নিক বসুমতী

শারদীয়া সংখ্যা
১৩৭১

CUK-Hos 883.5 1245081

ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
প্রিয়া স্নো
উষসী ফেস্ পাউডার

কলিকা

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ

উৎসবের দি
গানে গন্ধে
রসে ভরে উ
সার্থক হোক্ মাতৃপূ

এনামেলের বাসন

খাস জনতা
(ঢাকনাসহ)

খাস জনতা

দীপ্তি লণ্ঠন

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট

৬৭, ৭৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গু

কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫

KALPAN

শারদীয় অভিনন্দন

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

কেয়ো-কার্পিন বিভাগ

দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দেবাদুর্গা ঃ—		৯
উপন্যাস ঃ—		
১। শেষবসন্ত	বাণী রায়	১৩১
শিকার কাহিনী ঃ—		
১। হৃতশাবা	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৩৭
ছড়া ঃ—		
১। উষ্ট্ররোগ	অন্নদাশঙ্কর রায়	৭৪
২। রকমারি ঝকমারি	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৮৯
স্মৃতিচিত্রণ ঃ—		
১। হেমলতা ঠাকুর (বড়মা)	অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬
২। শ'এর সঙ্গে কিছুক্ষণ	সুধীরচন্দ্র সরকার	১৭৪

বিষয়	লেখক
বিবিধ-বিষয়ক রচনা ঃ—	
১। বাঙালীর দুর্গোৎসব	তারাপদ ভ
২। বাঙলায় দুর্গাপূজা	ননীমাধব
৩। বর্ণবিদ্বেষ ও জাত্যাভিমান	জুলফিক
৪। মানুষের অমরকীর্তি	রমা দেব
৫। মূক-বধির শিক্ষার ইতিহাস	নির্মলেন্দু
৬। ভারতে বিদেশী চিকিৎসকগণ	শৌরীন্দ্র
৭। পশ্চিম বাঙলার লোকচিত্রকলা	আশীষ ব
৮। রবীন্দ্রসংগীতে সুররক্ষণ	প্রফুল্লকুমা
৯। আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও ভারত	কৃষ্ণময় ভ
১০। একটি প্রাচীন তামিল গাথা	সুধাংশুমোহন

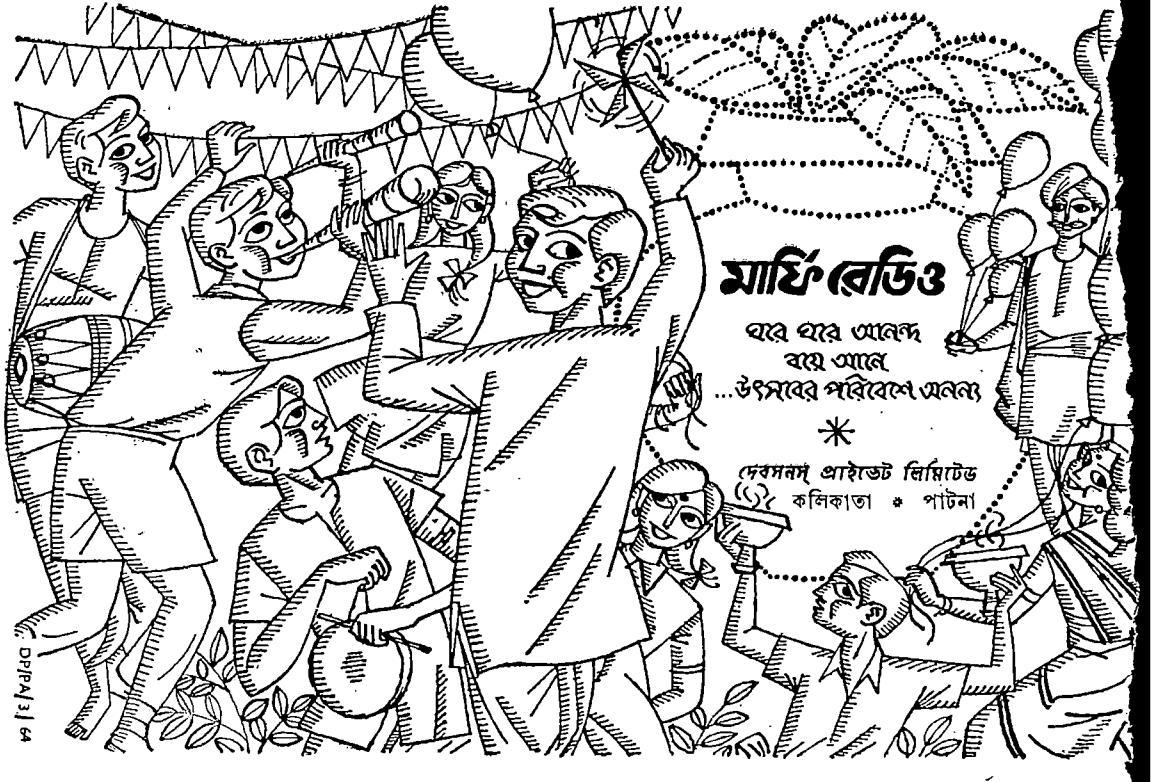

সূচীপত্র

	লেখক	পৃষ্ঠা
য় শিল্পকলার সূচনা		
াশ	প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
লোকে বুদ্ধিমান		
ছ	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	১১২
বা ফুলের তোড়া	আভা পাকড়াশী	১৯৯
বিজয়ার গান	নরেশচন্দ্র ঘোষ	২০১
া ঃ—		
রর পিকাডিলি	দেবেশ দাশ	২১
ান	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৫
টনে তুলেছে	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	২৯
	লুইজি পিরানদেল্লো ঃ অনুবাদকঃ সুবীরকান্ত গুপ্ত	৩১
ণ্ট	কালপুরুষ	৫৯
া	বিভা বসু	৬৯
ঠি দেয় ভরিয়া	শান্তা বসু	৮১
	ভক্তি দেবী	৮৩
	চিত্রিতা দেবী	৮৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১০। সম্পাদকীয়	প্রণতি মুখোপাধ্যায়	৯০
১১। প্রেমের জন্ম এবং মৃত্যু	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৫
১২। বুফে ডিনার	দক্ষিণারঞ্জন বসু	১০৬
১৩। জীবনের সাধনা	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪
১৪। যৌথ	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১১৮
১৫। ভর করো	নীলকণ্ঠ	১২৫
১৬। প্রতিধ্বনি	বাবি দেবী	১২৮
১৭। আংশিক মূল্য	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৬৩
১৮। পিতা স্বর্গ ঃ পিতা ধর্ম	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৬৯
১৯। দশটা পঁয়তাল্লিশে	ছবি বসু	২০৩
২০। নব-সন্ন্যাস	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩৩
২১। ইতিহাসের একটি সন্ধ্যা	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৭
২২। মুক্তি	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	২৪১
২৩। অন্নদামঙ্গল	প্রভাত দেবসরকার	২৪৪
২৪। একটি মৃত্যু কাহিনী	আশা দেবী	২৫৪
২৫। নক্সা	সন্তোষ বন্দোপাধ্যায়	২৬০

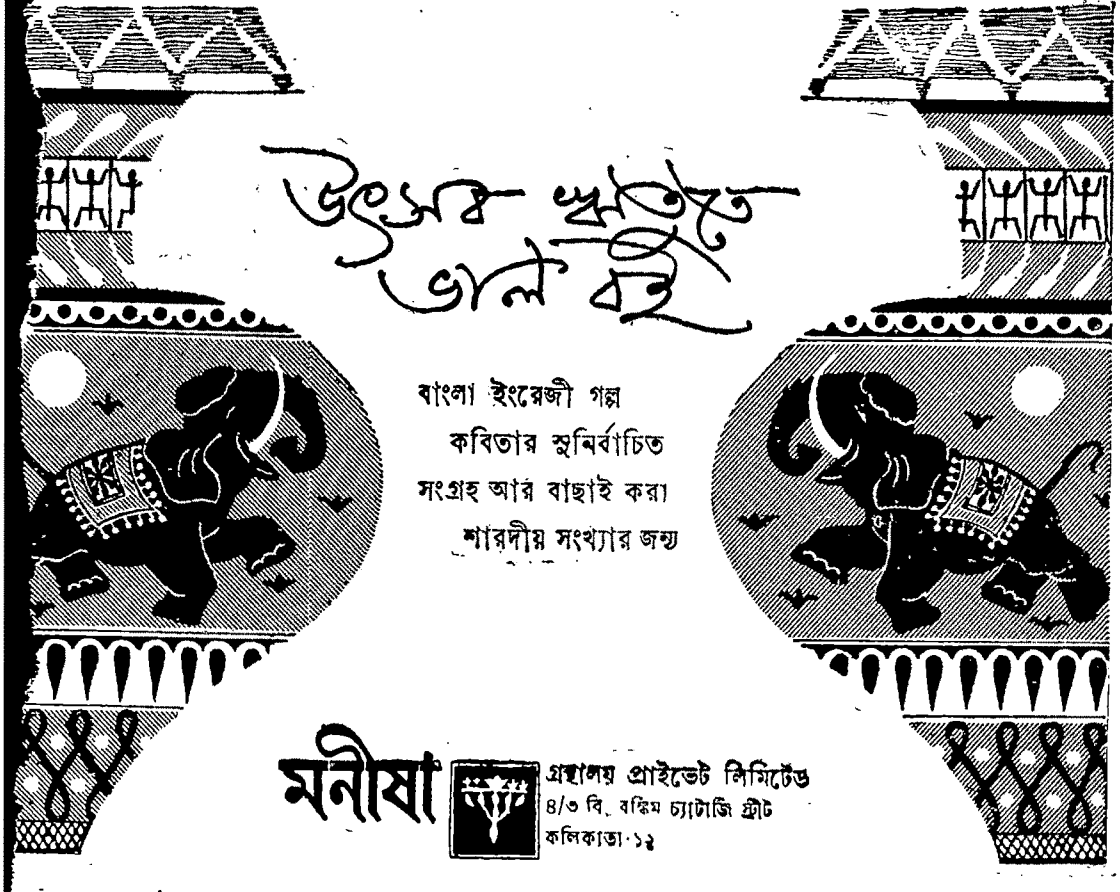

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা :—			
১।	চতুর্দোলা	বনফুল	৪১
২।	নাস্তিক	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪২
৩।	পলাতক	কান্তা দাশ	ঐ
৪।	বিষাদিনী তুমি আছ	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	ঐ
৫।	স্বাদ	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৩
৬।	পথ	বাসব ঠাকুর	ঐ
৭।	যন্ত্রণা	মৃণালকান্তি দাশ	ঐ
৮।	গীটার বাজে	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৪৪
৯।	প্রথমা	জয়ন্তী সেন	ঐ
১০।	মধ্যরাত্রি	কৃতী সোম	ঐ
১১।	তৃতীয় ছায়া	শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	ঐ
১২।	তন্বী	কৃষ্ণধন দে	৪৫
১৩।	জানালাটা খুলে দাও	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	ঐ
১৪।	বিস্মৃত অতীত	বীরু চট্টোপাধ্যায়	ঐ
১৫।	এই মন	করুণাময় বসু	ঐ
১৬।	মহিষাসুর	শিবরাম চক্রবর্তী	১৭৬
১৭।	অভিনেত্রী	বন্দে আলী মিয়া	ঐ
১৮।	ভাদ্রসন্ধ্যা	বিষ্ণু দে	ঐ
১৯।	বিচার	গোপাল ভৌমিক	১৭৭
২০।	একটি মনের মৃত্যু	শশাঙ্কশেখর সরকার	ঐ
২১।	সাঁকো	হরপ্রসাদ মিত্র	ঐ
২২।	বুড়োটা	মায়া বসু	ঐ

	বিষয়	লেখক
২৩।	পরোয়ানা	কনক মুখোপাধ্যায়
২৪।	তিমিরাভিসার	রাণা বসু
২৫।	অকথ্য	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়
২৬।	জাগরণ	শিবদাস চক্রবর্তী
২৭।	একটি মুখ	সুধাংশু দে
২৮।	শরতে আজ সোনার দিনে	সুধীর বেরা
২৯।	পারি নি	সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৩০।	মিছিল	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৩১।	হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র	প্রতিমা রায়
৩২।	টপলেস	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৩৩।	যোজনা	প্রেমেন্দ্র মিত্র
৩৪।	জন্মদিনে	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫।	তুমি খুশি হবে বলে	জগদীশ ভট্টাচার্য
৩৬।	বুকের ভিতর	আনন্দ বাগচী
৩৭।	দূর-দিগন্তে	আবুলকাশেম রহিমউদ্দ
৩৮।	বাদল দিনে	রমা চৌধুরী
৩৯।	ম্যাগ্নোলিয়া	সুনন্দা দাশগুপ্ত
৪০।	দ্বিতীয় নায়ক	দুর্গাদাস সরকার
৪১।	আরো কিছুদিন	সুশীলকুমার গুপ্ত
৪২।	রূপসী	মৃণালকান্তি মুখোপাধ্
৪৩।	মলয় লিপিকা	ছায়া দেবী
৪৪।	আশ্চর্য কলম	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৪৫।	কোলকাতায় বৃষ্টি	শুদ্ধসত্ত্ব বসু

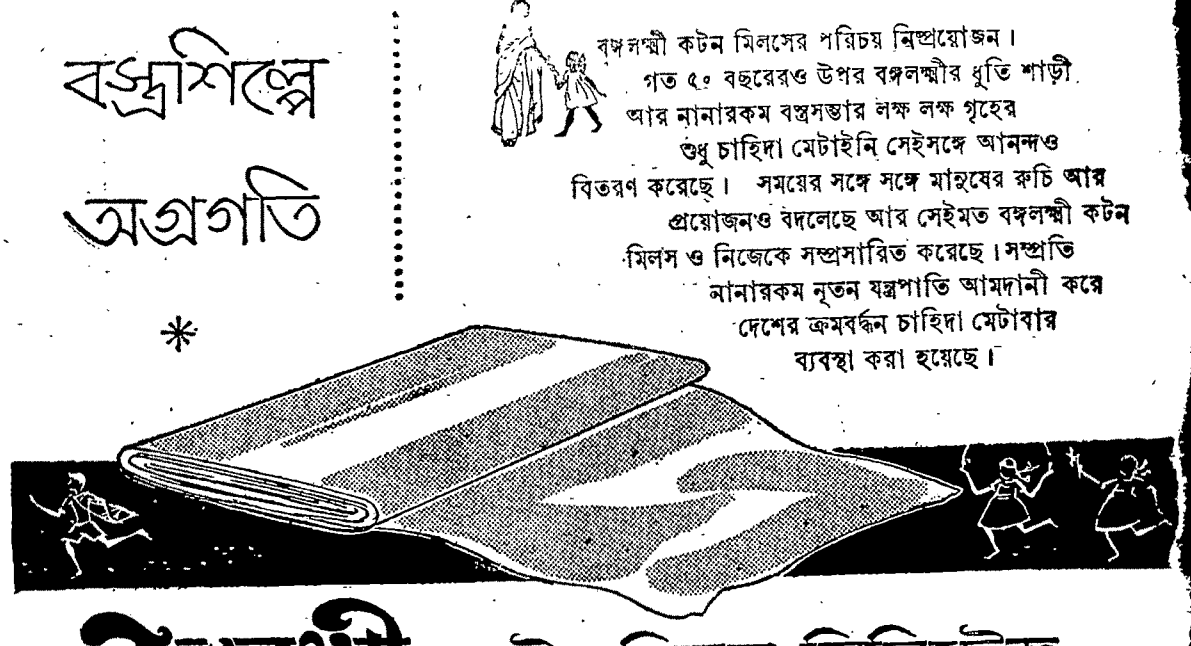

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোটদের পাতা :—		
১। এলেন দশভুজা (কবিতা)	বিষ্ণুশর্মা	১৮২
২। অদৃশ্য অশ্বারোহী (গল্প)	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৮৩
৩। সত্যি কথা (কবিতা)	অতীন মজুমদার	ঐ
৪। মিনকু (গল্প)	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	১৮৪
৫। নেতা হবার নেশা (গল্প)	স্বপনবুড়ো	১৮৫
৬। লক্ষ্মীচোর (গল্প)	শান্তা দেবী	১৮৭
৭। গায়ে যদি জোর পেতে চাও (প্রবন্ধ)	পশুপতি ভট্টাচার্য	১৮৮
৮। বিপিনদা' (গল্প)	অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১৮৯
৯। তুচ্ছ এক কণা ধূলো (গল্প)	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৯১
১০। মুস্কিল আসান (গল্প)	বিমল দত্ত	১৯২
১১। মানুষ (কবিতা)	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৯৩
১২। নরওয়ের একটি উপকথা (গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৪
১৩। ব্লাড ব্যাঙ্ক (প্রবন্ধ)	নির্মল সরকার	১৯৫
১৪। একটি হত্যাকাণ্ড (গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	ঐ
১৫। গিনুর আবিষ্কার (কবিতা)	নরেন্দ্র দেব	১৯৬
১৬। যো হুকুম হুজুর (কবিতা)	পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭
১৭। নতুন ভূগোল (কবিতা)	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৯৮
চিত্ররূপ ও নাট্যমঞ্চ :—		
১। আজকের ছায়াছবির সমস্যা	ও সি গাঙ্গুলী	২৫০
২। তারকাপুঞ্জ কি অস্তগামী	রমেন চৌধুরী	২৫২
সংগ্রহ :—		
১। শ্রী	অক্ষয়কুমার বড়াল	২৪
২। শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৩৬
৩। মহাকবি চণ্ডিদাসের দুইটি পদাবলী		৬৮

নাট্য-সাহিত্যের সেই গৌরব-জ্যোতি
ঐতিহাসিক নাট্য প্রতিভার বরপুত্র
অমর নাট্যমহাকবি—গীতিনাট্য-সম্রাট
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে :—প্রতাপাদিত্য, কিন্নরী, বঙ্গে রাঠোর, মিডিয়া, প্রমোদরঞ্জন।

২য় ভাগে :—ভীষ্ম, বাঙ্গালার মসনদ, পদ্মিনী, গুহামুখে, ভূতের বেগার, চাঁদের আলো।

৪র্থ ভাগে :—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদিন, জয়শ্রী, ফুলী।

৫ম ভাগে :—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদী, পুনরাগমন, বৃন্দাবন বিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে :—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভঙ্গ, খাঁজাহান, বিরামকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে :—রঘুবীর, জুলিয়া, বদৌরা, কুমারী, বরুণা ; কবি-কাননিকা রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

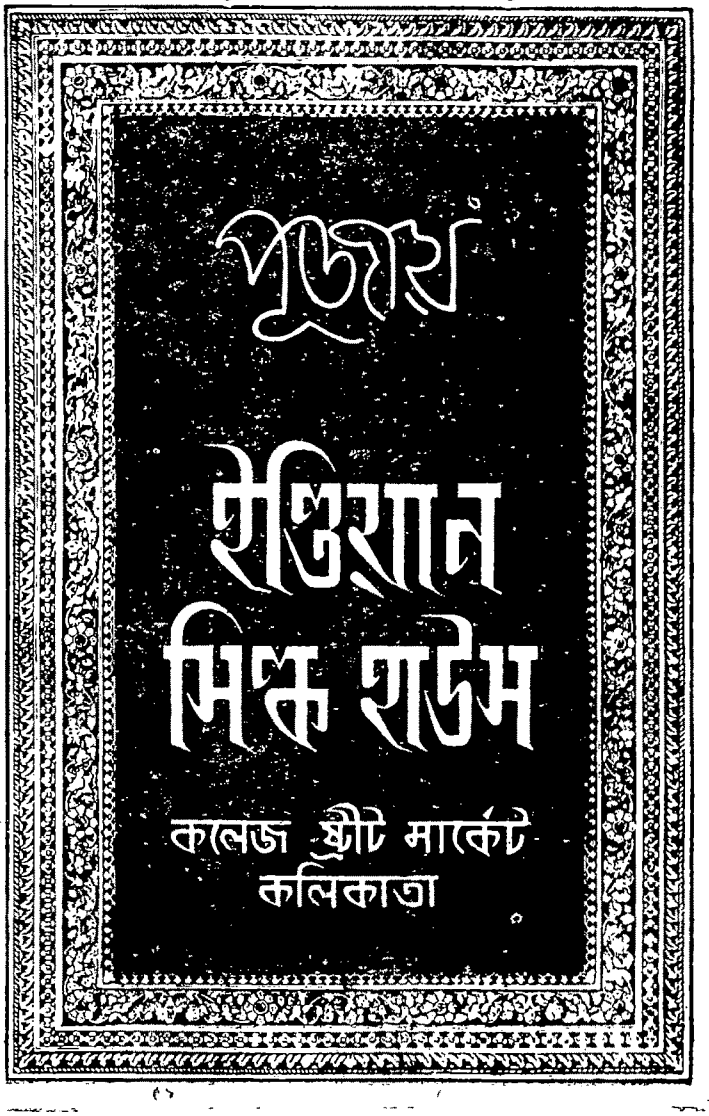

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল কারখানায় সেন-র‍্যালের তৈরী

SRC.88 BEN

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের **একমাত্র সুগম পন্থা**—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়।

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ সংস্করণ—

দেবাদিদেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র জগতে সদ্য ফলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা অন্য শাস্ত্র নিদ্রিত—তাহার সাধনা নিষ্ফল। শ্মশানে সাধনামগ্ন মহাদেব পঞ্চযুগে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তন্ত্রসমুদ্র মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের শক্তি-বীজ নিহিত অমূল্য রত্ন এই বৃহৎ তন্ত্রসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনান্তকর পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঙ্কলন সারাৎসার সমাবেশ করিয়া

মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তন্ত্র-তত্ত্ব ও তন্ত্র-রহস্য—পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্ত ভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহু ব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তায় কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে! পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের অনুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশকালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনায় সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের সমন্বয়—কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত তন্ত্র আছে, সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। **মূল্য দশ টাকা।**

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খাটাউ ভয়েল কিনতে গিয়ে...

খাটাউ ভয়েল কিনতে গিয়ে সত্যি আনন্দ পাবেন, কত অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ—আর কত অপরূপ ছাপ ও বাহারের ছড়াছড়ি। একমাত্র খাটাউই এই অনৈসর্গিক সৌন্দর্যসম্ভার অতি সামান্য মূল্যের ভিতর আপনাকে পরিবেশন করতে সক্ষম।

প্রতি মিটার অন্তর কিনারায় খাটাউ মিলের ছাপ দেখে নেবেন

দি খাটাউ ম্যাকেন্‌জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কাং লিমিটেড

হেড অফিস :—লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বম্বে-১

মিলস্ :—হাইনস্ রোড, বা: কুলা, বম্বে-২৭

পাইকারী বস্ত্রের দোকান :—গোবিন্দ চৌক্, মুলজী জেঠা মার্কেট, বম্বে-২

দেখুন আজকের সব চাইতে জনপ্রিয় গাঢ় বাদামী রঙের জমির উপর কি মনমাতানো—অথচ কত আধুনিক ছাপের সমাবেশে খাটাউ এই অতুলনীয় ভয়েলটি সৃষ্টি করেছে।

যে কোন বেলায়
যে কোন জায়গায়
যে কোন অনুষ্ঠানে

খাটাউ ভয়েল

আপনাকে শ্রী ও লাবণ্যে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলবে

SISTAS KMS 335

রিটেল শো-রুম : ১৮-এল, পার্ক স্ট্রীট, প্রবেশ পথ মিডিলটন রো, কলিকাতা—১৮
১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

আপনি কি নিঃসন্দেহ?

ছবি উপভোগ করছেন? কিন্তু আপনি কি নিঃসন্দেহ যে আপনার আশেপাশের সঙ্গীদেরও আপনি ছবি উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছেন?

ঘামের দুর্গন্ধ বিরক্তিকর, বিশেষত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে। বিস্ময়কর জি-১১* দেওয়া **সিন্থল** টয়লেট পাউডার নিয়মিত ব্যবহার করলে এই দুর্গন্ধের মূল বীজাণুগুলিকে অব্যর্থভাবে অথচ ধীরে ধীরে মারা যায়।

সিন্থল আপনাকে বরণীয় ক'রে তোলে এবং আপনার বরণীয়তা সম্বন্ধে আস্থা জাগায়।

পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে হ'লে **সিন্থল** সাবান মেখে স্নান করার পর, মধুর গন্ধে সুবাসিত, দুর্গন্ধনাশক এবং স্নিগ্ধকর জি-১১ দেওয়া **সিন্থল** টয়লেট পাউডার আপনার সারাদেহে ছিটিয়ে দিন।

* এল জীবনদান কোং এর ট্রেডমার্ক

*"**হোয়াট ইজ জি-১১**" নামে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক পুস্তিকার জন্যে নিম্ন ঠিকানায় লিখুন—**গোদরেজ,** বোম্বে—১২

এই সেই সৌন্দর্য সাবান যেটি একাধারে দুর্গন্ধিনাশক

Godrej গোদরেজ সাবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম

CT-12 BEN.

শ্রীশ্রীদুর্গা

(উড়িষ্যার দুষ্প্রাপ্য লোকশিল্প

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী

॥ ১৩৭১ ॥

(চিত্রাধিকারী শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ১৩৭১

758.3
০০৩।।

দুর্গার ধ্যান—

'জটাজুটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীং॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তী কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্ধ্বং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাং॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দুর্গাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং।'

শ্রীশ্রী দুর্গা

ভারতে মহাশক্তির পূজা অতি প্রাচীন। বেদ চতুষ্টয়ে চিন্ময়ী মহাশক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। আর্ষঋষিগণ সেই চিন্ময়ী মহাশক্তিকে জগতের আদিকারণ মনে করিয়া তাঁহার অর্চনা করিতেন। ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত নামে দুইটি সূক্ত আছে। ভগবতী অম্ভৃণঋষির বাগ্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী দুহিতৃরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবীসূক্ত বলিয়াছিলেন ইহা উক্ত আছে। এই সূক্ত ভগবতী দুর্গারই সূক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীপাঠের পর এই সূক্ত পাঠের ব্যবস্থা আছে। মহারাজ সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্য দেবীসূক্ত জপ পুরঃসর দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

স চ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
—চণ্ডী ১৩।১০

চণ্ডীপাঠের আদিতে পঠনীয় রাত্রিসূক্তেও দুর্গারই স্তব করা হইয়াছে—

স্তোষ্যামি প্রযতাং দেবীং শরণ্যাং
বহ্বৃচ প্রিয়াং।
সহস্র সম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে
সুনবাম সোমং॥

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেহরুণে
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানচুর্নৃপ সৈকতীম্॥

অগ্রহায়ণ মাসে গোপবালাগণ ব্রতগ্রহণ পূর্বক মৃন্ময়ী মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন।

দেবীপুরাণে আছে—

তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্ধেন যৎফলং।
ন তদ্বক্তুং মহেশোঽপি শক্তো
বর্ষশতৈরপি।

দুর্গা তুষ্টা হইয়া নিমেষার্ধে যে ফলদান করিতে পারেন স্বয়ং মহাদেব শতবর্ষেও তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না।

আবার ভবিষ্যপুরাণে উক্ত আছে—

ন তত্র দেশে দুর্ভিক্ষং ন চ দুঃখং প্রবর্ততে
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ পূজ্যতে যত্র
চণ্ডিকা।

অন্যত্র ভবিষ্যোত্তরে উক্ত রহিয়াছে—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ
শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে
সর্ব দস্যুভিঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্য যে কোন ম্লেচ্ছসেবক অথবা দস্যুসেবক দেবীর পূজা করিবে।

পুনরায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে—

প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলকে রাসমণ্ডলে।
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ
ত্রিপুর প্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥
কালান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥

প্রথমে সৃষ্টির আদিতে গোলোকে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার মধুকৈটভের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মা দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার ত্রিপুরাসুরের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া মহাদেব দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। চতুর্থবার দেবরাজ ইন্দ্র দুর্বাসার শাপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবীর আরাধনা করেন। ইহার পর মেধসঋষির শিষ্য মহারাজ সুরথ মৃন্ময়ী প্রতিমাতে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যচিন্তামণি নামক স্মৃতিনিবন্ধে উক্ত আছে—

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
তৎ পশ্চাদ্রামভদ্রেন রাবণস্য বধার্থিনা॥

মহারাজ সুরথ প্রথমে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন, তৎপর রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

সাধারণত দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমাই বিহিত, ইহা পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে। তবে অন্যান্য প্রকারেরও বিধান রহিয়াছে, যথা—

বাঙালীর দুর্গোৎসব

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেন জুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।

কেনোপনিষদের প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে যে উমা-হৈমবতীর উল্লেখ আছে ইনিই ভগবতী দুর্গা।

স তস্মিন্নেকা কাশে
স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানা
মুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ
কিমেতৎ যক্ষমিতি
—কেনোপনিষৎ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকাঃ
চেরর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনং ব্রতং।

অনেন বিধিনা যস্তু দেবীং প্রীণয়তে নরঃ
স্কন্দবৎ পালয়েত্তস্য দেবী সর্বাপদিস্থিতং।
পুত্রদারা ধনর্দ্ধীণাং সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে
ভুক্ত্বেহ পরমান্ ভোগান্ প্রেত্য দেবীগণো
ভবেৎ॥

যে দেশে দেবীর পূজা হয় সেই দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না, সেই দেশে কেহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

না এবং কাহারও অকালমৃত্যু হয় না। যথাবিধি যে দেবীর প্রীতি উৎপাদন করে, দেবী তাহাকে স্বীয়পুত্র কার্তিকেয়বৎ সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার স্ত্রী-পুত্র-ধনসম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে সে পরম ভোগী হইয়া পরলোকে দেবীর অনুচর হইয়া থাকে।

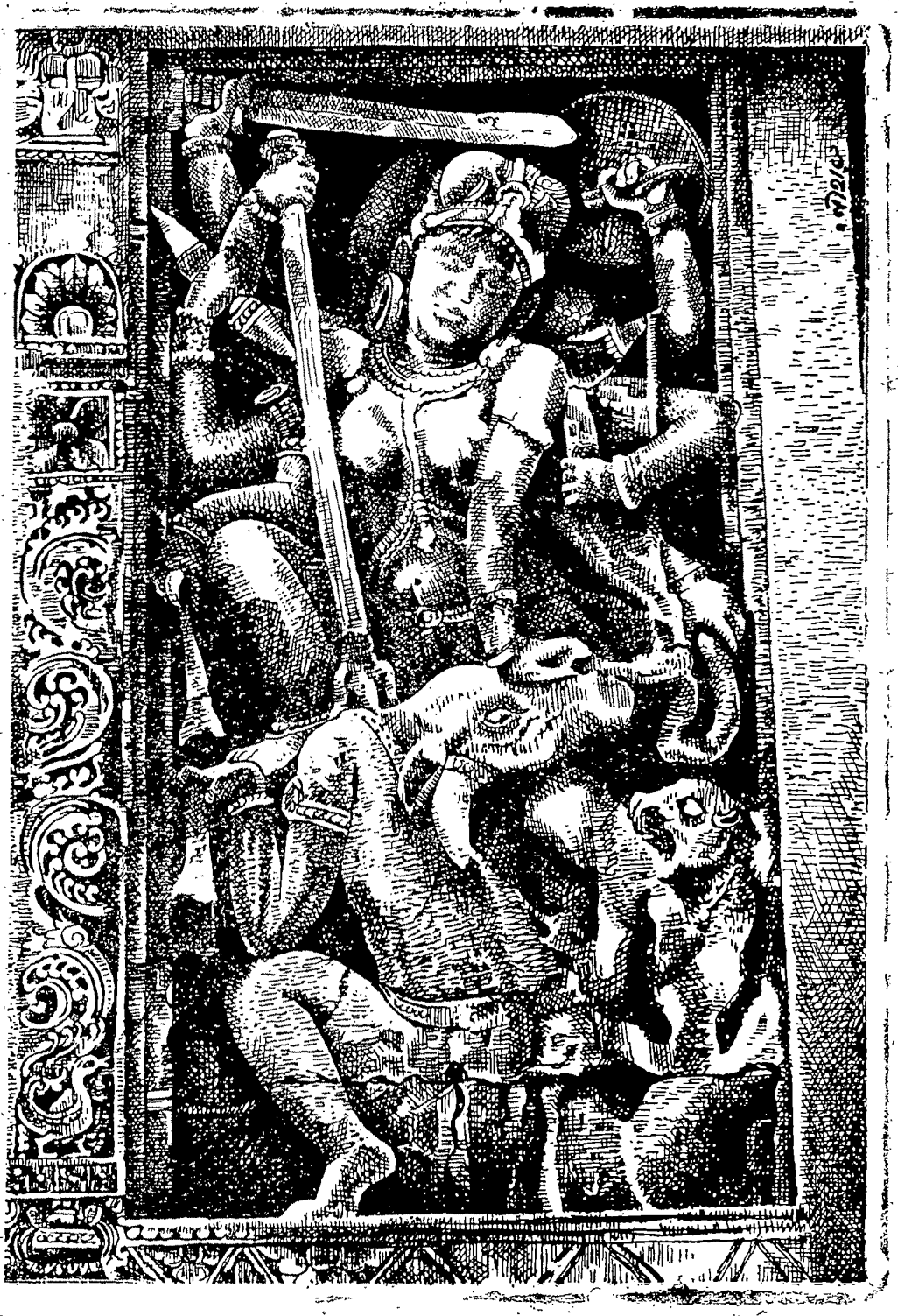

অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী (ভুবনেশ্বর)

[শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত]

তস্মিন্ দেবী প্রকর্তব্যা হৈমী চ রাজতী তথা
মৃদ্বার্ষী লক্ষণো পেতা খড়্গে শূলেঽথ পূজয়েৎ ॥
হেমোত্থা চাদরাৎ কার্যা সর্বকাম প্রসাধিকা
রাজতী চায়ুরারোগ্যা তাম্রী সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী ॥
চিত্রে বিরাজিতা দেবী গণগন্ধর্ব পূজিতা
হেমরাজত মৃদ্ধাতু শৈল চিত্রার্পিতাঽপি বা ॥
খড়্গে শূলেঽর্চিতা দেবী সর্বকাম ফলপ্রদা
মৃন্ময়ী প্রতিমাং কৃত্বা বিল্বে বা যস্তু পূজয়েৎ
আত্মবিত্তানুসারেণ স লভেন্নৌলিকং ফলম্ ॥
—দেবীপুরাণ

যথা স্বর্ণময়ী, রজতময়ী, মৃন্ময়ী, দারুময়ী, তাম্রময়ী, প্রস্তরময়ী প্রতিমায়, খড়্গে, শূলে, চিত্রে অথবা বিল্বমূলে দেবীর পূজা বিহিত আছে। হেড়ম্ব রাজগণের প্রতিষ্ঠিত রণচণ্ডী খড়্গরূপিণী ছিলেন। কোন কোন স্থানে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ধাতুময়ী, প্রস্তরময়ী বা দারুময়ী মূর্তি নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন এবং পর্বাদিতে দেবীর বিশেষ পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তবে দুর্গোৎসবে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমাই প্রচলিত। নিবন্ধকারগণ পুরাণাদি হইতে যে-সকল পূজাবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবতাগণের উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র কালিকা-বিলাস গ্রন্থের অষ্টাদশ ও বিংশ পটলে ঐ সকল দেবতার পূজারও বিধান রহিয়াছে—

গণেশ কার্তিকস্যাপি ময়ূর মূষিকস্য চ
জয়ায়া বিজয়া দেব্যাঃ সরস্বত্যাস্তথৈব চ।
কমলায়াস্তথা পূজাং শিবস্য ব্রহ্মণস্তথা
সাবিত্রীপূজনং কৃত্বা স চ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
—কালিকা-বিলাস, ২০ শ পটল

কোন্ প্রতিমা দেবীর কোন্ দিকে নির্মাণ করা হইবে তাহাও বিহিত আছে।

বাঙলায় প্রবর্তিত দুর্গোৎসব অন্যূন ছয়শত সরের প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রতিমার বর্তমান প্রচলিত রূপ ও আকার অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যুগেরই বলিয়া মনে হয়। কালিকা বিলাসই তাহার প্রমাণ—

জয়াং বামস্থিতাং বিদ্যাদ্বিজয়াঞ্চাপি দক্ষিণে
বামে চ কার্তিকং দেবং দক্ষে গণপতিস্তথা।
যা নিত্যা প্রকৃতিলক্ষ্মী দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা
সারদা সরস্বতী নিত্যা বামভাগে সদাস্থিতা ॥

শক্তিসাধক বাঙালী ভাবুক ও কবি। দশভুজার উপরোক্ত মূর্তি বাঙালীর ভাবুকতার পরিচায়ক। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—বাঙালী নিজস্বভাবে ও কল্পনায় মায়ের সে মূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছে। তাঁহার দশভুজা অসুরদলনী নহেন, তিনি তাঁহার মাতৃরূপিণী মহাশক্তি। দশপ্রহরণ-ধারিণী সিংহবাহিনী মা—জয়া, বিজয়া, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা দেবসেনাপতি প্রভৃতি পরিজনসহ সম্বৎসরে দিনত্রয়ের জন্য পিতৃগৃহে শুভাগমন করিয়া থাকেন। সে বাৎসল্যরসাশ্রিত ব্যাপার এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাবের সামগ্রী। সম্বৎসরে বাঙালীর গৃহে গৃহে এই বাৎসল্যরসের অবতারণা হইয়া থাকে যেন বৎসরান্তে কন্যারত্ন শ্বশ্রূগৃহ হইতে তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়া মহানন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বাঙালীর সে আনন্দ কেবল উৎসবের আনন্দ নহে, সে আনন্দ যেন দীর্ঘদিনের পর কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের আনন্দ। বাঙালী মহানন্দে যেন কন্যার সেই সাযুজ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকভাবের সহিত সে-বাৎসল্যরস মিশ্রিত হইয়া এই যে ভাবের সৃষ্টি করে তাহাই বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি। সেই ভাবের উন্মাদনায়ই বাঙালী একদিন গাহিতে পারিয়াছিল—

গিরি! এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না ॥

দুর্গোৎসবের কয়েক প্রকার পূজাপদ্ধতিই দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, দেবী-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বরপুরাণ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে? বিদ্যাপতি সংকলিত শ্রীদুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী নামক নিবন্ধগ্রন্থ বাঙলার কোথাও কোথাও অনুসৃত হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব রাজকীয় ব্যাপার, রাজসিকও বটে, বিধিদৃষ্টে অন্তত ইহা অনুমিত হইয়া থাকে। মহারাজ সুরথ চৈত্রমাসে মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন। পুনরায় রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য আশ্বিনে মায়ের বোধন করিয়াছিলেন—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি
কৃতঃপুরা ॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে
বোধয়াম্যতঃ ॥

উত্তরায়ণে দেবতাগণ জাগ্রত থাকেন, দক্ষিণায়নে সুপ্ত থাকেন। শরৎকাল দক্ষিণায়ন, তাহা দেবতার অকাল। তাই অকালের পূজায় বোধনের ঘটা এত অধিক। শক্তিসাধক মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে সংযম নিয়মাদি দ্বারা জাগ্রত করিবেন। দেহ-বিল্বমূলে যে শক্তি প্রসুপ্তা আছেন বোধনের দ্বারা সে শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে, বোধনের আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই।

শক্তিসাধনায় পিতৃগণের আশীর্বাদ অবশ্য কাম্য। তাই দেবীপক্ষের পূর্বে পিতৃপক্ষ, প্রেতপক্ষ বা অপরপক্ষ। সে সময় তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের আশীর্বাদ কামনা করিতে হয়। ভক্তিমান্ হিন্দু-সন্তান সেই পক্ষে স্বর্গস্থ স্বধাভুক্ পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনপূর্বক শক্তিসাধনার যোগ্যতা লাভ করিবেন। আমাদের সে সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হইলেও ধর্ম ও সমাজস্থিতির জন্য এ সকলে প্রাণসঞ্চারের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রাণহীন অনুষ্ঠানের সার্থকতা নাই, তাই শক্তিসাধক দুঃখভরে গাহিয়াছেন,—

শক্তিপূজা কথার কথা নয় মা,
যদি কথার কথা হতো চিরদিন ভারত—
শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না।

বাঙলায় দুর্গাপূজা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

বাঙলায় দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে। দেবীপুরাণের মতে এই পূজা অকালের পূজা। অকালে পূজার ব্যাখ্যা আছে বোধনের মন্ত্রে—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণো বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি
কৃতঃ পুরা।

হে দেবি, পূর্বে রাবণবধের জন্য এবং রামকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অকালে ব্রহ্মা তোমার বোধন করিয়াছিলেন। কালিকা-পুরাণের শ্লোকে অকালের উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, মহাভারতে রামের দুর্গাপূজার কথা আছে। পুরাণের মত গ্রাহ্য করলে এই দাঁড়ায় যে, বাঙলায় আমরা যে দুর্গাপূজা করি তাহা ত্রেতাযুগে রাম কর্তৃক রাবণ-বধের বার্ষিক উৎসব। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, ভারতবর্ষে এতগুলি দেশ থাকিতে পূর্বপ্রান্তের বাঙলায় এই উৎসব পালিত হয় কেন? বাল্মীকি রামায়ণে বা অধ্যাত্ম রামায়ণে রামের দেবীপূজার উল্লেখ নাই। কালিকাপুরাণে দেবীপুরাণের শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে, শরৎকালে দুর্গোৎসবের কথা আছে। পুরাণ অনুযায়ী অনেককাল এ পূজা হইতেছে বাঙলায়, এই সকলের ভিত্তিতে বাঙলার নিজস্ব পূজাপদ্ধতিও রচিত হইয়াছে। শূলপাণির দুর্গোৎসববিবেক, বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তি-তরঙ্গ এবং রঘুনন্দনের দুর্গাপূজাতত্ত্ব ইহার প্রমাণ। উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বৈদিক সংস্কার ছাড়া বাঙলায় পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজায় তান্ত্রিকবিধির প্রাধান্য।

বাঙলায় পূজিতা দুর্গার প্রতিমায় দুর্গা দশভুজা, প্রহরণধারিণী, সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী। কালিকাপুরাণে দেবী দশভুজা, মহিষাসুরমর্দিনী রূপের বর্ণনা আছে। দেবীর চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, অষ্টাদশভুজা রূপের কথাও আছে। উক্ত হইয়াছে দেবীর মূলমূর্তি অন্তর্হিত। দেবগণের পূজিত দেবীর দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী রূপই প্রসিদ্ধ। এই রূপেই দেবী সর্বত্র পূজিত। দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের উৎপত্তির ইতিহাস কালিকাপুরাণ ও দেবীমাহাত্ম্যে একই প্রকার। সকল দেবতার তেজ মিলিয়া দেবীর উৎপত্তি হয়। দেবীর সকল প্রহরণ দেবগণ দিয়াছিলেন, বাহন সিংহ দিয়াছিলেন নগরাজ হিমালয়। দেবীমাহাত্ম্যের একটি শ্লোকের মতে দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী নন। তিনি দুর্গম অসুরনাশিনী এবং দেবীর এক অবতার।

দুর্গার পরিচয় প্রসঙ্গে মোটামুটি দুই প্রকারের মত দেখা যায়। বাঙলায় পূজিতা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার পিতৃপরিচয়—তিনি হিমালয় ও তৎপত্নী মেনকার দুহিতা উমা, গৌরী বা পার্বতী। স্বামীর পরিচয়—তিনি কৈলাসাধিপতি মহাদেব। কেন উপনিষদের মতে উমা হৈমবতী, ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি দেবগণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হৈমবতীর অর্থ করা হইয়াছে হিমবত-দুহিতা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে জগন্মাতার নাম অম্বিকা। অম্বিকার অপর নাম পার্বতী। অম্বিকাপতির উল্লেখও আছে। ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী উমাকে ঋগ্বেদের উষার সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অম্বিকাপতি মহাদেবকে বৈদিকরুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। এই হইল একটি মত। দ্বিতীয় মত, শাক্ত ও তন্ত্রশাস্ত্রকার-গণের মত। তাঁহাদের মতে যিনি ব্রহ্মবিদ্যা তিনি আদ্যাশক্তি, মহাবিদ্যা, বিষ্ণুমায়া।

যোগমায়া, মহামায়া, মহাদেবী বিষ্ণুমায়ার নাম। আবার শিবা, দুর্গা, পার্বতী, অম্বিকা ও বিষ্ণুমায়ার নাম। শাক্ত ও তন্ত্র-শাস্ত্রকারগণ এই আদ্যাশক্তিকে বৈদিক উষার সঙ্গে যুক্ত না করিয়া ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ দেবী-সূক্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। দেবীসূক্তে বিষ্ণু বিষ্ণুর কথা নাই, রুদ্রের উল্লেখ আছে। দেখা যায় যে, বিষ্ণুমায়া নাম হইতে বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া দেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ে শুম্ভ-নিশুম্ভবধের যে কাহিনী আছে তাহাতে দেখা যায়—রাজ্যভ্রষ্ট দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া কৌষিকীর স্তব করিলেন। তাঁহার ললাটফলক হইতে কালীর উৎপত্তি হইল। চামুণ্ডা ইহার অনুরূপা। এইরূপে তিনি চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

দেবীমাহাত্ম্যের অন্য স্থানে উক্ত হইয়াছে, দেবী নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করিয়াছিলেন। নন্দগোপকুল এবং বিন্ধ্য-পর্বতের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক সম্বন্ধে এই যে নূতন ধারা দেখা যাইতেছে ক্রমে তাহা প্রবল হইয়াছে। দেবীপুরাণে দেবীকে বিন্ধ্য-ভূধর পুত্রিকা, বিন্ধ্যাচলবাসিনী বলা হইয়াছে এবং শবর, পুলিন্দ, বর্বর উপজাতিদের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা আছে। দেবীর পূজা উপলক্ষে ইহারা যে উৎসব করিত তাহার

নাম শারদোৎসব। এই উৎসবের কথা কালিকাপুরাণে আছে। হরিবংশে দেবকীগর্ভে দেবীর জন্মের কথা, বিন্ধ্যাচলে তাঁহার পূজার কথা এবং শবরাদি উপজাতীয়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নন্দগোপগৃহে বিষ্ণুমায়ার জন্মগ্রহণের কথা আছে। দুর্গা, অম্বিকা, ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবীর নাম।

মহাভারতে দুইটি দুর্গাস্তব আছে। দুর্গার উৎপত্তি-কাহিনী হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণের কাহিনীর অনুরূপ। মনে হয় এই কাহিনী মহাভারত হইতে পুরাণাদিতে গৃহীত হইয়াছে। রাজ্যভ্রষ্ট যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের লইয়া বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়া দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ ত্বাং প্রপন্নবান, রাজ্যভ্রষ্ট আমি তোমার শরণাপন্ন। তুমি সংগ্রামে জয়প্রদা, মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম। এই দুর্গাদেবী কিন্তু চতুর্ভুজা, চতুর্বক্ত্রা। তিনি মহিষাসুর-নাশিনী। দুর্গবত্তারথসে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গাস্মৃতা জনৈঃ, দুর্গ বা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দুর্গা বলে। তিনি বাসুদেবের ভগ্নী, বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী, মেঘের ন্যায় কৃষ্ণা। ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত দেখিয়া শত্রুজয়ের কামনায় বাসুদেব অর্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে উপদেশ দিলেন। অর্জুনের স্তবে দেখা যায়, দেবী মন্দরবাসিনী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, পীতবাসিনী, মহিষরুধিরপ্রিয়া, রণপ্রিয়া। তাঁহার নাম মহাবিদ্যা, মহানিদ্রা, ভগবতী, দুর্গা ইত্যাদি। শাক্তপুরাণের কোকামুখ, অট্টহাসা, করালী, কাপালী, শাকম্ভরী নামগুলিও দেবীতে আরোপিত হইয়াছে। দেবীর শিখিপুচ্ছ ধ্বজের কথা দুইটি স্তবেই দেখা যায়। দেবীর পূজাগৃহে ধ্বজা উত্তোলন করিবার বিধি ছিল।

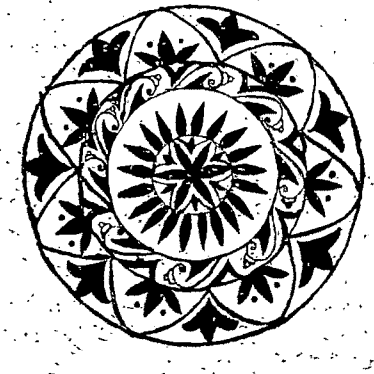

মহাভারতের দুইটি স্তবে দেবীকে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার উদ্যম দেখা যায়, হিমালয়ের ও মহাদেবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের উল্লেখ নাই, যদিও তাঁহাকে সকন্দমাতা নামটি দেওয়া হইয়াছে। হিমালয় ও মহাদেবের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রশ্ন উঠে নন্দগোপগৃহেজাতা, বাসুদেবের ভগ্নী হইয়া দেবী দূর বিন্ধ্যাচলে বাস করিতে গেলেন, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতির উপাস্যা হইলেন কেন?

আরও প্রশ্ন উঠে—শরৎকালে বাঙলায় পূজিতা দুর্গার সঙ্গে এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হয় তাহার কথা বলা হইতেছে। দুর্গার সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইতেছে, যথা দেবী-প্রহরণধারিণী, রণপ্রিয়া। নষ্টরাজ্য উদ্ধার, ভয় ও বিপদ হইতে উদ্ধার, শত্রুগণের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ দেবীর পূজার উদ্দেশ্য। দেবী উৎপত্তির পুরাণে দুইটি ধারা দেখা যায়, একটি ধারা হিমালয় ও মহাদেবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক, অন্য ধারা বিষ্ণু, বাসুদেব, বিন্ধ্যাচল, শবর, পুলিন্দাদি উপজাতির সঙ্গে সম্পর্ক। দেবীমাহাত্ম্যে অবতারবাদের সাহায্যে দুইটি ধারা মিলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাঙলায় পূজিতা দুর্গার স্বরূপ এবং হিমালয়-দুহিতা দুর্গা ও নন্দগোপকুলেজাতা বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের প্রশ্নের ব্যাখ্যায় নূতন কথা বলিয়াছেন রমাপ্রসাদ চন্দ। শরৎকালে দুর্গার পূজা এবং তাঁহার শাকম্ভরী নাম এই ব্যাখ্যার সূত্র। শরৎকাল ধান্য পক্ক হইবার সময়। এই সময়ে দুর্গাপূজা করিবার অর্থ এই যে দুর্গাপূজা গোড়াতে ছিল শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা। দুর্গার একটি নাম শাকম্ভরী। বিভিন্ন শাক্ত-পুরাণে এবং মহাভারতে এই নাম পাওয়া যায়। এই নামের ব্যাখ্যায় দেবীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে, শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণ আমার স্তব করিবেন, আমি শতাক্ষীরূপে আবির্ভূতা হইব। তখন এই সকল লোককে আমার দেহ হইতে নানাপ্রকার শাক উৎপন্ন করিয়া পরিপুষ্ট করিব এবং শাকম্ভরী নামে আমি প্রসিদ্ধিলাভ করিব। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন —দুর্গা corn mother এবং গ্রীকদেবী demeter-এর সঙ্গে তুলনীয়। বাঙলার দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ করিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোড়ায় দুর্গাপূজা শস্যদেবীর পূজা ছিল এবং The worship of Nava Patrika is a survival of agrarian phase of Durga-Worship.

দুর্গা উমা হৈমবতী, দুর্গা নন্দগোপকুলে-জাতা শবরাদি উপজাতীয়দের পূজিতা বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী, শরৎকালে ধান পাকিবার সময় বাঙলায় দুর্গার পূজা, তাহার শাকম্ভরী নাম এবং নবপত্রিকার পূজা এই সকল তথ্য মিলাইয়া দুর্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের অধিবাসীদের পূজিতা গিরিদেবী (mountain goddess) যাযাবর আভীরগণের পূজিতা দেবী, স্ত্রী-দেবতারূপে কল্পিত শস্যদেবী এবং রণদেবী, এই বিভিন্ন দেবীর সম্মেলনে (Syncretism) দুর্গার উৎপত্তি হইয়াছে, বহু সন্দেহের অবকাশ আছে এই সিদ্ধান্তে। একটার কথা বলিতেছি। উত্তরপ্রান্তের হিমালয়বাসীদের পূজিতা উমা, পণ্ডিত জগকোরী যাঁহাকে female mountain ghost বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং দক্ষিণের বিন্ধ্যপর্বতবাসী শবর-পুলিন্দ ইত্যাদি উপজাতীয়ের পূজিতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে এক mountain goddess বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। দুই দেবীর উৎপত্তির পুরাণ এবং ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। আর শরৎকালে দুর্গার পূজা হয় এই যুক্তিতে দুর্গাকে শস্যদেবী বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্ষান্তে শরৎকালে শুধু ধান পাকিত না, পথ-ঘাটের কাদা শুকাইত, সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন। শরৎকালে নবরাত্রি ও দশহরা উৎসব হয়। এই উৎসবের সঙ্গে আয়ুধধারিণী, বিজয়দায়িনী দুর্গার পূজার সম্পর্ক দেখা যায়। পুরাণে নবমীতে বিজয় কামনায় রাজাদের অস্ত্রপূজার বিধান আছে। পুরাণে দুর্গার প্রতিমার বিকল্পে ঘটে বা অস্ত্রে পূজার কথা আছে। তাহা ছাড়া syncretism বা এক দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন দেবীর সংযুক্তি শাস্ত্রসম্মত ব্যাপার। শাক্ত-পুরাণাদির মতে একই দেবী ত্রিগুণ-ভেদে বিভিন্নরূপে ও নামে বিভিন্ন স্থানে পূজিতা হন। বহুদেববাদের (polytheism) মধ্য দিয়া একদেববাদে (monotheism) উপনীত হওয়া হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অন্তরের কথা।

এবার বাঙলার দুর্গাপূজার কথায় আসা যাউক। পূজা হয় শরৎকালে, পূজাপদ্ধতি শাক্ততন্ত্রপুরাণানুযায়ী, আয়ুধধারিণী, সিংহ-বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার প্রতিমাও শাক্তপুরাণানুযায়ী। নূতন ব্যাপার এই যে, দুর্গার

সহিত কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী স্থান পাইয়াছেন বাঙলার দুর্গার প্রতিমায়। অর্থাৎ বাঙলায় দুর্গার গ্রুপ-প্রতিমার পূজা হয়। পুরাণোক্ত দুর্গার প্রতিমায় ইঁহাদের স্থান নাই দুর্গার পাশে। নবপত্রিকা বা নবদুর্গার পূজার কথা আছে পুরাণে কিন্তু তিনি দুর্গার পুত্রবধূ নহেন। নন্দগোপবংশজাতা, বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী দুর্গাকে বাঙালীরা চেনে না, তাহাদের দুর্গা হিমালয়ের কন্যা উমা, মহাদেবের গৃহিণী। কন্যা-স্নেহাসক্ত পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার স্থান গ্রহণ করিয়া বাঙলায় গৃহস্থ-গৃহিণী তিনদিনের জন্য কন্যা উমাকে স্বামিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আনেন, চতুর্থদিনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দেন। কন্যার পিতৃগৃহে আগমনে আনন্দের বান ডাকিয়া যায় ঘরে-ঘরে। তাই এত আগমনী গানের ছড়াছড়ি বাঙলায় কবে হইতে। বাঙলার চণ্ডীমঙ্গল ও শিবমঙ্গল পৌরাণিক দুর্গা ও মহাদেবকে 'সেণ্ট পার্সেণ্ট' বাঙালীতে পরিণত করিয়াছে।

ঐতিহাসিক কোন নজির আছে কি না জানি না। শোনা যায় তাহেরপুরের এক রাজা বাঙলায় দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। কালিকাপুরাণে রাজাদের (নৃপাদয়) দুর্গোৎসব করিবার কথা আছে। ব্যয়সাধ্য জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব বলিয়া প্রথমে ধনীরা দুর্গোৎসব করিতেন, তারপর মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে দুর্গাপূজা করা আরম্ভ হয়। আগেকার দিনে গৃহস্থের অবস্থা কিছু সচ্ছল হইলেই তিনি দুর্গাপূজা করিতেন। ইহাতে তাঁহার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত। তারপরের যুগে আরম্ভ হইল বারোয়ারী দুর্গাপূজার প্রচলন। এই বারোয়ারী দুর্গাপূজা এখনকার সর্বজনীন দুর্গোৎসব। গোড়ায় রাজসিক ধর্মানুষ্ঠান হইতে ইহা বাঙলার এবং বাঙালীদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে যে কোন শহরে কিছুসংখ্যক বাঙালী কায়েম হইয়া বসিতে পারিয়াছেন, সেখানে দুর্গাবাড়ি বা কালিবাড়ির পত্তন হইয়াছে। বাঙালীর এই Community Festival'কে এখন National Fesivtal বলা হয়।

দুর্গাপূজা যে শুধু পূজা নয়, উৎসবও বটে —কালিকাপুরাণে একথা পাওয়া যায়। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীত, ক্রীড়া-কৌতুকের কথা আছে। আগে ধনীগৃহের পূজায় এই অঙ্গটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইত। ১৯শ শতাব্দীতে কলিকাতায় ধনীগৃহে কি ভাবে দুর্গোৎসব করা হইত সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল খুঁজিলে তাহার বর্ণনা মিলিবে। সাহেব নিমন্ত্রণ, বিলাতী সুরা এবং nautch girls আমদানীর কথা, প্রচুর সুরাপানের পরের অবস্থার বর্ণনাও মিলিবে। আগে পূজার সময় যাত্রাগান হইত, এখনও হয়, কিন্তু সর্বজনীন পূজায় স্ত্রী-পুরুষের মিশ্র থিয়েটার এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রচুর ব্যবস্থা থাকে। এইসব ব্যবস্থার ফলে সর্বজনীন পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু যে পাড়ায় পাড়ায় তা নয়, একই পাড়ায় পৃথক পূজার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। অল্পবিত্ত গৃহস্থের চাঁদার অঙ্কও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাঙালীর উৎসবপ্রমত্ততা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগেকার দিনে পূর্ব ও উত্তর বাঙলার পল্লী অঞ্চলে দুর্গাপূজায় মুসলমান চাষীরা যোগ দিত, নূতন কাপড় পরিয়া প্রতিমা দর্শন করিত, জলপান লইত, বর্ষীয়সী চাষী-গৃহিণীরা নূতন শাড়ি পরিয়া নিরঞ্জনের জন্য নদীর ঘাটে রক্ষিত প্রতিমার পায়ে সিন্দুর-কৌটা স্পর্শ করাইত, মুসলমান যুবকেরা এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৌকা-বাইচে যোগ দিত ও আগমনী গান করিত। তিন-চার বছর আগে ঢাকার এক দুর্গাপূজার বর্ণনা পড়িয়াছিলাম। বড়লোকের পূজা। পূজামণ্ডপে এক খান বাহাদুরের কন্যা ও পুত্রবধূকে প্রতিমার পাশে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজনে নিযুক্ত দেখা গিয়াছিল।

বাঙলার দুর্গাপূজা মায়ের পূজা, কন্যার পূজা, বাঙলার দুর্গাপূজা জাতীয় উৎসবও বটে। জাতীয় উৎসব এই বিশেষ অর্থে যে দুর্গার সিংহবাহিনী, অসুরদলনী রূপের উৎপত্তির ইতিহাস এবং সেই রূপের পূজার গোড়ার কথা বাঙালীরা ভোলে নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই দৃষ্টান্ত দিবার জন্য কয়েক বৎসর পিছাইয়া যাইতে হইবে। দুর্গাপূজার সময় সে আমলে কোন কোন বাঙলা কাগজে দুর্গাস্তোত্র প্রকাশ করা হইত। এইসব স্তোত্রের মর্ম এইরূপ: মা কে বলে তুমি অসুরদলনী? দৈত্যগণের উৎপীড়নে আমরা আজ সন্ত্রস্ত, তাহাদের অত্যাচারে আমরা পর্যুদস্ত। তাহাদের উদ্দাম তাণ্ডবে পৃথিবী কম্পিতা। তুমি না কি শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়াছিলে, চণ্ডমুণ্ডকে চূর্ণ করিয়াছিলে, মহিষাসুরকে ধ্বংস করিয়াছিলে? তাহা হইলে রক্তবীজের গোষ্ঠী এখনও আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে কিরূপে? দুর্গা, ভক্তিভরে পবিত্র গঙ্গাজলে তোমার পূজা করিতেছি আমরা, অভয়া হইয়া তোমার সন্তানদের ভয় দূর করিতে অবতীর্ণা হইতেছ না কেন? ইত্যাদি।

এই দুর্গাস্তোত্র বিংশ-শতাব্দীর গোড়াকার। ঐ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ হইলে অসুরমর্দিনী দুর্গা, কালী, চামুণ্ডার নিকট অসুর বিনাশের প্রার্থনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। সে-যুগে গীতার মত চণ্ডী ও 'সিডিশাস' সাহিত্যের পর্যায়ে পড়িয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কৌতুকজনক একটা ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি। ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় (১৯১২—১৩) ঢাকার অনুশীলন সমিতিভুক্ত পঞ্চান্নজন আসামীকে চালান দিয়াছিল পুলিশ। সরকারী কৌসিল পি এল রায় মোকদ্দমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় শক্তিপূজা ও শাক্ততন্ত্র হইতে বিপ্লববাদীরা কিভাবে বাঙলায় বিপ্লববাদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আদালত এবং সাধারণকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

দশমীতে দুর্গাপূজা বিসর্জনের সময় শারদোৎসবের কথা আছে বিভিন্ন পুরাণে। শারদোৎসবের বর্ণনা দিলাম না, রমাপ্রসাদ চন্দের ভাষায়—It was a licentious revel. Licentious না বলিয়া আমরা riotous কথাটি ব্যবহার করিতে পারি, এই উৎসব সম্বন্ধেও যে আমাদের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটে নাই ভাসানের দিন প্রতিমাবাহী ট্রাকগুলির এবং তাহাদের অগ্রগামী জনতার অঙ্গভঙ্গী, মুখবাদ্য ইত্যাদি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন।

বর্ণবিদ্বেষ ও জাত্যাভিমান

ঔপনিবেশিকতার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

একে একে এশিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেতকায় ও অনুন্নত দেশগুলি বিদেশী শাসনের নাগপাশ-মুক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। যারা ছিল হীন, অবজ্ঞাত, আজ বিশ্বের দরবারে তাদের স্বীকৃতি মিলেছে। বেলগ্রেড সম্মেলনে বিশ্বভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তাই ডাক এসেছিল নেহরু, সুকর্ণ, নাসের, নক্রুমার। ফলে হ্যামারশীল্ডের শূন্য আসনে বসেছেন পীতকায় বর্মী উ থাণ্ট।

যদিও জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে অনেকে মানবিক অধিকার, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতির গালভরা বুলি আউড়েছেন, তবু ধ্বংসোন্মুখ কলোনিয়ালিজমকে রক্ষার জন্য এঁদের কারো কারো দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

স্বাধীনতাকামী উপনিবেশগুলিতে গোপনে দলাদলির বিষাক্ত আবহাওয়া ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য এঁরা বিশেষ সচেষ্ট। নিজেদের দেশ থেকে অর্থ, সৈন্য ও রণসম্ভার সরবরাহ করে জনগণের ঈপ্সিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন।...কেনিয়া, আলজেরিয়া, কঙ্গো, এঙ্গোলা, লাওস প্রভৃতি দেশের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।...

আসলে কলোনিয়ালিজমের মূলে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ ও জাত্যাভিমান। অশ্বেতকায় জাতির উপর বিদ্বেষ শ্বেতকায় জাতির অন্তর থেকে আজও দূর হয় নি।...

●

বেশিদিন আগের কথা নয়,—পঁচিশ বছর আগে বৃটেনে আর বছর বারো আগে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে (Northern States) যাঁরা বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা করতেন লোকে তাঁদের উপহাস করে বলত, 'Crack-pot'...

মোটামুটি বলতে গেলে, হাওয়াটা যদিও এখন অনেকটা পাল্টেছে তবুও ইউরোপের কোথাও কোথাও—বিশেষ বৃটেন ও অ্যামেরিকায় অশ্বেতকায় লোকদের উপর ঘৃণার ভাবটা এখনও দূর হয় নি, বরঞ্চ কিছুকাল হল কোন কোন জায়গায় এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা যেন উত্তরোত্তর উগ্রতর হয়ে উঠছে।

বছর কয়েক হল, বৃটেনে একশ্রেণীর লোক KBW (Keep Britain White) আন্দোলন সুরু করেছে। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার টেকনিসিয়ান ও শ্রমিক হিসাবে বহু ভারতীয় বা কমনওয়েলথভুক্ত অশ্বেতকায় (coloured) জাতির লোক বৃটেনে জীবিকা অর্জন করছেন। এঁদের আবার কেউ কেউ স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে ওদেশে আছেন।

আফ্রিকার বৃটিশ-শাসিত দেশগুলি স্বাধীন হয়ে কমনওয়েলথভুক্ত শ্বেতকায় জাতির সমপর্যায়ে উঠেছে। এ-সব দেশের মন্ত্রীরা বিলেতে এলে, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীদের মত সাড়ম্বর আপ্যায়ন তাঁদেরও হয়—অন্তত বাইরের দিক থেকে কোন ত্রুটি নেই।

কালো চামড়ার নিগারেরা এসে বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্যা রাণীর সঙ্গে করকম্পন করবে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে

জুল্‌ফিকার

খানা খাবে—এগুলো ইংরেজদের অনেকেরই চোখে অসহ্য ঠেকে। সাধারণ ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের আপত্তিটাই তীব্রতর। কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শ্রমিকদের উপর ইংরেজ প্রতিবেশীদের হামলার কথা কাগজে অনেকেই পড়ে থাকবেন। কালো রঙের আফ্রিকান, এমন কি শ্যামবর্ণের ভারতীয়দের দেখে ইস্ট এণ্ড মহাল্লার রাস্তার ছোকরাদের অভদ্র বিদ্রূপ ও গালিগালাজের মাত্রা আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে। অশ্বেতকায় জাতির ছেলেদের পক্ষে নির্দিষ্ট ছাত্রাবাসের বাইরে কোন ফ্ল্যাট বা হোটেলে স্থান পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

১৩৬৬ সালের মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রখ্যাত সাঁতারু মিহির সেন বৃটেনে ভারতীয়দের লাঞ্ছনার কয়েকটি নৃশংস ও করুণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এক ভারতীয় যুবকের ইংরেজ স্ত্রী প্রতিবেশিনীর উপহাস ও সহিংস বিরোধিতায় উত্ত্যক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে, শেষটায় Underground Railway Platform-এ আপনার শিশু-সন্তানটিকে শুইয়ে রেখে, চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতিনী হন।

বর্ণবিদ্বেষের এই মর্মান্তিক পরিণতির সংবাদ ১৯৫৭ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে বিলাতের NEWS CHRONICLE-এ প্রকাশিত হয়।...KBW আন্দোলনের তোড়জোড় কমে গেলেও গোপনে সেটা চলেছে। ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ্যে কোন পার্ক বা সভাগৃহে বর্ণবৈষম্য বিরোধী কোন সভার আয়োজন করা বা বক্তৃতা দেওয়া আদৌ সহজসাধ্য নয়।

●

মার্কিন মুলুকে লিঞ্চিংয়ের খবর দু'একটা এখনও শোনা যায় না—এমন নয়। কু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের (Ku Klux Klan) নৃশংস কার্যকলাপ বহুপূর্বে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে সত্য, কিছুদিন হয় নিগ্রো ছেলেমেয়েদের জন্যে আমেরিকার স্কুল-কলেজের দ্বারও উন্মুক্ত করা হয়েছে (এই ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের কঠোর ব্যবস্থায় ইয়াঙ্কি জনসাধারণের একাংশ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উপর মর্মান্তিক চটে যায়, ফলে তাঁকেও আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল,—প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁরই পূর্বসূরীমহলে নেতা লিঙ্কনকে যেমন দিতে হয়েছিল) নিগ্রো যুবকদের কারো কারো দু'একটা বড় চাকরীও জুটছে-হয়ত, কিন্তু অতিতুচ্ছ অপরাধে নিগ্রোদের প্রাণদণ্ড এখনও হয়ে থাকে। নিগ্রো জিমি উইলসনের শ্বেতাঙ্গ জুরীর বিচারে সামান্য চৌর্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। সাংবাদিকমহলে ব্যাপারটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত মার্কিন সরকার বাধ্য হয়ে উইলসনের মৃত্যু-আজ্ঞা রহিত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করেন। জিমির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা নিতান্তই তুচ্ছ। সে নাকি কোনও শ্বেতাঙ্গিনী অ্যামেরিকান মহিলার দু'ডলার (আজকালকার বাজারে ভারতীয় দশ-এগার টাকার মত) চুরি করেছিল।

বছর তিনেক আগে ভারতীয় দূত

শ্রীগগনবিহারীলাল মেহতাকে অ্যামেরিকার এই হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, অথচ সাধারণ ভারতবাসীর তুলনায় মেহতার গায়ের রঙ অনেক ফর্সা। তারপর এই সেদিন সোস্যালিস্ট নেতা লোহিয়ার ভাগ্যেও অনুরূপ লাঞ্ছনা জুটেছে। মার্কিনী-কর্তৃপক্ষ লোহিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না সে বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি,—দিতেও হয়ত পারেন না।

অ্যামেরিকান গভর্নমেণ্ট আফ্রিকার বিজার্তা এ্যালজেরিয়া, এ্যাঙ্গোলার মুক্তিকামী নিগ্রোদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য উত্তর আটলান্টিক জোটের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বলে কিছুদিন আগে জাতিসঙ্ঘের কোন কোন নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধিরা অভিযোগ জানালেন, মার্কিনী সরকারপক্ষ তাঁদের কার্যের কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নি।

●

অষ্ট্রেলিয়ায় লোকাভাব। জনবিরল এলাকায় বসতির জন্য ওদেশের গভর্নমেণ্ট ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন,—'এসো আমাদের এখানে, কি আলো-হাওয়ায় উজ্জ্বল দেশ। চাষ করলে এখানকার মাটিতে সোনা ফলান যায়।'

বাড়ি-ঘর-দোর তৈরি করে দেবেন সরকার। বিনা ভাড়ায় আসার ব্যবস্থাও করবেন। প্রয়োজনমত চাকুরীও দেওয়া যাবে।

এই ডাকে অনেক দুঃস্থ ও ভাগ্যবিড়ম্বিত সাড়া দিয়েছে।

বৃটেন থেকে আসছে ইংরেজ, স্কচ, আসছে ফরাসী, ইটালীয়ান, ডাচ, জার্মান, শ্লাভ, বুলগার কিন্তু এশীয় বা আফ্রিক লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। শ্বেতকায় জেলফেরতা ex-convict—এরাও জায়গা পাচ্ছে অথচ উদ্যমী, সৎ ভারতীয়, মালয়ী, চীনা বা নিগ্রোদের কোন স্থান নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যারিস্টার গান্ধীর (মহাত্মাজীর) নির্যাতনের পর অনেক, অনেক বছর গত হয়েছে। এখনও সেখানে জুলু, হোটেণ্টট, বাণ্টু প্রভৃতি স্থানীয় আফ্রিকান ও ভারতীয় বাসিন্দাদের সোয়াস্তি নেই—অহরহ নানাপ্রকার অপমান ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। সংখ্যালঘু উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের চোখে এরা যেন মানুষই নয়।···অল্পদিনের কথা, শুধুমাত্র সাদা দস্তানা পরার অপরাধে (ধৃষ্টতায়) একজন নিগ্রো ব্যারিস্টার শ্বেতকায় যুবকদের হাতে অমানুষিক প্রহারের ফলে প্রাণ হারিয়েছেন, অথচ হত্যাকারীরা সামান্য অর্থদণ্ড দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আজও দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন স্থানে কৃষ্ণকায়দের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সাথে রাস্তার একই দিকে চলবার অধিকার নেই।

উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ন্যায়সাল্যাণ্ড—এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র (CENTRAL AFRICAN FEDERATION) নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার জন্য (এই অঞ্চলে প্রচুর টিন পাওয়া যায়)।···

এখানে বিশাল নির্যাতন শিবির (Concentration Camp) গড়া হয়েছিল। বারো ফুট উঁচু, বিদ্যুৎবাহী তারের বেষ্টনী, সুউচ্চ টাওয়ারে মেসিন গানে সজ্জিত সতর্ক প্রহরীর ব্যবস্থা।···এখানকার খবর দু'একটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝে আমাদের কানে এসে পৌঁছেচে। বছর তিন-চার হল ভারতীয় হাই-কমিশনারের তৃষ্ণার্তা স্ত্রীর জন্য জল চাইতে গিয়ে, গ্রামের হোটেলে একজন শ্বেতকায় পরিচারক কর্তৃক অপমানিত হতে হয়েছিল। হাই-কমিশনারের পরিচয় পাবার পরও, কমনওয়েলথভুক্ত একট দেশের বিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর এই প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবার সাহস সামান্য একটা হোটেল ওয়েটারের কিভাবে হতে পারে সেটাই আশ্চর্যের!

●

১৯৬০ সালের মে মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়, তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য। একদল চাইলেন এর অবসান ঘটাতে, অন্য দলের শ্বেতকায় মন্ত্রীরা এটা দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার বলে মেনে নিলেন, অর্থাৎ এই বৈষম্যকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সমর্থন করলেন। এই শেষোক্ত দলে ছিল গ্রেটবৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা বা নব-গঠিত সেণ্ট্রাল আফ্রিকান

● বিদ্যালয়ে বৈষম্যনীতি বিসর্জন

ফেডারেশনের মন্ত্রীরা ত' এই আলোচনা সম্মেলনের বিষয়ভুক্ত হতে পারে না বলে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মালয় রাজ্যের মন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রহমান এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক এক অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'এরিক্ লো'-এর বক্তৃতা সম্মিলিত জাতিবৃন্দের প্রতিনিধিদের কাছে এতই বিদ্বেষপূর্ণ মনে হয়েছিল যে, ভৎসনা প্রস্তাবের সমর্থনে মোট ৬৭ ভোট ও বিপক্ষে মাত্র একটি ভোট (তাও লো সাহেবের নিজের) রেকর্ড হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ আজও অব্যাহতভাবে চলেছে।···এর উচ্ছেদ করবে কে? বাইরে থেকে অনেক নিন্দা, প্রতিবাদ ও দেশের কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছেচে, কিন্তু তাঁরা এতে আদৌ বিচলিত নন, বিশ্বের জনমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের এক্তিয়ার অনুযায়ী চলেছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রতিবাদে পৃথিবীর নানাস্থানে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

●

ঔপনিবেশিকতার অত্যাসন্ন ধ্বংসের দিনে, পুস্তক ও সিনেমার মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষপ্রচারে একদল লোক তৎপর হয়ে উঠেছে। লেখার চেয়ে ছবির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারটা বেশি জোরালো হয়। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে THE NUN'S STORY বলে একটা ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল—বেলজিয়াম কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে। আফ্রিকার কঙ্গোলীরা এখনও যে কতদূর অনগ্রসর, কুসংস্কারগ্রস্ত সেইটেই প্রকট করে তোলা হয়েছিল এই ছবিটিতে। ইংরেজ আমলে ভারতে নূতন রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তনের প্রাক্কালে মিস মেয়োর (Cath rine Mayo) 'মাদার ইণ্ডিয়া', বেভারলী নিকলসের 'ভারডিক্ট অন ইণ্ডিয়া' এবং আরও অনেক ভাড়াটে লেখকের বইয়ে ভারতকে বিশ্বের চোখে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করবার একটা তোড়জোড় চলেছিল। এমন কি মহাত্মাজীকে নিয়েও আপত্তিকর ফিল্ম তৈরি হয়।···

ছবি হিসাবে THE NUN'S STORY উচ্চ ভাবদ্যোতক। এতে পরার্থে উৎসর্গীকৃত একজন মিশনারীর মহাপ্রাণতা ও নার্সদের সেবাধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অসভ্য অর্ধোলঙ্গ কঙ্গোলীদের ঘৃণ্য বর্বরতার ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। অথচ এই কঙ্গোরাজ্য এককালে বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এর প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন,—

'There are now records hardly known that in the 15th and 16th century, there were kingdoms in what is now the CONGO, which sent their emmissaries to the courts of South Europe, and they were garbed in their own magnificent silk, equal to any of the manufacturer of Europe.'

The Nun's Story ফিল্মটায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং HINDUSTHAN TIMES-এ এ নিয়ে অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয়েছিল।

শুধু যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশ থেকেই এইসব Propaganda film রচিত হচ্ছে তা নয়, যে দেশের নিজের কোন রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, সে দেশেও শুধুমাত্র বর্ণ-বিদ্বেষ জাগাবার জন্যে এই ধরণের ছবি তৈরি করা হচ্ছে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, দিল্লীতে ছোটদের জন্যে পোলাণ্ডে প্রস্তুত একটা কার্টুন পিকচারে দেখানো হচ্ছিল, এতে নরখাদক অসভ্য দ্বীপবাসীরা জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীকে হাঁড়িতে চাপিয়ে সেদ্ধ করছে—এরকম একটা ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। ছবিটা যদিও মুখ্যত হাসির, তবুও এতে কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের উপর দারুণ কটাক্ষ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পোল সরকারের প্রতিনিধির কাছে প্রতিবাদ জানাতে, শেষ পর্যন্ত ওয়ারস থেকে নির্দেশ আসে ছবিটার প্রদর্শনী বন্ধ করে দেবার।

●

শুধু আরব দাসব্যবসায়ী বা পর্তুগীজ হার্মাদেরা নয়, সুসভ্য অ্যামেরিকানেরাও

● বিদ্যালয়ে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন

একশো বছর আগে পশুর মত নিগ্রোদের বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। কি অমানুষিক নির্যাতন, মানবসত্তার কি নিদারুণ অবমাননা করেছে তারা সে কথা পৃথিবীর লোক এখনও ভোলে নি।

UNCLE TOM'S CABIN আজও দেশ-বিদেশের ছেলেরা পড়ে থাকে। অ্যামেরিকাকে ভুললে চলবে না। তার বিপুল সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে নিগ্রো ক্রীতদাসের ঘাম ও রক্ত।

শ্বেতকায় সভ্য জাতিরা যে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতায় অসভ্য জাতিদেরও হার মানিয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

মেক্সিকোর প্রাচীন মায়া ও এ্যাজটেক সভ্যতা ষোড়শ শতাব্দীতে নিষ্ঠুর ও বিবেক-বিহীন স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। অসভ্য কৃষ্ণকায় নিগ্রো ও বিধর্মী মুরদের উপর স্প্যানিশেরা যেমন ঘৃণার ভাব পোষণ করত, সুদূর মধ্য অ্যামেরিকার তাম্রাভ আদিমবাসীদের অমিতবৈভব ও সমৃদ্ধি তাদের হৃদয়ে তেমনি ঈর্ষা ও অদম্য লোভ জাগিয়ে তুলেছিল। ধনলিপ্সু স্প্যানিয়ার্ডেরা মেক্সিকো ও পেরুভিয়ায় লুণ্ঠন ও কালাপাহাড়ী অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। দেবতার মন্দির চূর্ণ করে অজস্র স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করেছে। ইস্কাদের আমলে পেরুর বিপুল ঐশ্বর্য দেখে ওরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রজতমণ্ডিত কুজকোর সূর্যমন্দিরের চূড়ায় প্রতিফলিত সূর্যালোকে হিস্পানীদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল।···আজ ইউকাটানের গহন অরণ্যে প্রাচীন মায়াদের বিস্মৃত পবিত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে—স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, One of the glories of man's imagination and craftsmanship.

অসভ্য কৃষ্ণকায় জাতিদের নৈতিক মান এখনও সভ্য শ্বেতাঙ্গ জাতিদের চেয়ে উর্ধ্বে। শঠতা, তঞ্চকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, যৌন অপরাধ এদের মধ্যে এখনও প্রসারলাভ করে নি, যদিও বর্তমানে শ্বেতাঙ্গ জাতির সংস্পর্শে এসে ওদের অনেকখানি নৈতিক অধোগতি হয়েছে।

পূর্বে আফ্রিকার কোন কোন দুর্গম অঞ্চলে অথবা অষ্ট্রেলেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোথাও কোথাও নরখাদক ছিল, কিন্তু কোন বিশেষ অনুষ্ঠান (ritual) ব্যতীত তারা কখনও নরমাংস ভক্ষণ করত না।

এই সব নরভুক্ অসভ্যদের অন্তরে ভালবাসা ও স্নেহ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। জনৈক ইংরেজ, যিনি আফ্রিকায় বহুদিন কাটিয়ে এসেছেন এবং একবার নরখাদক অসভ্যদের কবল থেকে ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পান, আফ্রিকান এই নর নরভুক্ অধিবাসীদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

'There is no man who has greater respect them I for the deep human feelings of these African s va..es.'

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দাসব্যবসায়ীদের আনাগোনা সুরু হবার কিছু পরে (অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে) একজন ডাচ্ ভ্রমণকারী নাইজেরিয়ার বেনিন শহরে এসেছিলেন। সেখানকার স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দেশে আমস্টার্ডাম শহর বেনিনের তুলনায় অনেক অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়েছিল তাঁর।

ইউরোয়্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনেক শ্বেতকায় ছাত্রের চেয়ে অশ্বেতকায় (কালো, হলদে, বাদামী) ছেলেরা পরীক্ষায় ঢের বেশি যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। একজন শ্বেতাঙ্গিনী লেখিকা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন:

'What many white people do fear is fair and equal competition, for they are not at all sure they can compete, if put to test.'

কৃষ্ণাঙ্গ অনগ্রসর জাতিরা যে একদিন সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করবে এই ভবিষ্যদ্বাণী ইউরোপীয় মনীষীদের কেউ কেউ করে গেছেন।···উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিশেষ রুশ-জাপান যুদ্ধের ঠিক পিঠে-পিঠেই ইউরোপে যেমন মঙ্গোলভীতি বা পীতাঙ্ক (Yellow Peril) দেখা দিয়েছিল, বর্তমান অশ্বেতকায়, বিশেষ কৃষ্ণাঙ্গ জাতির অভ্যুত্থানে ধনতান্ত্রিক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ ভীতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ভয় বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম বিভীষিকার অন্তরালে রয়েছে। নবজাগ্রত এশীয় ও আফ্রিক দেশগুলির অনেকেই কম্যুনিস্ট পন্থী এবং তাদের প্রগতি পক্ষান্তরে কম্যুনিজম প্রসারেরই সহায়ক।

ইংল্যাণ্ডে বছর-চারেক হল ফ্যাসিস্টদের একটা গুপ্ত সংস্থা গঠিত হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে FASCIST INTERNATIONAL. উদ্দেশ্য ভারতীয় ও আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও অপর অপর শ্বেতকায় ইউরোপীয়দের ঘৃণাকে উদ্দীপ্ত করে তোলা।

কিছুদিন আগে কাতাঙ্গায় ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে 'অবর্ণনীয় বর্বরতা'র অভিযোগ BBC মারফত প্রচার করা হচ্ছিল। এই খবর যে ভুয়া সেটা প্রমাণিত হলে এই মিথ্যা খবর প্রচারের জন্য কমনওয়েলথ রিলেশন অফিসারকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় হাই-কমিশনারের নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে। ইউরোপের বাইরেও শ্বেতকায় জাতিরা বর্ণেতর জাতিদের সংস্পর্শ পরিহার করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট সমাজসেবিকা Marie Senton তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যে মন্তব্য করেছেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য:

'While 19th century colonisation

● নিউইয়র্কের হার্লেমে দাঙ্গাকারী নিগ্রোদের উপর বেটন চালাচ্ছে আমেরিকার পুলিশ-বাহিনী

is being eliminated, the colonial mind itself has not neccessarily been eliminated—neither on one side nor the other. Indeed I've actually seen the colonial mind operating in Delhi, behind the express intention of business investment or teaching 'know-how. Quite recently, I was pounced upon a dinner party and pressed to accept the idea of an 'orientation' course being held by a foreign organisation, operating in Delhi. I was astounded that my people could be so over bearing as to corner me and tell me that they would orientate me about a country, not their own and of which I am not a citizen and not of the same nationality as themselves. When I said very politely that I had never worked in India, except at the intention of the Indian Government organisations and I did n't think foreign 'orientation' courses could teach me anything I wanted to learn, the people in question didn't realise their own arrogant presumptuousness —they were too impervious. I said I thought that the only course they needed was how to behave and dress if they an going to be acceptable to Indian society···

It this is not a demonstration of a new colonialism I don't know what it is.'

●

বর্ণবিদ্বেষের মূলে রয়েছে অপরপক্ষের গাত্রবর্ণ, কৃষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্নতা ধর্ম ও আচারগত কুসংস্কার। বর্ণশ্রেষ্ঠের আভিজাত্যবোধ হীনবর্ণ ও হীনাচারী লোকদের প্রতি স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক করে এবং তার ব্যবহারে দর্প, অনুদারতা বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যখন ওদের উন্নতি তার স্বার্থের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই ঘৃণা ও অনুদার মনোভাব অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থকামী শ্বেতাঙ্গজাতির স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। The Right Hon'ble James Bryce (Viscount) তাঁর STUDIES IN HISTORY AND JURISPRUDENCE-এ বলেছেন :

'To the Teutonic people and especially to the English and Anglo-American, the difference of colour means a great deal. It creates a feeling of separation and even of slight (?) repulsion. Such a feeling may be deemed unreasonable or unchristian but it seems too deeply rooted to be effaced in any time we can foresee.'

হিটলারী আমলে ইহুদীর উপর অকথ্য নির্যাতন চলেছে। যদিও এই সব ইহুদীরা সবাই জার্মান। তুর্কীরা নিগ্রো নয় কিন্তু বিধর্মী, ওরা ইউরোপের একপ্রান্তে বাস করে। ধরতে গেলে ওরা এশিয়ারই লোক, কাজেই ইউরোপীয়ানদের কাছে অনেকটা অপাংক্তেয়। তুর্কীদের একবালে ইউরোপের লোকেরা জুজুর মত ভয় করত। সমগ্র বল্কান অঞ্চল ও আইবেরীয় উপদ্বীপে ওদের আধিপত্য ছিল।···অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পর লসেন বৈঠকে তুর্কী প্রতিনিধিদের নিকৃষ্ট আসন দেওয়ার জন্য আতাতুর্ক দৃপ্তভঙ্গীতে দলবলসহ সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে আসেন। পরে লর্ড কার্জনকে বাধ্য হয়ে অন্যান্য সভ্যদের মত ওদেরও গদী-আঁটা চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

●

বংশগৌরব, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে মানুষের মন থেকে উৎখাত করতে হলে চাই নতুন রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অবসান। যুগের পর যুগ যারা পঙ্কিল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাটিয়ে এসেছে, তাদের চারপাশে নূতন, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য চাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদার ও অকুণ্ঠ সহযোগ। একথা অনস্বীকার্য যে, কম্যুনিস্ট অধ্যুষিত দেশগুলিতে জাতি-বর্ণবৈষম্য ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সোভিয়েট দেশ সত্যিই আদর্শস্থানীয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে রুশ, লিথুনিয়ান, লাটভিয়ান, উক্রেনী, আর্মানী, কাজাক, বাশখির, উজবেকী, তাতার, পাহাড়ী তাজিক, মঙ্গোল কিরঘিজ, এস্কিমো, ল্যাপ, ইয়াকুত, সামোয়েদ —এদের মধ্যে আকার ও বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও মর্যাদাগত ভেদ নেই। রাষ্ট্রের কাছে সবাই সমান সুবিধা পাচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এদের কেউ ধলা, কেউ কালো, কেউ পীত, কেউ বা পিঙ্গল। কারো ধর্ম খৃষ্টান, কারো ইসলাম, কেউ বা ইহুদী কেউ বা জড়োপাসক। কিছু-দিন আগেও ওদের কেউ কেউ বাস করত যাযাবরের মত তাঁবুতে, কেউ বা বরফের ইগলুতে। এই পাঁচহাজার মাইল দীর্ঘ বিস্তীর্ণ রাজ্যে কত বিভিন্ন ভাষা, বেশভূষা, আহার-বিহার, সামাজিক আচার-ব্যবহার। কিন্তু আজ তাদের বিবিধের মাঝে মহা-মিলনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নব্য সোভিয়েট সমাজে মানুষের সাথে মানুষের মর্যাদার পার্থক্য দূর হয়েছে।

●

বুড়ো আলি খাঁয়ের মা ও বিবি বোরখার ঘেরটোপে সারা অঙ্গ ঢেকে গাঁয়ের ঝরণা থেকে জল এনেছে, পুরুষের নজর এড়িয়ে। টাকার মালা ঝোলানো লম্বা বেণী দুলিয়ে গম পিষেছে, ঘোড়ার দুধ থেকে পনীর তৈরি করেছে, বানিয়েছে ক্যুমিস (Kumiss), শুকনো তুঁত ফলের (mulberry) মোরব্বা। বার্চ আর আখরোটগাছের নীচে, মাটির দেওয়ালওয়ালা খুপরী ঘরের ভ্যাপসা অন্ধকারে বসে উটের লোমের গালিচা বুনেছে। হয়ত বড়জোর গাঁয়ের মসজিদের আঙিনায় বসে আরবী হরফের সঙ্গে জান-পচান হয়েছে, কোনমতে কুরাণ পড়া চলে যার ফলে। নিজেদের পাহাড়ঘেরা গাঁয়ের বাইরের জগৎ ছিল ওদের সম্পূর্ণ অজানা।···আর, আজ আলির মেয়ে হুস্রকেশী জুলেখা আলিখানোভনা কর্ডের প্যাণ্টালুন আর জার্কিন চাপিয়ে, চোখে গগল্‌স এঁটে, চুয়িংগাম মুখে, স্টেপসের ধারে গড়ে ওঠা নতুন কোলখোজে ট্রাক্টর চালাচ্ছে, না হয় তাসখেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচতলার ঘরে গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণা করছে, রুশ ছেলেদের পাশাপাশি।

●

অহমিকা, লোভ, হিংসা, অবিশ্বাস অহরহ মানুষের মনে বিভেদ ও বৈষম্যের ভাবকে জাগিয়ে তুলছে। শুধুমাত্র কঠোর সমাজ-ব্যবস্থা বা আইন প্রয়োগে একে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য। আবার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে একই ধাঁচের ব্যবস্থা বা আইন চালু করা সম্ভব নয়।···মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের অনুশীলন হতে পারে সহপঠন বা সহকর্মের মাধ্যমে—সকলের মন বুদ্ধি ও শক্তিকে একই দিকে নিয়োজিত করে। ঠিক এই পন্থায় সোভিয়েট রাষ্ট্র বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করেছে। যাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ দেশের আপামর সবাই পেতে পারে—সোভিয়েট সরকারের সে বিষয় সর্বদা সজাগদৃষ্টি এবং তারই ফলে আজ এই বিশাল বহুজাতি অধ্যুষিত দেশ থেকে বর্ণবৈষম্য ও জাত্যাভিমান প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

(সে-লা গিরিবর্ত্ম বিনা লড়াইয়েই বোধ হয় শত্রুর দখলে এসে গেল। চীনেদের যুদ্ধই করতে হল না।

রেডিয়োতে এ খবর যিনি পড়লেন তাঁর গলার স্বরে কোনরকম পরিবর্তন শোনা গেল না। যেন আমাদের দেশে বিদেশী আক্রমণ গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের বৈঠকখানার একেবারে মাঝখানেই চীনে হামলা সুরু হয়ে গেল। যেন ওদের মধ্যে কয়েকজন আগুয়ান সিপাই এরই মধ্যে কলকাতায় এসে পৌছেগে। আর আমাদের বরাতে ঠিক আমাদের বৈঠকখানাতেই হাজির।

অসম্ভব নয়। কারণ কত জোরে দৌড়ে সরে আসতে হয় তার নমুনা ত' আমরাই দেখিয়ে এসেছি।

রেডিয়োর পাট নেই। ঘরে যখন মানুষ মর-মর তখন হয়ত বাইরে থেকে ফিল্‌মি গানা ভেসে আসবে।

ভূধরবাবু যেন এতক্ষণে চৈতন্য ফিরে পেলেন। সে-লার খবর ওঁর বুকে শেলের মত বিঁধেছিল। সেটা এতক্ষণে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে বলে উঠলেন,—দাও না হে কেউ ওটার বোতাম টিপে বন্ধ করে। কান মলে বন্ধ করে দাও।

রমেশবাবু যেন অকূলে কূল পেলেন। ধপ করে নিজের চেয়ারখানা আবার দখল করে ফেললেন। লাঠিটা আগেকার জায়গায় রেখে আসতে গেলে আবার একটু হাঁটতে হয়। অবশ্য সেটুকু মেহনৎ করতে গেলে পথে রেডিয়োটাও বন্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে বসে থাকাই সুবিধাজনক। মিছে মেহনৎ করে মরার কোন মানে হয় না।

যুৎসই করে বসেই তিনি হুকুম ঝাড়লেন,—ঠিক কথা, দাও ওটাকে কান মলে বন্ধ করে।

ক্যাপ্টেন সরকার দূরের একটা কোণা থেকে বলে উঠলেন,—রেডিয়োর কি দোষ হল যে ওটার কান মুলতে চাইছেন আপনারা। যান না, এগিয়ে। সে-লাতে গিয়ে দুষমনের কান মলে দিয়ে আসুন। তখন আমরা ঘরে বসেই নির্ঝঞ্ঝাটে রেডিয়োর খবর বাজ্যি বক্তৃমে সবই শুনতে পারব।

এ-হেন একটা প্রস্তাব শুনবার জন্য ওঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। সবাই হকচকিয়ে গেলেন।

রমেশবাবু অবশ্য হার মানবার পাত্র নন। চেয়ারের হাতল ভাল করে পাকড়িয়ে ধরে ক্যাপ্টেনের পায়ের দিকে একখানা টেরা নজর নিক্ষেপ করলেন। তারপর গলা খ্যাকারী দিয়ে বললেন,—ওসব হচ্ছে সেপাইদের কাজ। আমরা কেন ওর মধ্যে? দিই নে আমরা খাজনা ওদের মাইনে আর রসদ যোগাবার জন্য?

ক্যাপ্টেন হেসে বললেন,—তা হলে ওদের নিজেদের কাজ করতে দিন। দূর থেকে সমালোচনা করে ওদের দুর্বল না করে ওদের লড়তে দিন।

ভূধরবাবু আর চুপ থাকতে পারলেন না,—আলবৎ ওদের দেব। দিয়েই ত' এই

দেবেশ দাশ

অসাড় হয়ে তাই আমরা যে-যার চেয়ারে বসে। কঙ্গোতে কি রঙ্গ হচ্ছে তা শুনবার উৎসাহ নেই কারো। কিন্তু এই খবর বয়ে আনার জন্য রেডিয়োটাকে যে কেউ বন্ধ করে দেবে সেটুকু সাহসও বাকি নেই। যেন রেডিয়োর ভিতরেই কোন শত্রু ওৎ পেতে বসে আছে।

খবর শেষ হয়ে সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে গেল। তখনো কেউ উঠে ওটা বন্ধ করল না। ঘরের ভিতর একটা থমথমে ভাব। সুরের গমগমে প্রভাব তাকে একটুও হাল্কা করে তুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত পাড়ার প্রৌঢ় মাতব্বর রমেশবাবু আর থাকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে উঠে দেওয়ালের কোণায় রাখা লাঠিটা তুলে নিলেন। বললেন,—সেই দুঃখেই ত' বাড়িতে অবস্থ। এখন যে শুধু নিজেদের চরকায় তেল দেব তার উপায়ও নেই। আবার সেই তেতাল্লিশের জাপানী হামলার চোটের মত তল্পিতল্পা না গুটোতে হয়।

ক্যাপ্টেন একটু হৃদয়হীনভাবে বলে উঠলেন,—বেশ ত' দরকার হলে না হয় তল্পি গুটোবেন। কিন্তু জোয়ানদের এখন লড়তে দিন ত' নির্বিবাদে।

ভূধরবাবু তাতে রাজী নন। ভুঁড়ি দুলিয়ে বললেন,—নিজের চরকায় তেল দিতে আমার মন বসে না। ভাগ্যিস অপরের চরকার দিকে নজর দিয়েছি। তা না হলে জোয়ানরা যে শুধু নিজেদের জিইয়ে রাখবার জন্য সটকাচ্ছে তা ত' এই গরীব ছাড়া আর কেউ খেয়াল করে নি।

আশুবাবু গরম আবহাওয়া পছন্দ করেন

না। সবাইকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললেন,—দেখুন এই বিষ্যুৎবারটাই যত গণ্ডগোলের মূলে। বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রেডিয়োটা না খুললেই চীনেরা এগিয়ে এসেছে এ খবরটা শুনতে হত না।

ক্যাপ্টেন এবার নিজের খোঁড়া পা'টা একটু আরাম করে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—ঠিক বলেছেন আশুবাবু। এই বিষ্যুৎবারের বারবেলাতেই আমি এই হাঁটুতে চোট খেয়েছিলাম জাপানীদের গুলীতে। আর আমাদের লড়াইয়ের ব্যাপারটার নামও ছিল অপারেশন থাস-ডে। কিন্তু অমন একটা গৌরব করবার মত কারবার গোটা জাপানী যুদ্ধে হয় নি। বেঁচে থাক আমাদের বিষ্যুৎবারের বারবেলা শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে। বিষ্যুৎবারের পিকাডিলি। আহা!

বলেই ক্যাপ্টেন যেন স্মৃতির সাগরে ডুবে গেলেন। সেখানে আছে শুধু রসের স্রোত, রঙের ফেনা আর সুরভির হিল্লোল। মুখখানা তাঁর প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল। চোখ দু'টি আবেশে আধো-নিমীলিত হয়ে এল। এমন কি খোঁড়া পা-খানাও যেন নৃত্যের তালে তালে স্পন্দিত হয়ে ব্যাকুল হয়ে চঞ্চলতা অনুভব করতে লাগল।

রমেশবাবু লাঠিখানা প্রেমসে বাড়িয়ে ধরে গলায় একটু রহস্যের আভাস এনে ফেললেন,—বলেই ফেলুন না ছাই। বয়েস ত' প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল। এখন আর জঙ্গী বয়সের পিকাডিলির মজার ঘটনা আমাদের এখানে বললে ঘর ভাঙবার ভয় নেই ব্রাদার। অবশ্য মিলিটারী পেন্সন পেয়ে ঘর ত' বাঁধলেনই না আপনি।

আবেশে বিগলিত হয়ে ক্যাপ্টেনের মুখের উজ্জ্বল তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—আহা, বয়েসকালে জঙ্গীদলে নাম না লেখানটা বড় ভুল হয়ে গেছে। চোস্ত ইউনিফর্ম, ঝকমকে তারা আর তরোয়াল যে কোন মেয়ের মন মজাবার পক্ষে যথেষ্ট। তায় ব্রাদার আমার চান্স পেয়েছিল পিকাডিলিতে। আহা কত ক্লারা মেরী জুলিয়া।

চীনে আক্রমণ আর সে-লা পাসের পতন পিছনে—মানে পুবদিকে পড়ে রইল। তাদের সবারই নজর তখন পশ্চিমের দিকে। খাস পিকাডিলিতে।

আশুবাবু বেশ রসিয়ে বললেন,—তা ক্যাপ্টেন, পিকাডিলি যদি হয় ত' বিষ্যুৎবারেও আপত্তি নেই আমার। শনিবারের সন্ধ্যের চেয়ে বিষ্যুৎবারই বরং ভাল। ও সব ব্যাপারে একটু অঘটনের রস না থাকলে জমবে কেন?

সেই অঘটনটার কথাই আজ রেডিয়ো শুনতে শুনতে মনে হল। তবে রসের ঘটনাতেই জঙ্গী-জীবনটা মাৎ হয়েছিল।

—বটে, বটে, ছাড়ুন না, ক্যাপ্টেন, দু'এক-খানা আপনার ঝোলা থেকে।

—হ্যাঁ, আজই তার মোক্ষম সময়। তবে পিকাডিলিতে যাবার ঠিক আগেকার পাওয়া একখানা প্রেমপত্র দিয়ে সুরু করি।

সবাই চেয়ার টেনে কাছাকাছি ঘেঁষে বসল। আহা পিকাডিলি পৌঁছবার আগেই!

প্রেমপত্রখানা পেয়েছিলাম মিলিটারী থেকে ফার্লো নিয়ে তিন দিনের জন্য কলকাতায় যখন ছিলাম তখন। বালিগঞ্জের একটা ফ্যাসান-দুরস্ত আধুনিক পার্টিতে। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে, ইউনিফর্ম আর য়্যাডভেঞ্চারের দৌলতে তরুণীমহল মাৎ করে রেখেছিলাম আমারা মিলিটারী-ছোকরা অফিসাররা। স্বয়ম্বরার বরমাল্য আমাদেরই গলায় গোপনে এমন কি গন্ধর্ব মতেও এসে পড়ত। ছুটি ফুরোবার আগের দিন রাতে এই চিঠিটা গাড়িবারান্দার সামনে ভিড়ের মধ্যে একটি তরুণী হাতে গুঁজে দিয়ে সরে গেল। ঠিক যে কোন্‌টি তা ঠাহর করতে পারলাম না। প্রেমপত্রটি এই:

প্রিয়,

তোমায় ঠিক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মত অবশ্য দেখায় না, কিন্তু তুমি আমার স্বপ্নলোকের সেনাপতি পুত্র। তোমার রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া মুখখানা যেন আগুনে গলা নিখাদ সোনা। যুদ্ধক্ষেত্রের কাদা আর বারুদে ঢাকা আসল সোনা।

ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মুখখানা আমার দু'হাতে তুলে ধরে ধুয়ে মুছে দিই। স্নেহস্পর্শে সবক'টি রেখা বিলীন করে মসৃণ করে দিই। তোমার মুখের ক্লান্ত হাসিকে অধরোষ্ঠের মধু দিয়ে অরুণবর্ণ করে তুলি।

তোমায় যে ভালবাসি তা খুলে বলবার জন্য আমার পক্ষে পুরীর সমুদ্রতীর বা দার্জিলিং-এর কুয়াসায় ঢাকা আকাশ বা গঙ্গায় মেঘেমাখা সূর্যাস্তের প্রয়োজন হবে না। শুধু তুমি ফিরে এসো। ইতি—

॥ ২ ॥

আমাদের লীলা সুরু হল লালাঘাট থেকে। লুসাই পাহাড়ের কোলে লুকানো, আঁকাবাঁকা স্রোতের বুকে বসানো লালাঘাট। সেখানে নতুন তৈরি একটা বিমানঘাঁটি। তাকে ফুটবলের মাঠও বলা চলে। শুধু তফাৎ এই যে মাটিটা বাঁঝরা করা লোহার পাতে মোড়া। বর্ষার কাদাতে যাতে প্লেন ওঠা-নামা করতে পারে।

একজন পাইলট একটু আগেই জাপানীদের দখলী বর্মা দেশের প্রায় দু'শো মাইল ভিতর পর্যন্ত দেখে ছবি আর খবর নিয়ে এসেছে। এয়ার ষ্ট্রিপের ফালিটুকুতে আমরা সবুজ রঙের যুদ্ধের পোষাক পরে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সারি সারি। গ্লাইডার টেনে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবার গ্লাইডার ক্যারিয়ার তৈরী রয়েছে একগাদা।

আমরা ছিলাম বাছাই করা লোক। বেশিরভাগ ইংরেজ, কিছু গুর্খা আর সামান্য কিছু নিগ্রো। আমি ছিলাম আমার আগামী মণিপুরী আর বর্মী ভাষার সঙ্গে মামুলী পরিচয় আর খোদ বিধাতার কারিকুরি করা এই লেপচা-মার্কা মুখের কল্যাণে। আমাদের নাম ছিল খুব ভারী—থার্ড ইণ্ডিয়ান ডিভিসন। কিন্তু পাইলটদের নাম ছিল খুব হাল্কা—ককরাণের সার্কাস। চিনডিট বলে যাদের নাম আপনারা কাগজে দেখেছেন, আমরা ছিলাম তাই। জেনারেল উইনগেটের নিজের বাছাই করা লোক, মায় হাতিয়ার আর জানোয়ার পর্যন্ত।

বিষ্যুৎবারের কারবার—অপারেশন থাস-ডে—এই ছিল আমাদের কাজের গোপন সাংকেতিক নাম। দশ হাজার সৈন্য আর একহাজার মালবাহী জন্তু রাতের অন্ধকারে উঁচু পাহাড়গুলি সব টপকিয়ে শত্রু-সৈন্যদের অনেক অনেক পিছনে বর্মার জঙ্গলে কোন ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এর আগের বছর কিছু কিছু এরকম হামলা আমরা করে এসেছিলাম। কিন্তু তখন গিয়েছিলাম হেঁটে আর হাওয়াই জাহাজ থেকে আমাদের কাছে মাল, খাবার আর হাতিয়ার ফেলে দেওয়া হ'ত। আমাদের তখন ছিল হাল্কা হাতিয়ার। জঙ্গল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে হামলা করে জাপানীদের মারতাম। বুবিট্র্যাপ পেতে বারুদের আর বোমার ফাঁদে ওদের নিকেশ করতাম। আবার জঙ্গলের গভীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতাম।

তখন অবশ্য মাথায় বা ছাতিতে গুলী খেয়ে পটল তোলা গুলীর ঘায়ে চরণ মাঝির নৌকো জখম হওয়ার চেয়ে ভাল ছিল।

কারণ জানখানা দাসখত লিখে দিয়েছিল শুধু শ্রীচরণে। চরণ গেলেই মরণ।

এবারের ব্যাপারই অবশ্য আলাদা। গ্লাইডারে করে শুধু গ্যারিসনের পর গ্যারিসন সৈন্যদল নয়, সিগন্যাল যন্ত্রপাতি, য়্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট, পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের ব্যাটারি কামান এমন কি বুলডোজার পর্যন্ত দুষমনের পিছনের এলাকায় আমরা হাজির করলাম। চার-চারটে ডিভিসন জাপানী সৈন্য আর তাদের হাওয়াই জাহাজের ছাতার আশ্রয়কে ঘায়েল করতে হবে। ওরা যেখানে আছে সেখানে লড়াই দিয়ে নয়। ওরা যেখানে নেই, সেখানে কাজ গুছিয়ে নিয়ে।

বর্মায় ভামো শহরের কাছাকাছি এলাকার জঙ্গলে তিনটে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড অর্থাৎ গ্লাইডার নামাবার মত স্বাভাবিক সমতল খোলা জায়গা আগে থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। কক্‌রানের সার্কাস দলের পাইলটরা তাদের টানা প্লেনের সঙ্গে বাঁধা সৈন্য বোঝাই গ্লাইডার-গুলিকে মাটি থেকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আকাশে ভেসে আসবে গ্লাইডারগুলি। নীচে অবতারণিকার কাছে ওদের শেকল খুলে দিলেই ওদের পাইলটরা গ্লাইডারগুলি নীচের খোলা মাঠে নামিয়ে আনবে। শেকলের বাঁধন খুলে দেওয়ার পর আর পিছু ফেরা নেই। প্রথম ঢেউয়ের সৈন্যরা খোলা জমিটুকু দখল করে পাখার মত চারধারে ছড়িয়ে পড়বে আর জমি পাহারা দেবে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভেসে আসবে আরো সৈন্য, বুলডোজার আর স্যাপার আর মাইনার। শেষের দল সারাদিনের মধ্যে মোটামুটি একটা বিমানঘাঁটি গড়ে তুলবে। পরের দিন রাতে ডাকোটা বিমানে করে নামবে ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, জীপ, ওয়াগন আর জানোয়ার।

এমনিধারা তিনটে খোলা মাঠ, প্রকৃতির নিজের হাতে তৈরি খোলা মাঠ আমাদের লক্ষ্য ছিল। তাদেরই নাম ছিল পিকাডিলি, ব্রডওয়ে আর চৌরঙ্গী। আমার অভিসারের কথা পিকাডিলিতে।

কিন্তু হায়। পিকাডিলির প্রেয়সীদের সেখানে দেখা মিলল না। পথেতে চোরকাঁটা। পিকাডিলির উপর এসে দেখি যে, মাঠের উপর বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে পেতে বসান হয়েছে। বিষ্যুৎবারের অভিসারের কথা কি তা'হলে ফাঁস হয়ে গিয়েছে? কোন মাতাহারি কি আয়ান ঘোষকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল বেতার মারফৎ?

এত দূর থেকে এত উঁচু চিনহিল গিরি-শৃঙ্গ টপকিয়ে আসা কি বিফলে যাবে? আট হাজার ফুট পাহাড় পার হয়ে নেমে এসে আবার অত উঁচুতে গ্লাইডার টেনে উঠিয়ে ফিরে যাবার মত বাড়তি পেট্রল টাগ এরোপ্লেনে নেই। অতএব পিকাডিলিতে যদি না নামা যায়, তা'হলে চল ব্রডওয়েতে। লণ্ডনে অভিসার হল না তাতে কি। নিউইয়র্কেই না হয় বাসর জাগা যাবে।

লালাঘাট থেকে প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে একটা করে টাগ এরোপ্লেন দুটো করে গ্লাইডার টেনে উড়ে আসছে। ফাঁকা জমির কাছে এসে ক্ষীণ টানা রশি খুলে গ্লাইডারকে মুক্তি দিতে হবে। গ্লাইডার হয়ত তখন আছড়িয়ে মাটিতে পড়বে; পেটের উপর ধাক্কা সামলাতে সামলাতে, দু'পাশের ডানা ছিঁড়ে উল্টিয়ে যাবে। এতটা আকাশপথ অন্ধকারে বিনা আলোতে আসাই পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তায় অজানা অকুস্থলে শত্রুর পিছনে এসে নামা। শুধু চাঁদের আলোতে। আপনারা ত' আবেগভরে গেয়ে থাকেন—

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সে-ও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

সেই মরণই আমাদের হল সে রাতে। সত্তরটা গ্লাইডারের মধ্যে বত্রিশটা ব্রডওয়েতে নামল। কিছু অন্য অন্য নিরাপদ জায়গায়, জঙ্গলে বা ধানজমিতে নেমে আটকিয়ে গেল। গোটা-দশেক শত্রুর ছাউনীর মাঝখানে গিয়ে পড়ল। আর একটা ত' একেবারে জাপানী ডিভিসনের হেড-কোয়ার্টারের ঠিক মাথায়।

আর আমি?

সঙ্গে ছিল একটা বুলডোজার আর ভারী যন্ত্রপাতি। নীচে একটা ভেঙেপড়া গ্লাইডারকে কোনমতে এড়াতে গিয়ে চোখা-ভাবে কোণা কাটলাম আমরা। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে জঙ্গলের দেওয়ালের মত সারি সারি শালগাছে খেলাম ধাক্কা। দু'পাশের গাছ গ্লাইডারের ডানা দু'টো ছিঁড়ে নিল আর মধ্যখানের ফিউসিলাজ অর্থাৎ আসল কামরাটুকু তার মাল মায় মানুষসহ তেড়ে ছুটে চলল। ফিউসিলাজ যদি বা কোনমতে আটকিয়ে থেমে গেল বুলডোজার নাহি ছোড়তা। সেটা সব কিছু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেলাম আমরা।

তারপর কি ভয়ানক সব দৃশ্য শুরু হল। শুধু চাঁদের আলোতে সার্জনরা ভাঙা হাত-পা কেটে য়্যামপুটেট করছে। ভোঁস করে কোন গ্লাইডার জমি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে ক্র্যাশ করে মরছে। গাছের ডালের মড় মড় আওয়াজ আর মানুষের আর্তনাদ মিলে সে কি ভীষণ পরিবেশ। আর আমরা—যারা মানুষ মারার ব্যবসা করি, আমরা আধমরা মানুষদের মরিয়া হয়ে জঙ্গলের কোণায় কোণায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর?

তারপরের ইতিহাসের বাইরের পাতা-গুলো আপনারা খবরের কাগজের মারফৎ পেয়েছেন। শুধু খবর পান নি যে, জাপানীরা যখন খবর পেল, তখন রাগে অন্ধ হয়ে ওরা মাঠে-জঙ্গলে পড়ে-থাকা ভাঙা গ্লাইডারগুলির উপরই এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে লাগল। কিন্তু এদিকে আমরা আলাদা আলাদা দলে জাপানী যোগাযোগ লাইনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছি।

বিপদ হল পিকাডিলিকে নিয়ে। সেখানে কিছু সৈন্যদল গ্লাইডারে করে নেমে পড়েছিল। আর জাপানীরা ত' তৈরি হয়েই ছিল। ওরা আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে পেরে উঠছিল না; কিন্তু জঙ্গলের চারপাশ ঘেরাও করে রেখেছিল। আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে পাঠান বেতার বিকল হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত নামবার সময়ের রাম ঝাঁকুনিতে। অথচ ওদের একটা গোপন পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসার খবর পৌঁছে দিতে হবে না হলে ওরা ইঁদুরকলে ধরা পড়ে ইঁদুরের মত মরবে।

একটা ফিরতি মুখের এরোপ্লেনে সাংকেতিক কোড দিয়ে পথের সন্ধানটা বাক্সে ভরে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে সৈন্যদল একটু জায়গা বদল করেছে, আর কোডের খবরটা পড়বি ত' পড় জাপানী লাইনের মাঝখানে। ওরা কোড ভেঙে তার মানে বের করতে পারবার আগেই খবরটা আবার পৌঁছান দরকার। তার জন্য ভলান্টিয়ার চাই। কারণ প্লেন থেকে প্যারাসুট দিয়ে যাকেই নামান হবে, তাকেই জাপানীরা চাঁদমারি করে ছাড়বে।

'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে'

গাইতে গাইতেই ওরা রাইফেল চালাতে পারবে অব্যর্থ টিপ নিয়ে। তা ছাড়া জঙ্গলের মাথার উপর প্যারাসুট ধরে নামতে গেলে দেহের পৈত্রিক হাড়-গোড় মায় মাথার খুলিখানাও খুলে যেতে পারে। এ দিকে আমাদের আর জাপানীদের দু'পক্ষেরই

শ্রী

দেবী,
তোমার মধুর হাসে,
তুচ্ছ ম্লান ছিন্নবাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অমরী !
আলু-থালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি'।
সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি !

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে—
সহস্র নয়ন 'পরে দাঁড়ায় উর্বশী !
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম !
মূরছিয়া পড়ে কাম উরস পরশি' ।
কোথা উষা অচঞ্চল,
নির্জন মন্দার-তল,
কোথা মন্দাকিনী-জল—তরল আরসী !

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে !
জগৎ মুদিয়া আসে শুনে' সে বাঁশরী !
সুর পায় কিবা সুর—
আশা-ভাষা শত-চুর !
মুগ্ধ-প্রাণ দেবাসুর সুধা পান করি' !
ধরা ফুলে ফুলময়,
যমুনা উজানে বয়,
রমণী ত্বরিতে ধায় ভরিতে গাগরী ।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব-বসন্ত জাগে !
মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ, গুঞ্জরিয়া মন !
ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ মতি
লভে কি তাড়িৎ-গতি—
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন !
আপনে আপনি লিখে'
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন !

—অক্ষয়কুমার বড়াল

রাইফেল শত্রু ভেবে গুলী করবে। আমার নাক, মুখ আর ভাষার কল্যাণে আমিই নির্বাচিত হলাম।

সত্যি সত্যিই আলো-আঁধারের মধ্যে দু'পক্ষই আমায় তাক করে গুলী ছুড়তে লাগল। এঁকে-বেঁকে প্যারাসুটের ছাতিতে ঝুলে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। ডান হাঁটুটা জন্মের মত জখম হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের দলের হাতেই পড়েছিলাম। এই আমার বিষ্যুৎবারের অভিসার পিকাডিলিতে।

কাহিনী শেষ হল। কিন্তু কথা ফুরালো না। প্রেমপত্রটির কথা কেউ ভোলেন নি। প্রশ্ন হল—ইউনিফর্মের উপর মেডেল আর রিবন ঝুলিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে আবার গিয়েছিলেন? বরমাল্য হাতে স্বয়ংবরা কি এবার দিলেন ধরা?

গভীর স্বরে উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন,—না। সেই সেনাপতি-পুত্র পিকাডিলির অভিসারে রূপকথার রাজ্য থেকে এক আঘাতে পা ভেঙে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছিল। তার পর তার ত' পদক আর পেন্সন নিয়ে সে রাজকন্যার সামনে হাজির হতে চায় নি। বীরের মূর্তি নিয়ে এক সন্ধ্যায় স্বপ্ন রচনা করা যায়। কিন্তু সে স্বপ্নকে সারাজীবন ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে দিই কি করে?

—আচ্ছা, আপনি কি একবারও সেই তরুণীদের সামনে উপস্থিত হন নি?

—হয়ত হয়েছিলাম; কিন্তু চোখ খোলা রাখি নি এদিকে।

—রাখলে হয়ত চিনতে পারতেন সেই অচেনাকে। তার চোখে থাকত জল।

—না, না। চোখের জল হচ্ছে সাদা-মাঠা মেয়েদের সম্বল, কিন্তু সুন্দরীদের সর্বনাশ। আমি তা সইতে পারি না।

—আপনি, ক্যাপ্টেন সরকার, শুধু রসকষহীন যুদ্ধটাকেই চিনলেন। জাপানীদের জয় করলেন। কিন্তু জীবনকে নয়।

ম্লান হেসে ক্যাপ্টেন সরকার বললেন,—কি কই বলুন। যুদ্ধ করা সহজ। শত্রুকে জয় করা সহজ। কিন্তু জীবন বড় শক্ত ব্যাপার। আমরা জীবনকে চালাই না। জীবনই আমাদের চালায়।

এই বলে উনি উঠে পড়লেন। আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোলেন। একটু থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন,—হ্যাঁ, তবে দরকার হলে জীবনের মুখোমুখি হতে ডরাই না। আজ রেডিয়োর খবর শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল,—খুব ইচ্ছা হচ্ছিল —আবার সেই মেয়েটিকে খুঁজে তার সামনে দাঁড়াই। বলি,—আবার যেতে চাই বিষ্যুৎবারের অভিসারে। নতুন পিকাডিলিতে। কই, দাও তোমার অলক্ষ্য প্রেমপত্র।

মুস্কিল আসান

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন আমি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ম্যাঙ্গানিজ খনি নিয়ে কাজ করছি। কর্মস্থলের মধ্যে ছিল রামটেক পাহাড়ের পিছনে ঘন জঙ্গল এলাকায় ঘোটি নামে এক ছোট গ্রাম। ঐ গ্রামেই আমাদের দু'জন কর্মচারী ও তাদের লোকজন থাকত এবং খনিও ছিল গ্রামের পাশের জঙ্গলে। গ্রামের বাসিন্দা প্রায় সবই গোণ্ড জাতীয় আদিবাসী, তবে দু'চার ঘর মহারাষ্ট্রীয় চাষীগৃহস্থই ছিল তাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন এবং তাদের জমিজমা ও অন্য অধিকারও ছিল গোণ্ডদের চাইতে অনেক বেশি। আমায় সেখানে তখন প্রায়ই যাতায়াত করতে হোতো।

এ কথা বোধ হয় বলা প্রয়োজন নেই যে, রামটেক পাহাড়ই 'মেঘদূতে'র রামগিরি। রামটেক পাহাড় ও তার পাশের 'জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদক'-যুক্ত বিল অতি সুদৃশ্য এবং সেখানে 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু' অজস্র ছিল, যখন আমি সেখানে যাওয়া-আসা করতাম।

যাওয়া-আসার পথ, অর্থাৎ রামটেক স্টেশন থেকে ঘোটি গ্রাম পর্যন্ত তেরো মাইল ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা এবং সেই জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, হায়না ও কখনো-কখনো 'শোনকুত্তা' নামের জঙ্গলী কুকুরের দল, স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতো। গ্রামের লোকের গরু, ভেড়া, ছাগলও ক্বচিৎ-কদাচিৎ মহিষের বাচ্চা প্রায়ই এই সকল শ্বাপদের কবলে পড়তো। আবার মাঝে মাঝে মানুষ-খেকো বাঘ বা চিতার উৎপাতে জঙ্গলের কাঠুরে বা কাঠকুড়ুনি স্ত্রীলোক কিম্বা রাখাল বালকেরও প্রাণ যেতো। জঙ্গলী গোণ্ডেরা দল ছাড়া হয়ে জঙ্গলে একলা যেতে ইতস্তত করতো, কেন না সদাশয় বৃটিশ সরকার এবং ততোধিক সদাশয় সরকারি পুলিশ এদের হাতে লাঠি বা ছোট টাঙ্গী—অর্থাৎ দু'হাত লম্বা বাঁটের উপর অতি হাল্কা ও ছোট কুড়াল ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র রাখেন নি। তবে কোনও ইংরাজ শিকারী বা বড় অফিসারের অনুগ্রহ হ'লে এদের কোনও কোন সর্দারের একটা পুরাণো গাদাবন্দুকের লাইসেন্স জুটে যেতো। তাও সর্ত ছিল যে, লাইসেন্স দু'জনের নামে হবে এবং তার একজন হবে সরকারি জঙ্গলের পেয়াদা বা অন্য কোনও সরকারি বা আধা-সরকারি লোক। বলা বাহুল্য, এইসব কারণে দলবেঁধে ঐ লাঠি ও টাঙ্গীর উপর নির্ভর করে এদের জঙ্গলে চলাফেরা বা কাজ করতে হোত।

আমাদের প্রায় রোজই রামটেক শহরে লোক পাঠাতে হোত ডাক আনবার জন্য ও সেখানের মুদীর দোকান ইত্যাদিতে এটা-ওটা কিনতে। এই কাজে প্রত্যহ পাঁচ-ছয়জন লোক বা দু-তিনটে গরুরগাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা প্রচুর খরচের ব্যাপার। গোণ্ডেরা অতি দরিদ্র কাজেই একাজে দু'জন খুব সাহসী জোয়ান রাজী হয়। এরা একদিন অন্তর একজন করে ঐ তেরো দু'গুণে ছাব্বিশ মাইল পথ যাতায়াত করতো। আমি সে গ্রামে গেলেই এরা দরখাস্ত করতো একটা ইস্পাতের ফলা-দেওয়া বর্শা যদি এদের যোগাড় করে দেওয়া হয়। কেন না একলা ঐ ঘন জঙ্গলের পথে দিনের পর দিন প্রাণ হাতে করে যাওয়ার অর্থ একদিন বাঘের সঙ্গে প্রায় খালি হাতে মোকাবিলা করা।

জঙ্গলের মধ্যে ঐ অবস্থায় একাকী বাঘের সামনে পড়া যে কি ব্যাপার তা আমাদের বিলক্ষণ জানা ছিল। সুতরাং এদের আবেদন যে কতটা সঙ্গত তা বুঝতে আমার দেরি হয় নি। কিন্তু স্থানীয় ফরেস্ট অফিসার ও পুলিশ দারোগা বিরূপ হওয়ায় আমি নাগপুর পর্যন্ত গিয়ে এদের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি নি। শেষে কলিকাতার এক বড় কোম্পানীর কাছে একডজন আমেরিকান গাছ কাটা কুঠার (Logging Axe) কিনেছিলাম। এগুলির প্রায় তিনহাত লম্বা হাতল ছিল অত্যন্ত মজবুত ও ফলা ছিল ইস্পাতের তৈরি, চওড়া ও বেশ ভারী—পরশুরামের কুঠারের মত। এই জিনিস হাতে পাওয়ায় আমাদের লোকেরা নির্ভয়ে জঙ্গলে চলাফেরা করতো। পুলিশ জিজ্ঞাসা করায় তারা 'কোম্পানী'র সম্পত্তি বলায় আর কোনও উৎপাত হয় নি, কেন না খনির এলাকায় জঙ্গল সাফ করার জন্য গাছ-কাটার লাইসেন্স আমাদের ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং (Rudyard Kipling) তাঁর 'জঙ্গল বুক' পুস্তকে যে গহনবনের নানা গল্প লিখেছেন, সে এই জঙ্গল এবং আমি যখন সেখানে ঘুরেছি তখনও সেখানে বাঘ, বাঘেরা (বড় চিতাবাঘ), ভল্লুক, নেকড়ে ইত্যাদির ছিল রাজত্ব এবং জঙ্গলের মধ্যের এলাকায় মানুষ বাস করতো বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে ঘর করে।

একবার সেখানে থাকার সময় হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন হলো নাগপুর যাওয়ার। রেলপথে নাগপুর যাওয়ার ঝঞ্ঝাট ছিল অনেক—এক তো তেরো মাইল জঙ্গলের পথ, দ্বিতীয়ত ট্রেনের সময়ের ঠিক নেই এবং সে চলেও অতি মন্থর-গতিতে। কাজেই খনির কর্মচারীরা পরামর্শ দিলেন 'পাওনি' নামের গ্রামে গিয়ে 'সিওনি' থেকে নাগপুর যে বাস চলে তাই ধরতে। প্রতি ঘণ্টায় নাকি বাস আসে এবং সেই সার্ভিসও দ্রুত ও সস্তা। সুতরাং সে-পথে নাগপুর যাওয়াই স্থির করা হোলো।

যেতে হবে ছয় মাইল জঙ্গলের পথে এবং ঐ অঞ্চলের 'খাচর' গাড়ির বলদ টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে চলে, সুতরাং কাঁচা 'মেঠো' রাস্তা হলেও ঐ পথটুকু সওয়া ঘণ্টায় অনায়াসে যাওয়া যাবে। কিন্তু শীতের দিনে সূর্যের আলো ঐরকম ঘন জঙ্গলের ভেতরে বেলা আটটা-সাড়ে আটটার আগে বিশেষ পৌঁছায় না এবং ঐ পথ যে ধরণের দারুণ জঙ্গলে ছাওয়া, তাতে রোদ ভাল করে ওঠার আগে সে-পথে গাড়ি হাঁকালে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে। আচার্য মশায়ের নৈশভ্রমণকালে যদি শিকার না জুটে থাকে তবে তাঁর ঘরে ফেরার পথে একটি হৃষ্টপুষ্ট বলদ ধরে 'প্রাতরাশ' করাও কিছু আশ্চর্য নয়। শিকার জুটে থাকলেও পরিহাসচ্ছলে গাড়ির বলদ বা গাড়োয়ানকে একটা কামড় বা দু'টো থাপ্পড় দিয়ে বিষম ঘায়েল করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সুতরাং যাত্রার দিন সকালে তিনটি গাড়ি ঠিক করে রাখা হোলো। একটিতে যাব আমি, সুটকেশ হোল্ডঅল নিয়ে, অন্য দু'টিতে যাবে খনির কর্মচারী অন্য লোকজন নিয়ে, পথের সাথী হয়ে বিপদ-আপদ ঠেকতে।

আটটার কিছু পরে রওনা হয়ে দশটা নাগাদ সেই পাওনি গ্রামে পৌঁছান গেল।

গ্রাম বলতে কয়ঘর গোণ্ড এবং একটি পশ্চিমা ব্রাহ্মণের পরিবার-পরিজন। এখানের জমিজমা, ক্ষেত-খামার প্রায় সবই ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং তাদের বাড়িও পাকা ও বড়। গোণ্ডরা প্রায় সবাই তাদেরই প্রজা। গ্রামের কাছে-কাছেই বড় বড় ম্যাঙ্গানিজের খনি-খাদান থাকায় এখানে খুব বড় হাট বসে শুনলাম। তা ছাড়া সিওনি থেকে নাগপুর বাস চলার ১২০ মাইল রাজপথের এটা ঠিক মাঝখানে। সে কারণে এখানে সব বাস থামে, রেডিয়েটারে জল ভরে বাসের লোকজন ও যাত্রীরাও জল খেয়ে নেয় এবং হাট-বাজারের দিনে সওদা কেনা-বেচা করে। এইসব কারণে জায়গাটার গুরুত্ব বেড়েছে, নইলে গ্রাম হিসাবে এটা বিশেষ কিছু নয়।

জমিদারের বাড়ির পাশেই রাজপথের উপর একটা লম্বা খাপরার ছাওয়া চালাঘর আছে; তার তিনদিক খোলা, শুধু বড় বড় কাঠের খুঁটি চালার ঠেকো হয়ে আছে। এটা লম্বায় ৪০-৪৫ হাত, চওড়ায় ১০-১২ হাত এবং বাইরের জমি থেকে প্রায় দেড়হাত উঁচু করে গাঁথা পাকা ইট-পাথরের মেজে দেওয়া এবং পিছনের দেওয়াল পাকা মোটা ও মজবুত।

হাটে-বাজারের দিনে এটিই কেন্দ্রস্থল হয় বুঝলাম। এখানেই আমাদের গাড়ি থামলো এবং আমার জিনিসপত্র ঐ পাকা দাওয়ায় নামিয়ে সঙ্গের লোকজন বলদের জোত খুলে 'চারা' দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, আমায় বাসে তুলে দেওয়ার জন্য। চালাঘরের ওপাশে কয়েকটি অত্যন্ত নীচু চাল দেওয়া কুঁড়েঘর ছিল। সেগুলির দেওয়াল পাথর বসানো, চাল মোটা কাঠের রলা ও বাঁশ দিয়ে তৈরি ও মজবুত করে বাঁধা এবং দুয়ার বলতে অত্যন্ত ছোট ও মোটা কাঠের তৈরি কপাট দেওয়া, দেড় হাত চওড়া, আড়াই হাত উঁচু ফোকর। যার ভিতরে যেতে হলে প্রায় হামা দিতে হয়। দেখেই বুঝলাম এখানে বাঘ ভাল্লুকের উৎপাত বেশ আছে এবং তাদের আটকাবার জন্যই কুটিরগুলি ঐভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঐগুলিতে থাকে সব গোণ্ড-পরিবার।

রাস্তার ওপারে জমিদারবাড়ির প্রশস্ত গোয়ালঘরের বেড়াও মোটা ও ঘনভাবে বসান মজবুত কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি এবং সেগুলি প্রায় ১২-১৪ হাত করে উঁচু। বাঘের দেশেই রয়েছি—এটা ভাল করেই বুঝা গেলো। গ্রামের পাশেই ক্ষেত, তারপরেই ঘন জঙ্গল।

রাস্তায় লোক চলাচল কম, দু'চার জন গোণ্ড মেয়ে বা পুরুষ মাঝে মাঝে মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে। জমিদারবাড়ির লোকজনও দুই-একবার এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। গোণ্ডদের কুটিরগুলিও প্রায় সবই নিস্তব্ধ। মেয়ে-পুরুষ সকলকেই সারাদিন খেটে খেতে হয়, সুতরাং সবাই কাজে গিয়েছে ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েই। শুধু আমার দলের আট-দশজন বসে কথা বলছে নইলে চতুর্দিক নির্জন।

এদিকে বাসের দেখা নেই। একঘণ্টা গেল, দু'ঘণ্টা গেল, ক্রমে দুপুর পার হয়, যখন প্রায় দেড়টা, তখন আমার লোকজন চঞ্চল হয় উঠলো। শীতের দিনে জঙ্গলে ঢোকার নিয়ম যেমন আটটার পরে, বেরিয়ে যাবার নিয়মও চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে—অর্থাৎ রোদের আলোর তেজ থাকতে থাকতে। কাজেই তাদের ফিরতিপথে রওনা হ'বার সময় এগিয়ে এসেছে। আমিও তাদের সঙ্গে ফিরে যাব কি না জিজ্ঞাসা করায় একটু ভেবে আমি তাদের বিদায় দিলাম, কেন না আমার সেদিন নাগপুর যাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। তারাও একটু ইতস্তত করে ভাবিত অবস্থায় রওনা হোলো, দ্রুতগতিতে বলদ ছুটিয়ে। তারপর চতুর্দিক আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

তিনটের পর, রোদ যখন পাতলা হয়ে এসেছে, একপাল গরু-মহিষ নিয়ে দু'তিনজন রাখাল ও একজন মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতা-পরা লোক জমিদারবাড়ির পিছনের পথে গেলো। তারপর গোণ্ড পল্লীতে লোকজন চলতে লাগলো। আরো কিছু পরে একটি মারাঠী ধরণের শাড়িপরা বয়স্কা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক এসে দাওয়ায় উঠলো। দাওয়ার এককোণে কি সব জিনিস-পত্র ছিল, তার পাশে নিজের পিঠের ঝোলা নামিয়ে সে বেশ একনজর আমায় তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে দাওয়ার কোণ থেকে একটা বড় মাটির হাঁড়ি, একটা বড় পিতলের পরাত ও লোটা বার করে, ঝোলা থেকে একরাশ চাল, ডাল, ফলমূল পরাতে ঢেলে নিয়ে, দাওয়া থেকে নেমে গেলো। তার বয়স পঞ্চাশের উপর, রোগা, কালো, লম্বা, ছিপ্‌ছিপে গঠন, চোখের চাহনি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও বিক্ষিপ্ত, মুখ-নাক-চোখের গড়ন ভাল এবং রুক্ষ ও কর্কশ ভাব থাকা সত্ত্বেও যেন তাতে অতীত আভিজাত্যের ছাপ ছিলো। আমার সুটপরা চেহারার দিকে যে দৃষ্টি সে দিয়েছিল তাও যেন সমানে-সমানে, তার মধ্যে হীনভাবের বা ভিক্ষাবৃত্তির লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। তার মুখ-নাক-চোখের চৌখা গঠন আর কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নভাব যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, সে পাগল হলেও ভিখারী নয়। আমার দিকে সেই একবার তাকিয়ে সে আর দৃকপাতও করে নি—ভিক্ষা চাওয়া তো দূরের কথা!

দৃষ্টিপাত আরও অনেকে করেছিল, বিশেষ জমিদারবাড়ির লোকে। কিন্তু একটা লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে, তাকে একটু জল খেতে দেওয়া বা দু'টো কথা বলা কেউ প্রয়োজন বা উচিত মনে করে নি। জমিদার-পরিবারের দু একজন বরঞ্চ নিজেদের মধ্যে আমার উদ্দেশ্যে দু'চার কথা গ্রাম্য হিন্দীতে বলছিলো, তা আমার কানে আসায় আমি বুঝলাম যে, তারা জাতে উঁচু, কিন্তু স্বভাবে অত্যন্ত নীচ। সুতরাং তাদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

আরও কিছু পরে একজন কাবুলি 'আগা' পরিপাটি বাঁধা পাটকরা কাপড়ের বস্তা নিয়ে দাওয়ায় উঠলো এবং আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে স্মিতমুখে 'সালাম' বলে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেখলাম খাঁ সাহেব বয়স্ক কিন্তু তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরে বার্ধক্যের বিশেষ ছাপ পড়ে নি। প্রশ্ন করায় বললাম—বসে আছি বাসের প্রতীক্ষায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময়। শুনে মাথা নেড়ে সে দাওয়ার অন্য কোণে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তখন আমার নজরে পড়লো যে সেখানে একটা তালাবন্ধ দরজা রয়েছে। খাঁ সাহেব দরজা খুলে ভিতরে গেল এবং তার অল্প পরেই আর একজন আগা এসে উপস্থিত হ'ল সেখানে। এর বয়স আঠারো-কুড়ি ও জোয়ান শরীর। এ-ও হাসিমুখে 'সালাম' বলে সেই দরজায় ঢুকলো। আর অল্প পরে দূরে বাসের হর্ন শোনা গেল এবং আমিও তটস্থ হয়ে জিনিস-পত্র ঠিক করলাম—যাতে চট্ করে উঠে পড়তে পারি। জমিদারবাড়িতেও একটা হট্টগোল শোনা গেল সেই সঙ্গে।

বাস এসে দাঁড়ালো কিন্তু জমিদারবাড়ির সদর দরজায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ জন ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, ঝি-চাকর, একরাশ হাঁড়ি-কলসী-বাসন ও বিরাট বড় বড় মোট নিয়ে হুড়-মুড় করে বাসের ভিতর-বার ও ছাদ মালপত্রে ভরিয়ে নিজেরা চেপে বসলো। তাদের পালের গোদা, অর্থাৎ খোদ জমিদার এক ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মোটা লোক। সে এদিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, 'মামা হো, যাইবা তো চলা।'

তাকিয়ে দেখলাম মামা আর কেউ নয়,

গরু-মহিষের পাল হাঁকিয়ে যে জামা-জুতা পাগড়ি পরা লোকটি—সেই। সে যাবে না বলার সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিলো। আমায় কথা বলারও অবকাশ দিল না। বাসের আওয়াজ পেয়ে কাবুলিদের বড়জন বেরিয়ে এসে সব দেখলো। তারপর সেই 'মামা'কে দু'চারটা প্রশ্ন করে ভিতরে চলে গেলো।

সেই পাগলিনী এরই মধ্যে দাওয়ার নীচে উনুন ধরিয়ে তাতে সেই প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে পাশের কুটীরের গোণ্ড স্ত্রীলোকের সঙ্গে বচসাও চালিয়ে যাচ্ছে। এর ভাষা পরিষ্কার উত্তর প্রদেশের 'হিন্দুস্থানী' হিন্দী এবং উচ্চারণও অবস্থাপন্ন ঘরের স্ত্রীলোকের। গোণ্ডনীর বাচ্চা-কাচ্চারা এর উনানে কি সব ফেলেছে এবং সেই জন্যে সে শাসাচ্ছে যে, তাদের 'চমকা দুঙ্গী' এবং তাতেও শায়েস্তা না হলে 'হলাল কর ডালুঙ্গী'!

মামা মহাশয় পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অচ্ছাহ্!' তাতে পাগলী তার কাছেও নালিশ জানাতে তিনি মন্তব্য করলেন, 'হাঃ।' পিলে চমকিয়ে দাও কিন্তু একেবারে 'হলাল' কোরো না।

ওদিকে গোণ্ডনীও দমবার পাত্রী নয়; সে হেঁকে বললো, 'দেখি তুই কি করতে পারিস। তুই কোথাকার কে যে ভয় দেখাচ্ছিস?

উত্তর হোলো, 'তুই-ই বা কোন 'অংরেজন' (ইংরাজ স্ত্রীলোক)?

আগা সাহেব এরি মধ্যে বেরিয়ে এসে কি খোঁজ করছিল। খাঁটি উর্দু শব্দ শুনে সে ফিরে বললো, 'হুঁ।' অং-রে-জন!

পাগলী হেসে বললে, 'দেখ না বাবা, বলে কি না আমি কোথাকার কে!'

খাঁ সাহেব গম্ভীরভাবে বললে, 'আ রে ও গেঁয়ো গোণ্ডনী ও তোমায় কি করে চিনবে বুঢ়ী? তুমি আজ মন্তর লাগিয়ে এ পথে বাস চলা বন্ধ করে দিয়েছো!'

এই মন্তব্যের উত্তরে, একগাল হেসে সেই পাগলী যা বললো তা শুনে আমার তো চক্ষুস্থির! শুনলাম সেদিন শেষরাতে চন্দ্রগ্রহণ লাগবে ও ভোরের দিকে শেষ হবে। সেজন্য এ অঞ্চলের যত 'রইস' জমিদার, সব কোম্পানীর বাস ভাড়া করে রিজার্ভ করেছে। সবাই যাবে সেই 'মেঘদূত' প্রথিত জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু নদীতে মুক্তিস্নান করতে, সারারাত মন্দিরে ও ধর্মশালায় কাটিয়ে। সারারাত জাগতে হবে বলে বাসওয়ালারাও দিনে আরাম করে, বাস ধুয়ে-মুছে, বিকালের দিকে যাবে, যার যাকে নিয়ে যাবার কথা, সে তার কাছে—যেমন এসেছিল এখানে।

সে কথা শুনে আগা গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন 'বুঢ়ী' হেঁকে বললে, 'বাবা! কফি কেনার পয়সা নেই।'

আগা পিরানের পকেট থেকে বটুয়া বার করে কিছু খুচরা পয়সা তার হাতে দিয়ে ঘরে গেল। আমি বসে রইলাম দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে।

বেলা পড়ে এলো। পাগলীর হাঁড়ি নামলো। তার রান্নার জায়গার পাশে দশ-বারোটা বড় বড় কুকুর এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। হাঁড়ি নামিয়ে যখন একরাশ খিচুড়ি ও সিদ্ধ তরকারি পরাতে ঢালা হোলো তখন তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তারপর বাকি খিচুড়ির স্তূপ তাদের সামনে ঢেলে দেওয়া হোলো যখন, তখন তাদের যেন আর তর সয় না—খিচুড়ি ঠাণ্ডা হ'তে দিতে। পাগলী হাত-মুখ লোটার জলে ধুয়ে, খানিক অপেক্ষা করে খেতে বসলো, কুকুরের পালও সন্তর্পণে খাওয়া আরম্ভ করলো। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সব সাফ—মায় হাঁড়ি শুদ্ধ। কেন না সবার বড় কুকুরটা হাঁড়ির চওড়া মুখের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে সব চেটে সাফ করলো।

সন্ধ্যা নামলো; সেই সঙ্গে বনস্থলী জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো। পাগলী তার হাঁড়ি-বাসন ধুয়ে-মুছে যথাস্থলে রেখে দাওয়ার এক কিনারে বসে খানিক চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নীচে নেমে, গলা ছেড়ে তুলসীকৃত রামায়ণের গান গাইতে লাগলো। গলা জোর, সুর-তান-লয়ও ঠিক, সুতরাং মনে দুশ্চিন্তা না থাকলে ঐ পরিবেশে গান হয়তো ভালই লাগতো। পাগলীর মনে ভাবনা নেই, সে গেয়েই চলেছে এবং মাঝে মাঝে হাতে তালি দিয়ে নৃত্যও করছে। আমি তখন স্থির করছি আশ্রয় না জুটলে কোথায়ও বসে থাকলে কিছুটা নিরাপদে রাত কাটাতে পারি।

এরই মধ্যে কাবুলিদের ছোটজন আমার সামনে দিয়ে দ্রুত হেঁটে দাওয়া থেকে নেমে গ্রামের ভিতরে গেল। তার অল্প পরেই বড় খাঁ সাহেবের গম্ভীর গলায় শুনলাম: 'ভাই সাহাব! এই জায়গা বড় খারাপ। রাত্রে 'কাফি সে জ্যাদা সর্দি' (অর্থাৎ প্রচুর হইতে অধিক শীত পড়বে) জঙ্গলী জানোয়ারও এই অঞ্চলে 'খতরনাক' (বিপজ্জনক)। সুতরাং তুমি আমার ঘরে এসো। সেখানে গরীবের ঘর হলেও নিশ্চিন্তমনে শুয়ে রাত কাটাতে পারবে।'

এ-ই বলে সে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আমার সুটকেস ও হোল্ডঅল দু'হাতে তুলে নিজের ঘরের দিকে চললো এবং আমাকেও স্মিতমুখে আসতে ডাকলো। এই অপ্রত্যাশিত সৌজন্যে অবাক হয়ে আমি দু'কথায় ধন্যবাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম।

ঘরটি খুব বড় না হলেও ছোটও নয়। দরজার দিকে খানিকটা জায়গা মাটি দিয়ে লেপা। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা, বাসন-পত্র জলের কলস ও খাদ্যবস্তু রাখা আছে। তার এদিকে একটি চেয়ার ও একটি উঁচু চৌকি, তার সামনে খানিকটা জায়গায় শতরঞ্চি পাতা এবং তারপরে একটি নেওয়ার ছাওয়া খাটে বিছানার জিনিস গুটানো আছে। ঘরের পিছন দিকে প্রায় ছয় হাত লম্বা চার হাত চওড়া তিরপলের উপর গরম কাপড়, আলোয়ান, কম্বল ইত্যাদি পাট করে সারি সারি সাজানো রয়েছে। বুঝলাম এরা গরম কাপড়ের ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা নেহাৎ কম কিছু নয়, কেন না গরম কাপড়ের থাক প্রায় তিনফুট উঁচু হয়ে সমস্ত তিরপল ছেয়ে রয়েছে। একটা বড় হ্যারিকেন লণ্ঠনে সারা ঘরে আলো দিচ্ছে। এই ঘরেই পিতপুত্রের গেরস্থালি সাজানো রয়েছে।

ছোট আগা ফিরে এসে বাপের সঙ্গে কথা বলার পর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাপ তখন ধীরে ধীরে বলতে লাগলো: 'ভাই সাহাব, এ তো এক মুস্কিল ব্যাপার। আমাদের খানদানের নিয়ম ঘরে মেহমান (অতিথি) অভুক্ত থাকলে আমরা খেতে পারি না। তোমার কথায় বুঝেছি তুমি হিন্দু তাই ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম দুধের সন্ধানে। দুধ পাওয়া গেল না, কেন না সব দুধ পূজা দিতে নিয়ে গেছে জমিদার। তারপর সে গেল পান সুপারিও যদি পাওয়া যায় সেই খোঁজে তাও তো পেল না। আমাদের চায়ের জন্য অল্প দুধ রাখা আছে আমাদের বাসনে। সেটা গরম করে দিলে কি তুমি খাবে? পান পেলে তোমায় চা ও পান দিতাম, যদি অবশ্য আমাদের তৈরি চা আমাদের বাসনে খেতে তোমার আপত্তি না থাকে।'

আমি বললাম: 'আমি কলকাতার লোক। হোটেলে যখন খাই তখন সেখানের বাবুর্চি খানসামা তো সবই মুসলমান। সুতরাং অত ছুঁৎছাঁত আমাদের নাই। অবশ্য কোন জিনিস আমাদের খাওয়া নিষিদ্ধ তা

হোটেলের লোকে জানে এবং তোমরাও জানো।'

বড় আগা হেসে বললে, 'সে সব জিনিস খানদানি মুসলমানেরা বড় একটা খায় না। আর আমি তো এই ঘর জমিদারের কাছে ভাড়া পেয়েছি এই সর্তে যে এখানে মাংস ডিম এসব আসবে না, কারণ ওরা ওসব ছোঁয় না। কাজেই আমরা এখানে 'ভগৎ' (পরম বৈষ্ণব) হয়ে রয়েছি।'

ওদিকে আমার ওদের হাতে খেতে আপত্তি নেই জেনে ছেলে মহা খুশি হয়ে বললে, 'আমি এখনি উমদা (উৎকৃষ্ট) চা ও ভাল রুটি বানাচ্ছি।'

সে বসলো খাদ্য-সরঞ্জাম নিয়ে। আমি সিগারেট ধরাচ্ছি দেখে খাঁ সাহেবও গড়গড়ায় টান দিচ্ছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। দুয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'মামা' এসে ঘরে ঢুকলেন। আমায় দেখে তিনি বড় আগাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুতে যাবার সময় হঠাৎ মনে এলো এই বাবুসাহেবের কি ব্যবস্থা করা যায়? খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম যে বাবুসাহেব তো ছাপর দালানে নেই। তাই ছুটে এলাম খবর নিতে যে কি হোলো।'

উত্তর হোলো, 'বাবুসাহেবকে যে এরকম ভাবে রাত্রে বাইরে বিপদ-আপদের মুখে রেখে দেওয়া যেতে পারে না, সে কথা অনেক আগেই আমাদের সমঝমে আগয়া (বুদ্ধিতে এসেছে)।'

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। খাওয়ার কি হবে? সারাদিন তো জলও মুখে পড়ে নি।'

এবার ছেলে হেসে বললে, 'বাবুসাহেব আমাদের মেহমান। ওসব বিষয়ে তাঁর আর আমাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।'

'আচ্ছা? তবে তো সব ঠিকই হয়েছে।' এই বলে তিনি প্রসন্নমুখে, ঝঞ্ঝাটের শান্তি হয়েছে জেনে বিদায় নিলেন।

আমি ভাবলাম তবু ভাল। মনুষ্যত্বের অল্প কিছুটা এদের মধ্যে রয়ে গেছে।

'তারপর মনে এলো ঐ পাগল স্ত্রীলোকটির কথা। জিজ্ঞেস করলাম, ঐ পাগলীর আশ্রয় কোথায়? ও তো একলাই দাওয়ার এককোণে পড়ে থাকবে?'

'ওর কুকুরগুলো দেখেছো? কি রকম মোটা তাজা ও বড় তা লক্ষ্য করেছ কি? ওই দল দিনভোর আশে-পাশের ক্ষেতে ও জঙ্গলে বড় বড় ইঁদুর, খরগোস এমন কি কখন-কখনও হরিণছানা এইসব ধরে শিকার করে খায়, বিকালে গাঁয়ের মধ্যে ঘুরে সন্ধ্যায় আসে পাগলীর 'পরসাদ' খাবার জন্য। রাত্রে ঐ দশ-এগারটা ওর কাছে ঘেঁষে, ওকে ঘিরে শুয়ে থাকে। কোনো অচেনা লোক বা জঙ্গলী জানোয়ার ওর কাছেও পৌঁছাতে সাহস পায় না।'

খাঁ সাহেবের কাছে আরও শুনলাম যে জমিদারি, বাড়ি, ক্ষেত-খামার সব ওরই ছিল। ও বাপের বুড়ো বয়সের একমাত্র সন্তান তাই ওকে যত্নে মানুষ করেছিল এবং লেখাপড়া শিখিয়েছিল। বর্তমান জমিদারের বাপ ছিলো সেই বুড়ো জমিদারের মুনশী ও খাজাঞ্চী এবং সেই তার শালাকে—অর্থাৎ এই 'মামা' মহাশয়কে—আনে খাতাপত্র লিখতে ও দেখাশুনা করতে। বুড়ো জমিদার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল এক অপদার্থ লম্পটের সঙ্গে। সে বুড়া শ্বশুর বেঁচে থাকতেই টাকা পয়সা সরিয়ে নিজের বদখেয়ালের খোরাক যোগাতো এবং সেই সুযোগে ঐ মুনশী-খাজাঞ্চীও বিলক্ষণ বেইমানীর ফাঁক পায়।

বুড়ো মারা যাবার পর এই অসহায় স্ত্রীলোককে ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করতে সেই গুণধর জামাই ও বেইমান মুনশী উঠে-পড়ে লাগে। তারপর খাজনার দায়ে জমি বেচা-কেনা ও স্বামীর ঋণের দায়ে স্ত্রীর সর্বস্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন স্বামী পালায়। স্ত্রীলোকটার সর্বস্ব বিক্রি করিয়ে একরকম ওরই টাকায় সে সব কেনে ঐ মুনশী, যার ছেলে এমন জমিদার। স্ত্রীলোকটি দুঃখে-কষ্টে পাগল হয়েও পৈতৃক ভিটামাটির টান এড়িয়ে যেতে পারে নি, তাই এখানেই আছে। এ অঞ্চলের সবাই জানে ওকে তাই ভিক্ষা না চাইলেও ও গান গেয়ে ফিরলে নানা গাঁয়ের ও খনি-খাদানের লোক তাকে চাল, ডাল, পয়সা ইত্যাদি দেয়। জাতে ও জমিদার চেয়ে ছোট, কিন্তু অন্যদিকে এদের চাইতে ভাল। সেজন্য ও এখানে থাকে তাতে কেউ বাধা দেয় না এবং জমিদারও তাড়িয়ে দিতে সাহস পায় না।

কাহিনী শুনিয়ে খাঁ সাহেব বললে, 'বাবুসাহাব, খোদা জানে কেন, কিন্তু সারা দুনিয়ায় এই তো চলেছে!'

আমি ভাবলাম সে কথা খুবই সত্য।

রাত্রে নৈশভোজন হোলো গরম রুটি, গরম চা—এবং করেলা ও পেঁয়াজের 'ভাজি' দিয়ে। চা ছিল ব্রুক বণ্ডের অরেঞ্জ পিকো এবং রুটি, সত্য সত্যই 'উমদা,' কিন্তু জঙ্গলী করেলার বিকট তেতো প্রচুর 'খাটাই' (আমচুর) দেওয়া সত্ত্বেও শায়েস্তা হয় নি। এদিকে আমার হোল্ড-অল খুলে বিছানা পাতা হোলো, ঐ গরম কাপড়ের পাটকরা থাকের উপর। আমি বললাম, 'ওসব তো বিক্রির জিনিস আমি ওর উপর শোব কি করে?'

উত্তর হোলো, 'মেহমান শুলে ওসব এক হপ্তার ভিতরে ভাল দামে বিক্রি হয়ে যাবে, কোনও ভাবনা নেই!'

খাওয়া শেষ করে মুখ-হাত ধুতে বাইরে গিয়ে দেখলাম, পাগলী শোবার আয়োজন করছে এবং কুকুরের দল সেখানে বসে আছে।

ভোরে উঠে সকালের সব কাজ শেষ করে চা-রুটি খেয়ে, আবার বসলাম বাসের প্রতীক্ষায়। বাস এলো দেরিতে, প্রায় এগারোটায়। খাঁ সাহেব আমার সহযাত্রী, শুক্রবারের নমাজ পড়বেন নাগপুরের 'এতোয়ারী' বাজারের বড় মসজিদে এবং হাট-বাজার সওদা এ সবও করবেন। আমরা নাগপুর পৌঁছলাম বেলা দু'টোর পর।

নাগপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে সেদিনকার বাস সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চীফ সেক্রেটারীকে সে কথা জানান। ফলে বাসওয়ালাদের বেশ কিছু আক্কেলসেলামী দিতে হয়।

পরেও ঐ পথে যাতায়াত করেছিলাম, এবং প্রতিবারেই কড়া চুরুট ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। কিন্তু সেদিনের ঋণ শোধ তাতে কিছুমাত্র হয় নি।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। —বঙ্কিমচন্দ্র

গড়াইকে ঠেলে ফেলে দেবো

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(শান্তিনিকেতন)

ঘরে বসে আত্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি যত অকাজের কাজ আছে, তা নিয়ে মত্ত থাকি। বেকার লোকের দিনাতিপাতের প্রধান সহায় যে মূক জড় পদার্থ, সাতচড় খেলেও যে কথাটা বলে না—অথচ তার অশব্দিত বাণী চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেলেই মনের মধ্যে নবরসের তরঙ্গ তুলে ধরে—সেই জড়ের উপর মুখ থুবড়ে কি যেন পড়ছি—

হঠাৎ পিছন থেকে শব্দ 'দাদু'—আন্দাজে বুঝলাম পাড়ার একদল ছেলে কি যেন বলতে এসেছে। সাধারণত, সকালে তাদের আসা বারণ—বিকালে তাদের অবাধ গতি, সেজন্য শুনতে হয়—আমি নাকি তাদের বড় বেশি প্রশ্রয় দিই। পিছনে তাকাতেই প্রায় সমস্বরে তারা বলে উঠলো, 'দাদু' স্কুলবাড়ির বারান্দায় একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তাদের শুধোই কি রকম লোক? তারা বলে, 'ভিখিরী—এখানে ঘুরতো।'

বলু যাচ্ছিল বাজারে সাইকেলে,—তাকে বললাম, 'ব্যাপারটা কি দেখে এস এখুনি।'

কয়েক মিনিট পরে সে এসে বললে, 'সত্যিই একটা লোক মরে পড়ে আছে স্কুলবাড়িতে, দক্ষিণের বারান্দায়। লোকটাকে দেখেছিলাম পাছা ঘসে-ঘসে চলতো। সেদিন ভোলার মা বলছিল ঐ লোকটাই পথের ধারে গর্তে পড়ে যায়—ছেলেরা উঠিয়ে আনে।'

আমারও মনে পড়লো—হ্যাঁ একটা লোককে তো এইভাবে চলতে দেখেছিলাম। বিরাট দেহ—দেখলে মনে হয় এককালে বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল। তারপরে কি করে এ-দশা হলো—তার ইতিহাস তো খোঁজ করি নি।

হয় তো গাছ থেকে পড়ে গিয়ে দেহটা থেঁতলে যায়—চিকিৎসা বিনা নিম্নাঙ্গ অচল হয়ে গিয়েছে। অথবা কোন ব্যাধিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, হয় তো তার ছেলেমেয়েও আছে—কিন্তু তারা একটা অকর্মণ্য মানুষকে পুষতে না পেরে বিদায় করে দিয়েছে—কে জানে? কেউ তো খোঁজ নেয় নি। খোঁজ নিলেই তো বলতো, 'রাতে দাওয়ায় পড়ে থাকবো বাপু', সর্বনাশ! আশ্রয় তো দিলাম—তার হেপা সামলাবে কে? ময়লা করে রাখবে শেষকালে— ও যে অপটু ভিখারী। ঘরে পোষা কুকুর ময়লা করে রাখে—অম্লানবদনে সাফ করে—তা নিয়ে গল্পও করে বন্ধুমহলে, 'সকালে মেথরটা আসে নি আজ, কি করি। কিন্তু এ যে ভিখারী—কি জাত কে জানে? আমার কুকুরটা খাঁটি ড্যালমেশিয়ান, আপনারটা তো অ্যালসেশিয়ান্ আপনাকেও নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে নোংরাঘর সাফ করতে হয়।'

নিশ্চয়ই।

ফোনে থানায় খবরটা দিলাম—তাঁরা বললেন, 'ওটা তো মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপার—তাদের বলুন।'

তখন বলতে হলো, 'আমার কাজ আমি করলাম, এখন আপনাদের যা করবার করবেন। একটা কনেস্টবল পাঠাবেন—তা না হলে কুকুরে টানাটানি করবে।'

তাঁরা কনেস্টবল পাঠিয়ে দিলেন—একটু পরে মুর্দাফরাসও এলো।

আমি ভাবছি—লোকটা মরার সময়ে জলও বোধ হয় পায় নি। ইঁদারা তো কাছেই ছিল—কেউ কি তার টিনের পাত্রে জল ঢেলে দিয়েছিল? কে জানে? কেউ জানে না। আর জানবার দরকার কি মশায়? ঠিক কথা ও তো ভিখারী! সত্যই তো, আমি কি ওর দারিদ্র্যের জন্য দায়ী? ওর কর্মফল। এ-জীবনের কর্মফলের যুক্তিতে না কুলোলে, বলবো পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করছে। কথাটা খুব সত্য—ভাগ্যে বিধাতা, পূর্বজন্ম প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের scapegoat সৃষ্টি করেছি তাই তো শান্ত মনে সংসারে চলাফেরা করতে পারি। আমি কি বিশ্ব-সংসারের যত ভিখারী, গরীব, রুগ্ন, কুঠে, পাগল আছে—তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী। তাদের উদ্ধার করতে পারি সে সাধ্য আছে কার? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

একবার কলকাতার কাছে এক ধর্মের আখড়ার আধুনিক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—তাঁদের শুধোই, 'আপনারা কি কোন জনকল্যাণ কর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন।'

তাঁরা বললেন, 'কর্মফলে মানুষ সুখ-দুঃখ পায়, কতটুকু দুঃখ মানুষ নিবারণ করতে পারে। না হয়, তার ভাত-কাপড়ের অভাব দূর হলো—কিন্তু তার মনের মধ্যে নিরবধি কত রকমের চুল্লীতে আগুন জ্বলছে—সে আগুন নেভাবার ক্ষমতা কার আছে। অতএব কর্ম নিরর্থক—।'

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

মনে পড়লো ফাদার ড্যামিয়ানের কথা। ক্যাথলিক মিশনারী, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কুষ্ঠরোগের মধ্যে সেবা-কাজের জন্য প্রেরিত হলেন। সেখানে ঐ মারাত্মক ব্যাধি-আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন। আজ সে দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধি অজ্ঞাত।

সামনে দেখছি মাদার থেরেসার আর্তসেবার আয়োজন। নিশ্চিত মৃত্যু-পথযাত্রীর শেষ সেবাটুকু দেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে কালীঘাটের কাছে তাঁর সেবাসদন স্থাপন করাতে স্থানীয় লোকের কি আপত্তি!

কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরের পাশে যে সব ভিখারীরা বসে, তারা সবাই হিন্দু ও মন্দিরের আশে পাশের বাসিন্দা—তারাও হিন্দু। কিন্তু যিনি আর্তসেবার জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন। তিনি খৃষ্টান ও বিদেশিনী!

'তাই বলে হিন্দু-ভিখারীকে খৃষ্টান পাদরীর সেবা নিয়ে, তাদের হাতের জল খেয়ে মরতে হবে! মরতে হয় হিন্দু থেকে রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাক—মুর্দাফরাস আছে! কিন্তু তা না হয়ে খৃষ্টানের কবরখানায় নিয়ে যাবে! অসম্ভব! মরতে হয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পোড়োবাড়িতে মরে পড়ে থাক্! মিউনিসিপ্যালিটি তো লোক পাঠিয়েছে।

CALCUTTA CENTRAL

মনে পড়ছে কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। তখন আমি নিকটস্থ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। একটা গ্রামে গিয়েছি সফরে—কথা বলছি পথে দাঁড়িয়ে গ্রাম-মুখ্যদের সঙ্গে—অর্থাৎ যাঁদের বলে গাঁয়ের মোড়ল। দুইজনই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ মুনির সগোত্রীয়। পেষা চাষ-বাস, ব্রহ্মত্র ভোগ ও গ্রাম্য দলাদলির মধ্যমণিরূপে শোভমান। কয়েক বৎসর পূর্বে এঁদের একজনের ঘরের মাটকোঠা থেকে চোলাই সোমরস আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অপরজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ; সর্বদা জবাফুল শিখায় বাঁধা, রক্ত-চন্দন-তিলক ফোঁটা কপালে, লাল গামছা কাঁধে ফেলা; পেষা দোকান পরিচালন ও কারণে-অকারণে কারণরস পান। তবুও গ্রামের শূদ্র-সমাজের প্রণম্য! এঁদের সঙ্গে কথা বলছি গ্রামের উন্নতি কি করে করা যেতে পারে তাই নিয়ে। আদর্শবাদ নিয়ে এই কাজে নেমেছিলাম, তখন কি জানতাম আদর্শবাদের অর্থ হচ্ছে, আদর্শকে বাদ দিয়ে চলা।

কথা বলছি এই গ্রাম-মুখ্য, বর্ণশ্রেষ্ঠ মাতব্বরদের সঙ্গে; এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন অবগুণ্ঠনবতী একবস্ত্রা অর্ধবয়সী বিধবা। বর্ণশ্রেষ্ঠদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মুখুজ্জেমশায় শুনেছেন? এখনই নদী ঘাট থেকে আসছি। দেখি—গড়াইকে টেনে তুলেছে।'

'গড়াইকে টেনে তুলেছে'—বাক্যের কোন অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কি।'

মুখুজ্জেমশায় আমার অজ্ঞতায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ওঃ আপনি জানেন না বোধ হয়ঃ আমাদের গাঁয়ে বিষ্ণু গড়াই ও তার মামা সাধুচরণ বাস করতো—ঐ যে মনসাতলার ঘর—তার পাশেই তাদের বাড়ি। সাধুচরণ ডবল নিমোনিয়ায় মারা গেছিল।'

তারপর যা বললেন, তার নির্গলিত অর্থ হচ্ছে এইঃ গড়াইরা কলু—এককালে অবস্থা খুব ভাল ছিল; দু'খানা ঘানি চলতো; তেল যেতো অনেক দূরে। তারপর কলের তেল এলো বাজারে—সস্তা তেল ফেলে ঘানির তেল কে কিনবে। এ গাঁয়ে মুখুজ্জেমশায় তাঁর দোকানে সস্তা কলের তেল শহর থেকে এনে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন। দেখতে দেখতে গড়াইদের ব্যবসা গেল প্রায় উঠে। এমন অবস্থা হয় যে, বিধু বিয়ে করতেই পারলে না, টাকার জোগাড় হলো না; টাকা দিয়ে এদের মেয়ে কিনতে হয়। দু'টো বিধবা বোন আছে ঘাড়ের উপর—ধান ভেনে খায় কিন্তু তা-ও জুটছে না; লোকে কলে ধান বিক্রি করে আসছে, চাল করে বিক্রি করে না, ঘরে খাওয়ার মত করিয়ে নেয়। এই অবস্থায় গড়াই-এর হলো নিমোনিয়া—একেবারে ডবল নিমোনিয়া—।

'বলুন, ডবল নিমোনিয়ার রোগী গাঁয়ে রাখতে পারা যায়। বিধু বলেছিল পাশের গাঁয়ে কুটুম্বদের খবর পাঠানো হয়েছে, এলেই সৎকারের ব্যবস্থা করবে। তা কি সম্ভব মশায়—গাঁয়ের মধ্যে ডবল নিমোনিয়ার রোগী পড়ে থাকবে—গ্রামটা মড়ক লেগে উচ্ছন্ন যাবে না! আমরা জোর করলাম বলেই তো বিধু ও তার দুই বোন লাসটা একটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে টানতে টানতে নদী পর্যন্ত নিয়ে যায়। গাঁয়ের ক'টা ছোঁড়া গাড়ি টানতে চেয়েছিল। এসব, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের শিক্ষার ফল। আমি পরিষ্কার তাদের বলে দিলাম একে তো কলুর মড়া তার উপর ডবল নিমোনিয়ার রোগী—তোমরা যদি গাড়ি ছোঁও—সব ক'টাকে একঘরে করবো। আমি যদি হুঙ্কার না ছাড়তাম, কি বলো বাঁড়ুজ্জে, তবে কি কাণ্ডটা করতো ছোঁড়াগুলো। বেজার বারা কান ধরে বেজাকে টেনে বলে দিলঃ বেটা বজ্জাত কোথায় যাওয়া হচ্ছিল—বলে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিল। তবেই না সব ঠাণ্ডা হয়।'

আমি বললাম, 'সব তো বুঝলাম, কিন্তু গড়াইকে টেনে তুলেছে তার মানে বুঝলাম না ঠিক।'

'ও বুঝলেন না? বিধু ও তার দুই বোন মামার মুখাগ্নি ক'রে, কোনরকমে ছ্যাঁকা-পোড়া করে বালির মধ্যে গেঁদে রেখে এসেছিল। তিনদিন পরে সেই আধপোড়া মড়া শেয়ালে টেনে তুলে খাচ্ছিল—আচার্যি-গিন্নী সেই কথাই বলছিলেন। আমি বিধুকে শুধিয়েছিলাম, হাঁ বিধু, অন্ত্য-প্রায়শ্চিত্তর করালি না, কতকাল ভুগে মামাটা মরলো? বেটা কি বললে জানেন—ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়; দু'টো রাঁড়ি বোন, আমি বিয়ে করি নি—আমার কি করবেন? আর আপনারা আমার কোন্ উপকারটা করেছেন? আমি শহরে চলে যাবো। এই বলে সেই যে বেটা গাঁ ত্যাগ করেছে আর এমুখো হয় নি। ভাবছি শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়নগুলো কোথায় করলো।'

বাঁড়ুজ্জে বললেন, 'বিধুর অমন দশা হতো না, তুমি যদি দোকানে কলের তেল এনে ওর ঘানির সর্বনাশ না করতে।'

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, 'মুখুজ্জে মশায়, সাধুচরণ হিন্দু ছিল, তার সৎকার গাঁয়ের সবাই মিলে করতে পারতেন। মাত্র তো একঘর গড়াই ছিল।'

মুখুজ্জে জবাকুসুম আঁটা শিখাটা শুদ্ধ মুখটা ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, 'বলেন কি, প্রেসিডেণ্টবাবু, আমরা ছত্রিশ জাতের মড়া ছুঁয়ে বেড়াবো—তাহলে জাত-ধর্ম থাকবে? শুনেছি মোছলমানের মড়া সকলে কাঁধ দেয়—তারা তো বইবেই—তাদের তো জাত নেই, ম্লেচ্ছ যবনদের পক্ষে সব সম্ভব।'

বুঝলাম হিন্দুধর্ম এঁদের দৌলতে এখনো টিকে আছে।

বহু বৎসর পরে ১৯৬৪ সালের জুন মাসের শেষভাগে হিন্দুর মড়া ডোমের কাঁধে মরা গরুর মতো চারহাত পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে স্বর্গযাত্রা করতো না আর গড়াইকেও টেনে তুলতো না, নদীর ধারে বালি চাপা থেকে।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন বৃটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু নারীদের শিক্ষাকল্পে কুমারী কুককে [পরে বিবি উইলসন] এদেশে পাঠান, তখনও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ আপত্তি হয়। আমি উক্ত ভদ্রলোককে হিন্দু-সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তখন এই মর্মে লিখি,—

'শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্বে বালিকাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বে আট-নয় বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সব কারণে সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুক দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী কুক প্রয়োজন হইলে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মিশনরী স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানে লিপ্ত হইতে পারেন।'

—রাজা রাধাকান্ত দেব

[ইতালির খ্যাতনামা নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্লো প্রথমে ছোটগল্প লিখেই সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। উত্তরকালে নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই তিনি মানব-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই কাহিনীটি ব্যতিক্রম। এই হাস্যরসাত্মক কাহিনীটিতে তিনি দেখিয়েছেন, কি করে সামাজিক সংস্কারের মুখোস থেকে মুক্ত করে ভাবী বর ও বধূকে তাদের হৃদয়ের ধর্মকে পালন করতে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজেকেও আঁটসাট ফ্রককোট থেকে মুক্ত করেছিলেন—এই সুনিপুণ শিল্পী ১৯৩৪ সালে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং এই ঘটনার মাত্র দু'বছর পর ১৯৩৬ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। —স]

ফ্রক কোট

লুইজি পিরানদেল্লো

V

যে বৃদ্ধা পরিচারিকাটি প্রায় বিশ বছর ধরে কাজ করছে, প্রফেসর গরি সাধারণত তার ওপর রাগ করতেন না। সেদিন যখন জীবনে প্রথম সেই ফ্রককোটটা পরতে হল তখন তিনি রেগে জ্বলে উঠলেন।

যে মন নানারকম গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধির ব্যাপার নিয়ে ভারাক্রান্ত এবং যে মনে চপলতার কোন স্থান নেই, সেই মনকে যে একটা তুচ্ছ ঘটনাও উত্তেজিত করতে পারে, শুধু এই চিন্তাতেই তিনি রেগে উঠছিলেন।...

তারপর—হে ভগবান! জলহস্তীর মত কি বিশাল বপু তাঁর!—যেন প্রাচীনকালের একটি জন্তুবিশেষ!

প্রফেসর গরি পরিচারিকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। খর্বাকৃতি তুলোর বস্তার মত স্ফীতকায়া পরিচারিকা তার বিশালকায় মনিবকে অনভ্যস্ত বিশেষ পোষাক পরতে দেখে আনন্দে আত্মহারা—এই অবস্থা দেখে বিশৃঙ্খল আধো-আঁধার কক্ষের পুরোন সাধারণ আসবাবপত্র এবং বইগুলিও যেন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল।

ফ্রককোটটি অবশ্য প্রফেসর গরির নিজস্ব নয়। তিনি ওটি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন। কাছেই একটি দোকানের কর্মচারী কতগুলো পোষাক বাড়িতে এনেছিলেন। এর ভেতর থেকে তাঁকেই একটি পছন্দ করে দিতে হবে।—অর্ধ-নিমীলিত আঁখি-যুগল তাঁর— অধরে বিজ্ঞজনোচিত আত্মপ্রসাদের ঈষৎ হাসির রেখা—বিচক্ষণ বিচারকের ভঙ্গীতে তিনি প্রফেসরকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাঁকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিলেন, 'মাফ করবেন! মাফ করবেন।' শেষে সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছ সঞ্চালন করে বললেন—'এটা চলবে না।'

প্রফেসর জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ঘাম মুছে ফেললেন। তিনি আট-ন'বার চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রত্যেকটাই আগেরটার চাইতে বেশি আঁটসাঁট হয়েছে। কলারটার জন্য মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ওয়েস্ট কোটের ভেতর থেকে সার্টের সামনের দিকটা কুঁচকে ফুলে উঠেছিল। স্টার্চ-দেওয়া সাদা 'টাই'-টা ঝুলছিল, কারণ তিনি জানতেন না কি করে বাঁধতে হয়!

শেষে কর্মচারীটি প্রসন্ন হয়ে বললেন—'ঠিক আছে। এটা চলবে। বিশ্বাস করুন এর চাইতে আর ভাল দেখছি না।'

প্রফেসর গরি জ্বলন্তদৃষ্টিতে পরিচারিকার দিকে চাইলেন যাতে সে—'নিখুঁত!' না বলে ওঠে, তারপর তিনি ফ্রককোটের দিকে নজর দিলেন যার জন্য নিঃসন্দেহে কর্মচারীটি তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছিল। কর্মচারীটির দিকে চেয়ে বললেন: 'আপনার কাছে আর অন্য পোষাক নেই?'

'আমি এক ডজন এনেছিলাম স্যার।'

'এইটাই কি শেষটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, ভাল!'

এটা অন্যগুলোর চাইতে একটু বেশি আঁটসাঁট হয়েছিল। তরুণ কর্মচারীটি একটু সক্রোধেই স্বীকার করলে: 'সামান্য আঁট হয়েছে বটে, কিন্তু পরে ঠিক হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে আয়নায় দেখুন'—

'না, ধন্যবাদ!' আমি আপনার এবং এই মহিলাটির—আমার পরিচারিকার কাছে অনেক দৃশ্যের অবতারণা করেছি, আর নয়।'

তরুণ কর্মচারীটি পূর্ণ মর্যাদা বজায় রেখে মাথা নাড়লেন একটু, তারপর অন্য একটা ফ্রককোট হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন।

'বিশ্বাস করতে পারো এটা?' হাতটা ওপরে তোলবার চেষ্টা করে বেগে গর্জন করে উঠলেন প্রফেসর।

আয়নায় নিজেকে দেখে আবার সজোরে নিঃশ্বাস নিলেন। কনের বাড়ি 'ভিয়া মিলানো'তে তাঁর আটটার সময় যাবার কথা; এদিকে সওয়া সাতটা বেজে গিয়েছে। বাড়ি থেকে হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিট লাগে।

বৃদ্ধা পরিচারিকা কর্মচারীটির সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ছোট ঘরটিতে ফিরে এলে, প্রফেসর তাকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন, 'চুপ! চেষ্টা করে দেখ 'টাই'-টা বেঁধে যদি আমায় শ্বাসরুদ্ধ করে শেষ করতে পার।'

'সহজভাবে নিন ব্যাপারটাকে—কলারটা—' বৃদ্ধা পরিচারিকা কম্পিত দু'টি হাত সযত্নে রুমালে মুছে 'টাই'-টা ঠিক করতে লাগল।

পাঁচ মিনিট ধরে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। প্রফেসর এবং সমস্ত ঘরটা যেন রুদ্ধশ্বাসে শেষ বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ'লো?'

এ—' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরিচারিকা।

লাফিয়ে উঠে চিৎকার করলেন প্রফেসর

গরি, 'থাম। আমি নিজেই চেষ্টা করব। আর সহ্য করতে পারছি না!'

কিন্তু আয়নার কাছে গিয়েই তিনি রেগে এমন চিৎকার করে উঠলেন যে, বেচারী স্ত্রীলোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। প্রথমে তিনি নিজেই নিজেকে অভিবাদন করলেন বিচ্ছিরিভাবে—যেই মাথা নুইয়েছেন অমনি দেখতে পেলেন পেছনের কোটের নীচের দু'টি প্রান্ত একটু ফাঁক হয়েই আবার বন্ধ হয়ে গেল—বেড়াল যেমন দ্রুত পেছন ফিরে দেখে, যদি মনে হয় ল্যাজে কিছু বাঁধা আছে ঠিক তেমনিভাবে যেই তিনি পেছন ফিরেছেন অমনি ফ্-ড্-ড্! ফ্রককোটের বগলতলাটা খুলে গেল।—

অস্বাভাবিক রেগে গেলেন তিনি।

'খুলে গিয়েছে! শুধু সেলাইটা খুলে গিয়েছে!' বৃদ্ধা পরিচারিকা তাঁকে আশ্বস্ত করে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। 'খুলে ফেলুন, আমি সেলাই করে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমার আর সময় নেই হাতে। আমি এই রকমভাবেই যাব—শাস্তিস্বরূপ! এমনিভাবে—অর্থাৎ আমি কারও সংগে করমর্দন করব না।—আমায় যেতে দাও।' গর্জন করে উঠলেন প্রফেসর।

—প্রচণ্ড রেগে গিয়ে 'টাই'টা বেঁধে আরও একটা কোট চাপিয়ে ফ্রককোটের কেলেংকারীটা চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

যাই হোক, পরিশেষে তাঁর খুশি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কি ঝঞ্ঝাট! সেদিন সকালে চেসারা রেইস নামে তাঁর এক প্রিয় ছাত্রীর বিয়ে। প্রফেসর গরির সাহায্যে তিনি এই বিয়ের ফলে তাঁর দীর্ঘ স্কুল-জীবনের আত্মত্যাগের পুরস্কার লাভ করছিলেন।

প্রফেসর গরি পথ চলতে চলতে ভাবছিলেন, কি অদ্ভুত যোগাযোগের ফলে এই বিয়েটা ঘটছিল! কিন্তু বরের নামটা যেন কি?—সেই বিপত্নীক ধনী ভদ্রলোক যিনি একদিন তাঁর কাছে 'টিচার্স' কলেজ-এ এসেছিলেন তাঁর মেয়েদের পড়াবার জন্য কোন মহিলার সন্ধান যদি প্রফেসর গরি দিতে পারেন এই আশায়।—'নামটা যেন কি? গ্রিমি? গ্রিতি? না, মিত্রি! হ্যাঁ ঠিক: মিত্রি, মিত্রি।' বিয়েটা ঠিক হ'ল অদ্ভুতভাবে। পনের বছর বয়েসের সময় মিস্ রেইস তাঁর বাবাকে হারান। সাহসে বুক বেঁধে দর্জির কাজ এবং প্রাইভেট টুইশানি করে মাকে নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। চেষ্টার ফলে শিক্ষিকার ডিপ্লোমাও পেলেন। প্রফেসর গরি তাঁর চরিত্রবল এবং অধ্যবসায় দেখে খুশি হয়ে রোমের এক স্কুলে অনুরোধ এবং কৌশল করে কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। যখন ওই মিঃ গ্রিতি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

'গ্রিতি, গ্রিতি, হ্যাঁ ঠিক নামটা গ্রিতি-ই বটে। মোটেই মিত্রি নয়!'—প্রফেসর গরি তাঁকে মিস্ রেইসের নাম করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি (গ্রিতি) হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন। চেসারা রেইস তাঁর বয়েস এবং পদাবস্থার কথা বিবেচনা করে পড়াতে সম্মত হলেন না। তা' ছাড়া তিনি তাঁর বৃদ্ধা মাকেও ছেড়ে যেতে পারেন না। কে জানে হতভাগী মেয়েটা কিরকম কণ্ঠস্বরে, কিরকম মুখভংগীতে কথাগুলো বলেছে তাঁকে!

মিস্ রেইস রূপসী মেয়ে ছিলেন। প্রফেসর গরি যে রকম সৌন্দর্য পছন্দ করতেন রেইস ঠিক তেমনি সুন্দরী ছিলেন।—দীর্ঘকালের দুঃখ তাঁর মুখে এঁকে দিয়েছিল এক করুণ-মধুর ঔদার্যের ছাপ।—

নিশ্চয়ই সেই গ্রিমি—

'আমার ভয় হচ্ছে তার প্রকৃত নাম হল গ্রিমি, এখন আমার মনে পড়েছে।' নিশ্চয়ই মিঃ গ্রিমি প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। তিন-চারবার প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অবশেষে তিনি প্রফেসর গরিকে ধরলেন। প্রফেসরকে তিনি অনুরোধ করলেন রেইসকে জিজ্ঞেস করতে যে—যদি তিনি পড়াতে না চান, তবে তাঁর মেয়েদের মা হতে রাজী আছেন কি না। রেইস ছিলেন অতি নম্র, গুণী এবং সুন্দরী। প্রফেসর গরি সানন্দে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হলেন। প্রফেসরের কথাতে মিস্ রেইস বিয়ে করতে রাজী হলেন।—গ্রিমি, গ্রিতি না মিত্রির আত্মীয়-স্বজনদের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও বিয়ে ঠিক হল।

এখন প্রফেসর গরিকে কনের জন্য একটি ছোট ফুলের তোড়া কিনতে হবে। মেয়েটি বিয়েতে তাঁকে সাক্ষী হবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন যে, সাক্ষী হিসেবে বরের সামাজিক উচ্চপদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁকে (মেয়েটিকে) তাঁর বিয়ের উপহার দেওয়া উচিত। কিন্তু সে সামর্থ্য তাঁর নেই। ফ্রককোটের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাই-যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, একটা ফুলের তোড়া কিনতে পারেন।—বিমূঢ় দ্বিধাগ্রস্ত মনে একটি ফুলের দোকানে গেলেন। অনেক দাম দিয়ে অল্প কয়েকটি ফুলসহ সবুজ পাতায় ভরা একটা তোড়া কিনলেন।

'ভিয়া মিলানো'তে পৌঁছে মিস্ রেইসের বাড়ির গেটের সামনে একদল লোককে দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গিয়েছে এবং বিয়ের শোভাযাত্রার গাড়িগুলিও নিশ্চয়ই উঠোনে অপেক্ষা করছে। লোকগুলি সম্ভবত শোভাযাত্রা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। কিন্তু ঐ নিষ্কর্মা লোকগুলো তাঁর দিকে অমন করে চেয়ে কি দেখছে? ফ্রককোটটা তো ওভারকোটের নীচে ঢাকাই আছে। বোধ হয় কোটের পেছনের প্রান্ত— পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন। না, দেখা যাচ্ছে না। তা হলে? গেটটা অর্ধেক বন্ধ কেন?

শোকবিহ্বল দরোয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ওপরে যাচ্ছেন বিয়ে দেখতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নিমন্ত্রিত।'

'কিন্তু—কি জানেন বিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'কি?'

'হতভাগ্য ভদ্রমহিলা—মানে—মা—'

'মার গেছেন?' চমকে উঠলেন গরি—বিস্ময়ে ঘরের দরজার দিকে চাইলেন।

'গতরাত্রে, অপ্রত্যাশিতভাবে।'

প্রফেসর কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এটা কি সম্ভব? মা অর্থাৎ মিসেস্ রেইস্?'

উপস্থিত জনতার দিকে চাইলেন তিনি—তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখলেন অবিশ্বাস্য সংবাদটি সত্য কি না নির্ধারণ করতে। ফুলের তোড়াটা হাত থেকে পড়ে গেল। তোলবার জন্য যেই নীচু হলেন অমনি অনুভব করলেন ফ্রককোটের বগলের ছেঁড়াটা বড় হয়ে যাচ্ছে—হায় ভগবান! ফ্রককোট! মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। কি করবেন? ওপরে যাবেন এই অবস্থায়? ফিরে যাবেন। তোড়াটা তুলে নিয়ে যেন হতভম্ব হয়ে দরোয়ানের হাতে তুলে দিলেন।

'অনুগ্রহ করে এটা একটু তোমার কাছে রাখ।'

ভেতরে ঢুকলেন তিনি। ওপরে যাবার জন্য একসঙ্গে দু'টো করে সিঁড়ির ধাপ ডিঙোতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শুধু প্রথমবারই সফল হলেন। শেষে ওপরে উঠে এলেন।

একেবারে দম বেরিয়ে গিয়েছে।—ভুঁড়িটাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন। বৈঠকখানাঘরে গিয়ে লক্ষ্য করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীর ভেতরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতা—কেউ যেন তাঁর উপস্থিতিতে পালিয়ে গেল—একটা হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।—

প্রফেসর গরি বিমূঢ় হয়ে ভেতরে ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়ালেন—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চারিদিকে তাকালেন। শত্রু-শিবিরের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায়ের মত মনে হল। বরের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবরা সম্ভ্রান্তবংশের লোক। ঐ ভদ্রমহিলাটি বোধ হয় তাঁর মা। অপর দু'জন বৃদ্ধাকে মনে হচ্ছে যেন পরিচারিকা এবং দু'টি বোন। বিচ্ছিরিভাবে তিনি অভিবাদন করলেন। (হায় ভগবান! আবার সেই ফ্রককোটটা!) মনে হল কে যেন তাঁকে ভেতর থেকে টেনে ধরল—চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সেলাইটা ছেঁড়ার শব্দ কেউ শুনতে পেয়েছে কি না!—তাঁর অভিবাদনে কেউ প্রত্যুত্তরও জানাল না—যেন এই শোকাবহ শোচনীয় ঘটনায় কেউ একটুও মাথাও নাড়লেন না। কয়েকজন ভদ্রলোক (সম্ভবত পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) একজন লোককে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রফেসর গরি ভাল করে লক্ষ্য করে মনে করলেন যে বরকে চিনতে পেরেছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার কাছে গিয়ে বললেন: 'মিঃ গ্রিমি—'

'আজ্ঞে আমার নাম মিগ্রি।'

'হ্যাঁ ঠিক, মিগ্রি—আমি একঘণ্টা ধরে এই কথাই ভাবছি, বিশ্বাস করুন! আমি বলছিলাম গ্রিমি, মিত্রি, গ্রিতি,—মিগ্রি নামটা আমার মনেই হয় নি। মাপ করবেন! আমি প্রফেসর ফাবিও গরি—আপনার বোধ হয় মনে আছে—যদিও আমায় এখন দেখছেন—'

'খুশি হলুম কিন্তু'—নির্লিপ্তভাবে বললেন ভদ্রলোকটি। তারপর যেন মনে পড়ল—'ও গরি!—হ্যাঁ, আপনিই তো পরোক্ষভাবে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার ভাই আমায় বলেছে—'

'কি? কি? মাপ করবেন, আপনি তার ভাই?'

'আজ্ঞে আমার নাম কারলো মিগ্রি।'

'মাপ করবেন! আশ্চর্য! আপনাকে দেখতে ঠিক তাঁর মত! মাপ করবেন আমায় মিঃ গ্রি—ও হ্যাঁ, মিগ্রি, কিন্তু—এটা যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! হ্যাঁ! দুর্ভাগ্যক্রমে আমি—অর্থাৎ না দুর্ভাগ্যক্রমে নয়—আমার কোন দোষ নেই।—হ্যাঁ বলতে হয় পরোক্ষভাবেই ভাগ্যক্রমে আমি এই বিয়েটা—'

মিগ্রি ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন আমার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

'তাহলে অবশ্য আমি খুব সম্মানিতই হব।'

মিগ্রি প্রফেসরকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর বিশাল বপু নিয়ে অর্ধেকটা শোফা জুড়ে বসেছিলেন। পরনে কালো পোষাক, টুপিটাও কালো।—তাঁর ঈষৎ হলুদ রঙের চ্যাপ্টা এবং প্রায় পার্চমেণ্ট কাগজের মত মুখের চারিদিকে রেশমের মত চুলগুলি ছড়িয়ে ছিল।

'মা, ইনি হচ্ছেন প্রফেসর গরি। ইনিই আন্দ্রেয়ার বিয়ের সব বন্দোবস্ত করেছিলেন।'

ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে ভারী চোখের পাতা দু'টো ওপরে তুললেন—একটি চোখ বেশি খুললেন, অপরটি অপেক্ষাকৃত কম—তাঁর ঘোলাটে ডিম্বাকৃতি চোখ দু'টি ভাবলেশহীন প্রায়।

'প্রকৃতপক্ষে' প্রফেসর তাঁকে সংশোধন করলেন এবং ফ্রককোট সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ইতস্তত করে অভিবাদন করলেন এবং বললেন: 'প্রকৃতপক্ষে বন্দোবস্ত করেছি বললে কথাটা ঠিক হবে না—আমি শুধু—'

'আমার নাতি-নাতনীদের জন্য একজন শিক্ষিকার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন।' বৃদ্ধা মহিলা কথাটি শেষ করে দিলেন।

'চমৎকার! সত্যিই তাই বললেই ঠিক হয়। ঠিক, হ্যাঁ—মিস্ রেইসের গুণাবলী এবং নম্রতার কথা জেনে'—বললেন প্রফেসর গরি।

'চমৎকার মেয়ে সে, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বিশ্বাস করুন আমরা আজ খুবই দুঃখিত—' তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন ভদ্রমহিলা চোখের পাতা দুটো নামিয়ে।

'কি দুর্ভাগ্য! সত্যই! এমন অপ্রত্যাশিতভাবে!' অনুশোচনা করতে লাগলেন গরি।

'ভগবানের যেন এই ইচ্ছে ছিল না।' ভদ্রমহিলা বললেন।

'অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস—' তার দিকে চেয়ে বললেন গরি। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিঃ আন্দ্রেয়া কোথায়?'

নির্লিপ্ততার ভাব দেখিয়ে জবাব দিলেন তার ভাই, 'জানি না, একটু আগে এইখানেই তো ছিল। বোধ হয়—তৈরি হবার জন্য গিয়েছে।'

হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন গরি, 'বিয়েটা হবে তাহলে?'

'না! আপনি কি বলছেন? বাড়িতে মৃত ভদ্রমহিলা রয়েছেন!—হায় ভগবান! ও—ও!' বিস্ময়ে ক্রুদ্ধ হয়ে জ্বলে উঠলেন মহিলাটি।

'ও—ও!' ভীত হয়ে পরিচারিকা দু'টি আর্তনাদ করে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করলে।

'এখান থেকে চলে যাবার জন্য তৈরি হতে গিয়েছেন। নব-পরিণীতাকে সংগে নিয়ে আজই তাঁর তুরিনে রওনা হবার কথা ছিল। সেখানে ভালসানগোনে-তে আমাদের একট কাগজের কারখানা আছে সেইখানেই তাঁর যাওয়া বিশেষ দরকার।' ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন মিগ্রি।

'এবং এই অবস্থায় তাকে যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করলেন গরি।

'প্রয়োজন বোধে। আজ যদি নাও হয় তবে কাল। আমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছি—বেচারা! বুঝতে পারছেন তো! এখানে থাকা তার পক্ষে আর উচিত নয়।'

'মেয়েটির জন্য—সে এখন একা রয়েছে—গুজব রটনাকারীরা—' ওদের মা বললেন।

'সত্যই তাই। তারপর ব্যবসা—এই বিয়েটা—ভাই বলছিলেন।

'খুবই তাড়াহুড়ো করে স্থির করা হয়েছে।' একটি পুরোন পরিচারিকা রেগে ফেটে পড়ল।

'বরং বলা যাক হঠাৎ ঠিক করা হয়েছে কিছু না ভেবেই।' সুর নামিয়ে বলতে লাগলেন মিগ্রি। 'এখন এই শোকাবহ ঘটনাটি দুরাদৃষ্টের রূপ নিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছে, যেন—আমাদের খানিকটা সময় দিতে। বিয়েটা স্থগিত রাখতেই হবে—শোক প্রকাশের জন্য—এবং এই সময়ের ভেতরে উভয় পক্ষই ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার সুযোগ পাবে।'

প্রফেসর গরি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। এই বিরক্তিকর কথা শুনে তিনি বিজ্ঞের মত নীরব হয়েই ছিলেন ঠিক যেমন বগলের সেলাইখোলা ফ্রককোটের জন্য সাবধান হয়েছিলেন!—কথাগুলোকে তাঁর কাছে মনে হল সেলাইখোলা ফ্রককোটের মত—অসংলগ্ন—এবং সেই ফ্রককোটের মত এই ব্যাপারটিতেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।—জোর করতে গেলে যেমন ফ্রক—

কোটটি ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা তেমনি পীড়াপীড়ি করতে গেলে ব্যাপারটিও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এবং চাপের ফলে ফ্রককোটের হাতা যেমন খুলে আসতে পারে, তেমনি এইসব সম্ভ্রান্তবংশের লোকদের ভণ্ডামিও প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে।

প্রফেসর গরি অসন্তোষ এবং মানসিক যন্ত্রণার কথা ভুলতে চাইলেন। বৃদ্ধা মহিলার কালো পোষাকের গলার ধারে সাদা লেস দেখে দুঃখ হল তাঁর। যখনই তিনি এইরকম সাদা লেস দেখতেন তখনই তাঁর মানসপটে ভেসে উঠত একটি ছবি—দূরে তাঁর দেশে পিয়েত্রো কারদেল্লা নামে একজন লেস-বিক্রেতা প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে অতিকষ্টে পথ চলছে।—ভগবান জানেন কেন এই ছবি তাঁর মনে পড়ত!—সজোরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে সংযত হলেন—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'সত্যিই! বেচারি মেয়েটি!'

তাঁর কথায় সবাই সমস্বরে মেয়েটির প্রতি সমবেদনা জানালেন। প্রফেসর গরি তাঁদের কথায় যেন কশাঘাত পেলেন—ভীষণ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় মেয়েটি? তাকে দেখতে পারি?'

মিগ্র একটা দরজা দেখিয়ে বললে—'এখানে—সোজা চলে যান—'

ভীষণ রেগে গিয়ে প্রফেসর গরি সেইদিকে গেলেন।

ছোট্ট সাদা বিছানার ওপর রয়েছে মায়ের ঋজু মৃতদেহটি—মাথায় টুপি—ধারটাতে স্কার্চ দেওয়া।

আসবার সময় প্রফেসর গরি কাউকে লক্ষ্য করেন নি। ওদের কথাবার্তা শুনে রাগে তাঁর মাথা ঘুরছিল এবং এই দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত না হয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন তিনি—যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার—যেন অদৃষ্টের উদ্ধত নিষ্ঠুর ছলনা—কিছুতেই এ বরদাস্ত করা চলতে পারে না!

মৃত মহিলার কাঠিন্যভাব তাঁর কাছে অভিনয় বলে মনে হল—যেন ইচ্ছে করেই বিছনায় শুয়ে রয়েছেন—কন্যার উৎসব উপলক্ষে ইচ্ছে করেই প্রকাণ্ড টুপিটা পরেছেন।—প্রফেসর গরি যেন বলতে চাইলেন, 'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, প্রিয় ভদ্রমহোদয়া! এই রকম চালাকি করবার এখন সময় নয়।'

চেসারা রেইস হাঁটুগেড়ে মেঝের ওপর বসে ছিলেন এবং অন্যেরা এসে তাঁর মায়ের বিছানার কাছে ভিড় জমালো। বিমূঢ়, স্তব্ধ হয়েছিলেন তিনি। অবিন্যস্ত কালো কেশদামের কয়েকটি গুচ্ছ তখনও কার্ল-পেপারে কোঁকড়ান ছিল—আগের দিন সন্ধ্যায় ঐগুলি করা হয়েছিল।

করুণার পরিবর্তে মেয়েটির প্রতি প্রফেসর গরির ভীষণ ঘৃণা জন্মাল। প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল তাঁর মেয়েটিকে মেঝে থেকে তুলে ঝাঁকি দিয়ে সমস্ত বিমূঢ়তা দূর করতে।—যে ভাগ্য সমবেত উচ্চশ্রেণীর লোকেদের ভণ্ডামির পক্ষে অন্যায়ভাবে সহায়ক হয়েছে তার হাতে মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া চলতে পারে না।—সমস্ত তৈরি। যাঁরা তাঁর মত বিয়েতে ফ্রককোট পরে এসেছেন তাঁরাও—এখন শুধু প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ—হতভম্ব হতভাগ্য মেয়েটিকে জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে দেওয়া—তাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা।

কিন্তু যে ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন দাঁড়িয়েছে, সেই ইচ্ছাশক্তি প্রফেসর গরির ভেতর দেখা গেল না।—সেই চেসারা রেইস মাথা না নাড়িয়ে, একটি আঁখিপল্লবও না নাড়িয়ে তাঁর শায়িতা জননীকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন, প্রফেসর!'

তখন সহসা তিনি বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ মা হ্যাঁ' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন তিনি এবং তাঁর প্রাক্তন ছাত্রী বিস্মিত হয়ে গেলেন।—'কিন্তু তুমি উঠে পড়! আমায় নীচু হতে বাধ্য করো না, কারণ আমি নীচু হতে পারি না। তুমি নিজেই উঠে দাঁড়াও—এক্ষুণি—উঠে দাঁড়াও! উঠে দাঁড়াও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরুণীটি তাঁর উত্তেজনায় বাধ্য হয়ে হতাশার ভাব কাটিয়ে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে চেয়ে বললেন—'কেন?'

'কারণ—আগে তুমি উঠে দাঁড়াও! বলছি আমি নীচু হতে পারি না—ভগবানের নাম নিয়ে বলছি।' প্রফেসর গরি বললেন।

চেসারা উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ছোট্ট বিছানার ওপর মায়ের মৃতদেহটি আবার দেখতে পেয়ে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ভীষণ কাঁদতে সুরু করলেন।—তিনি ভাবতেই পারেন নি প্রফেসর তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না! না! এখন কেঁদ না! ধৈর্য ধর মা! আমার কথা শোন!'

ভীষণ ভয় পেয়ে তিনি প্রফেসর গরির দিকে চাইলেন—চোখের জল যেন থমকে দাঁড়াল—বললেন—'কিন্তু আপনি কি করে আশা করতে পারেন যে আমি কাঁদব না?'

'তুমি কাঁদতে পারবে না, কারণ তোমার পক্ষে এটা কান্নার সময় নয়!' তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর গরি বলতে লাগলেন, 'তুমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে মা! তোমাকে নিজেকে সাহায্য করতে হবে! বুঝতে পারছ, তোমাকে নিজেকে সাহায্য করতে হবে? এক্ষুণি! হ্যাঁ, এক্ষুণি! সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দাঁতে দাঁত চেপে আমি যা বলি তাই কর।'

'কি প্রফেসর?'

'কিছু না। আগে চুল থেকে ঐ কাগজের টুকরোগুলো সরিয়ে নাও।'

'ও ভগবান!' ওগুলোর কথা মনে পড়তেই আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ কম্পিতহস্তে চুলে হাত দিলেন।

'ঠিক আছে!' বলতে লাগলেন প্রফেসর, 'তোমার স্কুলের পোষাক আর ছোট টুপিটা পরে আমার সঙ্গে এস!'

'কোথায়? আপনি কি বলছেন?'

'সিটি হলে!'

'প্রফেসর! আপনি কি বলছেন?'

'আমি বলছি সিটিহলে—রেজেষ্ট্রী অফিসে তারপর গীর্জায়। কারণ এই বিয়ের কাজ শেষ করতেই হবে এবং এক্ষুণি; নইলে তোমার সর্বনাশ হবে! দেখতে পাচ্ছ তোমার জন্য আমি কি বেশে রয়েছি? ফ্রককোট পরে! তুমি যেমন চেয়েছিলে আমি একজন সাক্ষী হব তোমার বিয়েতে। তোমার হতভাগ্য মাকে এখানে রেখে চল; আর একমুহূর্তও তাঁর কথা ভেব না। মনে ক'র না এতে অধর্ম হবে। তোমার মা নিজেও এই চান! শোন আমার কথা! যাও পোষাক প'রে এস। আমি এক্ষুণি বিয়ের সব ব্যবস্থা করছি।'

'না না, কি করে আমি পারি?' চেসারা আবার মায়ের বিছানার ওপর প'ড়ে দুই হাতের ভেতরে মাথা গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'অসম্ভব, প্রফেসর! আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে! আমি জানি সে চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না—সে আমায় পরিত্যাগ করবে—কিন্তু আমি পারব না, পারব না—'

গরি দমলেন না। নীচু হলেন তাকে তোলবার জন্য। যেই হাত বাড়ালেন অমনি সজোরে মেঝেতে পা-ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করি না—এমন কি জামার একটা হাতা নিয়েই সাক্ষী দেব, কিন্তু আজকেই বিয়েটা শেষ করতে হবে! বুঝতে পারছ? আমার দিকে চাও! বুঝতে পারছ,

নয় কি? যদি এই সুযোগ হারাও তাহলে সব হারাবে। অসহায়ের মত কি করে চলবে? সর্বনাশের জন্য মাকে দোষ দেবে? কত আগ্রহ নিয়ে তোমার মা কি এই বিয়েটা চান নি? সাহসে বুক বাঁধ চেসারা আমি এখানে আছি, তুমি যা করবে সে দায়িত্ব আমার। যাও লক্ষ্মীটি। আর সময় নষ্ট না ক'রে পোষাক প'র এস—'

এই কথা বলে তিনি মেয়েটিকে তার ঘরের দরজার দিকে নিয়ে গেলেন—মেয়েটি তাঁর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিল। গরি ফিরে এসে মৃতদেহটি যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে যোদ্ধার মত বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলেন।

'বর কি এখনো আসে নি?'

প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথিরা তাঁর দিকে চাইলেন। মিগ্রি একটু ভাণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি খুবই মর্মাহত হয়েছেন?'

'খুব ভাল বোধ করছে সে এখন!' তীব্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর। 'বরং আনন্দের সঙ্গে আমি ঘোষণা করছি, ভদ্র-মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! শোক ছাপিয়ে তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি ক্ষণিকের জন্য।—আমরা সবাই এখানে এবং সমস্ত তৈরি, এই যথেষ্ট—আমি বলছি! আপনাদের একজনের পক্ষে এটা যথেষ্ট—আপনি যদি অনুগ্রহ করে,' একজন অতিথির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'আপনি যদি একটা গাড়ি করে তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারীদের একটা খবর দেন যে—'

একটা সম্মিলিতকণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদে প্রফেসরের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। তাদের ভেতর ফুটে উঠল বিস্ময়, ভীতি—প্রচণ্ড ক্রোধ—

'বুঝিয়ে বলতে দিন আমায়!' প্রফেসর গরি দৃঢ় উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'কেন এই বিয়ে হবে না? কারণ মেয়েটি শোকাভিভূতা নয় কি? কিন্তু মেয়েটি যদি এখন নিজেই—'

'কিন্তু আমি কখনও অনুমতি দেব না,' আরও উচ্চকণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন বৃদ্ধা মহিলাটি, 'আমার ছেলেকে আমি কখনও অনুমতি দেব না—'

'তাঁর মহৎ কর্তব্য পালন করতে?' প্রফেসর গরি তাড়াতাড়ি কথাটি শেষ করে দিলেন।

'হস্তক্ষেপ করবেন না এই ব্যাপারে!' রাগে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের পক্ষ হয়ে বললেন তিনি।

'ক্ষমা করবেন! আমি হস্তক্ষেপ করছি,' প্রফেসর গরি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'কারণ আমি জানি যে আপনি একজন ভদ্রলোক প্রিয় মিষ্টার গ্রিমি—'

'অনুগ্রহ করে বলুন মিগ্রি!'

'মিগ্রি, মিগ্রি, আপনি বুঝতে পারবেন যে এইরকম পরিস্থিতির অনিবার্য কর্তব্যকে অস্বীকার করা অবমাননাকর। যে দুর্ভাগ্য মেয়েটিকে শোকাভিভূত করেছে, আমাদের উচিত তার চাইতেও শক্তিমান হয়ে হতভাগ্য মেয়েটিকে রক্ষা করা! সহায়-সম্বলহীন হয়ে মেয়েটি কি এইরকম একা থাকতে পারে? বলুন আপনি! না, বিয়ে হবেই—দুর্দৈব সত্ত্বেও এবং···শান্ত হোন, অনুগ্রহ করে।'

ভীষণ রেগে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন প্রফেসর গরি—তারপর ওভার-কোটের তলায় হাত দিয়ে এক হেঁচকা টানে ফ্রককোটের হাতাটা খুলে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিলেন। এই বিচিত্র এবং অপ্রত্যাশিত হাস্যস্কর ব্যাপারটা দেখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবাই হাসতে লাগল। প্রফেসর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবং এই হাতাটা সত্ত্বেও—যেটা আমায় এতক্ষণ ধরে কষ্ট দিচ্ছিল!'

'আপনি কি পরিহাস করছেন?' শান্তভাবে মিগ্রি বললেন।

'আজ্ঞে না মশাই, সেলাইটা খুলে গিয়েছিল।'

'আপনি পরিহাস করছেন! আপনার রাগটা অকারণ।'

'এই পরিস্থিতিই কারণ।'

'অথবা কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ! আমি আপনাকে বলছি যে এই অবস্থায় বিয়ে কোনমতে সম্ভব নয়!'

সৌভাগ্যক্রমে বর এসে উপস্থিত হলেন।

'না! না! আন্দ্রেয়া, না!' চারিদিক থেকে সবাই বলতে লাগল।

কিন্তু গরি সবাইকে উপেক্ষা করে মিগ্রির কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি স্থির করুন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই: যে গুরুতর পরিস্থিতি হয়েছে এবং আপনি তাকে যে অবস্থায় ফেলে চলে যাবেন সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি মিস্ রেইসকে সাহস সঞ্চয় করতে রাজী করিয়েছি। এখন মিস্টার মিগ্রি আপনি যদি সম্মত হন তাহলে বিনা আড়ম্বরে নিঃশব্দে একটা বন্ধ গাড়িতে করে সিটিহলে গিয়ে এক্ষুণি বিয়ের কাজটা শেষ করা যেতে পারে—আমার বিশ্বাস আপনি অসম্মত হবেন না। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন—'

আন্দ্রেয়া মিগ্রি বিস্মিত হয়ে গরির দিকে চাইলেন—তারপর অন্য সবার দিকে একবার চেয়ে ইতস্তত করে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি যে চেসারা যদি রাজী থাকেন···'

'সে রাজী আছে! সে রাজী আছে!' গরির চিৎকারে অন্য সবার অসম্মতিসূচক কথাগুলো চাপা পড়ে গেল। 'অবশেষে হৃদয়ের কথা বেরিয়ে এল! আপনি অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি সিটিহলে চলে যান!' যে অভিথিটির সংগে তিনি প্রথমে কথা বলেছিলেন, তার হাত ধরে দরজা পর্যন্ত গেলেন। হল-ঘরের ভেতর ঝুড়ি ঝুড়ি চমৎকার ফুল রয়েছে বিয়ের উপহার স্বরূপ। তিনি বৈঠকখানা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বরকে ডাকলেন ক্রুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য।

'মিস্টার মিগ্রি, মিস্টার মিগ্রি, একটি অনুরোধ! চেয়ে দেখুন—'

মিগ্রি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন।

'আসুন হতভাগ্য মেয়েটির মনোবেদনায় সহানুভূতি জানাই—এই সমস্ত ফুল মৃতা মহিলাটির কাছে পাঠানো যাক আমায় সাহায্য করুন!'

গরি দু'টো ঝুড়ি হাতে করে বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে বিজয়গর্বে মৃতা-মহিলাটির ঘরে নিয়ে গেলেন। আরও দু'টো ঝুড়ি হাতে নিয়ে বরও তাঁকে অনুসরণ করল। তৎক্ষণাৎ দলের ভেতরে একটা পরিবর্তন এল। আরও কয়েকজন ছুটে এল হলঘরে শোভাযাত্রা করে ঝুড়িগুলো বয়ে নিয়ে যেতে।

'ফুলগুলি মৃত মহিলার ঘরে নিয়ে যান। এই চমৎকার ফুলগুলি মৃতা মহিলার জন্য।'

চেসারা তাঁর স্কুলের সাধারণ কালো পোষাক পরে এসে হাজির হলেন। বিবর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে—মাথার চুল সুবিন্যস্ত নয়।—মুখের সৌম্যভাব বজায় রাখবার প্রচেষ্টায় কাঁপছিলেন তিনি।—তৎক্ষণাৎ বর ছুটে এসে করুণায় বিগলিত হয়ে তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই নীরব। প্রফেসর গরির চোখের জল চিক্ চিক্ করছিল···তিনজন ভদ্রলোককে সাক্ষী দেবার জন্য বর-কনের সংগে রওনা হতে অনুরোধ করলেন তিনি। তাঁরা নিঃশব্দে রওনা হলেন। মা, ভাই, বৃদ্ধা পরিচারিকাদ্বয় এবং অতিথিবর্গ চেসারার উপস্থিতিতে ক্ষণিকের জন্য সংযত হয়েছিলেন বৈঠকখানা ঘরে, এবারে তাঁরা রেগে জ্বলে উঠলেন। ফুলের ভেতর শায়িতা হতভাগ্যা বৃদ্ধা জননীর সৌভাগ্য যে, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই

চমৎকার লোকেরা যে ভাষায় ক্রোধ প্রকাশ করছিল, তা আর শুনতে সমর্থ হলেন না।

পথে যাবার সময় প্রফেসর গরি চিন্তা করছিলেন—তাঁর সম্বন্ধে বৈঠকখানা ঘরে লোকেরা কি আলোচনা করছিলেন। তিনি যখন সিঁড়িতে পৌছলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল যেন মাতালের মত একটা নেশাচ্ছন্নভাব—ফ্রককোটের একটা হাতা যে খুলে ফেলেছিলেন, সে কথা ভুলে গিয়ে অন্য সবার মত ওপরের ওভারকোটটা খুলে ফেললেন।

'প্রফেসর!'

'ও হ্যাঁ!' তাড়াতাড়ি আবার ওভারকোটটা গায়ে দিলেন এমন কি চেসারাও এই ব্যাপারটা দেখে হেসে ফেললেন। গরি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, ওই সব লোকেরা তো আর এটা দেখে হাসতে পারলো না! এখন তাঁকে আবার ফিরে যেতে হবে ঐ লোকেদের কাছে—বিশেষ প্রয়োজন! কারণ ফ্রককোটের হাতাটা নিয়ে আসতে হবে, ওটা ফেরৎ দিতে হবে ফ্রককোট সমেত যে দোকান থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন সেই দোকানে। সই? কিসের সই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; সাক্ষী হিসেবে তাঁকে সই করতে হবে। কোথায়?

গির্জার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে বর-কনের সংগে চারজন সাক্ষী বাড়িতে ফিরে এল। বরফ-নীরবতায় তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হল।

গরি যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কয়জন অতিথিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আস্তে—একটু আগে ফ্রককোটের যে হাতাটা শূন্যে ছুড়ে ফেলেছিলাম সেটা কোথায় বলতে পারেন?'

...তাড়াতাড়ি একটা খবরের কাগজে হাতাটাকে মুড়ে চুপি চুপি সরে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, সেদিন যে ভাগ্যকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন—সে শুধু ঐ ফ্রককোটের হাতাটার জন্য কারণ ফ্রককোটের বগলের সেলাইটা খুলে গিয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করলে মূর্খের মত তিনি ওদের ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন। আঁট ফ্রককোটের বিরক্তিতে রেগে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করেছিলেন এবং জয়ীও হয়েছিলেন।*

অনুবাদক—সুবীরকান্ত গুপ্ত

[*মূল ইটালিয়ান থেকে অনূদিত।]

শরদের আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন

মনোহর সুধাকর, চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার, সুধার বৃষ্টি করে।।
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্বতীর, প্রতিমা প্রকাশ।।
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু, আয়োজন করে।।
অনিবার হাহাকার, অর্থবল হত।
ঋণজালে বদ্ধ হয়ে, অর্চনায় রত।।
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন।।
বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু।।
কপালের মাঝে এক, আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে।।
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ, দুর্বাসার মত।।
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শূদ্রের নিকট।।
পেলে কিছু গদ গদ, আশীর্বাদ সুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল, অনর্গল মুখে।।
যাজক পূজক যত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে, পন্থা নিজ নিজ।।
হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট।
'অপবিত্র পবিত্রবা' ঊর্ধ্ব এই পাঠ।।
পূজারির কার্য যত, সে কেবল রোগ।
পুকারে উকার লোপ, আকারের যোগ।।
দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী, তুমি মা জননী।।
এই হেতু করি তব, প্রতিমা নির্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব, তোমার সন্তান।।
এতদিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি, বিপরীত ধারা?

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হাতশাবা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

খাবাড়ের জঙ্গল থেকে যে বাঘের বাচ্চাটা কম্বল চাপা দিয়ে ধরে এনেছিলাম, সেটা তখন একটু বড় হয়েছে। গলায় শিকল দিয়ে রোজই তাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে ঘুরে বেড়াই। কোনদিন সদর রাস্তা দিয়ে বাজারের দিকে, কোনদিন বা নিরিবিলি পদ্মার ধারে।

সেদিন পদ্মার ধারেই গিয়েছিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। গেটের সম্মুখেই নজরে এল আমার বন্ধু অর্জুন সেন, পশ্চাতে ভল্টু; আমারই অপেক্ষায় পায়চারি করছে।

তাড়াতাড়ি পা চালাই—অর্জুন সেনও হাত তুলে এগিয়ে আসে, কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, হঠাৎ আমার সঙ্গী জানোয়ারটির গলা দিয়ে ঘরর-ঘরর আওয়াজ বের হতেই অর্জুন সেন থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—এ কি হে? কুকুর নয়? আমি তো মনে করেছিলাম তোমার টেরিয়ারটা—

সহাস্যে বন্ধুবরকে বলি—টেরিয়ার নয়—টেরিবল্—বাঘের বাচ্চা!

—সাবাস! বাঘের বাচ্চাকে শিকল পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে বেশ একটা থ্রিল আছে। জানি তো তুমি চিরদিনই রোমান্টিক! কি করে জোগাড় করলে বল তো?

উত্তর দিলাম—যোগাড় করে নয় হে, স্বহস্তে ধৃত। তারপর কতক্ষণ আসা হয়েছে? চা-টা দিয়েছে কি না—

—তোমার এখানে এলে ও সবের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করতে হয় না—যা একখানা গেস্ট হাউস—

তার উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিলাম—চল, আমার ফরাসের ঘরে গিয়েই বসা যাক। তারপর ছুটি ক'দিনের? কিছুদিন থাকবে তো?

—না ভাই, সে সৌভাগ্য নেই—আমার ব্যাটেলিয়ন নিয়ে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—বহরমপুরে রাত্রে হন্ট করার প্রোগ্রাম করা আছে। আর সবাই চলে গেল, আমি নেমে পড়লাম এখানে—কাল সকালের গাড়িতেই গিয়ে ওদের ধরতে হবে।

অভিমান দেখিয়ে বন্ধুবরকে অনুযোগ করি—এরকম নিমেষের দেখা নাই বা দিতে!

—সত্যি ভাই, এবার কিন্তু না এলেই ভাল হ'ত! তোমার ঐ বাঘের বাচ্চাটা দেখে আমার বড় আফশোস হ'ল। আমিও একবার শিকারে গিয়ে তিন-তিনটে বাচ্চা পেয়েছিলাম—সেগুলো বেশ বড়ও হ'ল। কিন্তু আমারই কোথাও স্থিতি নেই কি না, ব্যাচেলারদের যা হয়ে থাকে—তাই একটা গেল মরে, বাকি দু'টোকে বিক্রি করে দিলাম। অবশ্য দাম পেয়েছিলাম ভালই।

—গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন সেই শিকারের কাহিনীটা বল দেখি—একবার নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। রাঘিনীর পাল্লায় পড়লে কি যে নাজেহাল হতে হয় সেটা আমি বিলক্ষণ জানি।

অর্জুন সেন দম নিয়ে বলে—না, না, তেমন কিছু হয় নি—তবে সেবার যে দৃশ্য দেখেছিলাম—তা যেমন ইন্টারেস্টিং তেমনি অদ্ভুত আমার শিকারী জীবনে এমনটি আর কখনও হয় নি।

অর্জুন সেনকে অনুরোধ করি—বেশ ধীরে সুস্থে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে যাও—দার্জিলিং মেল চালিও না। খুঁটিনাটি বিবরণ না দিলে গল্প জমে না—

এটা জল-মেশানো দুধ নয় হে বন্ধু, একেবারে খাঁটি সত্য ঘটনা!

অর্জুন সেন বলতে থাকে—সেবারে নেপালের তরাই অঞ্চলে কিছুদিনের জন্যে আস্তানা নিয়েছিলাম। কেন, কি প্রয়োজনে, এসব জানতে চেয়ো না—র‍্যাপারটা পলিটিক্যাল। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই পার্বত্যিয়া নেপালী—ভারতের মাটিতে ঘর বেঁধেছে—পাহাড়ী বলেই তাদের সকলে জানে

ছোট্ট গাঁ। অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী। চাষ করে। কারও না

নিজেরই জমি আছে—কেউ বা পরের জমি ভাগে চাষ করে। তবে ধানের গোলা দেখলে মনে হয় যে কমবেশি সকলের অবস্থাই স্বচ্ছল। অনেকের বাড়িতেই হাল-বলদ। গাইগরু ও মহিষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা শুক্‌নো নদীর খাত—জল এতটুকু নেই। আমাদের ক্যাম্প পড়ল নদীর ধারেই। ওপারে ঘন জঙ্গল—নানারকম ছোটবড় গাছ, নিবিড় অন্ধকার সেই বন। পাহাড়ীরা সেখানে কাঠ কাটতে যায়, কোমরে ভোজালী হাতে টাঙ্গি। অবশ্যি একলা কেউ যায় না—দলে দলে ভাগ হয়ে কাঠ কাটে—সেই কাঠই তাদের জ্বালানীর কাজ করে।

শোনা গেল কিছুদিন আগে এক পাহাড়ী সেই জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল—দলছাড়া হওয়ায় আর ফিরে আসে নি। লোকের বিশ্বাস সে বাঘের পেটে। ভয়ে কেউ আর ও-মুখো হয় না—কাছাকাছি কোথাও শুক্‌নো গাছ পেলে তাই কেটে আনে।

আমরা যখন সেখানে ক্যাম্প করি, আমাদের সঙ্গে যে দলটি সেখানে পৌঁছল, তাকে একটা সার্কাস পার্টি বললেও চলে। কি নেই? তাঁর তিন-চারটে। দু'টো হাতী, একটা ছোট মাদী, একটা দাঁতাল, গোটা তিনেক ঘোড়া। তা ছাড়া পাহাড়ীদের উপঢৌকন-স্বরূপ গোটাচারেক খাসী ও দু-তিন খাঁচা মুরগী একটা তাঁবুর মধ্যে হরদম হরেকরকম ঐকতানের সৃষ্টি করে। ক্যাম্পে আমরা জনপাঁচেক প্রাণী। আমি, ভল্টু, ওখানকার সার্কেল অফিসার, তাঁর পিওন এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাহের মিঞা একাধারে সে-ই আমাদের বাবুর্চি, মশালচি, আর কি নয়?

মাঝে মাঝেই নদী পার হয়ে ক্রমশ উঁচু পাহাড়ী বস্তিগুলো পরিদর্শনে আমাদের দূরে যেতে হয়, আবার হয় তো একনাগাড়ে তিন-চারদিন তাঁবুর বাইরে যাই না।

সপ্তাহে একটিমাত্র হাট রবিবার বসে। যা কিছু প্রয়োজন সাতদিনের মত যোগাড় করে রাখতে হয়। তরিতরকারী, শাক-সব্জী সবই স্থানীয়। মাছ মোটেই পাওয়া যায় না—খাসীর মাংস, মুরগী আর ডিমের আমদানিটা প্রচুর। হাটও বসে নদীর ধারেই। ওপারের পাহাড়ী বস্তী থেকেও লোকজনের সমাগম হয়—এদিককার গৃহস্থরাও তাদের কেনাকাটা করে। আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়েই হাটে যাবার পথ।

ভল্টু গিয়েছে হাটে, আমি তাঁবুর মধ্যে বসে সার্কেল অফিসারের সঙ্গে কিছু হিসেব-পত্র তৈরি করছি—ওপরওয়ালার কাছে পাঠাতে হবে। পাশ দিয়ে হেটো লোকজন হেঁটে যায়—তাদের কথার আওয়াজ কানে আসে। তাহের মিঞা ক্যাম্পের একপাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসে রাত্রের বরাদ্দ একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগীর সৎকার করছে। তার হাতে যে ছোরাখানা—তার জন্যে সে কম গর্বিত নয়। এই দিয়ে তার বাপজান না কি গণ্ডাখানেক শের খতম করেছে। পাশাপাশি তিনটে গাছের সঙ্গে আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া তিনটি বাঁধা—তার মধ্যে সার্কেল অফিসারের বাহনটি নেহাৎ নির্জীব—বহুকাল উপযুক্ত খাদ্য না পেলে যা হয়—তাই হয়েছে; অর্থাৎ পাঁজরার হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ক্যাম্পের বাইরে হস্তী-মিথুন একটা পাকুড় গাছের ডাল ভেঙ্গে নির্বিবাদে চিবিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে কুলোর মত কানের ঝাপটায় মাছি তাড়ানোর পট্ পট্ শব্দ। তাদের পায়ে জড়ানো মোটা লোহার শেকলগুলো মাঝে মাঝে ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে আর হঠাৎ এক একটা চাপা গুরুগম্ভীর আওয়াজ যেন দূরাগত বাজপড়ার শব্দের মত শোনা যায়। সব মিলিয়ে কেমন একটা একটানা ঝিমিয়ে পড়ার সুর।

হিসেবপত্র শেষ। দ্বিপ্রহরে চোখে একটুখানি ঢুল এসেছিল। সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। যেন অলক্ষ্যে কোন এক ব্যাণ্ড মাস্টার তার লাঠি ঘুরিয়ে এই বহু বিচিত্র ধ্বনির ঐকতানকে বিরামের সঙ্কেত দিয়েছে।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। আমি সজাগ হয়ে উঠলাম। দূরে দেখা গেল তিনজন লোক পাগলের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকেই ছুটে আসে। তাদের মধ্যে একটি আমাদের পিওন—তার সঙ্গে দু'জন রাখাল। মাথার চুল এলোমেলো—গায়ের জামা-কাপড় আলুথালু—ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের পাঁজরা হাপরের মত ওঠানামা করে—চোখে কেমন একটা ভয়বিহ্বল উত্তেজনা। দেখেই মনে হয়, তারা কোনও গুরুতর সংবাদ এনেছে।

ব্যাপার দেখে হাটের লোকও অনেক জমে গেল। আমরাও বেরিয়ে এলাম। ক্যাম্পেও সাড়া পড়ে যায়। হাতী দু'টো গুরুগম্ভীর সুতীক্ষ্ণ বৃংহিতে জানিয়ে দিলে—হুঁসিয়ার, সব হুঁসিয়ার। ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে শক্ত জমির ওপর ক্ষুরের আওয়াজ করতে থাকে। এমন কি খাঁচার মুরগীগুলো পর্যন্ত ঝটাপটি সুরু করে দিলে। অজ-সম্প্রদায়ের যে ক'টি অবশিষ্ট ছিল, তাদেরও তারস্বরে ম্যা-ম্যা আর্তনাদ!

ব্যাপার কি?

প্রথমটা কিছুই ভাল করে বোঝা গেল না—শুধু সমবেতকণ্ঠে একটিমাত্র আর্ত-চীৎকার কানে এল—

—বাঘ, বাঘ, বাঁচাও বাঁচাও—

যারা সংবাদ এনেছিল, সেই রাখাল দু'টি

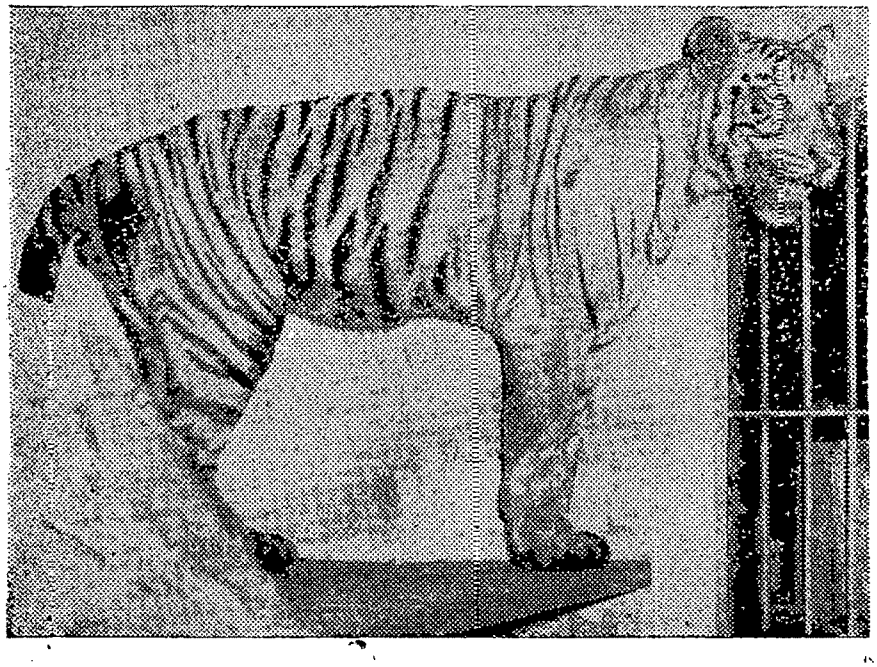

হুমড়ি খেয়ে পড়লে—তারপর শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে কোনোরকমে জানায় একটা বাঘিনী নদীর ওপারে তাদের মোষের পালে পড়েছে—তার বাচ্চাগুলো সঙ্গেই আছে।

ভল্টু ইতিমধ্যে হাট করে ফিরে এল। কাঁধের বোঝাটা মাটিতে নামিয়েই সে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপারটা কি। তারপর কাউকে কিছু না বলে সটান চলে গেল হাতীর মাহুতকে ডাকতে। ছোট মাদী হাতীটাই খুব চট্‌পটে—তাই সেটার পিঠে হাওদা চড়াতে বলে সে ঢুকে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। আমার ক্যাম্পখাটের নীচেই রাইফেল আর গুলীর বেল্ট থাকে—সেগুলি হস্তগত করে সে যখন বেরিয়ে এল, দেখলাম শিকারে যাত্রা করার জন্যে সে প্রস্তুত।

সার্কেল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর ভল্টু হাতীর ওপর সওয়ার হলাম। রাখাল দু'টিকে পথ দেখাবার জন্যে আগে আগে যেতে বলি। তারাও তখন স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে পেয়ে দলে কিছুটা ভারী হয়েছে। সবার আগে তাহের মিঞা—হাতের সেই বহু-ব্যাঘ্রনিধনকারী অস্ত্র তুলে শূন্যে নাচায় আর আস্ফালন করে—আজ বহুদিন পরে তার ভোজালিটা আবার শেরের খুনে উঁচু করবে।

বেশিদূর যেতে হল না। নদীর এপার থেকেই ওপারে একটা ধূলোর মেঘ দেখা গেল—আর অনেকগুলো ক্ষুরের সমবেত খটাখট আওয়াজ—শিং-এ শিং-এ ঘর্ষণ আর ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যায়।

ধূলোর মেঘটা কেটে যেতেই যে দৃশ্য দেখলাম—তা জীবনে ভুলবার নয়। এমন উত্তেজনা বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখি, একপাল মহিষ অর্ধচন্দ্রাকারে শিং মেলে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মধ্যে ছোট্ট বাচ্চা মোষ আর কিছু গরু-বাছুরও আশ্রয় নিয়েছে। অদূরে এক ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রী তাক্ করে বসে আছে—কখনও বা মাটির ওপর নখের আঁচড় কাটছে। ওদিকে মোষগুলো তাদের ক্ষুর ঠোকে, শিং-এ শিং-এ খটাখট আওয়াজ—চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক মাঝে মাঝেই চমৎকার অর্ধচক্র ব্যূহের রণ-কৌশল দেখিয়ে সেই ব্যাঘ্রীকে আক্রমণ করতে ছুটে যায়। ব্যাঘীও ধূর্ত কম নয়—সেও পাশ কাটিয়ে সেই মহিষ-ব্যূহের দুর্বল জায়গার সন্ধান করে। কখনও পিছিয়ে আসে, কখনও মাটির সঙ্গে বুক লাগিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে যায়, হয় তো কখনো ঝাঁপ দেবার ভঙ্গী করে—কিন্তু সে-ও যে ভীষণ উত্তেজিত, তার মুখের ভঙ্গীতে সেটা সুস্পষ্ট। কান দু'টো খাড়া, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ, একটুখানি হাঁ-এর পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে দু'কষ বেয়ে ঝরে পড়ে মূর্তিমতী হিংসার মত সেই ব্যাঘ্রী যেন জগতের ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহার জলন্ত নিদর্শন।

এই পর্যন্ত বলেই অর্জুন সেন থামে তারপর সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে—যাই বল না কেন ভাই—বাঘিনীটাকে দেখে ভারী সুন্দর বলে মনে হ'ল—যেন পরিপূর্ণ আরণ্য শোভাকে সে সঙ্গে করে এনেছে। তখনকার মত যদিও তার দেহে একটা নির্জিত:শক্তির চিহ্ন, কিন্তু ভঙ্গীটাই আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে এই দৃশ্যটি মনের পাতায় এঁকে নিচ্ছিলাম।

ভল্টু স্মরণ করিয়ে দেয়—বাঘটাকে খতম করুন হুজুর, আমাদের পাল্লার মধ্যেই আছে।

তাকে বলি—সেটা আমিও জানি—তবে কি না এটাকে এখনই মেরে ফেলব কি না ঠিক করি নি। আজ বরং থাক। কাল এই জঙ্গলে খেদা করে যা হয় করা যাবে।

ভল্টুর মুখে-চোখে অপ্রসন্ন ছবি—হাতে পেয়ে শিকার কেউ ছেড়ে দেয় না কি?

তাকে আশ্বাস দিই—এ শিকারে আনন্দ নেই। চোরের মত আড়ালে থেকে বাঘের ন্যায় একটা সেরা জানোয়ার হত্যা করার মধ্যে আর যাই থাকুক, বীরত্বের লেশমাত্র নেই—বিশেষ যখন বাঘিনীটা এক প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত।

ভল্ট চুপ করে গেল।

হঠাৎ মাহুত চীৎকার করে ওঠে—আহা-হা—একটা বাঘের বাচ্চা রে—এই না বলেই সে হাতীর গলার দড়ি ধরে ঝুলে মাটিতে নেমে পড়ল—তারপর সেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলেই জানিয়ে দেয়—মরে গেছে হুজুর—মোষগুলোর পায়ের ঘা খেয়েই বেচারীর দফা রফা।

সার্কেল অফিসার ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন—এবার মুখ খুললেন—আমার মনে হয়, আরও বাচ্চা আছে।

আমিও সায় দিয়ে বলি—নিশ্চয়, একসঙ্গে ওদের অনেকগুলো বাচ্চা হয়। সবগুলোই বাঘিনীর সঙ্গে থাকে।

মাহুতকে নির্দেশ দিলাম হাতীটাকে নিয়ে ঝোপ-ঝাড়গুলো খুঁজে দেখা যাক।

চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু হাতীটা আবার মায়ের জাত কি না, স্নেহবৎসলা কিছুতেই নড়তে চায় না পাছে বাচ্চাগুলোকে পেয়ে আমরা তাদের সাবড়ে দিই।

মাথায় ডাঙ্গশ মারতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে চলতে হয়। সামনের লম্বা কাশ-ঝোপের মধ্যেই আমাদের প্রার্থিত জীবের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা নয়, তিন-তিনটে—সব ক'টিই নর। দেখে মনে হয় ডোরাকাটা বিড়ালের ছানা—ঠিক বিড়ালের বাচ্চার মতই ফিঁচ্ ফিঁচ্ করে ওঠে।

মাহুতের কম্বলে বাচ্চা তিনটিকে জড়িয়ে নিলাম ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাজেই আর কোনও গোলমাল না করে আস্তে আস্তে সরে পড়াই ভাল। ওদিকে দর্পিতা ব্যাঘ্রী তার আক্রমণ রচনা করুক ব্যূহবদ্ধ মহিষ-যূথের বিরুদ্ধে।

ক্যাম্পে ফিরে এসেই বাচ্চাগুলোর তদ্বির সুরু হয়। একটা খাঁচার মধ্যে তাদের রেখে দুধ খাওয়ানোটা নিজের তত্ত্বাবধানেই করতে হ'ল। ভল্টুও এ সব কাজে খুব অগ্রণী। পাছে সার্কেল অফিসার ভাগ বসায়—তাই সে নিজে থেকেই হিসেব করে—

—তিনটে বাচ্চাই আমরা নেব—একটা আমার কোলে আর দু'টো সাহেবের ডাইনে-বাঁয়ে থাকবে—নইলে মানাবে কে?

তাকে বাহবা দিই বেশ চুলচেরা হিসেব যে শুভঙ্কর হার মেনে যায়, কি বল?

সমস্ত রাত বাঘিনীর ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে সমস্ত বনভূমি বিকম্পিত। আমাদের চোখেও ঘুম নেই।

আর একটা দিনের মামলা। আগামী কালই হয় তো তার নির্বাণপ্রাপ্তিযোগ।

বাধা দিয়ে বলি—

—বাচ্চাগুলোর কি করলে শেষ পর্যন্ত ?

—কেন ? সেগুলো গোকুলে বাড়তে থাকে। তবে তাদের জন্য একটা ছাগল পুষতে হ'ল। কারণ বাচ্চাগুলোর জন্যে একটা ধাই-মা চাইতো। প্রথম প্রথম ছাগলটা ভয় পেত, পরে সেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠল আর শিং বাঁকিয়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলা করত।

দু-মাসেই বাচ্চা তিনটি এমন তাগড়া হয়ে উঠল আর এমনি তাদের খিদে যে, দিনে ছ'টা করে পাঁঠা তাদের জন্য বরাদ্দ।

ছ-মাস বাদে যখন তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরি, সে এক দৃশ্য। সাহেবগঞ্জে ফেরী ষ্টীমারে পার হতে গিয়ে রাজ্যের লোক আমাকে প্রশ্ন করে, জ্যান্ত বাঘ কোথায় পেলেন, ওরা কামড়ায় কি না, মানুষ খায় কি না—এমনি সাত-সতেরো প্রশ্ন।

কলকাতায় আসার পর একদিন একটা বাচ্চা মরে গেল। অসুখ হওয়ায় তাকে মাংসের বদলে দুধ দেওয়া হয়েছিল—সেটাই নাকি তার মৃত্যুর কারণ। আর দু'টো বাচ্চা খুব তেজী আর দেখতে খুব সুন্দর। এ-দু'টোকে নিউ মার্কেটে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে দিলাম। কেই বা দেখে আর কেই বা ওদের তত্ত্বাবধান করে! জানই তো আমি চিরদিনের যাযাবর। তখন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত, তা হলে আর এমন অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া করতাম না।

এই বলেই অর্জুন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

অর্জুনকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে বলি—যাক গে বাঘের বাচ্চার কথা—সেই বাঘিনীর কি হ'ল, সেটা বললে না ?

—নিশ্চয়, বলব বৈ কি। সে এক বীভৎস কাণ্ড—কি যে হয়রানি আর বিপদ একের পর এক আমার জন্যে জমা ছিল!

তার কথায় সায় দিয়ে বলি—সে তো হবেই—বাচ্চাগুলোকে গায়েব করার ঠ্যালা সামলাতে হবে না ?

অর্জুন বলে যায়—শুধু বাচ্চাদের টানেই বাঘিনীটা ঘোরাঘুরি করছিল, তাই তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের কোনও কষ্ট হয় নি—বরং তাকে ঘায়েল করতে গিয়ে আরও একটা ফাউ পেয়ে গেলাম।

আমার চোখের দৃষ্টি জোরালো হয়ে ওঠে—

—আরও একটা বাঘের বাচ্চা—?

—না, বাচ্চা নয়, তার বাবা!

—বাবা কি জ্যেঠা, তুমি কি তার কোষ্ঠী বিচার করেছ ?

অর্জুনের সাফ জবাব—সে গবেষণায় তোমার কোনও লাভ নেই—ঘটনাটা এখনই শুনতে চাও না মুলতুবী থাকবে ?

—সে কি কথা ভাই ? বাঘিনীকে হাতের কাছে পেয়েও শিকার করলে না—আবার এখন বলছ কি না মুলতুবী থাক ? আমার কিন্তু 'নাউ অর নেভার'—

—বেশ তবে শোনো!

উত্তেজনায় ভাল ঘুম হয় নি। তারপর হাতীর পিঠে উঁচুনীচু জমির ওপর ছুটোছুটি করে গায়ে-গতরে ব্যথাও হয়েছে। পরদিন বিছানা ছাড়তে একটু বেলাই হয়ে গিয়েছিল।

বাইরে এসে দেখি আমার সদাপ্রস্তুত ভল্টু মহারাজ সব দিকেই তৈরি। হাতী দু'টোকে খাইয়ে নেওয়া হয়েছে, মাহুতও বাদ যায় নি। আশ-পাশের জনা-ত্রিশেক লোকও হাজির—তারাও লাঠি-সোঁটা ক্যানেস্ত্রা টিন নিয়ে প্রস্তুত। নিজেও সুসজ্জিত—শুধু আমিই বাকি। সার্কেল অফিসার সাহেব যাবেন কি না জিজ্ঞেস করতেই ভল্টু টিপ্পনী কাটলে—তিনি তাঁবুতে নেই—জরুরী কাজে সদরে গিয়েছেন।

—বেশ করেছেন। কিন্তু তাহের ? তারও কাজ পড়ে গেল না কি ? সেও পালিয়েছে ?

তাহের হাসিমুখে এগিয়ে আসে—আজ্ঞে না হুজুর, বান্দার হাতে এই পৈতৃক ভোজালি থাকতে, সে কোনও শেরকে ডরায় না।

—বেশ আমাকে আধ ঘণ্টার সময় দাও, আমি একেবারে তৈরি হয়ে আসি।

চিরপ্রথানুযায়ী ভল্টু আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। পোষাক পরানো, চা-খাবার দেওয়া সব কিছুই সে নির্ভুল-ভাবে করে গেল।

আমরা হাতীর পিঠে রওনা হলাম। সঙ্গে লোকজন। সেই জলহীন শীর্ণকায়া নদীর পারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে তাহের ওপারে গিয়ে জঙ্গল বিট করার বন্দোবস্ত করে। আমরা নদীর খাত পার হয়ে ওপারে গেলাম।

সামনে খানিকটা অনুর্বর এবড়ো-খেবড়ো জমি, তারপরই আসল জঙ্গল। তারই এক-পাশ ঘিরে উল্টোদিক থেকে খেদা আরম্ভ হল। হাতী দুটো চালিয়ে আমি ও ভল্টু জঙ্গলের মুখে এসে পড়লাম।

তখন বেলা দশটা। জঙ্গলের ভেতরটা আমাদের কারও ঠিক জানা ছিল না। তাই হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে ভল্টু ইতস্তত করে।

আমি তাকে চাঙ্গা করে তুলি—সে কি রে ? এতদূর এসে কি ফিরে যাব ? আর হলই বা অচেনা—তবু হাতে বন্দুক থাকতে ভাবনা কিসের ? এদিককার জঙ্গল তো আর ডুয়ার্সের মত নয়—দেখ না সামনেই খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া জলার মত। আশ-পাশের ঝোপগুলোও তেমন বড় নয় যে বাঘ ওরই মধ্যে লুকিয়ে থাকবে।

আমার কথা শেষ হয় নি, এমন সময় আমার হাতীটা হঠাৎ শুঁড় তুলে গুর্ গুর্ আওয়াজ তুললে। আমিও বন্দুক নিয়ে তৈরি—ভল্টুও কাঁধের ওপর হাতিয়ার তোলে।

আচমকা দেখা গেল ভল্টুর হাতীর বাঁ-পাশ দিয়ে কি একটা জানোয়ার বিদ্যুতের মত সামনের ঝোপে ঢুকে পড়ল। বিটাররাও ততক্ষণে এসে পড়েছে। সেই হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজে সেই জানোয়ারটা যেই না বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই আমারও গুলী। ছিটকে পড়ে সেটা মাটির ওপর গড়াতে লাগল। আমার গুলীটা লেগেছিল কাঁধে—ভল্টুর গুলী তার কানের পাশ দিয়ে মাথার ভেতর চলে যেতেই তার সব ছট্‌ফটানি বন্ধ।

কাছে গিয়ে দেখি, একটা লোমওঠা বুড়ো বাঘ—বীভৎস মুখভঙ্গী—কানের পাশ দিয়ে রক্তের ফিনকি!

বাঘটাকে বেঁধে অপর হাতীটার ওপর তোলা হতেই আবার আমরা এগিয়ে গেলাম।

সেই বাঘিনীটা কোথায় ? তাকে না পেলে তো আজকের শিকারই বৃথা।

লোকজন তেমন বেশি না থাকায় জঙ্গলের একপাশ খেদা করা হয়েছিল। তবে কি তাড়া খেয়ে বাঘিনীটা অন্যদিকে গা ঢাকা দিয়েছে ?

মনের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—অসম্ভব! হতেই পারে না!

বুড়ো বাঘটা যখন এদিকেই আছে—সন্তানহারা বাঘিনীটা এ তল্লাট ছেড়ে যেতে পারে না। হয় তো কোন একটা ঝোপের মধ্যে বসে তার দুষমনদের আক্রমণ করার মতলবে আছে।

বিটারদের আদেশ দিলাম,—আর এক চোট খেদা করে যাও। প্রত্যেক ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে দেখ।

নতুন করে খেদা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের মধ্যে আবার সেই ক্ষুব্ধ গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতী দু'টোও দাঁড়িয়ে যায়।

চতুর্দোলা

বনফুল

আকাশের চাঁদ পেড়ে যখন
পুরে ফেলতাম পকেটে,
সূর্যদেবকে ঝুলিয়ে দিতাম
ঘড়ির চেনের লকেটে,
বিনা 'প্লেনেই' অনায়াসে আকাশেতে উড়তাম,
বিনা আঠায় অবহেলে অনেক কিছু জুড়তাম,
তখন আমার গোঁফ ওঠে নি
বয়স ছিল অল্প,
সত্য ব'লে মেনে নিতাম
অনেক কিছু গল্প।

ক্রমে ক্রমে বাড়ল বয়স,
প্রমাণ পেলাম ভুরুতে
মন বললে, ওরে ছোকরা
ভুল করেছিস শুরুতে।
নিঃসম্বল হ'য়ে এবার গলা ছেড়ে খুব কাঁদ,
শোন রে বাবা, স্বপ্ন বাজে—আসল কথা রূপচাঁদ!
এটা তোকে বুঝতে হবে
আবিলম্বে, বুদ্ধু,
নইলে কাঁদবে তোর দুঃখে
শেয়াল কুকুর সুদ্ধু।

মরিয়া হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম
ব্ল্যাক-সমুদ্র-সলিলে
রূপচাঁদকে বেঁধে ফেললাম
বাক্সে, ব্যাঙ্কে, দলিলে।
কিন্তু এসব করতে গিয়ে তুবড়ে গেল গাল টাল
জুতো খেয়ে গুঁতো খেয়ে উঠল পিঠের ছাল টাল
জুটল অনেক ইয়ার বক্সি
হ'ল অনেক 'মচ্ছপ'
হ'য়ে গেলাম ক্রমে ক্রমে
জবু-স্থবু কচ্ছপ।
'প্রেসার' এবং ডায়াবিটিস্
গেঁটে বাতের কৃপাতে
খেতে পাই না মাছ মাংস
আলু কিম্বা ঘি-ভাতে
দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে করি ছট্‌ফট্
সারা অঙ্গে সারা মনে ঝনঝন্ আর কট্‌কট্!
এমন সময়, কি আশ্চর্য,
এলেন আবার স্বপ্ন
সোহাগিনী নাত্নী এসে
হলেন কণ্ঠ-লগ্ন!
টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে, চুমু দিলেন গণ্ডে
বাঁধা প'ড়ে গেলাম আবার নতুন রকম 'বণ্ডে'।

জঙ্গল তচ্‌নচ্ করে বিটাররা ক্যানেস্তা টিন বাজিয়ে চলে। সেই হট্টগোলে আমাদেরই মাথা গরম হয়ে যায়—বাঘের মেজাজ আর কতক্ষণ ঠিক থাকবে। কাজেই, নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা তার নিষ্ফল হয়ে গেল—ক্রুদ্ধ বিক্রমে 'রণং দেহি' মূর্তিতে সে ঝাঁপিয়ে বের হ'য়ে আসে একটা বেতের জঙ্গল থেকে—আমাদের কাছ থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে। সে জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা ছিল বলেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। জোরে হাতী চালাতে আদেশ দিলাম। তখনও প্রায় আশি গজ দূরে—কিন্তু সেই ধূর্ত জানোয়ার কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এদিক-ওদিক লক্ষ্য করি—কোথাও দেখতে পাই না। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে 'বাঘ, ঐ বাঘ' চীৎকার শুনে অনেকখানি আশা ফিরে পেলাম। যেদিক থেকে চীৎকারটা আসছিল, আমার হাতীটা সেদিকে দু'দশ পা এগিয়ে যেতেই চমৎকার দৃশ্য! বেশ বড় একটি ডোরাকাটা জানোয়ার গুঁড়ি মেরে একটি ছোট ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু তার মেজাজটা যে রীতিমত খারাপ-মুখের বিকৃতি আর দাঁত বের করে ভ্রূকুটি করার মধ্যেই তা বেশ টের পাওয়া গেল।

ভন্টু হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—ঐ বাঘ, ঐ বাঘ, গুলী করুন।

বলতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময় দিয়েছিল সেই জানোয়ার। পলকের মধ্যে সে ঐ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে আসে—মরণযুদ্ধে সে যেন শেষ আঘাত হান্‌তে চায়। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই! আমিও আর কালবিলম্ব না করে এক সঙ্গে দু'টো গুলীই ছেড়ে দিলাম।

আমার প্রথম গুলীটা লাগলো বাঘের পায়ে—আহত হয়ে মাটির ওপর ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়তেই দ্বিতীয় গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। ভন্টুর বন্দুকটা হাতে তুলে নিতেই দেখি সেই জানোয়ার আহত হয়েও বীরবিক্রমে ছুটে আসে। তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে—মুখে বিকট ভঙ্গী—যেন মূর্তিমতী প্রতিহিংসা তার সর্বাঙ্গে। হঠাৎ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই আমার তৃতীয় গুলী তার গলায় মোক্ষম আঘাত করলে, ছিট্‌কে বাঘটা মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল—তারপর সব ঠাণ্ডা! ভন্টু উৎসাহের আতিশয্যে হাতীর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। তার হাত ধরে থামিয়ে দিই—ওদিকে বিটাররা নিহত বাঘের কাছাকাছি আসতেই তাহের মিঞা ছুটে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

তারপর তার ভোজালীটা বাঘের রক্তে ভিজিয়ে নিয়ে পরম উল্লাসে প্রচার করে।

বহুদিন পর তার পৈতৃক হাতিয়ার শেরের খুন পান করে ঠাণ্ডা হ'ল।

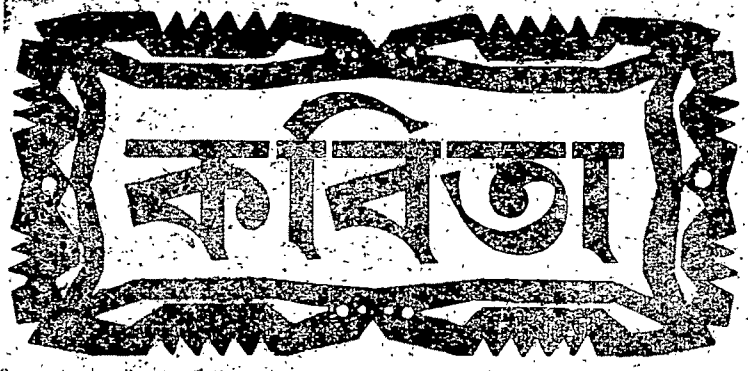

নাস্তিক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মানুষই তোমাকে গড়িয়াছে প্রভু,
তুমি তো মানুষ গড় নি,
ধরণীতে নেই মানুষ,—রয়েছে
মানুষের মনে ধরণী।
ভুবনের লোকে ভূয়া ভোট দিয়ে,
তোমারে ভবেশ সাজায়েছে কি হে?
বোঝাই বহিছে তরণী রে হায়—
বোঝা বহে না তো তরণী।

তুমি কল্পনা, জল্পনা তুমি,
নাহিক তোমার কিছু নাই,
শুনি আনন্দে হাততালি দিই
ঘৃণা লজ্জায় মরে যাই।
বুদ্বুদ দিই সাগরে উড়ায়ে,
সূর্য ফেরেন আলোক কুড়ায়ে,
পদ্মনাভের চরণ ছাড়িয়া
উর্ণনাভের কাছে ধাই।

অনেক ঠেকিয়া—ঠেকিয়া শিখেছি
তুমি ছাড়া আর কিছু নাই
কালের জীবাণু এতো ফেঁপে উঠে
মানিতে চাহে না দরিয়াই।
তোমার ইচ্ছা বিনা জানি খাটি,
পড়ে নাক জল, ঝরে না পাতাটি,
বিরাট বিপুল তোমার মহিমা
ভাবিয়া কি তার সীমা পাই?

পলাতক

কান্তা দাশ

আমি চলে যাব
শুধু বলে যাওয়া হবে না—
এই পৃথিবীতে কেন এসেছি,
রাতের স্বপ্ন নিয়ে
ফুলের গন্ধ দিয়ে
চুপিচুপি কারে ভালোবেসেছি
আমার ঠিকানা শুধু
হতাশায় হোলো ধূ-ধূ
পথ চলা জীবনের সাঁঝে,
পেয়েও পেলাম না
স্নেহের এক কণা
ব্যথাভরা, দিনগুলোর মাঝে।
নীড়ের শীতল ছায়া
আনে কই কোমল মায়া
মনের শিশির-ভেজা ঘাসে,
ষোড়শী লাজুক মেয়ে,
স্বপ্নে অবাক চেয়ে
এলো কই, জীবনের এই মধুমাসে।
চাওয়া আর না চাওয়ার
পাওয়া আর না পাওয়ার
হিসাব মিলাতে আজ, মন চায় না,
সোনালী স্বপ্ন দেখে
ভোরের আলো মেখে
বাঁচার ঠিকানা তাই, খুঁজে পাই না।
তাই এই পলাতক মন
ক্ষয়ে ক্ষয়ে অনুক্ষণ
ঠিকানা না রেখে, শুধু যাবে হারিয়ে,
রাতের স্বপ্নে দেখা
ফুলের গন্ধে লেখা
চুপিচুপি, এই পৃথিবীর মায়া ছাড়িয়ে।

বিষাদিনী, তুমি আছ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বিষাদিনী, তুমি আছ সজল রাতের এলোচুলে
নির্বাপিত শ্রাবণ সন্ধ্যায়। দিকে দিকে কালো মেঘে
দিক দিগন্তরে ব্যাপ্ত অশ্রুনীল মায়াবী ছলনা।
শ্রাবণমন্থিত এই রাতগুলো মৃত্যুহীন বড়ো ভয়ঙ্কর
এবং যুবতী যেন একগলা জলে বুক রেখে
সুডৌল স্তবক দু'টি ঢেকে রাখে সান্ধ্য আবরণে,
রাঙ্কিত পায়ের শব্দে কোথাও এলো না কেউ দেখে
শ্রাবণ রাত্রির কান্না ঠোঁটে নিয়ে কাঁপল অধর।

কয়েক হাজার রাত কেটে গেল অশ্রান্ত নির্ঝরে,
যে-কেউ প্রেমিক আছ বুকে নিয়ে অন্ধ তমসার
বিনিদ্রিত বন্যাবেগ, ভীষণ তৃষ্ণার প্রহরের
ম্লানতার পাঠ শেষে দেখে যাও রহস্য-অতীত
অনিণীত পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ প্রাচীন দেয়ালে,
প্রাচীন বৃক্ষের ডালে, ভগ্নমন্দিরের রুদ্ধদ্বারে,
হাজার রাত্রির কান্না থেমে আছে দৃশ্যের আড়ালে।

সারারাত থমথমে, অন্ধকার গতজাগরণে
ঢেউয়ের মতোই আবর্তিত। পক্ষীরাজ অশ্বহীন
কর্দমাক্ত পথে হেঁটে রাজপুত্র হাজার দেশের
অস্থির উজানে ভেসে কোথায় উধাও পথ ভুলে;
বিষাদিনী, তুমি আছ সজল রাতের এলোচুলে॥

স্বাদ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কী অসহ্য সবুজ !
গভীর নীলাভ মনের সর্বাঙ্গ অবুঝ।
ফুল ফুটলো কী মাঠে মাঠে ঘাস
তোমার মনের কাছে পৌঁছয় কোনো আশ্বাস ?
হেলেনের মন
তাই নিয়ে ভাববো কখন ?

চুড়ি-পরা হাত
আঙুলেতে বিন্দু-বিন্দু হলুদের স্বাদ।
চোখে পড়ে কোঁকড়ানো ঝরা
কয়েকটি মাথার চুল
আনমনা করে এক কুড়ি ও কোমলে।
হেলেন ! তোমার মন কোন সে অতলে ?

অতলে সিন্ধুর স্বাদ। মাছের মতন
কত প্রজাপতি ঘোরে। অরূপ রতন
থেকে গেছে তোমার ও দু'চোখ তারায়
প্রাণ আর হৃদয় কি সেখানে হারায় ?

পথ

বাসব ঠাকুর

অন্ধকার রাজপথ
কর্দমাক্ত করুণ পিচ্ছিল
ইনক্লাব জিন্দাবাদ
শুনি শুধু আর্তনাদ
অন্ধকার রাজপথে
কঙ্কালের চলেছে মিছিল।
অন্ধকার রাজপথ
কাল সর্প-সম সরীসৃপ
শুধু চাই সব চাই
তবু কিছুই যে নাই
অন্ধকার পথপ্রান্তে
জ্বলে শুধু আকাঙ্ক্ষার দীপ।
একদিন এই পথে
চলেছিল জীবন্ত মানব
অদৃশ্য হয়েছে তারা
অন্ধকারে চলে কারা ?
চতুর্দিকে আবর্জনা
পূতিগন্ধ বিগলিত শব।

যন্ত্রণা

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

শিল্প সাধনার অদৃশ্য মেঘ মিনারে
জীবনের প্রতিটি প্রহর,
চুপিচুপি হলো যেন, যন্ত্রণার রক্তাক্ত সিন্ধু।
ব্যর্থতা, প্রেম, অক্ষমতারা,
অস্থির, পঞ্জরাস্থিত একটা নতুন সংঘায়
জীবনের মাঝে বাঁধে
কুয়াশার কাঞ্চনজঙ্ঘা।
আজ
জীবনের অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষারা
প্রহরে প্রহরে
কর্তব্য, স্বপ্ন আর অবিশ্বাসেরা,
দুর্জয় হতাশার দুরন্ত বোধে
অগ্নিক্রোধে
হৃদয়ের উৎকল বহ্নি
জ্বালমুখী শপথ জাগায়।
তাই
জীবনের প্রতিটি নতুন ভোরের
পথে যেতে যেতে শুধু থেমে,
আমি আসি নেমে,
তিমির যন্ত্রণার, যন্ত্রণাময় ক্ষেত্রে।
সেই যন্ত্রণার
পদধ্বনি জাগে,
জ্যোতির্ময় আলোর ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার···
হিংস্র-হিংস্রার পুরোভাগে।···

গীটার বাজে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নুন বার্গে রাত্রি এখন, গীটার বাজে।
দীপ নিবু-নিবু রাইনের তীরে, ব্যবসা শেষ;
এলবে নদীর খাঁড়িতে নেমেছে তন্দ্রা বেশ!
মৌন হয়েছে মুখর দিনের বাণিজ্য-বন্দর।
গীটার বাজে॥

বীচ-পাইনের অরণ্য আর অসংখ্য হ্রদ জুড়ে
সুরের কান্না ব্যাকুল করেছে মালবেরি-মর্মর,
জুরা পাহাড়ের উপত্যকায় উইলো বেঁধেছে ঘর,
গিরিখাত বুঝি ভরে যায় কোন্ মিঠে অতীতের সুরে।
গীটার বাজে।।

ঝিরিঝিরি হিম ঝরছে রাতের তুষার হয়ে,
আইভিলতার বেড়া দিয়ে ঘেরা পাশের বাড়ি।
জানলায় তার কাচের শার্সি, গ্লাসের সারি!
আলপনাগুলি নিবিড় হয়েছে বাষ্প বয়ে।
গীটার বাজে।।

পাহাড়তলীর কোন্ বিরহিণী হেলিয়ে মাথা
শুনছে জীবনে অনাগত এক গ্রীষ্ম-গাথা।
দ্রাক্ষাবনের লক্ষ্যবিহীন দ্বীপের মাঝে
সূর্যমুখীর গুচ্ছ সেজেছে পপির সাজে।
গীটার বাজে।।

প্রথমা

জয়ন্তী সেন

কারো এক অস্পষ্ট কি নাম শুনেছিলাম—
তারপর আর মনে নেই
অক্লান্ত নদীর মত বিস্মরণ যেচে
সব স্মৃতি মুছে নিয়ে গেছে
দর্পণে নূতন ছায়া বুকের কাছেই।

তবুও অস্থির মেঘে
যত রঙ লাগে
সোনালী আলোর সুতো পাক খেয়ে ছড়ায় আকাশে—
সকালের ভিজে নীল ঘাসে।
সুখ যত হয় গাঢ়তর
মনের গভীরে আর কারো
কাছাকাছি স্পর্শটুকু পেলে—
অথবা বিকেলে
সন্ধ্যার আসন্ন মুখে ধূসর ভাষায়
যে বেদনা ভাষা খুঁজে পায়।
সবখানে দেখি সেই নামের স্মৃতিরা
ফুলেতে সুগন্ধ সুখ—আকাশেতে তারা।

মধ্যরাত্রি

কৃতী সোম

আকাশ এখন স্তব্ধ মধ্যরাত্রে বর্ষণের পর
ক্লান্তির আবেশে মগ্ন। চাঁদ গলে, জোনাকির ঝাড়ে
আলোর ফুলেরা জ্বলে। থেমে আসে বনের মর্মর
পাখির করুণ ডাকে শ্রান্তি নামে সবুজ পাহাড়ে।
ঘাসের নিবিড় বুকে শিথিলিত জ্যোৎস্নার বন্ধনে
ঝরে ঝরে ক্লান্ত হলো অবসন্ন শিশিরের মন।

মধ্যরাত্রি ঠিক যেন জীবনের উত্তর-তিরিশ।
প্রথম ফাল্গুনী শেষ সেদিনের দহন-বর্ষণ
একদিন মনে হতো যতকিছু অজস্র আশীষ
আজ তাতে যবনিকা। অন্যকিছু অন্য কোন মন
তোমার শরীরে নিয়ে কাছে এসো আজ, হে রমণী
শুধু এই ঝরে-পড়া, মদালস, অকৃপণ ক্ষণ
আমাকে বিহ্বল করে, আমাকে আবিল করে জানি।
এ-আকাশে কত মেঘ, থেমে যাক পুরনো স্খলন
নবতন রূপ এনে ঢেউ দাও জীবনের উত্তর-তিরিশে
মধ্যরাত্রে তন্দ্রা আসে অবিমিশ্র বাসনায় মিশে।

তৃতীয় ছায়া

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কেন কণ্ঠ রোধ করে বসে-থাকা···সামনের আগুনে
রুটি সেঁকেছিল কালো গ্যাঙের কুলিরা;
আজ শুধু প্রশস্ত বাগান কোন তাপসী সন্ধ্যার,
ভালবাসা-গান গেয়ে নেচে নেচে নেমে যায় নদী···
আমার দু'চোখে কয়লা আর একবার পড়ুক, পড়ুক,
ঝুঁকে-আসা কোমলতা, মানুষের দেহের সৌরভ
প্রসাধনদ্রব্যেও দুর্লভ।
কণ্ঠ রোধ হয় নি তখনো, আমি বহু আত্মহত্যাও দেখেছি
কণ্ঠ সর্পাকিত···আমি স্বরে ভেসে গিয়ে
অপ্রকৃতিস্থের মত ছোটগাড়ি মাথা নেড়ে চলি
বামনের হেঁটে-যাওয়া যেমন রাস্তায়—
দুই কণ্ঠ ছিল ঐ আগুনের এপারে ওপারে,
দেখি নি উনুনে ছিল স্বরবিদ্ধ তাজা মুর্গিটা যে,
মুর্গির রেশমী গলা পুড়ে যেতে দেখে
তৃতীয় ছায়ার মত স্মৃতি দুঃখ আরো এক মুখের আকারে
বিভেদ রচনা করেছিল সেই আগুনের এপাশে ওপাশে।

তন্বী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

খরস্রোতা নদী যেন তোমার যৌবন
তন্বি, তুমি জান না তা,'—শুধু তব মন
প্রতীক্ষার সিন্ধুতটে যায় ছুটিবারে,
শ্যামস্বপ্ন নেমে আসে স্রোতের কিনারে।
কভু ছুটে যেতে যেতে স্তব্ধ হয়ে রও,
নিশীথ রাত্রির তন্দ্রা ভেঙ্গে কথা কও।
ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে কত ছল ছল ভাষে
কুড়াইয়া লও ফুল যা'রা উড়ে আসে।
তন্বি, তুমি জেগে থাক অলস শয়নে
বিস্তীর্ণ বালুর তটে, সেথা কলস্বনে
কাহারে ডেকেছ পাশে? চঞ্চল যৌবন
অর্ঘ্য দিতে চাও কারে? তটে মৌ-বন
কি তৃষ্ণা লুকায়ে রাখে? তবু জাগে ভয়,—
কখনো তোমার স্বপ্ন এ জীবনে যদি মিথ্যা হয়!

জানালাটা খুলে দাও

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

জানালাটা খুলে দাও
একবার ভালো ক'রে আকাশটা দেখি।
সুনীল আকাশে সেই সাদা সাদা মেঘ ভেসে যাওয়া
কতোদিন দেখি নি যে। জানালাটা খুলে দাও,
একমুঠো সোনারোদ ভিতরে আসুক।

আমরা প্রত্যেকে বন্দী আজীবন হ'তে
কেউ বা পিঁজরে বদ্ধ পাখিটার মতো
গৃহকোণে বন্দী থাকে। মুক্তিকামী মন তার
আকাশের শূন্যনীলে উড়ে যেতে গিয়ে
বারবার রক্তাপ্লুত খাঁচার বন্ধনে।
নিয়মিত রুটিনের নিবিড় বাঁধন
দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে অসংখ্য মানবে
কল-কারখানা স্কুল
অথবা অফিসে। সমস্যায় জর্জরিত
কর্মক্লান্ত এ মনের নিষ্কৃতি কোথায়!

বাইরে উন্মুক্ত মাঠে নীলিমার নীচে
সবুজের সমারোহ। অজস্র ফুলের মাঝে
ছোট ওই ঘাসফুলটিও
খুশিতে উচ্ছল। একটা দখিনা হাওয়া
প্রাণে যদি সুর ডেকে আনে
তাহ'লে আবদ্ধ ঘরে মিছে হবে অবরুদ্ধ থাকা।

তার চেয়ে এসো আজ মুখোমুখি বসে
সকল বন্ধন-ব্যথা সাময়িক ভুলে
একান্ত নিবিড় হ'য়ে—ক্ষণিক হ'লেও
জীবনকে জেনে নিই প্রীতির উত্তাপে।
এবং একবার,
প্রকৃতির নগ্নরূপ যদি তুমি ছাখো
জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরে তাকাও।

বিস্মৃত অতীত

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

বীতকাম, বীতস্পৃহ, বিগত দিনের স্মৃতিগুলি,
কিলবিল করে ওঠে, মস্তিষ্ক কোটরে শুধু ছোট ঢেউ তুলি।
এরা বুঝি স্মৃতি নয়, এরা সব অতীত-বীজাণু আর রোগ বংশধর।
কুরে কুরে ধ্বংস করে যৌবনের রোমাঞ্চিত সর্বতাপহর—
শুচিস্নিগ্ধ স্বপ্নগুলি। তমসার গুহামাঝে অরণ্যের শ্বাপদের দল—
অক্টোপাস বাহুগুলি দ্বিগুণ শক্তির ভরে খুলে শতদল,
সুপ্তিভঙ্গে জেগে ওঠে, হিংস্রদংষ্ট্রা ক্রূর ফণা মেলে।
দেহমন দগ্ধ করে মৃত আর বিশ্বাসের তীব্রদাহ জেলে।
তাই বলি হে অতীত, সসম্মানে থাক তুমি দূরে,
জীবাশ্মের মত থাকো, অচিন-অচেনা কালো বিস্মৃতির পুরে।
চলমান হৃদয়েতে নাই দিলে দেখা, অভাঁকিত হানা।
কি লাভ শিবের গীতে, শুধু শুধু পণ্ড ধানভানা,
সুখ-দুঃখ লাজে-ভয়ে হোক না সে প্রবল জর্জর—
কিংবা যদি ভগ্নপ্রায়, হতাশার উন্মত্ত বর্বর,
ছেড়ে দাও হে বিস্মৃতি, নিয়তির লিপিবদ্ধ ধামে।
যেখানে গরল সাথে আজও কিছু অমৃতও নামে।

এই মন

করুণাময় বসু

এই মন পদ্মপাতা,—জীবনের গভীরতা ছোঁয়
বাসা ভাঙা পাখিদের ডানা ঝরা সোনার আলোয়।
পথের প্রীতির সুর, আকাশের নক্ষত্র পিপাসা
মধুমতী নাম নেয়, তারি নাম বুঝি ভালোবাসা!
বকুলের মরাপাতা, শ্রাবণের কান্নাভরা চাঁদ
বিকেলের ছায়া হয়, চাঁপাবনে গন্ধ হয়ে
অন্ধকারে মিলায় হঠাৎ।
তবু ভাবি একদিন হৃদয়ের সুর হ'তে সুরে
ভালো লাগা গানগুলি জোনাকির পাখা হয়ে ঘুরে
বকুলের পাতা ঝরা ছন্নছাড়া বিষন্ন শ্রাবণে;
জ্বলে নেভে কথাগুলি ফুলেন পাপড়ি হয়
আলোছায়া ঝিলিমিলি চামেলির বনে।

এই মন মনে হয় বৃহত্তর আকাশ বিস্তার:
এ জীবন পার হয়ে অন্য এক জীবনে সে করে পারাপার।
সেখানে কি সুর নেই, গান নেই, শুধু আছে সমুদ্রের ঝড়;
অলস মায়ার মতো মনে হয় বহুদূরে শান্ত এক দ্বীপের স্বাক্ষর।
যে দ্বীপ চোখের মতো জল মোছে, জেলে মমতা প্রদীপ;
যে দ্বীপ সন্ধ্যার মেঘে মনে হয় প্রেয়সীর একফোঁটা কাঁচপোকা টিপ:
সে দ্বীপ এখনো টানে, মনে মনে ভালোবেসে কুঙ্কুম ছড়ায়,
অলস মেঘের রঙে রাঙা হয়, কার যেন মুখ হয়,
জ্যোৎস্নারাতে ফুল হয়, হীরের জোনাকি হয়,
প্রজাপতি-পাখা হয়ে চৈত্র শেষে ফুলঝরা চম্পাবনে
কোথায় হারায়?

দেশসেবিকা, সমাজসেবিকা, লোকসেবিকার প্রতিমূর্তি, বর্তমানে একানব্বই বৎসরবয়স্কা পুরুষোত্তম-প্রবাসিনী,—এখনও সেবাকার্যে নিযুক্তা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর,—শান্তিনিকেতনের 'বড়মা'।

এই বড়মাকে জানতে হলে যেতে হবে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে, অথবা তারও পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার স্বনামধন্য অ্যাটর্নি স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে, কারণ তাঁরই সহোদরা তিনি। তাঁদের পিতা ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—মাতা ৺লক্ষ্মী দেবী। পিতামহ সেকালের প্রচলিত কুসংস্কার-মুক্ত উদারহৃদয় শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় এবং পিতামহী বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতি দেবী। মনে হয় বড়মার বড় মন ও জীবনভোর সমাজসেবী কাজের উৎসাহ ও প্রেরণা উভয়কুল থেকেই প্রাপ্ত সহজাত।

বাড়ির পুত্রস্থানীয় শিশু এবং আমলা-কর্মচারী পরিজনের তিনি তখন থেকেই 'বড়মা'। প্রতিদিনের বৃহৎ যজ্ঞের কাজের মত কুটনো কোটা, ভাঁড়ার দেওয়া প্রভৃতি পরিচালনা করার ভার এসে পড়ে তাঁর উপরে বিবাহের পর থেকেই,—তিনিও হাসিমুখে অক্লেশে বহন করেন ঐ বিপুল দায়িত্ব। বাড়ির মানুষের সুষ্ঠু সেবায় হাত পাকিয়ে শুরু হয় তাঁর সমাজসেবার কাজ—পরার্থে আত্মদান।

তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা,—স্বামী দ্বিপেন্দ্রনাথের অকালমৃতা প্রথমা পত্নীর দু'টি শিশুসন্তানকে অপত্য-স্নেহে অঙ্কে ধারণ। এই দু'টি সন্তানের একটি কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সুরের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ও অপরটি তাঁর ভগ্নী নলিনী দেবী। তাঁদের তিনি ছিলেন স্নেহময়ী জননী—'ছোট-মা'।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দে শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত হেমলতা দেবী প্রণীত গল্পগ্রন্থ 'দেহলি'তে দেখা যায়—'দিনু ও নলিনী'কে উৎসর্গ-পত্র, তাদেরই উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন এই সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ গল্পের বইখানা।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন,—কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথও আশ্রমবাসে আকৃষ্ট হয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ির ঐশ্বর্য ত্যাগ করে এসে স্থানগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন,—শান্তিনিকেতনের 'নীচু-বাংলোয়'। ঐ বাড়িটি ছিল শান্তিনিকেতনের উঁচু-নীচু জমির একটু নিম্নভূমিতে, তাকে বলা হত 'নীচু-বাংলো'। তাঁদের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের খোলা মাঠের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, মাঝে মাঝে এসে এখানে থাকার জন্য এই একতলা ছোট বাংলো বাড়িটিই করান সর্বপ্রথম। তারপর দোতলা বড় বাড়ি 'শান্তিনিকেতন-ভবন' নির্মাণের পর পূর্বের ছোট বাড়ি নীচু-বাংলো পরিত্যাগ করে এসে বড় বাড়ি শান্তিনিকেতন ভবনে বাস করেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হবার কিছুকাল পরে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নীচু-বাংলোর জীর্ণ-সংস্কার এবং কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ হেমলতা দেবীসহ এসে বাস করেন নীচু-বাংলোয়,—এবং জীবনান্ত পর্যন্ত এখানেই থাকেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিপেন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শান্তিনিকেতনে,—সেই সূত্রে বর্তমানে (১৯৬৪) পুরী-প্রবাসিনী বড়মা বললেন,—আমারও একান্ত ইচ্ছা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যাই শান্তিনিকেতনে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম পত্তনে প্রথম দলের অল্প কয়েকটি ছাত্রের মধ্যে ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, মোহিনীমোহনের মধ্যমপুত্র নয়নমোহন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রজতমোহন, অরবিন্দ বসু, সন্তোষ মজুমদার, অরুণ সেন প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকেই এখন আর ইহজগতে নেই। কবি-জায়া মৃণালিনী দেবী তখন সেই ঘর ছেড়ে-

হেমলতা ঠাকুর

(বড়মা)

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুকাল পূর্বের কথা। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করা মোহিনীমোহন তখন কলকাতার সের অ্যাটর্নিদের মধ্যে একজন,—সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর অগ্রগণ্যদের অন্যতম। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সরোজা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে,—হন ঠাকুরবাড়ির জামাতৃ-পদাভিষিক্ত।

পরে আবার তাঁর অনূঢ়া ভগ্নী হেমলতা দেবী পরিণীতা হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। এভাবে কলকাতার মোহিনীমোহনের পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে যুগ্ম গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে।

অল্পবয়সে বিবাহের পর হেমলতা দেবী এলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। একান্নবর্তী পরিবার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূরূপে হেমলতা সে বাড়ির 'বড়-বৌমা'।

আসা ছোট ছেলেদের দেখাশোনার ভার নেন —কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দুরারোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণবিয়োগে পর, স্বেচ্ছায় এ ভার শিরে তুলে নে নিঃসন্তানা হেমলতা দেবী। তখন থেকে তাঁ শান্তিনিকেতনে নামকরণ হয় 'বড়মা'—অবঃ এ নামটি এখানে প্রচলন করেন সৌমেন্দ্রনা ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর দেবরপুত্রগণ। সেদিনে সে নামের ছোট গণ্ডীটি বেড়ে বেড়ে আ তিনি সমগ্র বাংলা দেশের নারী-কল্যা নিযুক্তা সকলের বড়মা।

ক্রমশ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের খ্যাতি চতুর্দি ছড়িয়ে পড়ায় নানা দেশ থেকে বহু ছা আসতে থাকে এবং একটি শিশু-বিভাগ খো হয়—যা এখনও আছে। শিশু-বিভাগের ছো ছেলেদের বড়মা মায়ের মত যত্নে খাওয়াতে ও দেখাশোনা করতেন। সমবায় রন্ধনশালা আহার্যের একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রায় নিজের হাতে পায়েস-পরমান্ন রান্না ক বাচ্চাদের খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন তাদের চেয়ে

বেশি। সেদিনের সেই বড়মার স্নেহধন্য বালকদের মধ্যে এখনও বার্ধক্য-পীড়িত অনেকেই জীবিত আছেন। আশ্রম-বালকগণ ছাড়াও তিনি এখানকার ছোট-বড় সকলেরই ছিলেন স্নেহময়ী বড়মা।

হেমলতা দেবীর বিদ্যাশিক্ষা অনেকাংশে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত খুড়শ্বশুর কবিগুরু কাকামশাইয়ের নিকট। তাঁর কাছেই তিনি পান সাহিত্যিক হাতেখড়ি ও প্রেরণা। সমস্ত জীবনে তিনি গদ্য-পদ্য লেখেন অনেক। তাঁর লেখা কয়েকখানা বই এখনও দেখা যায়। মাসিক পত্রিকায় এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা সাতখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেল,—(১) দুনিয়ার দেনা, (২) মেয়েদের কথা, (৩) দু' পাতা, (৪) পৃথিবীর ডাক (নাটিকা), (৫) দেহলি (গল্প), (৬) জ্যোতি (কবিতা), (৭) আলোর পাখী (কবিতা)।

এসব পুস্তক প্রকাশিত হয় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব থেকে,—নব্বুই বৎসর বয়স পূর্ণ হয়ে গেলেও এখনও তিনি লেখেন।

তিনি সেকালের মহিলা কবিদের অন্যতমা। তাঁর লেখা গান ও কবিতার একটু নমুনা, যেমন—

'হে নারী তোমার গৃহের দ্বারে
সোনার সাঁঝে প্রদীপ জ্বালো
যে জন আসে পথের পাশে
সবার প্রাণে পড়ুক আলো।'...

অথবা—

'সেবায় তোমার হাত দু'খানি
হে জননী, মেলে ধর
দেশের ছেলে মা মা বলে ডাকছে,
তাদের কোলে কর।
পথের পাথর ভাঙ্গছে তারা,
দারুণ শ্রমে হচ্ছে সারা
তোমার বক্ষ স্নেহের ধারা
বর্ষি তাদের শ্রান্তি হর।'...

অথবা—

'যেমন করে পারি আমি করব
তোমার কাজ,
সুখে পারি দুঃখে পারি
নাইকো তাহে লাজ।...
তাই পৃথিবীর কাজে আমার
সকল দুঃখ হরে,
জীবনখানা গেছে যে তাই
তোমার সুধায় ভরে!'

কবিতার এই কথাগুলির মধ্যেই যেন তাঁর সমস্ত জীবনের কর্ম ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। 'সরোজ নলিনী' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মেয়েদের লেখা ও রেখায় সুশোভিত হয়ে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়,—বহুদিন যোগ্যতার সঙ্গে তিনি তার সম্পাদনা করেন,—আজও তার পরিচালিকা-মণ্ডলীর শিরোদেশে তাঁর নাম দেখা যায়। শান্তিনিকেতনের 'আলাপিনী মহিলা সমিতি' পরিচালিত 'ঘরোয়া' পত্রিকায়ও তিনি অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

তাঁর পূজনীয় খুড়শ্বশুর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু লেখা তিনি নানা পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি তা একত্র গ্রথিত হয়ে

হেমলতা ঠাকুর

'পথিক রবীন্দ্রনাথ' নামে পুস্তকাকারে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। হেমলতা দেবীর লেখা কবিতা কিংবা গল্প প্রথমাবধি কবিগুরুর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। তাঁর লেখা গল্পের বই 'দেহলি' পড়ে গুরুদেব খুশি হয়ে লিপি দেন, যা ঐ পুস্তকের প্রথমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লিপিকাটি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ছোট গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কি মানব চরিত্রের কি তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশের ছোট-বড় নানা গ্রামে, পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষে তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষ ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি ৮ চৈত্র, ১৩৪৫।

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমলতা দেবীর লেখা সর্বাধুনিক কবিতা 'প্রেমের দৃষ্টি' পড়ে সম্প্রতি এক পাঠক তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছেন—

বড়মা, আপনার 'প্রেমের দৃষ্টি' পড়িলাম। জগতকে মধুময় উপলব্ধি করা ভারতীয় সনাতন ধর্ম, আর্য-ঋষিরা চারিদিকে এই প্রেমময়ের উপলব্ধি করিতেন,—বাতাস মধু বহন করিতেছে, সপ্তসিন্ধুর জলরাশি নিত্য মধুক্ষরণ করিতেছে,—এই উপলব্ধিই আমাদের ধর্ম। আপনার মধ্য দিয়া প্রাচীন ঋষিগণের সেই ভাবধারাই প্রকাশ পাইয়াছে। আপনাকে নমস্কার করি। ইতি...

ঐ কবিতাটির কিছু অংশ—

সোনার চোখে যে দেখেছি তোমারে
তাই ফিরে ফিরে দেখিতে চাই
ভালবাসা দিয়ে ছুঁয়েছি তোমারে
মাটিদেহ সোনা হয়েছে তাই।
আয় আনন্দ, আয় রে ছন্দ,
দ্বন্দ্বকলুষ-নাশা
পেয়েছি জীবনে সারা ত্রিভুবনে
সোনাভরা ভালবাসা।
জন্মমৃত্যু নাই যে নাই—
প্রেমের সাধন দুর্লভধন মর্ত্য-জীবনে
মুক্ত পাই।

১৯৬৮ সালের মে মাসে পুরীতে বড়মার সঙ্গে সাক্ষৎকারে জানা গেল—তাঁর জন্ম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মকর-সংক্রান্তির ভোরে, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে। অল্পদিন হয় তাঁর বয়স নব্বুই পূর্তির উৎসব হল পুরীর বিধবাশ্রমে মহা সমারোহে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে ছবি তোলা হল—ছবিতে তিনি শোভা পেলেন যেন দেবীমূর্তি! উপাধি দেওয়া হল 'স্বর্ণসেতু'। এ উপাধির নূতনত্বে আকৃষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসায় জানা গেল—হেমলতা দেবীর দ্বার বাংলার দু'টি বিখ্যাত বংশ রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বংশের

সুষ্ঠু সংযোগ সাধিত হওয়ায় তাঁকে স্বর্ণসেতু উপাধি দেওয়া হল।

নব্বুই বৎসর অতিক্রান্ত হলেও আজও বড়মা সাধারণ মানুষের চক্ষে এক পরম বিস্ময়! স্মরণশক্তি এত প্রখর যে, আজও তিনি বহু রবীন্দ্রনাথের এবং স্বরচিত কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। চোখের দৃষ্টি এত ভাল যে, চশমার সাহায্য বিনা পড়াশোনা করেন। পায়ে একটু আঘাত পাওয়ার দরুণ চলাফেরায় অশক্ত হলেও আজও তাঁর আছে পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতা। পুরীর বসন্তকুমারী বিধবা-শ্রমের আজও তিনি কর্ণধার।

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই বললেন,—

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা, সকাল থেকে বুদ্ধের কথাই পড়ছি—আজ আর কিছু করতে মন চায় না।

আশ্রম-পরিচালিকা ভোরে এসে বলেন,—আজ পুণ্যদিন, সমুদ্রস্নানে যাব—আজ আশ্রমে ছুটি দিন।

আমি বলি,—না, আজ ছুটি নয়, সমুদ্র-স্নানান্তে সব মেয়েদের নিয়ে বুদ্ধের কথা আলোচনা কর,—তাঁর পুণ্য-জীবন—তাঁর উপদেশ সকলকে শোনাও—তাঁর স্তুতিগান করো।

বড়মা বলেন,—তিন বৎসর তন্ন তন্ন করে বৌদ্ধ-সাহিত্য পড়েছি, সাধনাথে কাটিয়েছি কতদিন—যশোধরা ও বুদ্ধ সম্বন্ধে কত কবিতা লিখেছি,—এখনও বুদ্ধের কথা পড়তে ও বলতে কত ভালো লাগে! তারপর তাঁর লেখা 'যশোধরা' নামে একটি বড় কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। কবিতাটি তাঁর লেখা 'আলোর পাখী'তে আছে। তার শেষাংশ—

সারা বিশ্বে মৈত্রী যাঁর লভিল বিস্তার।
শুদ্ধ যিনি বুদ্ধ যিনি পরম পবিত্র,
যশোধরা-প্রেম-ঋণ করেন স্বীকার
আশ্চর্য করুণাদীপ্ত কি মহান চিত্র!
নমামি মহাবোধি করুণাবতারং
নম নিষ্কলুষ প্রেম সংসার সারং।

বুদ্ধের জীবনের অনেক কথা বলে বড়মা বললেন,—চিরকালই পড়া আমার একটা নেশা। মহর্ষিদেবের নির্দেশে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট তিন বৎসরে পড়ি দশখানা উপনিষদ। কৃষ্ণকামশাইয়ের নিকট পড়ি বাংলা-ইংরেজী কত গ্রন্থ,—তার মধ্যে এত বৈচিত্র্য ছিল যে মুসলমানী 'সুফি' গ্রন্থও তার থেকে বাদ যায় নি।

এই জ্ঞান-তপস্বিনী বৃদ্ধা শুধু গীতা, উপনিষদ্ অধ্যয়নই করেন নি, তার মর্মোপলব্ধিও যে করেছেন, তা তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও কথা শুনলেই বোঝা যায়। কথার সঙ্গে চোখ দু'টি যেন জ্ঞানের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। শ্রীধাম পুরীতে বাস করছেন প্রায় ৩৪ বৎসর,—তার মধ্যে গত সাত বৎসর একটানা এখানেই আছেন। তিনি তাঁর 'পুরুষোত্তম' কবিতায় লিখেছেন—

তোমারে চাহিয়া দেখি হে পুরুষোত্তম
নির্লিপ্ত স্বাধীন তুমি আনন্দ উত্তম
তোমারে ধরিব প্রেমে চিনিয়া লইব
উত্তমের সাথে মিলি উত্তম হইব
ক্ষুদ্রতম প্রাণটিরে পূর্ণ করি দিল
উত্তম পুরুষে দেখি জীবন্ত নিখিলে।

উত্তমের সাথে মিলে তিনি সত্যই উত্তম হয়েছেন। তাঁরই কথায়—সকলের প্রতি ভালবাসায় তাঁর মাটিদেহ সোনা হয়ে তাঁর 'হেমলতা' নাম সার্থক করেছে!

স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হুগলি জেলার রাধানগরে তাঁর সাম্প্রতিক স্মৃতিসৌধের ভিত্তিস্থাপনের গৌরব অর্জন করেছেন সেই বংশের গৌরবোজ্জ্বলা হেমলতা দেবী। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সিংহাসনারোহণের বৎসর বিলেত গমনও বড়মার আর এক কৃতিত্ব। তিনি সে সময়ে সমগ্র ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেন। ব্রিস্টলে যাবার পর রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে 'পিতৃগুরু, বংশগুরুর' প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বড়মার বিদ্যানুরক্তি ও জ্ঞানস্পৃহা দেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে প্রায়ই বলতেন,—তোমার মস্তকে রামমোহন রায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে।

হেমলতা দেবী মহামানব রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছেন বহুদিন ধরে,—তাঁকে সেবা-যত্ন করে নিজেকে ধন্য করেছেন। বড়মা বললেন,—আমি কি আজকের মানুষ? আমি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দের মত মনীষী মহাপুরুষদের দেখেছি স্বচক্ষে। সে সব যেন মনে হয় এই সেদিনের কথা!

অনেকদিন শান্তিনিকেতনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত থেকে কাটার পর,—শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পর হেমলতা দেবী ফিরে আসেন কলকাতায় দাদা মোহিনীমোহনের নিকটে। মোহিনীমোহন তখন এক নূতন আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় হাবুডুবু। অনেকদিন পূর্বেই ভ্রাতা-ভগ্নী ও তাঁদের পরিবারের অনেকে দীক্ষিত হয়েছিলেন মৈথিলী মহাপুরুষ—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর নিকট।

পরমহংসের ধর্ম বৈদিকহিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতার ঊর্ধ্বে। মোহিনীমোহনের বাড়িতে তখন হয় প্রতিদিন বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান। প্রতি রবিবার তাঁর বাড়িতে আগমন হয় পরমহংসদেবের বহু শিষ্য-শিষ্যার,—এবং সকলে মিলে হোমে আহুতি দিয়ে ভগবানের আরাধনা করেন ভক্তি-নম্র-চিত্তে। তখন থেকে হেমলতা দেবী সেই অশিক্ষিতা অথবা স্বল্প-শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম, স্বাবলম্বন প্রভৃতির প্রচার শুরু করেন। নারী-কল্যাণে আত্মনিয়োগের ভিত্তিস্থাপন হয় এইখানে।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসার কিছুকাল পরে হেমলতা দেবী যোগ দেন 'সরোজনলিনী মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে'। ঐ সময়ে গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস, মহাশয় তাঁর পত্নী মহীয়সী মহিলা সরোজনলিনী দেবীর মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় বাংলার মেয়েদের একটা স্থায়ী উপকার করার জন্য ব্যগ্র হন।

নিরুপায়-অসহায় বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অথবা স্বাবলম্বন-প্রয়াসী কুমারী মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান' স্থাপনের সঙ্কল্প নিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া করে এ কাজ আরম্ভ করেন।

হেমলতা দেবীকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নিতে অনুরোধ করায় তিনি গ্রহণ করেন এই বিপুল কর্মভার। এখানেও তিনি সকলের বড়মা—মাতৃরূপেই তিনি এ প্রতিষ্ঠান চালনা করেন। এখানকার শিক্ষার্থিনী মেয়েদের হাতের কাজ এবং শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে তিনি শেখাতে থাকেন—স্বাবলম্বন, ধর্মনিষ্ঠা ও নৈতিক দৃঢ়তা। তাঁর বহুবিধ চেষ্টার ফলে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান ক্রমশ বড় হয়ে আজকে বিশালরূপে পরিণত হয়েছে।

এ কাজের সঙ্গে তাঁর আরও একটি মহৎ কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার দুর্ভাগিনী পদস্খলিতা মেয়েদের জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদত। তাদের মধ্যে যারা অনুতপ্ত, ভুল-সংশোধন-প্রয়াসী, তাদের যাতে শিক্ষা দিয়ে সমাজে সুষ্ঠু ও সম্মানের স্থান দেওয়া যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর কৃপায় পুনর্জন্মপ্রাপ্ত কত নারী হয়ত খুঁজলে এখনও পাওয়া যায়।

তারপর হেমলতা দেবীর ব্যাপক নারী-আন্দোলন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলার নারীর স্থান ছিল রান্নাঘরে ও প্রসূতি-আগারে। হিন্দু কোড বিলের দায়ভাগ আইনে, তার পিতা কিংবা শ্বশুরের সম্পত্তিতে ছিল না কোনো ন্যায্য-অধিকার। শ্বশুরের জীবিতকালে স্বামীর অকালে পরলোকপ্রাপ্তি ঘটলে, ধনী শ্বশুরের ধন-দৌলতের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশেরও আশা না করে,—সামান্য ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের অবহেলা শিরোধার্য করা ভিন্ন ছিল না অন্য উপায়। ভুক্তভোগিনীদের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত ক্ষমতা অথবা শিক্ষাও ছিল না। এ সব হেমলতা দেবীর প্রাণে বেদনা দেয় গভীরভাবে।

তখনকার দিনে তিনি মূক-মৌন-অশিক্ষিত রমণী-সমাজের মুখপাত্র হয়ে, বড় বড় সভা-সমিতি আহ্বান করে এ সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে চালান জোর আন্দোলন। গ্রামে-গ্রামে সমিতি করে অক্লান্ত চেষ্টায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণায় ডুবিয়ে দেন নিজেকে। আজকের সমাজে মেয়েদের যে পুরুষের মতই উচ্চস্থান ও সমান অধিকার এবং শিক্ষার সুযোগ,—তার মূলে আছে এই পুণ্যবতী, পরদুঃখকাতর-হৃদয়া, মহীয়সী মহিলা হেমলতা দেবীর অসীম অবদান! বাংলার নারী-জাগরণের তিনি পথিকৃৎ।

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গৃহে শিক্ষিতা হেমলতা দেবীর সমাজের নানা অব্যবস্থা ও জটিল সমস্যা-সমাধানে নির্ভীক সমালোচনা ও বাগ্মিতা সত্যই অদ্ভুত! তা ছাড়া বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে,—বিশেষত গীতায় জন্মে তাঁর অসাধারণ অধিকার! তাঁর গীতাপাঠ ও তার সুললিত ব্যাখ্যা শোনার জন্য তাঁকে সেদিনের বহু মহিলা-সংঘ থেকে আহ্বান জানাত। লেডি অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত 'বাণী-ভবনের' মেয়েদের তিনি নিয়মিতভাবে গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন বহুদিন যাবৎ।

প্রায় দশ বৎসর তিনি কলকাতায় বাস করে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বহু নারী-কল্যাণ সমিতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার পর—আহ্বান পান নীলাচল থেকে। সমুদ্রের ডাকের মত এ উদার আহ্বান তিনি অবহেলা করতে পারেন নি। এ ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজ-সেবার একটি অতি প্রয়োজনীয় মহৎ কাজে নিজেকে নিমজ্জিত করেন।

লাহোর হাইকোর্টের জজ স্যার প্রতুল চ্যাটার্জির সহধর্মিণী লেডি বসন্তকুমারী দেবীর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে, বাংলার দুর্ভাগিনী বিধবাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু করার। বড়মা'র সংগঠন-শক্তির কথা তিনি ইতিপূর্বেই লোকপরম্পরা অবগত ছিলেন। তাঁর পুরীর বাড়িখানা এই কাজে দান করে, সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করে বড়মাকে ডাকেন এটি গড়ে তোলার জন্য। বড়মা'র সমাজসেবী মনও তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয় এই ডাকে।

সেই থেকে ১৯৩০ খৃস্টাব্দে পুরীতে এসে তিনি এই 'বসন্তকুমারী বিধবা-আশ্রম'টি গড়ে তুলে আজ পর্যন্তও আছেন এখানে। চৌত্রিশ বৎসর ধরে তিনি এখানে করে চলেছেন এই 'বহু-জন-হিতায়' কর্মযজ্ঞ।

বসন্তকুমারী বিধবা-আশ্রম একেবারে অঙ্কুর হতে গড়ে তুলে ক্রমশ অনেক বিস্তার করার পর সেটি বর্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়মা বললেন,—এই আশ্রম গড়ে তুলতে বহু অসুবিধার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বাড়িটিতে একটিমাত্র ছোট কুয়া ছিল। মেয়েদের নিজের হাতে জল তুলে স্নান ও কাপড় কাচা প্রভৃতি করতে খুব কষ্ট হয়। একবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী ৺বিধান রায়ের নিকটে জানাই আমাদের অসুবিধার কথা;—তিনি সঙ্গে সঙ্গে চার হাজার টাকার চেক্ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। সে টাকায় চারটি টিউবওয়েল এবং আরও কিছু বাড়ির কাজ করানোতে এখন আর কোনো জলকষ্ট নেই। এখন পাশাপাশি তিনখানা বাড়ি নিয়ে বিধবা-আশ্রম। এখানে মেয়েদের তাঁত, সেলাই প্রভৃতি নানা-বিধ হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বিনী করা হয়। একটি বাড়িতে আশ্রমের বিদ্যালয় বিভাগ। এই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ বড়মা'র চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। এখন সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিতে বহু কুমারী মেয়েও শিক্ষালাভ করে। একানব্বুই বৎসর বয়সে বড়মা আজও এই প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী। এই দীর্ঘজীবন দিয়ে তিনি মেয়েদের,—বিশেষত বাংলার বিধবাদের জন্য যা করেছেন তার বুঝি আর তুলনা নেই। কবির ভাষায় সার্থকভাবে বলা যায়—

'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।'

যে প্রদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন নিজের দেহ দিয়ে,—তা সঞ্চারিত হউক দেহ হতে দেহান্তরে! সুশিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হউক বাংলার প্রতিটি নারী-অন্তর!

মানুষের অমর কীর্তি

মিশরের পিরামিড

রমা দেবী

মানুষের কীর্তিকলাপ দ্বারাই মানব-সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মিশর দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। আজ থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে সে দেশের মানুষ যে অমর কীর্তিস্তম্ভ নিজেদের হাতে গড়ে রেখে গিয়েছে—তা দেখে আজও সারা জগতের লোক বিস্ময়ে অভিভূত হয়। মিশরের সেই অমর কীর্তিস্তম্ভ জগতবাসীর কাছে 'পিরামিড' নামে পরিচিত। এরকম বৃহদাকার সৌধ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে জানা যায় নি।

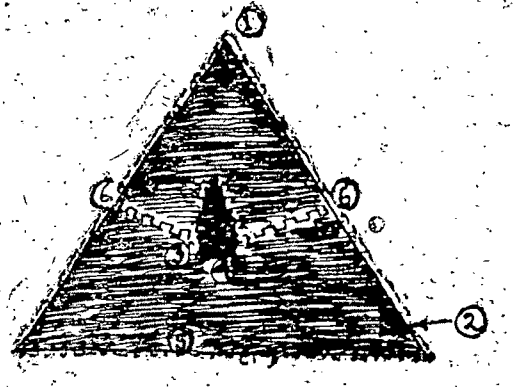

১। চুণাপাথরের আচ্ছাদন, ২। প্রবেশ পথ, ৩। রাজার কক্ষ, ৪। রাণীর কক্ষ, ৫। ভূনিম্নস্থ গৃহ, ৬। বায়ু চলাচলের পথ

প্রাচীনকালের বিখ্যাত পণ্ডিত প্লিনি ও ডাওডেরাস্ মিশরের এই পিরামিডের কথা বিস্তৃতভাবে লিখে রেখে গিয়েছেন। তাঁদের হিসেব অনুসারে তিনলক্ষ ষাট হাজার মানুষ কুড়ি বছর ধরে একটানা পরিশ্রম করে মিশরের সর্বোচ্চ পিরামিডটি নির্মাণ করতে পেরেছিল। কিন্তু এই মতের সঙ্গে হিরোডোটাসের মতের মিল হয় নি। তাঁর মতে, মিশরের সর্বোচ্চ পিরামিড তৈরি করতে একলক্ষ লোকের শ্রম লেগেছিল। হিরোডোটাস্ খৃষ্টের জন্মের ৪৪৫ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি মেম্‌ফিস্-দেবালয়ের পুরোহিতদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, হিরোডোটাসের জন্মেরও প্রায় ৫০০ বছর আগে মিশরের রাজা চিওপস একলক্ষ কারিগর দিয়ে ঐ পিরামিড তৈরি করিয়েছিলেন।

পিরামিডের নির্মাণকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে সর্বশেষ যে আনুমানিক তারিখ পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন তা হল খৃষ্টপূর্ব ৩৩০৩ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩৭০০-এর মধ্যে। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে মিশর। মিশরের নীলনদের তীরে যে স্থানের নাম গিজা—সেখানেই মিশরের বৃহত্তম পিরামিড দুইটি অবস্থিত। প্রথমটি চিওপ্‌স্ বা খুফু (Cheops or Khufu) রাজার নামে এবং দ্বিতীয়টি সিফ্রস্ রাজার নামে বিখ্যাত।

এই কীর্তিসৌধগুলি মিশরের রাজধানী কাইরোর পশ্চিমে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পিরামিডগুলির চারদিকে প্রায় ত্রিশ মাইল স্থান জুড়ে বালুকাময় মরুভূমি। নীলনদের বুক থেকে মরুভূমির উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট।

রাজা চিওপ্‌স্ বা খুফু নির্মিত প্রথম এবং সর্বোচ্চ পিরামিডের উচ্চতা ৪৮২ ফুট-মতান্তরে ৪৬১ ফুট। এই পিরামিডেরই নীচে একটি প্রকোষ্ঠে চিওপ্‌স্-রাজার মৃতদেহ রক্ষিত আছে। কিছুকাল পূর্বে পিরামিডের অভ্যন্তরে রাজার স্মৃতিজড়িত একটি এমনই জিনিস পাওয়া গেছে, যার মধ্যে লিখিত সাংকেতিক অক্ষর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, চিওপ্‌স্ রাজারই আসল নাম খুফু।

চিওপ্‌স্-রাজের নামাঙ্কিত প্রথম পিরামিডে ২০৩টি সিঁড়ি বা ধাপ আছে। নীচ থেকে ১৫টি সিঁড়ি উঠে এলে পর পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ পাওয়া যায়।

হিরোডোটাসের আবির্ভাবের আগে পিরামিডের অভ্যন্তর সম্পর্কে প্রায় কিছুই কেউ জানত না। তিনিই প্রথম জানিয়েছিলেন যে, এই পিরামিডের একটি পথ দিয়ে ভিতরে যাওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এই পিরামিডের নীচে অনেকগুলি গুপ্তকক্ষ আছে।

হিরোডোটাসের পর এই পিরামিডের ব্যাপারে যিনি তথ্য আহরণে মনোযোগী হন—তাঁর নাম প্লিনি, তিনি খৃষ্টীয় ৬৬ অব্দের লোক, অর্থাৎ হিরোডোটাসের প্রায় ৫০০ বছর পরে তাঁর জন্ম। এই প্লিনি যে নূতন তথ্য উদ্ধার করলেন, সে হল এই যে, উক্ত পিরামিডের ভিতরে ৮০ ফুট গভীর কূপও বর্তমান।

প্লিনির পরে মিশরের পিরামিডের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানীদের মধ্যে যিনি বিখ্যাত—তাঁর নাম খলিফা আলমামুন। তিনি বাইরে থেকে পিরামিড দর্শনের পর ওর ভিতরে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর অনুচরেরা তাঁকে জানায় যে, পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তিনি সে কথায় নিরস্ত না হয়ে পিরামিডের একপাশে একটি ছিদ্র করান, তারপর সেই ছিদ্রটিকে বড় করে নিয়ে তা দিয়ে ভিতরের

[১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

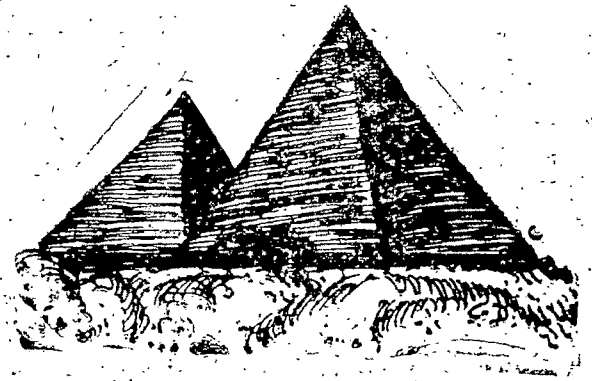

● মরুভূমির বুকে মিশরের পিরামিড

মূক-বধির শিক্ষার ইতিহাস

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

য়ুরোপে বধির-শিক্ষা

মূক-বধির শিক্ষা-ইতিহাসের সূচনা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। এর আগে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। আর যা-ও পাওয়া গেছে তা-ও প্রামাণিকতা সংশয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে মূক-বধিরদের সম্বন্ধে বিদগ্ধ-সমাজের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা প্রয়োজন :—

১। বিখ্যাত গ্রীক্ ফিজিসিয়ান হিপোক্রাটিস্ (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) বলেছেন—জিহ্বার সঠিক কার্যকারিতার উপর কথার বোধ্যতা (intelligiblity) নির্ভর করে।

২। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)-এর মতে যারা বধির, তারাই মূক। কিন্তু এর যথার্থ কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। তিনি আরো বলেছেন যে, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ই মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অকার্যকারিতার জন্যই বুদ্ধির দিক থেকে বধিরেরা তুলনামূলক-ভাবে অন্ধদের অপেক্ষা হীন, শ্রবণ এবং কথন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল এই যে,—মূক-বধিরেরা কথা বলতে না পারার আনুষঙ্গিক কারণ হচ্ছে,—'speech was a natural and not an acquired art'। অর্থাৎ কথা আয়ত্তগত নয়, স্বভাবগত।

৩। এ্যারিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন, মূক-বধিরগণ কখনই শিক্ষার অধিকারী নয়। শ্রবণক্ষমতার অভাবে কোনো প্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব—তাঁর মত বহু শতাব্দী পর্যন্ত সাধারণের উপর আধিপত্য করেছিল। অবশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, জন্ম-বধিরতার সঙ্গে জন্ম-মূক হওয়ার পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তিনি শব্দ বা কথাকে চিন্তা ও ভাবপ্রকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, কথাই বধিরদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত।

৪। গ্যালেন (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) প্রমুখ ফিজিসিয়ানেরা মনে করতেন cerebral region (মস্তিষ্ক)-এ শ্রবণ ও বাক-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা আছে। আর সে কারণে জন্ম-বধির নিশ্চয়ই জন্ম-মূক।

৫। খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী সময়ে মূক-বধিরতাকে একপ্রকার ব্যাধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের মতগুলি, ইতিহাসের পূর্বসূত্র হিসাবেই এখানে সংযোজিত হয়েছে। বিবর্তিত আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা মতগুলির গুরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না।

সে সময়ে বধিরদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ছিল যে, জন্ম-বধির কখনোই কথা বলতে বা লিখতে পারবে না। আর যদি কেউ তা' পারত, তবে সেটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করা হত। এ থেকে একটা জিনিস অনুমান করা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূক-বধিরেরা সে সময়েও কথা বলতে সক্ষম হত। কিন্তু কিভাবে,—সে সম্বন্ধে কতকগুলি আধিদৈবিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না। বধিরদের কানে শোনাবার জন্য সে সময়ের কিছু কিছু প্রচেষ্টা (চিকিৎসা!) আধুনিক চিন্তায় কৌতুকপ্রদ।

যা হোক্, সাধারণের এই ধারণা অন্তত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যে কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয়েছে—এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মূক-বধিরদের সম্বন্ধে তৎকালীন য়ুরোপীয় সামাজিক ব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। কোনো কোনো স্থানের লোক মূক-বধিরগণকে কষ্ট প্রদান করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করে সন্তানদের বিনষ্ট করত। লাইকারগাস ব্যবস্থার মধ্যে এই আদেশ ছিল যে, মূক-বধির সন্তানদিগকে বিনাশ করবার জন্য বাইরে ফেলে রাখতে হবে। সুসভ্য এথেন্স নগরে মূক-বধিরদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হত। রোম নগরে তাদের টাইবার নদে নিক্ষেপ করা হত। মূক-বধিরদের সম্বন্ধে সমাজের ধারণা কতদূর হতাশাব্যঞ্জক ছিল, তার প্রমাণ আছে Roman Law, Justinian Code এবং Mediavel Law ইত্যাদির মধ্যে। 'রোমান ল'-তে মূককে মানসিকতার দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে। 'জাস্টিনিয়ান কোড' (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী)-তে মূক-বধিরদের সব রকম সামাজিক অধিকার এবং নৈতিক দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, যারা জন্ম-মূক-বধির তাদের অভিভাবকদের আওতায় থাকতে হবে, কারণ নিজ নিজ কার্য পরিচালনায় ব্যক্তিগতভাবে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের অধিকারের সীমারেখা এভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে, তাদের উইল করবার ক্ষমতা থাকবে না কোনো চুক্তি করবার বা কোনো কিছুতে সাক্ষী হওয়ার অধিকারও থাকবে না। তবে ঐ 'কোড'-এ জন্ম-মূক-বধির ও জন্মের পরে যারা কোনো কারণে মূক-বধির হয়েছে এবং কথা বলতে ও লিখতে শিখেছে, উভয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানা হয়েছিল। বধিরদের বিবাহ সম্বন্ধে কোনো বাধা ছিল না। এই 'কোড'-এর প্রভাবেই পরবর্তীকালে Mediavel Law-তে মূক-বধিরদের জ্যেষ্ঠাধিকার অস্বীকৃত হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বধিরদের সম্বন্ধে চিন্ত প্রারম্ভিক, পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য। চার্চ লিটারেচার ইত্যাদি থেকে যেটুকু জানা যাচ্ছে, তা তৎকালীন জনসাধারণের ধারণার সমপর্যায়ের। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে Mosaic Law-এর ধর্মীয় নিয়মাবলীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে,—'বধিরদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। তাদের অভিশাপ দিও না। কারণ, বধিরতা ভগবান কর্তৃক ইচ্ছিত।'

খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে Talmud-এর Rabbis [ডাক্তার বা আইন প্রণেতাদের Jewish উপাধি] সম্প্রদায় বধিরদের শিশু এবং মূর্খের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'a fool and a child. কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং সমাজ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম Jermiah মূক-বধিরদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করেন নি। খৃষ্টান্ চার্চ বধিরদের মানসিক ক্ষমতাগুলির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। যদিও বিবাহ বিষয়ে ইসারার সাহায্যে বিবাহ সম্পন্ন করবার আদেশ তাঁরা দিয়েছিলেন।

পূর্বে বলেছি, খৃষ্টের জন্মের পর থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বধির-শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তবে বেড সাহেবের ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা কথা বলা (Speaking with the Fingers) নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়, হেক্সনের বিশপ সেণ্ট জন অব বিভার্লি ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে একজন মূক-বধিরকে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেছিলেন এবং সে বিষয়ে আংশিক কৃতকার্য হয়েছিলেন।

প্রাক্-আধুনিক পর্ব

প্রাক-আধুনিক পর্বের পরিসীমা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ (১৭৭৫ খৃঃ) পর্যন্ত, এ পর্বের বৈশিষ্ট্য মূক-বধির শিক্ষণে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা, যদিও এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটা আপাতসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত এবং শিক্ষকগণ দ্বারা পদ্ধতির ব্যবসায়-গুপ্তি (trade secret) রক্ষার ফলে, পদ্ধতিটি বিশেষ উৎকর্ষলাভ করতে পারে নি। তা ছাড়া তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল 'রাজসিক'। রাজসিক বলার পিছনে যুক্তি এই যে, এ সময়ে রাজপুত্রদের বা রাজ-পরিবারের কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রধানত শিক্ষক নিয়োজিত হত। এ সময়ের সমস্ত শিক্ষণ প্রচেষ্টাই পরীক্ষামূলক-ভাবে গৃহীত হত, কারণ নিশ্চয়ই শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা তৎকালে ছিল না। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, এ সময়ে কেউ কেউ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বধিরদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হন এবং তাদের কথা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না, সে বিষয়ে কিছু পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালান। তৎকালীন রাজা বা রাজপুরুষেরাই বধিরশিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় শিক্ষকেরা রাজা ও রাজপুরুষদের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেছেন, এর কিছু কিছু তথ্য রাজপরিবারগুলির নথীপত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

রাজন্যবর্গের এই মহানুভবতা একদিকে যেমন পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করেছিল অন্যদিকে তাঁদের প্রদত্ত এই সম্মান ও অর্থের লোভেই শিক্ষকেরা নিজ নিজ পদ্ধতিকে অন্যদের কাছ হইতে গুপ্ত রাখতেন। যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে প্রাথমিক স্তরে প্রচারের স্বার্থে তার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকাও অসম্ভব নয়।

এই পর্বের খ্যাতিমান শিক্ষকদের মধ্যে—

(১) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের—Pedro Ponce De Leon (১৫২০ ?—১৫৮৪); Juan Pablo Bonet (১৬২০ খৃঃ-এ শিক্ষকতা গ্রহণ করেন: মৃত্যু ১৬২৯ খৃঃ-এ), John Bulwer; William Holder, D. D, F. R. S. (১৬১৬-১৬৯৮); John Dalgarno;

(২) হল্যাণ্ডে—John Conard Amman M D. (১৬২৯-১৭২৪);

(৩) ফ্রান্সে—Jacob Rodrigues Pereire (১৭১৫-১৭৮০); Henry Baker, F. R. S. (১৬৯৮-১৭৭৪)।

(৪) জার্মান দেশীয় L W. Kerger (১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে); Jorges Rafel (১৬৭৩-১৭৪০); O. B. Lasius J. L. F. Arnoldi প্রভৃতি শিক্ষকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই প্রথম জীবনে ডাক্তার, অঙ্ক-শাস্ত্রবিদ্ বা ধর্মযাজক ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো মূক-বধির সংস্পর্শে আসায় হঠাৎ তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছিলেন। এটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

প্রাক্-শিক্ষণ পর্বে কথা শেখাবার উপরেই প্রথম জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বধিরদের সম্বন্ধে পূর্বের ধারণাগুলির পর্যালোচনা করলে শিক্ষণের পদ্ধতি ছিল Natural Sign (স্বভাবিকৃত অঙ্গ সংকেত) বা Manual Alphabet (অঙ্গুলি সংকেত)। কারণ তখনও সাধারণের ধারণা ছিল যে, বধিরেরা কথা বলতে পারবে না। কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে যে, পিতামহ শিক্ষকেরা প্রথমে কথা শিক্ষণের মধ্য দিয়েই বধির শিক্ষার সূচনা করেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তৎকালীন শিক্ষকেরাও ভাব ও চিন্তার যোগাযোগে কথার গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। লিখন, শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়েছিল। Natural Sign এবং Manual Alphabet বিপরীত পদ্ধতি হিসাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথন-শিক্ষা পদ্ধতির সহায়ক হিসাবেও ব্যবহৃত হত।

এ পর্যায়ে একজন ইতালীয় বিকারতত্ত্ববিদ্ Girolamo Cardano-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন এবং তাদের শিক্ষার বিষয়ে কতকগুলি সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই সূত্রগুলি বধির শিক্ষকগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল।

ভাষাকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে এবং সহজতর-রূপে শিক্ষার পরিকল্পনা সে সময়ে অনাবিষ্কৃত থাকলেও, Cardano বস্তু (object) এবং ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যাকরণের নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হত। ওষ্ঠ-পাঠ (Lip-reading) শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ীভূত হয়েছিল। তৎকালীন পদ্ধতিকে আধুনিক ভাষায় মিশ্র-পদ্ধতি (Combined method) বলা হয়। যদিও ভাষার মৌখিক প্রকাশের গুরুত্বটি তখনই স্বীকৃতিলাভ করেছিল।

বর্তমানের সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষামানের তুলনা অবৈজ্ঞানিক। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রাক্-পর্বের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেদিক থেকেই এ পর্বের মূল্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। পূর্বের তুলনায় এ পর্বের দৃষ্টিভঙ্গী কত বিকশিত এবং বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ হিসাবে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ-এ অক্সফোর্ডে প্রকাশিত Dalgarno-র Didascalocophus থেকে একটি অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি:—

'একথা মেনে নিন যে, বধিরেরা বোধশক্তি এবং স্মৃতিশক্তির দিক থেকে কেবলমাত্র অন্ধদের সংতুল্যই নয়; তাদেরও সমকক্ষ যাদের সব ক'টি বোধেন্দ্রিয় কার্যকরী আছে: কানের সাহায্যে শব্দের প্রতিরূপ গ্রহণ ও ধারণের মত এরা চোখের সাহায্যে বস্তুর ও ভাবের প্রতিরূপ গ্রহণ ও ধারণে সক্ষম।···আমি বিশ্বাস করি, একজন বধির শিশুর কাছ থেকে তার দোলনার বয়সেই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া সম্ভব···।'

এ পর্বে কয়েকজন শিক্ষাবিদ মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

আধুনিক পর্ব

সম্মিলিতভাবে গঠনমূলক প্রচেষ্টা আধুনিক পর্বের বৈশিষ্ট্য। এ পর্বের সূচনায় রয়েছেন আব্বে চার্লস মাইকেল ডিলাপে (১৭১২-১৭৮৯) এবং জার্মান দেশের স্যামুয়েল হাইনিকা (১৭১৩-১৭৯০)। ডিলাপে প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চিরদিন অমর হয়ে

থাকবেন। প্যারিসে ১৭৭৫ খৃঃ-এ (কারো কারো মতে বিদ্যালয়টি ১৭৬০-৭০-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের প্রমাণও খুব অযৌক্তিক নয়) তিনি প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ডিলাপের সমসাময়িক হাইনিকা জার্মান দেশে প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৭৮ খৃঃ-এ। ১৭৯২ খৃঃ-এ টমাস ব্রেইডউড এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জোসেফ ওয়াটসন সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ডের প্রথম বিদ্যালয় 'দি ওল্ড কোর্ট রোড ইনস্টিটিউসন' সংস্থাপন করেন।

শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসাবে Sign এবং Oral-এর ব্যবহার বিষয়ে ডিলাপে এবং হাইনিকার মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ডিলাপে ছিলেন 'মেথডিকাল সাইন্'-এর পক্ষপাতী; অন্যদিকে কথা ও কথাপাঠ শিক্ষায় হাইনিকা লেখন-পদ্ধতিকে বিশেষ উপযুক্ত মনে করতেন। দু'জনের এই মতান্তর তৎকালে য়ুরোপে এমন কি আমেরিকায়ও শিক্ষকদের প্রচেষ্টাকে দু'-ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ একদল ডিলাপে-র 'মেথডিকাল সাইন্' পদ্ধতিকে স্বীকার ক'রে ঐ পদ্ধতিকেই অনুসরণ করলেন, অন্যদল হাইনিকার পদ্ধতিকে।

শিক্ষণ-পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে ডিলাপে স্পেনের পাবলো ডি বনেট্-এর 'দি মেথড অব টিচিং ডেফ মিউটস্ টু স্পীক্' নামে বইখানি ব্যবহার করতেন। তিনি মনে করতেন যে, কথা তার বস্তুধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক, সুতরাং কথার উন্নতির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির কোনো যোগ নাই। ১৭৭৬ খৃঃ-এ তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি প্রকাশ করেন:

.....'The world will never learn to make eyes and fingers travel post haste in order to have the pleasure of conversing with the deaf. The only way of totally and entirely restoring those in this predicament to society is to teach them to understand what is said their sight, and to express their own ideas and sentiments with their voice.'

ডিলাপের পদ্ধতির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এবং তাঁরই ছাত্র আর এ সি সিকার্ড (১৭৪২-১৮২২) পরবর্তীকালে 'মেথডিকাল সাইন্' পদ্ধতিটির ক্ষেত্র বিস্তৃত ক'রে পরিণত রূপদান করেন, অনি আব্বে সিকার্ড নামেই সমধিক পরিচিত এবং তাঁর পদ্ধতি 'ফেন্স মেথড' নামে পরিচিত।

এ অধ্যায়ের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে —(১) ফ্রান্সে: J. Valade-Gabel (১৮০১-১৮৭৯)।

(২) জার্মান দেশে: John Baptist Graser (১৭৬৬-১৮৪১); Victor August Jager.: Friedrich Mortiz Hill (১৮০৫-১৮৭৪)।

(৩) ইংলণ্ডে: Tomas Arnold (১৮১৬-১৮৯৭) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সম্পূর্ণ যুগটির উপর ডিলাপে এবং হাইনিকার প্রভাব অবিসংবাদিত। কারণ, পূর্বেই বলেছি এঁদের পদ্ধতিকে অবলম্বন ক'রে, দু'টি পৃথক শিক্ষণ ধারার অনুশীলন কার্য চলেছে। ফলে উভয় ধারারই উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

আমেরিকায় বধির-শিক্ষা

মূক-বধির শিক্ষণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছিল ফিলিপ নেলসন্ দ্বারা ১৬৭৯ খৃঃ-এ 'রাওথি'তে। আমেরিকায় বধিরদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত 'কোবাস্'-এ ১৮১২ খৃঃ-এ। প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল উইলিয়ম বোলিং-এর তিনটি বধির সন্তান ছিল। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়।

আমেরিকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা রেভারেণ্ড টমাস হপকিন্স গ্যালোডেট (১৭৮৭-১৮৫১)-এর দ্বারা। তিনি বধির-শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য প্রথমে ইলণ্ডের ব্রেইডউড স্কুল-এ যান। সেখানে দু'-তিন বছর শিক্ষা নেওয়ার পর আরো শিক্ষা নিতে যান প্যারিসে। সেখানে আব্বে সিকার্ডের কাছে Sing Language শিক্ষণের পদ্ধতি শিক্ষা করেন। দেশে ফিরবার সময় তিনি লরেণ্ট ক্লার্ক নামে সেখানকার একজন শিক্ষকবে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং ১৮১৭ খৃঃ-এ 'অ্যামেরিকান অ্যাসাইলাম্ ফর্ দি ডেফ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখন বিদ্যালয়টি 'অ্যামেরিকান স্কুল ফর দি ডেফ' নামে

ম্যাডোনা

শিল্পী—শ্রীমতী করুণা সাহা

পরিচিত। টমাস গ্যালোডেটের ছেলে ই এম্ গ্যালোডেট পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

এখানে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম্ বেল (মৃত্যু ১৯২২ খৃঃ) এবং তাঁর দ্বারা আলেকজাণ্ডার মেল্‌ভিল্ বেল-এর নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। এঁরা দু'জনে বধির শিক্ষাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। গ্রাহাম্ বেল যদিও টেলিফোনের আবিষ্কারক হিসাবে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি একজন বধির শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ-এ তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এখন তা' 'আলেকজাণ্ডার গ্রাম্ বেল এ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি ডেফ্' নামে পরিচিত। বধির ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাকে উন্নততর করতে তিনি বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে বধিরদের 'শ্রুতি পরিমাপক যন্ত্র' (audiometer) আবিষ্কার করেন। ডাঃ বেল-এর স্ত্রী একজন বধির, তিনি বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এবং ভাল কথাবার্তা কহিতে পারিতেন। ডাঃ বেল বলেছেন, 'মিসেস বেল দ্বারা আমার অনেক গুরুতর কার্যের প্রচুর সাহায্য হয়েছে।' তিনি হেলেন কেলার-এর মনীষার আবিষ্কর্তা। তাঁর একটি উক্তিতে নিজস্ব দার্শনিক চিন্তার সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছে—

'Leave the beaten track occasionally and dive into the woods. You will be certain to find something never seen before'.

অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে Sarah Fuller; Caroline Yale এবং Max A Goldstein-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী ইতিহাস বিংশ শতকের। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, শ্রুতি পরিমাপক এবং শ্রুতি সহায়কা (Hearing aid) যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বধির-শিক্ষা পদ্ধতিতে এসেছে যুগান্তর। এখন বধিরেরা যাতে তাদের আংশিক শ্রুতিক্ষমতাকেও কাজে লাগিয়ে সাধারণ পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে, বর্তমান আমেরিকা, মূক-বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। সেখানে বধিরদের উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ (গ্যালোডেট কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Aural এবং Oral পদ্ধতির উপরেই বিশেষজ্ঞগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Sign পদ্ধতিও বহাল আছে। এ পর্বের গবেষক শিক্ষকগণের মধ্যে Halwell Davis, M.D.; S. Richard Silverman, P.H.D.; S. Gordon Tayler; Miriam D. Pauls, P.H. D. প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের গবেষণা ইত্যাদি কর্মদ্বারা প্রভূত সুনাম এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

ভারতে বধির-শিক্ষা

ভারতবর্ষে বধির-শিক্ষা ইতিহাসের সূচনা আকস্মিক এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের পূর্বে এ বিষয়ে কোনো তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু শিক্ষা-ইতিহাস আলোচনার প্রারম্ভে সংক্ষেপে মূক-বধিরদের সম্পর্কে প্রাচীনকালের চিন্তাধারার যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা উল্লেখ করছি।—

১। 'সামবেদীয় ছান্দোগ্যপনিষদ' (২য় ভাগ) গ্রন্থে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্ব বিষয়ক একটি কাহিনীতে মূক-বধিরতার অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ পাচ্ছি। সেখানে মূক অবস্থায় কানে শোনার এবং বধির অবস্থায় কথা বলার প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে। কিন্তু মূক বা বধির হওয়ার জন্য মানসিক চিন্তায় কোন বাধা আসে না।

২। মহা ভ শ্রীমৎ মাধবকর-এর 'নিদানম্' গ্রন্থে মূক এবং বধিরতার কারণ উল্লিখিত হয়েছে। মাধব কর মূক-বধিরতার যে লক্ষণ উল্লেখ করেছেন তা' অসম্পূর্ণ হলেও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তিনি মূক-বধিরতার সঙ্গে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অক্রিয়কতার ঘনিষ্ঠ যোগ নির্দেশ করেছেন। মাধবকর-কে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়।

৩। মূক-বধিরতার কিছু কিছু চিকিৎসা সুপ্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ মতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তৎকালে বধিরতাকে অসাধ্য বলা হয়েছে। কিন্তু কোন্ কোন বধিরতার চিকিৎসা চলত।

৪। সুপ্রাচীনকাল হইতে শিক্ষা-ইতিহাস সূচনার প্রাক্কাল পর্যন্ত মূক-বধিরদের সম্বন্ধে সাধারণের মনে দৈবী অনুগ্রহলাভ জাতীয় কিছু চিন্তা কার্যকরী ছিল। প্রমাণ যথা :—'মূকং করোতি বাচালং' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা); 'খোঁড়ায় নাচে কানায় দেখে বোবায় বলে বম্বোলা...' (ত্রিনাথের পাঁচালী)।

৫। য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রাচীনপর্বে মূক-বধিরদের প্রতি ঘৃণিত নৃশংস আচরণের অনুরূপ কোনো তথ্য ভারতবর্ষে নাই। বরঞ্চ ভারতে প্রাচীনকালে মূক-বধিরদের সম্বন্ধে চিন্তা যে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তার প্রমাণ আছে 'মনুসংহিতায়' মূক-বধিরদের অধিকার সম্বন্ধীয় আইনের মধ্যে। তাতে বলা হয়েছে যে, মূক বা জন্ম-বধির পিত্র্যাদিধনে অধিকারী নহে, কিন্তু ধনাধিকারীরা তাহাদিগকে ন্যায্য গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, অন্যথায় পাপী হবে।

ভারতবর্ষে মূক-বধির শিক্ষা-ইতিহাস সূচনায় এত অধিক বিলম্বের পশ্চাতে সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে,—

১। সুপ্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত ধর্মীয় ভাব-প্রবণতার আত্যন্তিকতায় এ জাতীয় বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার সূচনা প্রায় অসম্ভব ছিল।

২। প্রাচীনকালে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল ধর্মজ্ঞানের জন্য। পাঠ্য বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ।

৩। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকে প্রতিবন্ধিতদের দায়িত্ব নিজেরা বহন করবার অঙ্গীকার করেছে। ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে এই দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধ যুক্ত হওয়ায় এদের সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কোন প্রশ্নই ওঠে নি।

৪। ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক জীবন।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় ভারতীয় ধর্মচেতনা য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-চেতনার দ্বারা আহত হল, য়ুরোপীয় শিক্ষার আলোকে আমাদের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হল, আমরা আমাদের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথায়ও ভাঙন সুরু হয়েছে। ফলে, পরিবারে ব্যক্তির জীবিকা অর্জন সম্বন্ধীয় চিন্তায় শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। য়ুরোপীয় শিক্ষার ফলে মূক-বধির-অন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হতে সুরু করে এবং এ কারণেই আকস্মিকভাবে প্রতিবন্ধিতদের (মূক-বধির-অন্ধ ইত্যাদির) শিক্ষার সূচনা হয়। ভারতে মূক-বধির শিক্ষার ইতিহাসকে আকস্মিক বলার পিছনে আর একটি যুক্তি এই যে, য়ুরোপীয় ইতিহাসে প্রাক্-আধুনিক যুগ নামে একটি সুদীর্ঘকালের বিক্ষিপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস আছে; কিন্তু ভারতে এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রস্তুতি পর্বটির সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য য়ুরোপের বিকশিত শিক্ষাপদ্ধতিকেই যদি ভারতে আনয়ন করা হয়ে থাকে, তবে সে পর্বের অনুসন্ধান বৃথা।

ভারতে প্রথম বধির শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচেষ্টা

দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের সমাপ্তিতে। বঙ্গের মাননীয় ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসন্ (Sir Rivers Thomson) স্থানীয় লোকের সহায়তায় কলকাতায় মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সেই মহতী ইচ্ছা কার্যকরী হয় নাই। তাঁর এ কাজে অমৃতবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক এবং কয়েকজন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু জনসাধারণের বিশেষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত না হওয়ায় কার্য সুসিদ্ধ হয় নাই।

ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে খৃস্টান মিশনারীদের দান অপরিমেয়। মূক-বধির শিক্ষার সূচনা এদের আর একটি মহৎ অবদান, মিশনারী উদ্যোগে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে ভারতবর্ষের প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা বোম্বাই-এর প্রধান ধর্মযাজক ডাঃ লিও মিউরিন্ (Dr Leo Meurin)। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ :—

নিজস্ব বাসভবনে বিশ্রামের সময় একদিন রেভ. মিউরিন্-এর সঙ্গে এক মূক-বধির বালকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন এবং কিছু উন্নতি লক্ষ্য করেন। ১৮৮৪ খৃঃ-এ তিনি নিজ আবাসে, নিজস্ব স্বল্প সঙ্গতিতে ঐ অঞ্চলের আরো কয়েকজন মূক-বধির ছাত্র নিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পরে টি এ ওয়ালস্ (T. A. Walsh) নামে একজন আইরিশ বধির-শিক্ষককে তাঁর দেশ থেকে আনান। মিঃ ওয়ালস্ বেলজিয়ামে বধির-শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন। প্রথম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শিক্ষক হিসাবে তাঁরা দু'জন ভারতের বধির-শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

বোম্বাই বিদ্যালয়টি পরিচালনায় মিঃ ওয়ালস্-কে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অনেক অশিক্ষিত এবং কুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক মূক-বধিরদের শিক্ষা-সম্ভব এ কথা বিশ্বাস করতে চান নি। তাঁরা বধিরদের কথা-শিক্ষা দেওয়াকে 'খোদার উপর খোদ্‌কারী'-র অনুরূপ অন্যায় দুঃসাহস এবং শাস্ত্র বহির্ভূত বিষয় ব'লে মনে করতেন এবং যাতে অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ে সন্তানদের প্রেরণ না করেন তার চেষ্টা ক'রতেন, অবশ্য সব দেশেই প্রাথমিক প্রচেষ্টাগুলিকে এ জাতীয় কিছু না কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে ভারতবাসীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা অপরিণামদর্শী বলে আক্রমণ করবার কোনো মানে নেই।

উপরের আলোচনা থেকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও যে মূক-বধিরদের সম্বন্ধে ভারতবাসীর বাস্তবচিন্তা আসে নি, এ কথা অনুমান করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় চেতনাও বর্তমান আছে।

ভারতের দ্বিতীয় মূক-বধির বিদ্যালয় ১৮৯৩ খৃঃ-এর মে মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলায় বধির-শিক্ষার সূচনা খুব আকস্মিক নয়। কারণ প্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর অন্তত ন' বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বধির-সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবাসী অপেক্ষাকৃত স... ন হ'য়েছে। তার প্রমাণ, কলিকাতা বিদ্যালয়টি বাঙালী তথা ভারতবাসীর প্রচেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮ খৃঃ-এর কাছাকাছি সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত বধির মিঃ ম্যাগিন্ (Mr. Francis Maginn) ভারতে মূক-বধিরদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই জেনে, ভারতের তদানীন্তন গবর্নর জেনারেলের কাছে মূক-বধির শিক্ষা প্রবর্তনের প্রার্থনা ক'রে এক আবেদনপত্র পাঠান। গবর্নর সেই আবেদন সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্নমেণ্টের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে মন্তব্য করেন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় তার সারমর্ম উদ্ধৃত করছি :—

'ভারতে একান্নবর্তী পরিবারে বাসের প্রথা চিরপ্রচলিত। পরিবারে অন্ধ, খঞ্জ, বধির

গ্লাডিওলা শিল্পী—শ্রীমতী সরমা ভৌমিক

থাকিলে অন্যেরা তাহাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও কষ্ট হয় না। বিশেষত আর্থিক অনটনে, সাধারণ শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করা যাইতেছে না; এ অবস্থায় ভারতে মূক-বধির স্কুল সংস্থাপন করিয়া অর্থব্যয় করা কষ্টসাধ্য। তবে স্থানীয় লোকের দ্বারা স্কুল সংস্থাপিত হইলে গভর্নমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।' [শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার: মূক-শিক্ষা, পৃঃ ১৯]

কিন্তু প্রস্তাবিত কার্য সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে অনেকদিন কোন সহানুভূতি পাওয়া যায় নি। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য নিম্নরূপ:—

বাবু শ্রীনাথ সিংহ তাঁর মূক-বধির ভাইকে নিজেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন এবং আংশিক সাফল্য লক্ষ্য করেন। এভাবে বধির-শিক্ষণ বিষয়ে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা হয়। ১৮৯৩ খৃঃ-এর এপ্রিল মাসে কিছু মূক-বধিরদের অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে একটি স্কুল আরম্ভ করতে অনুরোধ জানান। সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, বিশেষত অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলেজের একটি ঘরে শ্রীনাথবাবুকে ক্লাস আরম্ভ করতে অনুমতি দেন এবং কলেজের কিছু কিছু আসবাবপত্র ব্যবহারেরও সুযোগ দেন। বিদ্যালয়টির তখন নাম ছিল 'The Deaf and Dumb School'। শ্রীনাথ সিংহ বাংলার বধির-শিক্ষার প্রথম হোতা।

কিছুদিন পরে কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার এবং বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শ্রীনাথবাবুর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মধ্য কলিকাতার তৎকালীন বিশিষ্ট ধনী বাবু গিরীন্দ্রনাথ বসু—যিনি কয়েকটি হতভাগ্য বধির সন্তানের পিতা—তিনি বধির-শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে সুগঠিত রূপ দিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি যামিনীবাবুকে বোম্বাই স্কুলে বধির-শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁর সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সাগ্রহে বহন করেন। তখনকার শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মিশ্র পদ্ধতি। পরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যামিনীবাবুকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। যামিনীবাবু ইংলণ্ডে 'ন্যাশনাল কলেজ' থেকে ডিপ্লোমা গ্রহণের পর ওয়াশিংটনের 'গ্যালোডেট কলেজ'-এ শিক্ষালাভ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে ভারতে সর্বপ্রথম 'মৌখিক-পদ্ধতি' (Oral method)-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২১ খৃস্টাব্দে অকালে যামিনীবাবুর মৃত্যু হয়। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি বধির-শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, অপূর্ব সংগঠন ক্ষমতা এবং কর্তব্যসচেতনা এবং ভারতবর্ষে 'মৌখিক পদ্ধতি'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যামিনীনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর আরব্ধকার্যকে যিনি নিজ স্কন্ধে তুলে নেন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত অটলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনামধন্য অটলচন্দ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বধির-শিক্ষণ ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নিয়মানুবর্তিতা, স্বার্থত্যাগ এবং বধিরদের শিক্ষা ও সমস্যা সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা তাঁকে বর্তমান বধির-শিক্ষকদের গুরুস্থানীয় ক'রে রেখেছে।

পূর্বেই বলেছি, বাংলা দেশে বধির শিক্ষার সূচনার ইতিহাস আকস্মিক নয়। কলকাতার সমাজ-জীবনে বধির সমস্যাটির প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত ঘটেছিল। এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র ক'রে তৎকালীন নাগরিক জীবনে যে সীমাবদ্ধ অন্তঃপ্রবাহী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত 'সুভা' গল্পটি রচনার মধ্যে। বাংলা দেশের বধির-শিক্ষার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। গল্পটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৯৯ সাল (ইং ১৮৯২ খৃঃ-এ), আর কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর বৎসরেই। গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমাজের অজ্ঞতা এবং দায়িত্বহীনতাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন। গল্পটির মধ্যে মূক-বধিরদের সম্বন্ধে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভূতপূর্ব অস্থায়ী হোটলাট সি. সি. স্টিভেন্স, পেন্সনপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এফ জে রো, মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আসামের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ সি ডবলিউ বোণ্টন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুর, রেভারেণ্ড ডাঃ কে এস্ ম্যাকডোনাল্ড ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ এ্যাটর্নি বাবু নবীনচাঁদ বড়ালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৬০টিরও বেশি মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু মিশনারী প্রচেষ্টায় কিন্তু বেশির ভাগই ভারতীয়দের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতে বধির বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে, তা' হচ্ছে এই যে, ভারতের অনেকগুলি বধির-বিদ্যালয়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত মূক-বধিরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিদেশে কিন্তু মূক-বধিরদের নিজস্ব দিক থেকে এ জাতীয় প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। ভারতবর্ষে মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বাঙালীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বধির-শিক্ষার ইতিহাস আকস্মিক হলেও খুব অল্পসময়ের মধ্যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত য়ুরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সমান পদক্ষেপে বধির-শিক্ষণ কার্য চালাচ্ছে। পূর্বে বধির-শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে ছিল না, এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচটি বধির-শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষা দিচ্ছে।

মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রথম পুস্তক রচিত হয় বাংলা ভাষায়, 'মূক-শিক্ষা' নামে তিনখণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকখানি রচনা করেন কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক মোহিনীমোহন মজুমদার, কলিকাতা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত এই পুস্তকখানি ১৩১০ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত। লেখক পুস্তকখানি 'বাগ্মীবর, দেশহিতৈষী, সন্তোষের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়কে' উৎসর্গ করেছেন। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথমগ্রন্থ হিসাবে পুস্তকখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে। পুস্তকখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'সত্যেন্দ্র সংগ্রহে' একখানি আছে এবং আর একখানি আছে 'সাধারণ সংগ্রহে'। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের নিজস্ব লাইব্রেরীতে একখানি কপি আছে।

ভারতে বধির-শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ এখন পর্যন্তও মূক-বধিরদের সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে উঠতে পারে নি। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

বধির-শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশের পশ্চাতে ভারতে যে সব বিশেষজ্ঞ বর্তমানেও কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে দিল্লী 'ব্লেডী নয়েস' স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমলেশচন্দ্র সেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে বিদেশী চিকিৎসকগণ

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতে ওলন্দাজরা (Dutch) আসবার পর থেকেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য সার্জেনরাও আসেন। তাঁদের নামের তালিকা পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায় যে, বাঙলা দেশ থেকে মুগলেরা যখনই যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাতেন, তখনই তাদের সঙ্গে 'ডচ'-কোম্পানীর সার্জেনদের পাঠান হত। মুগলেরা 'ডচ্'-কোম্পানীর কাছে অনেক সময় চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইত আর ডচেরাও সাহায্য দিত। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়।

পিত্রে দে লান (Pitre de Lan)

১৬৫২ খৃস্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্যটক টেভারনিয়ার গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন ও জনৈক ওলন্দাজ যুবক সার্জেনের বাড়িতে বাস করেন। এঁর নাম ছিল পিত্রে দে লান। ইনি গোলকুণ্ডারাজের সার্জেন ছিলেন। জাভা দেশের রাজধানী বাটাভিয়া হতে যখন M Cheteur রাজ-প্রতিনিধিরূপে গোলকুণ্ডায় আসেন, তখন তিনি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। স্বদেশে ফিরে যাবার সময় এঁকে গোলকুণ্ডায় রেখে যান। এই সময় গোলকুণ্ডারাজের বড় মাথা ধরত। রোগ-প্রশমের জন্য জিভের নীচের শিরা হতে রক্তক্ষরণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দেশীয় চিকিৎসকগণ এই সামান্য অস্ত্রোপচার করতে সাহসী হন নি। তখন এই ওলন্দাজ সার্জেন দে লান সহজেই অস্ত্রোপচার করে রাজাকে সুস্থ করেন। এতে রাজা তাঁকে যথেষ্ট পুরস্কার দেন। এরপর অন্য কয়েকটি অস্ত্রোপচারে সফল হওয়ায় রাজদরবারে তাঁর খাতির বেড়ে যায়। তারপর ইনি রাজচিকিৎসক নিযুক্ত হন। Valentyn-এর মতে ইনি ১৬৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গোলকুণ্ডায় ছিলেন।

—Travernier's Travels, Trans. by V. Ball, Vol. 1 P. 30.

বুরজের ক্লড মেইল্লিএ (Claude Maille of Bourges)

১৬৬৫ খৃস্টাব্দে যখন টেভারনিয়ার এলাহাবাদে পৌঁছন, তখন তিনি সেখানকার রাজপ্রতিনিধিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেন। তাঁর চিকিৎসার ভার কয়েকজন পারস্য দেশের চিকিৎসক ও ক্লড মেইল্লিএ-এর ওপর ভার ছিল। ক্লড মেইল্লিএ অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসাকার্য দুই করতেন। এর বেশি তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

[ঐ, ১ খণ্ড ১১৬ পৃষ্ঠা।

বাউটন গেব্রিএল (Gabriel Boughton)

গেব্রিএল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'হোপওয়েল' (Hopewell) জাহাজের সার্জেন ছিলেন। ১৬৩৯ খৃস্টাব্দে সম্রাট শাহজহানের দ্বিতীয়া কন্যা জাহানারা বেগম যখন ভয়ানক রকম পুড়ে যান, তখন তিনি সুরাটে ইংরেজ কুঠিতে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক চেয়ে পাঠান। সুরাট হতে সম্রাট কন্যার চিকিৎসার জন্য ইনি প্রেরিত হন। এঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে—সম্রাট-নন্দিনী শীঘ্রই নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরে পান। সম্রাট এঁকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হলে এই মহামতি চিকিৎসক আপনার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে যাতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকার-বাহাদুরকে শুল্ক না দিয়ে বাংলা দেশে বাণিজ্য করবার অধিকার পায় তাই প্রার্থনা করেন। সম্রাট বাউটনের অভীপ্সিত প্রার্থনা পূর্ণ করে 'ফরমান' দান করেন ও অন্যান্য পুরস্কার দেন। বাউটন দিল্লী থেকে বাংলা দেশে আসেন। এখানে নবাবের জনৈক প্রিয়তমা স্ত্রীলোকের রোগ আরোগ্য করেন। নবাব এঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি এঁকে নিজের চিকিৎসক নিযুক্ত করেন ও ইংরেজদের বিনা পারমিট মাশুলে (Custom duty) ব্যবসায় করতে আদেশ দেন। এই অনুমতি পেয়ে বাউটন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৬৪০ খৃস্টাব্দে দু'খানি জাহাজ পাঠাতে বলেন।—Cyclopaedia of India, p. 424, Burges : The Chronology of India, p. 92, 98.

বারনার্ড (M. Bernard)

মুসলমান সম্রাটেরা বৈদেশিক চিকিৎসকদের কঠিন পীড়ার সময় ডাকতেন ও তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। সম্রাট জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফরাসী দেশীয় বারনার্ড দিল্লীর প্রথম ইউরোপীয় বাসিন্দা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তা নয়, তিনি একজন কুশলী শল্যবিদ্যা-বিশারদ সার্জেন (Surgeon) ছিলেন। তাঁর ওপর সম্রাটের খুব আসক্তি ছিল ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি সম্রাটের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহারাদিও করতেন। বার্নিয়ার বলেন, তাঁর প্রাত্যহিক দর্শনী (fee) ছিল ১০ ক্রাউন বা ৫০ শিলিং (৩৭৷৷০ টাকা)। সম্রাটের বা সম্ভ্রান্ত-ভদ্রলোকদের পর্দানশীন স্ত্রীলোক দেখতে তিনি আরও অধিক দর্শনী নিতেন। ওমরাহদেরও তিনি দেখতেন। তাঁরা বেশ কড়রকমের উপহারও তাঁকে দিতেন। কেবলমাত্র যে ইনি রোগ আরোগ্য করবার জন্য এরূপ উপহার পেতেন তা নয়, সম্রাটের দরবারে ওঁর প্রভুত্ব অসীম ছিল বলেও অনেক সময় প্রচুর উপহার পেতেন। ক্রমশ পদমর্যাদায় ইনি উন্নতি লাভ করেন।

—Bernier, Vol. 1, P. 309.

মানুসী (Manucci)

বারনার্ডের কিছুদিন পরে ইনি আগ্রাতে এসে উপস্থিত হন। ইনি ভিনিসের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীতে ইনি ১৬৪৯ খৃঃ হতে ১৬৯৬ খৃঃ পর্যন্ত ৪৮ বছর বাস করেছিলেন। ইনি সম্রাট শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশেকোর শরীর-চিকিৎসক (body physician) ছিলেন। দারার মৃত্যু পর্যন্ত (১৬৪৯ খৃঃ) ইনি ঐভাবে ছিলেন।

—Burgess : The Chronology of India, P. 98.

ফ্রেয়ার জন (John Freyer)

ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সার্জন ছিলেন। ১৬৭৫ খৃঃ ইনি জেনিয়ার (Jeneah) মুগল সেনাধ্যক্ষের পরিবারে চিকিৎসা করে কৃতকার্য হন। ইনি ১৬৭২-১৬৮১ খৃঃ পর্যন্ত পারস্য ও ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ-এর 'New Account of the East Indies and Persia' ভ্রমণকাহিনী বের হয়। এই বইয়ে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা, অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন ও ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

—Cyclopaedia of India, P. 1154.

ডাক্তার ফোর্থ (Dr. Forth)

১৭৪২ খৃঃ ইনি কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির সার্জেন ছিলেন। পরে আলিবর্দি খাঁ যখন শেববারে পীড়িত হয়ে পড়েন, তখন ইনি বাঙলার নবাবের চিকিৎসা করেছিলেন

ডাক্তার ফলারটন (Dr. Fulerton)

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের মুসলমানেরা যখন উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের হত্যা করে, তখন তারা এঁর গায়ে হাত পর্যন্ত দেয় নি। কারণ এঁর সুচিকিৎসায় বহু মসলমান আমীর-ওমরাহ আরোগ্যলাভ করেছিলেন।

বার্নিয়ার, ফ্রান্সোহিস (Francois Bernier)

ইনি একজন ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী ছিলেন। খৃঃ ১৭ শ' শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে ইনি উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এঁর ভ্রমণকাহিনী হতে মুগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

সম্রাটের প্রিয়পাত্র দৈনিচাঁদ (Dain. Chand) এঁকে একবার কাশ্মীরে নিয়ে যান। জীবনের কিয়দংশ ইনি সিরিয়া ও ইজিপ্টে (মিশরে) অতিবাহিত করেন। চিকিৎসাবিদ্যার গুণপনার জন্য ইনি ভৈষজ্যশাস্ত্রে 'Montellier' উপাধি পান (১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ)। প্যারীর পণ্ডিতেরা এঁকে 'মুগল' এই উপনামে অভিহিত করতেন। ভারতবর্ষে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চিকিৎসকরূপে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আট বছর কাজ করেন। সর্বসমেত ইনি বারো বছর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে প্যারী শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

—The Imperial Dictionary of Universal Biography, Vol. 1, P. 539.

হ্যামলটন, উইলিয়ম (Willium Hamilton)

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইনি অস্ত্রোপচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব জার্নকের নিম্নতম কর্মচারী ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন। কলকাতা হতে জন সারম্যান (John Surman) ও এডওয়ার্ড স্টিফেন্সের অধিনায়কত্বে যে সকল রাজদূত সম্রাট ফরাকসিয়ারের কাছে যান ইনি তাঁদের অন্যতম। এই সময় সম্রাটের পৃষ্ঠ-ব্রণ (carbuncle) হয় ও তাঁর রাজচিকিৎসকেরা কেউ তাঁকে নিরাময় করতে পারেন নি। ইনি তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে এঁকে পাঁচ হাজার টাকা, বহুমূল্যের পাথর, হীরের আংটি, একটা হাতী ও একটা বোড়া উপহার দেন। আরোগ্যলাভ করে সম্রাট জয়সিংহ (Jye Singh) অজিত সিং (Ajit Singh)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। হ্যামিল্টনের প্রভাবেই ইংরেজ-রাজদূতেরা 'ফরম্যান' নিয়ে কলকাতায় আসতে পেরেছিলেন ও কলকাতায় বাস করবার অনুমতি পান। এরপরে সম্রাট এঁকে আপনার অধীনে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন। বহুদিন এদেশে থাকবার পর এঁর স্ত্রী-পুত্রদের দেখবার জন্য দেশে যাবার অনুমতি দন ; কিন্তু এই সর্তে অনুমতি দেন যে, তিনি আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন ও আসবার সময় যে সকল ওষধ এদেশে দুষ্প্রাপ্য তা ইংলণ্ড হতে সম্রাটের জন্য নিয়ে আসবেন। দেশ হতে ফিরে এসে অল্পদিনের মধ্যেই ইনি ১৭১৭ খৃঃ দূষিত জ্বরে (fut id fever) মারা যান। এঁর সমাধিলিপি ঐতিহাসিক তথ্যবিশেষ।—

—Cyclopaedia of India, p, 10; Cal, Past and Present, p. 17-20.

ডাক্তার হনিগবার্গার (Dr- Honigberger)

১৮৩০ সালে হনিগবার্গার তাঁর স্বদেশ হাঙ্গেরী থেকে লাহোরে এসে পৌছন। এখানে এসে তাঁর চিকিৎসা-খ্যাতি প্রচারের সঙ্গে মহারাজা রঞ্জিৎ সিংয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহারাজ রঞ্জিৎ সিং তাঁকে রাজ-চিকিৎসক করেন। মাসিক বেতন ৮০০৲ পরে ৩০০০৲ টাকা। তিনি মহারাজার এতদূর বিশ্বাসভাজন হন যে, তাঁকে একটি প্রদেশের শাসনভার দিতে চেয়েছিলেন—তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রাচ্যে ৩৫ বছর প্রায় ছিলেন। তিনি 'Thirty five years in the East' নামে এক আত্মচরিত লেখেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ডাঃ মারে (Murrey), ডাঃ স্টীল, ডাঃ ম্যাকগ্রেগার, ডাঃ ডবল্যু জেনসন—এঁরা ইউরোপীয় চিকিৎসক। রঞ্জিৎ সিংয়ের আমলে লাহোরে ছিলেন।

—Dr. Honigberger, Thirty five years in the East, 1852, p. 96, 139.

মুসলমান যুগের সায়াহ্নে ও ইংরেজ যুগের প্রারম্ভে ভারতে বহু গুণী চিকিৎসক এসেছিলেন। তাঁদের নাম ও কীর্তি ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জল হয়ে আছে। পাশ্চাত্য থেকে আহরিত চিকিৎসাপদ্ধতি ভারতে প্রবর্তিত হয় তা তখনকার দিনে তৃণসদৃশ হলেও আজ তা মহীরুহ হয়ে জনসাধারণকে কল্যাণ-ছায়া দান করছে।

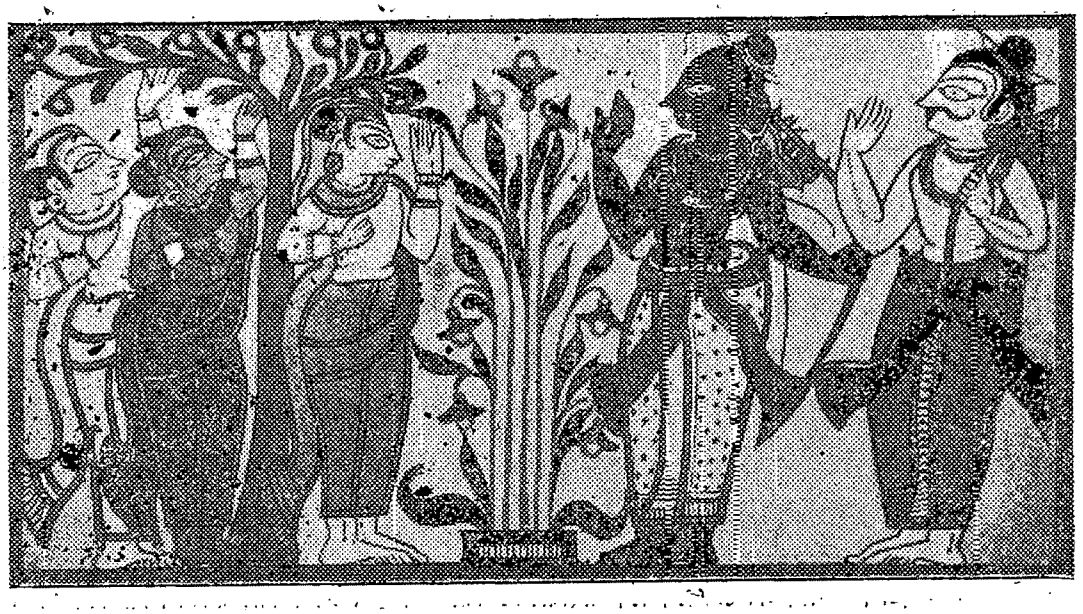

রাম
সীতা
লক্ষ্মণ

শিল্পী—
শ্রীমতী বীথি ঘোষ

এ্যাকসিডেন্ট

কালপুরুষ

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরি হয় কি না জানি না, কিন্তু নীরজার হয়েছিল। আর এ চাকরি ছাড়া তার আর হবেই বা কি? বিদ্যে তো ক্লাশ ফোর অবধি—সুতরাং ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা এবং রান্নাবান্নার কাজ বিধবা নীরজার পক্ষে সম্মানজনক চাকরি-ই।

স্বামী হঠাৎ মারা যাওয়ার পর নীরজার চোখের সম্মুখ থেকে জগতটাই মুছে গেল। শিশুকন্যাকে নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার কারণও ছিল। শাশুড়ি তাকে মোটে দেখতে পারতেন না। ইতিপূর্বে দু-দু'বার তার সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শাশুড়ির অশ্রদ্ধার মাত্রা বেড়ে যায়। এবার যখন কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখনও শাশুড়ি মুখ বেঁকিয়েছিলেন—ও আর ক'দিন। রাক্ষসী মায়ের পেটে জন্মেছে তো! কিন্তু যখন প্রায় তিন বছরের মধ্যে রাক্ষসী মায়ের স্নেহধারায়, যত্নে, মমতায় কন্যা পুষ্ট হয়ে উঠল, তখনও শাশুড়ির মুখে হাসি ফুটল না। সেই সময় মারা গেল নীরজার স্বামী। আর শাশুড়ি হয়ে ওঠেন দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত। সামান্য কথায় তুমুল কাণ্ড বেঁধে যেত এবং অনিবার্যভাবে ঝগড়ার মাঝে শাশুড়ি নিয়ে আসতেন তার ছেলের কথা। নীরজা সে-সময় চুপ করে যেত।

কিন্তু সেদিন যখন নীরজার মা-বাবা পর্যন্ত তুলে শাশুড়ি বললেন—এমন মেয়েও গর্ভে ধরেছিল মা, আমি হলে অমন মেয়ের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম।

নীরজা তখনই বলেছিল—বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিন আমাকে। একবেলা যা হোক করে চলে যাবেই।

স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেন শাশুড়ি নীরজাকে। নীরজা যেন একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে গিয়েছিল—মেয়েটা···।

খিঁচিয়ে ওঠেন শাশুড়ি—মেয়ে! আমার ছেলেকে খেয়েছ তুমি, আবার মেয়ে চাও কোন সাহসে!

কি সাহসে সে মেয়ে পাওয়ার দাবী করেছিল সে তিনি—এক ছেলের মা—নিশ্চয়ই জানতেন। তবু তিনি সে দুর্বলতাকে ক্ষমা করেন নি। নীরজাকে—মা নীরজাকে—শূন্য হাতে বিদায় করেছিলেন। দয়া করে একজন লোক সঙ্গে দিয়ে বাপের বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বাপের বাড়িতে এসে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নীরজা দেখত প্রায়ই—কর্মখালির কলমটা। বাপের বাড়ির অবস্থা তার ভাল নয়। তাই তাকে পেটের দায়ে চাকরির যোগাড় দেখতে হয়। অবশেষে মিলে যায় সুবিধামত এক বিজ্ঞাপন। দরখাস্ত দেওয়ার দিন-সাতেকের মধ্যে উত্তর আসে নিয়োগ-পত্র নিয়ে।

বিজ্ঞাপনে ছিল—নিঃসন্তানা, অল্পবয়স্কা বিধবা হলেই ভাল হয়। দরখাস্তে কি ভেবে নিঃসন্তানা বলেই নিজেকে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু ঐ একটা কথা লিখবার জন্যেই তাকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে যেন। একবার ভেবেছে—মা হয়ে সন্তান আছে জেনেও কেমন করে সে এত বড় একটা মর্মান্তিক মিথ্যাকথা লিখবে? আবার ভেবেছে—একটা-কিছু না করলেও তো চলে না। শেষে ঐভাবেই লিখে দিল দরখাস্ত।

বিজ্ঞাপনের ভাষা যে কত বিভ্রান্তিকর, তা সে এখানে এসে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে।

অমরেশবাবুর মস্ত স্টেশনারী দোকান। তাতে কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। আর ছেলেমেয়ে যা আছে, তাদের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অমরেশবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন দশ বছরেরও উপর।

এই সংসারের মধ্যে এসে পড়ল নীরজা।

রান্নাবান্নার কাজেই দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময় কেটে যেত। কারণ, কর্মচারীরাও এখানে খাওয়া-দাওয়া করত। দু-তিনজন থাকতও তাঁর বাসায়। আর এই সব কর্মচারীদের আসবার সময়ের—বিশেষত দিনের বেলায়—কিছুই ঠিক ছিল না।

বছর ছয়-সাত এইভাবেই কাটল।

তারপরেই নীরজার জীবনে এল আবার বিপর্যয়।

নিশীথ দোকানের তরুণতম সদ্য-নিযুক্ত কর্মচারী। গৌরবর্ণ দেহ, কোঁকড়ানো চুল, বয়স বছর আঠারো-কুড়ি; কিন্তু মুখে-চোখে একটা করুণ বিষণ্ণতা মাখানো। নিশীথের মুখেই নীরজা শুনেছিল ওর-ইতিহাস। অল্পবয়সে মাতৃহীন, পিতা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। সৎমা মোটেই দেখতে পারেন না তাকে। তাই সে পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে—যা হোক করে একটা পেট চালাবার বন্দোবস্ত সে করে নিতে পারবেই।

নীরজা সেদিন নিশীথকে ভাত দিতে এসে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ নিশীথ ঘাড় তুলেই দেখতে পেল—নীরজা শূন্য থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নীরজার মুখখানা, চোখা-চোখি হবার পরেই, কেমন যেন স্নেহে, করুণায় কোমল হয়ে গেল। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে।

নিশীথের মন থেকে ঘটনাটা মুছে যায় নি। পরের দিন দুপুরে খেতে এসে সে জিজ্ঞেস করল—ভাল আপনি অমন করে চেয়েছিলেন কেন আমার দিকে?

—ভাবছিলাম তোমার কথা। এইটুকু বয়েসে ঘর ছেড়ে বেরোতে হয়েছে অন্ন-চিন্তায়! মা থাকলে কি আর—আর অল্প দু'টো ভাত আনি।

—না, না,—মোটেই না। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

অন্য সব কর্মচারী অল্পসময়ের মধ্যেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে যেত দোকানে; ফিরত না শুধু নিশীথ।

সেদিন দুপুরে নিশীথ খেতে বসেছে, সামনেই বসে নীরজা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

নীরজা জেনে নিচ্ছে নিশীথের ইতিহাস। নিশীথের পাতের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ নীরজা উঠে গেল এবং দু'টো সন্দেশ এনে তার থালায় ফেলে দিল। আবার স্বস্থানে বসে পড়ল নীরজা। মৃদু আপত্তিসহকারে একটা সন্দেশ খাওয়া শেষ হয়েছে; আর একটাতে যেই হাত দিতে যাবে নিশীথ, অমনি দরজার সামনে মূর্তিমান আতঙ্কের মত অমরেশবাবু এসে দাঁড়ালেন।

গম্ভীরস্বরে শুধোচ্ছেন তিনি—হুঁ, রাজসূয়-যজ্ঞের আয়োজন দেখছি যে। কতদিন ধরে চলছে এমন?

দু'জনেই নির্বাক নীরজা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—দরজা ছাড়ুন।

—না, জবাব দিয়ে যাও।

—কিসের জবাব?

—সন্দেশের পয়সা আসে কোথা থেকে?

—তাতে আপনার কি দরকার—আপনার তহবিল থেকে নিশ্চয়ই না, এটুকু বলতে পারি।

—কে জানে?—একটা ক্রূর হাসি হেসে পথ ছেড়ে দিলেন অমরেশবাবু। তাঁরও তখন খাওয়া-দাওয়া হয় নি। রাগে-দুঃখে নীরজা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না।

পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল নিশীথ। এবার উঠে পড়ল। সন্দেশ একটা পড়েই রইল। অমরেশবাবু তা দেখলেন, বিদ্রূপ-ভঙ্গীতে বললেন—ওটা আর পড়ে থাকে কেন?

নিশীথ উত্তর না দিয়ে বক্রদৃষ্টি হেনে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমরেশবাবুও তেমনি দৃষ্টিহেনে বললেন—হুঁ, অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে দেখছি। আচ্ছা—।

কয়েকদিন পর রাত্রে খেতে বসে নীরজাকে বললেন অমরেশবাবু—দেখ, তোমার ভালর জন্যেই বলছি। তুমি বিধবা মানুষ। আর নিশীথ ছোকরা কর্মচারী। কর্মচারীরা আমার সবাই সমান—এই পর্যন্ত বলে মুখ তুলে তাকালেন।

নীরজা কোন উত্তর দিল না। তবু তিনি বলে চললেন—তা ছাড়া যতদূর খবর পেয়েছি ওর স্বভাবটাও নাকি ভাল নয়। দেখতেই ওই রাঙা টুকটুকে—

বাধা দিল নীরজা—মিছে কথা। ওর মত সচ্চরিত্র কর্মচারী আর হতে পারে না।

একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে অমরেশবাবু বললেন—তা হয়ত হবে। তবে কি না সেদিনের সেই ব্যাপারটা নিয়ে খুব ঘোট পাকানো হচ্ছে কি না, তাই—

ঘৃণা বোধ হলেও মাঝপথেই নীরজা উত্তর দিল—সে তো আপনিই বলে বেড়াচ্ছেন। আমার জানতে বাকি নেই।

—আমি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন অমরেশবাবু।

—হ্যাঁ—আপনি। না হলে কি আর এমন ঘটনা; তা বাদে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি সেদিন আর কেউ ছিল না।

এরপর নীরবে খেয়ে উঠে গেলেন অমরেশবাবু।

নিশীথকে অতঃপর দোকানে তীব্র কটাক্ষ, বিদ্রূপ বাণ, সহ্য করে কাজ করে যেতে হল। এতেও তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু যখন চুরির অপবাদ মাথায় নিতে হল তখনই আর তার সহ্য হল না।

বাজারের পথে একজন গ্রাহক অমরেশবাবুকে বললেন—আপনার টাকাটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছি—জমা করেছেন তো? নিশীথ নিয়ে এসেছে।

অবাক হয়ে রইলেন অমরেশবাবু—টাকা! কই না তো! মনে পড়ছে না আজ কোন টাকা জমা হয়েছে বলে

সন্দেহ বেড়ে গেল গ্রাহকের—সে কি?

বুক-পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করলেন তিনি; পেয়ে গেলেন যা খুঁজছিলেন। এই যে—দেখুন। দেখালেন টাকা দেওয়ার রসিদ।

—ওঃ তা হবে। বলে অমরেশবাবু চলতে চলতেই বললেন—আচ্ছা, আসি দেখব আর একবার।

দেখা তাঁর আর হয় নি। উল্টে নিশীথকে খুব শাসিয়েছেন—ক্যাশের টাকা মেরে দিয়েছে। এ রকম অসাধু কর্মচারীকে একদণ্ডও তাঁর রাখতে ইচ্ছে নেই। নিশীথ যত বলে টাকা দিয়ে দিয়েছে, অমরেশবাবু ততই চীৎকার করেন, না দাও নি তুমি। তোমায় এজন্যে জেল খাটাতে পারি, জানো।

নীরজা সব শুনল রান্নাঘরে বসে।

গভীর নিশুতি রাত।

কোমল হাতের শীতলস্পর্শে জেগে উঠল নিশীথ। চেঁচাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একখানা হাত তার মুখ চেপে ধরল।

—নিশীথ, আমি—নীরজা।

—আপনি এত রাত্রে। কি দরকার?

—শোন নিশীথ। এটা রাখো, বিক্রি করে কালই টাকা দিয়ে দিও। আর, আপত্তি যদি থাকে, পরে টাকা দিয়ে দিও আমাকে।

—কি জিনিস এটা?

নীরজা তার হাতে ফেলে দিতেই সে অনুভবে বুঝল সোনার আংটি একটা।

—আংটি! সোনার!—না, এ আমি নিতে পারব না। আপনি নিয়ে যান।

—দেখো নিশীথ, সামান্য ক'টি টাকার জন্যে তোমার চোর অপবাদ আমি সহ্য করতে পারব না।

—এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি আমি, টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি। উনি যদি এখন না তুলে থাকেন খাতায়—কান্নায় স্বর রুদ্ধ হয়ে এল নিশীথের।

ধরা-গলায় নীরজাও বলল—তা কি আর আমি জানি নে?

পরদিন আংটি বিক্রি করে টাকা শোধ দিতে দেখে অমরেশবাবু অত্যন্ত বিস্মিত বোধ করলেন,—শুধোলেন, টাকা কোথা থেকে পেলে?

—তাতে আপনার দরকার কি? আপনার হিসাব মিলেছে কি না, তাই দেখুন।

—হুঁ, খুব কথা শিখেছ।

নিশীথ কোন উত্তর দিল না।

নিশীথের দিকে তাকালে নীরজার কেমন যেন একটা মায়া হয়। তার অসহায় মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, অনেক ঝঞ্ঝা, অনেক অনর্থ তার এইটুকু জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে।

দু-একদিন পরে নিশীথ যখন কাজ ছেড়ে দিতে চাইল এবং মাইনে মিটিয়ে দিতে বলল—তখন অমরেশবাবু শুধোলেন, কোথাও কাজ ঠিক করেছ বুঝি?

—না—গম্ভীরস্বরে উত্তর করল নিশীথ।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এইভাবে অমরেশবাবু বললেন—হ্যাঁ শোন নিশীথ, সেদিনের সে টাকাটার হিসেব পাওয়া গেছে।

তখনই বাসুকে সেটা দিয়েছিলাম বাড়ির জন্যে সিমেণ্টের খাতে। বাসু ছুটি থেকে ফিরে এসে আমাকে বলতেই আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই; এ-রকম তো হয় না কোনদিন। যাক—কিছু মনে ক'র না। দু' একদিনের মধ্যেই তোমার ও-টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেব।

নিশীথ কোন কথা বলল না। অমরেশবাবু আবার শুধোলেন—তবে কি কাজ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলে?

গম্ভীর স্বরে বলল নিশীথ—হ্যাঁ।

অগত্যা অমরেশবাবু মাইনে মিটিয়ে দিলেন—ঐ সঙ্গে নিশীথের সেদিনের আদায়করা টাকাটা। কিন্তু নিশীথ নিজের মাইনের টাকাটা ছাড়া আর কিছুই নিল না।

দোকানের অন্যতম কর্মচারী বাসু এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল। নিশীথ চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সে একেবারে কেঁদে ফেলল নিশীথের হাত ধরে—সত্যি চললে ভাই! আমারই ভুল হয়েছিল, টাকাটার কথা মনে করিয়ে দিই নি সঙ্গে সঙ্গে। আমার দোষেই আজ তোমাকে পথে বসতে হচ্ছে।

ম্লান হেসে বলল নিশীথ—না না, তোমার কোন দোষ নেই। আমারও তো উচিত ছিল, টাকাটা জমা হলো কি না সে-খোঁজ নেওয়া।

নিশীথ বেরিয়ে পড়ল—একান্ত একা। একদিন যেমন ঠিকানাবিহীন ভাসতে ভাসতে এসে এখানকার ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল, আজ আবার তেমনি নিরুদ্দেশের পথে তার যাত্রা সুরু হল। হাতে সম্বল মাইনের গোটা-তিরিশ টাকা আর নীরজার আংটি বেচে ধার শোধ দেওয়ার পর পাঁচটি টাকা যা বেঁচেছিল, সেই টাকা ক'টি।

এ টাকা পাঁচটি ফেরৎ দিতে গিয়েছিল নিশীথ; কিন্তু নীরজা নেয় নি। বলেছিল, ও আর আমার কি হবে? তুমি যে দায় উদ্ধার হতে পেরেছ, এইটেই আমার সবচেয়ে আনন্দের কথা।

নিশীথের চোখে জল এসে গিয়েছিল। নীরজার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল জলভরা চোখে।

নীরজা এগিয়ে এসে নিজের আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল—পুরুষমানুষের অত যখন-তখন কাঁদতে নেই।

—কই, কাঁদছি না তো! মেঘলা-ভাঙা রোদের পর সূর্যের একটুকরো আলোর আকস্মিক প্রকাশের মত হেসে উত্তর দিয়েছিল নিশীথ।

সন্তানের দৈব-দুর্ঘটনার ছায়া নাকি জননীর বিশাল হৃদয়ে আগে-ভাগেই পড়ে; জননীকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। নিশীথের একদিনের অনুপস্থিতিও নীরজার মনে তেমনি একটা আশঙ্কার আভাস ঘনিয়ে তুলল। কিন্তু কথাটা বলি-বলি করেও কাউকেই বলতে পারল না। একবার ভাবল অন্য কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে এর কারণ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল—সে-পথে গেলে অমরেশবাবুর কুটিল রসনা কুৎসিত রটনার প্রবাহে অতিক্রুত সিক্ত হয়ে উঠবে। আর তার শাখা-প্রশাখার বিস্তারও হবে তীব্রগতিতে।

নীরজার চোখে ঘুম নেই। ছেলেটা গেল কোথায়? মাতৃহারা এক যুবকের নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়তার কথা ভেবে তার সারা অন্তর জুড়ে জেগে উঠল হাহাকার। নিজেকেও যেন পরম আশ্রয়হীনার মত মনে হতে লাগল হঠাৎ। আবার একসময় নিশীথের উপর অভিমানও এসে গেল অকারণেই—ছেলেটা একবার দেখা পর্যন্ত করে গেল না! পুরুষমানুষ এমনিই নিমকহারাম হয় বোধ হয়।

হঠাৎ নীরজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এক ভাগ্যহত যুবক এই অন্ধকার রাতে পথে পথে হয়ত একটু আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরছে, হয়ত সারাদিন অভুক্ত; আর সে দিব্যি অন্নের গ্রাস মুখে তুলেছে, পাকা-দালানে রাত কাটাচ্ছে! চোখের জল বাধা মানল না। খানিকক্ষণ কাঁদবার পর নিজেই একসময় চুপ করল। কিন্তু ঘুম আর তার কিছুতেই এল না। একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ করতে লাগল। শেষে একবার বাইরে শীতল বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে উঠল। দরজার খিল খুলে একটা পাল্লা ধরে টানতেই অদূরে চোখে পড়ল, ছায়ামূর্তির মত কে-যেন সরে গেল। অন্ধকারে ঠিক চিনতে না পারলেও ভুল হয় নি তার ঐ ছায়ামূর্তির সম্বন্ধে। প্রথমে একটু চমকে গেলেও পরে হেসেছে নীরজা। যেন, এরকম একটা ঘটনা যে ঘটবে তা সে জানত-ই; তবে সেটা যে আজই ঘটবে, সে-কথা তার অজানা ছিল। তাই সে এরপর নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি করে সচেতন হতে আরম্ভ করল।

নিশীথ নেই। সারা বাড়িটা এই একটিমাত্র লোকের অভাবে কি যেন এক অতল নিস্তব্ধতার সাগরে ডুব দিয়েছে! অমরেশবাবুও আশ্চর্যরকমের গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। নিঃশব্দে আসেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রামান্তে চলে যান। নীরজা কি সেদিন তাঁকে চিনেছে?

একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ দিনরাত্রি কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে থাকে। রাত্রির আঁধারের যবনিকায় যে ঘটনা তুচ্ছ করে ফেলেছিলেন, পরের দিন দিনের আলোকে তা তাঁকে একান্তভাবেই হীন ও লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিত—নিজেকে অপরাধী মনে করতে তিনি কিছুতেই পারতেন না—বিশেষ করে নীরজার সামনে এলে। এর চাইতে নীরজা যদি সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, তিনি অকপটে সব স্বীকার করে, মনের কলঙ্কিত বোঝা তার কাছে নামিয়ে, ক্ষমা চেয়ে নিতেন। নীরজা সে ধার দিয়েও যায় না।

নীরজার নামে কোন চিঠি কেউ আসতে দেখে নি তাই সেদিন তার নামে হঠাৎ একখানা চিঠি আসাতে একটা সোরগোল পড়ে গেল—চিঠি! রাঁধুনীর নামে!

অমরেশবাবু শুনলেন দুপুরে এসে। খেতে বসেই প্রথম প্রশ্ন—তোমার নামে কে চিঠি লিখল? কই, এতদিনের মধ্যে কেউ তোমাকে কোন চিঠি লিখেছে বলে তো মনে পড়ছে না! তোমার যে কেউ আছে, তাই তো জানতাম না।—একসঙ্গে এতগুলো কথা অপ্রয়োজনে বলে ফেলে এতদিনকার গাম্ভীর্যটাকে একটু হাল্কা করে নিতে চেয়েছিলেন অমরেশবাবু। তাই বক্তব্যের পর নিঃশব্দে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে লাগলেন—উত্তরের তো তাঁর প্রয়োজন ছিল না,—ছিল শুধু দু'জনের সম্পর্কটাকে পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।

চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকেই নীরজার মনটা ভাল ছিল না। তাই সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—নিশীথ লিখেছে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে রাখলেন অমরেশবাবু। এবার তাঁর ভিতরে জেগে উঠল একটা পরিবারের সর্ব-নিয়ন্তা কর্তা। একটা কঠিন প্রশ্ন একেবারে ঠোঁটের গোড়ায় এসেও ছিল; কিন্তু অতিকষ্টে সেটা সামলে নিয়ে শুধোলেন—টাকা চেয়েছে বোধ হয়?

অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে নীরজা বলে উঠল—না।

—তবে?

নীরজা ততক্ষণে ওখান থেকে চলে

এসেছে, নইলে উদ্‌গত অশ্রু কিছুতেই দমন করতে পারত না সে।

অমরেশবাবু নিঃশব্দে আহার করে চললেন। অন্যদিন হলে এ বেয়াদবী তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না।

ইতিমধ্যে চোখ-মুখ জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে আঁচলে মুছে নীরজা আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অমরেশবাবু মুখ তুলে তাকালেন। কিন্তু এর পর নিশীথের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন হবে কি না ভাবতে লাগলেন। শেষে একেবারে স্থূল জগতে নেমে এলেন, বললেন—দু'টো ভাত নিয়ে এস।

ভাত নিয়ে পাতে ঢালতেই অমরেশবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন—আরে সব ভাত দিয়ে দিলে নাকি?—তোমার?

—আমার আজ আর ক্ষিদে নেই।

—সে কি! তাই কি হয়? এত ভাত তো নষ্ট হবে। খানিক থেমে অতঃপর পরম স্নেহভরে তিনি নীরজাকে বসতে বললেন। নীরজাও যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ল। মুখের দিকে এবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখে অমরেশবাবু বুঝলেন—খানিক আগে নীরজা কেঁদেছে। কয়েক গ্রাস ভাত নিঃশব্দে মুখে তোলবার পর মুখ নীচু করেই নীরজাকে বললেন—নীরজা, সত্যি করে বল তো, তোমার আজ কি হয়েছে? নিশীথের চিঠিতেই কি এত মন খারাপ হয়ে গেল? কোথাকার কে-এক বখাটে ছোকরা, না আছে বাড়ি-ঘর, না কোন দেখবার লোক,—ব'লেই নীরজার দিকে তাকাতেই বাধা পেলেন বক্তব্যে। আগ্নেয়গিরির চেহারা তিনি দেখেন নি কোনদিন। গল্প শুনেছেন, বইয়ে পড়েছেন, ছবি দেখেছেন—বাইরে তার শান্ত-সমাহিত রূপ। কিন্তু ভিতরে জ্বলে অনন্ত প্রতিহিংসার আগুন। ফেটে পড়বার পূর্ব-মুহূর্তে তার মুখ-গহ্বরের চেহারা হয় ভয়াবহ, নিষ্ঠুর। নীরজার মুখমণ্ডলেও জীবন্ত আগ্নেয়গিরির চিহ্ন তিনি দেখতে পেলেন; তাই হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর প্রশ্নের ধারা পালটে জিজ্ঞেস করলেন—যাক, সে ভাল আছে তো? কোথায় আছে? কাজ পেয়েছে কোথাও নিশ্চয়! ছেলেটা কিন্তু সৎ ছিল।

একটা কথাও যেন নীরজার কানে যাচ্ছে না, সেইভাবে নীরজা হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে শেষে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলল—ভাল আছে কি না জানি না, তবে বর্তমানে জেলে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন তুলে ধরলেন অমরেশবাবু। নীরজার তা বুঝতে বাকি রইল না। তার বুকখানা মথিত করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শুধু—সৎ-লোকের জায়গা এখনকার দুনিয়াতে নেই।

অমরেশবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না নীরজার এ মন্তব্যের অর্থ। তাই তিনি নিজেই বলে উঠলেন—বিশ্বাস করো নীরজা, আমি তাকে তাড়াই নি; সে নিজে থেকেই চলে গেল। দোকানের দু-এজন কর্মচারী হাত পর্যন্ত ধরেও ফেরাতে পারে নি। একটা ঢোক গিলে নিয়ে বললেন—আমিও কি তাকে কম বলেছি?

নীরজার হাসি এল এত অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও। বলল—আমি কিন্তু আপনাকে বলি নি মোটেই। বস্তুত, আমি জানতাম-ই না যে, সে এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কেউ আমাকে বলেও নি। নিশীথ এ-চিঠি না দিলে আমি বোধ হয় জানতেও পারতাম না ছেলেটা মরল না বেঁচে আছে।

হঠাৎ উঠে গেল নীরজা। একটু পরেই একখানা খামের চিঠি এনে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল—পড়ে দেখুন।

চিঠিখানা দেখবার জন্যে অদম্য আগ্রহ-বশতই হউক অথবা খাওয়া শেষ হওয়ার জন্যই হউক, অমরেশবাবু তখনই উঠে পড়লেন। চিঠিখানা হাতে করে নিয়ে যেতে ভুললেন না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমরেশবাবু পড়তে লাগলেন চিঠিখানা।—চিঠিখানা ছিল এই:

'শ্রীচরণেষু,—

আজ যেখান থেকে চিঠি লিখছি, আপনি যে তাতে আশ্চর্য এবং দুঃখিত হবেন, তা আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমার এত বড় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের কাহিনী আপনাকে ছাড়া জানাবার মত লোক এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। তাই আপনাকে জানিয়ে ভার লাঘবের চেষ্টা করলাম।

ভাগ্য যখন বিরূপ হয়, তখন সেই বিরূপতাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি সত্যিই এ-জগতে নেই। তা ছাড়া, মানুষ মনুষ্যত্ববোধ হারালে তত নীচে যে নামতে পারে, আমার ঘটনা-ই তার প্রমাণ।

অমরেশবাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে লজ্জায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, সেটা আমার পক্ষে ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা হয়েছে। জানি যদিও যে, আপনি আমাকে যে-লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তার ঋণ আমার পক্ষে সারাজীবনেও শোধ করা সম্ভব হবে না। লজ্জা ছিল অন্য কারণে। অমরেশবাবুর সামনে পড়লে আপনাকে হয়ত অপমান করে বসতেন তিনি। তাই আর ও-মুখো হই নি। কিন্তু হলেই বোধ হয় ভাল হত।

স্টেশনে এলাম। কোথায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক একটি সুটকেশ হাতে করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে মিনতি করে বললেন—এটা একটু ধরবেন? আমি এক্ষুণি আসছি।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, ভদ্রলোকের দেখা নেই। আমি চিন্তিত হলাম—কেমন ভদ্রলোক! সুটকেশ রেখে চলে গেলেন। দু-একজনকে বললামও ঘটনাটা, তারা কেমন অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল—আপনি তো আচ্ছা নির্বোধ দেখছি।

তখনও আমি বুঝি নি যে কারো এই সামান্য উপকারের অন্তরালে কি ঘোরতর নির্বুদ্ধিতা লুকিয়ে আছে।

একজন পুলিশ কনেস্টবল এল। বলল—সুটকেশ খোলো। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম—আমি কেন সুটকেশ খুলতে যাব? আমার তো নয় এ সম্পত্তি। বললাম সে-কথা। পুলিশ কনেস্টবলটি আপত্তির হাসি হেসে বললে—ও রকম সবাই বলে। খোলো বাছাধন ওটি। আমাদের কাজ সেরে নিই।

তখন বললাম—চাবি নেই আমার কাছে।

ইতিমধ্যে সঙ্গী আরো একজন কনেস্টবল জুটেছে। সে বলল—সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, বোঝা যাচ্ছে। একটা ধমক দিয়ে বলল—শালা, খুলবি কি না বল! বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলে ঝাঁকানি দিয়ে গালে একটা চড় কষে দিল।

থতমত খেয়ে বললাম—চাবি কোথায় পাব?

হেসে গড়িয়ে পড়ল তারা—শালা চাবি সরিয়ে ফেলেছে রে! ভাঙতে হবে সুটকেশ। চল, নে ধর ওটা।—আমার হাতে সুটকেশ দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল স্টেশন-মাস্টারের অফিসের ভিতরে।

সুটকেশের তালা ভাঙা হল তার সামনে। প্রথমে বেরোল খান-কতক ধোয়ানো সযত্নে ভাঁজ-করা, জামা-কাপড়। তারপরে কিছু কাগজপত্র, খাতা ইত্যাদি; তারপরে আবার কাপড়ের ভাঁজ। কিন্তু তার নীচে যা ছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, পুরানো ব্যবহৃত কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে ঠাসা, বে-আইনী ভাবে আমদানী করা, প্রায় সের তিনেক গাঁজা!

পাপীগুটা ছিল উদোরই, কিন্তু তা চাপল বুধোর ঘাড়ে। তাই অতঃপর পুলিশে করল আইন-মোতাবেক ব্যবস্থা—থানা, কেস-ডায়েরী, কোর্ট, অবশেষে এই সুউচ্চ প্রাচীর-ঘেরা খণ্ডিত জগতের অধিবাসী আমি।

প্রণাম জানাতে ভয় হয়, তবু জানালাম এই ভরসায় যে, আপনি ছাড়া প্রণম্য হিসাবে আর কাউকে চোখে পড়ছে না।

ইতি—হতভাগ্য নিশীথ

পুনশ্চ :—

আমার সঙ্গে যে সামান্য টাকাকড়ি ছিল, তার শেষ পর্যন্ত কত বড় পাখা গজাল, তা টের পাই নি; তবে উড়ে গিয়েছে এইটুকু বুঝতে পেরেছি। ওরা বলেছিল—থানায় জমা হবে। হয়ত হয়েছে, কিন্তু সেটা সরকারী না বে-সরকারী খাতায়—তা বলতে পারব না। তবে জেল-গেট পর্যন্ত আজও তা পৌঁছায় নি, এই শুধু জানি।

রাত্রিতে চিঠিখানা নিঃশব্দে ফিরিয়ে দিলেন অমরেশবাবু। সমবেদনার বাণী শোনালেন নীরজাকে—সত্যিই ভালমানুষের জায়গা নয় আজকের দুনিয়াটা।

নীরজা কোন কথা বলল না।

অমরেশবাবু শুধোলেন—কি করবে এখন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় নীরজা—দেখি!

অনেকদিন পর কি মনে করে সযত্নে রক্ষিত পুঁটলীটা নিভৃতে সেদিন একবার খুলে দেখল নীরজা। চকচক করছে একজোড়া সোনার তাগা, নিরেট সোনার, তার মায়ের দেওয়া। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। শাশুড়ির চোখে ধুলো দিয়ে সে এ দু'টিকে রক্ষা করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে আনতে পেরেছে—ভগবানকে ধন্যবাদ। হাত দু'টো কপালে ঠেকাল একবার।

পরদিন দুপুরবেলা, এ বাড়ি নিস্তব্ধ হওয়ার পর নীরজা একাই বেরিয়ে পড়ল। এসে দেখা করল নিশীথের সঙ্গে—জেল-গেটে। সব তার কাছ থেকে জেনে গেল কোর্টে।

উকিল-মোক্তারের পিছনে বেশ কিছু টাকা ব্যয় করে নীরজা যখন ফিরে এল তখন প্রায় সন্ধ্যে।

সাত-আট দিন পর নিশীথের কোর্টে হাজিরার তারিখ ছিল এবং ঐ তারিখে মোক্তারেরা নীরজাকে একবার যেতে বলেছিল। সেদিনই নিশীথের জামিন হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

কোর্ট লক-আপে দুপুরে দেখা করল নীরজা। নিশীথকে বলল—জামিন হলে আমার কাছে যাবে কিন্তু।

কৃতজ্ঞতায় সজল চোখ তুলে তাকাল নিশীথ। ভিজে-ভিজে গলায় বলল—কিন্তু অমরেশবাবু যদি কিছু বলেন।

হাসল নীরজা—সে আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কোন কথা বললে, আর কিছু না পারি, কাজ তো ছেড়ে দিতে পারব। তুমি পারবে না নিতে আমার ভার?

সন্তান কি মাকে কখনও ফেলতে পারে?

বেলা চারটে নাগাদ জামিনে বেরিয়ে গেল নিশীথ। তারপর দু'জনে এসে উঠল অমরেশবাবুর বাড়িতে।

যে-প্রসঙ্গ সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল, নিশীথকে ফিরে আসতে দেখে সেই প্রসঙ্গই আবার রসালো হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু অমরেশবাবুর মনে পড়ল সেদিনকার রাত্রির ঘটনা; নিশীথকে দেখে তিনি যেন আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু সে-ভাবটা তিনি ওদের কাউকেই বুঝতে দিলেন না।

সেইদিনই রাত্রিতে তিনি নীরজাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—ও সব চোর-ছ্যাঁচোড়ের আশ্রয় এ বাড়িতে হবে না। নিশীথ চোর-ছ্যাঁচোড় যে নয়, তা তিনি জানতেন, কিন্তু এবার সত্যিই তিনি তাকে তাড়াতে চেয়েছিলেন অন্য কারণে। সব সময় তাঁর ভয় হত, সেদিনের ব্যাপারটা বোধ হয় নিশীথের কানে তুলেছে নীরজা।

একটু ঘুরিয়ে অমরেশবাবুর বক্তব্য নীরজা শোনাল নিশীথকে। নিশীথ বলল—আপনি কি বললেন?

—আমি? আমি কিছু বলি নি। আমি যা করব, তা কাল দেখতে পাবে। তুমি তৈরি থেকো নিশীথ।

কোর্টের হাজত-ঘরে দেখা করতে গিয়ে যে প্রতিশ্রুতি নীরজা দিয়েছিল তার কথা মনে পড়ল নিশীথের। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল তার।

পরদিন সকালে, নীরজাকে না জানিয়েই, নিশীথ কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ফিরে এল দুপুরের কিছু আগেই। বলল—ঘর একখানা ভাড়া করে এলেম।

গর্বের হাসি ফুটে উঠল নীরজার মুখে—সন্তানের উপযুক্ত কাজ করেছে বটে।

অমরেশবাবু দুপুরে বাড়িতে আসতেই নীরজা বলল—সে আর এখানকার চাকরি করবে না।

জ্বলে উঠলেন অমরেশবাবু, ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করে বললেন—ওঃ, দু'টিতে যুক্তি করে করা হয়েছে। তা না হলে মানাবে কেন? রাঁধুনী মেয়েমানুষ আর কত ভালো হবে! ছোঁড়াটার মাথা তুমি-ই খেলে দেখছি!

হঠাৎ নিশীথ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ে বলল—মুখ সামলে কথা বলবেন অমরেশবাবু। মনে রাখবেন—এখন আর আপনি আমার মনিব নন, আমিও চাকর নই। তা ছাড়া, উনি আমার মায়ের মত!

বিকৃত মুখভঙ্গী করে অমরেশবাবু উত্তর দিলেন—এঃ ভারী দরদ দেখছি। অতই যদি তো নিয়ে যাও না দেখি, কোন চুলোয় যাবে—

রাগে কাঁপতে লাগল সর্বশরীর, তবু তা অতিকষ্টে দমন করে বলল নিশীথ নীরজাকে লক্ষ্য করে—আপনি চলে আসুন! আমার যদি একমুঠো জোটে, আপনারও জুটবে।

বেরিয়ে এল নীরজা।

অমরেশবাবুর সুর হঠাৎ অত্যন্ত নরম হয়ে এল। বললেন—সত্যিই চললে নীরজা! তা-ও একেবারে অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে।

ঘুরে দাঁড়াল নীরজা, বলতে যাচ্ছিল কিছু একটা; কিন্তু দ্বিতীয়বার নিশীথের ডাক শোনা গেল।

—চলো—বলেই বেরিয়ে গেল নীরজা।

—তোমার মাইনেটা—বলতে চাইলেন অমরেশবাবু, কিন্তু স্বর ঠিক স্পষ্ট হল না। তবু নীরজার কান এড়াল না।

—থাক। চলে গেল নীরজা।

দু'জনে এসে উঠল একটা বস্তির খোলার ঘরে, সস্তা ভাড়ায়। নিশীথ বলল—তাড়াতাড়িতে আর ভাল করে খুঁজতে পারি নি। যত শীগ্‌গির সম্ভব উঠে যা অন্য যায়গায়।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় নিশীথ বলল নীরজাকে—এবার তো একটা কাজ খুঁজতে হবে আমাকে। ভাবছি এখানকার কেসটা মিটলে এ শহরই ছেড়ে অন্য কোথাও যাব।

খানিকক্ষণ কি ভেবে নিয়ে নীরজা বলল—একটা কথা তোমায় বলি নিশীথ, সে কথা কেউ জানে না। এই শহরেই আমার একখানা সাইকেলরিক্সা ভাড়া খাটে। আমি মাস-কাবারে তার চালকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বুঝে আনতাম। যা দিত হাতে তুলে, তাই সই। তা সেই রিক্সাটাই তুমি এখন চালাও না কেন? দু-চারদিন চালালেই অভ্যেস হয়ে যাবে।

—বেশ তো, কাল থেকেই ব্যবস্থা করে

দাও, মা! নিশীথ এই প্রথম 'তুমি' সম্বোধন করল। এতদিন যেন একটা দূরত্বের ব্যবধান ছিল; নিশীথের মনে সেটা পীড়া দিত। আজ মন খুলে সে নীরজাকে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে সম্বোধন করে স্বস্তি পেল।

পরদিন থেকে তাই হল।

নিশীথের মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, এখানকার পরিবেশ থেকে তাদের অন্যত্র উঠে যেতেই হবে। সেইজন্য সে অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনে মন দিল। সকালবেলা বেরিয়ে যায়; আবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে ফিরে আসে কোনদিন রাত এগারোটায়, কোনদিন বা বারোটায়। অবসরে, ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত বোধ করলে, গেলে খালি চা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই নিবারণ করে তাতে।

শরীরের ভিতরে যে দুর্যোগের সঙ্কেত দিচ্ছিল, সেটা বুঝতে পারলেও গায়ের জোরে নিশীথ তা অগ্রাহ্য করে এসেছিল এতদিন। অবশ্য যাত্রীরাও অংশত দায়ী সেজন্য। তার চেহারাই ছিল তার যাত্রী আকর্ষণের মৌন অথচ জোরালো বিজ্ঞাপন।

একদিন সত্যিই আর চলল না। পা দু'টো বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিছানা নিতে হল নিশীথকে।

ডাক্তার এলেন। দেখে বললেন—ভয়ের কিছু নেই—ইনফ্লুয়েঞ্জা। দিন পাঁচ-সাতের মধ্যেই সেরে যাবে।

নিশীথের মনে পড়ল—তার কেসের তো তারিখ আছে এর মধ্যে। বলল সে কথা নীরজাকে।

নীরজা ধমক দিয়ে বলল—থামো তুমি। আমি জানি তা। সে সব তোমাকে অসুস্থ শরীরে ভাবতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করেছি। একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হবে, তাও আমি বন্দোবস্ত করেছি।

নিশীথের চোখে জল এসে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখ মুছে নিল।

প্রায় একমাস পর নিশীথ কিছু সুস্থ হল। নীরজা তবু তাকে কাজে যেতে দিল না। আরও দিন পনের পর সে নীরজার নিষেধ অমান্য করে কাজে বেরোল বটে, কিন্তু উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দিত না নীরজা। প্রথম বেরোবার দিন-ই নীরজা গম্ভীরমুখে বলেছিল—বেরোবার সময় আর বাধা দেব না; কিন্তু আগের মত যদি দিনরাত পয়সার পেছনে ঘোরো, তবে আমি যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। শরীরটা আগে।

নীরজাও যে গোপনে গোপনে কাজ খুঁজছিল শুধুমাত্র নিশীথকে সাহায্য করবার জন্যেই, সে কথাটা সে কোনদিন কাউকেই বলে নি। সেদিন কাজের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর কথাটা ফাঁস করল নিশীথের কাছে।

—একটা কাজ ঠিক করলাম নিশীথ—মেয়েদের স্কুলের হোস্টেলে রান্নার কাজ।

—বুঝেছি; আমাকে তাড়াতে চাও তুমি। স্পষ্ট বললেই হয় সে-কথা।

—পাগল ছেলে! তা কেন হবে? এদিকে এখনও অনেক টাকার প্রয়োজন। বলে স্বর নামিয়ে কি যেন বলল নিশীথের কানে কানে।

নিশীথ বলে উঠল—তা হোক তবু তোমাকে ও-কাজ করতে হবে না,—ও ছাই রাঁধুনীর কাজ।

হাসল নীরজা—তা ছাড়া আর কি হবে রে আমাকে দিয়ে? পাগলামি করিস্ নে, লক্ষ্মীটি! এ ছাড়া কোন উপায় নেই। একটা হতে পারত, কিন্তু—হঠাৎ উঠে গিয়ে ফিরে এল একটা ন্যাকড়ার পুঁটলী হাতে। ত্বরিতগতিতে পুঁটলীটা খুলে একখানা তাগা তুলে ধরে বলল—দ্বিতীয় উপায় এইটে।—বলে তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধতে বাঁধতে স্মিতমুখে বলে উঠল—এটি আমি হাতছাড়া করছি নে, প্রাণ গেলেও না। আমার বুঝি আর সাধ-আহ্লাদ নেই!

ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হল না নিশীথের। কিন্তু সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—তোমার সে-আশা ভগবান কোনদিনই পূর্ণ করবেন না। কিন্তু মা, একটা কথা তোমায় সত্যি করে বলতে হবে—আর একখানা তাগা কি করলে?

—বিক্রি করে দিয়েছি। আমার দরকার ছিল।

হঠাৎ নীরজার একখানা হাত টেনে এনে তার মাথায় ঠেকিয়ে নিশীথ বলল—এইবার বলো তো, দরকারটা তোমার ছিল, না আমার জন্যে হয়েছিল।

—হাত ছাড় নিশীথ, লাগছে।

—না আগে বলো তুমি, তারপর ছাড়ব হাত। কি তোমার এত দরকার পড়েছিল?

নীরজা তবুও চুপ করে আছে দেখে নিশীথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল—বুঝেছি। আর বলতে হবে না।

এ বিষয়ে দু'জনের মধ্যে আর কোনদিন কোন কথা হয় নি।

বছরখানেক ধরে কেস চলেছিল। অবশেষে ফাইন্যাল রিপোর্টে নিশীথ খালাস হয়ে যায়।

নিশীথ যতই বলুক, এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হল না।

চার-পাঁচটি বছর এইভাবে কেটে গেল।

সে বছর আরও চার-পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে এল। হোস্টেলে থাকবে সে। মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠল নীরজা। মুখ-চোখের চেহারায় কি আশ্চর্য মিল! এমন কি উপর-ঠোঁটের বাঁদিকে তিলটি পর্যন্ত। নাম শুনল অনুভা।

মেয়েরা যখন একসঙ্গে খেতে বসে নানা হাসি-গল্পে উচ্ছল হয়ে উঠত, নীরজা তখন হাঁ করে চেয়ে থাকত—একটি বিশেষ মেয়ের মুখের দিকে—সে অনুভা। চেয়ে থাকত দূর থেকে একদৃষ্টে ওষ্ঠাধরের তিলটির দিকে। ভাবত, এ মেয়ে নিশ্চয় স্বামী-সোহাগিনী হবে। নীরজা তিলতত্ত্ব জানে না, কিন্তু সে শুনেছে এমনি একটা কথা তার জ্ঞান হওয়া অবধি। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারত না, লজ্জা করত।

মেয়েরা একদিন এ নিয়ে ঠাট্টা করেছিল অনুভাকে।—তোর দিকে চেয়ে চেয়ে রাঁধুনী-মাসী অমন করে কি দেখে বল তো?

—কি জানি ভাই, সত্যিই আমি জানি নে।

কি একটা উপলক্ষে স্কুল বন্ধ ছিল সেদিন। মেয়েরা অনেক বেলা পর্যন্ত আড্ডা দেওয়ার পর খাওয়ার ঘণ্টা পড়তেই অনুভার হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। সে ছুটল রান্নাঘরে—বলল, তোরা চান করতে যা, আমি আসছি।

রান্নাঘরের দরজায় ছায়া পড়তেই নীরজা বলতে যাচ্ছিল—যান, আপনারা বসে পড়ুন—

কিন্তু দরজায়-দাঁড়ানো মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই বলতে পারল না। আজ বেশ তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে দেখল, ঠোঁটের উপর তিলই নয় শুধু, বাঁ পাশের মাঝখানে একটা ছোট কাটা দাগও রয়েছে—অভ্রান্ত নির্দেশক! অতীতের কোন দুর্ঘটনার স্মারকচিহ্নরূপে বয়ে এনেছে এগারো-বারো বছর ধরে ঐ মেয়ে! সারাজীবন ধরেই বইতে হবে তাকে ললাটদেশের এই কলঙ্কচিহ্ন—নীরজার অসতর্ক মুহূর্তের অবহেলার সাক্ষ্য!

কঠোর কণ্ঠে বলল অনুভা—হাঁ করে দেখছ কি? দেখ,—আজ বলে দিলাম, ওভাবে আর কোনদিন আমার মুখের দিকে তাকাবে না। বুঝলে? যাও, ভাত দেবার আয়োজন করো।

উত্তরে নীরজা কি বলেছিল, তা শুনবার জন্যে আর মুহূর্তকাল দাঁড়ায় নি অনুভা।

কিন্তু নীরজা পারে নি; কাঁচপোকার টানের চেয়েও তীব্র টানে ঐ মেয়েটি যেন টানছে তাকে। ঐ মেয়েটির কাছে এসেই নীরজার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়, ভুল হয়ে যায়; ভাত দিতে গিয়ে ওর পাতেই ভাত বেশি পড়ে যায়, কখনও বা মাছের টুকরো। সে-জন্য খিঁচিয়েও ওঠে অনুভা,—চোখে কম দেখ নাকি! উপস্থিত মেয়েরা হেসে ওঠে। নীরজা মুখ কাঁচুমাচু করে চলে যায় নিঃশব্দে।

দল বেঁধে-চার-পাঁচ জনে ম্যাটিনী শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল অনুভাকে নিয়ে। মেসিন বিগড়ে যাবার দরুণ সিনেমার শো ভাঙতে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হয়েছিল। ফিরবার সময় কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল, ট্যাক্সি করে হোস্টেলে ফিরবে। কিন্তু অনুভাই সে-প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। বলে, এই সন্ধ্যেবেলা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেশ ভাল লাগে। ট্যাক্সি!—দূর! হুস করে গিয়ে নেমে পড়লাম স্কুলের সামনে। আমি ওর মধ্যে নেই।

শেষ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াই স্থির হল।

রাত প্রায় আটটা, চার-পাঁচটি মেয়ে তখনও ফেরে নি। হোস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখে চিন্তার কুঞ্চন-রেখা দেখা দিল। সিনেমায় ছ'টার শো-ও প্রায় শেষ হয়ে এল। এখনও এরা ফিরছে না। টেলিফোন তুললেন তিনি। সিনেমা-হলের প্রোপাইটার বললেন—ম্যাটিনীতে খানিক দেরি হয়েছে একটু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য,—এই ধরুন ঘণ্টাখানেক।

—ওঃ আচ্ছা, নমস্কার। বিরক্তিভরে টেলিফোনের রিসিভার রেখে দিলেন মিস দাস।

আরো চিন্তিত হলেন তিনি—মেয়েগুলো গেল কোথায়? আজকালকার মেয়েরা এত বেয়াড়া হয়ে উঠেছে—এদের কণ্ট্রোল করাই মুস্কিল। অভিভাবকরা তো খড়্গহস্ত হয়েই আছেন—হোস্টেলে গিয়েই মেয়েটা আমার গোল্লায় গেল! তাই যদি হয়, তবে এখানে পাঠানো কেন? কিন্তু—

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন—হ্যালো, হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস দাস বলছি।

ওপার থেকে আর্তস্বর ভেসে এল—কে বাসন্তীদি'! শীগ্‌গির আসুন একবার হাসপাতালে। মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, অনুভা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি। টেলিফোন লাইন 'আউট অফ অর্ডার' ছিল। এইমাত্র লাইন পেলাম। ছেড়ে-ও যেতে পাচ্ছি না কেউ।

হোস্টেলের উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বিদ্যুদ্গতিতে রটে গেল অনুভার অ্যাক্সিডেণ্টের সংবাদ। সবাই যাবার জন্যে তৈরি হল—হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে। নীরজা-ও শুনল।

হোস্টেলের সর্বশেষ মেয়েটি যখন বেরোবার জন্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, নীরজা হঠাৎ তাকে শুধাল—দিদিমণি, বেঁচে আছে তো মেয়েটা?

—ও কি অলক্ষুণে কথা তোমার—বলে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুতপদে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

নীরজার মাথা ঘুরে উঠল। চোখে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন। খানিক পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে।

'বলহরি, হরিবোল',—কারা যেন এগিয়ে আসছে। নীরজার সর্বশরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কি ভেবে। আবার পরক্ষণেই ছুটল। নিশীথের রিক্সাখানা পেলেও কাজ হত। যা দু-একখানা যাচ্ছে—সব এখন সিনেমা-ফেরৎ ছাত্রীতে ভর্তি। পথ যেন আজ দীর্ঘতর মনে হচ্ছে নীরজার। শেষে মসজিদের সামনে আসতে তার খেয়াল হল, পথ ভুল হয়েছে।

এবার প্রায় পাগলের মত ছুটে চলল সে হাসপাতালের দিকে।

অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে অনুভা। পাশে লম্বা চোঙার মত কি-একটা যন্ত্র দাঁড় করানো আছে; তার মাথা থেকে একটা নল বেরিয়ে রোগিণীর নাকে ঢুকেছে। তার পিতৃগৃহে থাকতে সে একবার দেখেছে চাটুয্যেদের বাড়িতে ঐ রকম একটা চোঙা। রমেশ চাটুয্যের অসুখের সময় এনেছিল তার বড় ছেলে। তবু চাটুয্যের মৃত্যুকে ঠেকানো যায় নি। নিঃশব্দে মরণের কোলে ঢলে পড়েছে রমেশ চাটুয্যে।

তারপর নীরজা শুনেছে—ঐ চোঙাই মরণের অগ্রদূত! এখানেও সেই চোঙা! মনটা একেবারে দমে গেল তার।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল—ওর বাড়িতে খবর দিলে হত।

—আছেই বা কে, এক বুড়ি ঠাকুমা ছাড়া! বলল আর একজন।

—শুনেছিলাম তো মাও বেঁচে আছে। বাবাই মারা গেছে ছোটবেলায়।

নীরজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এতক্ষণ দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এবার একটু দূরে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল, যেখান থেকে অনুভাকে বেশ দেখা যায়।

অনুভার ঠাকুমাকে সংবাদ দেওয়াই স্থির হল, কেন না ওর মায়ের ঠিকানা কারো জানা ছিল না।

টেলিগ্রাম গেল বুড়ির নামে।

মেয়েরা পালাক্রমে সারারাত জেগে রইল অনুভার শয্যাপার্শ্বে। কেউ খেতে গেল না হোস্টেলে। দোকান থেকে সামান্য কিছু আনিয়ে সবাই মিলে খেয়ে নিল। একটা রাত তো!

নীরজা বসে রইল বারান্দায়।

পরদিন বেলা আটটা নাগাদ বুড়ি ছুটে এল উন্মাদিনী প্রায়।

বুড়ির পিছন পিছন এবার নীরজা ঘরে ঢুকল তার চোখের পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ অনুভার মুখের দিকে।

পিছনে একবার চোখ পড়তেই বুড়ি চমকে উঠল—তুমি এখানে!

মেয়ের দল অবাক। উনি তো আমাদের হোস্টেলের রাঁধুনী। আমরা মাসী বলে ডাকি। আপনি চেনেন নাকি ওঁকে?

—আমার বৌমা যে, অনুভা ওরই মেয়ে।

নার্স এসে একবার পাল্‌স দেখে নাকের নলটা সরিয়ে নিল। খবর দিতেই ডাক্তার এলেন; থমথমে মুখে রোগী দেখে চলেও গেলেন। নার্স একটা চাদর দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে দিল অনুভার দেহখানি।

সবার চোখ ছলছল করে উঠল।

নীরজা শুধু এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মৃতার বুকের উপর।

এমন একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই এক শ্রেণীর চিত্রকরকে দেখা যেত গ্রামের মেলায় মেলায় ঝোলা কাঁধে ঘুরে বেড়াতে। সেই ঝোলায় থাকতো শিব-পার্বতীলীলার ছবি, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের নানা গল্পের ছবি, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা—এমনি সব সাধারণের খোরাক। মুখে মুখে হোত গান তৈরি, সেই গান আর ওই ছবির 'রোল' খুলে দেখিয়ে লোক জমানো চলতো। পশ্চিম বাঙলাতেও এমনি সব চিত্রকরের তৈরি নানা কাজের নিদর্শন আজও রয়েছে অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে, সরকারী ও বে-সরকারী সংগ্রহশালাগুলিতে। সেদিনের চিত্রকর এঁকেছেন গাজীর পট, গোঁসাই পট, সাহেব পট থেকে শুরু করে ডাকাতের পট অবধি।

চিত্রকরেরা যে শুধু ছবিই আঁকতেন তা নয়, তাঁরা কাঠের নক্সী পুতুল বানাতেন, সরার ওপর নক্সা কাটতেন, পিঁড়ি, ঘট, কুলো সব কিছুতেই নক্সা কাটা হতো, চিত্রাঙ্কন চলতো, এমন কি খেলার তাসের গায়েও ছবি থাকতো। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস তার প্রমাণ—যার শেষ কারিগর ছিলেন সতীশ ফৌজদার।

পশ্চিম বাঙলার চিত্রকরকে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান জীবন কাটাতে হয়েছে রাজনৈতিক অত্যাচারের জ্বালায়, একথা অনেক গবেষকেরই ধারণা। মুসলমান শাসক-গণের চাপে তাঁদের গাজীর পট (শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত বীরভূম অঞ্চল থেকে হজরত মহম্মদের জীবনী-অঙ্কিত একখানি পট উদ্ধার করে আনেন।) আঁকতে হয়েছিল এবং হিন্দু-সমাজ এঁদের গ্রহণ করতে চায় নি। আজও তাই চিত্রকরেদের বিবাহাদিতে কলমা পড়ার রেওয়াজ আছে। তাঁরা পূজাও করেন এবং নমাজও পড়েন। অনেকেই অবশ্য মসজিদে যান না।

● মনসা ঘট

পারলৌকিক চিত্র বা 'চক্ষুদান পেইণ্টিংস' পশ্চিম বাঙলার চিত্রকরদের এক অতি বিস্ময়কর অবদান। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলের যাদু পটুয়াদের আঁকা ছবিগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি 'যমপট,' এতে থাকে যমরাজের শাসন—যে ভাল কাজ করে তার জন্য পুরস্কার ও যে খারাপ কাজ করে তার জন্য শাস্তি, নরকবাসের চিত্র ইত্যাদি। অন্যটি কোনও মৃতব্যক্তির ব্যক্তিগত চিত্র। এটিতে চিত্রকর মৃতব্যক্তির ছবি আঁকেন কিন্তু চক্ষু দেন না। যে ব্যক্তি মারা গেছেন তাঁর আত্মীয়ের কাছে গিয়ে বলেন যে, তোমার অমুকের আত্মা অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অতএব তুমি টাকা খরচ করো তবে আমি এই ছবিতে চোখ বসাবো নচেৎ অনন্তকাল ধরে সে (মৃতব্যক্তি) অন্ধ অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। যথোপযুক্ত অর্থপ্রাপ্তির পর তবেই চিত্রকর ছবিতে চোখ বসাতেন। এই থেকেই চক্ষুদান পেইণ্টিংস-এর জন্ম। এই যাদু-পটুয়া যাঁরা এই পারলৌকিক চিত্র আঁকার জন্য খ্যাত—অনেকের মতে তাঁদের আদি বাসস্থান বিহারের মানভূম ও সাঁওতাল পরগণায়। অবশ্য পশ্চিম বাঙলার সরপুর-বিনপুর, রোহিণী (মেদিনীপুর) ও বাঁকুড়ার খাতরা অঞ্চলেও অনেক যাদু-পটুয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। এই যাদু-পটুয়ারা ছবি আঁকা ছাড়া পিতলের মূর্তিগড়ারও কাজ করেন। আজকের বর্ধমানের দরিয়াপুর এবং বাঁকুড়ার নতুনচটি অঞ্চলের ডোকরাকামারদের মূর্তিগুলি দেখলে এঁদের যাদু-পটুয়াদেরই কোন শাখা বলে মনে হয়।

● কালীঘাটের কাঠের পুতুল

আজকের অবস্থা যাই হোক না কেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কিন্তু চিত্রকরদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তাঁদের স্থান ছিল অনেক ওপরে। চিত্রকরেদের তৈরি চিত্রাবলীর দ্বারা জনশিক্ষার কাজে সাহায্য হয়েছে প্রভূত। তাই আমরা দেখি, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্রম, উত্তর-রাম-চরিতম, হর্ষচরিতম প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রকরদের উল্লেখ রয়েছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এঁরা জাতিচ্যুত হয়েছেন একথা বলছে পুরাণে। অর্থাৎ সামাজিক স্বীকৃতিসম্পন্ন নয়টি শিল্পগোষ্ঠীর মধ্য থেকে চিত্রকর-সম্প্রদায় জাতিচ্যুত হয়েছেন। নয়টি শিল্পগোষ্ঠী যথা কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় ইত্যাদি। মহম্মদের জীবনীসহ পট আঁকা যে তার একটা কারণ হতে পারে তা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

চিত্রকরদের মতে হিন্দুরা তাঁদের জাতিচ্যুত করাতেই তাঁরা বাধ্য হয়ে শেষে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে এমনি একজন প্রাচীন চিত্রকরের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন (পৃঃ ৭০১)।

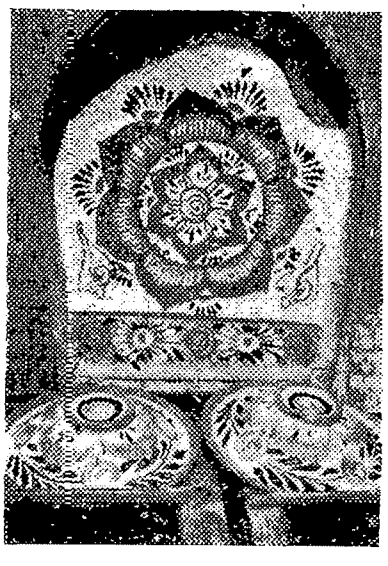

● নক্সী কুলো, সরা

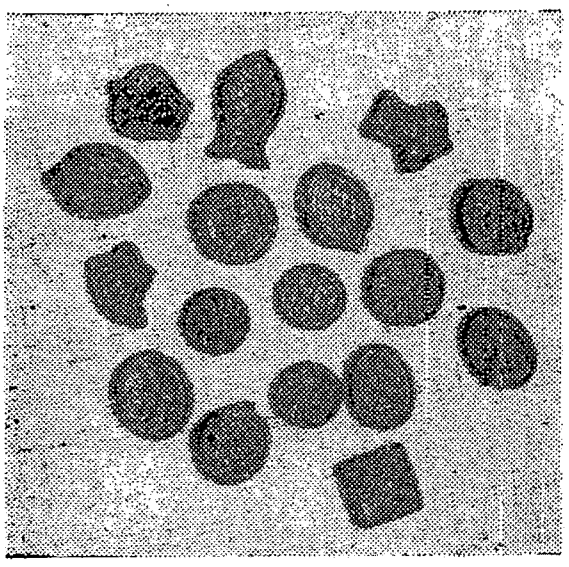

● সন্দেশের ছাঁচ

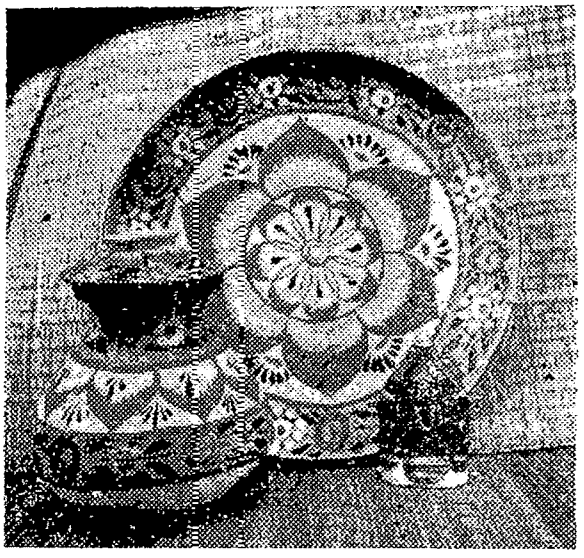

● নক্সী ডালা, হাঁড়ি, কালীমূর্তি

পশ্চিমবাঙলার লোকচিত্রকলা

আশীষ বসু

চিত্রকর বলছেন, 'ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে আমরা পতিত হয়েছি। হিন্দুর মতো পূজার্চনা করি, অথচ মুসলমানদের মতন নমাজ করি কেন, এ প্রশ্ন ছেলেবেলায় আমার মনে হয়েছিল। আমার পরলোকগত পিতাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। আমার মনে আছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আগে আমরা নমাজ করতাম না, নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করতাম। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের ঘৃণা করতেন এবং সমাজে কেন স্থান দিতেন না। তখন মুসলমানরা আমাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। দুঃখে ও অভিমানে আমরা মোল্লাদের ধর্মই গ্রহণ করি। কিন্তু করলে কি হবে, তার আগে হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠানে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, তাই অভ্যাস ছাড়তে পারি নি। আজ তাই আমাদের নমাজটুকু ছাড়া বাকি সব আচারই হিন্দুর মতন। আমাদের মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুর পরে, আমরা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি আঁকি, পূজো করি অথচ নমাজও পড়ি। আমাদের নমাজটাই হল ব্রাহ্মণের অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।'

চিত্রকরদের সমাজবন্ধনী কিন্তু খুবই কড়া। শোনা যায় যে—বিশ্বকর্মা ও অপ্সরা ঘৃতাচীর থেকেই চিত্রকর-সম্প্রদায়ের জন্ম। চিত্রকরেরাও নিজেদের সম্পর্কে এই কথাই বলে থাকেন। পশ্চিম বাঙলার চিত্রকরদের চিত্রকলার বিকাশ মূলত হয়েছে এই সমাজ-বন্ধনীকে অনুসরণ করেই। এর মোটামুটি তিনটি 'থাক' বা ভাগ। যথা—তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী অঞ্চল, বীরভূম-কান্দী-কাটোয়া অঞ্চল ও বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল। তবে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

● শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ

বিষয়বস্তু অসংখ্য। দুর্গা, বাসন্তী, কালী, মনসা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ এমনি নানা দেব-দেবীর মূর্তি পটে, সরায়, চালচিত্রে সর্বত্র। ওদিকে আছে সিন্ধুবধ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণবধ, কৃষ্ণলীলা এমনি কত অফুরন্ত বিষয়বস্তু—যাতে আঁকা হয়েছে চিত্রপটগুলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর অধিকাংশ পটই গেছে নষ্ট হয়ে। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি যোগাড় করে যদি কোনও গ্রন্থনা প্রকাশ করা সম্ভব হত তো বাইজেনটাইন ফ্রেসকো কি রাশিয়ান ইকনসের চেয়ে তার দাম কম হত না।

শহর কলকাতার নাম যে কলিকাতা নামের ছোট গ্রামটি থেকেই হোক, কি 'কাল কুঠি' থেকেই হোক, কি কলিচুণের কাতা (সুনীতিবাবুর মতে) বা শামুকপোড়া থেকেই হোক অথবা সেই রসিকতা 'কাল কাটা হায়—ঘাস' তাই হোক, কলকাতায় যে একাধিক পটুয়াপাড়া ছিল একথা সর্ববাদীসম্মত।

● একখানি দুষ্প্রাপ্য পটচিত্র। বস্ত্রহরণ লীলা

কালীঘাটের পটুয়াপাড়া তো বহু পুরাতন। কালীঘাটের চিত্রকর-সম্প্রদায়, তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী স্কুলের। এখানে কালে-কালে এসেছেন মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীর চিত্রকর সম্প্রদায়। তীর্থস্থান হিসাবে কালীঘাটের খ্যাতি থাকায় তার পাশে একটি পাকাপাকি বাজার গড়ে উঠেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সেই বাজারে তিন-চার খানির বেশি চিত্রকরের দোকান খুঁজে পাবেন না। সে চিত্রবিদ্যা পারদর্শিতা গেছে হারিয়ে। যে চিত্রকর-সমাজ একদিন সীতার বনবাস, মশানে শ্রীমন্ত এঁকেছেন—তাঁরাই আবার এঁকেছেন সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রাদি—অর্থাৎ সাহেবের হাতে গড়গড়া, বাঙালীবাবুর সাহেব সাজা ইত্যাদি—সেই ছবি 'কালীঘাট চিত্রাবলী' বলে খ্যাতি অর্জন করেছে দেশে-বিদেশে।

কালীঘাটে তো চিত্রকর ছিলই—চিত্রকর ছিল কলকাতার আরও অনেক জায়গায় যেমন চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবীর কাছে, পটুয়াটোলায়, বেলেঘাটায়। চিত্রকরদের বাস ছিল সারা পশ্চিম বাঙলা জুড়ে। পশ্চিম বাঙলায় এমন জায়গা খুব কমই আছে, যেখানে পটুয়াপাড়া নেই। তবে বিখ্যাত ছিল বীরভূমের পানুড়ে (এই গ্রামেই শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত বিখ্যাত চিত্রকর ছবিলালের সন্ধান পেয়েছিলেন,) মেদিনীপুরের নাড়াজোল, কুমারীমারা (তমলুক), বেশবপুর, চৈতনপুর, চেতুয়া দাসপুর, চেতুয়া বাসুদেবপুর, দেউলপোতা ইত্যাদি নানা জায়গায় এঁদের বাস ছিল। বীরভূমের বালিয়া, দাদপুর, দোয়ার্কা প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের গনকর, কান্দী, গোকর্ণ, পাঁচথুপী, বর্ধমানের দুর্গা পলিতা, মাধবীতলা কাটোয়া প্রভৃতি, হুগলীর ত্রিবেণী, পুইনান, মোরা প্রভৃতি নানা গ্রামে ছড়ানো ছিল চিত্রকরদের বাস। ২৪ পরগণার ফতেপুর, জয়নগর, মজিলপুর, কঙ্গনবেড়িয়া ইত্যাদি এবং হাওড়া জেলার লিলুয়া, কুরচি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানেও চিত্রকরদের বাস ছিল।

আজকের কালীঘাটে যে শিল্পীরা কাজ করছেন তাঁদের উপাধি পাল, দাশ ইত্যাদি। এঁরা উপাধিতে চিত্রকর নন। এঁদের মধ্যে অনেকের নিবাস হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চলে। পূর্ববাঙলা থেকেও কেউ কেউ এসেছেন।

চিত্রকরদের কাজের মোটামুটি কয়েকটি ভাগ যেমন কাপড় বা কাগজের মোড়কের ওপর আঁকা—যাকে বলছি পট। কাঠের ওপর আঁকা, মাটির ওপর আঁকা, রঙদার পুতুল তৈরি, ঘট, সরা, কুলোর ওপর আঁকা ইত্যাদি। হাতে তৈরি কাগজ, আলতা, নিমগাছের গঁদ, তেঁতুলের কাই, ডিমের খোল, বেলের আঠা, ধুনা, চাঁচগালা, কাঠকয়লা, হরিতাল, তুঁত, চীনে সিঁদুর, মেটে সিঁদুর, কাঠখড়ি, মীনা এই সব দিয়ে চলতো তাঁদের ছবি আঁকা। তুলি তৈরি হতো কঞ্চির গায়ে পশুর লোম দিয়ে। এই সামান্য উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়েছে অসামান্য ছবি।

মহাকবি চণ্ডিদাসের দুইটি পদাবলী

নবীন কিশোরী মেঘের বিজরী চমকে চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী তত হি উদিত ভেল॥
কভু না দেখিএ এমন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন যে চাহনি গলায় মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধায়লি ঝঙ্কারে বেঢ়িয়া রাই।
অঙ্গের বসন খসায় কখন সঘনে ঝাপএ তাই॥
চরণ সুভঙ্গী অতি সে সুরঙ্গী ঠাহরে পরাণ মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদসে ঝলকে পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যার পানে বধএ পরাণে দারুণি চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে বিন্ধিয়া কর পার॥
জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া চেতন হরিল মোর।
চণ্ডিদাসে কয় ব্যাধি কিছু নয় দেখিয়া হইলা ভোর॥

* * *

পথে জড়াজড়ি নবীন নাগরী সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদনে তরঙ্গ ঈষৎ নয়নে চায়॥
সখি কে বলে মোহনী সে।
যদি সে সদয়ে অনুমতি দেয় তার সনে করি লে॥
নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে।
যেন তারাগণ উদিত গগন চাঁদেরে বেঢ়িয়া জলে॥
হাসির রাশি মনে খুশি যদি দান করে দাতা।
চণ্ডিদাসে কয় মনে করি ভয় কে জানি মাগিবে তায়।
যে ধন মাগিবে তাহা না পাইবে অপযশ পাছে রয়॥

দেবাশীষ

বিভা বসু

আশ্চর্য, এমন নাটকীয় পরিস্থিতিতেও মানুষকে পড়তে হয়। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ভিড় একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে কেতকী ওদের সারিবাঁধা বিষণ্ণ মুখগুলো দেখছিল। বৌদি, বড়দার ছেলে বাচ্চু, অতীন মামা, শেফালী। এই প্রথম বাড়িঘর ছেড়ে এলাহাবাদের কাছে একটা বিলিতি কনভেন্টে ড্রইং-টিচারের কাজ নিয়ে সে চলল। কলকাতার চাকরীও খারাপ ছিল না, এখানে মাইনে লোভনীয় হলেও ওখানে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকার আনন্দের স্বাদ ছাড়তে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মা পর্যন্ত জেদ করলেন তার মন ও শরীরের কথা চিন্তা করে।

না, কেতকী সেদিনের দুর্ঘটনার পর সিনেমা অথবা আধুনিক উপন্যাসের নায়িকাদের মত ভেঙে পড়ে নি। প্রথম কয়েকদিন শুধু আচ্ছন্ন একটা ঘোরের মধ্যে তার কেটেছিল যেন। দেবাশীষ শেষ পর্যন্ত এতখানি বঞ্চনার আঘাত দিতে পারে, সে কথা তার কল্পনার বাইরে ছিল। আর মল্লিকা: মল্লিকার নাম মনের শ্লেট থেকে সযত্নে মুছে ফেলেছে কেতকী। মা আপশোষ করেন, বড়দা লুকিয়ে লুকিয়ে খোঁজে, শেফালী কাঁদে, কিন্তু কেতকীর জীবন থেকে মল্লিকার স্মৃতিও বুঝি হারিয়ে গেছে।

চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছিলো নিশ্চয়, রুমালের কোণ দিয়ে মুছতে মুছতে ধোঁয়াটে চোখে সামনের বেঞ্চিতে দেবাশীষকে দেখে বুকের মধ্যে এতদিনকার জমাট পাথরের ভূমিকম্পের উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। চিনবে না ঠিক করে কেতকী বই-এর পাতার মধ্যে অনিচ্ছুক মনকে জোর করে বেঁধে রাখতে গিয়েছিল, কিন্তু একটি অক্ষরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বই-এর পাতাই নয়, চোখের সামনে দৃশ্যপটে সবকিছুই লেপে মুছে একাকার।

তা হবেই বা না কেন, মনের কোণে এবপ্রান্তে জমে-ওঠা স্মৃতির শুকনো পাতাগুলো একত্র করে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেই দাউ করে জ্বলে-ওঠা আগুনের শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধোঁয়া, কুয়াশার তোলপাড়ের দোলায় নিষ্কম্প নিরাসক্ত প্রাণও বুঝি দুলে ওঠে।

এতদিন বাদে কেতকী বুঝল অত বড় বিশ্বাসঘাতকতার পরে দেবাশীষকে সে ভোলে নি। এর পরে আত্মপ্রবঞ্চনার আর কোন অর্থ হয় না। তবু ভালো, সঙ্গে মল্লিকা নেই। মল্লিকা থাকলে এতক্ষণ এভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে সে পারত না। হয় তো পাগলের মত চেন টেনে চলন্ত গতিকে থামিয়ে দিত, কিংবা নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ত হাওড়া স্টেশনের অপসৃয়মান প্ল্যাটফরমে।

'নিজেকে যখন ঠকাতে পারো না, তখন অপরকে ঠকিয়ে লাভ কি?' কথাগুলো জোর করে ছুড়ে মারল সে। দেবাশীষের মুখ ফেরানো ছিলো। স্পষ্ট দেখলো কেতকী, সে মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে উঠেছে। কোলের কাছে মুঠি করা হাত থর থর করে কাঁপছে।

'আমাকে চিনেছো তা হলে।' হাসিটা আলপিনের মতো ফুটিয়ে দিতে চাইলো কেতকী—'তিন বছর কিন্তু নেহাত কম সময় নয়। আমি মনে করেছিলাম বিবেক দংশনের জ্বালা বুঝি এতদিনে মিটে গেছে।'

এবারে দেবাশীষ মুখ ঘোরালো। কোনরকমে জড়ানোগলায় অস্ফুটভাবে বলল, কেতুকী! 'তুমি এখানে।'

'হ্যাঁ আমিই।' আশ্চর্য শান্ত শোনালো কেতকীর গলা। আয়নায় নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হচ্ছিল। দেবাশীষের বাগানবাড়ির ফোয়ারার বেদীতে বসানো সেই শ্বেত-পাথরের মূর্তিটার মতো অভিব্যক্তিহীন নিষ্প্রাণ একটি ছবি—'ভয় পেও না দেবাশীষ, তোমার কাছে আজ আমি হা-হুতাশ করে ব্যর্থ প্রেমের কাঁদুনী গাইতে বসব না। প্রেম শব্দটা আজকে আমার কাছে বড্ড খেলো হয়ে গেছে। অনেকটা তোমার সেদিনকার ব্যবহারের মতই। আমি শুধু জানতে চাই—'

'কি, কি জানতে চাও তুমি?' দেবাশীষ যেন শিউরে উঠলো।

'আমার প্রশ্ন অনেকগুলো।' কেতকী বেশ রূঢ়ভাবে বলল—'অতীন মামা ঠিকই

খবর এনেছিলো সেদিন। তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল এবং কাপুরুষ। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তুমি এর আগেও দু-তিন জায়গায় কেলেঙ্কারী করেছ। নিজের সত্যিকারের পরিচয় দেবার সাহস সেদিন কেন হয় নি তোমার—কেন বলতে পার নি ঘরে তোমার অভিজাতবংশীয়া স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে।'

দেবাশীষকে নিরুত্তর হয়ে বসে থাকতে দেখে কেতকী এবারে তার মোক্ষম বাণ ছুড়ল। 'জানো এখুনি পুলিশে খবর দিতে পারি আমি।'

'পুলিশ—'—কাপুরুষের মত পিছিয়ে গেলো দেবাশীষ—'পুলিশ কেন?'

'কেন কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না দেবাশীষ—। মল্লিকার বয়স তখন সতেরো, সে অন্যের বাক্‌দত্তা এসব জেনেও তাকে ভুলিয়ে, ফুসলিয়ে তুমি সেই রাত্রিতে পালালে। চরম অপমানে লাঞ্ছিত আর একটি মেয়ের কথা বেমালুম ভুলে যেতে কোনই অনুতাপ হোল না। নেহাৎ কলঙ্কের ভয়—বড়দা চুপ করে রইলো, আর আমার মুখ চেয়ে মা সব ভুলতে চাইলেন।'

একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার কোলাহলে কথার শব্দ শোনা গেল না। বাধ্য হয়েই বাইরের অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো কেতকী। কয়লার গুঁড়োতে নয় মনের জ্বালাতেই তার চোখ দু'টো তখন জ্বলছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে আগুনের ফুলকির মতো বিচ্ছিন্ন বসতির মাঝখানে আলোর আভাস, গাছগুলো যেন ছাই রঙের চক্‌খড়ি দিয়ে কালো শ্লেটে আঁকা। গাড়ির চলন্ত গতি তার সমস্ত সত্তাকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। আকাশভরা গ্রহ-তারার দল যুগ-যুগান্তর ধরে কেবল চলেছে, চলেছে আর চলেছে। একটি দিনও থেমে থাকার উপায় নেই। দেবাশীষের মুখে স্পষ্ট অপরাধীর ছাপ দেখতে পেয়েছে সেই কথা ভেবে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল কেতকী। তার বদলে যদি আজ দেবাশীষের চোখে-মুখে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাব ফুটে উঠতো, তা হলে বোধ হয় অপমানের জ্বালা আরও বেশি করেই বিঁধত।

দেবাশীষের কথা ভুলে হঠাৎ মল্লিকার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেতকীর পরেই মল্লিকা, বয়সে তিন বছরের তফাৎ সত্ত্বেও ওরা পিঠোপিঠি বোন। চেহারায়-স্বভাবে অমিল, তবু দু'জনের ভাবের অন্ত নেই। কেতকীর রঙ উগ্র সাদা, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, মুখে-চোখে রুক্ষ অপ্রসন্নতার আভাস। মা বলতেন, 'আমার বড় মেয়ে হাসতেই জানে না।' মল্লিকা ঠিক উল্টো। কচি শ্যামলা রঙ, বয়স অনুপাতে ছেলেমানুষ চেহারা, হাসি-খুশিতে সর্বদা টলমল করছে। দেখলে মনে হবে, কাদার তাল—মাখনের মতো নরম। কিন্তু ঐ বাইরের খোলশটা দেখে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তার প্রমাণ পাওয়া যেত মল্লিকার চরিত্রে। কি ভীষণ জেদ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একপাও নড়বে না কিছুতে। বরং নরম হোত কেতকী। সেই ছেলেবেলা থেকে যখন যা চাইত মল্লিকা নিজের ভাগ থেকে অনায়াসে অক্লেশে ছোট বোনকে দিতে হয় এই সান্ত্বনায় নিজেকে বুঝিয়ে ওর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করে নি প্রথম সংঘাত বাধল সেদিন, যেদিন মল্লিকা তার কালো চোখ জলে ছল ছল করে বলল—'দিদি, তুই ভুল বুঝিস নে আমাকে। আমি নিজের মনকে এতকাল বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। ও লজ্জায় তোকে কিছু বলতে পারছে না।'

সেদিনের মত আজকেও ভুরু কুঁচকে চোখে আগুনের জ্বালা নিয়ে কেতকী বলল—'আমাকে ছলনা করার প্রয়োজন ছিল না। যে জিনিস অপরের, তার জন্যে কোনদিনই হাত বাড়ানোর স্বভাব আমার নয়।'

সেদিনও জবাব দিতে পারে নি দেবাশীষ, আজও পারল না। কেবল একটু অস্বস্তিভরা গলায় বলল—'তোমার কাছে সাবান আছে। আর ডেটল জাতীয় কিছু! হাতটা একটু ভাল করে ধুয়ে নিতাম।'

হাত দু'টো মুঠি করাই ছিলো, তবু নখের মধ্যে কালো কালো দাগ চোখে পড়ল বলে একটু অবাক হোল কেতকী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে দস্তুরমত খুঁতখুঁতে ছিল ওর। এমন কি, স্নানের শেষে মেয়েদের মতো আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম পাউডার পর্যন্ত মাখায় ওর ক্লান্তি ছিল না। আজকে এতক্ষণ পরে দেবাশীষকে যেন অন্য রকম দেখাচ্ছে বুঝতে পারা গেল। দেবাশীষের পোষাক পরিচ্ছদে কোথাও পারিপাট্যের চিহ্ন নেই, চুল এলোমেলো, মোজায় কাদার ছাপ। নখ ম্যানিকিওর করতে যে ছেলে সারা সকাল কাটাতো, তার আজ সাবান পর্যন্ত আনতে ভুল হয়ে গেছে। এত বদলও মানুষের হয়! আর কি কথার পরে কি কথা!

'মল্লিকা কোথায়?'—এটাচী কেস খুলে লিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক সোপের বোতল আর একটা তোয়ালে বার করে হাসি সামলে নিল কেতকী। প্রশ্নটা শুনে ভীষণ চমকে উঠে দেবাশীষ মুখ নীচু করে বসে রইলো নির্বাক হয়ে।

'কথাটা শুনতে পেয়েছো আশা করি। তিন বছরে মেয়েটা একটা চিঠি পর্যন্ত দিল না, ওর জন্যে আমরা সবাই কি ভীষণ ভাবি সে কথা কি বুঝতে পারো না তোমরা? ও কি তোমাদের মুঙ্গেরের বাড়িতেই আছে, অতীন মামার সেই সেজশালা রণজিৎ না কি যেন নামটা, সে নাকি তোমাদের সাউথ ইণ্ডিয়ার কোন একটা হোটেলে দেখেছিলো। মল্লিকা নাকি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে।'

কথা বলতে বলতে খেয়াল হোল দেবাশীষ শুনছে না। চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা ভরিয়ে সে বোবার মতো বসে রয়েছে।

'মল্লিকা কোথায়?' আবার কঠিন হয়ে উঠল কেতকী—'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই একবার।'

'কেন'। একটু নড়েচড়ে বসল দেবাশীষ।

'একটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করার আছে। সে যদি প্রথম থেকে খোলাখুলি আমাকে সব জানাতো, তা হলে আমি তাকে বাধা দিতাম না। লুকিয়ে-চুরিয়ে এভাবে পালিয়ে গিয়ে সে শুধু নিজেরই সর্বনাশ করে নি, আমাদের গোটা পরিবারকেও একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। মার নার্ভস ব্রেক ডাউন হয়েছে ওরই দোষে, শেফালীর ভালো ভালো বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, আর আমার—।'

'আমাকে ক্ষমা কর'—দেবাশীষ হাত বাড়িয়ে তোয়ালে আর সাবানের শিশি নিয়ে বাথরুমের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এ প্রসঙ্গের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার মতলব থাকলেও কেতকী কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। মল্লিকাকেও না। মল্লিকাকে ক্ষমা করা যায় না। তবু তার কথা মনে করে কেতকী চঞ্চল হয়ে উঠল।

এদিকে রাত বাড়ছে। কৃষ্ণপক্ষ, তাই একটু দেরি করে চাঁদ উঠেছে আকাশে। হাতঘড়িতে সময় এগারটা। বড়দা বলেছিল গাড়ি ছাড়লেই যেন বিছানাটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ে সে। বিদেশ যাওয়ার উত্তেজনা ও শেষ মুহূর্তের হাতের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার হাঙ্গামায় গত তিনরাত চোখের পাতা এক করতে পারে নি। বড়দা নিজেই সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অফিসে ছুটি মঞ্জুর হল না। বাচ্চুর এবারে ফাইন্যাল পরীক্ষার বছর। অতীন মামা হার্টের অসুখে ভুগে আজকাল

কেমন জবুথবু হয়ে পড়েছেন। কাজেই শেষপর্যন্ত একাই আসতে হল তাকে।

কে জানত এমন একটা চরম পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে। যে লোকটা ধূমকেতুর মতো তার এবং মল্লিকার জীবনে সর্বনাশ এনে দিয়েছে, যাকে মূর্খের মতো তারা দু'জনেই ভালোবেসেছিলো, সব অপরাধ, সব অন্যায়ের কথা জেনেও যার স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় নি—সেই দেবাশীষের সঙ্গে একা ট্রেনের কামরায় সমস্ত রাত মুখোমুখি কাটাতে হবে জানলে বড়দা বোধ হয় ঘুমের ওষুধের পিল খেয়ে দরজা-জানলা এঁটে শুয়ে পড়ার উপদেশ তাকে দিত না।

দেবাশীষও বিছানা পাতে নি। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কেতকী লক্ষ্য করল হোল্ডল, বা ঐ জাতীয় কিছু সঙ্গে তার নেই। এটাচী কেস, ব্যাগ, হাতবাক্স—কিছু না। বেঞ্চির নীচে কালো একটা ট্রাঙ্ক অবশ্য ঢোকানো রয়েছে। হয় তো কাছাকাছি অন্য কোন স্টেশনে নেমে যাবে বলেই বাড়তি মাল কিছু সঙ্গে রাখে নি। কতক্ষণ ধরে হাত ধুচ্ছে দেবাশীষ। পর পর আরও অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ভিড় করে এলো। সব জানতে হবে একে একে, মল্লিকাকে সে কি বিয়ে করেছে, 'মল্লিকা কি সুখী হয়েছে!'

'ধন্যবাদ'—ভিজে তোয়ালে আর সাবানটা সামনে ধরে দিয়ে এতক্ষণ বাদে দেবাশীষ হাসলো। বুকের মধ্যে এখনও যে হাসি দেখলে ব্যথার মত মোচড় দিয়ে ওঠে।—'তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি কেতকী। ঠিক সেই আগেকার মতই আছ।'

নিজেকে একটুও বিচলিত না হতে দিয়ে নীরসকণ্ঠে কেতকী বলল—'বল আমাকে, মল্লিকা কোথায়?'

'যদি বলি জানি না—' কপালের উপর ঢেউখেলানো ঘন বাদামী চুলে হাত ছোঁয়ালো দেবাশীষ। ওর পিঙ্গল চোখের তারায় কৌতুকের আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠলো যেন। এতক্ষণে মানুষটা অতীতের লজ্জার গ্লানি থেকে বোধ হয় কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। কেতকীর দৃষ্টিতে প্রশ্নচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে সে আবার বলল—'একবার খাঁচা ছেড়ে পালানো পাখিকে কি অত সহজে শেকল পরানো যায় কেতকী। সুযোগ পেলে সে হাওয়া হয়ে যাবেই।'

'কোথায় গেছে সে?' উত্তেজনার ঢেউ কেতকীর চোখে-মুখে দুলে উঠল—'তার ঠিকানা না পেলে আমি পুলিশে খবর দেব।'

'এতকাল দাও নি কেন?' একটু থতমত খেয়ে বিব্রতমুখে দেবাশীষ বলল—'তিনবছর ধরে তোমরা তো তার কোন খোঁজ কর নি।'

'আমরা জানতাম, সে তোমার কাছেই আছে। অতীন মামার সেজশালাও তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছিল বৃন্দাবন গার্ডেনস্-এ আলোর ফোয়ারার পাশে।' কেতকীর গলা ধরে এলো কথা বলতে বলতে। গঙ্গার ধারে তার পাশে বসে দেবাশীষ একদিন সুদূর মহীশূরের বিখ্যাত আলোক-উদ্যানের স্বপ্নময় পরিবেশের কথা শুনিয়ে তাকে বুঝিয়েছিলো বিয়ের পরে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে তারা সেখানেই যাবে।

'তোমার বোন তোমার মতো একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বাসী নয়—' দেবাশীষের গলায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর—'ফুলের মধু খেয়ে ফুলকে অক্লেশে ভুলে যেতে পারে সে।'

'তুমি কথা ঘুরিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না দেবাশীষ, কেতকী সোজা হয়ে উঠে বসল, 'আমার নিশ্চিত ধারণা তাকে নিয়ে খেলার পালা তোমার মিটে গেছে। কিন্তু সে হতভাগিনী এখন কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, তা জানতে না পারলে পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছো, কেতকী—' হঠাৎ উঠে এসে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো দেবাশীষ। ওর চোখের তারা দু'টো এখন আগুনের কুচির মতো জ্বলছে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে সে সুযোগ না দিই গাড়ি এখন ফুলস্পিডে চলেছে। আস্তে আস্তে এমনি করে তোমার গলাটা যদি টিপে ধরি, তা হলে যতই চিৎকার কর না কেন—কেউই সাহায্যের জন্যে ছুটে আসবে না।'

সত্যি সত্যি তার গলার কাছে আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করে আতঙ্কে হিম হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করে নিয়ে কেতকী জোর করে হাসলো।

'তারপর আমার ডেড-বডি নিয়ে কি করবে?'

'খালি ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় গয়না-পত্তর-টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে সুটকেশ খুলে ছড়িয়ে রেখে যাব—লোকে ভাববে রাহাজানির কেস।' দেবাশীষ প্ল্যান করতে হেসে ফেলল। 'একটা কথা কিন্তু তোমাদের খেয়াল করা উচিত

ছিল। আজকালকার দিনে মেয়েদের একা একা ট্র্যাভেল করা ঠিক নয়। প্রায়ই তো কাগজে দেখি এ ধরণের কত কিছু ঘটছে।'

'কিন্তু বড়দা যে তোমাকে দেখে ফেলেছে' —কেতকী আশ্বস্ত করে ওর হাত সরিয়ে দিল মুখের সামনে থেকে—'আমার কিছু ঘটলে তুমিও জড়িয়ে পড়বে।' কথাটা সম্পূর্ণ বানানো হলেও কেতকী সিরিয়াস গলায় থেমে থেমে বলল। আবার একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলাতে প্রচণ্ড কর্কশ শব্দে কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে বেঞ্চিতে বসে পড়ল দেবাশীষ। কেতকীর পাশেই। ক্লান্তভাবে গা এলিয়ে দিয়ে কপালের উপর ছড়ানো চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—'তুমি একটুও ঠাট্টা বোঝ না কেতকী। ঠিক আগেকার মত জেদী, একগুঁয়ে দুষ্টুমেয়ে। মল্লিকা আমার কাছেই আছে। রেজিস্ট্রি মতে আমাদের বিয়েও হয়েছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি? ওর কি কোন অসুখ করেছে?'

'না, না, সে কথা বলছি না আমি। ও ভালোই আছে। কেতকী, সেদিন যে ভুল করেছিলাম, সেই অপরাধের বোঝা আমার মনে ভারী হয়ে জমে আছে। আমি তোমাকেই ভালোবাসি এই সত্যি কথাটা সেদিন আমরা কেউই বুঝি নি। তোমাকে ভুলতে পারছি না বলে মল্লিকা আজ তোমাকে অথবা আমাকে ক্ষমা করতে পারছে না।'

'একবার আমাদের দেখা করিয়ে দেবে দেবাশীষ—'চোখের জলের সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যপট দুলতে লাগলো কেতকীর দৃষ্টিতে, 'মাত্র একটি বার। ওকে বোল আমি কিছু মনে রাখি নি সব ভুলে গেছি। এখন আবার আগেকার মত ও আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক—।'

দেবাশীষ উত্তর দিতে গিয়েও বাইরের আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া এসে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে। চোখের নীচে ঘন কালির ছোপ, যেন কতকাল ঘুমোতে পারে নি মানুষটা।

'কেতকী, তুমি আমার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার কথা শুনলে শিউরে উঠবে। মল্লিকা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।'

'কি করে?' কান্নায় গলার স্বর ভিজে শোনালো কেতকীর—

'সন্দেহ—ওর নিদারুণ সন্দেহ আমাকে নিয়ে—। আমাকে একদিন বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার এখন কিছুকাল খুব সাবধানে থাকতে বলেছে, কোনরকম শক অথবা উত্তেজনা ওর পক্ষে মারাত্মক—। কিছুকাল তোমার সঙ্গে ওর বোধ হয় দেখা না হওয়াই ভালো—।'

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নতার ঘোরে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল কেতকী। মল্লিকা পাগল হয়ে গিয়েছিল—। গাড়ির চাকার শব্দের তালে তালে কথাটা তার কানের কাছে বাজতে লাগলো। মল্লিকা না, এ অসম্ভব, এ হতেই পারে না।

'আমাদের ঠিকানাটা তোমার মনে আছে আশা করি—' কেতকী জলভরা চোখ মেলে চাইল—'ও একটু ভালো হলেই চিঠি দিও লক্ষ্মীটি।'

দেবাশীষ আবার কাছে সরে এলো। ওর চোখের তারায় কেমন একট বিহ্বলতার ছোঁয়া লেগেছে। কেতকীর হাত ধরে বলল—'জানি আমার কিছু বলার নেই। কি করে তোমাকে বলি আমার সেদিনকার ভুলটা ভুলই—।'

নিজেকে দুর্বল হতে দিল না কেতকী। হাত ছাড়িয়ে খুব সহজভাবেই বলল—'অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভালো দেবাশীষ। আজ আমার বড় ক্লান্তি লাগছে। শুয়েই পড়ি। রাত প্রায় দু'টো হতে চলল। দেখো, ঘুমের মধ্যে আবার রাহাজানির কেস্ না ঘটে—। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে। এলাহাবাদে সোনামাসির বাড়ি উঠব—তুমিও নামো না। মল্লিকার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া সত্যিই দরকার। ভালো করে বুঝিয়ে বললে ও বুঝবে তোমার জীবনে আমি এখন আর কিছুই নই।'

'সত্যি বলছ—' দেবাশীষ সামনে ঝুঁকে পড়ল।

'নিশ্চয়—' কেতকী হাল্কাভাবে হাসল তুমি এতো সিরিয়াস মুখ করে কথা বললে আমার হাসি পায়। যাক্ সে সব কথা, শোবে কোথায় 'বিছানাপত্র তো সঙ্গে নেই দেখছি। এই নাও আমার চাদর আর বালিশ—।' না, না, আমার আরও আছে, সেজন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।'

দু'টো বিছানাই নিপুণ হাতে পাতল কেতকী। বড় আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ভরে দু'টো ঘুমের ওষুধের ট্যাবলেট খেয়ে নিল। কৃত্রিম আয়োজন নইলে এ চোখে এখন ঘুম নামবে না। চিন্তার রাশি ঢেউ-এর মতো দুলতে দুলতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে ভাবনা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে।

বালিশে মাথা রেখে বুজে-আসা চোখ মেলে কেতকী বলল—'এলাহাবাদে অন্তত একদিনের জন্যেও নামতে হবে কিন্তু—।'

জানলা দিয়ে হঠাৎ একরাশ আলো এসে কেতকীর চোখে-মুখে পড়ে ওর ঘুমন্ত সত্তাকে একটু একটু করে জাগিয়ে দিয়ে গেল। ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেছে যে। দেবাশীষ! ঘরের চারিদিকে তাকে না দেখতে পেয়ে দরজা ভেজানো বাথরুমে টোকা মারল কেতকী, সেখানেও সে নেই। চমকে উঠে কেতকী তার বালিশের নীচে রাখা হাত-ব্যাগে টাকাকড়িগুলো ঠিক আছে কি না দেখে নিলে। শিয়রের কাছে টেবিলে রিস্টওয়াচ, গলার তিন ভরির সোনার হার, আঙুলের আংটি। সবই আছে—। কোথাও কিছু খোয়া যায় নি। বরং সামনের বেঞ্চির নীচে সেই স্টীল ট্রাঙ্কটা অমনি পড়ে আছে। দেবাশীষ ওটাকে ফেলে গেলো কেন? ভীষণ অপ্রসন্ন ও হতাশ হয়ে কেতকী তার বিছানা গুছিয়ে ভরে ফেলল। দেবাশীষের জন্য পাতা বিছানাটা সেই একভাবেই পড়ে আছে। দেবাশীষ একবার শোয় নি পর্যন্ত।

সব গোছগাছ করে যখন চায়ের অর্ডার দিলো কেতকী, ঘড়িতে তখন দশটা বাজছে। আর বেশি সময় নেই। বাকি পথটুকু স্টেশনে কেনা গল্পের বই পড়েই দিব্যি কেটে যাবে।

কিন্তু দেবাশীষ এভাবে চলে গেল কেন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধূ-ধূ দিগন্তকে তার উপচে-পড়া চোখের জলের বিন্দুর মধ্যে কাঁপতে দেখল কেতকী। সে তো সত্যিই ওর কাছে অধিকারের দাবী জানাতে চেষ্টা করে নি। শুধু একবার মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল মাত্র। মল্লিকার খবর না পেয়ে মা আজকাল ছটফট করেন, বড়দার মুখে কোনদিন হাসি কেউ দেখে না, আর তার নিজের জীবন ঐ ধানকাটা শুকনো রুক্ষ অফলা মাঠের মত নিষ্ফল হয়ে গেছে। দেবাশীষ এই সহজ কথাটা বুঝল না কেন। নাকি বুঝেও এড়িয়ে গেল অন্য কোন কারণে। হয় তো মল্লিকার অসুখ সারে নি।

সোনামাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে হাত ধরে টেনে নিলেন কাছে। বিদেশবাসীর কাছে কলকাতা থেকে অতিথি-অভ্যাগত এলে তার আদরই আলাদা। কথাও ফুরোতে চায় না সহজে, কার বিয়ে ঠিক হল, কার হতে

হতে হল না, অথবা হতে পারে, এ নিয়ে সোনামাসির অদম্য কৌতূহল।

কেতকীর থেকে হাল খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়ার মতলবে তিনি মুখ বাড়িয়ে বললেন—'যাও না গো, মেয়েটার মালপত্রগুলো নামিয়ে নাও। আমি বরং ওকে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে ততক্ষণ বসি।'

'একবারে বরং বাড়ি চলে যাই সোনামাসি।' কেতকী ক্লান্ত চোখে মিনতি জানালো, 'তারি তো ক'টা মাল, নামাতে দু' মিনিটও লাগবে না।'

'সেই ভালো'—সোনামাসি পেটমোটা ব্যাগ সামলে চলার জন্যে পা বাড়ালেন—'তুই সেজদির ননদের খবর শুনেছিস। সেই যে আমাদের বেলুর সঙ্গে পড়ত। শুনছি কোন এক পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে খুব ভাব, তাকেই বিয়ে করবে।'

সোনামাসির কথাবার্তার স্রোতে বাধা দিয়ে লাভ নেই। সুবিধেও যথেষ্ট, কেবল হ্যাঁ আর না বলেই খালাস। বক্তৃতা এক-তরফা হলে যা হয়। এরই ফাঁকে কখন মালপত্র নামানো হয়ে গেল। মেসোমশাই রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, 'ট্রাঙ্কে কি ইট-পাথর পুরে এনেছ কেতকী—চারটে কুলি মিলে নামাতে পারে না।'

'ট্রাঙ্ক! কেতকী সাদামুখে তাকায়—'ও ট্রাঙ্ক তো আমার নয়।'

'কিন্তু কম্পার্টমেণ্টে আর কাউকে তো দেখলাম না'—মেসোমশাই অবাক হয়ে ওঠেন 'হয় তো কেউ ভুল করে ফেলে গেছে। আর কে কে ছিল গাড়িতে?'

'ছিলেন একজন ভদ্রলোক।' কেতকী ঢোক গিলে বলল আমি রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানি না কখন নেমে গেছেন।'

'বড়দির খুব অন্যায় তোকে একা এভাবে ছেড়ে দিয়েছে।' যদি একটা কিছু হোত সোনামাসি গজ গজ করতে লাগলেন। আবার ট্রাঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠাতে ঠিক হোল ওটা স্টেশন মাস্টারের ঘরে জমা দেওয়া হবে। যার জিনিস সেই গরজ করে খুঁজে নিয়ে যাক।

'লোকে ছোটখাট জিনিস ভুলে ফেলে যায়। এই পেল্লায় বাক্সটা কি করে নজর এড়িয়ে গেল জানি না বাপু। এমন তালকানা মানুষও হয়।' সোনামাসি কেতকীর হাত ধরে প্ল্যাটফরমের গেটের দিকে রওনা হলেন।

কুলিরা কিন্তু বাক্সটা নিয়ে ততক্ষণে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। বেওয়ারিশ মাল হলেই সন্দেহজনক মনে হয়। তার উপর কেমন একটা অস্পষ্ট গন্ধ ওদের আরও ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক আবিষ্কার করেছে দুখন্ বলে ছোকরা কুলিটা। পাল্লার ফাঁকে একটুকরো ন্যাকড়া ঝুলছিলো, তার গায়ে রক্তের কালো দাগ।

'বাক্সটা আপনার নয়,' পুলিশ অফিসার কেতকীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

'না।'

'তা হলে কার?'

'এক ভদ্রলোক হাওড়া থেকেই উঠেছিলেন।'

'চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন।'

'না।' থেমে থেমে বলল কেতকী, ভালো করে লক্ষ্য করি নি। গাড়ি ছাড়ার পরেই স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।'

'তা হলেও একটা আইডিয়া তো দিতে পারেন। লোকটা রোগা না মোটা, কালো না ফর্সা, চোখে চশমা আছে কি না, পোষাক-পরিচ্ছদ কি ধরণের, বয়স কত ইত্যাদি।'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে কেতকী বলল—'মনে হয় মোটামুটি মাঝারি গড়ন, রং কালো বা ফর্সা কোনটাই নয়, চশমা—হ্যাঁ চশমা আছে। গাঢ় রঙের বুশ সার্ট আর প্যাণ্টপরা ছিলো। বয়স বোঝা যায় না চল্লিশ হতে পারে, কিংবা আর একটু বেশি।'

'আপনার বর্ণনা খুবই জেনারেল—এতে করে ঠিক লোককে স্পষ্ট করা মুস্কিল। যা বলছেন তাতে মনে হয় আমাদের আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের মতই বিশেষত্বহীন কেউ একজন। যেমন ধরুন এই ভদ্রলোকটি—আপনার মেসোমশাই।'

কেতকী মেসোমশাই-এর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। সত্যিই অজান্তে অনেকটা তাঁর বর্ণনাই দিয়ে ফেলেছে সে। সোনামাসিও স্বামীর দিকে অস্বস্তিভরা চোখে তাকালেন।

'না, না এটা নেহাতই ঠাট্টা মিসেস্ বোস'—পুলিশ অফিসারের মুখে তির্যক হাসির আভাস ফুটে উঠল। 'তবে আমি সেই লোকটির অসাধারণ সাহসের কথা ভাবছি। হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেলে এই ট্রাঙ্ক নিয়ে ট্রেনে ট্রাভল্ করা মুখের কথা নয়—'

বাইরে থেকে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার এসে দাঁড়াল। সমবেত সকলের জিজ্ঞাসু চোখ তার মুখের দিকে।

'একটি অল্পবয়সী মেয়ে স্যার—খুব নিষ্ঠুর-ভাবে মার্ডার করা হয়েছে। কিছু চেনা-জানার উপায় নেই।'

'ভোনো ক্লু পাওয়া গেছে'—অফিসার ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

'সারা শরীর টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর চটে জড়ানো। লণ্ডির মার্কও খুঁজে পাই নি। কেবল একটা আংটি।'

কেতকী দেখলো চুনি আর পোকরাজ বসানো সেই আংটিটা। যেটা দেবাশীষ একদিন তার আঙুল থেকে খুলে মল্লিকার আঙুলে পরিয়েছিল।

মল্লিকা! বলে চিৎকার করে উঠল সে। ঘরের দেওয়ালগুলো কাঁপছে। অন্ধকার। তারপর আরও অন্ধকার।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের **সপ্তসিন্ধু** ৪·৫০

নিগূঢ়ানন্দের

রাজা বাদশার পথের ধারে ৮·০০

বেগম নয় বাঁদী নয় ৬·০০

নতুন মহলের বেগম ৪·০০

পঞ্চ নদীর তীরে ১·৫০

সন্ধ্যা রায় (কবিতা) ২·০০

সুন্দর পাহাড়ী ঈস্ট শ্রীবাসবের ৩·৫০

দিক ভ্রান্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ২·৫০

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের

পাখনা ২·০০ **নয়নে নয়নে** ২·০০

শৈলজানন্দের

নদী বয়ে যায় (নাটক) ২·০০

বনফুলের মালা ২·০০ **মনোহারিকা** ২·০০

বিমল রায়ের একাঙ্ক নাটক

ব্রীজ, অন্তরালে, গ্রহ-সম্মেলন ২·০০

প্রদ্যোত গুপ্তের

রামকৃষ্ণ ২·০০ **বিবেকানন্দ** ২·০০

রাণী রাসমণি ২·০০ **সারদামণি** ২·০০

ভগিনী নিবেদিতা ২·০০

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী

১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অন্নদাশঙ্কর রায়

উটের পিঠে চাপাও কুটো ;
যেমন খুশি মুঠো মুঠো ।

পিঠের নাম মহাশয়
যা সওয়াবে তাই সয় ।

উটের হলো উষ্ট্র রোগ
উট যে হলো অপারোগ ।

ডাকো ডাকো বদ্দি ডাকো
বদ্দি বলেন, 'খাবে নাকো ।'

উট যে হলো পড়ো পড়ো
বদ্দি বলেন, 'চোরকে ধরো ।'

চোর বাছতে গাঁ উজাড়
বাড়ছে তবু কুটোর ভার ।

উট যে হলো মরো মরো
বদ্দি বলেন, 'ডাকাত ধরো ।'

ডাকাত ধরে লাগাও মার
বাড়ছে তবু কুটোর ভার ।

বদ্দি বলেন, 'এখন উঠি।
চাপাও এবার শেষ কুটোটি ।'

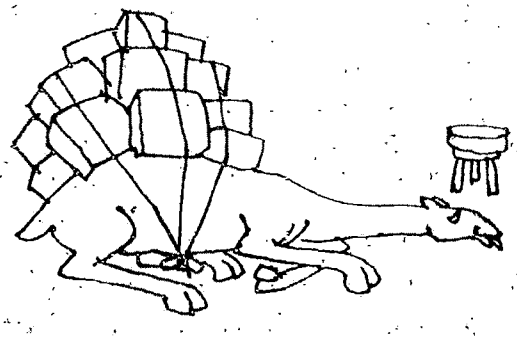

রবীন্দ্র সংগীতের সুর রক্ষণ

প্রফুল্লকুমার দাস

ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে গান সুযোগ্য গুরুশিষ্য পরম্পরায় কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রচারিত ও রক্ষিত হওয়াই চিরাচরিত রীতি। প্রকৃতপক্ষে গানের আসল উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টি ও ভাবের পরিস্ফুটন। গুরুশিষ্য পরম্পরায় গান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গায়কিও কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে চলে আসে। এই গায়কির অধিকার অর্জনের জন্য পূর্বে শিষ্যকে একাদিক্রমে বছরের পর বছর গুরুগৃহে থেকে সংগীতশিক্ষা করতে হত। সংগীতশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র মামুলিভাবে গান শেখা নয়, তার গায়কিও আয়ত্ত করা, অর্থাৎ কথা সুর ছন্দ লয় তথা ভাষা ভাব অলংকরণ স্বরক্ষেপণ ইত্যাদির সমষ্টিগত সামগ্রিক রূপ, যা গানকে প্রাণবন্ত করে তোলে, যা বিষয়ভেদে প্রতিভাধর ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি এবং, যার ধারা সৃষ্টি-রক্ষণকার্যে অনুশীলনীয়, তার অধিকার অর্জন করা। 'সুর রক্ষণের' পক্ষে এটিই উত্তম পন্থা।

কিন্তু যেহেতু সুযোগ্য গুরু এবং শিষ্যের যোগাযোগ সর্বদা ঘটে না এবং যেহেতু মানুষের স্মৃতিশক্তি ও আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ, সেজন্য সুর রক্ষণের অন্য পন্থাটিও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য, সেটি হল সুরের লিপি অর্থাৎ সংগীতলিপি বা চলতি কথায় স্বরলিপি।

বিধিবদ্ধ স্বরলিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবনের পূর্ব-যুগে আমাদের সংগীতের বহু 'খান্‌দানি চীজ' কালের অতলে তলিয়ে গেছে, ঢোঢ়ন, মোঢ়ন, বোঢ়ন, গমক, পুকার, সুত ইত্যাদি বহু 'কায়দা'র হেরফের হয়েছে। যা হোক, এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রবীন্দ্রসংগীতের সুররক্ষণ বিষয়ে আলোচনার কয়েকটি সূত্র উপস্থাপিত করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে সাহিত্য দর্শন গণিতাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এক ব্যক্তি বাংলা দেশে বাংলা সংগীতলিপির উদ্ভাবন করলেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৯১ শকাব্দের (১৮৬৯ খৃস্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায় (১৪০ পৃষ্ঠার পর ১—৬ পৃষ্ঠা সংযোজনে) 'সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' ও তৎসহ পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি

সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশিত হয়। উক্তস্থলে নামের উল্লেখ না থাকলেও এই প্রণালীর উদ্ভাবক যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অন্য প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায়। বিপিনবিহারী গুপ্ত-কৃত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে (পৃঃ ২০৪) দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে—[দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন]

'বাংলায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ।'

তা ছাড়া, 'বালক' ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিভা দেবী-কৃত 'সহজে গান শিক্ষা' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে, 'এখানে গীত শিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ১৭৯১ শকের কার্তিক সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে শ্রীযুক্তবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত এই 'সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' ও তৎসহ পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্র-পদ্ধতির অল্পবিস্তর পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ অনুসারে ক্রমশ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এবং 'ভারতী', 'বালক', 'সাধনা' ইত্যাদি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সংগীত রচয়িতাগণের স্বরলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। তার পর এই পদ্ধতিকে একটি বিশেষ বিস্তারিত ও পরিমার্জিত রূপ দান করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টিকাল হতে কবিকণ্ঠ থেকে কণ্ঠান্তরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারই ছিল রীতি। কবির জীবিতকাল পর্যন্ত এই রীতিরই প্রাধান্য ছিল বললে ভুল হবে না। কবি নিজে তাঁর গানের স্বরলিপিকার ছিলেন না।—স্বরলিপি করেছেন অন্যান্য স্বরলিপিকারগণ। কিন্তু তৎকালে স্বরলিপির সাহায্যে রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষার মাধ্যমটি ছিল একেবারেই গৌণ। এই রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপির ইতিহাস যদি পূর্বাপর পর্যালোচনা করা যায়, তা হলে পদ্ধতির উন্নয়ন ও স্বরলিপিতে গীতরূপের ঠিক-ঠিক প্রতিফলনের প্রচেষ্টার দিক থেকে নানা বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানটির উল্লেখ করা যায়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮৩৫ অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যার ১৮৫ পৃষ্ঠায় এই গানটির যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তার সূচনাংশ এরূপ :

২ ৩ ০ ১
II (ম প । জ্ঞঃ মঃ -ন -ন । জ্ঞ রঃসঃ । প -ন) I
য দি প্রে০ ০ ম দি লে না প্রা ণে ০
I -ন -ন । -ন -ন । -ন -ন । -ন পঃধঃ -ণ I
কে ন ভো রে র আ কাশ ভ রে০ ০
I ধ ণঃধঃ । পঃধঃ পঃমঃ গ । -ন -ন । -ন রঃগঃ -ম II
দি লে০ এ০ ম০ ন্ গা নে গা নে০ ০

০
[রপা -মজ্ঞা -ন । জ্ঞা রা সা]

এই গানটির স্বরলিপি পরে গীতলেখা দ্বিতীয় ভাগে (১৩২৫) এবং তারও পরে স্বরবিতান চত্বারিংশ খণ্ডে (ফাল্গুন ১৩৬১) প্রকাশিত হয়। উভয় স্থলেই সূচনায় স্বরলিপি এরূপ :

মা পা II মপা -জ্ঞ -ন । জ্ঞা রসা রা । রপা পা -ন । -ন সপা পা I
য দি প্রে০ ০ ম্ দি লে০ না প্রা ণে ০ ০ কে ন
I পা পা -ন । -ন পা পমা । পা পধা -ন । -ন ধা সণধা I
ভো রে ০ র্ আ কাশ্ ভ রে০ ০ ০ দি লে০
I পদা পদা -মগা । -ন গা মগা । রগমা মা -ন । -ন মা গমপা II
এ০ ম০ ০০ ন্ গা নে০ গা০০ নে০ ০ "য দি০০"

এই উভয় স্বরলিপিই একই স্বরলিপিকার-কৃত হলেও পরবর্তী স্বরলিপিতে পদ্ধতির উন্নয়ন ও স্বরলিপিকে গীতরূপ-অনুগ করার প্রচেষ্টা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া অন্যান্য নানা দিক থেকে পুরাতন স্বরলিপিগুলি পর্যালোচনা করলে ও তৎসম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করলে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু, বর্তমান প্রবন্ধ তার আলোচনার স্থল নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সম্বলিত কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৩৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল। তারপর ভাদ্র ১৩৫৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপির পূর্বতন গ্রন্থগুলি প্রকাশ করতে থাকেন এবং নূতন গ্রন্থ প্রকাশের কাজও আরম্ভ করেন। এই সব গ্রন্থই স্বরবিতান গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত স্বরবিতানের উনষাটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যে প্রায় উনিশ শ' গান আছে, তার অধিকাংশই এই উনষাট খণ্ডে মুদ্রিত। অবশিষ্ট কিছুসংখ্যক গান আছে, যার সুর বিশেষভাবে অনুসন্ধান সাপেক্ষ। কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবীশ এমন একটি গানের সন্ধান দিয়েছিলেন, যেটি বর্তমানে অশ্রুত। গানটি হল :

বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে
নিশীথেরই সমীরণ, হায় হায়।
মম মন হল উদাসী, দ্বার খুলিল—
বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায়॥

গানটি বর্তমানে প্রচলিত 'গীতবিতান' গ্রন্থে না থাকলেও কবির জীবদ্দশায় নাকি রবীন্দ্রসংগীতরূপে প্রচারিত হয়েছিল এবং কোনো একটি অনুষ্ঠান-পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছিল—মহলানবীশ মহাশয়ের উক্তি থেকে তা জানা গিয়েছিল। সুরও তাঁরই সৌজন্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় শ্রীমতী সাহানা দেবী গানটি টেপ-রেকর্ডে গেয়েছেন। তৎসূত্রেও পূর্বের উক্তি সমর্থনযোগ্য। মুক্তছন্দে, গীত ও গেয় এই গানটির সূচনাংশের স্বরলিপি এরূপ :

প্া প্ II ন্া -ন -ন সা সজ্ঞা -ন -ন -ন সন্ঃসঃ -ন -ন -ন
বু ঝি ও ০ ই সু দূ০ ০ ০ ০ রে০ ০ ০ ০ ০
ন্া -রজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা -রা -জ্ঞা -ন -ন -ন -রসা
ডা০ ০০ কি ল মো রে ০ ০ ০ ০ ০০ ০০
সা রা রা -ন -ন -ন সরগমা -ন পা গা -ন -ন
নি শী থে ০ ০ ০ রি০০০ ০ স মী ০ ০
পরঃসঃ -ন -ন সন্া সা -ন সা রসা -ন -মা -ন -জ্ঞা
র০ ০ ০ ০ ণ০ হা য় হা ০ ০ ০ ০ ০ ০
-ন -ন রজ্ঞা জ্ঞা সরা -ন -ন সন্া ন্া -ন সা -ন···
০ য় বু ঝি ও ০ ই সু০ দূ ০ রে ০

উল্লিখিত গানটির সুরের ছাঁদ কিছুটা 'খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো' গানের ধরণের। কবি-কর্তৃক পূর্বশ্রুত কোনো গানের প্রভাব থাকাও সম্ভব।

পূর্বে যে অবশিষ্ট কিছুসংখ্যক গানের সুর সংগ্রহ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ভানু সিংহের পদাবলীও আছে। ভানু সিংহের পদাবলীর মোট বাইশটি গানের মধ্যে মাত্র নয়টির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। বাকিগুলির সুর (অবশ্যই রবীন্দ্র-যোজিত) হয় তো আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া যা বাকি রইল সেগুলির কতকাংশের সুর সন্ধানের ফলে পাওয়া যেতেও পারে।

আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও ভারত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য

সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের মতো সাধারণ গ্রন্থাগার কোনো কালেই ছিল না, আর আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় তার প্রয়োজনও হয় তো অনুভূত হয় নি। পণ্ডিতদের চাহিদা মেটাতো ব্যক্তিগত পুঁথিসংগ্রহ আর জনশিক্ষার বাহন ছিল তখন আসর, কথকতা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানের পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সে কথা আর খাটে না। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে কোনো মিলই নেই আধুনিক সাধারণতন্ত্রী ভারতের। কাজেই আজকের দিনের পরিবর্তিত পটভূমিকায় পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ অবশ্যম্ভাবী, পশ্চিমী দেশের মতোই আমাদেরও আজ জনসাধারণের শিক্ষার বাহন হিসেবে সাধারণ গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক জগতে গ্রন্থাগারের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে একথা সমান খাটে। এর কর্মধারা বহু ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত। মনুষ্যদেহে হৃদযন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী জনসাধারণের, আর গবেষণাগ্রন্থাগার, বিদ্যায়তন বা বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিশেষ গ্রন্থাগার সীমাবদ্ধসংখ্যক বিশেষের। আধুনিক পদ্ধতির সাধারণ গ্রন্থাগারই এখানে আমাদের আলোচ্য। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের বিশদ আলোচনা বা সম্যক পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। তবু সাধারণভাবে আলোচনারও একটা মূল্য আছে, এ কথায় বিশ্বাস করি বলেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

যে চারিটি সংস্থা আধুনিক গণতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রধান বাহন—আধুনিক গণতন্ত্রে যে চারিটি সংস্থা প্রধানত নাগরিক-জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তার প্রথমটি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি সাধারণ গ্রন্থাগার, তৃতীয়টি সংবাদপত্র; আর চতুর্থটি বেতার-দূরেক্ষণ (television)। এ যুগের জনজীবনে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরই সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য—প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান ঐ গ্রন্থাগারের। জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনসাধারণকে তাদের বাঞ্ছনীয় পন্থা নির্দেশ করে বলেই আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারকে 'জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়' বলা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য নয়। জনসাধারণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ মান উন্নয়ন ক'রে শিক্ষা-দীক্ষায় জনসাধারণকে নাগরিকজীবনের যোগ্য করে তোলাই আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য।

আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা মুখে বলে থাকি বটে, কিন্তু আধুনিক কর্মধারার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় আমাদের অনেকেরই সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা আছে বলে আমার তো মনে হয় না! সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করা যাক প্রথমেই।

(১) সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবেশমূল্য লাগবে না (No direct taxation)। এর অর্থ গ্রন্থাগার আইন চালু করে বিত্তবানদের ওপর গ্রন্থাগার-কর বসাতে হবে ও সরকারী সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিচালিত হবে।

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতবাদের বাধা থাকবে না (no physical barrier)। অবশ্য জাতিধর্ম, বর্ণ ও মতবাদের বিশেষ গ্রন্থাগার থাকতে বাধা নেই, সে হবে দল-বিশেষের বিশেষ গ্রন্থাগার; কিন্তু রাষ্ট্রপুষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগারের মর্যাদা তা পাবে না।

(৩) আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রত্যেকে ইচ্ছামত জ্ঞান আহরণের ও পুস্তক নির্বাচনের ও বেছে নেবার সমান নির্বাধ সুযোগ পাবে (no censorship)। এই আত্মোন্নতি ও আত্মশিক্ষার সুযোগ দেওয়াই সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

পাশ্চাত্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার সংজ্ঞা নির্দেশের যে চেষ্টা করা হয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় দিলে উপরের কথাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবার্ট ডি লে (Robert D. Legh) তাঁর 'দি পাবলিক লাইব্রেরীজ ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস'—গ্রন্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নে তা' দেওয়া হলো।

(ক) উদ্দেশ্যের সাধারণ সংজ্ঞা:

(১) জনসাধারণের নাগরিকজীবন গঠন ও আত্মোন্নতির জন্য পুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা-বিষয়ক দ্রব্যসম্ভারের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদানপ্রদান।

● দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার

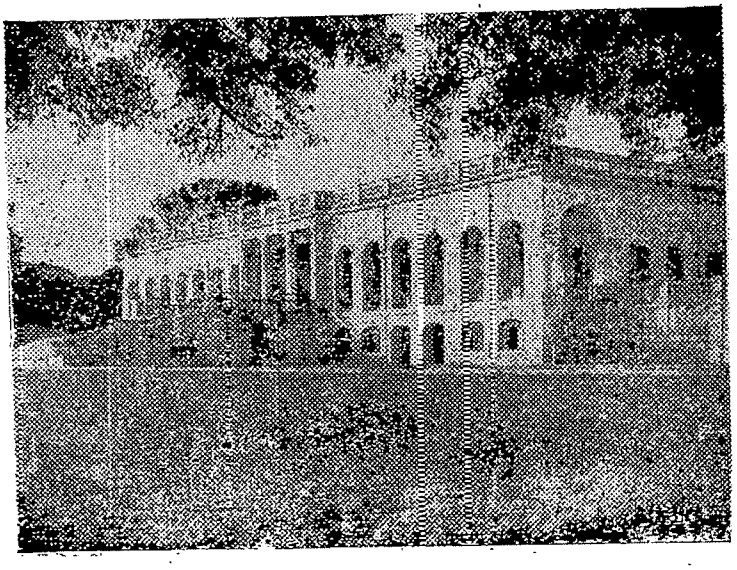

● শিশু গ্রন্থাগার

(২) সংবাদ (information) সরবরাহ-কেন্দ্র হিসেবে সমাজসেবা।

(৩) বালক, যুবক, নারী পুরুষকে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সর্বদা সুযোগ ও উৎসাহ দান।

(খ) জ্ঞান ও উৎসাহ দানের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা :

(১) সমাজ সচেতনতা : নাগরিক-জীবন।

(ক) কৌতূহলোদ্দীপন, পড়াশোনায় উৎসাহ দান ও জটিল সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা।

(খ) জগতের ও দেশের কর্মপ্রবাহে অংশগ্রহণে নাগরিক হিসেবে জনসাধারণের শক্তির বিকাশে সাহায্য।

(গ) সমাজজীবনের সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের গঠনমূলক সমালোচনার মানসিক ভাবসৃষ্টি ও তাদের অজ্ঞতা অপসারণে সাহায্য।

(ঘ) গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণ ও সঠিক মূল্যায়ন। অর্থাৎ অন্যদের সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাঁদের পূর্ণ মর্যাদা দান; মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা; গণ-তান্ত্রিক গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন-সচেতনতায় সাহায্য ও উৎসাহ দান।

(২) জীবিকা : জন-সাধারণকে জীবিকার্জন ও জীবিকা নির্বাহ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনে সাহায্য (এর আওতায় জীবনধারণের খুঁটিনাটি, পিতামাতা ও গৃহশিক্ষা, সন্তানপালন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, স্নেহ-ভালবাসা, জমা-খরচ, ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় খবরাখবর প্রভৃতি পড়ে)।

(৩) সৌন্দর্য সম্ভোগ : শিল্প সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের মানসিক মান উন্নয়ন ও তার স্বাদগ্রহণে সাহায্য।

(৪) আমোদ-প্রমোদ : জনসাধারণকে অবকাশ সময়ে আত্মবিনোদনে ও সর্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতিবিধানে সাহায্য।

(৫) সংবাদ আদান-প্রদান : জন-সাধারণকে বিজ্ঞানের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত করা; তাঁদের প্রাত্যহিক-জীবনের প্রয়োজন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত করা।

(৬) গবেষণা : যাঁরা জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করেন, তাঁদের সেবা করা।

সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ওয়েস্টমিনিস্টার সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও প্রাক্তন লণ্ডন লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ম্যাক্‌কল্‌ভিন সাহেব (Lionel R. Mccolvin) নিম্নে তা' দেওয়া গেল।

(১) সাধারণ গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের পক্ষে সর্বত্র সহজলভ্য হওয়া উচিত।

(২) সাধারণ গ্রন্থাগার নিজ কর্তব্য সাধনের পক্ষে উপযুক্ত হওয়া উচিত (ভালো পুস্তক নির্বাচন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে)।

(৩) সাধারণ গ্রন্থাগার সকলকে পূর্ণ নির্বাধ সুযোগ প্রদান করবে।

অবশ্য তাঁর নিজের কথায়ই এ সংজ্ঞা তিনটি ব্যাখ্যার প্রচুর অবকাশ রাখে।

এই সাধারণ সংজ্ঞা থেকেই গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের ব্যাপকতা বোঝা যায়। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও দু-চার কথা বলা এখানে অবান্তর হবে না। গ্রন্থাগার শুধু স্থানীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্রই নয়, ইহা স্থানীয় সংবাদ আদান-প্রদান কেন্দ্রও বটে। স্থানীয় ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্যাদি সম্বন্ধে বহিরাগত ও স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করবে স্থানীয় গ্রন্থাগার। ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে প্রচার, বক্তৃতা, সঙ্গীত, অভিনয়, নাটক ও কবিতাপাঠ প্রভৃতির মারফত আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত করার প্রচেষ্টায় এর পরিধি বিস্তৃত। ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারে শিশু-বিভাগে গল্পের আসর, রঙিন ছবির বই, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখাও আধুনিক গ্রন্থাগারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য। আজকের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় শিশু-গ্রন্থাগারের মারফত শিশুদের কৌতূহল উদ্দীপন ক'রে তাদের শিক্ষা দেওয়া গ্রন্থাগারের এক প্রধান কাজ। গ্রন্থাগারদের পরস্পরের সহযোগিতা ও বই লেনদেন ব্যতীত বর্তমানে কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষেই সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব নয়।

আর একটা কথা। পাঠক জনসাধারণের বই বেছে নেবার মৌলিক অধিকার স্বীকার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। তাঁদের পরিচিত হতে হবে বর্তমান বর্গীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে। নইলে শেল্‌ফে বইপত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, আর তাতে করে ব্যর্থ ও ব্যাহত হবে আসল উদ্দেশ্যটাই। আধুনিক জগতে শতাধিক বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ পদ্ধতি চালু আছে। তার ভেতর মেল্‌ভিল্ ডিউই (Melvil Dewey) প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির (D. C.) ব্যবহারই জগতের প্রায় সর্বত্র আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রচলিত। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়, দশটি বিভাগে সমগ্র জ্ঞান-রাজ্যকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এ পদ্ধতিতে। প্রত্যেক দেশ নিজেদের বই-পত্রের উপযোগী করে এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। আমাদের আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারেও এ ব্যবস্থাই চালু। তবে এ ব্যবস্থাকে আমাদের দেশের বইপত্রের উপযোগী করে নিতে হবে আমাদেরই।

ভারত

বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর লোকশিক্ষার বাহন

হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সর্বাধিক। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ও পরে ভারতের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা ও চাহিদা মেটালেও আজো তা' আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। এর প্রধান কারণ, বিদেশী সরকার—যাদের দৃষ্টি ছিল জনসাধারণের উন্নতির চেয়ে জনসাধারণকে শোষণের দিকে, জনসাধারণের অজ্ঞতা দূরীকরণে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সঙ্গে তাদের পরিচিত করতে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতালাভের পর সরকারী-ভাবে স্বীকৃতও হয়েছে।

● প্রধান পাঠগৃহের একটি সামগ্রিক দৃশ্য। মধ্যাংশে অবস্থিত টেবিলটির দৈর্ঘ্য ১১০ ফিট

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজে ও তারপরে হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে 'গ্রন্থাগার আইন' পাশ হয়েছে। এই আইনের বলে গ্রন্থাগার-কর ধার্য করে রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যে সব রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন হয় নি, সে সব রাজ্যেও রাজ্যসরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা-লাভের পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সারা দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আর গ্রন্থাগার উন্নয়নের এক সর্বাত্মক কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন আমাদের জাতীয় সরকার।

এই কার্যসূচীর মূল কথা হলো, প্রত্যেক রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (State Library) থাকবে, আর সেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনাধীনে প্রতিটি জেলায় স্থাপিত হবে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার (District Library)। জেলার ভিতর আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে, আর বিভিন্ন কেন্দ্রে বইপত্র পাঠাবার (Circulation) ব্যবস্থা করা হবে নিয়মিত ভাবে। সুদূর গ্রামাঞ্চলের জন্যে গাড়িতে (Exhibition Van) করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের (Mobile Library) ব্যবস্থা করা হবে।

এইভাবে গ্রন্থাগার দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে সারা দেশ। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার দিল্লীতে অবস্থিত 'কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার'-এর (National Central Library) মারফত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হবে।

● প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত ছায়াসুনিবিড় বেলভেডিয়ার ম্যানসন : জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান ভবন

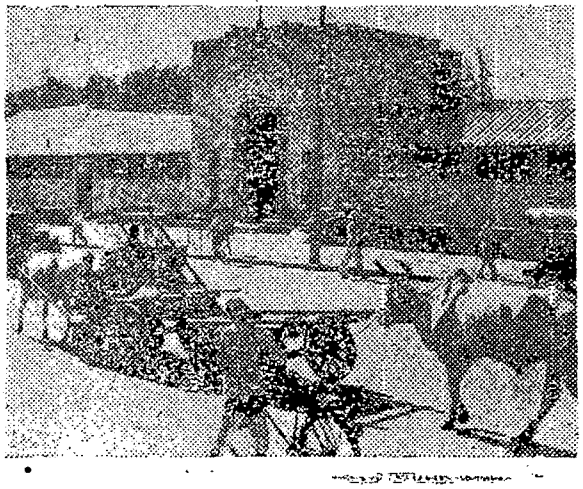

কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৬১ খৃস্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হবার কথা ছিল। আজো তা' স্থাপিত না হওয়ায় কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এর কাজ চলছে। এই পরিকল্পনায় কাজ আরম্ভ হয়েছে বটে, কিন্তু তা' সুষ্ঠুভাবে চলছে বলা চলে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, কাজের অগ্রগতি নৈরাশ্যজনক না হতে পারে, কিন্তু খুব আশাপ্রদও নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারে 'সামাজিক শিক্ষা'র অধীনে না রেখে পশ্চিম দেশের মত গ্রন্থাগারের অধীনে 'সামাজিক শিক্ষা' রাখাই বাঞ্ছনীয় ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে উপরিওয়ালা কর্মচারীদের আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকায় গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের সহিত উপরওয়ালা কর্মচারীদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটছে। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া গ্রন্থাগারের অগ্রগতির পথে জনসাধারণের অজ্ঞতা আর দারিদ্র্যের প্রচণ্ড বাধা তো আছেই, সমস্যাও অনেক।

আমাদের গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষা দেবার কিছুটা দায়িত্ব আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদ্ আর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটুকুই পর্যাপ্ত নয়। সরকার প্রচেষ্টায় বিদেশের (বিশেষ করে য়ুরোপ, আমেরিকার) সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে আমাদের গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষা দেবার ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হবার সুযোগ দিতে হবে। এ না করতে পারলে আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগার আমাদের দেশে কোনকালেই পূর্ণভাবে গড়ে উঠবে না।

১৯৫৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে ভারত সরকার 'ডেলিভারী অব্ বুকস্' পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট, বিধিবদ্ধ করেছেন। এই আইনের

বলে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের কোনেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, বোম্বাই-এর এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ভারতের প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই ও পত্র-পত্রিকা বিনা মূল্যে পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগারও এই আইনের আওতায় পড়ে। কিন্তু এখনও স্থাপিত না হওয়ায় দিল্লী পার্লামেণ্টারী লাইব্রেরীতে এর বইপত্র জমছে। এ আইনের বলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া গ্রন্থাগারগুলোকে 'কপিরাইট-গ্রন্থাগার' বলে। এ আইনে যে ব্যবস্থা হয়েছে সেটুকুই কিন্তু যথেষ্ট নয়। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ও গ্রন্থাগার পরিষদগুলো এই আইনের আওতায় পড়া উচিত ছিল।

এখানে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের অনুসৃত পথেই এটি স্থানীয় জনসাধারণের সেবা করে চলেছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টি সংস্থা' (UNESCO) মিলিতভাবে এই আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিচালনার ও ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলাকৃষ্টি সংস্থা' এশিয়ায় আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার (Demonstration Public Library) স্থাপনের প্রস্তাব আনয়ন করায় ভারত সরকার দিল্লীতে তা' স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ঠিক হয় 'দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী' নাম হবে এই প্রতিষ্ঠানের।

ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জনসাধারণের জন্য এই সাধারণ গ্রন্থাগার উন্মুক্ত হয়; এবং (১) বই লেনদেন ও খবরের কাগজ পড়িবার বিভাগ, (২) পুস্তক বর্গীকরণ ও প্রস্তুতি (processing) বিভাগ, (৩) শিশু বিভাগ এবং (৪) সামাজিক শিক্ষা বিভাগ—এই চারিটি বিভাগে গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হয়। আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ভিতর যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয় তার থেকে এ জাতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের চাহিদার আভাস পাওয়া যায়। বিনামূল্যে, বিনা জমায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার এ গ্রন্থাগারের মূল বিশেষত্ব। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫টি অঞ্চলে গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ শাখার কাজ চালু করা হয়। দুই হাজার পুস্তক সজ্জিত বিশেষভাবে নির্মিত মোটর ভ্যানে এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অবস্থিত। প্রথম বৎসর ১,২২,৩২১ ব্যক্তি এ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। পুস্তক ও কর্মধারা বর্ধিত হওয়ার ও আনুষঙ্গিক উপকরণাদি (audio-visual aids, ফিল্ম, স্লাইড ইত্যাদি) সংগৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের ব্যবহার এবং শিশু ও সমাজশিক্ষা বিভাগে বক্তৃতা সভা, গল্পের আসর, বিতর্ক সভা, সিনেমা, প্রদর্শনী প্রভৃতি কর্মপন্থা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

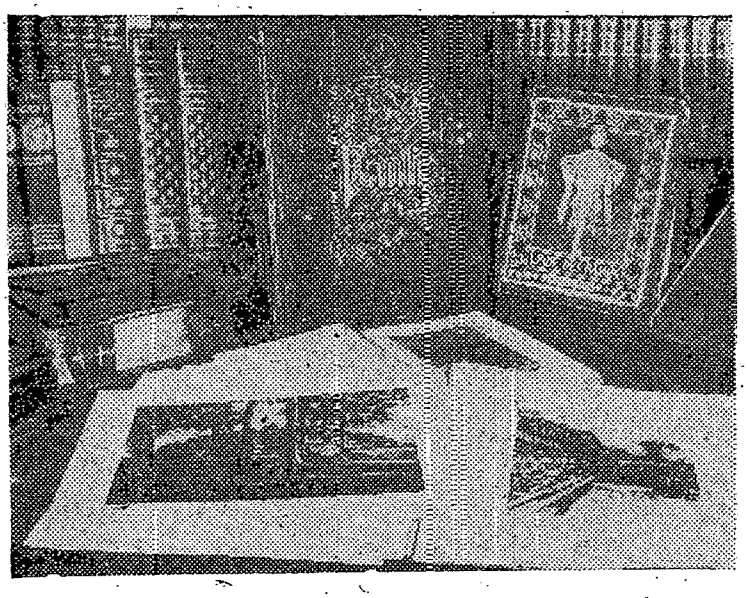

● আশুতোষ সংগ্রহের মহামূল্য কয়েকটি উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য। চিত্রটিতে বাইবেল, ফরাসী ভাষায় 'ইণ্ডিয়ান রাজাস', ফাউস্ট, ডন কিজোর বাঁধানো খণ্ডগুলি, চসার ও স্কটের বাঁধানো সংস্করণ এবং বোরোবুদুর সম্পর্কিত দু'খানি আলোকচিত্র পরিদৃশ্যমান

ম্যাক্‌কলভিন সাহেব তাঁর 'দি চান্স্ টু রীড' পুস্তকে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের যে ছবি এঁকেছেন,—তা নৈরাশ্যজনক, এর জন্যে শুধু আমাদের প্রচার বিমুখতাই দায়ী নয়, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অপপ্রচারই বেশি দায়ী। আমাদের জাতীয় সরকার যেসব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর আহরণ করেন, তাদের সততা ও সংবাদের সত্যতা যাচাই করে প্রচারের ব্যবস্থা করা কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ম্যাক্‌কলভিন সাহেব তাঁর উপরোক্ত বইয়ের উপসংহার অধ্যায়ে আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য:

'ভারতবর্ষের মতো স্বাধীন দেশে সরকারী সাহায্যে সুপরিচালিত সীমাবদ্ধসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠলে ক্রমে তার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূরীভূত হবে'—

(In independent countries such as India the solution lies in providing limited, properly directed public libraries, if necessary with state support, which will enable general educational improvement gradually to overcome economic limitations. p. p. 229.)

পরিশেষে ডঃ এস আর রঙ্গনাথন ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের যে আশাজনক ছবি এঁকেছেন তা দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করা যাক। তাঁর মতে—'১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার, ২২টি কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগার, ১৫৪টি নাগরিক গ্রন্থাগার, ৭১২টি নাগরিক শাখা গ্রন্থাগার, ৩৭৩টি কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও ৪,১০০টি আঞ্চলিক শাখা গ্রন্থাগার, ১৩,১০৭টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, ২,৬৮,৩৬১টি পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র গড়ে উঠবেই।'

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। Mecolvin, L. R.—The Chance to Read : Public Libraries in the World To Day. ২। Gardner, F. M.—The Delhi Public Library : An Evaluation Report. UNESCO, Paris, 1957. ৩। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ৪। কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী। ৫। The UNESCO Public Library Menifesto. ৬। The I. F. L. A. Public Library Working Paper, 1953.

হ্যামলেট!

কোথায় আছো তুমি?

আজও কি ডেনমার্কের রাজপথ তোমার সেই দরাজ গলার হাসিতে মুখরিত—না এলসিনোরের মাটির নীচে তোমার সেই কৌতুকের আলোমাখা চোখ দু'টি চিরদিনের মতই নিভে গেছে?

আমি তোমায় ভুলি নি হ্যামলেট।

আমার স্মৃতির ভুবনে আজও তুমি ঠিক সেইদিনগুলির মতই প্রাণোচ্ছল···কৌতুক-মুখর—মহাকাল তো সেখানে তোমায় স্পর্শ করে নি···

আজ এখানে শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার সঙ্গে ওখানের সেই বিগতবসন্তের ঝিরিঝিরি বর্ষণের সুরটি কোথায় যেন মিলে গেল—সেই কতদিনের হারিয়ে যাওয়া পথ বেয়েই যেন চলেছি সকালবেলার নরম আলোয় ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে—

কি যেন সেই পথটির নাম? বোধ হয় Knivholterj তাই না? পথ চলতি মানুষের দ্রুত চঞ্চলতায় গতি মন্থর করার উপায় ছিল না আমারও। বিনা কাজের ব্যস্ততায় এগিয়েই চলেছি, গতিরোধ হল এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। চোখ তুলে দেখি তুমি—আর তোমার পিছনে একজোড়া গভীর কৌতূহলী দৃষ্টি। তোমার মুখের রেখায় রেখায় সেই পরিচিত দুষ্টুমির হাসি···পরিচয় দিলে—'আমার স্ত্রী শ্রীমতী ক্লারা কার্কবি আর—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রীমতী ক্লারা বলে উঠলেন, 'আর এই তোমার নতুন পাওয়া ওফেলিয়া—কেমন, ঠিক না?'

আমার অপ্রতিভ বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে সকৌতুকে শোনালেন, 'সে খবর বুঝি পাও নি? উনি যে এখন নিজেকে প্রিন্স হ্যামলেট ছাড়া কিছু আর ভাবতেই পারছেন না—'

লজ্জায় অপ্রস্তুতে পড়ে কি যেন বলতে গেলাম কিন্তু তার আগেই তোমার সেই প্রবল হাসির হাওয়ায় সব মেঘ উড়ে গেল। এবার হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়েই জবাব দিলাম শ্রীমতীকে।

—'আশ্চর্য! পাশে এমন স্নো হোয়াইট থাকা সত্ত্বেও?'

'হায় রে কপাল আমার'—সখেদে বলে উঠলেন শ্রীমতী ক্লারা—'এখন শুনছি কালকুট্টা'র (কলিকাতা) কালো রঙেই নাকি সব রঙের ইসারা'—

"কালকুট্টা"! মনে মনে হেসেছিলাম 'কালকূট' বটে, নইলে তোমাকে আর এমন ছোবল হানে।

কিন্তু কি বেপরোয়া তুমি ছিলে হ্যামলেট, এমন সব আলাপচারীর শেষে বলে উঠলে—'এরপর প্রতিদিনই কিন্তু দেখা হবে আমাদের'—

জিজ্ঞাসুদৃষ্টি দেখে শ্রীমতী ক্লারাই রহস্য ভেদ করলেন, 'বুঝছো না; যে ক'দিন তোমাদের Conference চলবে সে ক'দিন Visitor's Gallery যে ওর একমাত্র ঠিকানা।

আমাদের সম্মিলিত হাসিতে মেঘলা আকাশ সেদিন মুখর হয়ে উঠেছিল।

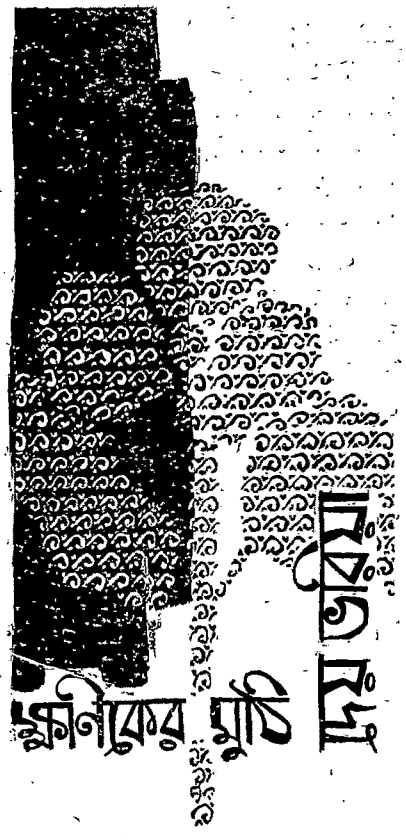

শান্তা বসু

পরদিন কনফারেন্স-হলে উপরের গ্যালারির দিকে চাইতেই দেখলাম তোমাদের শ্রীমতীও গরহাজির নন তা হলে!

হেসে মুখ নামিয়ে নিলাম। কিন্তু তখন কি জানি তোমার দৃষ্টি অত তীক্ষ্ণ?

পরদিন আসবার সময় দেখা হতেই বললে,

—'কালকে কি ভেবে হাসলে বলো তো?'

—'বা রে। হাসি পেলে হাসবো না?'—

—'উঁহুঁ! একটা কিছু মনে করেই হেসেছো মনে হচ্ছে—'

—'ঠিকই বলেছো, শ্রীমতী কার্কবিকে তোমার পাশে দেখে। কিন্তু এত কিসের ভয় বল তো? 'কালকূটে'র কালো রঙে না তার বিষে?'

আশা করেছিলাম জবাবে এক সকৌতুক উক্তির কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণতায় ঢেকে গেল তোমার মুখ। তাড়াতাড়ি চলে এলে অন্য আলোচনায়। মনে হলো সব কৌতুকের আড়ালে একটি ব্যথাতুর মন যেন কোথায় লুকানো আছে।

মনে পড়ছে জুনের সেই সকাল।

এসেছিলাম ক্রনবোর প্রাসাদ দেখতে। উপরে ঘন নীল আকাশ, নীচে নিবিড় নীল সমুদ্র আর তারই মাঝে অজস্র ফুলের নানা রঙের খুশিতে উপছে ওঠা এলসিনোর।

তোমার দেশের বসন্ত ঋতু বুঝি সবার মনেই জাগিয়েছিল তার সমারোহের ছোঁয়া···

পাথরেগড়া ক্রনবোরের সেই প্রাচীন প্রাসাদ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছিলাম বড় বড় গম্বুজ দেওয়া ত্রিতল দুর্গের মাঝখানে কি বিরাট প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—মনে পড়লো মহাকবির কাহিনীতে চিরদিনে অমর হয়ে থাকা দুর্গপ্রাসাদ আর তারই পটভূমিতে চির-অশান্ত, বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হৃদয় যুবরাজ···

—'হ্যামলেট!'

চমকে পিছন ফিরে চাইতেই দেখি তুমি।

—'হ্যাঁ, হ্যামলেটই তো ক্রনবোর প্রাসাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে ওফেলিয়ার—' এতক্ষণ যে হাসির আমার সঙ্গিনীদের চোখে ঝিলিক দিচ্ছিল তারা এবার সশব্দে ছড়িয়ে পড়লো শতধারে।

কিন্তু ততক্ষণে উঁচু পাথরের বাঁধানো পাঁচিলের সুদীর্ঘ চাতালের উপর দিয়ে চলতে চলতে পুরণো প্রাসাদের সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটাচ্ছে হ্যামলেট—সেই বিশাল প্রাঙ্গণ যেখানে আজও প্রতি জুনে 'হ্যামলেট'-এর অভিনয় হয়—দেশ-বিদেশের বিখ্যাত অভিনেতাদের সহযোগে—কক্ষের পর কক্ষ পরিক্রমায় শুনলাম কত ইতিহাস, দেখলাম কত বিচিত্র আড়ম্বর, আসবাব আর সম্ভারের সমাবেশ—কত বিভিন্ন যুগের রাজাদের কত বিচিত্র মূর্তি!

মনে আছে তুমি দেখালে সেই মাটির নীচের গুহার পথ? যার সামনে প্রহরারত এক বিশাল সশস্ত্র মূর্তি—কিন্তু চোখ দু'টি তার বন্ধ।

তুমি শোনালে ডেনমার্কের রক্ষক এই মূর্তি···মুদিত নয়নে দেশের শান্তির সূচনা—

কিন্তু চোখ মেলে জাগে তখনই যখন দেশ হয় বিপন্ন···

আমার চোখ কিন্তু খোলাই ছিল হ্যামলেট, তাই আমি দেখছিলাম, সেই সমুদ্রের ওপারে সুইডেনের তটভূমি হেলসিনবোর্গ

হঠাৎ যেখানে এগিয়ে এসেছে এলসিনোরের কাছটিতে—কানে কানে যেন একটি কথা শোনাতে···যেখানে ওপারের বন্দর ছুঁয়ে উত্তর সাগরের সব ঢেউ কি প্রচণ্ড কৌতুকে এগিয়ে আসছিল পাথরেবাঁধানো এই দুর্গপ্রাসাদের দিকে···ছোটো ছোটো ঢেউয়ের টুক্‌রো হাসি যেন ভেঙে ভেঙে লুটিয়ে পড়ছিলো এলসিনোরের তটে, বুঝি নতুন কালের হ্যামলেট আর তার ওফেলিয়াকে দেখে—

আর দেখেছিলাম এক ছায়াচারিণীকে।

দেখেছিলাম কি গভীর বেদনার ছাপ সেই মুখে···চোখে চোখ মিলতেই সেই বিষণ্ণ ম্লান হাসি—

আশ্চর্য! মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টির আড়াল করে নি তবু।

জানো সে কে? সে তোমার ক্লারা···

দেখে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম হ্যামলেট। মনে হয়েছিল সব সৌজন্যের আড়ালে কেন এ বিষণ্ণতার বাধা! আলোর মত স্পষ্ট সহজ প্রীতির এ বন্ধন কি এতই দুঃসাধ্য? সাত সাগরের পারের দেশে দু'দিনের অতিথি জানা সত্ত্বেও?

শুধু চোখই বুঝি খোলা ছিল সেদিন—মন ছিল ঘুমিয়ে ওই প্রহরীর মত! আজ এই স্মৃতিচারণের পথে সে মন আমার বারবার ছুটে যায় সেই নতমুখী বিষাদ প্রতিমার পাশে··· অনুতপ্ত অশ্রুজলে মুছে দেয় তার সব জ্বালা—

থাক সে কথা হ্যামলেট!

চোখের সামনে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে টিভোলী পার্ক। কি বিচিত্র আনন্দের উৎস···আলোর মালায় রাতের পরীর দেশ! সে বৈচিত্র্যের গোলকধাঁধায় তুমিই পথ দেখিয়েছিলে হ্যামলেট! 'নইলে কি জানতে পারতাম কি আনন্দ, বিস্ময় আর ভয় মেশানো উত্তেজনা 'ব্লু ট্রেন' আর 'সিনিক রেলওয়ে'? কি ভালোই না লেগেছিলো। আমরা সবাই যেন ফিরে গিয়েছিলাম ছেলেবেলার দিনগুলিতে। যেতে যেতে দেখলাম রঙিন আলোর ফোয়ারার ধারে কাঁচের ঘরে বাজনা বাজছে, কোথাও নাচ, কোথাও গান···কোথাও চলেছে অভিনয়। ছোট্টো ছোট্টো নৌকা করে সেই আলোর মালা গাঁথা জলের উপর ভেসে চলা···চলতে চলতে থেমে যাওয়া—হান্স এণ্ডারসনের পরীর রাজ্য! কি বিচিত্রই না লেগেছিল!

কিন্তু সব আনন্দ সব বৈচিত্র্য এক মুহূর্তেই বিস্বাদ হয়ে উঠেছিলো সে রাতে। ফেরার সময় হঠাৎ দেখি তুমি নেই···কখন নিঃশব্দে চলে গেছো আমাদের আনন্দ কলরবের মাঝ থেকে।

একটি কথাও বলে গেলে না। সেদিন গভীর রাতে নিদ্রাহীন চোখে মনের মধ্যে বারবার এই কথাই জেগেছিলো, 'তুমি কি জান না হ্যামলেটের দেশে ওফেলিয়ার আজ শেষ রাত—'

যাবার আগে একটি কথাও কি ছিল না দেবার? বিদায়ের একটি সম্ভাষণও কি ছিল না নেবার?

কেন তুমি এমন করে চলে গেল হ্যামলেট!

পরদিন ভোরের আলোও ছিল বিষণ্ণ ম্লান, বুঝি আসন্ন বিদায়ের আভাসে। মনে পড়ে কি ভারাক্রান্ত মন নিয়েই না গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে। দু'দিনের পরিচিত সুদূর ভারতের এই বিদেশী মেয়েদের বিদায় দিতে সেদিন জন-সমাবেশ কিছু কম হয় নি সেখানে। উৎসুক চোখে এগিয়েই চলেছিলাম···হঠাৎ শুনি পিছন থেকে ডাক···

'ওফেলিয়া'···'ওফে-লিয়া'···সে ডাক সেই প্রথম, আর বুঝি শেষও!

চম্‌কে উঠে পিছনে চাইলাম···না, তুমি নও···

দ্রুত ব্যস্ততায় ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলো ক্লারা কার্‌বি আমার আনন্দ বিস্ময়ভরা দৃষ্টির সামনে। দু'টি ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আমাকে টেনে নিলে একেবারে বুকের মাঝখানে—

'যাবার আগে হ্যামলেটের দেখা হল না তোমার সঙ্গে—তাই সে পাঠিয়েছে ওফেলিয়ার হাতে তুলে দিতে তার রক্তাক্ত হৃদয়ের এই প্রতীকটি।'

চোখ নামিয়ে দেখি, হাতের মুঠিতে এলো একটি লকেট—ছোট্ট একটি হার্ট (হরতন), আর তার সবখানি জুড়ে রক্তের মত লাল মীনা—

চোখ তুলে দেখি, আমার 'স্নো হোয়াইটে'র মোমের মত শুভ্র মুখের নরম হাসির রেখাগুলি বেঁকেচুরে ভেঙে পড়ছে অজস্র জলের ধারায়।

হ্যামলেট!

চিরদিনের মতই হারিয়ে গেছে 'ওফেলিয়া'—জানি একমাত্র সন্তানের শেষ চিহ্নটি নিভিয়ে দিয়ে গেছে স্মৃতির শেষ শিখাটিকে তবুও তার কি আভাস পেয়েছিলে সাত সাগরের পার হতে আসা ভারতের এক কালো মেয়ের মাঝে?

তার সেই ফেলে-যাওয়া ডাকটি—যে নামে সে ডাকতো তোমাকে···সে ডাক কি এই বিদেশী মেয়ের গলায় তেমনি করেই বাজতে পেরেছিল?

হ্যামলেট!

জানি কি সন্তর্পণেই না বুকের মণি-কোঠায় বাঁচিয়ে রেখেছো তোমাদের হারানো মণিটি, তাই বুঝি তারই একটু আভাস পেয়ে কি দুর্বার ব্যাকুলতায় আমার মাঝে খুঁজে নিতে চেয়েছিলে সেই আনন্দের হারানো কণিকাটি···তারই স্মৃতি-জড়ানো পথের বাঁকে বাঁকে···

তোমাদের শূন্যতা কোথাও পূর্ণ হয়েছিল কি না জানি না—কিন্তু আমার অঞ্জলি পূর্ণ করে পেয়েছিলাম, জরায় জীর্ণ দু'টি বিরহী হৃদয়ের, রক্তঝরা এক কান্না!

— শ্রীমতী ভক্তি দেবী

নিজের ঘরে এসে চৌকিটার 'পরে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লো রমানাথ। বিছানাটা তার জন্যে পাতাই থাকে সন্ধ্যে থেকে।

ফেরবার তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই ওর। কেমন করেই বা থাকবে? শিলিগুড়ি স্টেশনের ট্যাক্সি-ড্রাইভার সে। কখন যে কোনদিকে ট্রিপ থাকে বলা তো যায় না। কোন কোনদিন তো প্রায় রাত ভোর হয়ে যায়। অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়েও তো পড়তে পারে করুণা। তাই আগে হতে বিছানাটা পেতে রাখে সে।

আজ তাই রাত দশটা নাগাদ ঘরে ফিরে তাইতেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লো রমানাথ। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু সকাল সকালই ঘরে ফিরেছে সে। মাথার ভিতরটা ঘুরছে যেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছিল রমানাথ। পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে কি ঘুর লেগে গেল না কি? মনে মনে হাসি আসে রমানাথের। নতুন নাকি সে? কমপক্ষে দশ বছর এই শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রোডে ট্যাক্সি বোঝাই করে প্যাসেঞ্জারের দঙ্গল ঘুরিয়ে আনছে না? তবে?

তবে কি আজ সন্ধ্যের মৌতাতটা একটু চড়া হয়ে গেছে? ধ্যুৎ! ওইটুকু লালজলে কখনও রমানাথ শর্মার মাথা ঘোরাতে পারে না কি! তবে? কিসে ঘুরলো মাথাটা, এ্যাঁ?

তবে কি সেই? সেই মেয়েটাই রমানাথের মাথাটা ঘোরালে না কি? ভাবতে ভাবতে একটু হেসে ফেলে রমানাথ।

ইস এমন মজার গল্পটা কাউকে শোনাতে না পারলে জমছে না যেন। পঞ্চাটা যদি আজকেই কালিম্পং না যেতো। নেতাইটা তো দু'মাস আগেই গেছে জলপাইগুড়ি। কাকেই বা বলি? করুণাকে? ধ্যেৎ। ওর কি কোন একটা কথা বোঝবার ক্ষমতা আছে? ও কি জানে? রমানাথ যে ঘরে এসেছে সেই কি ও জানে?

নাঃ সেটা জানে।

যদিও দরজাটা ভেজানো ছিল বলে নিঃশব্দ পায়েই এসে পড়েছে রমানাথ—গায়ের জামাটাও খোলে নি ঘরে এসে। তবুও এ কথাটা ঠিক যে ওর আসবার কথা জানতে পেরেছে করুণা। করুণার হাতের ওই ক্ষয়া-ক্ষয়া চারগাছা চুড়ি আঁচলের চাবির ওই মিশ্রিত শব্দটা যেমন রমানাথের চেনা তেমনি রমানাথের নড়াচড়া এমন কি বোধ হয় নিঃশ্বাসের শব্দটাও করুণা অনুভবেই চিনে নিতে পারে। কমদিন তো আর একত্রে ঘরসংসার করছে না ওরা। কমপক্ষে বছর ষোলো-আঠারো তো বটেই। ভাবতে ভাবতে অল্প একটু চোখ মেলে চাইলো রমানাথ।

মেঝের 'পরে সতরঞ্চির বিছানায় রাণু আর বাবু ঘুমুচ্ছে। কিন্তু করুণা তো নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার আরও একটু বড় করে চাইলো রমানাথ। পরক্ষণেই বিরক্তিতে আবার চোখ বুজে ফেললো সে।

ওই তো—গুঁড়ো কয়লা দিয়ে রাখা ছোট্ট তোলা-উনুনটা টেনে ঘরের লাগোয়া রোয়াকটাতে বসেছে করুণা। আটার তালটা ঠেসে নিয়ে তাওয়াটা চাপিয়ে দিয়েছে উনুনটার ওপর। রমানাথের জন্য গরম রুটি সেঁকবে।

উঃ, ভগবান। অসহ্য লাগে করুণার এই নির্লিপ্ত কর্তব্যপরায়ণতা। হাজারদিন বারণ করেছে রমানাথ। বলেছে—রাত দুপুরে এ খাবার করার কি দরকার। করে রেখে দিলেই তো মিটে যায় ঝামেলা।

কিন্তু কিছুতেই শোনে না করুণা। যত রাত হোক সে বসে থাকবেই।

ও বোধ হয় ভাবে সারাদিনের পরে এসে গরম খাবারের চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ও যদি জানতো ওর ওই গরম রুটির চেয়ে কত বেশি গরম খবর রমানাথের বুকের ভিতর ফুটছে টগবগ করে।

অবশ্যি সব দিন এসে বৌয়ের সঙ্গে গল্প করবার শক্তি বা ইচ্ছে কোনটাই থাকে না রমানাথের।

কোনমতে দু'টি খেয়ে নিয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

কিন্তু আজ? এই তো আজ চোখ বুজে শুয়ে আছে কতক্ষণ। ঘুম কি আসছে? শুধু মনে আসছে সেই মেয়েটার মুখটা। ওর আগুন রংয়ের শাড়ি আর লাল রংয়ের জামা—ওর মুক্তোর মত দাঁত, লাল টুকটুকে ঠোঁট আর মাথাভরা একরাশ রেশমী রংয়ের চুল।

ওদের লাগেজটা একটু বেশি ছিল বলে পিছনের সিটেও জিনিসপত্তর রেখেছিল ওরা। তারপর মাঝে ওই মেয়েটাকে বসিয়ে ধারের দিকে বসেছিল ওই ছেলেটা। অর্থাৎ সামনের সিটে ড্রাইভার মানে রমানাথের আর সেই ছেলেটার মাঝখানে বসেছিল মেয়েটা।

ছেলেটা অবশ্য ঠিক বর নয় ওর—তবে ভাবের মানুষ হবে বোধ হয়। অমনতর একটা মেয়েছেলে একেবারে পাশে এসে বসায় প্রথমটায় বেশ একটু জড়োসড়ো মনে হচ্ছিল রমানাথের। ক্রমে অবশ্য ঠিক করে নিল নিজেকে। তবু যতবার বাঁকের মুখে গাড়িশুদ্ধ মানুষ হেলেছে ততবার ওই মেয়েটার সঙ্গে ঠেলা লেগেছে রমানাথের—বেশ কয়েক মিনিট গেছে সামলাতে। হবে না? অমন রাঙা ঠোঁটের হাসির অত কাছে এসে নিজেকে সোজা রাখা কি সহজ কথা? ইস্ আজকের মত প্যাসেঞ্জার যদি সারাদিন পেতো রমানাথ।

আবার টাকা মিটিয়ে চলে যাবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে ওরা তখন ওদের নমস্কার জানালো রমানাথ—প্রতিদানে হাত তুলে নমস্কার করলো মেয়েটা। উঃ, তারই বা কায়দা কি রকম। মাথাটা আর ঘুরবে না?

এঃ! এমন গল্পটা কারোকে না বলতে পারলে কি রকম একটা ধড়ফড়ানি ধরে।

কিন্তু করুণাকে না বলাই ভালো। এসব কথায় ওর কোন কৌতূহলই নেই। ও কেবল জানে নিজের এই চারহাত ঘরটার কথা।

[১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ব্রতভ্রষ্ট / চিত্রিতা দেবী

সন্ধ্যে নামতে না নামতেই সেদিনও এই রকমই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল। বিকেলবেলা রোদ খটখট করছিল, আর হাওয়া যেন নরক থেকে সদ্ধ হয়ে এসে গায়ে ফুটছিল। অবশ্য নরক তখন একেবারে গায়ের উপরেই ছিল।

ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিম দুইপ্রান্তেই নরক তখন বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। আর সেই নরকের মধ্যে থেকে কোনমতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছে স্বাধীনতা। তাই বীরেন মাঝে মাঝে ভাবে,—স্বাধীনতার ওরকম নারকীয় উদ্ভব বলেই বোধ হয় আজো তা আমাদের জীবনে তেমন সত্য হয়ে উঠছে না। কোথায় যেন কেবলি হেরে যাচ্ছি, ওর মূল থেকে সেই আদি পাপটাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে তুলতে পারলে, তবেই বোধ হয় ওকে সার্থক করা যেত।

বীরেনের সংশয় ঘোচে না, মনে হয়, আজ যদি গুরুদেব থাকতেন তো হয়ত কিছু সমাধান দিতে পারতেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে বীরেনের গুরুদেবের দান সামান্য নয়। সে কথা আজ অনেকেরই জানা নেই, কিন্তু বীরেনের মনে তাঁর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

লোকে মনে করে, বীরেনের জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছেন তাঁর গুরুদেব স্বয়ং আর কেউ নয়। কিন্তু বীরেন তা মনে করে না—করলে সেদিন শ্রীলেখাকে হাসপাতালে নির্বাসন দেবার সময় বলতে পারতো না,—তোমাকে আমি যা দিয়েছি, তার বেশি দিতে পারি নি বলে ক্ষমা কোর।

কিন্তু শ্রীলেখা তো কোনদিনই বেশি কিছু চায় নি, গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে সে তো নীরবেই ছিল; তবে? তবে কে জানে কি? কেমন করে কি হোল? স্বভাবের কোন গূঢ় অন্ধকার থেকে এমন দুর্বার অসহিষ্ণুতা ফণা তুলে দাঁড়াল।

শ্রীলেখা যে পথ ভুল করেছিল সে বিষয়ে কারো তো আর সন্দেহ নেই।

তবু আজ আবার কেন জানি শ্রীলেখার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে,—বলতে ইচ্ছে করছে—শ্রীলেখা, আজ যদি উল্টো কথা বলি, তুমি কি ক্ষমা করবে? আজ যদি আমার সর্বস্ব তোমায় তুলে দিতে চাই, তুমি কি নিতে পারবে?

—নাঃ, আজ আর সেকথা বলার কোন অর্থ নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে; কথার রস সময়ের তাপে ঝল্‌সে ঝল্‌সে শুকিয়ে গেছে; আজকে একথা শুনে হয়ত শ্রীলেখা অল্প একটু শুকনো মতন হাসবে। কিন্তু সেদিন শ্রীলেখার হাসিতে আকাশ রসায়িত হয়ে উঠত।

সেদিনও এইরকমই বিকেলের ছায়া পড়তে না পড়তে মেঘে মেঘে আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল। বজ্রবিদ্যুতে জমকালো আকাশ ঘন ঘন গর্জন করছিল। বীরেনের তখন নবীনযৌবন, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, কিন্তু যৌবনের উচ্ছলতাকে বীরেন ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিয়ে শান্ত-সংযত করে রাখত। ওকে শ্রদ্ধা করত না এমন বোধ হয় কেউই ছিল না এই ছোট সহরটায়। এমন কি মেয়েরাও ওকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে ভালবাসতে ভুলে যেত। কিন্তু শ্রীলেখা ভোলে নি, ওর গাম্ভীর্যকে শ্রীলেখা গ্রাহ্যই করে নি।—থাক্ সে কথা।

দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই বীরেন মা-বাবার সঙ্গে আনন্দাশ্রমে নিত্য যাওয়া-আসা করত। ম্যাট্রিকটা পাশ করে একেবারে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হল। এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বীরেনের মত ছেলে হয়ত একটু অস্বাভাবিক; কিন্তু তখনকার দিনে এমন অনেক ছেলেই দেখা যেত, যারা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেকে গড়তে চাইত। তাদের মা-বাবারাও ঐসব আদর্শ, সাধনা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি বড় বড় কথাগুলো ভারি ভালোবাসতেন। বীরেনের মত অনেক ছেলেই তখন স্বদেশ, সমাজ এই সব নানা সেবাব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করে বেশ খুশিমনেই দিন কাটিয়ে দিত, ভোগ-বিলাসিতাকে তারা বেশ ঘৃণা করতে শিখেছিল।

বীরেন মনে করেছিল সে চির-কৌমার্য ব্রত নিয়ে দেশ ও দশের সেবায় এই জীবনটা কাটিয়ে যাবে। কিন্তু বিধি বাদ সাধলেন। একটা অদ্ভুত আশ্চর্য রাতে,—সেই অদ্ভুত আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বীরেনের ব্রতভঙ্গ হল। যদিও মাত্র একবারের জন্যে, তবু আজো তার জের শেষ হয় নি।

ব্রতপতি আজো কি তাকে ক্ষমা করেন নি? তিনি কি বুঝতে পারেন নি, সেই আশ্চর্য রাতটার জন্যে বীরেন দায়ী ছিল না। সে রাতটা এমন সুন্দর, সেই ব্রতভঙ্গের উন্মাদনা এমন মনোহর, যে বীরেন বুঝতেই পারে নি, সে পতিত হয়েছে। অদ্ভুত একটা পূর্ণতার মধ্যে সে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা আশ্চর্য কি যেন, সুখেই বোধ হয় শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু যেন একসঙ্গে নৃত্য করে উঠেছিল,—সে কেমন সুখ, আজ বীরেন মনেও

করতে পারবে না। সুখই বল, আর দুঃখই বল, স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাকে কি বাস্তবে ফিরিয়ে আনা যায়? যাই হোক, সেই অদ্ভুত অনুভবের মধ্যে ডুবতে ডুবতে বীরেন বুঝতেই পারে নি যে, সে ব্রতভ্রষ্ট হল। যখন বুঝতে পারল, তখন প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর পথ ছিল না। সে কথা শ্রীলেখাও জানত। তবে এমন ভুল করল কেন?

যাক সে কথা,—আশ্রমে গৃহীশিষ্যেরাও থাকতেন কয়েকজন। তাঁদের দেখে বীরেনের মাঝে মাঝে বিয়ে করতেও সাধ হোত, ওই রকম পরিপূর্ণ শান্তজীবন যদি লাভ করা যায়, তবে সহধর্মিণী পথের বাধা নয় সহায়। কিন্তু শান্তজীবনের জন্যে নয়, শ্রীলেখার জন্যেই বীরেনকে বিয়ে করতে হয়েছিল।

সেদিনও এমনি করেই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল,—কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা যেন কার উপরে অন্ধ-আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করে ফুঁসছিল। বীরেন তাদের সেবাদলের সঙ্গে যতদূর সম্ভব রিলিফের কাজ করে যাচ্ছিল। তবু বীরেন জানত, যা করা উচিত তা কিছুই হচ্ছে না। মানুষগুলো ভয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছে, ছুটে পালাতেই পারছে না, তা রুখে দাঁড়াবে কি করে। বীভৎস অত্যাচার চোখের সামনে দেখে দেখে তাদের বুদ্ধি জড় হয়ে গেছে।

বীরেন গ্রামের পথ ধরে সহরের দিকে ফিরে আসছিল। গ্রামের নামটা আজ যেন মনে করতে পারছে না;—ময়ূরাক্ষীর ধারের কোন একটা অখ্যাত গ্রাম। কিছুদিন ধরে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশমত বীরেনরা এক একজন এক একদিকে ঘুরে নির্ভীকতা, সাহসিকতা, সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রচার করতে যেত।

রেললাইনের দিকে লক্ষ্য রেখে মেঠো-সড়ক ধরেই বীরেন আসছিল,—ভিতরে ভিতরে একটা ভয় যে থম্‌কে থম্‌কে ঠেলে উঠছিল না, এমন কথা বলা চলে না,—তার উপরে কালো আকাশে থেকে থেকেই কড়্ কড়্ করে বাজ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আকাশ একেবারে ভেঙে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যেন। ছাতাটি বগলে চেপে সাবধানে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বীরেন আসছিল। এতটা যে আঁধার হয়ে যাবে খেয়াল করে নি আগে। হঠাৎ ঝোপের পাশে কি যেন একটা নড়ে উঠল,—ভিতরকার কবন্ধ ভয়টাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, বীরেন সেই অস্পষ্ট নড়াচড়ার উপরে টর্চ ফেললো, ও জানে, মরার সময় সামনাসামনি মরাই ভালো। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া বিশ্বাসঘাতক মৃত্যুর চেয়ে সামনে থেকে ডেকে আনা লড়াইকরা মৃত্যু ভালো। তা ছাড়া বীরেনের কোমরে একটি গুলীভরা পিস্তল এবং হাতে একটি মোটা ছোট লাঠি ছিল। কিন্তু দেখা গেল যেটা নড়ছিল, সেটা মৃত্যু নয়,—মেয়ে;—টর্চের আলোয় তার শাড়ির পাড় ঝলসে উঠল।

শ্রীলেখাও টর্চের আলোকে মৃত্যুদূত মনে করেছিল,—তাই দু'হাতে মাটি আঁকড়ে উপুড় হয়ে প্রাণপণে মৃত্যুকে পিছনে ঠেলতে চেয়েছিল। এতদিন ধরে বলতে গেলে মরার মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে বীরেন। কখন যে কোথা থেকে পিঠে কে ছোরা বসিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। তবু এমন বিপদে পড়ে নি।

শ্রীলেখা অবশ্য প্রথমে বলেছিল—ঠিক আছে আপনি চলে যান, আমি এখানেই পড়ে থাকি, সকালে যদি এদিক দিয়ে পুলিশের গাড়ি যায় তবে আমাকে তুলে নেবে হয়ত।

তা হয়ত নেবে,—কিন্তু বীরেন জানে, তা হলেও ভয় ঘুচবে না, যে ভয়ে শ্রীলেখা খোলা জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ এইখানে টিলায় পা বেধে এমনভাবে পড়ে গেছে যে আর উঠতে পারছে না।

শ্রীলেখার মা নেই। কাকা-কাকীর সংসার,—আত্মীয়স্বজন অনেকেই ছিল, কিন্তু আপন বলতে একমাত্র ঠাকুমা। এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে কে কে বেঁচে আছে শ্রীলেখা জানে না, সে জানতে চায়ও না। সামনের বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে,—আর ডাকাতের গর্জন ও কাকীমার তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার শুনেই ও পিছনের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। বাঁচবার জন্যেই মরতে ঝাঁপিয়ে ছিল,—বাঁচল দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে কেন বিধি বাদ সাধলেন, এমনভাবে পড়ে গেল যে আর উঠতে পারছে না।

এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। সেদিন সে কি করে বিপদ কাটিয়ে শ্রীলেখাকে নিয়ে আশ্রমে এসে পৌঁছতে পেরেছিল, সে এক মস্ত ইতিহাস। আজ সে কথা মনে করতে ইচ্ছে করছে না।

শুধু মনে পড়ছে শ্রীলেখাকে তুলতে গিয়ে হাতে প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল, কেন ঠিক বুঝতে পারে নি। মেয়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির পাট তো বীরেনের জীবনে কখনোই ছিল না,—তাই হঠাৎ অন্ধকারে শ্রীলেখার ফর্সা হাতটা ধরে তুলতে গিয়ে নিজের হাতট যেন শিরশির করে উঠেছিল, কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি। অবশ্য শুধু হাত ধরাই নয়, নারীদেহের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট পরিচয় সেদিন ঘটেছিল—শ্রীলেখাকে প্রায় পাঁজা-কোলা করে তুলতে হয়েছিল। পরে অবশ্য এ নিয়ে মনে মনে হেসেছে বীরেন,—মেয়েরা যে একেবারেই অন্যধরণের জীব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীলেখাকে কিন্তু প্রথম দেখে সবাই ভালো-বেসেছিলো,—সবাই বলেছিলো,—আহা!—আজো সবাই তাকে আহা-ই বলে,—কিন্তু ঠোঁট বাঁকিয়ে—থাক সে কথা। কিশোর বয়স থেকেই বীরেন স্বামী ওঙ্কারানন্দের মন্ত্রশিষ্য। আর সকলের মত বীরেনও ভেবেছিল যে সে স্বামীজীর আদর্শে চিরকুমার থাকবে। কিন্তু শ্রীলেখার ষোলো বছরের তরুণ দেহ এত বেশি সুকুমার, ছল ছল লাবণ্যে ভরা ভরা, ওর হাতগুলি এমন ফুলের মত নরম, আর চোখ দু'টি এমন ভাসা ভাসা টানা যে, বীরেন মনে করল গৃহধর্ম তো খারাপ কিছু নয়,—আশ্রমের গৃহীশিষ্যদের জীবন কি পবিত্র, তাদের সংসারে শান্তির কি সুন্দর ব্যাপ্তি।

বীরেন অবশ্য প্রথমে অন্যরকমই ভেবেছিল। যেদিন শ্রীলেখার পায়ের প্ল্যাস্টার খোলা হোল—সেদিনই সেকথা তাকে বলেছিলো,—তুমি আমার কাছে আর কিন্তু কোন সঙ্কোচ কোর না; জেনে রেখো, আজ থেকে আমি তোমার দাদা।

কিন্তু শ্রীলেখা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলেছিলো,—তুমি আমার স্বামী।

ওঙ্কারানন্দ নিজে মন্ত্র পড়ে ওদের বিয়ে দিলেন। ওরা একসঙ্গে হোমকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে লাজাঞ্জলি আহুতি দিল। ওরা সপ্তপদী শেষ করে পতি-পত্নী হোল। কিন্তু পুরোপুরি হোল না,—ওদের দাম্পত্যকে আড়াল করে আনন্দ আশ্রমের ব্রত ধ্রুবতারার মত জ্বলতে লাগল। বিবাহের পর চার বছর স্বামী-স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য পালন আনন্দ আশ্রমের রীতি।

বীরেন ও শ্রীলেখা দু'জনেই একথা জানত, কিন্তু বিশেষ কিছু ভাবে নি। হঠাৎ বীরেন দেখলে সেই ভাবনাটা বার বার এসে ওর মনের কোণে ঠোকর মারছে। বীরেনের ভারি লজ্জা হোল। যদি শ্রীলেখা টের পায় যে বীরেন এই সব ভাবছে।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল,

বছর দেড়েক তো হবেই, ইতিমধ্যে শ্রীলেখা ম্যাট্রিক পাশ করল, আর বীরেন কেমিক্যাল ল্যাবরেটারীতে ফেলোশিপ নিয়ে রিসার্চ চালাতে লাগল। আনন্দ আশ্রমে মেয়েদের ডরমেটারীতে থাকে শ্রীলেখা, আর পুরুষদের ডরমেটারীতে বীরেন। দেখা হয় প্রায় রোজই, কথা বিশেষ হয় না। বীরেনের মাঝে মাঝে মনে হয়, শ্রীলেখা যেন দিন দিন তাপে-ঝলসানো ফুলের মত শুকনো শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যু অথবা মরণাধিক অত্যাচারের হাত থেকে—কোনমতে রক্ষা পেয়েও যার হাসি ঘোচে নি, আজকাল আর তার হাসি শোনা যায় না। সকালবেলা ধ্যানে বসে ওঙ্কারানন্দের মূর্তি ছাপিয়ে শ্রীলেখার দীন চেহারা ওর মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। তাই বীরেন ভাবল, একবার একটু সুযোগ করে নিয়ে শ্রীলেখাকে বোঝাতে হবে। কিন্তু সেই বোঝানই যে 'কাল' হবে, সে কথা আগে কে ভেবেছিল?

অনেক তোড়জোড় ফিকির-ফন্দী করে দাঁতের ডাক্তার দেখাবার ছুতো করে শ্রীলেখাকে একদিন সন্ধ্যেবেলা আশ্রম থেকে বের করে নিয়ে এল বীরেন। নিজের বাড়ি খালি পড়েছিল, মা-বাবা গিয়েছিলেন পুরীতে। বীরেন আগে এসে নিজের ঘরটি ঝাড়িয়ে-পুঁছিয়ে পরিষ্কার করে গিয়েছিল। শ্রীলেখাকে এনে নিজের ঘরটিতে একবার বসাবার ইচ্ছে যে অনেকদিন ধরেই বীরেনকে পেয়ে বসেছিল, তাও যেন সে এতদিন টের পায় নি।

নিজের ঘরে এনে শ্রীলেখাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করল বীরেন। প্রথমটা শ্রীলেখা চুপ করেই ছিল, সে তো বোঝাবুঝির কথাই তোলে নি, সে তো মোটে বুঝতেই চায় নি, নীরবেই পড়েছিল আনন্দ আশ্রমের একখানি তক্তপোষের উপরে। হঠাৎ এনে বোঝাতে চাইছে কেন বীরেন? তবু বীরেন বোঝাবেই,—দুঃখু কোর না,—

আরে কে দুঃখু করছে—দেখতে দেখতে হঠাৎ শ্রীলেখার চোখের মধ্যে কি যেন ঝক্‌ঝক্ করে উঠল,—কোন নূতন আশা, কিম্বা নূতন প্রতিজ্ঞা—কি জানি।

অনেক বোঝানোর পরে বীরেনের মনে হোল আর কিছু বোঝানোর নেই, তখন সে ঘড়ির দিকে তাকালো। এত শীঘ্র বোঝানো শেষ হবে, কে জানত। কিন্তু ওকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে শ্রীলেখা বললে,—তুমি হাত দেখতে জান? ছাখ তো আমার বোধ হয় জ্বর হয়েছে।

খুব সন্তর্পণে পাশে বসে বীরেন ওর সুন্দর হাতটা ধরে নাড়ি দেখতে লাগল।

শ্রীলেখা হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে,—আমার বড্ড মাথা ধরেছে, আলোটা নিভিয়ে দাও।

আলো নিভিয়ে দিতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হোল,—জানলার বাইরে লেগে থাকা মোটাসোটা চাঁদটা হঠাৎ যেন হুড়মুড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর জ্যোৎস্নায় ঘরের সবকিছু যেন মাখামাখি হয়ে গেল। কখন যে সেই অদ্ভুত আশ্চর্য রাতটা হঠাৎ—শেষ হয়ে গেল তা আজ আর ভালো করে মনে নেই।

কখন যে কি হয়ে গেল,—ব্রতপতিত বীরেন এসে মাথা হেঁট করে গুরুর কাছে দাঁড়াল।

শ্রীলেখা বলেছিল,—চল আমরা দু'জনে মিলে পালিয়ে যাই।

তার বদলে বীরেন একলাই পালিয়ে এল। শ্রীলেখা কিছুতেই আর আনন্দ আশ্রমে ফিরে যেতে চাইল না। বললে,—স্বামীর ঘরে তার অধিকার, সেখান থেকে কেউ তাকে বার করতে পারবে না।

অগত্যা বীরেনকেই এসে সব কথা গুরুকে নিবেদন করতে হোল। গুরু বললেন,—তোমাদের সাধনায় অনেক ফাঁকি রয়ে গিয়েছিল তাই এই কাণ্ডটি ঘটতে পারল।

তপস্যার বিধি কঠোরতর হল, এক বছরের জন্যে দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ। বীরেনের কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শ্রীলেখাকে হাসপাতালে পাঠানো হোল,—সকালে নার্সিং শিখবে, আর বিকেলে হাসপাতালে ডিউটি করবে। বীরেনই ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। শ্রীলেখা একটা কথাও বলে নি। সেদিনও সন্ধ্যা থেকে এই রকম ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা আসছিল আর মেঘে মেঘে আকাশ কালো হয়ে আসছিল।

শ্রীলেখাকে গেটের ভিতর পৌঁছে দিয়ে বীরেন বলেছিলো, শ্রীলেখা ক্ষমা কোর, তোমাকে আমার সব দিতে পারি নি বলে।

শ্রীলেখা উত্তর দেয় নি

তবু বীরেন ভেবেছিলো শ্রীলেখা তার স্বামীর মতেই মত দেবে, বীরেনকে তার ব্রতপালনে সাহায্য করবে

শ্রীলেখাও কি তাই ভেবেছিল? কে জানে। একথার উত্তর কোনদিনই কি মিলবে?

সবাই শ্রীলেখাকে সেদিন কলঙ্কিনী বলেই জেনেছিলো, কিন্তু বীরেনের মনের ভিতরে যে মন, সে কখনো একথা বিশ্বাস করে নি, তবু বীরেন নিজের হাতে দরখাস্ত করে শ্রীলেখার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের কেস্ এনেছে এবং শ্রীলেখার অনুপস্থিতিতে সে কেস একতরফা ডিক্রি হয়ে গেছে। বীরেন ভেবেছিল নিজেই গিয়ে শ্রীলেখার হাতে ডিক্রিনামা দিয়ে আসবে,—বলে আসবে, শ্রীলেখা, এই ছাখ আমি নিজের হাতে তোমার মুক্তির পরোয়ানা নিয়ে এসেছি, তোমার মন যাকে চায় তাকে বরণ করে সুখী হও। আমি ভুল করেছিলাম, নিজেই তা আজ শুধরে দিতে এসেছি। শুনে শ্রীলেখা কি বলত কে জানে, কিন্তু তার আর দরকার হয় নি,—ডাঃ চৌধুরী নিজে এসে বীরেনের কাছ থেকে ডিক্রিনামা নিয়ে গিয়েছিল।

যেদিন ডাঃ চৌধুরী প্রথম এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল, সেদিনও কি এমনি ঝড় উঠেছিল? মনে নেই বীরেনের। ওর মনের ভিতরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হয়েছিল, তার গর্জনে বাইরের কান যেন বধির হয়ে গিয়েছিল।

হাসপাতালে শ্রীলেখার তখন প্রায় দু'বছর কেটে গেছে,—অর্থাৎ ব্রত উদ্‌যাপনের আর দু'বছর ও প্রায়শ্চিত্ত এক বছর, এই তিন বছর বাকি। বীরেনের মনে মনে প্রত্যেক দিনের হিসেব টোকা হোত, আর প্রতিরাত্রেই সেই তার জীবনে হঠাৎ কোন স্বর্গ থেকে খসে-পড়া একটা রাত একেবারে কাছাকাছি মুখোমুখি এসে দাঁড়াত। এমন সময়ে ডাঃ চৌধুরী এসে দেখা দিলেন। শ্রীলেখার হাসপাতালের ডাক্তার—সরোজলাল চৌধুরী।

ব্যাপার কি? বীরেনের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল,—কোন খারাপ খবর নয়, শুধু একটা চিঠি—শ্রীলেখার হাতের লেখা ছোট্ট একটা চিঠি।

শ্রীলেখা লিখেছে—

আমি অপরাধিনী, আপনার সহধর্মিণী হইবার উপযুক্ত নই। আমাকে মুক্তি দিন।

শ্রীলেখার হাতের লেখা চিনতে কষ্ট হয় নি বীরেনের। ডাঃ চৌধুরী বললেন,—বীরেন যদি মুক্তি দেয় চৌধুরী ওকে বিয়ে করতে রাজী আছে। শ্রীলেখা নাকি মা হতে চলেছে আর তার সব দায় ডাঃ চৌধুরীর।

[১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

একটি প্রাচীন তামিল গাথা

(তিরুবাচকম্)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তকাল ধরে ভারত ভাগ্য-বিধাতার রথ পথ বেয়ে চলেছে। সে যাত্রার শেষ নেই। দক্ষিণের কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতীর কথা—'ভারতমাতার ত্রিশ কোটি মুখ, তিনি আঠারোটি ভাষায় কথা কন, কিন্তু তাঁর মন একটি।'

যুগ যুগ ধরে, কল্প থেকে কল্পান্তে এই শাশ্বত মনকে খুঁজতেই দেবতার দেউলে মহামানবের সাগরতীরে জড়ো হয়েছেন কবি-মনীষীরা, শিল্পী আর সাধক, ভোগী-যোগী, জ্ঞানী-গুণী, গৃহী ও সন্ন্যাসী, ভক্ত ও রিক্ত, দস্যু ও দেবতা। তাঁরা খুঁজেছেন সেই পরম রত্নকে, হিমসজ্জিত তুষারশৃঙ্গ হতে লবণাম্বু-রাশির ধার পর্যন্ত, কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকায়, দ্বারকা থেকে পরশুরাম ক্ষেত্রে, শুধু প্রকৃতির বাইরের বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে নয়, ঘটনার সমাবেশের মধ্যে নয়, হীরা, মুক্তা, মাণিক্যের ছটার মধ্যে নয়, বজ্র-সুকঠিন রাজশক্তির মধ্যে নয়, চঞ্চল জনতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে নয়, একান্ত নিভৃতে নিজের অন্তরের অমৃতলোকেও। উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে পশ্চিমে এই 'রাহী' দলের মিছিল চলেছে, চোখের জলে ভিজে গেছে পথের ধূলো, প্রেমের ত্রিস্রোতায় অবগাহন করেছে তারা, কাতর-কণ্ঠে বলেছে—দেখা দাও, দেখা দাও, বোঝাও, জানাও, রসিয়ে দাও, রাঙিয়ে দাও, দেহের প্রতিটি অণুতে জেগে উঠুক তোমার শিহরণ, মনের প্রতিটি অন্ধকার কোণ উদ্ভাসিত হোক্ আলোয়। এই ত' মানুষের নিত্য প্রার্থনা, সত্য আকুতি আমি জানতে চাই, আমি বুঝতে চাই, আমায় দেখা দাও। চার্বাকের অজ্ঞেয় তত্ত্ব থেকে ভক্তের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন পর্যন্ত সেই একই প্রশ্ন। কেউ উত্তর পায়, কেউ পায় না, কেউ মনগড়া অর্থ করে নেয়—কেউ জানে, কেউ জানে না, কেউ শোনে, কেউ শোনে না, কেউ বলে, কেউ বলে না—তবু সবাই চলেছে, পরম তীর্থের প্রয়াসী, বিজ্ঞানী হ'ন, অবিজ্ঞানী হ'ন, দার্শনিক হ'ন, ভক্ত হ'ন, সাধারণ নর-নারী হ'ন। এই তাঁদের শিব-সাধনা, শিবময় জগৎ যে।

ভারতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এসেছে শুধু আর্য-অনার্য নয়, ভেড্ডিড, ইণ্ডিড, মেলানিড, অষ্ট্রীক, দ্রাবিড়, নিগ্রোবটু, শক-হুণ-খৃস্টান, আরব, তাতার, পাঠান, মুঘল, ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ—তারা শুধু এক দেহে লীন হয় নি, তাদের সকলের বিচিত্র ধারা সমাজ-জীবনকে রসসমৃদ্ধও করেছে। এরই একটি প্রাণবান প্রকাশ দেখেছি প্রাচীন তামিল সাহিত্যে। দেখেছি হাজার বছর ধরে অগস্ত্যকে অনুসরণ করে সংস্কৃত ভাষা ও আর্য সভ্যতা দক্ষিণে প্রবেশ করে দ্রাবিড় ভাষা ও সংস্কৃতির পাণিগ্রহণ করলে। বিজেতারা বিজিত হ'ল। প্রাচীন তামিল হতে চেন তামিজ কোডু তামিজ পার হয়ে আমরা পেয়ে গেলাম এক রসোত্তীর্ণ উত্তরাধিকার। পেলাম বিখ্যাত বৈয়াকরণিক তোলকো-প্পীয়রকে; তাঁর এর্ধতু (Orthography বা বাক্যরীতি) চোল্ল (Etymology বা ধাতুরূপ) পরুল (Matter বা আলোচিত বিষয়বস্তু বা ছন্দবিন্যাস)-কে ঘিরে উঠলো এক প্রকাণ্ড সাহিত্য—তিরুকুরল, সঙ্গম যুগের নানা কাব্য, শিল্পপদরিকম, জীবক চিন্তামণি, মণিমেখলই প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলি, পরের যুগের শিবসিদ্ধান্তীদের অপূর্ব গাথাগুলি, মহাপ্রেমে নিমগ্ন আড়বারদের পদাবলী, প্রবন্ধকারদের, আচার্যদের, দ্বৈতাদ্বৈত কত মতবাদের, শঙ্কর রামানুজ, মধ্ব নিম্বার্ক, যামুন প্রভৃতির ভাষ্যে।

এর পরের যুগে সাহিত্যের ঋষি হলেন কাম্বান্। রামায়ণী পুণ্যকথা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শুধু যুগে যুগে আনন্দই জোগায় নি, তাদের কল্পনাকে রঙীন করেছে, আদর্শকে রূপায়িত করেছে, অবসর বিনোদনের মশলা জুগিয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনকে রসস্নিগ্ধ চঞ্চল উন্মন করেছে আর সারা ভারত জুড়ে একটি মিলনের মন্ত্রকে স্থায়ী করে দিয়েছে। গঙ্গার তটে যমুনার পুলিনে যে রামনাম মণিদীপ জ্বলেছে তারই স্নিগ্ধশিখা দেখেছি পদ্মার তীরে, ব্রহ্মপুত্রের ধারে, কৃষ্ণা কাবেরী তুঙ্গভদ্রার পারে, তামিলনাদ কেরলের বিরল কোণে। আমরা শুনেছি শিবকথা, বিষ্ণুকথা, দেবীগাথাও।

এই শাশ্বত ভারতের একটি রসময় রূপময় ধারাকে নবরূপে উজ্জীবিত করে ধ্যানের নৈঃশব্দে, প্রেমের আপনিস্তব্ধ নিমগ্নতায় যে সব কবির দল নিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে তামিল কবি মাণিক্য বাচকরের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। ইনি প্রসিদ্ধ শৈবাচার্যদের অন্যতম—তিরুজ্ঞান, সম্বন্দর, অপ্পরস্বামী ও সুন্দরেশের সঙ্গে এঁর নাম একসঙ্গে কীর্তিত হয়। এঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে বহু গাথা, গান, কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, আজও সে সব সঙ্গীত মন্দিরে মন্দিরে গীত হয়, 'পেরিয়া পুরাণে' লোকে পড়ে। ইনি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর লোক—এঁর সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত—ইনি পাণ্ড্যরাজার মন্ত্রী ছিলেন, রাজার জন্য অশ্ব ক্রয় করতে গিয়ে পথের ধারে গুরুরূপী শিবের সন্ধান পান—এমন এক দেবতা—যা তাঁর অপূর্বভাষায় বর্ণনা করেছেন ভক্তহৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস দিয়ে—যিনি শুধু পরম বিশুদ্ধ, পরম জ্ঞানী, পরম কারুণিক নন, তিনি সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাস, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত, তিনি ললিতে মধুরে অপরূপ—প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ তাঁর গাত্র, পূত ভস্মচ্ছাদিত, তাঁর জটায় কল্লোলিত জহ্নুকন্যা, ললাটে অর্ধচন্দ্র, তাঁর এক হাতে পাশবদ্ধ জীব, আর এক হাতে পরশু, অন্য হাতে বর ও অভয়, 'কলিত অণ্ডে, কেলিত পিণ্ডে' গলায় ঝুলছে শুভ্র উপবীত, আবার তিনি কল্পান্তরের ব্রহ্মা-বিষ্ণুর অস্থি দিয়ে গাঁথা হাড়ের মালাও পরেছেন। তাঁর কণ্ঠ নীল, দ্বীপিচর্ম পরিধান করেছেন তিনি। তাঁর নিতম্ব দেশে ঝুলছে শাণিত ছুরিকা ও মেখলা, রক্তকমল চরণে বাজছে নূপুর—এই দেবতাই মাণিক্য বাচকরের মহাদেব শ্রীকণ্ঠ।

এই কবির মুখে মুখে মাণিক্য ঝরতো বলেই নাম হয়েছে 'মাণিক্য বাচকর' —মাণিক্য ভাস্কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যের ও সাধনার 'রস'কে (তামিল ভাষায় 'মেইপত্থু') ঘনীভূত বা 'স্বামীভূত' করে নিয়েই এই সাধক কণ্ঠে নিয়েছেন গান 'শেষ পারাণীর কড়ি' হিসাবে। এর মধ্যে বিভাব, অনুভব, ব্যভিচারীভাব সব আছে, আত্মজ্ঞান আছে, শৃঙ্গার রস আছে, মিলনের উৎসব আছে। মনে হয় শৈবগাথা নয় যেন বৈষ্ণবপদ পড়ছি। এঁরই একটি গাথার কিছুটা সারাংশ দিচ্ছি—গাথাটির নাম—তিরুএমপবৈ বা যুবতী কন্যাদের প্রভাত সঙ্গীত—ঠিক এই ধরণের গাথা বৈষ্ণবপদ-কারদের মধ্যেও একটি গানে পাওয়া যায়—বৈষ্ণবসাধিকা দক্ষিণের 'মীরাবাঈ' অণ্ডালের 'তিরুপবৈ' নামক গাথায়—কাত্যায়নী পূজা

সেরে গোপীরা চলেছে নন্দ নন্দনকে দেখতে, তাঁকে ভোরবেলা জাগাতে। রাত্রি অবসানে এই জাগরণের গীতির ধারা আমরা সুব্রহ্মণ্য ভারতীতেও পেয়েছি।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার দক্ষিণের শৈবসিদ্ধান্তের 'শিব' সবার পরশে পবিত্র করা দেবতা। এখানে মিলেছেন মহেঞ্জদাড়োর নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি-পশুপ দেবতা, বেদের রুদ্র, মহাধ্যানী আদিবুদ্ধ, উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্ম, ভাগবতের লীলাবাদী কৃষ্ণ, জৈন গোমতেশ্বর, শূন্য নিরঞ্জন, মহাভারতের দিগবাস নগ্ন, মহাতপা, ঘোরতপা, লিঙ্গ প্রতীক দেবতা, তন্ত্রের আগমের নিগমের শক্তির বাহনও। এই 'শিব' ভক্তের পুত্রকে দুগ্ধপান করাতেও আসেন যিনি হ'ন 'পাল আররায়ের' 'আলুওয়ৈ পিল্লি' (সদা দুগ্ধপায়ী ভগবান পুত্র) মাণিক্য বাচকরের 'তিরু (শ্রী) বাচকম' তামিল ভক্তি সাহিত্যের একটি অপূর্ব অবদান—অনেকগুলি গাথা নিয়েই এই 'দেবহার' গাথা—তারই একটির সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো নিম্নে।

রেভারেণ্ড জি পোগ (১৮৩৯ থেকে চল্লিশ বৎসর তামিল সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষায় দক্ষিণে কাটিয়ে বৃদ্ধবয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তামিলের অধ্যাপনা করেন) ঐ প্রথম তিরুবাচকমের অনুবাদ পশ্চিমকে দেন। অবশ্য তারও পূর্বে ইটালিয়ান জোসেফ বেসচী (Beschi) ও সার্ভেয়ার জেনারল কলিন মেকেঞ্জী এই দিকে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর বহু তামিল পণ্ডিতরা নানাভাবে এই বিরাট সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি ভারতীয় বিদ্যাভবন সিংহলের শ্রীমতী রত্না নবরত্নমের তিরুবাচকম্ বা 'The Hindu Testament of Love' বলে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন]।

●

ত্রিযামা রজনীর তামসী আভা আকাশে তখনও লেগে—তরল হয়ে আসছে অন্ধকার—একটু একটু করে কালোর পর্দা যাচ্ছে ছিঁড়ে—জেগে উঠছে আলোর স্নিগ্ধদ্যুতি—আসছেন তিনি পরম জ্যোতির্ময়, সপ্তাশ্ববাহিত রথে ক্রান্তদর্শী—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য—এই পরম জ্যোতিই ত' শিব, যিনি শিবতর, শিবতম, তিনিই কল্যাণত্রয়ের হেতু, তিনিই অগ্নি, তিনিই অগ্রণী—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং···
হোতারং রত্নধাতমম

রাত্রি শেষেই গ্রামের কিশোরী কন্যারা উঠেছে, তারা গান গাইতে গাইতে শিবসম্ভাষণে চলেছে, মন্দিরসংলগ্ন সরোবরে স্নান করে বিশুদ্ধগাত্রী হয়ে স্নিগ্ধ হবে তারা, চন্দন-মাল্যে চর্চিত হয়ে শিববন্দনা করবে—নমো শিবায় বলে। ঘরে ঘরে পড়েছে সাড়া, ওঠো, জাগো, জাগৃহি—আলোর দেবতা এসেছেন।

শিবসোহাগিনীরা এগিয়ে চললো গান গাইতে গাইতে—দরজায় গিয়ে ধাক্কা, কেউ আসে, কেউ আসে না—ওরে হতভাগিনীরা এখনও জাগিস নি, তোর (হৃদয়) দুয়ার এখনও বন্ধ। একজন বললে—তাতে কি আসে যায়, সবাই তো জড়ো হয় নি। তবু তারা শোনে না—সে কি, কথা দিয়েছিলি না যে ভোরে যাবি শিবপূজায়, ভক্ত-হৃদয়ই যে পাদপদ্ম, মনভোমরা সেই পদ্মেরই মধু খায়, পান করে—তারপর গীত্বা গীত্বা সেইখানে ঢলে পড়ে, তাঁরই করুণা ও প্রেম যে সম্বল, ওঠ তোরা ওঠ।

সখীরা স্মরণ করিয়ে দেয়—বলিস নি তুই কাল ভোরে তোকে জাগিয়ে দিতে—বিশ্বাস হয় না যে পরম প্রেমময়ের কথা শুনেও কেউ শুয়ে থাকতে পারে, তার শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, মন পূর্ণ হয় না।

তারপর কবি গাইলেন—সূর্য উঠছে, আলোর বন্যা নামছে, সেই তমোঘ্নের করুণার ধারা—আলো, আলো, সেই অরুণ অঞ্জলি আমাদের মন ছুঁয়ে গেলো, ছাপিয়ে গেলো, পাখিরা করছে কূজন, মোরগরা মনের সুখে ডাকছে—শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে গ্রাম-প্রান্তর-মাঠ—আলোর জয়ধ্বনি উঠছে—পেয়েছো কি সেই আলোর পরশ, দেহে মনে জ্ঞানে প্রতিটি তন্ত্রীতে, প্রতিটি চেতনায়, অনুভূতিতে, তোমরা যে দেবতার পরম প্রিয়-পরিজন, জানো কি কোথায় থাকেন তিনি, কি তাঁর নাম, কে তাঁর আপনার।

নৃত্যে-গীতে-লাস্যে উল্লসিত হয়ে মেয়েরা পৌঁছল দেবতার মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণীতে—নেমে পড়লো তারা সেখানে—গানে গানে প্রশস্তিতে তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হলো পুণ্যনাম, সুরের সুরধুনী বেয়ে—জয় হোক তোমার, জয় হোক দেবতা—আত্মজ্ঞান দাও, প্রেম, ভালবাসা, করুণা, তোমার স্পর্শ—আনন্দ, পরমানন্দ।

জলে পদ্ম ফুটেছে শতদল বিকশিত হয়ে, রাজহংসরা দুলছে সেখানে মরালগমনে, যেন শিবের কণ্ঠে মালা—শক্তি আলিঙ্গিত তিনি বিরাজ করছেন সেখানে—শঙ্খই যে শক্তির অঙ্গভূষণ—আর গান উঠছে দুলে দুলে সর্পের মত। যারা সেই শিবশক্তির যুগ্ম সরোবরে নামে তারাই ধন্য হয়, সব মালিন্য মুছে যায়, সব অশুচি দূরে যায়—শিব, শিব, হে পরম, হে চরম, জীবনত্রাতা, মুক্তিদাতা—পিতানোঽসি।

কিশোরীরা দেখলে দূরে বসে এক প্রেমাতুরা কামিনী পুষ্করিণীর কিনারে। দেখেই মনে হয়, দেবতাকে সে সব দিয়েছে, দেহ-মন, জীবন-যৌবন, তার মনন নিধিধ্যাসন—কিন্তু কে এ বিষাদিনী—এতো গরবিনী তবে বিরহবিধুরা কেন—কে সে, কোন যৌবন-মদমত্ত পুরুষোত্তম, সুন্দরেশ বা সুন্দরদের শিরোমণি যে এই লোকললামভূতা যুবতীকেও বিচলিত করতে পারে। পরম শিবের করুণাই হচ্ছে শক্তি, বারিবর্ষণের মত মেঘ-বিদ্যুৎ বাহিত হয়েই সে আসে প্রিয়ার জন্য—মন উচাটন হয়—জীবন উত্তাল হয়।

মেঘালোকে সুখিনোঽপি ভবতি অন্যথাবৃত্তি চেতঃ—বলেছেন ভারতের আর এক প্রান্তের অপর এক কবি কিন্তু মেঘের বিদ্যুৎচমকের মধ্যেই কবি মাণিক্য বাচকর দেখছেন সেই শিবশক্তিকে, দেখছেন তাঁর করুণাঘন প্রসাদকে, অনুভব করছেন মেঘের ডম্বরুর মধ্যে ঈশানের বিষাণ, বর্ষার ধারাবর্ষণ যে তাঁরই করুণার বিগলিতধারা।

শিবপূজারিণীরা অভিভূত হয়ে উঠলো—তারা অনুভব করলে এসেছেন সেই প্রেমময়—জ্যোতিরূপে প্রবেশ করেছেন তাদের মধ্যে (মডার্ন সাইকোলজিস্টরা হয় তো বলবেন যে এই সব উৎসব প্রাচীনকালের Erotic dance ritual-কে স্মরণ করিয়ে দেয়) কিন্তু প্রভেদ এই যে, এখানে দেহকামনা মুখর ত' নয়ই বরং মূক ও স্তব্ধ, প্রেমচেতনা মূর্ত, বলা যেতে পারে এ যেন প্রেমচেতনার ঊর্ধ্বায়ণ বা sublimation, তারপর কবি বলছেন নারীরা ডুবে রইলো সেই শিবসাগরে,—তাদের প্রার্থনা হলো—হে প্রেমের দেবতা, তুমিই একমাত্র শরণ ও স্মরণ, তোমার ভক্তদের সেবার ও ভালোবাসার অধিকার দাও, সেই আনন্দেই মগ্ন থাকবার একটু আশীর্বাদ। মনে হয় এরই মধ্যে আমরা পাচ্ছি দেবদাসীতত্ত্বের ইঙ্গিত।

এই ধরণের বহুপদ আছে 'তিরুবাচকম' গ্রন্থে। সব ঘিরে রয়েছে 'ওম্ নমঃ শিবায়।' আর একটি গাথা 'তিরুবন্ধ পহুথী'তে পড়ি শৈবসিদ্ধন্তীদের ব্রহ্মভাবনার শেষ উল্লাস—ইংরাজী অনুবাদ দিচ্ছি (ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'তিরুবাচকম পৃঃ ৭৩)—

[১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রকমারি রকমারি

কিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ এক ॥

কবির মাথায় পোকা যখন কামড়ায়
কিম্বা কাঁধে যখন চাপে ভূত,
আত্মরতির শূন্যে দোদুল দোলে
কিমাশ্চর্য! অহো কিমদ্ভুত!
অহঙ্কারের তুঙ্গে আকাশ কাঁপায়
মাটিতে যেই পা পড়ে সেই লাফায়॥

॥ দুই ॥

হয়গ্রীবের হ্রেষায় মাতাল ঘোড়দৌড়ের মাঠে,
পঞ্চরঙের নেশায় যত রসিক সাঁতার কাটে।
সতীর হাতের শাঁখা জাগায় পতির মুখে হাসি
নাচায় ভুরু বাঁক, ঝরে বিয়ের মালা বাসি।
মন্ত্র পড়ায় গুরু নিরেট শিষ্য হুতুম থুম
চামড়া যাদের পুরু তা'রাই ঘুমোয় মরণ ঘুম।

॥ তিন ॥

একটিও পাতা নড়ছে না গাছে।
যে যার নিজের জ্বালা নিয়ে আছে॥
মেঘলা আকাশ দিনটা করুণ।
কে যেন বললে, 'মশাই সরুন!'
ফুটপাথ ছেড়ে পথে নামা দায়।
প্রাণ যাবে স্টেটবাসের চাকায়॥
গুমোট গরম মেঘে নেই জল।
সবাই বলছে, জীবন অচল॥

॥ চার ॥

তেল কোথাও নেই রে বন্ধু তেল কোথাও নেই,
তেল দিয়ে কাজ হাঁসিল করার
উপায় যে আর নেই।
হায় রে বেকার, হায় উমেদার, হায় রে যত ভক্ত,
তেল না জোটে প্রভুর পায়ে এবার ঢালো রক্ত!

॥ পাঁচ ॥

যে মরে সে মরে, কার কি তা'তে?
দিনরাত তো দেখছি যাচ্ছে মড়া।
মাছের টুকরো সবাই চাইছে পাতে,
জীবন যেন শতছিদ্র ঘড়া॥
আহম্মকেই দেশপ্রেমে মাতে
ত্যাগের বচন মিথ্যে পাখিপড়া॥

॥ ছয় ॥

আরে মশাই রাখুন, রাখুন,
চোরাই ব্যাপার যতই ঢাকুন,
লাফিয়ে বেরোয় ঝুলির বেড়াল
যতই করুন চোখের আড়াল।
গোপন ল্যাজে পা পড়ে যেই
সবাই নাচে তাধেই তাধেই॥

॥ সাত ॥

ডান বলে, 'বাম বেইমান তুই পাজি,'
বাম বলে, 'তুই খাস খালি ডিগবাজী।'
গণশ্রাদ্ধের পিণ্ডি গিলবে কে যে,
দু'দিকেই গেছে নীতির বারোটা বেজে।

॥ আট ॥

টাকা চাকা চাকা চিতার চামড়া
চিত্রিত চিতি সাপের খোলস!
চাল চিনি তেল শূন্যে উধাও
গুষ্টিবর্গ চালাই উপোস।

॥ নয় ॥

হায় হতোস্মি! তাক বুঝে বাঘ
শিকার না করে এ কি আপশোষ!
চাকা চাকা টাকা চামড়ায় জ্বলে
গর্তে চিতির শুনি ফোঁস ফোঁস্।

সম্পাদকীয়

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

—আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই ইওর অনার—আশা করি আমি প্রমাণ করতে পেরেছি আসামী সমাজের ওপর তলায় বাস করার সুযোগ নিয়ে কিভাবে নিজের মনুষ্যেতরপ্রাণী-সুলভ জঘন্য হিংস্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। অনেক আগেই সমাজের এই দুষিত ক্ষতের স্বরূপ ধরতে পারা যেত যদি বহু হতভাগ্যের জীবন বাঁচত, সমাজ বহু পূর্বে ঘৃণ্য এই জীবটির হাত থেকে পরিত্রাণ পেত। কে কল্পনা করতে পেরেছিল পূর্ণপাত্র-র মত প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত যিনি তাঁর হাতে কলমের বদলে চকচকে ছোরা হত্যার আনন্দে নৃত্য করে উঠতে পারে! প্রবাদ বলে 'পেন ইজ্ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড', অথচ দেখুন—

সম্পাদক সত্যপ্রিয় সেন আসামীর কাঠগড়ায় বসে। সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন আছে কাছে। পাবলিক প্রসিকিউটরের নিটোল ভরাট কণ্ঠস্বরে গম্‌গম্ করছে চারদিক। সত্যপ্রিয় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন এদিক-ওদিক। আদালত-কক্ষে লোক ধরে না, এত ভিড়।

এত লোক কি দেখতে এসেছে? সত্যপ্রিয় সেনের বিচার?···কে যেন হঠাৎ বলে উঠল, আজ রায় বেরোবে।···তাই কি এত ভিড়?

কিন্তু আশ্চর্য, কত যে পরিচিত-অতিপরিচিত মুখ চোখে পড়ছে তার ইয়ত্তা নেই। এই ভিড়ের বোধ হয় তিন-চতুর্থাংশকেই সত্যপ্রিয় চেনেন।···ঘরে বেশ একটু চাঞ্চল্য, চাপা গুঞ্জনও। সবাই কি যেন আলোচনা করছে—চাপা কণ্ঠেই, তবে সবার চাপা স্বর মিলে বেশ অনুচ্চকলরবের মতই শোনাচ্ছে। সত্যপ্রিয় কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতে বিচারকদের দেখতে পাচ্ছেন না। চোখের পাতায় যেন সীসের ভার, যত জোর করে চোখ তুলে চাইবেন ভাবছেন ততই যেন দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে··· ব্যাপারটাই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন···কোন্ দিকে তাকালে যে ফুল বেঞ্চকে দেখতে পাবেন কোনমতেই ঠিক করতে পারেছেন না।

···পাবলিক প্রসিকিউটরকে স্পষ্ট দেখছেন বেশ। ভাষণ চলছে।

—পশুকে যেখানে পশুরূপেই দেখি সেখানে তাকে চিনে নেওয়া সহজ এবং সেক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের সুযোগ থাকে, কিন্তু পশু যেখানে মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে বিপদ সেইখানেই। আসামী ভদ্রমানুষের ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল সমাজের বুকে বাস করেছে, তার, তার মধ্যে যে একটা রক্তলোলুপ পশু বাস করে—

চেনা-পরিচিত যে যেখানে ছিল সবাই কি আজ বিচার দেখতে এসেছে? এতগুলো মানুষ কি করে এমন নিশ্চিন্ত অবসর পেল এই দুপুরবেলা! আর পেলই যদি ওদের কারো ইচ্ছে করল না বাড়িতে আয়েস করে শুয়ে থাকতে? নাকে-মুখে গুঁজে দৌড়ে এসেছে তো সব! নাকি ওদেরও সত্যপ্রিয়র মতই ছুটির দিন বাড়ি থেকেও রেহাই নেই—কোনদিন যদিও বা দেখা করতে লোক দু-একজন কমই এল—ফোনের হাত থেকে অব্যাহতি কোনদিনই নেই।

টেলিফোনটা কি বাজছে? মনে হচ্ছে যেন বাজছে। কিন্তু তা হলে তো এতক্ষণ রমার গলাও বেজে উঠত।

তখনই সত্যপ্রিয় স্ত্রীর গলাও শুনতে পেলেন। পাবলিক প্রসিকিউটরকে আর দেখতেও পাচ্ছেন না, রমাকে যেন সেই জায়গাটাতেই দেখছেন। ও কি সাক্ষী দিচ্ছে। কিন্তু উদ্গিরণ যা হচ্ছে তা তো আদালতের উদ্দেশ্যে নয়।···তবে কি এটা বাড়ি?···ঐ তো মুখর টেলিফোনের উদ্দেশ্যে আলুলায়িত-কুন্তলা, বিস্রস্তবসনা গৃহকর্ত্রীর ধাবমান মূর্তিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

—আমার আর রেহাই-নিস্তার নেই। নিত্যদিন তো ভোর থেকে শুরু হচ্ছে ঝনঝনানি···দুপুরে যে একটু শোব—তা আজ আবার ছুটির দিন, বাড়ি থেকে উনি উদ্ধার করছেন আমায়।···

আদালত-কক্ষে নতুন একটা চঞ্চলতার ঢেউয়ে সচেতন হয়ে তাকিয়ে দেখলেন সত্যপ্রিয় জুরির দল আবার এসে বসছেন স্বস্থানে। তাঁদের গাম্ভীর্যের ছোঁয়া মুহূর্তে লাগল সারা ঘরখানায়। সবাই শান্ত, নিশ্চল হয়ে বসেছে। উৎকর্ণ, নির্বাক।

প্রধান বিচারপতির ভাষণ শুরু হ'ল। সত্যপ্রিয় এবার তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন বেশ। কিন্তু কি যে বলছেন তিনি কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না, অনেক চেষ্টা করেও না। শুধু মুখ নাড়া দেখছেন।

ঘরে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। দর্শকরা উদগ্রীব হয়ে শুনছে। সত্যপ্রিয় লক্ষ্য করে করে দেখছেন ওদের—কত যে চেনা মুখ! চেনা মুখ, আধচেনা মুখ। বন্ধুজনের মুখ। আত্মীয়-স্বজনের মুখ।

কিন্তু ওরা বেশ প্রফুল্ল মুখে বসে আছে সবাই। সত্যপ্রিয়র যে এতবড় বিপদ, ওরা কেউ কাতর নয় তো সেজন্য! মেয়েরাও অনেকে এসেছে—সত্যপ্রিয় ওদের সবাইকেই চেনেন। এখানেও ফিস্‌ফিস্ করে কি গল্প করছে ওরা? মুখে ছোট্ট রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে বা কেন! আর একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন সত্যপ্রিয়। সবারই মুখ চাপা আনন্দে উদ্ভাসিত যেন!

···ওরা কি টের পায় নি সত্যপ্রিয় সেন—সম্পাদক, পূর্ণপাত্র জীবনের চরমতম সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হঠাৎ বিপরীত সন্দেহে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন সত্যপ্রিয়।···ওরা কি তবে খুশি হয়েছে সত্যপ্রিয় সেনের সম্পাদক-জীবনের এই চরম পরিণতিতে?

দু'কানে ঠাসা তুলো কি কেউ বার করে নিলে? হঠাৎ সত্যপ্রিয় আবার শুনতে পাচ্ছেন সব। মাননীয় বিচারপতির জলদগম্ভীর স্বর এবার স্পষ্ট কানে আসছে।

কিন্তু ও কি! কি বলছেন উনি? বলছেন কি সমুদয় জুরি ও বিচারকগণ অনন্যমত যে, অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন তাঁকে? শাস্তি—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

হঠাৎ একটা চেনা গলার কান্না শুনতে পেলেন সত্যপ্রিয়। তাকিয়ে দেখলেন। রমা মুখে আঁচল চাপা দিয়েছেন। কি হ'ল—চমকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন সত্যপ্রিয়।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন।

ও না, দাঁড়ান নি। বসেছেন উঠে। শোবার ঘরে বিছানার ওপর। ঘর্মাক্ত কলেবর। সেকেণ্ডখানেক উপলব্ধি করতে গেল তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন।

স্ত্রী উঠে বসেছেন পাশে। নিদ্রালু দু'টি চোখ-ভরা আতংক। সভয়ে জিজ্ঞাসা করছেন কি হয়েছে। উত্তর না পেয়ে আবারও জিজ্ঞাসা করছেন।

সত্যপ্রিয়র বুকটা ধড়ফড় করছে এখনও। বুক পর্যন্ত শুকিয়ে মরুভূমি।

থেমে থেমে আস্তে আস্তে বললেন, এক গেলাস জল দাও, আর গামছাখানা।

বিছানা থেকে নেমে ব্যস্তহাতে জল গড়িয়ে আনলেন রমা, আলনা থেকে গামছাখানা এনে দিলেন।

স্বামীর বুকের বাঁদিকে হাত বুলিয়ে পুনশ্চ সেই একই প্রশ্ন করলেন উদ্বিগ্নকণ্ঠে, কি হ'ল গো হঠাৎ, বললে না তো? বুকে কোন কষ্ট হ'ল?

সত্যপ্রিয় প্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ হাসি হাসলেন একটু। বেচারি! ভাবছে তাঁর করোনারী এ্যাটাক হ'ল বুঝি।

জল খেয়ে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে উদ্বেগাকুল দু'টি চোখকে আশ্বস্ত করলেন, কিছু হয় নি, হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে—

—ওঃ তাই বল। আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম—

স্বস্তির শ্বাস ফেলে রমা জলশূন্য গেলাস আর অর্ধসিক্ত গামছাখানা নিলেন হাত থেকে, রেখে এসে বেড-সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে আবার শোবার উদ্যোগ করলেন।

—পেটটা গরম হয়েছে। এত করে বলি ওগো, চা খাওয়া একটু কমাও। এমন করে নিজের ক্ষতি মানুষে করে!

নিতান্ত সময়টা অতিক্রান্ত-মধ্যরাত্রি আর ঘুমটুকুর ওপর দুর্বলতা মানুষের সহজাত, না হলে এ হেন প্রিয়-প্রসংগে স্বগতোক্তি এমন এক কথায় শেষ করে ফেলার উদ্দেশ্যে সত্যপ্রিয়-জীবনসংগিনীকে সত্যপ্রিয় সেনের জীবনসংগিনী হবার জন্য সৃষ্টি করেন নি বিধাতা।

দুঃস্বপ্ন! হ্যাঁ, তা দুঃস্বপ্ন বৈ কি। যদিও ব্যাখ্যাটা একেবারেই দুরূহ মনে হচ্ছে না, বরং অতি সরল। বাহ্যত আজই সন্ধ্যার ঘটনায় এর উৎপত্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে বহু পুরাতন পট-ভূমিকাও বিদ্যমান—'লেটেস্ট ড্রিম থট্'-এর অভাব হবে না। নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় সারা-দিনের পর সত্যপ্রিয় একটু ত্যক্ত-বিরক্তই ছিলেন। তারপর দেখা-করতে-আসা লোকেদের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সারা সন্ধ্যা কেটে গেল। অনেক দিনই তাই যায়, তবে আজ লোক আসার মাত্রাটাও বেশি, আর সত্যপ্রিয়ও নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্যে ঘাটতি অনুভব করছিলেন। অথচ সন্ধ্যায় বাড়িতে যাঁরা আসেন, অধিকাংশই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন বটে, কিন্তু দাবীটা তাঁদের বেশি থাকে। মনে হয়, আসাটা 'আনঅফিসিয়াল' এবং ঘরোয়া বলেই সত্যপ্রিয়র কাছ থেকে অধিকতর সৌজন্য, সহৃদয়তা ও উদারতা আশা করেন সবাই।

সত্যপ্রিয়র বৃদ্ধা মামীমা এসেছিলেন ছেলেকে সংগে নিয়ে। তাঁর ভাইঝি এম-এ পাশ করেছে—পিতৃকুলে এই প্রথম মেয়ে এম-এ পাশ করল। তার ছবি-সহ সেকেণ্ড ক্লাস পাবার খবরটি তাই মামীমা এনেছেন আনন্দে অধীর হয়ে। তাঁর ভাগনে এত বড় কাগজের সম্পাদক, উনি জানেন শুভ-সংবাদটি ছাপতে কোন অসুবিধেই নেই, বাপের বাড়িতে সেই কথাই বলে এসেছেন। সংগে যে মামাতো ভাইটি এসেছে, তারও কিছু অভিযোগ আছে। তাদের পাশের বাড়ির রিটায়ার্ড কর্তা দর্শনচর্চা করেন। তাঁর গুটিকয় দার্শনিক প্রবন্ধ সে সত্যপ্রিয়র কাছে দিয়ে গেছে এই তিন মাস হ'ল। ভদ্রলোক না কি দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন, কই এ মাসের পূর্ণপাত্রেও বেরোয় নি! মামাতো ভাইয়ের তাই মুখ দেখাবার উপায় নেই, চোরের মত মুখ লুকিয়ে বাড়ি থেকে ঢুকতে-বেরোতে হচ্ছে। বড়মুখ করে তাঁকে যে সে কথা দিয়েছিল, পূর্ণপাত্র-র সম্পাদক স্বয়ং তার পিসতুত ভাই, ভদ্রলোক লেখা বেরিয়েই গেছে ধরে রাখতে পারেন।

নেহাৎ আত্মীয়স্থল, যত অযৌক্তিক অনুরোধ-আবদার হোক, তা তাদের বলতে গেলে কটু শোনাবে। কাজেই কিছুটা সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে স্তোক দিয়ে চা-জলখাবার খাইয়ে (ভরসন্ধ্যায় মামীমা অবশ্য খেলেন না কিছুই—পূজা-আহ্নিক সমস্তই বাকি) ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে রওনা করে দিলেন তাদের।

ঠিক তারপরেই কিষণরাম ঝুনঝুনওয়ালার বিশালবপু সেক্রেলেখানা গলির মধ্যে কায়ক্লেশে ঢুকে তাঁর দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখলেন। মামীমারা চলে যেতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সত্যপ্রিয়। গাড়ির আকার দেখে ঈষৎ বিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে শোফার, কিষণরামের স্থ-যন্ত্রযানজিনি দেহটি ভূতলে অবতরণরত। বিরক্ত মনে নীচে নেমে এলেন অতিথি সন্দর্শনে। নেমে দেখলেন অতিথি-মহোদয়ের বেয়ারা-শোফার লগেজ-ক্যারিয়ার থেকে সুবৃহৎ ঝুড়ি-ডালায় সাজানো আচার-লাড্ডু হালুয়া-শোন নামাতে ব্যস্ত। দেখে বিরক্তির পারা অনেকখানি চড়ল। কিষণরামের নিজের হাতের মোড়কটাও দৃষ্টি এড়ায় নি। আকারটা তার দু'বোতল হেগ্ ধরার পক্ষে যথেষ্ট। ভেটের বাজেটে ওরা বোতলের 'প্রভিসন' রাখবেই। অথচ সত্যপ্রিয় নিতান্তই রসহীন, বোতল-টোতল সত্যিই চলে না। উপঢৌকনের ঘটায় আর মেদবহুল মুখের বিজয়-হাসিতে কার্যোদ্ধারের দাবী এত বেশি প্রকট যে প্রতিবাদ করতে গেলে মানী লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হয়।

দূর-দেশজ এই ভদ্রসন্তান কেন এসেছেন ভালই জানতেন সত্যপ্রিয়। পূর্ণপাত্রের মালিক-কর্তৃপক্ষের কেউ এ-পরামর্শ দিয়ে থাকবেন হয় তো—যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। টানা-পোড়েন চলছে মাসাধিক কাল ধরে। কিষণরাম কলকাতায় নবাগত। দিল্লি-বম্বেতে কুবের-তুল্য বিত্ত-প্রতিপত্তি-শালী কিষণরাম পচ্‌পন্ বছর বয়সে এসেছেন কলকাতার বাণিজ্য-লছমীর বরপ্রার্থী হয়ে। তাই প্রথম পদক্ষেপে বেঙ্গলে কিছু প্রচার চান। যাকে বলে পাবলিসিটি। ইতোমধ্যে কিছু কিছু করেও ফেলেছেন আলাগ দো-চার পেপার মারফৎ। পূর্ণপাত্রতে প্রখ্যাত জীবিত ব্যক্তিদের ওপর আলোকপাত করে মাসে মাসে 'পাদপীঠতলে' নামে যে 'ফিচার' বেরোয় তাতে কিষণরামের জীবনী প্রকাশের জন্য এই মাসখানেক ধরাধরি করছেন সত্যপ্রিয়কে কিষণরামের বাঙালী একান্ত-সচিব। পাদপীঠতলে-র যা মূলাদর্শ, তাতে কিষণরামের জীবন-চরিত নিতান্ত অবান্তর। সুতরাং একান্ত সচিবটিকে বারবারই প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছিল। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ আভাসে-ইংগিতে সত্যপ্রিয়কে বুঝিয়েছেন, এ অনুরোধটুকু রক্ষা করলে পত্রিকার পক্ষে তা বিশেষ কল্যাণপ্রসূ হবে। কি কল্যাণ সত্যপ্রিয় ভালই জানেন। কিষণরামের অঙ্গুলীহেলনে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বহু টাকার বিজ্ঞাপন পূর্ণপাত্র-র দ্বারে এসে পড়তে পারে। এইটুকুই সব নয়, আরও আছে। সমগ্র দিল্লি কিষণরামের আমলকীবৎ করতলগত, কাগজের 'কোটা' বিভাগটা তার ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র একটি কোয়ামাত্র।

বেতনভুক সম্পাদক সত্যপ্রিয় সেনকে কর্তৃপক্ষ সমীহ করেন, তাঁর ওপর হুকুম দিয়ে তাঁর অমর্যাদা করবার ইচ্ছা কারো নেই। সত্যপ্রিয় নিজেও নিজের মূল্য জানেন—তাঁর নাম জড়িত না থাকলে পূর্ণপাত্র-র প্রচারসংখ্যা হু হু করে নেমে যেতে মুহূর্ত লাগবে না। কাজেই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহজে কিছু ঘটবে এ ভয় নেই—কিষণরামের সশরীর-আবির্ভাব সেই কারণেই।...সমাজ-সংসারে বাস করতে গেলে অনুরোধ আর সৌজন্য নামক বস্তু দু'টির পদতলে মাথা না বিকিয়ে

দিয়ে কারো উপায় নেই। সত্যপ্রিয় সেনের সম্পাদক জীবন সেই নিষ্ঠুর সত্যেরই উপলব্ধি।

কিষণরামকে বসিয়ে রেখেই একবার ফোন ধরতে যেতে হ'ল। অফিস থেকে মধুসূদন ফোন করছে, পূর্ণপাত্র-র হেড কম্পোজিটর। এইমাত্র পিওন ফিরে এল শুধু হাতে, বিশ্বতোষ বোস আজও কপি দেন নি, পরশু যেতে বলেছেন। জরুরি মিটিংয়ে না কি কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল, কপি তৈরি নেই। এরপর যে আবার হুকুম আছে প্রুফ পাঠাবার—মধুসূদনের জিজ্ঞাসা তা হলে বই কবে বেরোবে! মাস শেষ হতে আর কতই বা বাকি!···সত্যই চিন্তার কথা। এদিকে কাজ পিছিয়ে আছে বলে ও-টি চলছে। দেখছি কি করতে পারি, ফোনে একবার কথা কই। তেমন বুঝি এ মাসে কানা কড়ি দাম নয় যাবে না—নোট দিয়ে দেব একটা।

মধুসূদনকে টেলিফোনে এ ছাড়া কি বা বলতে পারতেন সত্যপ্রিয়। মনে মনে তা'বলে যে নিজের সিদ্ধান্তটা খুব প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করলেন এমন নয়। বিশ্বতোষ বোসের উপন্যাস একমাস না যাওয়ার মানে পাঠক-পাঠিকার আশাভংগহেতু ক্ষোভ আর উষ্মার উপলক্ষ হওয়া। ঐ ডাঁটেই তো লেখকরা ধরাখানাকে সরাখানা দেখছে। এককাঁড়ি টাকা ব্যয়ে অন্য কাগজের সংগে কত রেষারেষি করে ধারাবাহিক একখানি উপন্যাস প্রকাশের চুক্তি করা—অথচ এটুকু কর্তব্যবোধ নেই যে মাসিক কিস্তিটা সময়ে দেবে। প্রতি মাসে একটা হৈ-চৈ। দু'টো চারটে ফোন, দু'চার জন লোকের ছুটোছুটি—তবে কোনমতে কপি এসে পৌছোবে শেষমুহূর্তে। কিন্তু এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে যে লেখা জোগাড় হয়, সত্যপ্রিয় নিজে পড়তে গিয়ে দেখেছেন—অপাঠ্য। বিশ্বতোষ বোসের দিগন্তবিস্তারী নাম, সত্যপ্রিয় সেনও সামনে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন, খাতির করেন যথাসাধ্য। কিন্তু মনে মনে ভাবেন বিশ্বতোষ বোসের নিজেরও কানা-কড়ি দাম নয়, নেহাৎ দৈব বলীয়ান তাই আর লোকটার পিছনে ব্যাকিং ছিল প্রচুর। না হলে বাংলা দেশের একজন প্রখ্যাত-নামা সাহিত্যিক, তিন মাস অন্তর নতুন বই বেরোচ্ছে—অথচ সাহিত্যের ইতিহাস কোন আস্তাকুঁড়ে তাদের জায়গা দেবে সত্যপ্রিয় ভেবে পান না। লেখা শুধু কথার কচকচি। শুধু কথার মালা গেঁথে ফর্মা ভরিয়ে ফেলার প্রয়াস। ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজে বায়সকুলকে ব্যস্ত করে তোলা শুধু। না ভাব, না ভাষা, না নাটকীয় সংঘাত—প্লটও যে থাকে সর্বদা এমন কথা জোর করে বলা চলে না।

তবু এসব লেখাই তোষামোদ করে আনতে হয় তাঁকে, তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সর্বদা পান থেকে চুণ না খসে। ব্যবসায়-খাতিরে পাঠক-মনোরঞ্জনার্থে। পাঠক-সাধারণ আপন বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করেন লেখক-মহাশয়ের খ্যাতির ওজনের ওপর। উপন্যাস এখন দাঁড়ায় কেবল জন্মদাতার খ্যাতি-স্তম্ভের ক্রাচে ভর দিয়ে।

কথাপ্রসংগে অন্তরংগ এক বন্ধুর সংগে সেদিন দু'চার কথা হচ্ছিল।

তর্কের খাতিরে বন্ধু বলছিলেন, তা হলে কি তুমি বলতে চাও এখন আর সত্যিকার সাহিত্যিক কেউ নেই!

—না অতটা বলতে চাইছি না। দু'একটা অন্তত আছে বৈ কি—সব যুগেই থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিক হবে এবং যোগ্য সমাদর পাবে—এতটার জন্যে আবার কিছু সুকৃতি থাকা চাই আজকের দিনে।

—পাঠকদের চোখ ফোটাবার চেষ্টা কর না কেন তোমরা? সে দায়িত্ব তোমাদেরই।

ঠিক কথা। কিন্তু যুগটা যে পরস্পরের পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়নের, সুতরাং হাত-পা তো বাঁধা। সত্যপ্রিয় আগে-আগে পুস্তক-সমালোচনার ভার কাউকে দিতেন না, কিন্তু এখন প্রতিষ্ঠিত লেখকের সমালোচনার অর্থ তাঁর এবং তাঁর সাংগোপাংগদের বিরাগভাজন হওয়া, তার মানে পত্রিকাখানার শত্রুবৃদ্ধি। তার ওপর বহু লেখকের সংগেই ব্যক্তিগত হৃদ্যতা আছে, তাঁদের বইয়ের বিরুদ্ধে লেখা বিশ্বাসঘাতকতার সমান। আর নতুন কারো বই বেরোল যদি, সমালোচনার্থে আগত বইখানির সংগে সহানুভূতিসূচক ব্যবহারের প্রত্যাশায় মৌখিক অনুরোধ-উপরোধ ছেড়ে রেকমেনডেশান্ লেটার এসে পড়ছে। সত্যপ্রিয় নিরাশ হয়ে ও-পাট ছেড়েছেন। এক ছোকরাকে নির্দেশ দেওয়া আছে—বিভিন্ন ভাষায় স্তুতি করে যাবে কেবল। ভালই চলছে বিভাগটা।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কিষণরামকে বিদায় করে ফোনটা তুলতে যাবেন বিশ্বতোষ বোসকে ফোন করবেন বলে, ফোনটা নিজেই আর্তনাদ করে উঠল। ইতস্তত করবার সময় পেলেন না সত্যপ্রিয়, অন্যমনস্ক সহজতায় সাড়া দিয়ে বসলেন।

সাধারণত, মনেই থাকে, ফোন সত্যপ্রিয় সহজে ধরেন না। তাই নিয়েই বরং চাপা বিরক্তি ধূমায়িত বাড়িতে, প্রকাশ্য রাগা-রাগিও। সম্পাদক না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে টেলিফোন ছিল না সত্যপ্রিয়র। হবার পর নিয়েছিলেন কাজকর্মের সুবিধা হবে ভেবে। তখনও টেলিফোন নিতে গেলে এত যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা-আরাধনার দিন পড়ে নি। প্রথম প্রথম বাড়ির এই নবীন সম্পত্তিটিকে পরম সমাদরেই গ্রহণ করেছিল সবাই—স্ত্রী তাঁর পদোন্নতির সম-আদরে, ছেলেমেয়েরা ততোধিক। তারা নেহাৎ ছোট তখন।

নিদ্রিত সত্যপ্রিয়র কর্ণপটাহ দীর্ণ করে যেই দিনের প্রথম টেলিফোন বেজে উঠত, সচকিত সত্যপ্রিয় অদূরবর্তিনী গৃহিণীর সহাস মন্তব্য শুনতে পেতেন।

—ঐ শুরু হ'ল বন্দিগান—রাজামশাই আর কেন! এবার গাত্রোত্থান করুন।

ছেলেমেয়েরা দুড়্‌দুড়্‌ করে ছুটে আসত—কে আগে ফোন ধরতে পারে তাই নিয়ে রেষারেষি।

কিন্তু লেবু কচলাতে কচলাতে তেঁতো হয়। একটি বুদ্ধি-দীপ্ত পরিহাস অতিব্যবহারে বিরক্তি উদ্রেক করে। টেলিফোনটারও সেই দশা। তার বাজার ঠেলা সামলাতে সামলাতে বাড়িশুদ্ধ লোক উত্যক্ত সকাল-সন্ধ্যা। ফলে আজকাল টেলিফোন বাজলে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ অখণ্ডনীয় হয়ে ওঠে। একেবারে সমাধি-অবস্থা, টেলিফোনের আওয়াজ কোন বিঘ্নই ঘটাতে পারে না।

অগত্যা গৃহিণীই ভরসা এবং তিনি ও তাঁর বাক্যযন্ত্রণা অভেদ। কিন্তু অবাঞ্ছিত ফোন হলেই জরুরী কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করতে গেলে নিজে ধরা চলে না অনেকেই গলা চেনে। গৃহিণী ভিন্ন গতি কি।

আজ বে-খেয়ালে ধরে ফেলে পস্তালেন সত্যপ্রিয়। সন্ধেটা নির্ভেজাল কাজ গুছিয়ে নেবার কাল। সুতরাং ধরলে পস্তাতে হবেই। কথাটা সত্যপ্রিয়রই। এখনও মন-মেজাজ প্রফুল্ল থাকলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুরহীন গান গেয়ে ওঠেন কখনও—

কার্যোদ্ধার-ক্ষণ এল বুঝি কাছে,
কার্যোদ্ধার-ক্ষণ রে—

ছেলেমেয়েরা হাসে। রমাও হাসেন কখনও, বাড়িতে এটা একটা চালু রসিকতা। ফোনটা খুড়তুত ভাইয়ের শালার। তাগিদ দিতে করছে। তার কপালে বিভ্রাট বেধেছে

বড় মন্দ নতুন চাকরি, বেকার-জীবনের ভার সবে লাঘব হয়েছে। ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে প্রসংগক্রমে বলেছিল পূর্ণপাত্র-সম্পাদক তার নিকটাত্মীয়। উদ্দেশ্যটা মহৎই ছিল, 'ইম্‌প্রেস' করা। কার্যক্ষেত্রে মালিক-পত্নীর উপন্যাস পূর্ণপাত্রতে ছাপানোর দায় ঘাড়ে এসে পড়েছে।

—আমার পরিচয় দিয়ে বাজিমাৎ করবার পরামর্শ যখন আমি দিই নি, দায়িত্বও আমার নয়।—বহুবার বলতে-গিয়ে-থামা মন্তব্যটা করতে গিয়ে আজও থামলেন সত্যপ্রিয়। অহংকার আর দম্ভের সীমা খুঁজে পাবেন না তা হলে নির্বিচারে সব আত্মীয়-স্বজন। পদমর্যাদার দম্ভ আর পয়সার অহংকার ভিন্ন অমন মানবতাবোধহীন হওয়া তো আর সম্ভব নয়! এইটুকুতে নিষ্কৃতি পেলে সত্যপ্রিয় দমতেন না। কিন্তু শ্যালক-ছেলেটির দুঃখে বিগলিতদের অনুরোধ-উপরোধ আসতে শুরু করলে কড়া থেকে জলন্ত উনুনে পড়বেন। দু'বার এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে আগে। আর এ ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভাল নয় সত্যপ্রিয় জানেন, চাকরিটির মূল্য অনেক। কাজেই মানবতাবোধ বজায় তাঁকে রাখতেই হবে!

ফলত সেই একমেব 'দেখছি কি করতে পারি' করে ছাড়তে হল।

মেয়েটা অমনি বললে, বাবা, অমলকাকা আর গীতাকাকীমা এসেছেন, বসবার ঘরে যাও।

—আচ্ছা! কিন্তু ক'দিন বাদে তো পরীক্ষা—ঘুরে না বেড়িয়ে তুমি একটু বই নিয়ে বস দেখি।

মেয়েটাকে হাতের কাছে পেয়ে বিরক্তির বিষটুকু তারই ওপর ঢাললেন সত্যপ্রিয়। তৃপ্তি হ'ল না। নীচে নেমে এলেন। একটি আর্টিস্ট ছেলে বসে আছে বহুক্ষণ, কিষণরামকে অভ্যর্থনা করতে এসে মনে পড়েছিল। তারপরও বিশ্বতোষ বোসকে ফোনটা করে তবে দেখা করবেন ভেবেছিলেন, আপাতত সেটা স্থগিত রেখেই এলেন। তার হাতের কাজের নমুনা দেখে মুখে কিছু বলেন নি অফিসে, বাড়িতে এসে দেখা করবার আদেশ দিয়েছিলেন। তখন ব্যস্ত ছিলেন বড়, সময় ছিল না। নেহাৎ গরীব ছেলে এখনও পাশ করে বেরোয় নি, প্রয়োজন মেটাতে কিছু কাজ চায়।

সত্যপ্রিয়র মন ভিজেছিল। আপাতত সে সব বাষ্প হয়ে উবে গেছে। কোন আশা না দিয়েই বিদায় করলেন তাকে। পাশ-টাশ করুক, পূর্ণপাত্র-র কাজ এখনই পাবে কি করে। অথচ বহু ছোট কাজ থাকে। এদের নিষ্ঠা ও সুলভতা সেগুলোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তা ছাড়া নিজে যদি কাজ নাও দেন, তাঁর একখানি পরিচয়-পত্রে অন্যত্র একাধিক কাজ মিলতে পারত।

অথচ বসবার ঘরে এসে বেশ হাসতে পারলেন, ভদ্রতা-রক্ষায় ত্রুটি কি ঘটল না! যদিও অন্যের অজ্ঞাতে চোখ দু'টো অন্বেষণ করে নিল সংগে খাতা কি ফাইল আছে কি না! নেই দেখেও নিশ্চিন্ত হলেন এমন নয়। ভ্যানিটি-ব্যাগের গহ্বরে কবিতা কেন ছোট-গল্পও বেশ ধরে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সত্যপ্রিয় বন্ধু-বন্ধুপত্নী দেখলেই ভয় পান। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় যেমন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে শতকরা অন্তত সত্তর-ভাগ সিঁদুরে মেঘ আসল আগুন বলেই প্রমাণিত হয়। সত্যপ্রিয়কে খোলাখুলি মত প্রকাশ করতে বললে তিনি বলবেন, সম্পাদক-পদপ্রাপ্তির পর তাঁর বাল্য-কৈশোর তরুণ-জীবনের সমস্ত বন্ধু-বান্ধব পরিচিতের মধ্যে তাঁকে মাঝে মাঝেই দেখতে আসার তাগিদ শতকরা যদি আশিভাগ বেড়েছে ধরা যায় তা হলে তিনি বলবেন, তার শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাটভাগ স্বরচিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা ছাপানোর 'সুযোগাম্বেষণ-প্রসূত। তবে অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সত্যপ্রিয় সেন পুরুষের পকেট ইত্যাদির চেয়ে মহিলাদের ভ্যানিটি-ব্যাগ ইত্যাদিকে অধিক ভয় করেন।

যা আশংকা করেছিলেন তাই। কথায় কথায় ভদ্রমহিলার ব্যাগ থেকে গুটি চার-পাঁচ কবিতা লেখা কাগজ বেরোলো। হাত বাড়িয়ে নেবার আগে সত্যপ্রিয় নিজের ভারাক্রান্ত দপ্তরের কথা ভাবলেন।

তারপর কতকগুলো উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে দেখতে বললেন, কবিতা দেখছি। আমার দপ্তরে আবার বাছাই-করা কবিতা এত জমে আছে, ছ-আট মাসের মধ্যে জায়গা দিতে পারব না বলে রাখছি। আজকাল তো ছোট গল্পকে প্রাধান্য দিতেই হয়—

ভদ্রমহিলা সাগ্রহে একটু ঝুঁকে বসলেন সামনে।—তা যদি বলেন, ছোট গল্প আমার কয়েকটা তৈরি আছে। এগুলো রাখুন, না হয় দু-হ'মাস দেরিই হবে। আর ছোট গল্প আমি পাঠিয়ে দেব।—তুমি কাল লাঞ্চের সময় একটু পৌঁছে দিতে পারবে তো মিঃ সেনের অফিসে?—শেষটুকু স্বামীর উদ্দেশ্যে।

—কাল দুপুরে—বন্ধুবর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বোধ হয় ভেবে নিচ্ছিলেন কাল দুপুরে তাঁর অবকাশ হবে কি না, স্ত্রী ততক্ষণে অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন।

—তোমার অসুবিধে থাকে দরকার নেই আমিই গিয়ে দিয়ে আসব।···

ক্লান্ত হয়ে আলো নিভিয়ে শুয়েই পড়েছিলেন, আবার উঠতে হল। রমার এক বান্ধবী এসেছেন দেখা করতে। কারে আগমনের আভাস বেশ একটুক্ষণ আগেই পেয়েছিলেন, রমা এসে ডাকলেন তারপর। ভদ্রমহিলা দুঃস্থা। অকর্মণ্য অমানুষ স্বামী। ছেলেটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন তাই। নিজে কিছু উপার্জনের উপায় চান।

সত্যপ্রিয় তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত। আশ্বাস কিছু দিলেন না। বরং বললেন কোন সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে করেন না। তথাপি চেষ্টা করবেন। সামনের সপ্তাহে একদিন যেন আসেন ভদ্রমহিলা।

জীবনের ভারে ন্যুব্জদেহ মহিলাটি চলে যেতে রমার মেঘাবৃত মুখের দিকে খেয়াল না করে সত্যপ্রিয় একটু তিক্ত হেসে বললেন, মানুষ যে কেন ভদ্র-মুখোস পরল—আমার আফশোষ হয়! পারতাম ইচ্ছেমাত্রে সবার দিকে খোলা ছোরা উঁচিয়ে ছুটে যেতে—

মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটল। বারুদ-স্তূপ আগুনের একটা ফুলকির অপেক্ষাতেই ছিল।

তিক্ততর একটু হেসে রমা বললেন, একে তো ভগবান মেরেছেন, ওর জন্যে তুমি আর খুনে সাজবে কেন? তুমি তোমার বন্ধু-পত্নীদের আদর-আপ্যায়ন কর বরং, লেখা-টেখা ছাপ—তা হলেই হবে।···

পার্শ্ববর্তিনীর স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সুপ্তির আশ্বাস। সত্যপ্রিয়র চোখে কিছুতে আর ঘুম আসছে না। একটু আগেও যে স্বপ্নটুকুর জন্য নিজের মনেই একটু লজ্জিত হচ্ছিলেন, সেটাই কেমন নেশার মত পেয়ে বসেছে। সুখ-স্বপ্নের নিবিড় আমেজের মত ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

সত্যপ্রিয় সেন,—সম্পাদক, পূর্ণপাত্র ভাবছেন স্বপ্ন না হয়ে ওটা বাস্তব হলেই বা কি ক্ষতি হ'ত! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড? ওটাই বরং একটু জলো মনে হচ্ছে। প্রাণদণ্ড হলেই বেশি নাটকীয় হত। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যপ্রিয় সেন শেষ বিবৃতি দিয়ে যেতেন। যে বিবৃতি আলোড়ন আনত চারদিকে। হৈ-চৈ পড়ে যেত। দীর্ঘকাল

সংখ্যাতীত সভায় সভাপতি আর প্রধান অতিথি হয়ে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা রপ্ত হয়েছে বেশ। এখন যেখানে কিছুই বলবার নেই কিংবা বলবার মত কিছুই জানা নেই সে ক্ষেত্রেও সপ্রতিভ সাবলীলতায় জানরক্ষা করে আসতে কোন অসুবিধা হয় না।...

নাটকীয় অভিবাদন-ভংগীতে বাও করলেন সত্যপ্রিয় সেন। মাথা নত করে মাননীয় আদালতকে সম্মান জানালেন। বলতে শুরু করলেন তারপর।

—মাননীয় বিচারকমণ্ডলী জুরিভদ্র-মহোদয়গণ, সমবেত আইনজ্ঞবৃন্দ ও জনসমষ্টি! আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি আমি যা করেছি ঠাণ্ডা মাথায় সজ্ঞানে করেছি, কিছুমাত্র অনুশোচনা আমার নেই—মাননীয় আদালতের শাস্তিবিধান আমি মাথা পেতে নেব। আমার সান্ত্বনা শুধু এই, যে দীপশিখা আমি জ্বালিয়ে ছিলাম তা অনির্বাণ হয়ে জ্বলবে চিরদিন। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আমার এই জীবন-দানের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বর্তমান, বিশেষত ভবিষ্যৎকালের সতীর্থদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। দীর্ঘদিন আমি ক্ষুব্ধচিত্তে লক্ষ্য করেছি আমার সতীর্থদের সচেতন নীরবতা। আজও তারা কেউ নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন নয়। আমার জীবন তাদের জাগ্রত করুক, সংঘবদ্ধ করুক, প্রতিবাদের ভাষা যোগাক তাদের মুখে। প্রচুর অর্থ, প্রচুরতর সম্মান ও শ্রদ্ধাও তাদের শান্তি দিতে পারবে না সামগ্রিক জাগরণ যদি না আসে তাদের মধ্যে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা যদি তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ না করতে পারে। আমি যা করেছি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি হয় তো কিছু প্রলোভন যুগিয়েছে কিন্তু মূলত তা ব্যাপকতর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—ভীষণ একটা কিছু ঘটবার দরকার ছিল—বিশেষ একটা কিছু, আহত হবার মত কিছু, মোহনিদ্রা ভেঙে চমকে চীৎকার করে ওঠার মত কিছু। দীর্ঘ সময় বৃথা অপচয় হয়েছে—এখন এই নিদ্রিত সম্প্রদায়ের ঘুম ভাঙিয়ে সুশৃংখল অহিংস আন্দোলন পরিচালনার ধৈর্য আমার ছিল না। নেতৃত্ব বড় পাজী জিনিস। নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করেই আরও দুটো-চারটে যুগ কেটে যেত। তার চেয়ে এই ভাল হ'ল। জীবন-সীমান্তে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় সরকারকে আমি অনুরোধ করি সম্পাদক-স্বার্থরক্ষার্থে আইন প্রণীত হোক। তাদের ওপর যে-কোন প্রকার অত্যাচার যেন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা প্রণয়নের সুবিধার জন্য আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ গুটিকয়েক সত্য আমি নিবেদন করতে চাই।

প্রথম—যে কোন উচ্চপদে স্থায়িভাবে বসলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয় বটে মানুষ বড় স্বার্থান্বেষী জীব, কিন্তু সম্পাদক সে সত্য যেমন করে উপলব্ধি করেন তেমন আর কেউ নয়। তার কারণ, মানুষ সম্পাদকীয় ক্ষমতাকে সর্বজ্বরহর বটিকার ন্যায় ব্যবহার করতে চায়।

দ্বিতীয়—সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয় তো শুনলে আহত হবেন তবু বলব ভদ্রতা ও সৌজন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যেভাবে বিঘ্নিত করে তেমন আর কিছু নয়।

তৃতীয়—খুব কম করে ধরলেও জগতের অন্তত সত্তর ভাগ লোক (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ব্যগ্র। এমন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা শুধুই সাহিত্যিক, অন্য কোন জীবিকা তাঁদের নেই—আমাদের এই দরিদ্র দেশেও আছেন এবং তাঁরা তৃপ্ত। কিন্তু এমন বহু জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পুলিশ অফিসর, সিনেমা ডিরেক্টর, কেরানী ও গৃহকর্ত্রী আছেন যাঁরা তাঁদের সেইটুকু পরিচয়েই তৃপ্ত বা তুষ্ট নন—প্রত্যেকেই তাঁরা সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত এবং সে সাধনার ফলকে ছলে-বলে-কৌশলে মুদ্রণ-যন্ত্রের গর্ভে পুরে দেবার সাধনায় লিপ্ততর। ফলে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে মফস্বলের মিটিং থেকে নিমন্ত্রণবাড়ি, ক্রিকেট মরশুমে ইডেন উদ্যান থেকে দূর পাল্লায় ট্রেনের কামরা কোথাও আমি লেখা-ব্যাতিকগ্রস্তদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাই নি।

চতুর্থ—প্রত্যেক লেখা-ব্যাতিকগ্রস্ত মানুষই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ রচনার অশিক্ষিত পটুত্ব তাঁদের আছে। (বরং সে তুলনায় রম্যরচনার দাবীদার কম।) শিক্ষিতা, সুরুচির গর্বে গর্বিতা মাও যেমন দেখা যায় নিজেদের ছেলের বেলা শিশুসুলভ দুরন্তপনা ও অশিশুসুলভ অসভ্যতা ও জ্যাঠামোর তফাৎ করতে পারেন না, লেখা-ব্যাতিকগ্রস্তদেরও নিজেদের লেখা সম্বন্ধে সেই জাতীয় দুর্বলতা। সমালোচনার ক্ষেত্রে যাঁরা রীতিমত উন্নাসিক নিজেদের প্রলাপানুগ লেখাও তাঁদের কাছে সর্বদাই রসোত্তীর্ণ বলে প্রতিভাত হয় এবং লেখা নির্বাচন যে সম্পাদকের খেয়াল-খুশি এবং ইহা ভিন্ন অন্য কোন মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করতে পারে এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না বলে সম্পাদককে প্রায়ই তাঁরা নিষ্করুণ এবং তাঁদের সংগে অকারণ শত্রুতায় লিপ্ত বলে ভুল করেন।...

আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। কি একটা আচ্ছন্নতার ঘোর ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ। সামনের জানলার ফ্রেমে আটকানো আকাশটায় রং বদল হচ্ছে ধীরে ধীরে। কি মোহিনীশক্তি এক এক প্রলেপ কালোর ছোপ উঠিয়ে ভিতরের নীল রংটাকে বার করে আনছে টেনে। সত্যপ্রিয় নিষ্পলক নেত্রে নীলিমার সেই পুনরুদ্ধার দেখছেন। তবু পুরো দেখছেন না। সেই আচ্ছন্নতার ঘোরটা দেখতে দিচ্ছে না।...

—কি গো, আর কত বেলা অবধি ঘুমোবে? শরীর কি সত্যি খারাপ হল নাকি!

স্ত্রীর ডাকে সত্যপ্রিয় যেন ঘরভরা আলোয় চোখ মেলে চাইলেন। ভোরের হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জানেন না।

—বীণাপাণি সামন্ত এই নিয়ে তিনবার ফোন করলে—তোমার অফিস না কি গত মাসের সম্পূর্ণ উপন্যাসটার বাকি টাকা নিয়ে ঘোরাচ্ছে ওকে। রেগে আগুন একেবারে—চারদিন চেষ্টা করে তোমায় ধরতে পারছে না, আমাকেই দশ কথা শুনিয়ে দিল রাগের মাথায়। আমি বলতে গেলাম টাকা দেবার মালিক তো আর তুমি নও—সে সব ও শুনতে চায় না, তোমার মুখের কথাতেই উপন্যাস দিয়েছিল।

সত্যপ্রিয়কে নীরব দেখে একটু থামলেন রমা।

তারপর নিজের কাজে চলে যেতে যেতে বললেন, যাও ধর গে। কি মেজাজ বাবা! তবু যদি তোর সংসার চলত এই টাকায়। দিব্যি তো শাড়ি-গয়নার বাহার—

সত্যপ্রিয় বিছানা ছেড়ে উঠে আলস্য ভাঙলেন।...

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! তাই বা মন্দ কি। নির্জন সেলে সুখবাস—সেখানে টেলিফোন নেই।...কাগজ-কলম কি আছে। তাও নেই। মারাত্মক অপরাধের দণ্ড সবার—কয়েদীর কি আর সাহিত্যচর্চা করবে? দু'টো-একটা ব্যতিক্রমও থাকতে পারে অবশ্য, কিন্তু সেখানে সত্যপ্রিয় সেন তো আর সম্পাদক নন।

প্রেমের জন্ম এবং মৃত্যু

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

'তোর বৌ এখনো এলো না রে!'

'তাই ত!' আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। দু' পা গিয়েই ফিরে আসে। 'বুঝেছি!'

অমিত অবুঝের মত চেয়ে থাকে।

'লজ্জা পাচ্ছে, বুঝলি না!'

'লজ্জা? আমার সামনে—'

'সকলের সামনেই।' আদিত্যও খানিক লজ্জা পায়। 'অ্যাডভান্সড্ স্টেজ—বুঝলি না।' ফিক করে হাসির পিক ফেলে।

মাথাটা অমিতের দপ করে ওঠে। আচমকা এক চড় হাঁকিয়ে আদিত্যের হাসি ছরকুটে দেবার জোরালো সাধ চাড়া দিয়ে ওঠে!

প্রাণের বন্ধু আদিত্য।

তবু আদিত্য সম্পর্কে এ-ধরণের সাধ অমিতের এই প্রথম না।

কেমিসিট্রতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বকুল হাই সেকেণ্ড ক্লাস। বিয়ের পর একসাথে রিসার্চ করবে, ডক্টরেট হবে, ফরেনে যাবে, ফিরে এসে লেবরেটরী বানাবে, দেশের জন্যে দশের জন্যে—

কত প্ল্যানই এঁটেছিল! তাক-লাগানো কত প্ল্যান!

আর এখন?

প্রফেসর আদিত্য এখন রিসার্চ চালাচ্ছে বৌকে বছর-বছর মা-বানানোর!

একদা প্রফেসর বকুলমালা এখন ব্রেশিয়ার পরারও ফুরসৎ পায় না!

রাস্কেল! বাপ-ঠাকুর্দার জীবনই যদি কাটাবি, কি দরকার ছিল বকুল বাগচিকে বিয়ে করার? ব্রিলিয়ার্ণ্ট একটা মেয়ের কেরিয়ার বরবাদ করে দেওয়ার?

শুধু কেরিয়ার? একটা বিইয়েই হাড়-গিলে হয়ে পড়ে। এটা পাঁচ নম্বর। সাত বছরে পাঁচ নম্বর!

এখনকার হাল নিশ্চয় অকথ্যের একশেষ! লোকের সামনে বেরোতে বকুলের সাধেই লজ্জা!

॥ খ ॥

'বলিস কি অমি!'

বসন্ত প্রায়-ঘাবড়ে গেছে! স্বাভাবিক।

'আমার কিন্তু এখনও—'

বিশ্বাস হচ্ছে না! স্বাভাবিক স্বাভাবিক। অমিতকে যে জানে হুট করে বিশ্বাস করা তার পক্ষে শক্ত বৈ কি।

'তুই শেষ পর্যন্ত—'

সোমনাথ মেয়ে দেখলেই ছোঁক-ছোঁক করে। ভূপাল প্রেমের নামেই বিয়ের জন্যে কোমর বাঁধে। অমিত সোমনাথ নয়। অমিত ভূপাল নয়। অথচ পরিমল তাকে—

'প্রেমে পড়লি!'

সোমনাথ-ভূপালের শামিল বানিয়ে দিয়েছে!—

'বিয়ে করছিস!'

কথাটা তার শোনামাত্র 'আমি জানতাম! আমি জানতাম!' বলে খুশির তোড়ে দিশা হারিয়ে বাসের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সীন করেছে!

'সত্যিই তুই—'

'বাঃ!' অমিত মানানসই হাসছিল, গম্ভীর হয়ে যায়। 'প্রেমে পড়েছি, বিয়ে করব না!' বুক চিতিয়ে বসে। 'আমি অনাদি নই, ঢাক পিটিয়ে প্রেম করি না। অমিয় নয়—একটা বৌয়ের জন্যে ডজন-ডজন মেয়ে বাছি না।' সিগারেটে চড়চড় টান দেয়। 'কিন্তু—'

'তা বটে! তা বটে!' বসন্ত চটপট মাথা নাড়ে। 'তোর সঙ্গে কার তুলনা! আমাদের ব্যাচের মধ্যে তোর মত—' বন্ধুরা অনর্গল তারিফ করে। আধুনিক কবি হিসেবে নামডাক আছে। চমৎকার বলিয়ে-কইয়ে। খাশা চেহারা। পাকা চাকরি। মাথার ওপরে ভাই, পেন্সনওলা বাবা অমিতের সঙ্গে কার তুলনা!

'আমাদের মধ্যে সবার আগে তোরই তো প্রেমে পড়ার এক্তিয়ার ছিল রে! প্রেম করে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার। তোর মত সৌভাগ্য—'

কথাটা বসন্ত শেষ না করে ভোঁস করে শ্বাস ফেলে।

বল্লুর সৌভাগ্যে মুখখানা বন্ধুর যার-পর-নাই করুণ-কাতর হয়ে ওঠে।

বেচারা বসন্ত!

মঁরাকে বিয়ে করলে ওর বাপ-মা কি পরিমাণ কষ্ট পেত, অমিত জানে না। কিন্তু, শাস্ত্রমতে বিয়ে-করা অগ্নিসাক্ষী ওর বৌটা যে শ্বশুর-শাশুড়িকে দিনরাত চোখের জলে নাকের জলে করাচ্ছে।

পাড়াশুদ্ধ সবাই জানে।

কাপুরুষ বসন্ত! কাপুরুষ বসন্তর জন্যে বুকটা অমিতের টনটন করে।

॥ গ ॥

গলা নামিয়ে, যদিও ঘরে কেউ নেই, হীরেন শুধায়, 'মেয়েটি কে রে? আমি চিনি?'

অমিত হাসে দেখন-হাসি। যে-হাসির মানে হ্যাঁ-না দুই-ই হয়।

'চাকরি-বাকরি?'

চাকরে মেয়ে ছাড়া অমিত রায় প্রেম করতে পারে না? বিয়ে করার মত প্রেম?

'এক জাত?'

প্রেমে জাত বিচার? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই আজকাল আকছার ইণ্টারকাস্ট চলছে না?

'বাড়িতে আপত্তি উঠবে না?'

উঠবে না? প্রেমের বিয়েতে আপত্তি উঠবে না!

'দু'পক্ষেই?'

'ভীষণ!' অমিত মুখ খোলে। ভীষণের ভীষণতা বোঝাবার জন্যে টেনে টেনে শব্দটা উচ্চারণ করে। যথোচিত মাথা দোলায়।

যদিও জানে—ঘাড়ের বোঝা নেমে

যাওয়ার দরুণ লাবণ্যর মাসি বর্তে যায় এবং নিজে পছন্দ করে বৌ আনতে পারল না বলে মা অভিমান করলেও, বিয়েতে কানাকড়ি মিলল না দেখে বাবা গুম হয়ে গেলেও, বৌদি সবদিক ম্যানেজ করে নেবে।

রূপে-গুণে লাবণ্য তার থেকে অনেক নীরেস বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ম্যানেজ করে নেবে।

আহ্লাদে আটখানা হবে দাদাও। আর সব দিকে দিলেও বৌয়ের ব্যাপারে ভাই তার ওপর টেক্কা দিতে পারল না বলে হবে।

সবই অমিত জানে।

কিন্তু দু'পক্ষেই আপত্তি না উঠলে মান থাকে প্রেমের বিয়ের?

বিয়ের পরেই বৌ নিয়ে বোম্বাই পাড়ি দেওয়ার কারণ থাকে?

'কি করবি তা হলে?' বসন্ত ভয়ে ভয়ে শুধায়।

'ওরা সারেণ্ডার করে ভালো—'

'সারেণ্ডার! প্রথম প্রথম সারেণ্ডার করে। তারপর উঠতে-বসতে—সে যে কি অশান্তি রে!'

'একসাথে থাকলে তো! বিয়ে করেই বোম্বাই চলে যাব। ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

'বাড়ি ছাড়বি? গুড। ভেরি গুড। সাবাশ! তুই, তুই-তুই—'

গুড! ভেরি গুড! সাবাশ! তুই—তুই—তুই—'

কি বলতে চেয়েছিল? বাপকা বেটা তুই?

গা অমিতের শির-শির করে হীরেনের উচ্ছ্বাসের আদিখ্যেতায়।

বাপের ঔরসে কার জন্ম নয়? তুই তোর বাপের ব্যাটা নস?

কিন্তু নিজের পায়ে নিজে যদি কেউ কুড়ুল মারে, লোকে কি করবে?

তোর বাপের মত বুঝসুঝ বাপ আজকাল ক'জনের হয়? বৌ-বরণ করেই না বৌকে তোর মা ঘরে তুলেছিল?

তা তুই কেন বৌকে অমন নাই দেওয়া শুরু করলি? নাই দিতে দিতে মাথায় তুলে দিয়ে তার চাকরি ছাড়ায় সায় দিয়ে বসলি?

অভাবের সংসারে এমনিতেই খিটিমিটি বাধে। তার ওপর তোর বৌটা না-ঘরকা না-ঘাটকা। চাকরিও করবে না, ঘর-সংসারের কুটোটিও নাড়বে না। সব সময় নবেল নিয়ে শুয়ে থাকবে। লেখাপড়া জানা মেয়ে যে! হুটহাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। মডার্ন মেয়ে যে!

অমন বৌয়ের ওপর শাশুড়ি-ননদ চটবে না? চটে গেলে পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবে না? জাত তুলে গালাগাল দেবে না?

স্বজাত হলে বাপ তুলে দিত।

কিন্তু কালই বৌকে ফের চাকরির জোয়ালে জুতে দে, মাস মাস টাকা এনে শাশুড়ির পায়ে রেখে প্রণাম ঠুকুক, শ্বশুরের জন্যে হরলিক্সটা, লেবুটা, ননদদের জন্যে এটা-সেটা এনে দিক—দেখবি, বৌমা-বৌমা করে বৌদি-বৌদি করে আদর-সোহাগের বান ডেকে যাবে।

সংসারে সুখশান্তি থই-থই করবে।

॥ ঘ ॥

দুই চোখ বড় বড় করে চারু বলে, 'ওমা! তাই নাকি! পেটে পেটে এত!'

বিপিন বলে, 'বিয়ের চান্স আছে বুঝলে মেয়েরা আজকাল প্রেম করতে তেড়ে আসে।'

'তোমায় বলেছে!' চারু মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'ছাখ না একবার চেষ্টা করে।'

'স্কোপ কোথায়! হত শ'খানেক বছর আগে—গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ, মরাইভরা ধান, ঘরভরা বৌ—।'

আফশোস করছে বিপিন। কিন্তু নির্জলা আফশোস।

হেসে খানখান হচ্ছে চারু।

বিপিনের মত সুখী সংসারী বন্ধুদের মধ্যে কেউ নয়।

আই-এ পাশ করে চাকরিতে ঢোকে। চাকরির বছর পুরতে বিয়ে। আটটি ছেলে-মেয়ে। এখনও হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। মোটা ভাত-কাপড় জুটে যায়।

এই ঘরে সোফা-কৌচ নেই। ফ্লাওয়ার ভাস-ই নেই তো রজনীগন্ধা। রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়ের পাঠ্যপুস্তকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত পাশের বাড়ির রেডিওতে।

এই ঘরে ইনটেলেকচুয়াল আড্ডা জমানো চলে না। এই বৌ নিয়ে সংস্কৃতি-সম্মেলনে যাওয়া চলে না।

কিন্তু সেজন্যে বিপিনের কোন নালিশ নেই। বিয়ে যে জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার! বিধিলিপি।

বিপিন ভগবান মানে। ভাগ্য মানে। ভগবান যা করাবেন, ভাগ্যে যা থাকার—তাই হবে। সাধ্য কি মানুষের তার বাইরে পা দেয়।

তাই ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বিপিন কোনদিনই কোন প্ল্যান আঁটে নি, ছক কষে নি। কেন না যা হবার তা হবেই যখন, অনর্থক অশান্তি ডেকে আনা কেন?

বিপিন তার বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে আছে। সেই শান্তির ছাপ ওর বোকা-সোকা চোখে-মুখে। নেয়াপাতি-ভুঁড়ি চেহারায়। জীবনে যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি পেয়েছে।

এই পাওয়াটাই আসল। কেউ প্রেম করে পায়। নিজের হাতে জীবনকে তৈরি করে নিয়ে পায়। যেমন সুধাময়।

কেউ পাঁজির দৌলতে পায়। নিজেকে জীবনের হাতে সঁপে দিয়ে পায়।—বিপিন।

কিন্তু সবাই পায় না। পাওয়ার শখ ষোল আনা থাকলেও পাওয়াটা আদায় করে নেওয়ার নামমাত্র মুরোদ থাকে না বলে পায় না।—বসন্ত।

যৌবনের সাধ-স্বপ্নের বেলুনটা নিজেরই অপদার্থতায় চুপসে গেলে অবিরাম কেউ হাহাকার করে।—হীরেন।

না-পাওয়াটা কেউ আবার টেরও পায় না।—আদিত্য।

আধময়লা বিছানায় পেট-কাটা পাশ-বালিশটা জাপটে ধরে অমিত আরাম করে বসে।

বিপিনের কব্জির ওপরে সোনার চেনে সোনার তাবিজ। কিন্তু কই, এখন তো গা গুলিয়ে উঠছে না। বিপিনের নাকে একটি নোলক পরিয়ে দেওয়ার সাধ তো জাগছে না।

অথচ প্রভাতকে দেখামাত্র জাগে। শুধু নোলক-পরানো নয়, পরানোর পর হ্যাঁচকা টানে সেই নোলক নাক ছিঁড়ে খুলে নিলে গলগল রক্তে মুখ মাখামাখি হয়ে গেলে সুট-টাই-পরা কেতাদুরস্ত প্রভাতকে কেমন ছাখাবে, তাই দেখার জন্যে প্রাণটা কাটা-ছাগলের মত ছটফটিয়ে ওঠে।

বিপিনকে দেখে মনে হয়, তাবিজ ছাড়া ওকে মানাতই না।

চারুকে যেমন মানাত না নাকচাবি ছাড়া।

অথচ নাকচাবি দূরের কথা, নাকে শুধু একটা ফুটো আছে বলে পাথর নাচ-গান জানা গ্রাজুয়েট বৌটাকে দেখেই কেমন আনকালচার্ড-আনকালচার্ড মনে হয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল তেলির মেয়ে। বংশে ওই প্রথম ইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়েছে।

পুজো

এসে

গেল ....

বাজারে দোকানে এত ভীড়

কিন্তু সবাইকার লক্ষ্য -

বোরোলীন

কারণ ত্বকের মসৃণতা বৃদ্ধি করে

লাবণ্যময়িকে সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে তুলতে

বোরোলীন

ছাড়া আর কি আছে

বোরোলীন

মেডিকেটেড স্কিন ক্রীম

বিপিন বলে, 'অ্যাদ্দিনে তা হলে তোর থিয়োরিটা কাজেকর্মে প্রমাণ করছিস? বেশ! বেশ!'

বিপিন খোঁচা দিচ্ছে বুঝেও অমিত হাসে কৃতার্থের হাসি। বলে,—'দেখি!'

চারু শুধায়, 'কিসের প্রমাণ—হ্যাঁ গা?'

'প্রেম সম্পর্কে অমিতের—'

'এই!'

'একটা থিয়োরি—মানে ইয়ে আছে। সাধেই এত বছর অব্দি বিয়ে করে নি। কবিমানুষ—যাকে-তাকে তো বৌ করতে পারে না, আগে আগাপাশতলা যাচাই করে—'

'আঃ!'

'প্রেম। প্রেমের পরে বিয়ে। মেয়েটি হওয়া চাই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।'

'তা কে না চায় বাপু। ওঁর মত পাত্র—'

'খাবে কম দুধ দেবে বেশি!'

'আহা, কি কথার ছিরি!'

'নইলে কেতকীর মত মেয়েকে—'

'বিপিন!'

কথাবার্তায় বিপিনটা চিরকালেই মেঠো। মুখের রাখঢাক নেই। কিন্তু—

খাবে কম দুধ দেবে বেশি!—ভালগার শোনালেও কথাটা কি সত্যি নয়?

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!—তা কে না চায় বাপু। চারু কি মিথ্যে বলেছে?

বিয়ের চান্স আছে বুঝলে মেয়েরা আজকাল তেড়ে এসে প্রেম করে!—লাখ কথার এক কথা।

কিন্তু মেয়ে হলেই হল? অমিত রায় তো শুধু কবি নয়, জীবনশিল্পীও। যে-কোন মেয়ের সাথে সে প্রেম করতে পারে? বিয়ে করার মত প্রেম?

তেমন মেয়ে কি নেই? আছে। গণ্ডায় গণ্ডায় না হলেও আছে। কিন্তু সে-মেয়ে অমিত রায়কে পাত্তা দেবে কেন? কবি হিসেবে নামডাক থাকলেও, চেহারাটা চৌকশ হলেও মাইনে তো সাকুল্যে শ' তিনেক?

ধরা যাক, তবু ছিল। বাজার চালু উপন্যাসের মত দুম্ করে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেল। তার জীবনে অমন একটি মেয়ের আগমন নয়, আবির্ভাব ঘটল। প্রেম হল। জমল। বিয়েও হল।

তারপর? ছুঁচিবেয়ে মা, সেকেলে বাবা, টাকা-আনা পাইয়ের হিসেব-কষা দাদা, গেঁয়ো বৌদি—ওদের সঙ্গে ওই পাড়ায় সেই বৌ নিয়ে—

ভাবলেও বুক হিম হয়ে আসে।

আলাদা বাসা? ওই বৌ নিয়ে তিন শো টাকায়?

ভাবার আগেই বুক হিম হয়ে আসে।

বৌ লটারির টাকা নয় যে পেলেই বেল্লা ফতে। দাম্পত্য হল গিয়ে দস্তুরমত একটা আর্ট। প্রতিদিন তাকে সৃষ্টি করতে হয়।

খোরাক না পেলে কিছুই বাঁচে না। সার-জলের অভাবে দুর্দান্ত প্রেমের চারাও শুকিয়ে যায়।

অভাবের সুখ প্রেমের নটেও মুড়িয়ে দেয়।

॥ ৬ ॥

কেতকী আছে শুনেই অমিতের টনক নড়ে। সেরেছে!

'আসুন!'

'আমি না হয়—অসুবিধে হলে'—অমিত আমতা আমতা করে।

'আপনাকে বসতে বললেন।'

উপায় নেই। সামনের দিকে পা অগত্যা বাড়াতেই হয়। দুই হাঁটু ঠক-ঠক করে। বুক ঢিপ-ঢিপ।

কেন এল কেতকীর কাছে! কেন এল! এখানে আসার কথা তো ঘুণাক্ষরেও আজ ভাবে নি।

এ পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম—

আজ ভাবে নি। বন্ধুদের নেমন্তন্ন করার জন্যে সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন ভাবে নি।

কিন্তু কাল? না না কাল নয়—পরশু? পরশু সকালে লাবণ্যর মুখে কথাটা শোনার পর—

শোনামাত্র হকচকিয়ে যায় না না না, এ হতে পারে না, ইম্পসিব্‌ল্ ইম্পসিব্‌ল্—প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে চায়। কিন্তু চিৎকার করে গলা চিরে ফেললেও তো বাস্তবটা আদৌ বাতিল হয়ে যায় না।

পরশু সারারাত ঘুম হয় নি। অনেক কথা মনে পড়েছে। অনেকের কথা মনে পড়েছে।

সবচেয়ে বেশি মনে পড়েছে কেতকীর কথা। বারবার মনে পড়েছে।

কিন্তু কাল সকালেই না কেতকীকে মন থেকে চেঁচেমুছে ফেলে? আপশোস অনর্থক বুঝে। বাস্তবের মোকাবিলা করার জন্যে কোমর বাঁধে? ভরাডুবি থেকে বাঁচার জন্যে?

তবু কেন—

ওই বিপিন। বিপনেটা মনে করিয়ে দিল বলেই—

'আপনি! বসুন বসুন! কি সৌভাগ্য আমার—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল, ধপ করে অমিত বসে পড়ে। নিজের ব্যবহার নিজের কাছেই বেখাপ্পা মনে হয়।

'আমি ত' ভাবতেও পারি নি—'

'এ-পাড়ায় এসেছিলাম, ভাবলাম—'

'ভাগ্যিস এ পাড়ায় এসেছিলেন! গরিবের কথা মনে পড়ল।'

কেতকী হাসে। দাঁত দেখা যায় না কিন্তু গালে চমৎকার টোল খায়।

এখন আর মুখখানা এনামেল-করা নয়, তবু ঝকঝক করছে। পরনে ছাপা ভয়েল। কটকি ব্লাউজ। কানে রিঙ। গলায় সরু হার। হাত খালি। এলো খোঁপা। কি ছিমছাম। রুচিস্নিগ্ধতা!

অমিত মুগ্ধ হবে-হবে করছিল, কিন্তু কেতকী অপলকে তাকে দেখছে টের পেয়ে সামলে নেয়।

'অসময়ে এসে আপনার'—

'ভদ্রতা হচ্ছে! তা ভালো। অপিসে তো আমাদের মানুষের মধ্যেই—'

'ছি ছি, কি যে বলেন! আমি কখনো—'

'চা খাবেন? কফি? না কি শরবৎ? এক মিনিট—'

সেই কোন্ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কোন বন্ধুর বাড়িতে কিছু মুখে দেয় নি। চায়ের পিপাসায় গলা শুকিয়ে এসেছিল।

কিন্তু চায়ের বদলে শরবৎ যে এত আরামদায়ক কে জানত!

শরবৎ খেয়ে শরীর জুড়িয়ে যায়, মনটা

খচখচ করে। কেন এল কেতকীর কাছে? কেন এল! কেন এল!

ওই তো দেড়খানা ঘর। কিন্তু কি টিপটপ। সোফা-কোচ নেই বটে, কিন্তু বাক্সের ওপর শান্তিনিকেতনী চাদর বিছিয়ে চমৎকার বসার জায়গা। জানলায়-দরজায় পর্দা। বুক-সেলফ। সেতার। ড্রেসিং-টেবিল। আলমারি। টিপয়। টেবিল ল্যাম্প।

একটি ঘরের মধ্যে সব, জ্যামিতিক নিয়মে সাজানো।

শুধু মামুলী চা নয়, বাড়িতে কফিও থাকে। শরবতের জন্যে সিরাপ। ফিনফিনে কাচের গেলাস।

অথচ চাকরি তো সামান্য স্টেনোর!

বিধবা মাকে নিয়ে চাকর রেখে ওই চাকরি করেও এইভাবে বেঁচে আছে। কম বাহাদুরি!

বড্ড বেশি সাজগোজ করে বলে সবাই টিটকারি দেয়। কিন্তু কেন সাজবে না? সাজা মানে যখন নিজেকে আরও সুন্দর করে তোলা?

সুন্দরের সৃষ্টিই না শিল্প!

শিল্পী কেতকী শুধু অফিসে নয় বাড়িতেও।

শুধু বাইরে বেরোবার সময় নয়, সব সময়েই সুন্দর হয়ে থাকতে হয়। শুধু বৈঠকখানা না, গোটা বাড়িটাকেই সুন্দর করে রাখতে হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সুন্দর করে তুলতে হয়। তবেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।

অমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনশিল্পী অমিত রায়।

পারবে তো লাবণ্য জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে? অমিতের ট্রেনিং পেলে পারবে তো?

॥ চ ॥

'কি রে, আবার এলি?' সুধাময় অবাক হয়ে যায়।

রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা রগড়াতে রগড়াতে অমিত বলে, 'সবাইকে বলে এলাম।'

'বেশ করেছিস। কিন্তু ফের এলি কেন? বেলা বারোটা বাজে—'

'সেনসাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। বাড়িতে নেই।'

'সেজন্যে অত ভাবছিস কেন। বললাম না ওটা হয়ে যাবেই।'

সেজন্যে অমিত ভাবেও না। পঞ্চাশ কেন, একশো টাকা অ্যালাউন্স দিলেও বোম্বাই কেউ যাবে না অমিতও জানে।

'একটা কথা—রেজিস্ট্রিটা তোর বাড়িতে হবে—'

'বাড়িতে?' সুধাময় থমকে যায়। 'বাড়িতে যে—'

অমিত বাধা দিয়ে বলে, 'খরচ বেশি? হোক। খরচের জন্যে তুই—'

'খরচ না—হাঙ্গাম। সাত ভাড়াটের বাড়ি—'

'ভাড়াটে বাড়িতে বুঝি বিয়ে হয় না। প্লিজ, সুধা!'

অমিত মিনতি জানায়। খপ করে সুধাময়ের একটি হাত জড়িয়ে ধরে। 'তোর রেখার একটু অসুবিধে হবে বুঝছি, কিন্তু বিপিনের বৌ খুব কাজের—ও হেল্প করবে। তা ছাড়া রেস্তোরাঁয় অর্ডার দেব। সন্ধ্যার পর রেজিস্ট্রেশান—রাত আটটার মধ্যে বাড়ি ফাঁকা। আপত্তি করিস নি ভাই।'

'কিন্তু কি ব্যাপার বল ত'? হঠাৎ মত বদলালি কেন?'

'কারণ আছে। মানে—'

'দিনের বেলা বের করে আনা অসুবিধে?'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক ধরেছিস।'

চমকটা সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে অমিত সায় দিয়ে ওঠে।

দিনের আলোয় বন্ধু-বান্ধবের সামনে যায় লাবণ্যকে বের করা?

বাড়িতে আটপৌরে বেশে গেরস্থ মেয়ে বলে চলে যায়, কিন্তু সেজে-গুজে রাস্তায় বেরোলে কি জবরজং দেখায় ওকে দেখেছে তো!

আধময়লা রঙ, মাংসল শরীর, গোরুর মত ড্যাবডেবে চোখ, জবুথবু চাল-চলন, অচেনা লোকের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতেও পারে না।

এই নাকি অমিতের প্রেমিকা! প্রেম করে অমিত একে বিয়ে করছে!

ভাগ্যিস কেতকীর কাছে গিয়েছিল! বিয়ের খবরটা কেতকীকে জানাতে পারে নি বটে, কিন্তু ওকে দেখেই না লাবণ্যর স্থূলত্বটা নতুন করে মনে পড়ে গেল!

রাতে অত খুঁটিয়ে কেউ নজর করবে না। তার ওপর সুধাময়ের বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই এবং এই বিয়েতে হাসাক জ্বালানোর কথাই ওঠে না।

দেরি করে যাবে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। প্রাণপণে লাবণ্যকে আগলে আগলে রাখবে। ভালো করে দেখার, কথা বলার চান্সই কাউকে দেবে না।

বিয়ের দু-চার দিনের মধ্যেই বোম্বাই। বোম্বাইয়ে কয়েকটা বছর।

বৌ লটারির টাকা পাওয়া নয় যে পেলেই কেল্লা ফতে! দাম্পত্য হল-গিয়ে দস্তুরমত একটা আর্ট। প্রতিদিন তাকে সৃষ্টি করতে হয়।

পাথর কেটে শিল্পী মূর্তি বানায়। কাদামাটি ছেনেও বানায়।

পাথর কেটে মূর্তি বানানোয় ভারি মেহনত। কব্জির জোর না থাকলে পাথরে চিড় ধরে। মূর্তি বরবাদ হয়। যেমন হয়েছে হীরেনের।

কেতকীকে বিয়ে করলে অমিতেরও যে হত না তার গ্যারাণ্টি আছে?

কাদামাটি ছেনে মনের মত মূর্তি বানাতে

শুভ শারদীয়া উৎসবে
দেশবাসী সকলকে
আমাদের প্রীতি অভিনন্দন
জানাই—
সাপ্লায়ার টী কোং
ফোন—২২-৬১৫০
সেল ডিপো :—
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ও
৯১, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

কাষ্টিং, মেসিনিং, ফোরজিং
এবং ষ্ট্রাক্চারালস্ কাজের জন্য
অনুসন্ধান করুন
কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস
মাকড়দহ রোড, দাশনগর, হাওড়া
৩৩৬৩৪৬ —ফোন— ৬৭২৩০৩

সব শিল্পীই পারে। যেমন পেরেছে সুধাময়।

প্রেমে পড়ে মাসতুতো বোনকে বিয়ে করে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সাদামাঠা মেয়ে। টেপি না কি যেন নাম ছিল।

কিন্তু আজকের জ্যোৎস্না রায়কে দেখে কে বলবে এই সেই মেয়ে। পি-ইউ পাশ, টেলিফোনে চাকরি, রবীন্দ্র ভারতীর গানের ডিপ্লোমা।

সুধাময় তার মাইনের বেশিরভাগ মাকে পাঠিয়ে দেয়, সে নিয়ে জ্যোৎস্নার কোন নালিশ নেই। অভাবের জন্যে একবারের বেশি মা হতে পারে নি, সে নিয়ে কোন অভিযোগ নেই।

সংসারের যাবতীয় কাজ জ্যোৎস্না নিজের হাতে করে। আবার ছুটির বিকেলে খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়িয়ে স্বামীর সাথে বেড়াতেও যায়।

মাসে একটা করে রেডিও প্রোগ্রাম। এখানে-ওখানে ফাংশান। কালচারকে কালচার, টাকাকে টাকা। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

রান্না-করা, বাসন-মাজা, ঘর ঝাঁট-দেওয়া। চাকরি-করে টাকা-আনা। রবিঠাকুরের-গান গাওয়া বাড়তি উপায়।

আর কি চাই!

লাবণ্যও কাদামাটির তাল। সেই কাদামাটি ছেনে অমিতও তার মনের মত মূর্তি বানিয়ে নেবে।

বোম্বাই গিয়ে—সব সৃষ্টি-কর্মই নেপথ্যে চলে।

বকুলের মত ব্রিলিয়ান্ট মেয়েকে আদিত্য মামুলী বৌ বানিয়ে ফেলেছে, লাবণ্যর মত মামুলী মেয়েকে অমিত—

অমিত বুক চিতিয়ে হাঁটে।

কেতকীও তখন লাবণ্যর কাছে হেরে যাবে। কেন না, কেটি মিত্তিরের চোখ-নাক-মুখ যতই ধারালো হোক, দেহে যে তার অনেক কিছুই কমতি আছে সেটা বোঝার জন্যে দূরবীণ লাগে না।

সেই হিসেবে লাবণ্য—

লাবণ্যর নধর-নিটোল শরীরখানি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

লাবণ্য! লাবণ্য! লাবণ্য! বন্যা! বন্যা!

বন্যার তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা। তাহারি মাঝারে···তাহারি মাঝারে···তাহারি মাঝারে···

এক্ষুণি স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারায় বেপরোয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্যে অমিত করে কি, হাতের সামনে খালি বাস পেয়েও ট্যাক্সি ডেকে বসে।

॥ ছ ॥

কলতলার পাশে উবু হয়ে লাবণ্য গুল দিচ্ছিল, বাড়িতে পা দিয়েই অমিত ইশারায় ডাকে, কিন্তু লাবণ্য আসে ঘড়িতে বেলা তিনটে বাজিয়ে।

'আশ্চর্য! কখন থেকে আমি—'

'আস্তে! বৌদি জেনে গেছে।'

'বয়ে গেল!' বলেও অমিত দরজার দিকে যায়। বাইরেটা উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিরে এসেই লাবণ্যকে জাপ্টে ধরে।

'আঃ! ছাড়ো ছাড়ো—'

'তোমাকে না—!'

'মরে যাব যে!'

'তোমায় না আমি—!'

'মানুষের শরীর তো বাপু!' জোর করে নিজেকে লাবণ্য ছাড়িয়ে নেয়

লাবণ্য বিরক্ত হয়েছে, অমিত বোঝে। কিন্তু বুঝলে তার অভিমান জাগার কথা। অথচ এখন মান-অভিমানের পালা চালিয়ে নষ্ট করার মত সময় নেই।

অমিত তাই গদগদ গলায় বলে, 'একটা দারুণ খবর আছে। তুমি শুনলে—'

'আমারও একটা খবর আছে। তা শুনলে তুমিও—'

'আমারটা আগে শোন—'

'না; আমারটা আগে—'

'না আমারটা—'

'না আমারটা—'

'না—'

'না—'

'ন্না।' আদুরে জিদ ধরে অমিত ফের এগিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি লাবণ্য পিছু হটে।

'বেশ শুনি।'

'সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম। সামনের রোববার—সন্ধ্যের পর। ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা উচিত নয়। অমনিতেই—'

'এই খবর!' লাবণ্য ঠোঁট ওল্টায়। হেলাভরে বলে, 'এত তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না।'

'মানে?'

'মানে—মানে!' লাবণ্য মুখ টিপে হাসে।

ভয়ানক এক ধাঁধার গ্যাঁড়াকলে পড়ে যায় অমিত। লাবণ্যর মুচকি হাসিতে চটেও যায়।

'দূর ছ'ই! ব্যাপারটা কি বলবে তো! তাড়াহুড়োর দরকার ছিল না—একথার মানে কি?'

'আমি বলছি ছিল না।'

'তুমি বলছ, তুমি বললেই হল?'

'বাঃ রে, আমিই তো বলব। আমারটা আমি না বললে কি পাড়াপড়শী এসে বলবে। অমন হাঁ করে দেখছ কি—হ্যাঁ।'

'তুমি—ঠিক—ঠিক—'

'আস্তে! বললাম না বৌদি জেগে আছে।'

'কিন্তু তুমিই তো পরশু সকালে—'

'কি করে বুঝব! কখনও এমন হয় না। দুই-একদিন এদিক-ওদিক হলেও মাস দেড়েক—'

'লাবু! লাবু! লাবু!

অমিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কাল সকাল থেকে যত প্ল্যান-পরিকল্পনা এঁটেছিল, তাসের ঘরের মত ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ে।

সোজা কথা! গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো সহজ ব্যাপার! অত মেহনত পোষায় অমিত রায়ের।

ভাগ্যিস বাড়িতে ছিল না সেনসাহেব।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা করেছি—বললেই ল্যাঠা চুকে যাবে। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। কিন্তু 'বসে'র সঙ্গে ঠাট্টা! আজ বোম্বাই ট্রান্সফার করার জন্যে বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি, কাল যাব না বলা।

ঘাড় ধরে বোম্বাই ভেজে দিত। নয়, পাছায় লাথি মেরে অফিস থেকেই হটাবার।

কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অমিত বাঁচবে কি করে। তার পক্ষে চরে খাবার এমন জায়গা আর কোথায়!

চাকরি নট হয়ে গেলে যে সব লাটে উঠবে!

বন্ধু-বান্ধব দূরের কথা বেকার অমিতকে কেতকীই কি পাত্তা দেবে।

কেতকী! কেতকী! কেতকী! কেটি! কেটি! কেটি!

কেটি মিত্তির!

হে লাবণ্য, মোর লাগি করিও না শোক। আমার রয়েছে কর্ম···কর্ম···কর্ম···

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে লাবণ্যও।

বাব্বা! জোর বাঁচা বেঁচে গেছে। জবর আক্কেল হয়ে গেছে।

খিদের জ্বালায় লোভের বশে মানুষ অখাদ্য খায় তাই বলে জীবনভোর অখাদ্য গেলা!

আমেরিকায় শিল্পকলার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পচেতনা মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি।

অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন সভ্যতার আলোক লাভ করে নি, তখনও কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে একটি শিল্পসচেতন মন। এইখানেই পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই দেখা গেছে—মানুষ যেখানেই বাস করেছে, যা কিছু ব্যবহার করেছে—তৈজসপত্রই হোক বা অস্ত্রশস্ত্রই হোক—সবকিছুর মধ্যেই সে রেখেছে তার শিল্প-স্বাক্ষর।

আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা আমেরিকায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই সমস্ত দেশের তদানীন্তন শিল্পরীতিরই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে আমেরিকার ঔপনিবেশিক যুগের কলাশিল্পের মধ্যে। তবে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে হলেও ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে তুলনায় আমেরিকার শিল্পে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভৌগোলিক, জলবায়ুগত, সমাজপ্রথাগত স্থানীয় প্রভাবই এই পার্থক্যের মূলে কাজ করেছে। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে শিল্পকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এতে শিল্পকে জীবনের অঙ্গরূপে দেখা হয় নি, জীবনের একটা অলঙ্কারমাত্র বলে মনে করা হয়েছে।

● এডওয়ার্ড হপার

আমেরিকায় বহির্জগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল দু'বার। প্রথমবার ঘটেছিল খৃস্টজন্মের প্রায় ২০ হাজার বছর আগে। আজ আমরা যাদের রেড ইণ্ডিয়ান বলি—তারা ঐ সময়ে বেশ কয়েকটা দফায় সদলে এসে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল। অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় ঢেউটা এসেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এ সময়ে ইউরোপীয়রা এসে উপনিবেশ স্থাপন করল এই নতুন দেশের মাটিতে। প্রথমে এল স্পেনীয়রা। স্পেনীয়রা এসে দেখল—এই নতুন দেশে রয়েছে একটা পরিপূর্ণ সভ্যতা, একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পকলার ঐতিহ্য। আমেরিকা আবিষ্কারের আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে বর্তমান মেক্সিকো, হণ্ডুরাস, গুয়াতেমালা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত মধ্য-আমেরিকায় এবং পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, উত্তর-আর্জেণ্টিনা, উত্তর-চিলি প্রভৃতি দক্ষিণ-আমেরিকার অঞ্চলগুলিতেই সবচেয়ে উন্নত সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়।

মায়া-সভ্যতার কথা আমরা জানি। এই মায়া-সভ্যতা মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাস্‌কা, কুইমবায়া প্রভৃতি। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী যুগের সভ্যতা ও শিল্পকলা মানুষের দৈনন্দিন-জীবনের অঙ্গ ছিল। বস্তুত অশিক্ষিত মানুষের আদিম শিল্পকলা মানুষের দৈনন্দিন-জীবনযাত্রার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে। মাটির তৈজসপত্র, বস্ত্রশিল্প ও অলঙ্কারশিল্পের মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ।

প্রাক-কলম্বাস যুগের শিল্পের মধ্যে বেশ একটা স্বকীয়তা ও উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পে পালকের অপূর্ব ব্যবহার মনকে মুগ্ধ করে। মুখোস ও দেওয়ালসজ্জায় দামী ধাতুর সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। প্রাক-কলম্বাস যুগের মৃৎপাত্র আকার ও অঙ্গসজ্জা উভয় দিক থেকেই মনোরঞ্জনী ছিল। ছোটখাটো মাটির পাত্র ও মূর্তির মধ্য থেকে ক্রমে ভাস্কর্যশিল্পের একটা আদর্শ গড়ে উঠেছিল। এই ভাস্কর্যের সঙ্গে কোথাও কোথাও প্রাচ্যের শিল্পকলার মিল লক্ষ্য করা গেছে।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও একটি ঐতিহ্য ছিল। পেরুতে দেওয়াল ফ্রেস্কোর নিদর্শন দেখা গেছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শিল্পকলার পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিকোণ, অনুপাতবোধ প্রভৃতি দিক থেকে প্রাক-কলম্বাস যুগের শিল্পীরা মিশর ও মেসোপটেমিয়ার শিল্পীদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে।

● দি ব্লু ক্লাউন
শিল্পী : ওয়াল্ট কুন

● পাইপ, মগ ও সংবাদপত্র — শিল্পী : জন এফ পেটো

তা ছাড়া, এদের অঙ্কন-রীতির মধ্যেও একটা অনাড়ষ্ট, সাবলীল গতিছন্দ পরিলক্ষিত হয়।

চিত্ররচনায় তাদের দক্ষতা আধুনিক শিল্পীদের মানের সঙ্গে তুলনীয়। তবে সে যুগে শিল্প প্রধানত ধর্মীয় লক্ষ্যসাধনে প্রয়োগ করা হত বলেই শিল্পের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের অবকাশ ছিল কম। তাই প্রাক-কলম্বাস যুগের নক্সা ও শিল্পকলার মধ্যে চিরাচরিত ও বাঁধাধরা রীতির প্রাধান্য।

প্রাক-কলম্বাস যুগের স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতীয়দের ঘর-বাড়ি নির্মাণের মধ্যে। এদের সৌধনির্মাণশিল্প বেশ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলা চলে। এদের তৈরি উল্লেখযোগ্য সৌধগুলি বিপুলায়তন। পাথরের তৈরি পিরামিড সৌধগুলি ক্ষোদাই করে ধাপে ধাপে সরু করা হয়েছে। এই সৌধের শীর্ষে রয়েছে ছোট-ছোট মন্দিরকক্ষসদৃশ কক্ষ। এ-যুগের সৌধশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ, সমাধিস্তম্ভ প্রভৃতির সংখ্যা অল্প নয়। চুণ বা অট্টালিকা নির্মাণের অন্যান্য মাল-মসলার ব্যবহার না করেই এই সমস্ত সৌধ নির্মিত হয়েছিল। রোমক সভ্যতার মত প্রাক-কলম্বাস যুগের সভ্যতায়ও উন্নততর পথ-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, উঁচু রাস্তা, ঝোলানো সেতু প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। ঘর-সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের সামগ্রীর মধ্যেও সাংস্কৃতিক মনের পরিচয় রয়েছে। ছোট-ছোট কুটির ও কাঠের বাড়ি নির্মাণে স্তম্ভস্বরূপ যে কাঠের অবলম্বন ব্যবহার করা হত তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়, ঘরের কোণে কোণে অলঙ্করণে শিল্পচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনীয় উপনিবেশস্থাপনকারীরা এই নতুন দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সময় প্রধান যে বস্তুটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তা হল খৃস্টান ধর্ম। সে-যুগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর স্পেনীয়রা খুবই জোর দিত। তারা পৌত্তলিক রেড-ইণ্ডিয়ানদের শুধু যে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিল তা নয়, তাদের শিল্প-কলাও শিক্ষা দিয়েছিল। প্রতীক-চিত্র, মূর্তি-অঙ্কন, স্থাপত্য-শিল্প এ-সবই আদিম রেড-ইণ্ডিয়ানরা শিখেছিল স্পেনীয়দের কাছ থেকে। তবে এই নতুন দেশের আদিম অধিবাসীরা নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পায় নি। তাই তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আপন সংস্কৃতি বজায় রেখেই বিদেশী রীতি-নীতিকে গ্রহণ করেছিল। বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতিকে তারা নিজেদের ঐতিহ্যের জারক রসে জারিয়ে নিয়েছিল। এমনিভাবে ইউরোপীয় ও রেড-ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতির বিনিময় হল।

স্পেনের স্থাপত্য ঐতিহ্য ছিল গর্ব করবার মত। আমেরিকা আবিষ্কারের পর এই নতুন দেশটিকে গড়ার কাজে স্পেনীয়-স্থাপত্যের প্রভাব স্বাভাবিক-ভাবেই পড়েছিল। তখন স্থাপত্য প্রধানত ঘর-বাড়ি নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমেরিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রথম কাজই হল নতুন দেশের রাস্তাঘাট, উদ্যান, বাজার প্রভৃতি নির্মাণ। এ সমস্তের মধ্যেই স্পেনীয়-স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। বড় বড় নয়নমনোহর গির্জা এ যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। অবশ্য এর মধ্যে ইতালীয় প্রভাবও যে না আছে, তা নয়। তবে পেরু, বলিভিয়া ও আর্জেণ্টিনার স্থাপত্যশিল্পে ইন্‌কা উপজাতিদের নিজস্ব শিল্পরীতির কিছু কিছু নিদর্শন বজায় রয়েছে। ইন্‌কা হল পেরুর একটি উপজাতি। স্পেনীয়দের যখন আগমন ঘটল দক্ষিণ-আমেরিকায় তখন ইন্‌কা উপজাতির প্রাধান্য। অট্টালিকা নির্মাণকালে সন্ধিস্থলগুলিতে সোনার পাতা বসিয়ে দেওয়া ইন্‌কাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। পেরু, বলিভিয়া ও আর্জেণ্টিনার রেড-ইণ্ডিয়ানদের অট্টালিকা নির্মাণ-রীতিতে স্পেনীয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও ইন্‌কা রীতিও কিছু-কিছু বজায় রাখা হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ চিত্রকলার বিষয় ছিল ধর্মমূলক। এ সময়কার শিল্পনিদর্শনের মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য নতুন নতুন গির্জা, কনভেণ্ট ও ব্যক্তিগত উপাসনাগৃহের উপাসনাবেদীর পিছনে ও ওপরে শিল্পকৃতির নমুনা এবং গৃহস্থের বাড়ির উপাসনালয়ে ভক্তিমূলক চিত্রসজ্জা। ঔপনিবেশিক যুগে চিত্ররীতি যা লক্ষ্য করা যায়, তা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের স্পেনের চলতি রীতির অনুকরণ বলা চলে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের শিল্পীরা রাফায়েল, রুবেন্স প্রমুখ শিল্পীর অনুগামী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তা শিল্পীদের কাছে অনেকখানি কমে গেল।

দক্ষিণ-আমেরিকায় চিত্রশিল্পের চারটি কেন্দ্র ছিল। প্রধান কেন্দ্রটি ছিল মেক্সিকোয়। অন্যগুলি লিমা, কুইটো ও

বোগোটায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মত ঔপনিবেশিক চিত্রশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও ধর্মের প্রভাব ছিল তীব্র।

ইতালীয় সেণ্ট ফ্রান্সিস প্রবর্তিত ধর্মমতাবলম্বীরা রেড-ইণ্ডিয়ান শিল্পীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৫৩৪ সালে কুইটোয় একটি শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপন করলেন। তবে রেড-ইণ্ডিয়ান শিল্পীরা ইউরোপীয় শিল্পকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নি। তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই বিদেশী শিক্ষার প্রয়োগ করেছিল। এদের শিল্পে বিদেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও রেড-ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতির ছাপ পুরোমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। দূরবর্তী অঞ্চলের শিল্পীদের এইভাবে রীতিসম্মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি বলে, ধর্মমূলক চিত্রগুলির মধ্যে সারল্য, অকৃত্রিমতা ও আদিম সুরের ছোঁয়াচ অনুভব করা যায়।

ভাস্কর্য-শিল্পের ক্ষেত্রেও স্পেনীয় রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা গেছে। স্পেনীয় রীতিতে অলঙ্করণ ও বাস্তবতার দিকে ঝোঁক খুব বেশি। স্পেনে গির্জায় গির্জায় যে ভাস্কর্য আছে, তাতে দেহবল্লরী সজ্জিত হয়েছে সত্যিকারের বস্ত্রখণ্ডে এবং এতে প্রকৃত মণিমুক্তারও ব্যবহার দেখা যাবে।

আমেরিকায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম শতাব্দীটিকে অথবা মোটামুটিভাবে ১৬০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার অভ্যুদয়ের প্রথম যুগ বলা যেতে পারে। এটা গঠনের যুগ। এই যুগেই ইউরোপীয় রীতির পরিবর্তে আমেরিকার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হতে থাকে।

প্রাথমিক যুগের আমেরিকায় ঘরোয়া স্থাপত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে এলিজাবেথীয় ও ওলন্দাজরীতির ছাপ রয়েছে। অবশ্য নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন তাতে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক যুগে মার্কিন চিত্রকলায় প্রতিকৃতি-অঙ্কনের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ ও জার্মান বাস্তববাদী শিল্পের প্রভাব এবং ফরাসী রাজসভার প্রতিকৃতি-শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথম যুগের শিল্পে ধর্মীয় চিত্রকলার কোন স্থান ছিল না। প্রথম যুগের যেসব প্রতিকৃতি আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়—বহু জাতির ঐতিহ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে প্রথম যুগের মার্কিন শিল্পীদের শিল্পধারা।

১৭২০ থেকে ১৭৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশগুলির শিল্পে জর্জিয়া-রীতির প্রাধান্য ছিল। জর্জিয়া-রীতির যুগে মার্কিন চিত্রশিল্পীরা দু'টি সাধারণ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। ফলে অনেক সময়েই দু'টি বিশেষ দল গড়ে উঠেছে। একটা দল প্রতিকৃতি-অঙ্কনের ক্ষেত্রেই নিজেদের শিল্পদক্ষতা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল এবং অপর দলটি চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কিন শিল্পীরা যে রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন করতেন তাতে মুখাবয়ব অঙ্কনের জার্মান ও ওলন্দাজ বাস্তব রীতির পরিবর্তে সমসাময়িককালের বৃটিশ রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় পদ্ধতিতে চিত্ররচনা করে উপনিবেশের যে সব শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবার্ট ফেক, জন স্মিবার্ট এবং জোসেফ ব্যাডগারের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা যে ছবি আঁকতেন তাতে ইংলণ্ডীয় রীতির ছাপ থাকলেও প্রকাশভঙ্গির সারল্যটুকুর মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এঁদের প্রেরণার মূলে ছিল দেশের মাটির স্পর্শ, কিন্তু সেই প্রেরণাজাত রস রূপায়িত হয়েছে ইংলণ্ডের আঙ্গিকে।

ঔপনিবেশিক যুগের মার্কিন শিল্পীদের সম্পর্কে সাধারণ প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, এঁরা বুঝি শুধু প্রতিকৃতি-অঙ্কনের মধ্যেই নিজেদের শিল্পপ্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল।

● ফুলের গাছ (তৈলচিত্র)
শিল্পী : এজনার হ্যানসেন

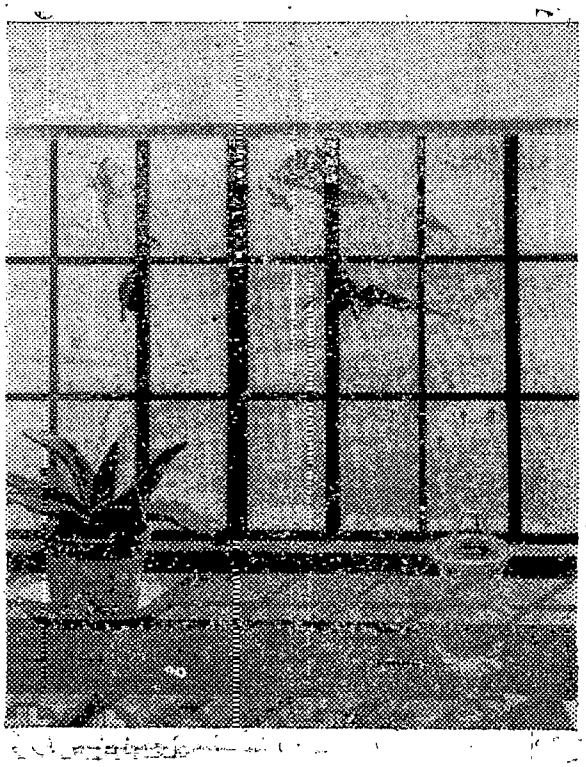

● চার্লস শীলারের আঁকা ছবি

সে যুগের মার্কিন শিল্পীরা যে আরও নানাবিধ বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিত্ররচনা করেছেন, তার প্রমাণের অভাব নেই। নিসর্গচিত্র, সমুদ্রের শোভা, নগরজীবনের চিত্র, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব চিত্র, শিকার-দৃশ্য প্রভৃতি থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক কাহিনী পর্যন্ত সবকিছুই তাঁদের চিত্রের উপজীব্য ছিল। এ ছাড়া ফুল, ফল ও জীবজন্তু এই সব চিত্রশিল্পীকে আকৃষ্ট করেছিল। আবার অলঙ্করণ শিল্প, কাচের ওপর চিত্রাঙ্কন, মানচিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁরা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ঔপনিবেশিক যুগে ভাস্কর্যের শিল্পকৃতির দিকটি উপযুক্ত স্বীকৃতি পায় নি। সে যুগে ভাস্কর্যশিল্পকে প্রকৃত শিল্প আখ্যা দেওয়া হত না, মনে করা হত এটা একটা হাতের কাজ। কিছু ধাতুর কাজ, কিছু বা কাঠখোদাই—ভাস্করের কারিকুরি দেখাবার তখন এই ছিল ক্ষেত্র। অবশ্য সমাধিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ তো ছিলই।

ঔপনিবেশিকযুগের পরবর্তীকালে বা প্রজাতন্ত্রযুগের প্রথম দিকে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রইল। বিশেষ করে নতুন প্রজাতন্ত্রের রাজনীতিকদের প্রতিকৃতি আঁকার দিকে ঝোঁক দেখা যায় খুব বেশি তবে আমেরিকার চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন বিষয়বস্তুরও অভাব ছিল না।

সে যুগের মার্কিন চিত্রশিল্পীদের মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: প্রথম শ্রেণীতে পড়ে স্থানীয় স্বভাব-শিল্পীরা। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর শিল্পীদের ওপর বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট। আর তৃতীয় গোষ্ঠীটিকে বলা যায় স্বাধীন বা প্রভাবমুক্ত শিল্পীদল।

বাস্তবধর্মী সৃষ্টিতে এবং দৈনন্দিন জীবন-চিত্র বাস্তবভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার কাজে সিদ্ধহস্ত শিল্পীদের কথা ছেড়ে দিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি মার্কিন চিত্রশিল্প বলতে 'হাডসন রিভার' শ্রেণীকেই বোঝায়। এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা রোম্যান্টিক ইংরেজী ও মার্কিন সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এঁদের সৃষ্টি রোম্যান্টিক পরিবেশও নীতিগত রূপকের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। আবার এঁদের নিসর্গচিত্র রচনায় অনুভূতিশীল মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। টমাস কোল, টমাস ডাফটি, ফ্রেডারিক এডউইন চার্চ, জন কেনসেট প্রমুখ শিল্পীরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল সাহিত্যস্রষ্টা তাঁদের শিল্পে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁদের নাম উইলিয়াম কুলেন ব্রায়ান্ট, ওয়াশিংটন আভিং এবং জেমস ফেজিমোর কুপার। ব্রায়ান্ট তো এই শিল্পীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

যে-সকল স্থানীয় শিল্পী মার্কিন জীবনের দৈনন্দিন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, জীবনের হাস্যকৌতুকের দিকটাকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম সিডনী মাউন্ট, জর্জ কালে বিংহাম ও জন জর্জ ব্রাউনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকায় চিত্র-শিল্পে একটা ঢেউ এসেছিল স্টীল-লাইফ চিত্রের মাধ্যমে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করা। এঁরা স্থির-জীবনের ছবির মধ্যে এমন বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতেন যে, এগুলোকে ছবি বলে মনে হত না, মনে হত যেন সত্যিকারের বস্তু।

● লাইট হাউস শিল্পী : এডওয়ার্ড হপার

কাগজ ও পেপারক্লিপের ছবি দেখে একবার এক দর্শক ঐ ক্লিপ তুলে নিতে গিয়েছিল। এতই বাস্তব এঁদের ছবি। এই গোষ্ঠীর চিত্রকরদের মধ্যে উইলিয়াম হারনেট, জন ফ্রেডারিক পেটো, চার্লস বার্ড কিং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন কিছুসংখ্যক শিল্পী আমেরিকার শিল্পক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁদের সৃষ্টি পরবর্তীকালের শিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। এঁদের নাম উইনসলো হোমার, টমাস ইকিনস এবং অ্যালবার্ট রাইডার। এঁদের সমকালীন শিল্পীরা কিন্তু এঁদের সৃষ্টিকে খুব উঁচুদরের শিল্প বলে মনে করতেন না। তবে মার্কিন চিত্র-শিল্পের বিকাশে এঁদের অবদানের কথা বর্তমান শতাব্দীর শিল্পীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকার চিত্রশিল্পীরা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের ঐতিহ্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথমেই আর্জেন্টিনা থেকে ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার সর্বত্র শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ব্রেজিল, কিউবা ও চিলির শিল্পকলা-শিক্ষালয়গুলির পরিচালকেরা ছিলেন ফ্রান্সের জ্যাক লুই ডেভিডের বিশিষ্ট ছাত্র। ফলে এ যুগের লাতিন আমেরিকার শিল্পকলায় ফরাসী রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সে যুগে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠছিল। তাই চিত্ররচনায় তার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে যুদ্ধদৃশ্য, নিসর্গদৃশ্য, সরকারী ভবনসমূহের রূপক অলঙ্করণ প্রভৃতি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে। নিগ্রো ও রেড-ইণ্ডিয়ানদের চিত্রিত করার দিকে এবং সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার দিকেও তাঁদের আগ্রহ কম ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার শিল্পকলায় খুব বড় রকমের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। শিল্পকলার প্রতি সাধারণের আগ্রহ খুব বেশিমাত্রায় চোখে পড়ে নি। ধনী পৃষ্ঠপোষক আর শিল্পসংগ্রাহকেরা পুরানো যুগের প্রথিতযশা শিল্পীদের সৃষ্টিই পছন্দ করতেন।

১৯৩০ সালে আমেরিকায় চারুকলা সম্পর্কিত হুভার কমিটী জানান যে, ব্যবসা বা শিল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সুকুমারকলার সত্যিকারের অস্তিত্ব তখন ছিল না। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে আমেরিকায় যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল তাতে আমেরিকার শিল্পীরা কলাক্ষেত্র থেকে সরে এসে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সমকালীন শিল্পকলার মত লাতিন আমেরিকার শিল্পকলার মধ্যেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুতপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই। এর প্রকাশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে। তবে বিলম্বিত হলেও বিংশ শতকে লাতিন আমেরিকার শিল্পে রেড-ইণ্ডিয়ানদের ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা গেছে। রেড-ইণ্ডিয়ানদের জীবনকথা মেক্সিকো ও পেরুর চিত্রকলার উপজীব্য হয়েছে, শিল্পীদের প্রেরণা দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন শিল্পকলা

ইউরোপীয় শিল্পের মত উৎকর্ষলাভ করে নি একথা সত্য। তবে এই শিল্প একটা প্রাণশক্তিসম্পন্ন শিল্প ঐতিহ্যের সূচনা করেছিল, যার মূল নিহিত রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মার্কিন শিল্পীদের মধ্যে এডোয়ার্ড হপার, এজনার হানসেন, চার্লস্ শীলার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ফুলের ছবি আঁকায় এজনার হানসেন সিদ্ধহস্ত। নানা রঙের সমাবেশে ফুলের কোমলতা ও চারুতা ফুটিয়ে তুলতে হানসেনের জুড়ি মেলা ভার।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ১৯০৮ সালে আটজন চিত্রশিল্পী তখনকার দিনে প্রচলিত ও জনপ্রিয় 'সুন্দর' চিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন। এই জনপ্রিয় 'সুন্দর' ছবিগুলিতে ভাবালুতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল খুব বেশি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এঁদের 'বিপ্লবী গোষ্ঠী' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একমাত্র রবার্ট হেনরী ছাড়া আর সকলেই সংবাদপত্রে ছবি আঁকার কাজ করতেন। কাজেই মানুষের জীবনের আবেদনের দিকটাই তাঁদের প্রধান উপজীব্য ছিল। বস্তুত অঙ্কনপদ্ধতির দিক থেকে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল ও বাস্তবপন্থী। অন্যান্যদের নাম মরিস পেনডারগাস্ট, এভারেট শিন, জন স্লোন, উইলিয়াম গ্ল্যাকেন্স, জর্জ লুক্স, আর্থার ডেভিস এবং আর্নেস্ট লসন।

১৯১৩ সালের ঐতিহাসিক আর্মারী শো আমেরিকার লোককে ইউরোপে আধুনিক শিল্পের বিকাশের কথা জানিয়ে দিল, মার্কিন শিল্পে আধুনিকতার সূচনা হল। এই আর্মারী শোর একজন সংগঠক ছিলেন উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ওয়াল্ট কুন। প্রথিতযশা শিল্পী কুনের চিত্রচনায় রয়েছে গভীরতা ও প্রাণের স্পন্দন। নিতান্ত বাস্তব বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ করাই ছিল তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। ক্লাউনের প্রতিকৃতি অঙ্কনে ওয়াল্ট কুন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্লাউনের মুখাবয়বে আলোছায়ার সমাবেশে শিল্পী এমন একটা ভাব সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর জীবনদর্শন ফুটে ওঠে।

১৯৩৩ সালে শিকাগো বিশ্বমেলা মার্কিন শিল্পকলার সঙ্গে আমেরিকার জনগণের পরিচয় সাধন করল। আমেরিকার মানুষ এই প্রথম জানল, প্যারিস ও নিউ ইয়র্কের বাইরেও শিল্পী আছে। এই শিল্পীরা আমেরিকার জীবনধারা ও আমেরিকার সমাজ ও মাটির সঙ্গে যোগ আছে এমন সব বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পরচনা করে মার্কিন চিত্রশিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এঁরা হলেন গ্র্যান্ট উড, জন স্টুয়ার্ট কারি এবং টমাস হার্ট বেণ্টন। এঁদের নাম তখন আমেরিকার লোকের মুখে-মুখে। এঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমেরিকার মানুষ তখন নিজেদের দেশের শিল্পসৌকর্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত বহু মার্কিন শিল্পী আমেরিকার শহর ও নগরের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করা পছন্দ করতেন। আমেরিকার জীবনধারা ও আমেরিকার দৃশ্য রচনাই ছিল মার্কিন শিল্পীদের কাজ।

সাম্প্রতিককালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে তরুণ মার্কিন চিত্রশিল্পী ও ভাস্করগণ শিল্পের বস্তুনিরপেক্ষ দিকটা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। এ ব্যাপারে আগে ইউরোপীয় শিল্পীদের একচেটিয়া অধিকার ছিল বলে মনে করা হত। অনেকে মনে করেন শিল্পের এই নতুন বিকাশক্ষেত্রের মাধ্যমে মার্কিন শিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্যের সার্থকপ্রকাশ সম্ভব হতে পারে। আজ মার্কিন শিল্পীদের চিত্ররচনা অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন-শিল্প আজ আর কোন অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠছে না, আজ তার শিল্পের উপজীব্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবধারা।

আধুনিক শিল্প ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। প্রাণবন্ত শিল্পের লক্ষণই এই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে এগিয়ে চলে। আমেরিকার শিল্পকলাও যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে।*

* প্রবন্ধটি রচনায় এই গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

1. What is American in American Art—J. Lipman.
2. History of American Art—D. M. Mendelowitz.
3. Aesthetics and History—B. Berenson.
4. Revolution and Tradition of Modern American Art—J. H. Baur.
5. History of Art—J. A. Vincent.
6. Art Through the Ages—H. Gardener.

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ব বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধি প্রাপ্ত **রাজ-জ্যোতিষী মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশ চন্দ্র শাস্ত্রী** যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রশ্ন গণনায় ও করকোষ্ঠি নির্মাণে এবং নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধারে অদ্বিতীয়।

সদ্য ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ

শান্তি কবচ ঃ—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্বদুর্গতিনাশক, সাধারণ—৫৲, বিশেষ—২০৲।

বগলা কবচ ঃ—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲। বিশেষ—৪৫৲।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত বই পড়ুন

জুয়েল অব পামিস্ট্রী (ইংরাজী) মূল্য ৭৲ **সামুদ্রিক রত্ন** (বাংলা) পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ ৬৲।

হাউস অব এষ্ট্রোলজি (ফোন : ৪৭-৪৬৯৩)
৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬

বহুকথানি উৎকৃষ্ট
কৃষি পুস্তক
গ্লোব নার্সারীর সত্বাধিকারী
শ্রী অমর নাথ রায় প্রনীত

* বাংলার সব্জী — ৩·৫০
* চাষীর ফসল — ৩·৫০
* আদর্শ ফলকর — ৩·৫০
* পুষ্পোদ্যান — ৩·৫০
* সরল পোল্ট্রী পালন - ৩·৫০
* সরল সারের ব্যবহার - ৩·৫০
* মাছের চাষ — ৩·৫০
* পশু খাদ্যের চাষ — ১·৫০

সব্জী কি খেতী (হিন্দিতে) ৩·৫০

দি গ্লোব নার্সারী
কলিকাতা-৪

বীজ গাছ ও ফুল গ্লোব নার্শরীতে ই ভাল

বেবী
তাল মিশ্রি

বুফে ডিনার

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এমনি পার্টিতে আসা সুচন্দ্রার জীবনে এই প্রথম। এর আগে কখনো আসেই নি সে রাজধানীতে, তাই জানবেই বা কি করে দিল্লীর কি হালচাল। কাজেই পার্টির জৌলুষ দেখে তার হকচকিয়ে যাওয়াটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়।

বড়ো বড়ো হোমরা-চোমরারা প্রায় সবাই সস্ত্রীক এসেছেন এবং আসছেন। মন্ত্রী-উপমন্ত্রীও জনকয়েক উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক জটলার ঝড় বয়ে চলেছে। অন্যদিকে ওপর মহলের অফিসাররা গেলাস হাতে নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনায় মশগুল। নিজ নিজ দপ্তরের মন্ত্রীরাই তাঁদের বিশেষ আলোচ্য।

লনের অপর দিকটা রঙীন স্বপ্নময় করে তুলেছেন দিল্লীর তথাকথিত সোসাইটি লেডীরা। বিচিত্র তাঁদের সাজসজ্জা। লিপস্টিকের লালিমা, শাড়ির বর্ণসুষমা, পেটকাটা ব্লাউজের বিশ্বে আবর্ষণ আর নিয়ন লাইটের আলোয় নকল হীরের গয়নার ঝলসানিতে তাঁরা গোটা পার্টিতে একটা মোহময়তা এনে দিয়েছেন

সুন্দর সাজগোজ দেখতে খুবই ভালোবাসে সুচন্দ্রা। তাই প্রথম থেকেই সোসাইটি লেডীদের দিকে তার প্রখরদৃষ্টি। তার ইচ্ছে, চলতি ফ্যাশনের দু'-চারটে কায়দাকানুন সে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে জামসেদপুরে চালু করবে।

কিন্তু সময় বেশি পেলে না সুচন্দ্রা। দেখতে দেখতেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপগুলো সব ভেঙে গেল। ছেলেমেয়েরা আর পৃথক পৃথক আলোচনায় আবদ্ধ রাখলো না নিজেদের। তারা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। বুফে ডিনারে পান-ভোজনের তখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায় আসন্ন। হাসি-তামাসা হৈ-হুল্লোড়ে আসর সরগরম।

এমন সময় পার্টিতে এলেন দিল্লীর অন্যতম সেরা বিজিনেস ম্যাগনেট স্যার ওঙ্কারমল, সঙ্গে তাঁর ছোট পুত্রবধূ সুভদ্রা দেবী।

ওঁদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে পার্টির প্রায় সবগুলি চোখই সেদিকে। সুচন্দ্রারও। বিশেষ করে সুভদ্রা দেবীর সৌন্দর্যে, তাঁর গলার রুমালহীরের নেকলেসের দ্যুতিতে সুচন্দ্রার চোখ দু'টো যেন ধাঁধিয়ে গেল। তবে এটুকু তার নজরে পড়লো যে, কয়েকজন এগিয়ে গেলেন নতুন অতিথিদের তাঁদের একটু বিশেষভাবে অভ্যর্থনার জন্যে।

সুভদ্রা দেবীর সৌন্দর্য যে দিল্লীর অভিজাত মহলের একটা আলোচ্যবিষয় আশপাশের গুঞ্জন এবং আলোচনা থেকেই সুচন্দ্রা তা' বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সঙ্গিনী বান্ধবী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আরেক দিকে। সেখানেই নাকি আসল গল্প।

ব্যাপারটা কি বলবি তো! তা' না হলে বুঝবো কি করে?

ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস না, এক ভদ্রলোক সুড়সুড় করে সরে পড়ছেন পার্টি থেকে।

এতক্ষণে সুচন্দ্রা ঠিকমতো লক্ষ্য করলে যে, টপ অফিসারদের একজন চুপিচুপি ধীরপদে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এতক্ষণ ধরে এই ভদ্রলোক কিন্তু বেশ হৈ-চৈ করেছেন। হঠাৎ তাঁর পার্টির মাঝপথে এভাবে চলে যাবার কি এমন কারণ থাকতে পারে? রহস্য উদ্ধারে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সুচন্দ্রা। কারণ জানতে চায় তার বান্ধবীর কাছে।

এটুকু তো নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিস যে স্যার ওঙ্কারমল এবং সুভদ্রা দেবী আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক উঠে পড়েছেন এবং নীরবে চলে গেলেন। ওঁদের চোখের সামনে উনি থাকতে চান না এই হলো আসল কথা।

কেন?—বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে সুচন্দ্রা। এঁদের সঙ্গে ওঁর এমনি সম্পর্ক দাঁড়ালো কি করে?

সঙ্গিনী উত্তর দিলে, সে এক করুণ ইতিহাস—ভদ্রলোকের জীবনটাই মস্তবড়ো একটা ট্রাজিডি।

খেতে খেতে সেই মস্তবড়ো ট্রাজিডির কাহিনীই সুচন্দ্রা শুনে চলে তার বান্ধবীর মুখে।

সিন্ধী-মেয়ে সুভদ্রা দিল্লীতেই মানুষ। বাবা তার রাজধানীর একজন বহুখ্যাত

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ ঃ—
কিনিবার সময়
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি
পিলফার প্রুফ ক্যাপের
উপর **R.C.M.** মনোগ্রাম
ও প্রস্তুতকারক
এম, এল, বসু এণ্ড কোং
দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস · কলিকাতা—৯

কণ্ট্রাক্টর, প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক। কিন্তু তাঁর চেয়েও অনেক বড়ো ধনী স্যার ওঙ্কারমল। সুভদ্রাদের বাড়ির অনতিদূরেই প্রকাণ্ড বাগানসহ ওঙ্কারমলের বিরাট প্রাসাদ। দুই পরিবারের মধ্যে তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও প্রতিবেশীসুলভ পরিচয় ওঙ্কারমলের সঙ্গে আগাগোড়াই ছিল শহরের অন্যতম সেরা ঠিকেদার বিজয়রামের সঙ্গে।

সুভদ্রা যখন কলেজের ছাত্রী সারা কলেজ তখন তার রূপের প্রশংসায় মুখর। বাস্তবিকই এমন সুঠাম দেহের গোলাপী রঙের অপরূপ চেহারা খুব কমই চোখে পড়ে। এমন মেয়ের দিকে বহু দৃষ্টিশর নিক্ষিপ্ত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

তেমনি বহু শরকে ব্যর্থ করে দিতে পারলেও হঠাৎ একদিন পৌরুষদীপ্ত এক বলিষ্ঠ যুবকের দৃষ্টিজালে সুভদ্রাকে জড়িয়ে পড়তে হলো। সেই যে সে বন্দিনী হলো, সেই বন্ধনদশা থেকে তার আর মুক্তি নেই এবং সে তা চায়ও না।

সে এক মজার গল্প।

সুভদ্রাদের কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন উৎসবে স্যার ওঙ্কারমল উপস্থিত রয়েছেন তাঁর ছোটছেলে সুরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে। ওঙ্কারমলের দানের টাকাতেই এই নতুন ভবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাই দাতাকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত অভিনন্দনপত্রখানি পাঠ করেছে সুভদ্রা নিজে।

যেমনি সুললিত সুভদ্রার কণ্ঠস্বর, তেমনি তার পড়বার ভঙ্গিমা। শুনে মুগ্ধ হয়েছেন দাতা ওঙ্কারমল, তাঁর চেয়েও বেশি মুগ্ধ হয়েছে তাঁর ছেলে সুরেন্দ্র। অভিনন্দনপত্রখানি পাঠের পর স্যার ওঙ্কারমলকে তা' দিতে এলে তিনি তা' হাতে নিয়েই পাশের চেয়ারে ছেলের কাছে দিয়ে দেন। সেই সুযোগেই সুভদ্রাকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে বসে সুরেন্দ্র—

বলতে পারেন, এ অভিনন্দনপত্রটি কার রচনা?

কেন, ভালো লাগে নি বুঝি?

কি বলছেন? অত্যন্ত ভালো লেগেছে। শুধু রচনা নয়, রচনা-পাঠও অপূর্ব হয়েছে।

সত্যি, না ঠাট্টা করছেন?—বলে একটু মুচকি হেসে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায় সুভদ্রা। সে হাসি থেকে যেন হীরে-মুক্তো ঝরে পড়ছে, এমনি হাসি।

সুরেন্দ্র তাকে পিছু ডেকে থামিয়ে দিয়ে বলে, এ কি বলছেন আপনি সুভদ্রা দেবী, আমার কথাগুলোকে আপনি ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন? আন্তরিকতা তা' হলে কাকে বলবেন?

আরেক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সুভদ্রা সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেল। সে হাসির অর্থ, না না সে সুরেন্দ্রের কথাগুলোকে ঠাট্টা বলে সত্যি সত্যি উড়িয়ে দিতে চায় নি; বরং সুরেন্দ্র যে সত্যিকারের একজন খাঁটি জহুরী এ সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

অনুষ্ঠান শেষে স্যার ওঙ্কারমল সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রের ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল। উৎসবের পর মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটি উৎসবের মধুরতম অংশ। তাতে যোগ দিয়েছিল সুরেন্দ্র। সুভদ্রাই একফাঁকে টুক করে এসে তাকে বলে গিয়েছিল, মিষ্টিমুখ না করে যাবেন না কিন্তু—আপনার সঙ্গে কিছু কথাও আছে।

সুভদ্রার মিষ্টিমুখের সেই মিষ্টি কথাতেই সুরেন্দ্র থেকে গিয়েছিল। আরো কয়জনের সঙ্গে তাকে নিজে হাতে পরিবেশন করেছিল সুভদ্রা। তাতে সে আরো বেশি তৃপ্ত হয়েছিল। যাবার সময় তাই সাহস করে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ দিকে থাকেন আপনি? আমার সঙ্গে যেতে পারেন, নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

না, থাক। ধন্যবাদ! আমার আরেকটু দেরি হবে।—প্রথম দিনের পরিচয়েই এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক হবে না ভেবেই এমনি উত্তরে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সুভদ্রা।

কিন্তু সুরেন্দ্র কিছুটা যেন নাছোড়বন্দা হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাল্টা জবাবে বলে, আপনি বলেছিলেন কি না আমার সঙ্গে আপনার কি কথা আছে তাই আপনাকে একটা লিফট দিতে চেয়েছিলাম। পথে যেতে যেতেই আপনার যা বলার বলতে পারতেন।

বেশ, একটু দাঁড়ান তা' হলে।—কপালে উড়ে-এসে-পড়া কয়েকগাছি চুলকে বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে এই বলেই প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে দৌড় যায় সুভদ্রা। মুহূর্তের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে সুরেন্দ্রের গাড়িতে তার পাশের সিটে বসে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করে, কি যেন বলবেন বলছিলেন আমাকে, বলুন এবার।

না, তেমন কিছু নয়। একটিমাত্র প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। যদি কোনো অপরাধ না নেন তা' হলেই জিজ্ঞেস করবো।

আরে কি আশ্চর্য! প্রশ্ন করবেন, আমি তার যথাসাধ্য উত্তর দেবো। এতে আবার অপরাধ নেবার কি থাকতে পারে?

বেশ, অভয় যখন পেলাম বলছি তা' হলে। আপনার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছে আপনি আমায় মোটেই চেনেন না, কোনোদিন আমায় দেখেন নি। এই না-চেনার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে, কোটিপতির সন্তানের চোখে সবাই পড়তে পারে না। কিন্তু এটুকু শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে, আমার বাবা তেমন বড়লোক না হলেও একেবারে দীন-দরিদ্র নন। একটু আগেই আপনি আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি কোন্ দিকে থাকি। কোনো প্রতিবেশীকে যদি এ ধরণের প্রশ্ন করা হয় তা' হলে তা' কি তার প্রতি উপেক্ষাই প্রমাণ করে না?

সুভদ্রার কথাগুলোতে তীব্র অভিমানের ঝাঁজ। তাতে ভারি অস্বস্তিবোধ করে সুরেন্দ্র। কি যে জবাব দেবে কিছুই ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত অনেকটা ক্ষমা চাইবার সুরেই বলে, না জেনে যদি কোনো অন্যায় করে ফেলে থাকি মার্জনা চাইছি তার জন্যে। কিন্তু সত্যি করে বলছি, বাবা এত কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন আমার ওপর যে, অন্য কোনো দিকেই আমি নজর দিতে পারি নে। ঘটনাচক্রে এবার যখন আপনার সঙ্গে চেনা হয়ে গেল আর কোনোদিন অপরিচয়ের উপেক্ষা কোনো পক্ষকেই ভোগ করতে হবে না, সে কথাই রইলো। কি বলেন? আচ্ছা, এবার আপনার বাবার নামটি বলবেন কি দয়া করে।

শ্রীবিজয়রাম গিদোয়ানী।

আরে, আপনি তা' হলে কনট্রাক্টর মশাইয়ের মেয়ে, তাই বলুন। বাবার সঙ্গে তাঁর বেশ জানাশুনো আছে। আমি দেখেছি তাঁকে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

কিন্তু তাঁর মেয়েকে আপনি চেনেন না, তাই দুঃখ।

আবার ক্ষমা চাইছি তার জন্যে। বলছি, আর ভুল হবে না।—শেষবারের মতো মার্জনা ভিক্ষা করে সুরেন্দ্র। আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কথা ওঠে না। গাড়িও ততক্ষণে রফি মার্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাড়ির গেটে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে 'বাই, বাই' বলে হাত নেড়ে সুভদ্রা সেদিন বিদায় দিয়েছিল সুরেন্দ্রকে।

তারপর থেকে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতো

দু'জনে। পূর্ব-ব্যবস্থা মতো তারা মিলিত হতো। দূরে—বহুদূর পর্যন্ত মোটর বিহার চলতো তাদের। আনন্দের স্বর্গে অহরহ তাদের বিচরণ চলেছে সেই থেকে। অন্তরঙ্গতাও স্বভাবতই শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে।

কিন্তু সুরেন্দ্রের সঙ্গে সুভদ্রার সেই ঘনিষ্ঠতার খবরে মোটেই খুশি হতে পারেন নি বিজয়রাম। স্ত্রী একদিন সুরেন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেই তিনি একেবারে ক্ষেপে আগুন। সিন্ধী-সমাজে কি ভালো ছেলের অভাব যে, এক মাড়োয়ারীর হাতে এমন সুন্দর মেয়েটাকে তুলে দিতে হবে? রেগে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে সমাজের বাইরে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দেবেন না এবং সাত দিনের মধ্যেই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ স্থির করে ফেলবেন।

সত্যি সত্যি তাই করলেন বিজয়রাম। এক বনেদী সিন্ধী-পরিবারের সদ্য-বিলেত ফেরৎ এক ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে পাকা করে ফেললেন মেয়ের বিয়ের কথা। দেশ-ভাগের পর থেকে ঐ পরিবারটি এলাহাবাদ-বাসী। ছেলে অমৃতলালও এলাহাবাদ হাই-কোর্টেই প্রাকটিস আরম্ভ করে। এরই মধ্যে ব্যারিস্টার হিসাবে বেশ নাম করে ফেলেছে। রুজি-রোজগার ভালোই করছে। এমন ছেলেকে সুভদ্রাও পছন্দ করবে, এ সম্বন্ধে সে-ও খুশি হবে, বিজয়রামের এই ধারণা।

কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতা করবার সাহস না পেলেও এ ব্যবস্থায় মোটেই খুশি হতে পারে নি সুভদ্রা। একটা অব্যক্ত অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় সে জলে-পুড়ে মরেছে, তবু মুখ ফুটে সে একটা কথাও বলে নি এ বিয়ের বিরুদ্ধে।

নির্দিষ্ট দিনে বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে দিল্লীতে। এলাহাবাদে বৌ-ভাতের বিরাট আয়োজন। চোখের জলে স্বামীর সঙ্গে ট্রেনে গিয়ে চাপে সুভদ্রা। তেমন কোন কথাবার্তা নেই—ট্রেনে সর্বক্ষণ ধরে কেবল কান্না, কান্না আর কান্না।

অমৃতলাল ভাবে, বাড়ির একমাত্র মেয়ে নিশ্চয়ই খুবই আদুরে—বাপ-মাকে ছেড়ে আসবার বেদনা বোধ হয় সহ্য করতে পারছে না সুভদ্রা। কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাই?

এলাহাবাদের বাড়িতে এসেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। কান্নায় কান্নায় চোখের জলে সমুদ্র সৃষ্টি হবার উপক্রম। একালের সোমত্ত মেয়ে—শিক্ষিতা মেয়ে, এমনি কান্না-কাটা করে এ ধরণের একটা কাণ্ড বাধাবে সুভদ্রা, এ কেউ ভাবতে পারে নি।

এক প্রৌঢ়া মহিলা তো নতুন বৌকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে বসলেন, না বাপু, এমন বৌ দেখি নি জীবনে। সব মেয়েমানুষকেই বাপ-মা ছেড়ে আসতে হয়, আমরাও এসেছি। দুঃখু আমাদেরও হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে কি আমরা কেউ এমনি মরাকান্না কেঁদেছি? যতসব অলুক্ষুণে ব্যাপার!

কথাটা কানে আসতেই অমৃতলালের মা ছুটে এসে মুখচাপা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন ভদ্রমহিলাকে। কিন্তু কতজনকে আর মুখচাপা দেবেন তিনি? মুখে মুখেই সুভদ্রার সমালোচনা চলেছে।

বাড়ির লোকজন সবাই আরো বিরক্ত নতুন বৌ-এর জেদ দেখে। সবাই ভেবেছিল, দেখতে যেমন লক্ষ্মী ব্যবহারে কথাবার্তায়ও তেমনি লক্ষ্মীই হবে বৌটি। সম্পূর্ণভাবেই তারা নিরাশ হয়েছে। সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও বৌকে কেউ জলগ্রহণও করাতে পারে নি। এতে লোকে বিরক্ত না হয়ে পারে?

কিন্তু শুভরাত্রির শয্যায় এ কি কথা?

সুভদ্রা কেন এমন করছে, কি তার দুঃখ জানতে চেয়েছিল অমৃতলাল। সস্নেহে এবং অত্যন্ত মৃদুভাবে তাকে বলেছিল, যদি একান্ত অসম্ভব না হয় তা' হলে সুভদ্রার দুঃখ দূর করতে সে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করবে।

সেই সুযোগই নিয়েছে সুভদ্রা। অকপটে সে সব কথা স্বীকার করেছে অমৃতলালের কাছে। পরিষ্কারভাবেই সে বলেছে, সুরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কাউকে সে স্বামী বলে ভাবতে পারে না—তবে বাবা যখন তাকে এখানে বিয়ে দিয়েছেন তখন শ্বশুরবাড়ির সবাইকে সে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু যে মন সে একবার অন্যকে দান করে ফেলেছে সে মনকে ফিরিয়ে-এনে তা আর অপর কাউকে দেওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

সুভদ্রার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল অমৃতলাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে একটু ভেবে নিলে বিষয়টা সম্বন্ধে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তোমার তো কোনো দোষ নেই সুভদ্রা! তুমি যখন সরলভাবে সব কথা খুলে বলেছ, আমিও আমার কথা রাখবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করবো না, বরং তোমায় সুখী করার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তোমাকে ক'টা দিন এখানেই থাকতে হবে। আমার মা'র কাছে ঠিক তাঁর মেয়ের

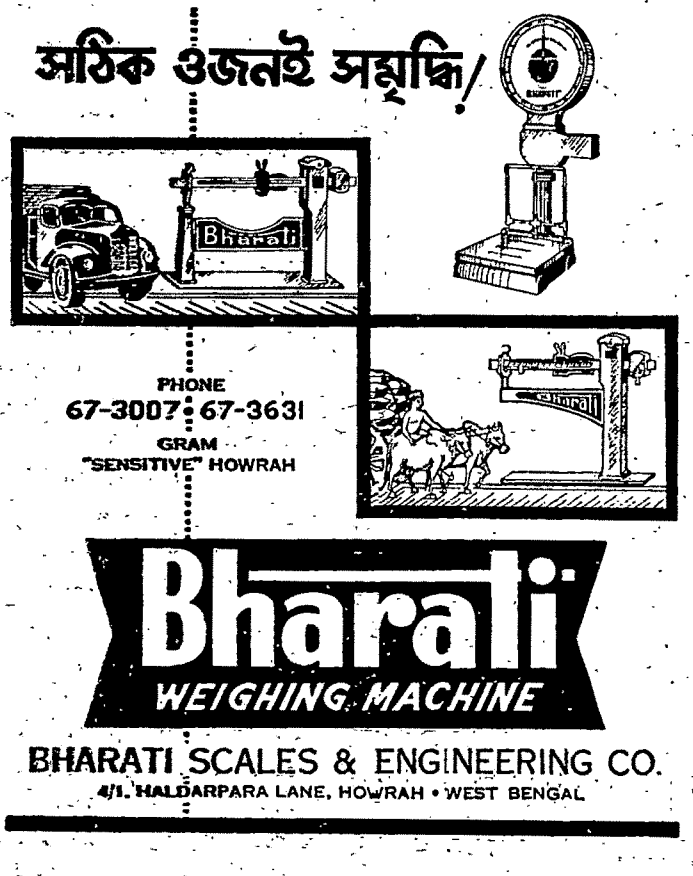

মতো হয়েই তুমি থাকবে, কোনো ভয় নেই। আমি আজ শেষরাত্রে দিল্লী রওনা হয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করেই ফিরবো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো যেন সুভদ্রা। কৃতজ্ঞতায় অন্তর তার ভরে উঠলো অমৃতলালের কথায়। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতাকে রূপ দেবার মতো ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। বরং আনন্দে বাকশক্তিই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে এমনি তার অবস্থা। রুদ্ধবাক হয়ে চুপচাপ একপাশেই সে পড়ে থাকলো।

অমৃতলাল এদিকে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে। ভোর হয় হয় সময়ে সে নিজের গাড়িতেই রওনা হয়ে যায় রাজধানীর দিকে। কতটুকুই বা দূর এলাহাবাদ থেকে দিল্লী? দিল্লীতে পৌঁছেই সে সরাসরি সুরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সব কথা খুলে বলেছে তার কাছে। সুরেন্দ্রও খোলাখুলিই সব স্বীকার করেছে সুভদ্রার সঙ্গে তার মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। তবে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে সুভদ্রার বাবার যে আপত্তি হতে পারে এবং তার ফলে ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতে পারে এ সে কখনো ভাবে নি, এটুকু জানিয়েই সে চুপ করে গেছে।

না, না, বাইরে থেকে যতদূর মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই ততদূর গড়ায় নি। আর সুভদ্রার বাবার আপত্তি খণ্ডন করাও খুব কঠিন হবে না। মেয়ের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনিও শেষ পর্যন্ত মেয়ের মনের ইচ্ছাই পূর্ণ করতে রাজী হবেন। আমিই তাঁর সে সম্মতি আদায় করবো।

বেশ কথা, দেখুন চেষ্টা করে। আমি রাজী।—অমৃতলালের আশ্বাস পেয়ে কথা দিয়ে দেয় সুরেন্দ্র।

আমি চাই তার আগের বিয়েকে বাতিল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুভদ্রাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে। এই বলেই সুরেন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমৃতলাল সোজা চলে যায় সুভদ্রার বাপের বাড়িতে।

বিয়ের পর জামাই জোড়ে আসবে শ্বশুরবাড়িতে, এই নিয়ম। কিন্তু অমৃতলালকে একা দেখে এবং মাত্র একদিন বাদেই সে চলে আসায় বিজয়রামের বাড়িতে মুহূর্তের মধ্যেই একটা গভীর উৎকণ্ঠার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে গেল। নতুন জামাই অবশ্য সবাইকেই আশ্বস্ত করলে সুভদ্রার এবং আর সকলের কুশল সংবাদ জানিয়ে। বিশেষ একটা জরুরী কাজের তাগিদে তাকে একদিনের জন্যে দিল্লীতে চলে আসতে হয়েছে, এ-কথাই সে সবার কাছে বললে। আরো জানালে যে, সব কাজ শেষ করেই সে শ্বশুরবাড়িতে দেখা করতে এসেছে।

প্রথম প্রথম সুরেন্দ্রের কথা কেউ অবিশ্বাস না করলেও পরে একটু একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে অনেকের মনেই। সন্দেহের কারণ নিশ্চয়ই আছে। তা' না'হলে খাওয়া-দাওয়ার পর এতক্ষণ ধরে দোর-আটকে শ্বশুর-জামাইয়ে কি এমন গল্পগুজব চলতে পারে? নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার, নিশ্চয়ই কোনো অশান্তির কথা।

কুকুরটাও সেই সন্ধ্যা থেকে মাঝে-মাঝেই অমন করে হাঁকছে কেন? এমন তো সে কোনোদিন করে না। আর এমনিভাবে সে লোহার চেনটাকে কামড়াচ্ছে আর টানাটানি করছে যেন সেটাকে ছিঁড়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। এগুলো নিশ্চয়ই দুঃসংবাদের লক্ষণ। দুশ্চিন্তায় সুভদ্রার মায়ের মনটা একেবারেই নুয়ে পড়ে।

না, ওস্তাদ ছেলে বটে অমৃতলাল। বিজয়রামকে সে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে নিয়েছে। তাঁকে সে একদম হাত করে ফেলেছে। দু'ঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টার আলোচনা তার সার্থক হয়েছে। অত্যন্ত শক্ত কাজ হলেও বিষয়টাকে সে বেশ সহজ করে নিয়েছে। বিজয়রামকে কিছুই করতে হবে না, ঠিক হয়েছে সব-কিছুই করবে অমৃতলাল।

আর কিইবা করবেন বিজয়রাম, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনিই জোর করে আপন সমাজে ভালো ছেলে খোঁজ করে আদরের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। অমৃতলালের চেয়ে ভালো ছেলে আর কি হতে পারে? ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁর খুশি হবে। এমন স্বামী পেয়ে হলো না, তিনি তার আর কি করবেন? সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তিনি একদম হতভম্ব, একেবারে নিস্তব্ধ।

এলাহাবাদ ফিরে যাবার আগে অমৃতলাল আরেকবার দেখা করে সুরেন্দ্রের সঙ্গে। বিয়ের দিন-তারিখটা পাকা করে ফেলে। সবকিছু ঠিক করে সুরেন্দ্রের বাবার সঙ্গেও একবার কথাবার্তা বলে যায়।

এতদিনে তাঁর ছেলে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, নিজেই সে মেয়ে পছন্দ করেছে, অমৃতলালের মুখে এ-সব শুনে স্যার ওঙ্কারমল ভারি খুশি। মৃতদার ওঙ্কারমল অনেক দিন চেষ্টা করছিলেন সুরেন্দ্রকে বিয়ে করাবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই তার মত আদায় করতে পারেন নি। তিনি যা পারেন নি, সুরেন্দ্রের বন্ধু তা' করতে পেরেছে বলে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। বারবার তাই তিনি তাকে ধন্যবাদ জানান সে বিদায় নেবার আগে। তবে একটা কথা তিনি খুব দুঃখের সঙ্গেই বলেন অমৃতলালকে যে, আগের মতো ছুটোছুটি করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়, দেহও অপটু হয়ে পড়েছে এবং চোখেও আর তেমন ভালো দেখতে পান না—তাঁর যেটুকু ঘোরাঘুরি সে শুধু এই রাজধানীতেই। কাজেই ছেলের বিয়েতে বেনারসে যাওয়া হয় তো তাঁর হয়ে উঠবে না, সেজন্যে তারা যেন কিছু মনে না করে।

এমনিভাবে সব কিছুর সুব্যবস্থা করেই এলাহাবাদে পরের রাত্রে ফিরে আসে অমৃতলাল। এসেই সমস্ত কথা জানায় সুভদ্রাকে। কিন্তু তখন তার সবচেয়ে বড়ো চিন্তা তাদের বিবাহ বাতিলের সমস্যা নিয়ে। তখনো ডিভোর্স আইন পাশ হয় নি দেশে। অনেক বইপত্র ঘেঁটে ব্যারিস্টার অমৃতলাল শেষ পর্যন্ত প্রাচীন হিন্দু বিবাহ বিধির এমন একটি ধারাবলে সুভদ্রার সঙ্গে তার বিয়েকে অসিদ্ধ বলে আদালত থেকে ঘোষণা করিয়ে নিলে যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জীবনে আর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করার সিদ্ধান্তও নিতে হলো।

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে, অপূর্ব আত্মত্যাগ!—এতক্ষণ ধরে খেতে খেতে নীরবে সুচন্দ্রা গল্প শুনছিলো তার বান্ধবীর মুখে। হঠাৎ সে উল্লসিত হয়ে মুখ খুললে, জিজ্ঞেস করলে—শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রের সঙ্গেই সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল, তাই না?

ঠিক তাই। বেনারসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমৃতলাল নিজে বিয়ে দিলে সুভদ্রার, সে নিজে কন্যা সম্প্রদান করলে সুরেন্দ্রের হাতে।

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ব্যারিস্টারী করতে আর ভালো লাগছিল না বলে অমৃতলাল ছেড়ে দিয়েছে সে পেশা। ক'বছর ধরে সে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কি একটা দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল। স্যার ওঙ্কারমল পুত্রবধূ সুভদ্রা দেবীকে নিয়ে পার্টিতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে যে অফিসারটি চুপি চুপি বেরিয়ে চলে গেল সে লোকটিই সেই অদ্ভুত মানুষ অমৃতলাল।

কিন্তু আমি ভাবছি, তুই এত ভেতরকার কথা জানলি কি করে হেনা?—সুচন্দ্রা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

বা রে, সুভদ্রা যে আমার একক্লাসের বন্ধু। একই কলেজে আমরা বি-এ পর্যন্ত পড়েছি, একই সঙ্গে বি-এ পাশ করেছি।

দেখেছেন ?

নতুন শার্প ঝংকার রেডিও

চমৎকার !

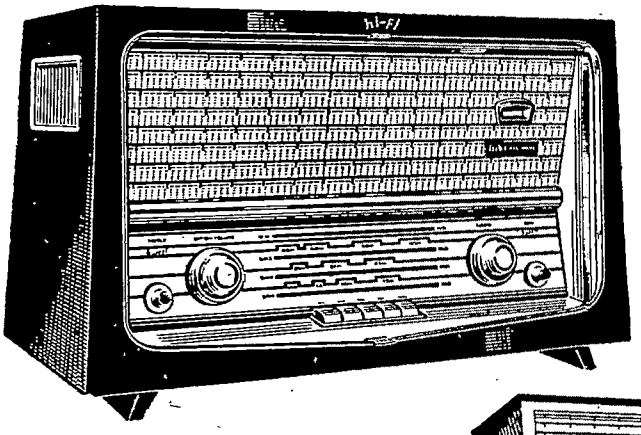

মডেল HF 464-৬ ভাল্‌ভ ৪ ব্যাণ্ড, ৩টি স্পিকার ; AC, মূল্য ৫৪১·৬৬ প:

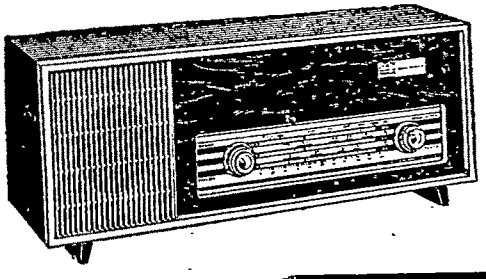

মডেল UL 164/ 264- ৬ভাল্‌ভ ৪ ব্যাণ্ড ; AC ও AC/DC, মূল্য ৪১৫৲

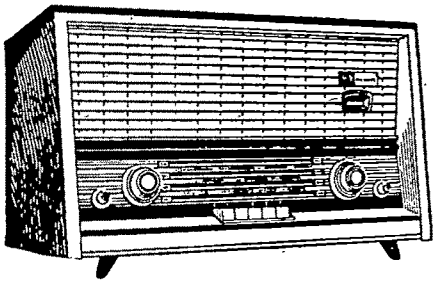

মডেল VC 053- ৫ ভাল্‌ভ ৩ ব্যাণ্ড ; AC, মূল্য ৩০৩৲ ; AC/DC, মূল্য ২৭৮৲

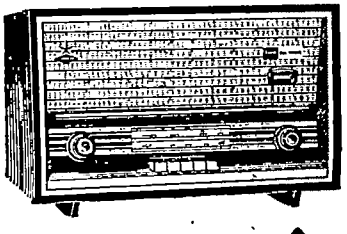

মডেল UW 153-৫ভাল্‌ভ ৩ব্যাণ্ড ; AC, মূল্য ৩২৮৲

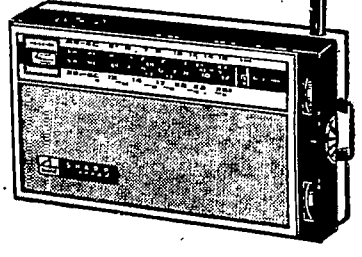

মডেল BZ 490- ৪ ব্যাণ্ড, পোর্টেবল্‌, চামড়ার কেস সহ ; মূল্য ৪৩০৲

জাপানের প্রখ্যাত হায়াকাওয়া ইলেকট্রিক কোং লিঃ-এর সহযোগিতায় প্রস্তুত, ইণ্ডিয়ান প্ল্যাস্‌টিক্‌স্‌ লিঃ (বোম্বাই)-এর অবদান

একমাত্র পরিবেশক :

রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স

প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৫৯২১-২

সহজ কিস্তির জন্য যোগাযোগ করুন

মডার্ণ রেডিও সার্ভিস

৮ চৌরঙ্গী রোড, ফোন : ২৩-৭২১৩

৪৮ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ফোন : ২৪-২২৩৪

১৫৭এল লিণ্ডসে স্ট্রীট, ফোন : ২৪-১৯৬৫

RSF·64.

অন্য নক্ষত্রলোকে বুদ্ধিমান জীব আছে

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা বনভূমির তুঙ্গুস নামে একটি জায়গায় আকাশে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। পরে দেখা যায় বনভূমির এক বিশাল অঞ্চল এমনভাবে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে যেন সেখানে একটা হাইড্রোজেন বোমা পড়েছে। এই ব্যাপারটি নিয়ে আজও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বাদানুবাদ চলেছে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে অন্য কোন গ্রহ থেকে এক মহাজাগতিক জাহাজ পৃথিবীতে আসতে গিয়ে ফেটে যায়। অন্যেরা সেকথা মানতে নারাজ। গ্রহ-গ্রহান্তরে বা অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে বুদ্ধিমান জীব থাকা সম্ভব কি না, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক। বিজ্ঞান আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই প্রশ্নটির কতটুকু জবাব দিতে পারে।

অন্যান্য কোটি কোটি নক্ষত্রের মত সূর্যও একটি নক্ষত্র যার একটি গ্রহে আমাদের বসবাস। এ কথা মোটামুটি ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে, অন্যান্য নক্ষত্রেরও সূর্যের মত গ্রহ-উপগ্রহ আছে—কারণ সূর্য তো নক্ষত্র হিসাবে কোনো ব্যতিক্রম নয়। তা ছাড়া জ্যোতির্বিদেরা আজ হিসেব করে ফেলেছেন যে, পৃথিবী থেকে ১০০ আলোক-বৎসর দূরত্বের মধ্যে অন্তত এমন ১০ হাজার নক্ষত্র আছে যেগুলিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে কমপক্ষে ১ লক্ষ গ্রহ। কিন্তু সেইসব গ্রহ পর্যবেক্ষণ করবার কোনো উপায়-উপকরণ জ্যোতির্বিদ্যার অস্ত্রাগারে নেই। তেমনি এমন কি আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের কোনো গ্রহে বসে কোনো জীবের পক্ষে পৃথিবী, এমন কি বৃহস্পতি বা শনির মত বিরাট গ্রহ দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। নিকটতম নক্ষত্রের কোনো গ্রহ আমাদের দেখতে হলে সে গ্রহের আয়তন বৃহস্পতির অন্তত ১০ গুণ হওয়া চাই। সিগ্নি বলে যে নক্ষত্রটি ভূমণ্ডলের খুব নিকটে, তার গ্রহের গতি দূরবীণ দিয়ে বুঝতে পারা যায়। মনে হয় তারাটি যেন একটু দুলছে। সিগ্নির গ্রহ বৃহস্পতির ১০ গুণ বড়।

আমেরিকায় সু-শু-হুয়াং নামে এক বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, নক্ষত্রের দুনিয়ায় নীহারিকাগুলি বিবর্তনের পথে নিত্য-নতুন জ্যোতিষ্ক ও গ্রহের জন্ম দিয়ে থাকে। তার অর্থ মহাজগতে অজস্র গ্রহ-উপগ্রহ আছে এবং সেগুলি নির্দিষ্ট আয়তনের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই জড়মানের প্রচণ্ড চাপে সেগুলির ভিতরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটার ফলে সেগুলি নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়।

অবশ্য প্রত্যেকটি তারার গ্রহ থাকা সম্ভব নয়। সব তারাই যে সূর্যের মত, তাও নয়। ছায়াপথে সূর্যের চেয়েও বহু গুণ বড় এবং বহু গুণ ছোট নক্ষত্র রয়েছে। ছোট-বড় মাঝারি সবরকম মিলিয়ে আমাদের ছায়াপথে ১৫ হাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র আছে এবং সেগুলির মধ্যে কয়েক শো' কোটির গ্রহ-উপগ্রহ আছে।

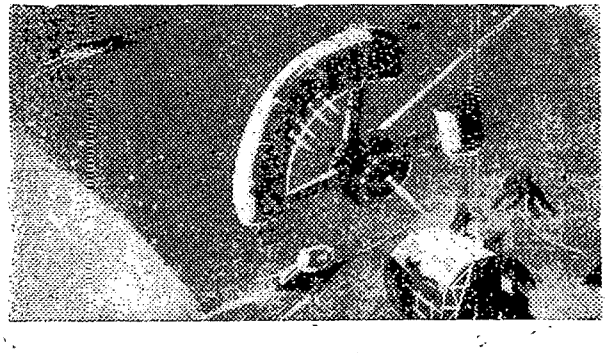

● ভবিষ্যতের মহাশূন্য পোত ও মহাজাগতিক স্টেশন

● ভবিষ্যতের গ্রহান্তর-যাত্রী

নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা ৩ হাজার থেকে ৭০ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। ৭-৭½ হাজার ডিগ্রীর কাছাকাছি যে সব তারার উত্তাপ, সেগুলির আহ্নিক-আবর্তনের বেগ অন্যগুলির তুলনায় অনেক কম। কারণ সেগুলির নিজস্ব গ্রহ-পরিবারের বার্ষিক-গতি মূল নক্ষত্রের আহ্নিক-গতি ব্যাহত করে।

গ্রহবিশেষে প্রাণের উদ্ভবের কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে। প্রথমত সেই গ্রহে তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাত্রা সীমায়িত হওয়া

দরকার। অত্যধিক বা অত্যল্প তাপে প্রাণের মূলবস্তু প্রোটিন ভেঙে যায়। জীবনের জন্য চাই আবহমণ্ডল। আবহমণ্ডল না থাকলে জীব শুধু যে অক্সিজেন পাবে না তাই নয়, ঠাণ্ডা এবং গরম দুই-ই হবে জীবের পক্ষে সহ্যাতীত।

বুধের মত ছোট্ট গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ এত দুর্বল যে, তার আবহমণ্ডল ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। তেমনি কোন গ্রহে মাধ্যাকর্ষণের মান যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি হয়, সেখানে আবহমণ্ডলে শুধু যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প থাকবে তা নয়, সেই সঙ্গে প্রচুর হাইড্রোজেন থেকে যাবে যা মেথেন ও অ্যামোনিয়া তৈরি করে জীবের বাঁচা অসম্ভব করে তুলবে।

সুসংগঠিত জৈব-জগতের অভ্যুদয় হতে কোটি কোটি বছর সময় লাগে। সুতরাং যে সব গ্রহ বহু প্রাচীন নক্ষত্রের চারিদিকে যুগযুগান্ত ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল সেইগুলিতেই বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোটি কোটি বছর ধরে সেই নক্ষত্রের জ্যোতি যদি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ থাকে —তবেই তার গ্রহে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব। সূর্য-গোত্রীয় নক্ষত্রগুলিতে এই পূর্বশর্তগুলি বজায় আছে। মহাবিশ্বে বহু যুগ্ম তারা আছে। সেইসব তারা গ্রহগুলির কক্ষ চক্রাকার নয় বলে সেগুলিতে তাপমাত্রার প্রচণ্ড তারতম্য হয়—যা প্রাণীর অস্তিত্বের অনুকূল নয়।

এইসব দিক বিচার-বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, আমাদের ছায়াপথে প্রায় শতকোটি গ্রহে সুসংগঠিত জৈব-জগৎ থাকা সম্ভব, যেখানে বুদ্ধিমান জীবের আবির্ভাব হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সেগুলির কোন-কোনটিতে সভ্যতার জীবনের মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে আবার কোন কোনটিতে সভ্যতার বিকাশ এখনো বাকি। কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী, অজর-অমর নয়। এক-একটি সভ্যতার মেয়াদ যদি কয়েক কোটি বছর ধরা যায়, তা হলে ছায়াপথে সম্ভবত বুদ্ধিমান জীববিশিষ্ট গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটির মত। যদি তাই হয় তা হলে পৃথিবী থেকে ১০০ আলোক-বৎসর দূরত্বের মধ্যে ঐরকম গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ থেকে ১০।

সর্ব্বাধুনিক ও বাজারের সেরা, মনোজ্ঞ সাজে সজ্জিত আর, ই, সি, রেডিও পূজায় উপহার দিয়ে সমস্ত পরিবারকে আনন্দমুখর করে তুলুন।

সুরের ও সঙ্গীতের ঝঙ্কারে আপনার ঘর আনন্দমুখর করে তুলবে রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং আর ই সি রেডিও...

আর ই সি-র একটি রেডিও আপনার ঘরে রাখুন, আপনার এক-ঘেয়ে ঘরোয়া পরিবেশ এক মুহূর্ত্তে সুর ও লহরীতে মাধুর্য্যময় করে তুলবে...

'আর ই সি' মডেলগুলি একান্ত নির্ভরশীল ও শক্তিশালী... পৃথিবীর সব ষ্টেশনই মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে...

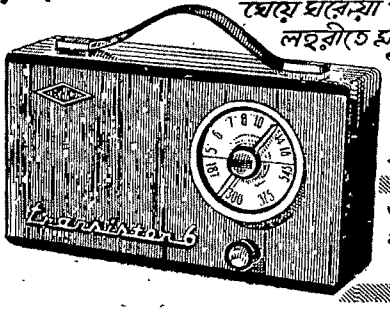

৬ ট্রানজিসটরস মিডিয়াম ওয়েভ
মডেল-৬টি৪ মূল্য-১৬৫ টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

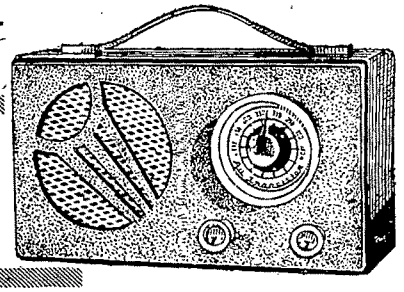

৫ ট্রানজিসটরস এম,ডব্লু
মডেল-৫টিপি২
মূল্য - ৯২৫ টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

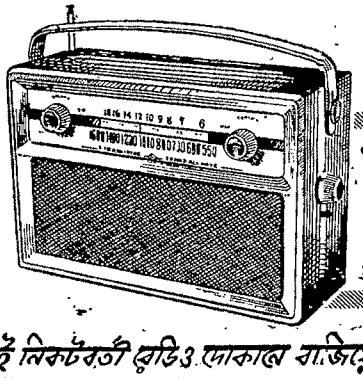

৭ ট্রানজিসটরস ২ ব্যাণ্ড
মডেল-৭টি এস৩
মূল্য - ৩০০ টাকা
শুল্ক কর-২৮ টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

আজই নিকটবর্তী রেডিও দোকানে বাজিয়ে শোনাতে বলুন...

রেডিও ইকুইপমেন্ট কোং : কলিকাতা -১৩-
ফোন : ২৩-৯৮৮৮

জীবনের সাধনা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক কনিংহাম পাগলের মতো চীৎকার করতে করতে ল্যাবরেটরীতে এসে ঢুকলেন।

তোমরা করছো কি বসে বসে?—যাও, শীগগির যাও, দেখে এসো ডক্টর কখ কি দেখাচ্ছেন! অবিশ্বাস্য,—স্বর্গীয় আবিষ্কার! যাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছো কি?—

অধ্যাপক কনিংহাম স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তাই তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে ছাত্রেরা প্রথমে সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলো। কেইবা ডক্টর কখ আর কিইবা তাঁর আবিষ্কার, যা জর্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে এমন উত্তেজিত করতে পারে! অধ্যাপক কনিংহাম ততক্ষণে মুখ ঢেকে একটি আরাম-কেদারাতে আশ্রয় নিয়েছেন, বোধ হয় ডক্টর কখের অতুলনীয় প্রদর্শনের চিন্তায় মগ্ন।

ভালো ছাত্র বলে পল এলরিখের যথেষ্ট সুনাম আছে, সে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—হের প্রফেসর—।

প্রশ্ন নয়। যাও নিজে গিয়ে দেখে এসে জীবন ধন্য করো। অধ্যাপক নিজেই আবার ছুটে চলেন লেকচার রুমের দিকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছাত্ররাও তাঁকে অনুসরণ করেন।

কে ডক্টর কখ, আর কিইবা তাঁর আবিষ্কার? শুধু অধ্যাপক কোহনের ল্যাবরেটরীতেই নয়, এই একই জিজ্ঞাসা সেই সময় সারা ইউরোপের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছিলো।

বিজ্ঞানীমহল এই সর্বপ্রথম জানলেন রবার্ট কখের নাম। জর্মনীর এক গ্রাম্য ডাক্তার—রোগীর দাঁত তুলে আর ছোট ছেলেদের হামজ্বরের চিকিৎসা করেই যাঁর জীবন কাটাবার কথা—তিনিই সর্বপ্রথম জগতকে জানালেন বীজাণুর আক্রমণই রোগের মূল কারণ। কয়েক বছরের সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ যে অচিন্তনীয় সত্য তাঁর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তারই আজ এই প্রদর্শনী—ব্রেসলো শহরে বোটানীর অধ্যাপক কোহনের ল্যাবরেটরীতে।

জর্মনীর বাঘা বাঘা অনেক বিজ্ঞানীই কখের বক্তৃতা শুনতে সভায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই এইরকম এক অসাধারণ আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। অধ্যাপক কোহনের আমন্ত্রণ অস্বীকার না করতে পারাই অনেকের আসার প্রধান কারণ। অধ্যাপক কোহন বয়োবৃদ্ধ এবং সম্মানীয় ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যখন এই সভার আহ্বায়ক তখন ভদ্রতা এবং সামাজিকতা রক্ষার্থেও এতে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। চিকিৎসা-জগতের সেরা গবেষকদের আমন্ত্রণ জানাতে কোহন ভোলেন নি। আমন্ত্রিত অধ্যাপক কনিংহাম তৎকালীন একজন দিকপাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, রোগের কারণ নির্ধারণ এবং নিবৃত্তির চেষ্টাই তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা।

সভায় কখ কথা খুবই কম বলছিলেন, একের পর এক দেখাচ্ছিলেন তাঁর কাজের ধারা—যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে রোগের মূল কারণ। প্রতিটি পরীক্ষার মধ্যে পরিস্ফুট হচ্ছিল এক পরম নিপুণতার ছাপ, কে বলবে হের ডক্টর কখ একজন গ্রাম্য ডাক্তার—আধুনিক গবেষণার কোন শিক্ষাই যিনি পান নি! ফরাসী দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর কিছুদিন আগেই বিবেচনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে ঘোষণা করেছিলেন—জীবাণুরাই রোগের জন্য দায়ী, কিন্তু রবার্ট কখই সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক সত্যের ভিত্তিতে এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

রোগ কেন হয়?—এই প্রশ্ন মানুষ আবহমানকাল ধরে নিজেকে করে আসছে, কিন্তু জবাব তার পায় নি। বিজ্ঞানসম্মত বলে যে চিকিৎসার চলন সেইকালে ছিল, তা হাতুড়ে চিকিৎসারই নামান্তর। জীবাণুর সঙ্গে ডাক্তারদের কোন পরিচয় ছিল না এবং রোগসংক্রমণ কি তা তাঁরা জানতেন না। চিকিৎসকদের জামা-কাপড় ও দেহের মারফতই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়তো সুস্থ মানুষের শরীরে।

রোগের সৃষ্টি করেছেন ভগবান • এবং একমাত্র কেবল তিনিই এর প্রতিকার করতে

সক্ষম। ভগবানের উপর অপার বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছিল আমাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান—মৃত্যুর কারণ ও রোগের নিবৃত্তির সমস্ত তথ্যই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিল সুপ্ত।

ঠিক কি ধরণের চিকিৎসা তখন করা হতো—তার একটা ছোট গল্প আপনাদের বলছি। ব্যাপারটা ঘটেছিলো লুই পাস্তুরের জীবনে, ঘটনাটি পশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত হলেও চিকিৎসা-সঙ্কটের ভয়াবহ রূপের আভাস এতেই উপলব্ধি করা যাবে।

ইউরোপ তখন অ্যানথ্রাক্স রোগের আক্রমণে বিপন্ন। ক্ষেত-খামারে কাজ আর চলে না, একবার রোগের মড়ক লাগলেই মাছির মতো গরু-ভেড়া মারা যেতে আরম্ভ করে। এই অবাধ্য রোগের চিকিৎসা খুবই লাভজনক তাই অনেকেই এর চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

হঠাৎ প্যারিসে খবর এলো ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলের একজন ঘোড়ার ডাক্তার অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসার এক অপূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন,—এতে রোগাক্রান্ত পশুর শতকরা একশটাই নিরাময় লাভ করে। ঘোড়ার ডাক্তারটির নাম হলো লুভ্রিয়ার, তিনি তাঁর এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির সাফল্যের স্বীকৃতির ঘোষণা ফরাসী দেশের বিজ্ঞানী-মহলের কাছে দাবী করলেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব কম নয় তাই লুই পাস্তুরকে পাঠানো হলো পরিদর্শনে। তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানী-মহল স্বীকৃতির কথা বিবেচনা করবেন।

লুভ্রিয়ারের চিকিৎসা-পদ্ধতি পরিদর্শন করতে গিয়ে পাস্তুরের চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! তাঁর হাসপাতালকে পশু-চিকিৎসালয় না বলে চিকিৎসাগার বলা উচিত।

চিকিৎসার প্রথম ধাপ রোগাক্রান্ত পশুটির ডলাই-মলাই। সে এক এলাহি ব্যাপার,—রগড়ানির ঠেলায় বেচারী রোগীর জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আর টান থাকে না। সে সজলচোখে মনে-প্রাণে পরলোকে ভগবানের শ্রীচরণ কামনা করে—অ্যানথ্রাক্স রোগের যন্ত্রণাও বোধ হয় এর থেকে ভালো, রোগীকে গরম করবার জন্যই এই ডলাই-মলাই,—তারপর সুরু হয় চিকিৎসার দ্বিতীয় অধ্যায়। পশুটির দেহ গভীরভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে কেটে তাতে টারপেনটাইন হয় ঢালা, পরে একটি অজানা বস্তু ভিনিগারে ভিজিয়ে বেচারীর চক্ষুরত্ন দু'টি বাদ দিয়ে সারা দেহ ইঞ্চিখানেক পুরু করে মাখিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়।

চমৎকার চিকিৎসা! কোন মানুষের এই রোগ হলে, চিকিৎসার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আগেই সে আত্মহত্যা করবে।

ঘোড়ার ডাক্তার কিন্তু সব যুক্তির বাইরে। কেন যে তিনি এই ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন এবং এর পেছনে কি ধরণের বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা লুকিয়ে আছে তা কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না, যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে গিয়ে পাস্তুর নাজেহাল হয়ে গেলেন। পাস্তুরকে অগত্যা পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হলো। বেশ, চারটে গরুকে এই রোগের বীজাণু ইনজেকসন দেওয়া হোক। তাদের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দু'টিকে কোনরকম চিকিৎসা করা হবে না এবং অপর দু'টিকে এই নবাবিষ্কৃত অপূর্ব চিকিৎসা-পদ্ধতির দ্বারা সম্বর্ধিত করা হবে। দেখা যাক প্রথম প্রাণী দু'টি মারা যায় এবং শেষের দু'টি বাঁচে কি না?

কথামতো হলো কাজ। অনাদৃত গরু দু'টির মধ্যে একটি গেল মারা এবং একটি গেল বেঁচে; চিকিৎসিত গরু দু'টির ফলাফলও একই হলো। তখন পাস্তুর বললেন,—চিকিৎসার প্রয়োজন কি? ফলাফল যখন একই রকম তখন প্রাণীদের উত্ত্যক্ত না করে শান্তিতে মরতে দেওয়াই ভালো।

পাস্তুরের যুগেও যদি চিকিৎসা-পদ্ধতির এই রকম নমুনা হয় তা হলে আরও প্রাচীন কালে এর কি স্বরূপ ছিলো তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। তখনকার ধারণা ছিলো রোগ হলো পাপের শাস্তি,—কর্মফল থেকেই এর উৎপত্তি, সুতরাং এই শাস্তি খণ্ডাবার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই।

প্রাচীন গ্রীস দেশেই বোধ হয় সর্বপ্রথম পাপের দোহাই থেকে রোগকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিলো। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রেটাস রোগের গুরুদায়িত্ব নিরুপায় ভগবানের কাঁধ থেকে নামিয়ে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ ও লক্ষণ বিশ্লেষণ করে তার কারণাকারণ নির্ধারণ এবং তৎসঙ্গে যুক্তিসম্মত নিরাময়কারী ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। হিপোক্রেটাসই লক্ষণ মিলিয়ে বিভিন্ন রোগকে আলাদা করলেন। তাঁর মতে, কতকগুলি লক্ষণের সঙ্গে এক-একটি বিশেষ ধরণের রোগ জড়িত আছে।

হিপোক্রেটাসের প্রায় তিনশ' বছর পরে রোম দেশে আর একজন চিকিৎসা-সম্রাটের আবির্ভাব হলো, নাম তাঁর 'গেলেন'। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে গেলেন অনেক কিছুই লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ ছিল—তিনি পরীক্ষার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। গেলেনের সর্বপ্রথম জেহাদ ঘোষণা করলেন মধ্যযুগের

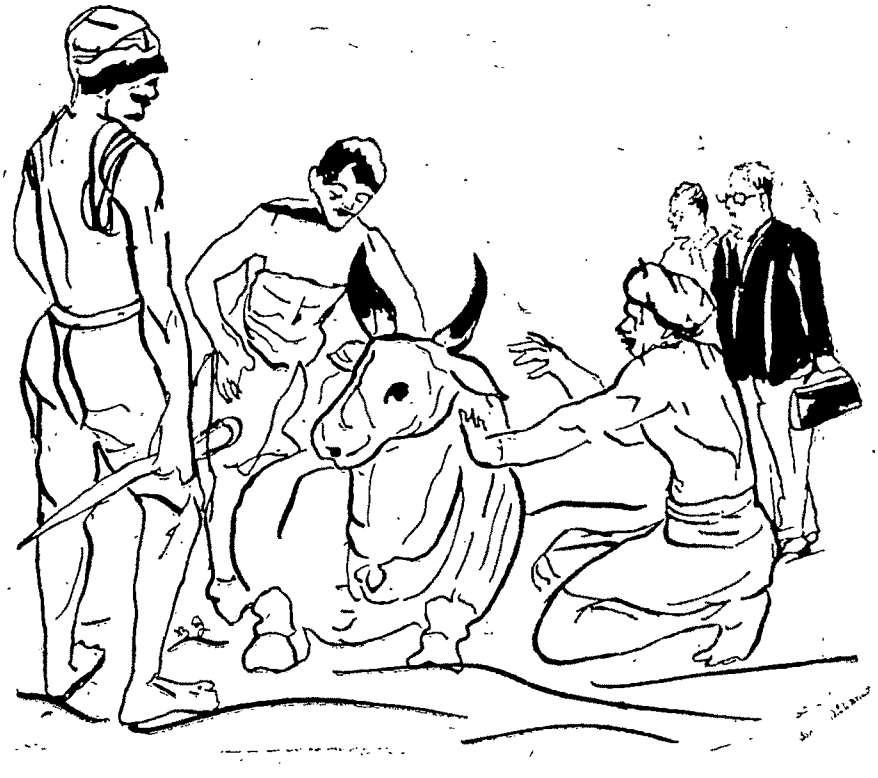

প্যারাসেলসাস। ব্রেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে থাকা-কালীন তিনি ছাত্রদের সমক্ষে এক এক করে গেলেনের সমস্ত রচনাবলী আহুতি দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানের সহায়তায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভিত্তিস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

প্যারাসেলসাস বিশ্বাস করতেন প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসাই আলাদা এবং কেবলমাত্র সেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদ্বারাই কোন বিশেষ রোগ নিরাময় করা সম্ভব। ভেষজ-বিজ্ঞানে পারা, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারের জন্য অনেক ওকালতিই তিনি করেছিলেন, কিন্তু পাঁচজনে তাঁকে শান্তিতে বাস করতে দিল না—নানারকম অভিযোগে উত্যক্ত করে বাধ্য করলো দেশ ছাড়া হতে।

পারা ও অ্যান্টিমনি ঘটনাচক্রেই বলতে পারেন কয়েকক্ষেত্রে রোগ সারাবার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়াতে চিকিৎসকেরা সর্বক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে পারা ও অ্যান্টিমনি প্রয়োগ করতে সুরু করলেন। বেশি পারা ব্যবহার করার ফলে রোগীদের দাঁত পড়ে যেতে লাগলো, সারা গায়ে বের হলো ঘা! অ্যান্টিমনি ব্যবহারে রোগ সারার চেয়ে অনেক বেশি রোগী মারা যেতে আরম্ভ করলো। মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা চলে না তাই ওষুধ হিসাবে অ্যান্টিমনির ব্যবহার রোধ করার জন্য অনেকেই উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

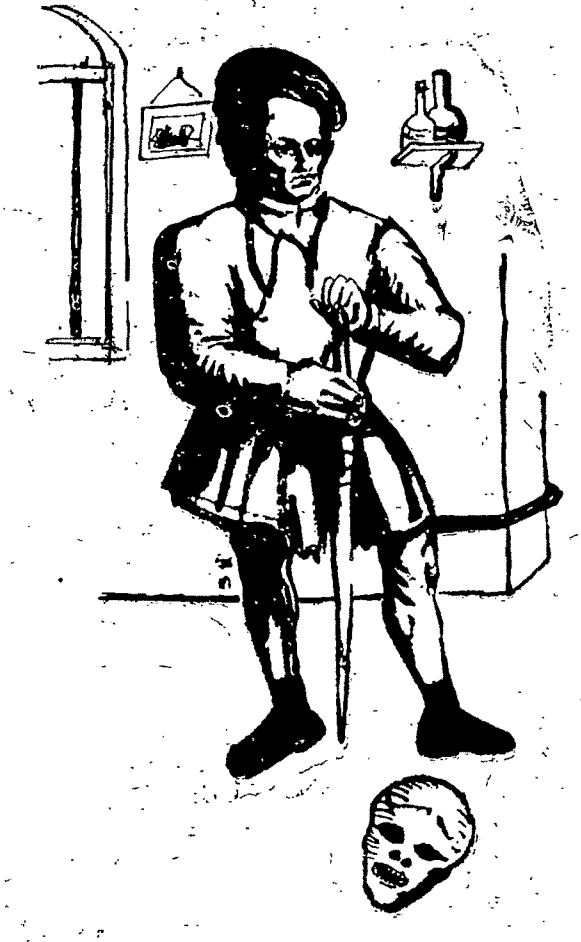

অ্যান্টিমনির ব্যবহার বোধ হয় এইবারই শেষ হলো, কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? ফ্রান্সের প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট চতুর্দশ লুই পড়লেন টাইফয়েড রোগে। প্রাণ বোধ হয় আর বাঁচে না, প্রায় দু' সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকার পরে জনৈক চিকিৎসক রাজার প্রাণরক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে প্রথমেই লাগালেন একডোজ অ্যান্টিমনি।

রাজপরিবার প্রথমে একটু আপত্তি জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু প্রাণ যখন এমনিতেই যাচ্ছে তখন অ্যান্টিমনি দিয়ে একবার চেষ্টা করতে আপত্তি কি? আর রোগ সারাবার গ্যারান্টি তো চিকিৎসক নিজেই দিয়েছেন, রাজা মারা গেলে তাঁর মাথা কি আর ঘাড়ের উপর থাকবে?

অ্যান্টিমনির উপর ভগবানের অসীম দয়া তাই ঐ এক ওষুধেই রাজা সাবুদানা পথ্য করলেন।

চিকিৎসকের ঘাড় বাঁচলো—অ্যান্টিমনির বাঁচলো মান-মর্যাদা। বিদ্রোহীরা সবাই নিরস্ত হলেন প্রাণের দায়ে, স্বয়ং সম্রাটকে প্রাণদান করেছে যে ওষুধ, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সাধ্য কার? অতএব অ্যান্টিমনির ব্যবহার আবার আরম্ভ হলো সর্বত্রটে!

ঠিক এই রকম এক চিকিৎসায় নেপোলিয়ন একবার কিন্তু বেজায় জব্দ হয়েছিলেন। বেচারা ভদ্রলোক তখন সেণ্ট হেলেনাতে বন্দী—এমন দিনে হলো তাঁর পাকস্থলীর অসুখ। চিকিৎসক মহাশয় বন্দী সম্রাটকে বহু একডোজ টারটার এমিটিক খাইয়ে দিলেন। টারটার এমিটিক একপ্রকার অ্যান্টিমনি-ঘটিত পদার্থ।

ব্যাস! এরপর সম্রাটের প্রাণ যায় আর কি। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন যন্ত্রণায় একেবারে নাজেহাল,—ওয়াটার্লুর পরাজয়ও বোধ হয় এর চেয়ে তাঁর কাছে আরামদায়ক মনে হয়েছিলো, সম্রাটের যন্ত্রণা দেখে করুণায় বিগলিত হয়ে চিকিৎসক মহাশয় আর এক গেলাস টারটার এমিটিক লেবুর রসে ভিজিয়ে এনে পান করতে অনুরোধ জানালেন। নেপোলিয়ন আরও বেশ কয়েকমাস বেঁচে ছিলেন এবং রোগের যন্ত্রণাও অবশিষ্ট জীবনে যথেষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু আর ঐ চিকিৎসকের মুখদর্শন করেন নি।

শবচ্ছেদ মহাপাপ, কিন্তু শরীরতত্ত্বে সামান্য জ্ঞান না থাকলে চিকিৎসা-বিদ্যা বান-চাল হবার জোগাড় হয় তাই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গেলেন শুয়োর আর বানর কেটে মানুষের শরীরের এক কাল্পনিক রূপ খাড়া করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষের হাড়ের কাঠামো শুয়োর অথবা বানরের কাঠামোর অনুরূপ। গুণীবাক্য বেদবাক্য,—এর অন্যথা হতে পারে না। গেলেনের কয়েক শতাব্দী পরও চিকিৎসকেরা এই একই গেলেন-অর্জিত বিদ্যা ছাত্রদের কাছে বিতরণ করেছেন—নির্দ্বিধায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসেলিয়াস সর্বপ্রথম জানালেন,—গেলেন যা বলেছেন তা ভুল, মানুষের পাছার হাড়ের কাঠামো একদম অন্যরকম।

প্রাচীনপন্থীদের চোখ কপালে উঠলো! —কি সর্বনাশ! দু'টো মড়া কেটে অর্বাচীনের এতো সাহস হয়েছে যে সর্বকালের চিকিৎসা-সম্রাট গেলেনের অপমান করে!

কিন্তু ভেসেলিয়াসের মতামত অস্বীকার করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এ যে হাতেনাতে প্রমাণ, শবচ্ছেদ পরীক্ষার কঠিন সত্য। অগত্যা বিদ্যাভিমানীরা চিকিৎসা-সম্রাটের মান বাঁচাবার জন্য প্রচার করলেন,—গেলেন ভুল বলেন নি। আঁট প্যাণ্টলুন পরে মানুষের পাছার হাড়ের কাঠামো বর্তমানকালে বদলে গিয়েছে।

চমৎকার যুক্তি! শ্যামও থাকলো কুলও থাকলো।—

শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শরীর-সংস্থান বিদ্যার পথপ্রদর্শক হলেন ভেসেলিয়াস। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভেসেলিয়াস শরীর-তত্ত্ব বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশ করে শরীর-সংস্থান বিদ্যাকে পরীক্ষামূলক-বিজ্ঞান-রূপে স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। তৎকালের আর একজন দিকপাল শল্যচিকিৎসক ছিলেন পেরা।

ফরাসী সম্রাট দ্বিতীয় হেনরী মৃত্যু-শয্যায়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী কাউণ্ট

মণ্টগোমারীর বর্শার টুকরো তাঁর মাথার খুলি ভেদ করেছে, অতএব অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপের দিকপাল শল্যচিকিৎসকেরা এসে সমবেত হলেন প্যারিস শহরে,—এখানেই দেখা হল ভেসেলিয়াস ও পেরার।

ইতিমধ্যে রাজার মাথার আঘাত বীজাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছে এবং বর্শার টুকরোর অবস্থিতিও অজানা, সুতরাং চিকিৎসা হবে কি করে? তখন তো আর রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার হয় নি।

অগত্যা পেরা ও ভেসেলিয়াস মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর মাথার খুলিতে বর্শার দ্বারা আঘাত করে বর্শার টুকরোর গতিপথ অনুমান করার জন্য অনেক পরীক্ষা করলেন; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ফললাভ করা সম্ভব হলো না,—একাদশ দিনে সম্রাট দেহত্যাগ করলেন।

এই ঘটনাটি অসাফল্যের পরিচয় দিলেও দেহমধ্যস্থ কোন কিছুর অবস্থিতি নির্ণয়ে পেরার অস্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। নেভারার রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের গুলীতে আহত হয়েছেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য পেরাকে আহ্বান করলেন রাজার অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রিন্স রসুরণ। গুলীটা যে ঠিক কোথায় গিয়ে বিঁধেছে তা কোন শল্যচিকিৎসকই স্থির করতে পারছিলেন না। পেরাই এসে জানালেন গুলীটি কাঁধের হাড়ের গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

অঙ্গের সংযোগস্থলে বীজাণুর সংক্রমণ অত্যন্ত সত্বর এবং মারাত্মক; তাই এ ধরণের আঘাত নিরাময় করা তখন শিবেরও অসাধ্য। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাজাকে বাঁচানো গেলো না, মৃত্যুর পর কেটে দেখা গেলো গুলীটি ঠিক পেরার কথামতোই কাঁধের হাড়ের গর্তের মধ্যে রয়েছে।

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসকদের বরাত কোন সময়েই খুব ভাল যায় নি। প্রাচীন ব্যাবিলনে নিয়ম ছিল—শল্যচিকিৎসকেরা যদি কোন রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তার মৃত্যুর কারণ হতেন, তা হলে তাঁদের কনুই থেকে হাত কেটে বাদ দেওয়া হতো। জনৈক ডিউক তাঁর মৃতা স্ত্রীর চিকিৎসকদ্বয়কে ফাঁসী দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশেই। ফ্লোরেন্সের একজন শল্যচিকিৎসক কোন রোগের চিকিৎসায় সাফল্যলাভ করতে না পারার দরুণ মহামান্য পোপ দ্বাদশ জন তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। ১৩৩৭ সালে একজন শল্যচিকিৎসক বোহেমিয়ার জনকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত না করতে পারার দরুণ ওডার নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

যাই হোক যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বুঝতে পারলেন শল্য-চিকিৎসার শিক্ষা ও অগ্রগতির জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ অপরিহার্য। কিন্তু এতো মৃতদেহ পাওয়া যায় কোথায়? সাধারণ লোকের বিশ্বাস শব-ব্যবচ্ছেদ মানুষের আত্মার পরম অপমান, তাই রাস্তার ভিখারীদের মৃতদেহও শব-ব্যবচ্ছেদাগারে নিয়ে যাবার আগেই চাঁদা তুলে সৎকারের ব্যবস্থা করা হতো। একমাত্র ভরসা আসামীদের মৃতদেহ, কিন্তু রোজ মৃত আসামীই বা কোন দেশে পাওয়া যায়।

মৃতদেহের অতিরিক্ত প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে অনেকেই এক নতুন লাভজনক ব্যবসা সুরু করলেন। কবর খুঁড়ে তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে এনে চিকিৎসকদের কাছে বিক্রয় করেন,—আইন এঁদের তখন কেশস্পর্শ করতে পারতো না, কারণ মৃতদেহ কারুর সম্পত্তি নয়। দেহের সঙ্গে কবরের মধ্যে অন্য যা জিনিসপত্র থাকতো, তা তাঁরা সযত্নে স্বস্থানে রেখে আসতেন। মৃতদেহ নিয়ে যাও আইন তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু কবরের মধ্যে অন্য কিছু ছুঁলেই চুরির দায়ে পড়বে!

অনেকে আবার খুন করেও মৃতদেহ সরবরাহ করতে আরম্ভ করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা খুনের লাস জেনেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই সব মৃতদেহ কিনতেন এবং মৃতদেহ অনুসারে এখনকার দিনের হিসাবে এক একটির দাম দিতেন একশ' থেকে দেড়শ' টাকা।

এইকালে চিকিৎসকদের শব-ব্যবচ্ছেদের সময়ে জনসাধারণের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামায় বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। ১৭৮৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে এইরূপ একটি বিরাট দাঙ্গাহাঙ্গামার হদিস পাওয়া যায়।

নিউইয়র্কের হসপিটাল সোসাইটীর গবেষণাগারে ডাঃ রিচার্ড বেইল শব-ব্যবচ্ছেদের কাজ করছেন, এমন সময় জানালা দিয়ে একটি ছোট ছেলে উঁকি মারলো। হঠাৎ কি ভেবে ডাক্তার সাহেব মৃতদেহের একটি হাত তুলে ছেলেটিকে ভয় দেখালেন। উদ্দেশ্য ক'জের সময় যাতে সে আর গোলমাল না করে।

ঘটনাটি এইখানেই শেষ হবার কথা, কিন্তু তা হয় নি। ছেলেটি ভয় পেয়ে বাইরে পালিয়ে এসে লোকজনদের কি বলেছিল তা ভগবানই জানেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটি জনসমুদ্র হাসপাতাল আক্রমণ করেছে!

[১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অনীতা আড়চোখে একবার চেয়ে দেখল। ভিড়ের চাপে ভদ্রলোক প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ছে। অবশ্য ভদ্রলোকের কোন দোষ নেই। সাড়ে চারটা থেকেই এই অবস্থা। বাড়ি ফেরার সংগ্রাম শুরু হয়। সূচ্যগ্র মেদিনীর জন্য কুরুক্ষেত্র হয়েছিল, আজকের যুদ্ধ তার চেয়েও কম নয়। অন্তত এর পরমায়ু অষ্টাদশ দিবস নয়, আজীবন।

একটু পরে শাড়িটা গুটিয়ে নিয়ে অনীতা বলল, বসুন।

ভদ্রলোক বোধ হয় শুনতে পায় নি। তার হাবভাব দেখে তাই মনে হল। স্থূলকায় আর একটি বপুর ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল। তা ছাড়া ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি তো ছিলই।

অনীতা গলাটা একটু চড়িয়ে বলল, আপনি বসতে পারেন।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বসল। মনে হ'ল এই কথামৃতর অপেক্ষাতেই যেন ছিল।

অনীতা অনেকটা সরে এসেছিল, কিন্তু তার মনে হ'ল এতটার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভদ্রলোক দু'জনের মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বসেছে।

ট্রাম একটু এগোতেই অনীতা হাতের বইটা খুলল। ক'দিন ধরে বইটা সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু একটি লাইনও পড়া হচ্ছে না। দু'বেলাই কোন-না-কোন পরিচিতা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় যাত্রাপথ ফুরিয়ে যাচ্ছে। বই খোলার অবকাশই পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ লেডিজ সীট প্রায় খালি। একেবারে ওদিকে একজন মাদ্রাজী মেয়ে উল নিয়ে বুনছে। আর এদিকে অনীতা।

বেশি নয়, একটা পাতা পুরোও নয়। একটু পরেই অনীতা বইয়ের পাতার দিকে চোখ রেখে যেন বুঝতে পারল পাশের ভদ্রলোকটি নির্নিমেষনেত্রে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। এও নতুন কিছু নয়। অফিসে চাকরি করছে অনীতা আজ প্রায় ছ-সাত বছর। যাতায়াত ট্রামে-বাসে। পুরুষমানুষের ব্যূহভেদ করে। অভব্য চাউনি, অশালীন ব্যবহারের মুখোমুখি অনীতাকে বহুবার দাঁড়াতে হয়েছে।

বিশ্রী একটা অস্বস্তি। প্রত্যেক স্টপেজে অনীতা মুখ বের করে দেখল, যদি কোন মেয়ে ওঠে। তা হলে অনীতা নিষ্কৃতি পাবে। ভদ্রলোককে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু অনীতার বরাত। স্টপেজে দু-একজন মহিলা ছিল বটে, কিন্তু তারা ট্রামের দ্বারপথে অভেদ্য ভিড় ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করল না। ভদ্রলোকের দৃষ্টি পলকহীন।

ইতর কোথাকার। অনীতা মনে মনে বলল। বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মনে হল, ভদ্রলোক যেন দৃষ্টি দিয়ে অনীতার অনাবৃত দেহাংশটুকু স্পর্শ করছে।

বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়েই অনীতা আরক্তিম হয়ে উঠল। এ কি করেছে সে? কাকে পাশে বসতে আহ্বান করেছে! যাকে নিজের পাশ থেকে একদিন তীব্র ঘৃণা আর উপেক্ষায় সরিয়ে দিয়েছিল, তাকেই এভাবে পাশে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে!

দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় সুদেবও তাকে চিনতে পেরেছে। অবশ্য এত কাছে বসে চিনতে না পারাটাই আশ্চর্য।

মনে মনে অনীতা একবার হিসাব করে নিল। সুদেব বাইরে ছিল। এলাহাবাদ না কানপুর কোথায়। সেই ব্যাপারের পরে নিজে ইচ্ছা করেই কলকাতা ছেড়েছিল, যাতে অনীতার সঙ্গে আর পথেঘাটে দেখাসাক্ষাৎ না হয়। সুদেবের বাইরে যাবার খবর অনীতা পেয়েছিল। সেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নিঝঞ্ঝাট।

সুদেব যদি কলকাতায় থাকত, তা হ'লে সত্যিই অনীতা ভারি মুস্কিলে পড়ত। দু'জনের যাতায়াতের পথ এক। জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া মানুষটার সঙ্গে অনবরত দেখা হওয়া অনীতার অভিপ্রেত ছিল না। নিজে না হয় মুখ ফিরিয়ে থাকত, কিন্তু বান্ধবীদের কৌতূহল মেটাত কি করে।

অনীতা আর সুদেবের ঘনিষ্ঠ হওয়ার খবরও যেমন বান্ধবীদের জানা, তেমনি দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবার সংবাদও তারা শুনেছিল। অনেকে উৎসাহিত করেছিল অনীতাকে এই বাঁধন ছেঁড়ার ব্যাপারে, দু-একজন উত্তেজিতও। অবশ্য কেউ কেউ মিটিয়ে ফেলতেও বলেছিল। পুরুষমানুষের সব দোষ-ত্রুটি ধরলে কোন স্ত্রীই সুখী হ'তে পারে না। একচক্ষু হরিণের মতন একটা চোখ নারীকে বন্ধই রাখতে হয়।

অবশ্য অনীতাও রেখেছিল।

সুদেব রেসে যায়, এ খবরটা জানতে পারার কয়েক দিন পর্যন্ত অনীতা বেশ একটু অস্বস্তিতে কাটিয়েছিল। সুদেব ঘুমালে

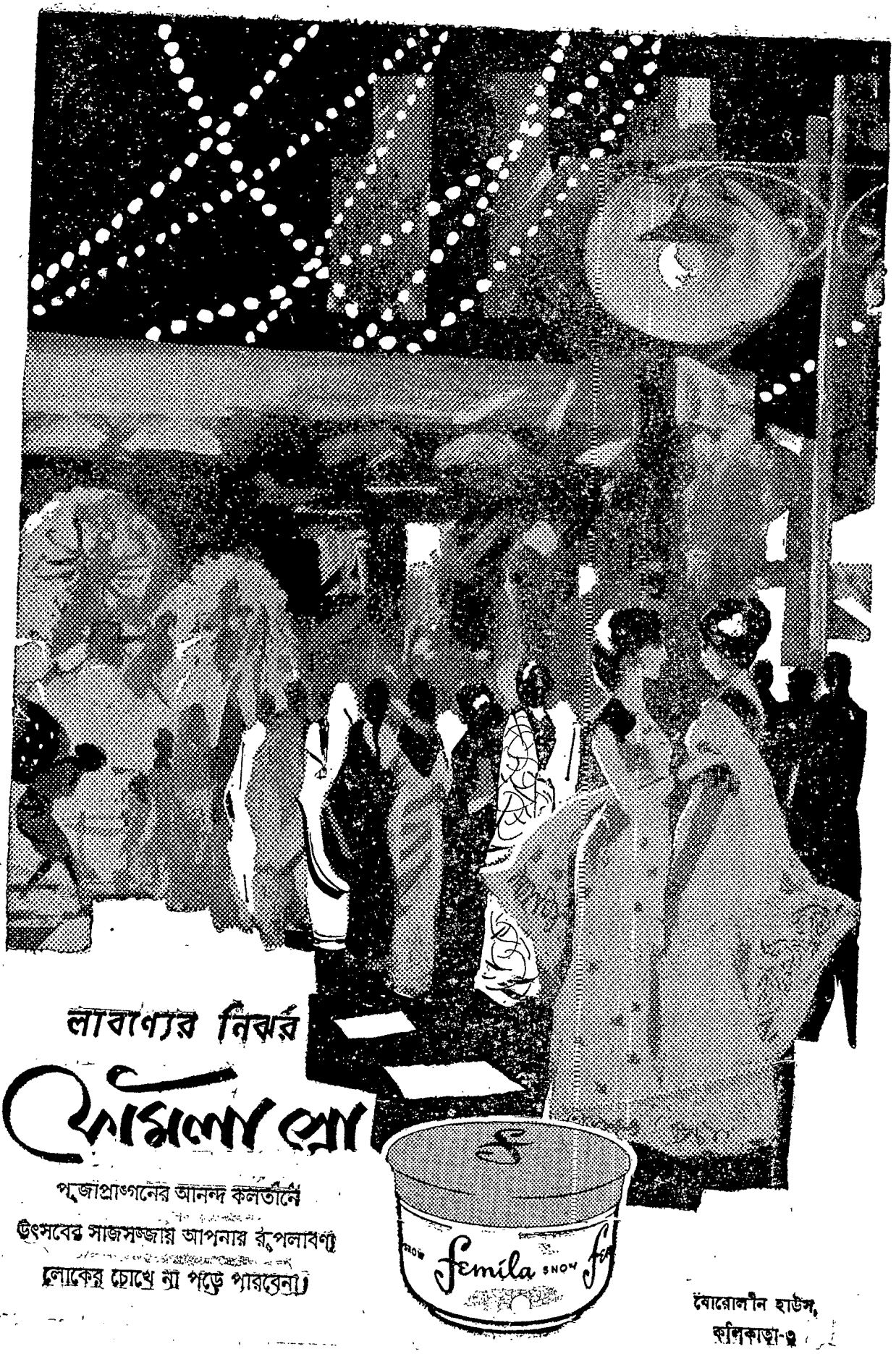

লাবণ্যের নির্ঝর

ফেমিলা স্নো

পূজাপ্রাঙ্গনের আনন্দ কলতানে
উৎসবের সাজসজ্জায় আপনার রূপলাবণ্য
লোকের চোখে না পড়ে পারবেনা।

বোরোলীন হাউস,
কলিকাতা-৩

বালিশে মুখ গুঁজে অনেক রাত কেঁদেও ছিল, তারপর একদিন চোখ মুছে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।

অনীতার মনে রেসখেলা সম্বন্ধে একটা দারুণ ভীতি ছিল, এ ভীতিটা যে একেবারে অকারণ তা নয়, তবে কিছুদিন পরেই তার মনে হয়েছিল ভয়ের যে বীভৎস ছবিটা সে এঁকেছিল, তাতে রং একটু বেশিই দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে সব সময়ে ব্যাপারটা অমন পরিণাম-ভয়াবহ হয় না।

অনীতার ধারণা, সুদেব আর তার মাইনের টাকা, অনীতার অলঙ্কার, একটু একটু করে বাড়িতে বিক্রয়যোগ্য যা কিছু সম্পত্তি আছে সব তলিয়ে যাবে অশ্বিনীকুমারদের পায়ের তলায়। দু'জনে একেবারে পথে দাঁড়াবে। সর্বহারা, নিঃসম্বল।

কিন্তু সুদেব অত বেহিসেবী নয়। পরিমিত অঙ্কের বাইরে সে কোনদিনই যায় না। কোনদিন জেতে, কোনদিন হারে। তাতে তার উল্লাস বা বিষাদ কোনটাই প্রকট হয় না।

রেসের আনুষঙ্গিক আর একটি রোগও যে সুদেবের ছিল সেটাও বিয়ের ক'মাস পরেই অনীতা জানতে পারল।

একরাতে সুদেব বাড়ি ঢুকতেই অনীতার কেমন সন্দেহ হ'ল। লোকটা ঠিক তালে যেন পা ফেলছে না। দু-একবার দেয়াল ধরে টাল-সামলাল।

কি গো শরীর খারাপ নাকি? অনীতা উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল।

না, ঠিকই তো আছি। কথার সঙ্গে সঙ্গে সুদেব হাত বাড়িয়ে টেবিলটা ধরল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অনীতার নাকে তীব্র একটা গন্ধ গেল। এ গন্ধের জাত তার একেবারে অচেনা নয়।

অনীতার দু'টি ভ্রূ ধনুকের মতন বেঁকে গেল। কঠিন হ'ল মুখের রেখা। বলবে ন বলবে না করে বলেই ফেলল।

তুমি ড্রিঙ্ক করেছ?

এই এতটুকু। আঙুল উঁচু করে সুদেব পানীয়ের পরিমাণ দেখাল, তারপর চেয়ারের ওপর বসে বলল, এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে খেতে হয়েছিল।

ব্যস, অনীতা একটি কথাও বলল না। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় শিকল তুলে দিল। মানুষটা কি খাবে, কোথায় শোবে সে কথা একবার চিন্তাও করল না।

পরের দিন ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দেখল, সুদেব অফিসের জামা-কাপড় পরেই ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা। একটা হাত ঝুলে পড়েছে।

রান্নাঘরে খাবার তেমনই পড়ে আছে। অবশ্য সুদেব রান্নাঘরে ঢুকে নিজের খাবার গুছিয়ে নেবে, এ আশা করাই অন্যায়। জলের গ্লাস পর্যন্ত যে মানুষকে মুখের কাছে তুলে ধরতে হয়, তার পক্ষে এমন কাজ করাও সম্ভব নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনীতার দু'টো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিয়ে হয়েছে বছর খানেকের ওপর। কোনদিন সুদেব এমন বেসামাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে নি। একদিন যদি বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে একটু অনিয়মই করে থাকে, তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি।

আগের রাত্রে অনীতা একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। এতটা নাটকীয়তার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে অনীতা একটা হাত রাখল সুদেবের কপালে। রাখামাত্রই সুদেব চমকে চোখ চাইল।

যাও, স্নান সেরে এস, আমি চা নিয়ে আসছি।

একটি কথাও না বলে সুবোধ ছেলের মতন সুদেব স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

সুদেব বাইরে আসতে অনীতা চায়ের কাপ সামনে ধরেছিল। শুধু চা নয়, পাঁউরুটির স্লাইস, ডিম আর কলা।

সুদেব খেতে খেতে একবার মুখ তুলতেই অনীতা বলল, শরীর যদি খারাপ লাগছে মনে হয় তো, নাই গেলে আজ অফিসে।

সুদেব একটু বিব্রত হ'ল। শরীর খারাপের উল্লেখের মধ্যে গত রাত্রের ইতিহাসের বেদনাটুকু লুকানো রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, না, শরীর ঠিক আছে। অফিসে যেতেই হবে। জরুরী কাজ রয়েছে।

সুদেব অফিস যাবার আগে পর্যন্ত আর কোন কথা হ'ল না। কেবল সে চৌকাঠের ওপারে পা দিতে অনীতা খুব মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে এস।

সুদেব চমকে উঠে মুখটা একবার তুলেছিল। দু'টি চোখের তারায় বিস্ময় আর বেদনার মিশেল। একটি কথাও না বলে ঘাড় হেঁট করে দ্রুতপায়ে নেমে গিয়েছিল।

অনীত অনেকটা স্বচ্ছন্দবোধ করল। সুদেব যদি তর্ক করত, আগের রাতের

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
স্থাপিত ১৮৬২
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার, কলিকাতা-৭

শারদীয় অভিনন্দন—
ব্যানার্জী এণ্ড কোং
কোয়ালিটি প্রিণ্টার্স এবং ষ্টেশনার্স
৬/২-বি, বলরাম বোস ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা—২০
ফোন ঃ ৪৭৪৪০২
"নিখুঁত কাজ ও সময়মত সরবরাহ"—আমাদের বৈশিষ্ট্য

ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তির জাল বোনার চেষ্টা কিংবা অযথা রাগারাগি তা হলে অনীতারও মেজাজ খারাপ হ'ত। সে-ও চেঁচাত, গরম গরম কথা বলত, শেষকালে হয় তো কাঁদত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এই যে সুদেবের সব মেনে নেওয়া ভাব, অন্যায়কে স্বীকার করা, এটাই অনীতার খুব ভাল লাগল। বরং নিজে যে একটু চেঁচামেচি করেছে, তার জন্যই বেশ অনুশোচনা হ'ল।

মাসকয়েক নির্বিবাদে কাটল। মসৃণ পথে সংসারের চাকা বাধাহীনভাবে গড়িয়ে চলল। বিয়ের বার্ষিকী স্মরণ করে সুদেব মাঝারি দামের একটা শাড়িও নিয়ে এল।

অনীতা আপত্তি করেছে, এ কি, আমার জন্য শাড়ি আনবার কি দরকার ছিল? আমি বুঝি চাকরি করি না? কথা ছিল না আমার ভরণপোষণ আমি চালাব?

ঠিক এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি অনীতা প্রাক-বিবাহিত জীবনে দিয়েছিল কি না সুদেবের মনে পড়ল না। তবে এটা তার মনে আছে, অনীতা বলেছিল, বিয়ের পরও সে চাকরি করবে—কারণ আজকাল শুধু একটা দাঁড়ে সংসারের পানসী তর তর করে চলে না।

সুদেব বলেছিল, তথাস্তু।

বেশ তো তোমার মাইনের টাকা দিয়ে আমার না হয় কিছু কিনে দিও। সুদেব হাসতে হাসতে বলেছিল।

পরের দিনই অনীতা সুদেবের জন্য প্যান্টের কাপড় নিয়ে এসেছিল।

হাত পেতে সে দান গ্রহণ করতে করতে সুদেব বলেছিল, আর কয়েকদিন অপেক্ষা করলেই পারতে নীতা, এ-যেন সঙ্গে সঙ্গে ফেরত হয়ে গেল।

কিন্তু নীলাকাশে একদিন মেঘ দেখা দিল। সংশয়ের কালো মেঘ। টিফিনের সময় অনীতাকে কথাটা প্রণতি বলল।

এই, কাল তোর কর্তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

ফাইলগুলো সরিয়ে নিজের চায়ের কাপ রাখার জায়গা করতে করতে অনীতা নিস্পৃহ-কণ্ঠে উত্তর দিল, কোথায়?

এলিটে।

অনীতা দু'টো ভ্রূর মাঝখানে চুলসরু খাঁজ ফেলল। মনে মনে বিড় বিড় করল। এলিট? কাল সুদেব একটু রাতেই ফিরেছে। বলে গিয়েছিল খিদিরপুরে এক সহকর্মীর বাড়ি নিমন্ত্রণ। ছেলে না মেয়ের জন্মদিন। উপহার কি দেওয়া যায় এই নিয়েও খাবার টেবিলে বসে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয়েছিল।

প্রণতির তারপরের কথাতেই অনীতা চমকে উঠল। বেয়ারার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখছিল, হাতটা কেঁপে উঠে খানিকটা গরম চা হাতের ওপর ছিটকে পড়ল।

সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখলাম। তোদের আত্মীয়া বুঝি?

কাপটা টেবিলের ওপর রেখে শাড়ির আঁচল দিয়ে অনীতা ততক্ষণে নিজের হাতটা চেপে ধরেছে।

ইস দেখি, প্রণতি আঁচল সরিয়ে হাতটা দেখল, অনেকটা জায়গা লাল হয়ে উঠেছে।

দাঁড়া বোরোলিন দিয়ে দিই। খুব ব্যথা হবে।

হাত নেড়ে অনীতা প্রণতিকে বারণ করল। মনে মনে ভাবল, বোরোলিন তো শুধু ওইটুকু জায়গাতে দিলেই হবে না। শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী অসহ্য বেদনায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কি করবে অনীতা! একটার পর একটা এভাবে আঘাত কি করে সহ্য করবে!

তোর সঙ্গে কথা হল না? খুব নিস্তেজ, ডুবন্ত মানুষের অসহায় কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল অনীতার গলায়।

না, আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি। কে রে মেয়েটি?

আমার এক দূর সম্পর্কের ননদ। থেমে থেমে, আস্তে আস্তে অনীতা বলল।

প্রণতি আর কিছু বলল না। নিজের সীটে ফিরে গেল।

টিফিনের আধঘণ্টা পরেই শরীর খারাপের অজুহাতে অনীতা অফিস থেকে বাড়ি চলে এল।

সেদিন সুদেব অফিসের পরই সোজা বাড়ি ফিরে এল। অনীতা একটা বই হাতে বিছানায় শুয়েছিল, ঘরের মধ্যে ঢুকেই সুদেব জিজ্ঞাসা করল, কি হ'ল অফিস যাও নি?

সুদেবের অফিস শুরু হয় সাড়ে ন'টায়, অনীতার সাড়ে দশটায়। একঘণ্টা ব্যবধান। সুদেব বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে অনীতা বেরোয়।

অনীতা বই সরিয়ে উঠে পড়ল। গম্ভীর গলায় বলল, গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি ফিরেছি।

সুদেবের কণ্ঠে উদ্বেগের রেশ, কি ব্যাপার শরীর খারাপ?

মশারি

রাজলক্ষ্মী ষ্টোর

৩৯৩, রবীন্দ্র সরণী (আপার চিৎপুর রোড) কলিকাতা-৭

পূজা অভিনন্দন—

পঞ্চানন সোম

প্রসিদ্ধ লৌহ, হার্ডওয়ার এবং শীট ব্যবসায়ী

রেজিঃ টাটা, ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স ★ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিষ্টার্ড ষ্টকিষ্ট ★ গ্যালভানাইজড রিজিং, গাটারিং এবং ডাউন পাইপ প্রস্তুতকারক

৯, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—(৭)

ফোন: ৩৩৪০১৬

অনীতার খুব কাছে এসে সুদেব গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করার চেষ্টা করার আগেই অনীতা সরে গেল। একেবারে রান্নাঘরে।

আসল কথাটা পাড়ল সুদেবের চা-জলখাবার খাওয়ার পর।

কাল বন্ধুর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া কেমন হল? অনীতা সোজাসুজি সুদেবের দিকে চোখ ফেরাল না। অন্যদিকে চেয়ে কথাগুলো বলল।

সুদেব খবরের কাগজ পড়ছিল। সকালে তাড়াহুড়োর মধ্যে পড়ার সময় পায় না। কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, খুব ভাল। জগদীশরা কলকাতার বনেদী বাসিন্দা কি না। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন খুব করে। মিষ্টি প্রায় চার-পাঁচ রকমের।

অনীতা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়াল একবার চোখ তুলে চেয়েও দেখল সুদেবের দিকে তারপর বলল, কাল তো বলেছে সন্ধ্যাবেলাই খাইয়ে দেবে, কিন্তু তোমার আসতে যে এত রাত হল।

খুব অল্পক্ষণের জন্য কালো সঞ্চরমাণ একটা ছায়া সুদেবের মুখের ওপর। চোখের তারায় অনিশ্চয়তার ঝিলিক, কিন্তু সামলে নিয়ে সুদেব বলল, আর বল কেন? ওই আয়োজনই করেছে বিরাট, পরিবেষণ করার লোক নেই। কোমরে গামছা বেঁধে নেমে পড়লাম। সব শেষ হ'তে সাড়ে এগারোটা, তারপর বাড়ি ফিরতে বারোটা বেজে গেল, ভাও ভাগ্যিস সময়মত একটা ট্যাক্সি পেয়েছিলাম।

একটু না থেমে অনর্গল একটা মানুষ কি ভাবে মিথ্যে কথার রাশ বলে যেতে পারে ভেবেও অনীতা বিস্মিত হ'ল। মাথার দু'টো পাশ দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। শরীরের পাকে পাকে দুঃসহ যন্ত্রণা। ইচ্ছা হ'ল এই সাজানো, অন্তঃসারশূন্য সংসারে নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে অনীতা পথে নেমে পড়ে। কপট্টচারী এই মানুষটার সঙ্গে একঘরে বাস করা বুঝি তার পক্ষে অসম্ভব।

বলতে চায় নি অনীতা, কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কাল তুমি ন'টার শো-তে এলিট-এ যাও নি?

এবার সুদেব চমকাল, যথেষ্ট আত্মসংযম সত্ত্বেও। খবরের কাগজের আড়ালে আত্মগোপন করে কথাগুলো শুনতে পায় নি এমন ভাব করল। কিন্তু অনীতার তীক্ষ্ণ, জলন্ত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারল, তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, অন্তত এই প্রশ্নের ব্যাপারে।

কিছু বললে? সুদেব প্রতি-প্রশ্ন করল।

অনীতা এলিটের কথাটা আবার বলল।

এবার খবরের কাগজ ফেলে সুদেব সোজা হয়ে বসল মুখে কৌতূহল, কৌতুক আর বিস্ময় ফোটাল নিপুণ শিল্পীর মতন।

বলল, এলিট-এ? কেন, সেখানে কেন?

সেখানে তোমাকে একজন দেখেছে। তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল।

সুদেব সজোরে হেসে উঠল। মনে হ'ল, সেই হাসিতে নিজের মনের দ্বিধা, সংকোচ, ভয় সব উড়িয়ে দিল। হাসতে হাসতেই বলল, যিনি দেখেছেন তাঁর বোধ হয় চোখের দোষ আছে চশমা নিতে ব'ল।

এবার অনীতা চিন্তিত হ'ল। প্রণতি ভুল দেখে নি তো? হয় তো আধ-অন্ধকারে কাকে দেখতে, কাকে দেখেছে। মানুষের ভুল হওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক।

কি গো সুদেব অনীতার দ্বিধাগ্রস্তভাবের সুযোগ নিল, তোমার চরটি কে? কাকে আমার পিছনে লাগিয়েছিলে? যেই হোক লোকটি কাজের নয়, নতুন লোক নিয়োগ কর। অবশ্য লোকটি রসাল একটি কাহিনী ফেঁদে ছিল। আমার সঙ্গে একটি মেয়েকেও দেখেছে।

অনীতা সত্যিই বিব্রত হ'ল। কোথায় একটা গণ্ডগোলই হয়েছে, নয় তো মানুষ ধরা পড়ে এভাবে কথা বলতে পারে না।

অনীতার মন থেকে গুরুভার নেমে গেল। সন্দেহের কাঁটায় যে মন কথাটা শোনার পর থেকে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল, সে মন অনেকটা সহজ হয়ে উঠল।

অনীতা নিজে থেকেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। পরিহাসের লঘুসুর মিশিয়ে জমাট গুমোট আবহাওয়াটা পরিষ্কার করে দিল।

কিন্তু বরাত অনীতার। নিজের সৃষ্ট স্বর্গলোকে বেশিদিন বাস করা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

মাস দু'য়েক পড়েই ব্যাপারটা ঘটল।

বিভা সঙ্গেই কাজ করে। ওদের ঝাঁকের মধ্যে একমাত্র অবিবাহিতা। বিয়ের ফুল বারকয়েক পাপড়ি মেলতে গিয়েও ফোটে নি। তবে চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেই বিভার বিয়ের ঠিক হল। দিনক্ষণ সব স্থির।

মেয়ের দল খবর পেয়ে ছেঁকে ধরল তাকে। অনীতও বাদ গেল না। মাইনের তারিখ, কাজেই বিভা এড়াতে পারল না। ঠিক হল, দলের জন-ছয়েক মেয়েকে সে সিনেমা দেখাবে। ইংরেজ পাড়ার কোন ছবিঘরে।

বেশ জমেছিল, কিন্তু বিরতির আলো জ্বলে উঠতেই সুর কেটে গেল। সকলের নয় শুধু অনীতার?

বাঁ দিকে চোখ ফিরিয়েই নিশ্চল হয়ে বসল। একেবারে কোণের সিটে সুদেব, পাশে একটি সুসজ্জিতা তন্বী।

এবার আর প্রণতির চোখ দিয়ে নয়, নিজের চোখ দিয়ে অনীতা দেখল।

তারপরই গোলমাল শুরু হল। সুদেব বাড়ি ফিরতে অনীতা সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অন্যবার সুদেব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। অন্য কথা পাড়ে। কিন্তু এবার আর নিষ্কৃতি নেই দেখে সেও হিংস্র হয়ে উঠল।

ফল বিশ্রী কাঁদা ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হল, বানিয়ে বানিয়ে সুদেবও একগাদা কথা বলল অনীতার চরিত্র সম্বন্ধে। অফিসের সহ-কর্মীদের জড়িয়ে।

একটা রাত অনীতা কোনরকমে কাটাল। রান্নাঘরে বিছানা পেতে। ভোর হতেই বিছানা আর সুটকেশ হাতে নিয়ে রিক্সায় চেপে বসল। একটু একটু করে এ সংসারে অনীতাও অনেক জিনিস কিনেছিল। খান-দুই চেয়ার, ছোট একটা আলমারি, একটা রেডিও। সেসব কিছু সঙ্গে নিল না। সংসারের মানুষটাকেই যখন ছেড়ে যেতে পারল, তখন কি হবে এসব টুকিটাকি আঁচলে

পূজা অভিনন্দন—

সাহা এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ লৌহ এবং করগেট ব্যবসায়ী

৮/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩৩৭৬১ ৪৬৭৩৬১

ওরিয়েণ্ট্যাল ইলেকট্রিক

এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্

লাইসেন্সেড কণ্ট্রাক্টর

১৫৭/১, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া

ফোন : ৬৬২৯২৫

বেঁধে নিয়ে গিয়ে। আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি! নতুন করে কোথায় ঠাঁই পাতবে তাই এখনও অনীতা ঠিক করতে পারে নি।

আস্তানা একটা মিলল। সহকর্মী আলোর বাড়িতে। সে বেচারীও অনেকদিন ধরে একজন লোক খুঁজছিল, অনীতাকে পেয়ে যেন বাঁচল। আগে আলো অনীতাদের অফিসে কাজ করত, বছর দুয়েক উন্নতি হয়ে আর এক অফিসে চলে গেছে। অফিস বদলালেও যাত্রার মাধ্যম বদলায় নি। ট্রামে-বাসে মাঝে মাঝে অনীতার সঙ্গে দেখা হয়। তারই অনুরোধে কয়েকবার অনীতা তার সাজানো গৃহস্থালীও দেখে এসেছে।

অনীতা সেখানেই উঠল।

আলোর কাছে ওঠবার অনীতার আরো একটা কারণ ছিল।

আলোর জীবনে কিছুদিন পুরুষের স্পর্শ এসেছিল। সবাই ভেবেছিল আলো এবার জোট বাঁধবে। হয় তো বাঁধতোও, কিন্তু হঠাৎ কি একটা হল, আলো সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপর ক্ষেপে উঠল।

অনীতা ভাবল তার বর্তমান মনের অবস্থার সঙ্গে আলোর মনেরও মিল হবে খুব।

অনীতাকে পেয়ে আলো যেন বেঁচে গেল। দু' হাত বাড়িয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। সমস্ত শুনে রেগে লাল হয়ে উঠল।

বহ্নি প্রজ্বলিত ছিলই তাতে ঘৃতাহুতি পড়ল। হয় তো কিছু সময় কাটলে অনীতা সুদেবের কাছে ফিরে যেত। মানিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিম্বা সুদেব মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ালে, তাকে ক্ষমা করত অনীতা। কিন্তু এসবের বদলে একেবারে উকিলের চিঠি গেল অনীতার তরফ থেকে। সুদেব তার কোন উত্তর দিল না।

আলো বোঝাল, এটা উপেক্ষা, অবহেলা, নিস্পৃহতা। সুদেব ভেবেছে শুধু বুঝি গর্জনেই শেষ হবে, বর্ষণ হবে না। তাকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত মেয়েদেরও আত্মসম্মান আছে, মর্যাদাজ্ঞানও।

অনীতা তাই দেখাল একেবারে কোর্টের শরণ নিয়ে। সেখানেও সুদেব নির্বিকার। ছাড়াছাড়ি তো ছিল এবার সেই বিচ্ছেদের ওপর কোর্টের ছাপ পড়ল।

তারপরেও দু-একবার পথে-ঘাটে সুদেবের সঙ্গে অনীতার দেখা হয়েছে। অনীতা আমল দেয় নি। সঙ্গে আলো ছিল। কাজেই অনীতা একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু আজকের মতন এমন অবস্থা হয় নি।

অনীতা আবার আড়চোখে দেখল। না, সুদেবের দৃষ্টি আর ওর দিকে নেই। বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছে।

ভাল করে সেই সুযোগে অনীতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুদেবকে দেখল। একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। উজ্জ্বল গৌর রং বেশ একটু তামাটে। সুদেব কোন কালেই শরীরের যত্ন করে না। অনীতাই দেখাশোনা করত। ডানা দিয়ে আগলে রাখত তাকে। সময়ে স্নান, খাওয়া, পোশাক বদলানো সব কিছুর ওপর কড়া নজর।

মুখের দিক থেকে অনীতা মানুষটার শরীরের দিকে নজর দিল। হাতের দিকে চেয়েই ভ্রূ কোঁচকাল। একটা আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এমন অসাবধানী লোক আর দু'টি নেই। আগেও দেখেছে অনীতা, সপ্তাহে একবার করে শরীরে আঘাত পাওয়া যেন সুদেবের বরাদ্দ ছিল।

দরজায় লেগে গেছে একটু।

কানের পাশে বোমা ফাটলেও বোধ হয় অনীতা এতটা আতঙ্কিত হ'ত না। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদেব নিজের আঙুলের দিকে চেয়ে কথাটা বলে ফেলেছে।

অনীতা সুদেবের দিকে চোখ ফেরাল। সুদেবের দু-চোখে চাপাহাসির ঝিলিক।

অনীতা আবার ব্যাণ্ডেজের দিকে দেখল। কাপড়ের ওপর রক্তের ছোপ।

ওষুধ দাও নি কিছু? কোন কথা অনীতা বলতে চায় নি, কিন্তু হঠাৎই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

সময় পাই নি, সুদেবের হাসি তখনও অম্লান, অফিসে বেরোবার মুখেই আঙুলটা দরজায় চেপটে গেল কি না। বনমালীর কাছ থেকে ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে ফেললাম।

বনমালী? অনীতা খুব মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

নতুন চাকর।

আশ্চর্য লোক। এখনও রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান দিয়ে। সারাটা দিন অফিসে কেটেছে, অথচ একটা ওষুধ লাগাবার সময় পর্যন্ত হয় নি!

সুদেবকে নিয়ে অনীতা কম ভুগেছে। সামান্য একটা আঁচড় থেকে ঘা দাঁড়িয়ে গেছে। দিনের পর দিন মলম ঘষে ঘষে তবে সেরেছে। তবু এসব দিকে সুদেবের খেয়াল নেই।

তুমি এখন এখানেই আছ, মানে কলকাতায়? একেবারে অন্য কথা পাড়ল অনীতা।

দিন-পনেরো, অফিসের একটা কাজে এসেছি, আবার কানপুরে ফিরে যাব।

খুব দ্রুত ত্রস্তকণ্ঠে সুদেব কথাগুলো বলল। ভাবটা যেন, অনীতার বিচলিত হবার কিছু নেই। জীবনের পথে বার বার সুদেবের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ হবে না। কয়েক দিন পরেই সে ফিরে যাবে কানপুরে।

অনীতা শুনল। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। মনে হল দু'টো চোখ যেন একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আলোর এত প্ররোচনা, উত্তেজনা সত্ত্বেও তিক্ততাটুকু কোন অসতর্ক মুহূর্তে একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে ছিল। কোথায় একটু প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা, সুদেবের অসহায় ভাবের প্রতি ক্ষীণ মোহ, এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সুদেবের অলক্ষ্যে ঘাম মোছার ছল করে অনীতা দু'টো চোখ আঁচল দিয়ে মুছে নিল। কিন্তু চোখ মুছলেই যদি মানুষটাকেও মোছা যেত।

আর গোটা-তিনেক স্টপেজ। তা হলেই অনীতা এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। এই পাশাপাশি বসার যন্ত্রণা।

এখন সে একলাই থাকে। অন্য এক বাসায়। আলো আর নিঃসঙ্গ নেই। পথ চলতে চলতে আর এক পুরুষের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে। শুধু আলাপ নয়, আলাপের সূত্র ধরে মানুষটা তার দেহ আর মনের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। পুরুষদের সম্পর্কে

আলোর বিদ্বেষ আর তেমন সোচ্চার নয়। পৃথিবীতে দু-একজন সৎ পুরুষ যে জীবিত আছে, একথা এখন সে স্বীকার করে। পথের সেই মানুষটি ইদানীং ঘরের মানুষ হয়েছে। সে মেসে থাকত, কাজেই বিয়ের পরে তাকে আলো নিজের ডেরায় এনে তুলেছে। ফলে, অনীতাকে আবার পথে বেরোতে হয়েছে, আস্তানার খোঁজে। এখন সে যেখানে আছে, সেটা তার পুরোনো বাসার কাছাকাছি।

একটু পরেই অনীতা বই আর ভ্যানিটি ব্যাগ আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। ভিড় ঠেলে নামতে হবে, কাজেই একটু আগে থেকে চেষ্টা করাই ভাল।

একবার ভাবল ওঠবার সময় সুদেবকে বলবে, চলি, কিন্তু বলি বলি করেও আর বলতে পারল না। বলতে গেলেই লোকটার দিকে চাইতে হবে। করুণ, বেদনাময় দু'টি চোখের দিকে। পুরোনো অনেক কথা মনে পড়ে যাবে। অনেক ব্যথা। মিছামিছি একটা বেদনা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। পিছনে ফেলে-আসা একটা জীবনের কথা ভেবে ভেবে একটা রাত্তের ঘুম নষ্ট করা।

লোকের ব্যূহভেদ করে অনীতা পথে নামল। নেমে পড়েই অবাক। পিছন পিছন সুদেবও নেমেছে।

এখানে নামল কেন সুদেব? আরো কিছু বুঝি তার বলার আছে। পুরোনো জীবনের বিচ্যুতির কোন কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে আবার বলবে। ক্ষমা চাইবে! কিন্তু কি লাভ! এত সব করে এতদিন পরে নীচু হয়ে এমনভাবে।

সুদেব যেমন আর অনীতার নয়, অনীতাও তেমনি সুদেবের নয়। মাঝখানে বিরাট একটা পাঁচিল উঠেছে। দু'জনের দু'টো এলাকা ভাগ করে দিয়েছে। স্বাধীনতার এলাকা! এ পাঁচিল হয় তো ওরাই গেঁথেছে। অন্তত সুদেব না হোক, অনীতা তৈরি করেছে। একটি একটি করে ব্যবধানের ইট গেঁথে-গেঁথে।

কিন্তু তা বলে সাধারণ একটা ভদ্রতাও কি লোপ পেয়ে যাবে। শারীরিক কুশল প্রশ্ন করা নিশ্চয় অন্যায় নয়। এটুকু করার অধিকার সকলের আছে। এতক্ষণ অনীতা এই পরিধির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে ছিল।

তুমি এখানে? চলতে চলতে সুদেবই প্রথম জিজ্ঞাসা করল।

ভ্যানিটি ব্যাগটা হাত বদল করে অনীতা উত্তর দিল, আমি আজকাল এদিকেই আছি। বলেই একটু থামল। ভাবল মনে মনে, ঠিকানা বললেই বা ক্ষতিটা কি। ঠিকানা জানালেই পাশের মানুষটা সেখানে গিয়ে উঠবে এমন তো নয়। খেলা ভাঙার খেলা শেষ, আবার নতুন করে ভাঙা ইট জড়ো করে ভালবাসার সৌধ গড়বে এমন আশা নেই।

অনীতা একটু জোরেই বলল, আমি শ্যামকান্ত বসাক লেনে আছি। পাঁচ নম্বর।

দু'জনে রাস্তা পার হল। সামনে একটা দ্রুতগতি মোটর এসে পড়েছিল অনীতার মনে হল সুদেব আলতো একবার হাত রাখল অনীতার পিঠে। বুঝি তাকে সাবধান করে দিল।

আশ্চর্য, অনীতার সারামুখে পলকের জন্য রক্তের সঞ্চার হ'ল। এখনও একটা মানুষের স্পর্শে শিহরণ এমন হয়!

দু'জনে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। সুদেব বলল, তুমি তো আগে আলো সরকারের সঙ্গে থাকতে না? এ জি অফিসের আলো সরকার?

এতেও অনীতা বিশেষ আশ্চর্য হ'ল না। আগে অনীতার সঙ্গে আলো কয়েকবার তাদের বাড়িতে এসেছে। তারপর কোর্টে অনীতার সঙ্গে আলোও ছিল কাজেই অনীতা আলোর ওখানেই আছে, এমন একটা কথা জানতে বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই।

এখন আর থাকি না, আগে থাকতাম। এখন আলো বিয়ে করেছে

অনীতার মনে হ'ল কথাগুলো বলার সময় একটু যেন দীর্ঘশ্বাসও বের হল। এবার অনীতা চমকাল। দীর্ঘশ্বাসের এ শব্দ সুদেবের কানে যায় নি তো!

আর কিছু পাছে সুদেব জিজ্ঞাসা করে সেই ভয়ে অনীতাই প্রশ্ন করল, তুমি—তুমি নামলে এখানে?

আমি তো পুরোনো বাসাতেই আছি। সুদেব হাসল খুব সামান্য।

বাসা ছাড়ো নি বুঝি? তা ভালই করেছ। একবার ছাড়লে বাসা পাওয়াই মুস্কিল হ'ত। শহরের যা অবস্থা।

বুকের দ্রুতস্পন্দন ঢাকবার জন্য অনীতা একটানা অনেকগুলো কথা বলে গেল।

গলির মোড়ে সুদেব এসে পড়েছিল। বাঁক ফিরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমি তো দু-তিন মাস অন্তর একবার আসি, যে কোন একটা মেসে আমি উঠতে পারি। ভারি তো দু-এক সপ্তাহের মামলা।

তবে? তবে? এত খরচ করে এখানে বাসা রাখার কি দরকার?

অনীতাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তা হলে, তা হলে কি! ভয়ের একটা কালোছায়া ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অনীতাকে আবৃত করবার জন্য।

তার মানে, সুদেব কি আবার সংসার পেতেছে, সেইজন্য পুরোনো বাসা ছাড়ে নি। তা হলে মেসে ওঠার কথা সে কেন বলল? নাকি, সংসার পাতবে সেই আশাতেই বাসা একটা সাজিয়ে রেখেছে।

আর থাকতে পারল না অনীতা। জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, এত খরচ করে পুরোনো বাসা রেখেছ যে?

এবার সুদেব অপ্রস্তুত হল। সারামুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মাটি থেকে চোখ তুলে অনীতার দিকে চোখ ফেরাল।

তারপর জড়ানোকণ্ঠে বলল, বাসা অন্য কারুকে এখন দেওয়া যায়, ওটা আমাদের আস্তানা।

কথা শেষ করে সুদেব গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, একটু পরেই গলির অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনীতা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে কি মনে করবে, একথা একবারও ভাবল না। আমাদের আস্তানা। সুদেব আর অনীতার প্রেমের বিরাগের শতস্মৃতি চিহ্নিত।

কিন্তু সেখানে ফেরার অধিকার কি সত্যিই হারিয়েছে অনীতা? নিজেদের তৈরি অবরোধ ভাঙবার কোন ক্ষমতা তাদের নেই!

এত পরিচিত গলিটাও যেন শ্বাসরোধকারী বিবর বলে মনে হ'ল। কিন্তু একবার এ অন্ধকার পার হ'তে পারলে নিজেদের আস্তানায় পৌঁছতে পারবে অনীতা। এইমাত্র সুদেব এই ইঙ্গিতটুকুই দিয়ে গেল।

ভর করো :

নীলকণ্ঠ

শেষ পর্যন্ত 'ভর' করার ওপরই নির্ভর করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বলো, আর বলো ঠাকুর রামকৃষ্ণ,—দু'জনের ওপরই ভর করেছিলো সেই একজন যে ভর না করলে এঁদের একজনেরও কাব্যজীবন কিংবা জীবন-কাব্য এমন 'ভর'পূর হতো না। 'ভর' হচ্ছে ইনস্পিরেশান। ভর না করলে, সব পার্সপিরেশান। ভর করলে তবেই 'সব'; ভর না করলে তখন শুধু 'শব।' রাজার ছেলে যখন পথে বেরোয়, সিংহাসন আর ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণীকে তুচ্ছ করে তখন আরও রমণীয় কেউ তার ওপর ভর করে বলেই সে পথে বেরোয়। ভূতে নয়, ভূতের চেয়েও ভয়ংকর এক আভুতে ধরে তাকে। চিকিৎসা নয় কেবল, সকল শাস্ত্রের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। ভিনসেণ্ট ভ্যান গগকে এমনই ক্ষ্যাপার মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে ছিলো কে,—ওই এক 'আভুত' ছাড়া।

ভূতে ধরলে হবে না; আভুতে ধরা চাই। রমণীতে ধরলে হবে না; রমণীয়তে ধরা চাই; MONEYতে ধরলে হবে না, NIL MONEY-তে ধরা চাই। সমস্ত ধরার বিনিময়ে চাই সেই অধরাকে। বলা চাই নিজেকে :

শূন্যে ভরা থাক না রে বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।

কখনও ভূতে ভর করে, কখনও আভুতে। ভূতে ভর করে যখন, তখন কলম লেখে :

'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে,
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।'

আভুতে ভর করে যখন, তখন সেই কলমে লেখা হয় :

'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর অন্যমনে গিয়েছ
কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।

ভর করে কোটিকে গোটিকের ওপর। তারই ওপর ভার পড়ে। 'অলৌকিক আনন্দের ভার শুধু তারই বুকে বেদনা অপার।' যার ওপর করে না তার কিছুই হয় না। তার কেবল লাঠি বাজে। লোকে লেখে, স্ত্রীলোকেও। লোকে কিংবা স্ত্রীলোকে, শেষ পর্যন্ত কেউ লেখক হয় না কারণ তাদের ওপর ভর হয় না। লোকে জ্ঞান-বিজ্ঞান করে, স্ত্রীলোকেও করে, কিন্তু নিউটন কিংবা আইনস্টাইন হয় না। কেন? কারণ এঁদেরই ওপর ভর করেছিলো 'সে' যার ওপর নির্ভর করে, আপেল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে কেন, সেই তত্ত্বাতীতকে জ্ঞাত করানো। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছবি আঁকতে গেছে কত লোক, কততর স্ত্রীলোক। কিন্তু গঁগা কিংবা গোগ্ হয় নি কেউ। কেন? কারণ, এঁদের দু'জনেরই ওপর কেবল ভর করে ছিলো। গঁগাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো,

'এত বয়সে নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে অনিশ্চিত জীবিকা আপনাকে কি দেবে?'

'জানি না,'—গঁগার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গঁগার ভেতরে যে ভর করেছে 'সে'! 'সে'-ই বসুধার রঙ্গমঞ্চে এসেই বলায় গঁগাকে দিয়ে : 'I have got to…'

ভর না করলে কেউ ফ্লবেয়ের মতো কখনও বলতে পারে তার বন্ধুকে :

…'We are no longer on the same road, you and I, we do not sail in the same boat. May God lead each of us where each of us wants to go—you to safe harbour, I to the open sea'—[Maxime du Camp-কে ফ্লবের]।

'Got to' আর 'ভর' করা একই কথা। এ যার 'কথা' নয় সে হচ্ছে 'also ran'-এর দলে। এ যার কথা সে চিত্র না করে চলচ্চিত্র তৈরি করলেও বলে, বলতে পারে : 'I want to continue' but I am struck…' [লাইম লাইটে চ্যাপলিন]।

ভর করে কে,—জানি না। জানতে চাইও না। শুধু জানি, মানি কেবল এইমাত্র যে, ভর যে করে সেই ভরে দেয় এসেই। হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে দেয় সে। যে সৃষ্টি করে কেবল তার হৃদয় নয়, যে সৃষ্টির ভোক্তা তারও ওপর ভর করে সে-ই এক। সম্রাটের সভায় ক্লাসিকাল গানের আসরে বাহবা জানাতে মাথা নাড়লেই মাথা কাটা যাবার ভয়ে যারা চুপ করে গেছে তারা শ্রোতা নয়, খরস্রোতা। বানের জলের সংগে তারা আসে এবং যায়। থাকে কেবল সে-ই যে তখনও, ওস্তাদ যখন 'শমে' এসে থামে, তখনও বলে : শোভানাল্লা, —এবং তখনই সম্রাট তাঁর নিজের গলার মালা পরিয়ে দেন তার গলায়, তখন যথার্থ শ্রোতার নয়, অজস্র খরস্রোতারই কাটা যায় মাথা লজ্জায়।

আর যদি কোনও বেরসিক সম্রাটের আদেশে শেষ পর্যন্ত সেই একমাত্র শ্রোতার মুণ্ডচ্ছেদ ঘটে, তখনও বিদায়কালে সংগীতলক্ষ্মী তার অশ্রুসিক্ত মালাখানি তার একমাত্র ভক্তের কণ্ঠে পরিয়ে দেয়। যে ভর করে গায়কের গলায় তাকেই ভর করতে শ্রোতার কানে। না করলে গায়কও জন্মায় না; শ্রোতাও না। বরজলাল এবং রাজা,—এদের দু'জনকে মেলানো নিয়েই খেলা।

সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। সবাই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক। যে ভর করে কবির ওপর, তারই ওপর নির্ভর করে যে পাঠক সেও। মহৎ সৃষ্টিই বিরল নয়; মহৎ ভোক্তাও কোটিকে গোটিক।

অজ পাড়াগাঁয় কারুর ওপর যখন ভর হয় তখন লোকে রোজা ডাকে। শহরে শিক্ষিত রোজা অর্থাৎ ডাক্তার তাই শুনে হাসে। তারা বলে হিস্টিরিয়া, সেক্সট্রাবল অর্থাৎ রিপ্রেশান ইত্যাদির রি-য়্যাকশান। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিও শুনি, ভাবতে ভাবতে ঠাকুরের নাকি ওই সব দর্শন হতো। আমরা বলি,—'ভর'; ওরা বলে 'পসেস্ড্'। আমরা জানিই না যে কেউ পসেস্ড্ না হলে, কারুর ওপর ভর না করলে, বিশ্ব রচনা কিংবা বিস্ময় রচনা করা যায় না; যা যায়,—তার নাম নিঃস্ব raw চোন। রবি ঠাকুর এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ, এঁরা দু'জনেই পসেসড; দু'জনের ওপরেই একজন 'ভর' করেছিলো। ঠাকুরের মুখে আর রবিঠাকুরের কলমের মুখে এমন অজস্র, অবারণ, ফুল ফুটেছে যে তার কারণ এঁরা দু'জনেই বিউটিফুল দ্বারা পসেস্ড্। কীটস সেই কথাই বলেছিলেন, বিউটি ট্রুথ। 'ভর' হয়েছিলো যখন কীটসের ওপর তখনই কেবল বলতে পেরেছিলেন একথা।

লোকে ত' বটেই, স্ত্রীলোকেও বটে। অটো রাইটিং শুনলে হাসে; বলে, আজগুবি। জানেই না যে, লেখা দু'জাতের। এক,—ফোটো রাইটিং; দুই,—অটো রাইটিং। ফোটো রাইটিং যা দেখে শুধু তাই বলে। অটো রাইটিং,—যা দেখা যায় না, তাই দেখায় ('Greatest writer can see through brick walls')। ফোটো রাইটিং হচ্ছে দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ, ওয়ার এণ্ড পিস, মাদাম বোভারি; অটো রাইটিং হচ্ছে, মেঘদূত, কিং লিয়ার, গীতাঞ্জলি।

কোনও দুষ্কার্য করে যখন কেউ তার দায়িত্ব এড়াতে চায় তখন আমরা ঠাট্টা করি,—তার হাতে অন্য কেউ গাঁজা খেয়ে গেছে বলে। না জেনে আমরা সত্য কথাই বলি। পৃথিবীর চরম দুষ্কার্য ও পরম আশ্চর্য,—এ দুই-ই একজনের হাত দিয়ে আর 'একজন' করায়। যে খুনি নির্মম হত্যা করে, আর যে গুণী নিরুপম সৃষ্টিকার,—এদের দু'জনেরই ওপর 'ভর' হয়। হয় শয়তান নয় ভগবান ভর করে। পসেস করে হয় ডেভিল নয় গড—

'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী'
না লিখে রবিঠাকুর যদি লিখতেন,—
'তুমি কেমন করে খুন কর হে খুনি,'

তা হলে আরও একটি সহজ কথা সহজে লেখার শক্তি দেখাতে পারতেন [না। ভুল বললাম। কঠিন কথা কঠিন করে বলবার জন্যেই শক্তির দরকার; সহজ কথা সহজে বলবার জন্যে প্রয়োজন,—নিরাসক্তির।]

'ভর' করে যার ওপর, যে পসেস্‌ড্ হয়, লোকে ত' বটেই, স্ত্রীলোকেও বলে, সে পাগল। না জেনেই এই আরও একটা সত্যি কথা বলে তারা। পাগল না হলে, কেউ সাধক বা প্রেমিক হয় না। ঈশ্বরের জন্য পাগল হলে তবেই ঈশ্বরকে স্বয়ং আসতে হয় দক্ষিণেশ্বরে। প্রেমে পড়ে যে পাগল হয় নি সে কি করে লিখবে,—

'Out of all your life give me but a little moment.'

ঈশ্বর অথবা পঞ্চশরবিদ্ধ যে সে অপেক্ষা করতে জানে না। হয় দেখা দাও এক্ষুণি নয় এই খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হব আজ,—দক্ষিণেশ্বরের অর্গলবদ্ধ এক মাতৃকক্ষে, বদ্ধ উন্মাদ এক ছেলে যখন হাঁক দিয়ে ওঠে, তখনই মা-পাগল পুত্রে এবং ছেলে-পাগল 'মা'-টিতে দেখা হয় এই মাটিতেই। আর ভালবাসার রমণীকে প্রার্থনা জানায় আরেক পাগল। 'লাস্ট রাইড টোগেদার'-এর জন্যে, কারণ,—

'Who knows the world may end to night.'

এ পাগলকে, এই রমণীয় পাগলামিকে প্রত্যাখ্যান করবে কোন্ রমণী!

কেটলির ঢাকনা ধোঁয়ায় নড়ছে,—এ ভাবনা যাকে ভর করে তারই ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রথম ট্রেন চালাবার কৃতিত্ব; পাখির ডানা যাকে পসেস করে উড়োজাহাজের কল্পনা কার্যকরী হওয়া নির্ভর করে তারই ওপর। অজানা যার চুলের ঝুঁটি ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় মরুদেশ থেকে মরা দেশ। শুধু সেই পৃথিবীতে এসেই অসংখ্য ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ass-এর মধ্যে হয় কলম্বাস। একা। 'ম্যারিকা' বিষ্কার করে সে-ই।

লোকে ত' বটেই, স্ত্রীলোক চিকিৎসকেও হাসে 'নিশির ডাক' শুনলে। তারা বলে নিশির ডাক আসলে অসুখ। না জেনে তারা আবারো আরো একটা সত্যি কথা বলে। এই অসুখ যাদের হয় তাদেরই জন্যে আমরা বাঁচি। দিনের বেলা এই নিশির ডাক শুনে একদিন অধ্যাপকের আসন ছেড়ে যিনি বেরিয়ে গেছিলেন তাঁর জন্যেই স্বজাতীয় মঞ্চরঙ্গ হতে পেরেছিলো জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। সেদিন, অনুমান করি, শুভার্থীরা নিশ্চয় বলেছিলো শিশিরকুমারের অসুখ করেছে। যদি নিশির ডাকে সাড়া না দিতেন শিশিরকুমার তা হলে তিনি সকল অধ্যাপকদের একজন হতেন। কিছুতেই হতে পারতেন না সেই একজন যিনি না এলে,—আর একজনও নাটক লেখার অথবা দেখার কথা ভাবতে পারত না। এই নিশির ডাক শুনেই লালাবাবু বেরিয়ে গেছিলেন বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে। এই নিশির ডাকে সাড়া দিতেই সুভাষচন্দ্র বেরিয়েছিলেন,—পরাধীন ভারতের শেষ পলাতক এবং স্বাধীন ভারতের পথে অগ্রসর সেই প্রথম পদাতিক। ভর না করলে তাঁর ওপর, একথা কারুর মুখ দিয়ে বেরুতে পারে যে, আমাকে মারতে পারে এমন বৃটিশ বোমার আজও জন্ম হয় নি

ভর হয়েছিলো দেশবন্ধুর ওপর, শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যখন তিনি বলেছিলেন: 'A poet of patriotism'! ভর হয়েছিলো উইনস্টন চার্চিলের ওপর, যখন তাঁর কণ্ঠে নিমজ্জিত গ্রেট বৃটেন গর্জে উঠেছিলো পরাজয়ের পর পরাজয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে এই অপরাজেয়বাণীতে:

'Never in the history of human conflict so much have been sacrificed by so many for so few.'

হেমিংওয়ের কলমে ভর করেছিলো যে-ই একমাত্র জন্ম দিতে পারে এই মৃত্যুহীন বেদনার, যে:

Man can be destroyed but not defeated.

হিটলারের উপর ভর করেছিলো ডেভিল না গড কে বলবে। হিটলার হেরে গেছে তাই বলছি শয়তানের, জিতলে বলতাম, ভগবানের দূত। কিন্তু ভর না করলে ব্যারাকে রুটি চিবোনো প্রথম মহাযুদ্ধের এক কর্পোর‍্যালের পক্ষে একথা লেখা অসম্ভব যে:

'Whatever goal man has reached, he has reached by his originality plus his brutality.'

এবং এই দম্ভে ফেটে পড়া, ঔদ্ধত্য আর বিশ্বাসের বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা বাণী কখন্ বলেছিলেন হিটলার।

য়ুরোপ দিগ্বিজয়ের দিনে, বললে কানাকড়ি মূল্যও কেউ দিতো না একথার। হিটলার একথা বলেছিলেন। নাৎসি পার্টি যখন প্রথম ছেলেমানুষি করে রাস্তার ওপর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তোলবার চেষ্টা করে এবং 'ব্লাডি পুশ' অবিমৃষ্যকারিতার চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়। জেলে বসে নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করা উচিত ছিলো যখন, হিটলারের তৃতীয় ক্রুদ্ধ চোখ থেকে তখনই ছিটকে পড়ে এই অমূল্য কণিকা। কোনও হাস্যকরভাবে হেরে যাওয়া তখনও প্রায় অখ্যাত এক সামান্য পার্টির পাণ্ডার মুখে এই দম্ভোক্তি অদ্ভুত শোনায়। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে হিটলারের কথা নয় এ। হিটলারকে দিয়ে যে ভয় দেখাবে নির্বীর্য দেবলোককে সে-ই ভর করেছিলো সেদিন নাৎসি-নেতার কণ্ঠে।

দস্তয়েভস্কির কলমে যখন লেখা হয়:

'Everyone shares the guilt of every crime, of every thing that happens on earth.'

একথা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; পরিশ্রম দিয়ে, এমন কি প্রতিভারও অনায়ত্ত এ পরমাশ্চর্য উক্তি। ভর করলে সেই 'একজন' তবেই যে কেউ, যে কোনও পঙ্গু একজনও এমন অনায়াসে গিরি লংঘন করে; জন্মমূক আরও একজন যে কোনও মুহূর্তে এমন অপরূপ বাচাল হয়। হয়ে উঠতে পারে।

দস্তয়েভস্কি প্রসংগে ফ্রয়েডের একটি উক্তিতে আমার বক্তব্যের পুনরুক্তি অনবদ্য উপস্থিত:

'Dostoevsky's place is not far behind Shakespear. The Brothers Karamazov is the most magnificent novel ever written...before the problem of the creative artist analysis must lay down its arms.'

যে রচনা পরিশ্রমে প্রস্তুত তা পারিশ্রমিকের যোগ্য; যে সৃষ্টি প্রতিভার,—তা পুরস্কৃত হবেই; যে আলো এরও সীমাহীন ঊর্ধ্ব থেকে আসে এই মরলোকে তা কখনও আলো, কখনও ভয়ালো। তা কখনও বাঁচার, কখনও মারার মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাই তা কখনও রাম হয়ে, কখনও রাবণ হয়ে দেখা দেয়। এ সৃষ্টি তো অনন্তকাল ধরে রাম এবং রাবণের অন্তর্দ্বন্দ্বে আলোড়িত। বাকি যারা সেই অক্ষৌহিণী মর্ত্যে আসে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে উলুখড়ের মতো,—মরতে আসে তারা। তারা কেউ কেউ রাম কিংবা রাবণকুলে পরিশ্রম আর প্রতিভায় রথী-মহারথীর ভূমিকায় অভিনয় করতে আসে। তারা হচ্ছে—

ফুল অভ সাউণ্ড এণ্ড ফিউরি সিগনিফাইং নাথিং।

আসল খেলা রাম-রাবণের। সত্য এবং শাশ্বত। ভীষ্ম, দ্রোণ অর্জুন, কর্ণ বদলের। চিরকালের কেবল, যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, লক্ষ্মণ, হনুমান এরা কালের; চিরকালের কেবল রাম এবং রাবণ। এদেরই ওপর 'ভর' করে কেবল 'সে'।

যে নির্ভর করে তার নাম রাম; যে নির্ভর করে না তার নাম রাবণ।

যে নির্ভর করে তার ওপর 'ভর' করে 'সে'। যে নির্ভর করে না তার ওপর বেশি ভর করে 'সে'। ঈশ্বরকে যে স্বীকার করে না, ঈশ্বর সর্বাগ্রে শিকার করেন তাকেই। প্রহ্লাদের আগে তাই হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার ঘটে। ভক্ত যে তার মুক্তি তাই সাতবারের আগে নয়; শক্ত যে তার মুক্তি তিনবারেই। একজন তার আলো, আর একজন ভয়ালো। কিন্তু এই দু'জনেই কেবল তাঁর। বাকি সব,—কেবল শব মাত্র।

কেন কেবল এই দু'জনের ওপর নির্ভর করে। এই আলো আর ভয়ালো-র, রাম আর রাবণের, যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের ওপর নির্ভর করে বিশ্বয় সৃষ্টি ও ভঙ্গের এই চিরন্তন রঙ্গের অধীশ্বর হবার কোনও যুগে কোনও দেশে, তার কোনও উত্তর নেই। মানব সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে, যাঁর উত্তরীয় রাঙা, এই একটি জায়গায় তিনি চিরনিরুত্তর দেবতাত্মা হিমালয়।

এর উত্তর আমার অজানা। কেবল এই প্রশ্নের উত্তরে একটি গল্প জানা আছে, সেইটে বলি।

ছেলের চাকরির আশায় মা কালীর মন্দিরে সওয়া পাঁচানার পুজো নিয়ে হাজির এক দরিদ্র ব্যক্তি, শুনলো ওই একই চাকরি ছেলেকে পাওয়ানোর প্রার্থনা নিয়ে আরেকজন হাজির হয়েছে। তখন সে বুদ্ধি খাটিয়ে মা-কে বললে: তোমাকে আমি দিয়েছি সওয়া পাঁচানার পুজো; আর ও দিয়েছে পাঁচসিকের। এ থেকেই বুঝবে আমার অবস্থা আরোও খারাপ; অতএব আমার ছেলেরই চাকরি পাওয়া দরকার বেশি।

মা বললেন তৎক্ষণাৎ: তা যদি বলিস, তা হলে বলি শোন্,—আরেকজন সকালে এসেছিলো কিছুই না নিয়ে এবং ওই এক প্রার্থনা নিয়ে, ছেলের চাকরিটা করে দাও মা,—আমি নিঃস্ব। তোর কথা শুনলে তো চাকরিটা তার ছেলেকেই দিতে হয়, তাই না?

রেগে গিয়ে এবং যুক্তিতে হেরে গিয়ে, সওয়া পাঁচানা পুজো দিয়েছে যে, সে বলে এবারে: তা হলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—

তাই তো করি,—মা হেসে বলেন: মাঝখান থেকে তোরা কেন যে পুজো দিয়ে মরিস তাই ভেবে পাই না—!

যে নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি ভর কেন 'সে' করে তার ওপর, যে নির্ভর করে না, তার ওপর কেন ভর করে সে অনেক বেশি, এর উত্তর ওই,—'যা ইচ্ছে তাই তো করি—।'

এহ বাহ্য। যে নির্ভর করে, আর যে করে না, তারও ওপরে যে আছে, সে ভর-এরও তোয়াক্কা করে না, 'নির্ভর'-এরও না। সে শক্তও নয়, আসক্তও নয়, সে নিরাসক্ত। রাম এবং রাবণের, আলোর এবং ভয়ালোর, আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বে তার বাস। তার নামই,—'চৈতন্য।'

সে জানে, কেবল 'সে'-ই। রাম-রাবণ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-মর্ত্য, ভক্তি-অভক্তি, এ সবই সে জানে এ সবই শেষ পর্যন্ত শব। কেবল সে-ই বলতে পারে এসেই,—সব ঝুট হায়, সব ঝুট হায়, সব ঝুট!

দাশের জর্দা
৪৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

পূজা অভিনন্দন
ন্যাশন্যাল ট্রেডার্স
জনপ্রিয় পোষাক শিল্পী
১৫০, বিধান সরণী, কলিকাতা—৪

শারদীয় অভিনন্দন
শেঠ এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী রেজিঃ টাটা, ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ ডিলার্স
বি/৫, জগন্নাথ ঘাট লোহাপট্টী, কলিঃ ৭
(অফিস) ৩৩-৪১৪৬ : ফোন : ৬৭-৩৩৭৪ (ইয়ার্ড)

অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজ হয়েছে আজকাল বিভাষের, কথাটা মিথ্যে নয়। বিভাষ নিজেও বোঝে, কিন্তু তার পেছনে যে কারণগুলো সর্বদা ওকে উত্তপ্ত করে তুলছে, তার খবর তো কেউ রাখে না। আগে ঘরে-বাইরে, বিনয়ী, মেধাবী, সৎ ও ভদ্র বলে তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো এবং সেইজন্যই যখন সে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়ে পাশ করেছিলো, তখন বাবা বলেছিলেন,—এবারে একটা চাকরি পেলেই, এই ভাঙাচোরা সংসারটাকে মেরামত করা যাবে।

ওর মা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—এমন ছেলেকে পড়াবার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় দেব, অন্ততপক্ষে বি-এ পাশ ওকে করতেই হবে।

বিভাষ কলেজে ভর্তি হল। সসম্মানে আই-এ পাশ করে বি-এ পড়া আরম্ভ করলো। ওর বাবার মাত্র দেড়শো টাকার পেন্সনে সংসার চলে না, ছোটভাই সুভাষ স্কুলে পড়ে, বোন মিনুও স্কুলে পড়ে, বাধ্য হয়ে বিভাষকে দু'টো টিউশানির কাজ নিতে হয়েছে। মায়ের গা থেকে ধীরে ধীরে সোনার চিহ্নটুকুও উধাও হয়েছে, বিভাষের নজরে সেটুকু ধরা পড়ে।

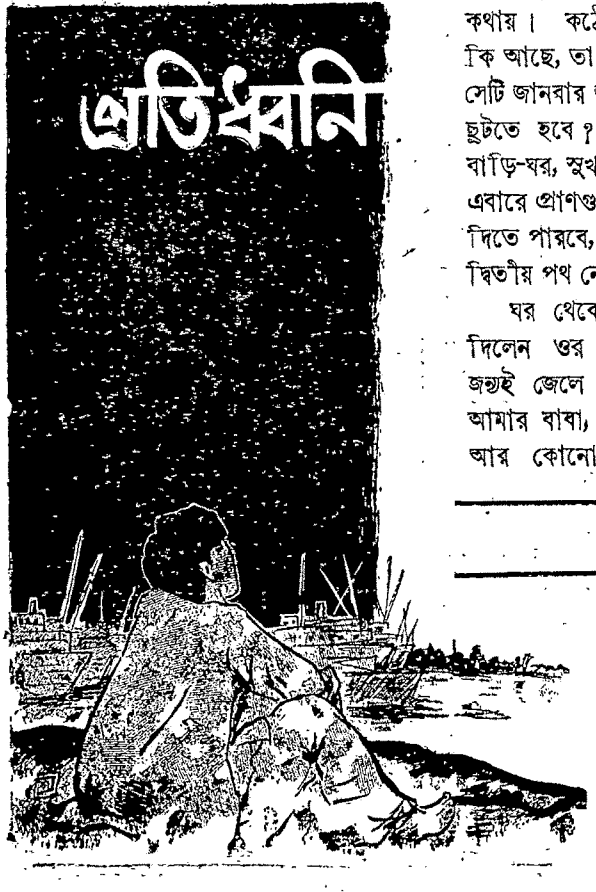

নিদারুণ অভাবের সংসার। বাজারে চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই, আনাজপত্র অগ্নিমূল্য, ফলের কথা তো ভাবাই চলে না।—তবুও কি নিদারুণ পরিশ্রমের সঙ্গে অটুট ধৈর্যের সঙ্গে, সংসারের হাল ধরে আছেন তার মা, জমিদারের একমাত্র আদরিণী কন্যা গঙ্গা দেবী।

এই মহা দুঃসময়ে আবার এলো নতুন বিপদ। ওর বাবা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে রইলেন দু'টো মাস। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, মায়ের সঙ্গে পালা করে রাত জাগা ইত্যাদিতে বিভাষের স্বাস্থ্যটাও যেন ভেঙে পড়লো। সকালে টিউশানি সেরে কোনোদিন চালের জন্য কোনোদিন তেলের জন্য লাইন দেওয়া, তারপর দু'টি ফেন-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে দু'মাইল পথ হেঁটে কলেজে যাওয়া, আবার আসা, সন্ধ্যের দিকে আবার টিউশানি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে বিভাষের, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা বোধ হয়, মেজাজ দারুণ খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে।

মা ওর মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কিতভাবে বললেন—একবার ডাক্তারের কাছে যা বাবা। এ কি চেহারা হচ্ছে দিন দিন, জানি না কপালে আমার আরো কি আছে।

দপ্ করে জ্বলে উঠলো বিভাষ মায়ের কথায়। কঠোরভাবে জবাব দিলো—কপালে কি আছে, তা কি তোমার জানা নেই মা? সেটি জানবার জন্যে আবার ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে? স্বাধীনতার খেসারৎ দিতে বাড়ি-ঘর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জন দিয়েছো, এবারে প্রাণগুলো দাও। তাড়াতাড়ি যত দিতে পারবে, ততই ভালো। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই আমাদের।

ঘর থেকে ভাঙাগলায়, শ্বাস টেনে জবাব দিলেন ওর বাবা—হ্যাঁ। এই স্বাধীনতার জন্যই জেলে পচে মরে, শহীদ হয়েছিলেন আমার বাবা, নিরঞ্জন রায়। তবে এখন আর কোনো বাইরের জেলে নয়, মধ্যবিত্ত

বারি দেবী

আর গরীব সংসারগুলো সবই হয়ে গেছে জেলখানা। সেই বিরাট জেলখানার থেকে মুক্তির উপায় ঐ একমাত্র মৃত্যুই বটে।

মায়ের একান্ত অনুরোধে, —হাসপাতালে একদিন গেলো বিভাষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। ডাক্তার পরীক্ষার পর জানালেন যে—রোগ অন্য কিছু নয়, একমাত্র পুষ্টির অভাব ছাড়া। দেহের নার্ভ আর পেশীগুলো পুষ্টির অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেজন্য প্রথমেই প্রয়োজন,—মাছ, মাংস, দুধ, ফল, সবুজ আনাজ ইত্যাদির। ওষুধ, ইন্‌জেক্‌শানও লিখে দিলেন ডাক্তার।

মা সব কথা শুনে, মাথায় করাঘাত করে কেঁদে উঠলেন,—দু'টো নুন-ভাত জোটানোর যেখানে সমস্যা, সেখানে এমন রাজরোগ কেন দিলে ভগবান। পুকুরভর্তি মাছ, গোলা-ভরা ধান, বাগানভরা ফল, আলো, হাওয়া-ভরা ঘর-বাড়ি সবই কেড়ে নিয়েছো। ও রে, কোন মহাপাপে এই শাস্তিভোগ আমাদের কপালে। আর যে সইতে পারি না ভগবান।

আরো শোচনীয় দিন বুঝি অপেক্ষা করছিলো ওদের জন্য। চালের, তেলের, রেশানের লাইন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ানোর জন্যে,—টিউশানিতে প্রায়ই কামাই করতে হচ্ছে বিভাষের। তাই ছাত্রের বাবা জানিয়েছেন যে—অন্য মাস্টার তিনি খোঁজ করছেন।

খবরটা শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠে বললেন মা—আমি না হয় লাইনে দাঁড়াই বাবা। চাকরিটা গেলে, কি উপায় হবে।

—থাক্। থাক্।—চিৎকার করে উঠলো বিভাষ। চাকরি গেলে বেশি আর কি হবে মা? এরকম করে গরু-ছাগলের অধম হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ তো অনেক ভালো। মরতে ভয় পাও কেন? সব হারিয়েছি তাও সয়েছে,—কিন্তু বজ্রযোগিনীর রায়-বাড়ির বৌ-এর—লাইনে দাঁড়ানো সইবে না মা, কিছুতেই সইবে না। উত্তেজিতভাবে থলে হাতে করে, ছুটে বেরিয়ে গেলো বিভাষ।

বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়েছে আজ। পরীক্ষার ফল আগের মত ভালো হবে না, তা জানতো বিভাষ। না হোক শুধু পাশ করেছে এটুকু জানলেই হবে, কারণ পড়ার লাইনে ইস্তফা দিয়ে এবার যে তাকে চাকরি নিতেই হবে। টিউশানী থেকে ফিরে এসে, অস্থিরচিত্তে যখন সে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, ঠিক সেই সময়ে মা এসে, একটি দড়ি-বাঁধা বোতল হাতে নিয়ে বললেন—একটু তেল জোগাড় করে এনে দিবি মা? কতদিন যে মাছের মুখ দেখি নি।

১৮০ বছরেরও বেশী ভারতের সেবায় নিযুক্ত মার্টিন বার্ন

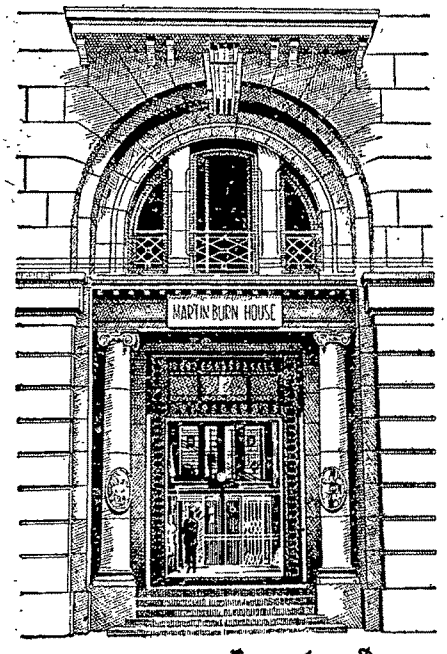

ভারতবর্ষে মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী শিল্পপ্রয়াসের পরিমাপ বছরের হিসেবে না করে যুগের হিসেবে করাই সমীচীন। এই সুদীর্ঘকাল একাগ্র সাধনায় বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিনীয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্প উদ্যোগের সহায়তায় মার্টিন বার্ন ভারতের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করেছে। মার্টিন বার্নের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির চমকপ্রদ সাফল্যের মূলে রয়েছে দূরদর্শিতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আজ অগ্রণী তো বটেই, তাদের কোন কোনটি গত শতাব্দীতেও ছিল সবার আগে। আজ তাই মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠান পিছন দিকে তাকিয়ে শুধু যে অতীত কীর্তির জন্যই গর্ব বোধ করে তা নয়, আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণাও পায়।

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঃ

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড ঃ কারখানা বার্নপুর ও কুলটি। বার্নপুরের স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানায় বছরে এক লক্ষ টন ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদন হয়। কুলটিতে কমনওয়েলথের মধ্যে সর্ববৃহৎ আধুনিক ঢালাই কারখানা। উৎপাদনদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া ঃ গোড়াপত্তন ১৭৮১ সালে। ভারতের প্রথম ঢালাই কারখানা—মালগাড়ি ইত্যাদি নানাবিধ রেলওয়ে সামগ্রী এবং ইস্পাতের বড় বড় কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড ঃ রিফ্র্যাকটারি গোষ্ঠী ঃ চারটি রাজ্যে অবস্থিত আটটি কারখানা—যাবতীয় রিফ্র্যাকটারি সামগ্রী প্রস্তুতকারক। ইস্পাত কারখানা, বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র, রেলওয়ে—এক কথায়, যেখানেই ফার্নেস ব্যবহার করা হয় সেখানেই বার্ন কোম্পানির রিফ্র্যাকটারির প্রয়োজন।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিমিটেড, সান্তা ঃ একান্ত-ভাবে মালগাড়ি নির্মাণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এদেশে মালগাড়ি নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা বলা চলে। বর্তমানে এখানে ভারী শিল্প ও মোটর গাড়ির জন্য স্প্রিং, ফোর্জিং, স্ট্যাম্পিং প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ঃ ১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড, ড্রাই ডক ইত্যাদি সর্ববিধ ব্যবস্থাসম্পন্ন জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানা।

রবার্ট হাড্‌সন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড ঃ ছোট রেলের নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রণী। বিবিধ খনিজ শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

রেলওয়ে কোম্পানি ঃ ভারতের প্রথম রেল প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম—চারটি রাজ্যে দু'টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি ঃ বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহের কয়েকটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের ৪২টি শহরে বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

দি ভল্‌ বার্ন ক্রেন কোম্পানি লিঃ— ম্যাঞ্চেস্টারের ভল্‌ ক্রেন কোম্পানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত...হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত ওভারহেড ট্র্যাভলিং ক্রেন এবং চেনপুলি ব্লক।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড কলিকাতা নয়াদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

MBGC-22A BEN

ও বাড়ির দিদি আজ একটু মাছ পাঠিয়েছেন, কিন্তু তেলের ছিটে নেই ঘরে।

খেঁকিয়ে উঠলো বিভাষ মায়ের কথায়—ফেলে দাও মাছ। শেয়াল কাঁটার আর তামাকের তেলগুলো কি না খেলেই নয় মা? ওতে যদি একেবারে মরণ হতো, তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না, কিন্তু তা তো হবে না, পঙ্গু হয়ে, সমাজের অভিশাপ হয়ে বেঁচে, মরে থাকতে হবে। এ সুখটুকু আর নাই বা চাইলে।

—আমার জন্যে কি বলছি বাবা? কান্নার ভারে কেঁপে উঠলো মা'র কণ্ঠস্বর।—ঐ রোগা মানুষটার মুখে দুনিয়ার অরুচি। তার জন্যেই—

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে, রান্নাঘরে চলে গেলেন মা। আহা। দুর্ভাগিনী মা আমার। কত দাস-দাসী, হাতী-ঘোড়া ছোটবেলায় দেখেছে বিভাষ মা'র বাপের বাড়িতে। শ্বশুরবাড়িও কিছু কম ছিলো না। তারপর··· স্বাধীনতার স্বপ্ন···দাঙ্গা···দেশবিভাগ প্রভৃতি ঘটনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে, স্বামী-পুত্রের হাত ধরে কোন নরকে এসে দাঁড়িয়েছেন মা দু'চোখে নামলো ওর জলের ধারা।—বোতলটা তুলে নিয়ে তেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো বিভাষ।

এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হবার পর, একটি ছোট দোকান থেকে কালো দাম দিয়ে কালচে রং-এর তেল, সরষের তেল বলেই নিলো বোতলে ভরে। তারপর হন্ হন্ করে চলল ফেরার পথে। মনটা ভীষণ উদ্বিগ্ন। অদৃশ্য সেই ভাগ্যবিধাতা, আজ তাকে কি ফল দেবেন, তাই জানবার জন্য বিষম অস্থিরতার দাপাদাপি সুরু হয়েছে ওর বুকের ভেতর।

ঘ্যাঁচ! ভীষণ জোরে ব্রেক কষার শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে মৃদুধাক্কা লাগলো ওর পিঠের ওপর। টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো বিভাষ। বোতলটাও ছিট্‌কে পড়লো ফুটপাথের ওপর।

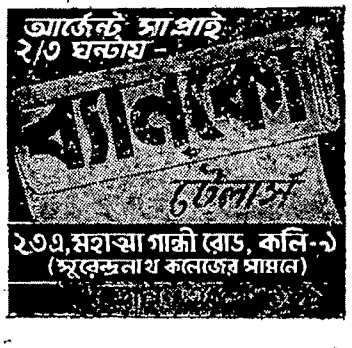

হৈ-হৈ করে ভিড় জমে গেলো চারিদিকে। বিভাষ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—কি হলো মশাই? কোথায় লেগেছে? চারিদিক থেকে আসছে প্রশ্নবান।

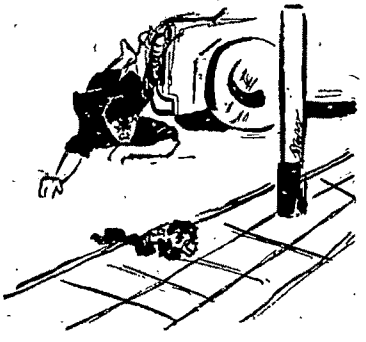

—না লাগে নি আমার। বলে, একটু দূরে রাখা গাড়ির দিকে চাইলো বিভাষ। গাড়িতে বসে আছেন একজন সুবেশধারী ভদ্রলোক, তাঁর পাশেই এক তরুণ। দু'জনের গলায় মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে-মুখে প্রসন্নতার আলো। তবে উপস্থিত এই বিভ্রাটের জন্য, বিরক্তির রেখা ফুটেছে কপালে।···

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন—কি করে পথ চলেন মশাই? এখুনি প্রাণটা যেত যে, ভাগ্যিস্ ড্রাইভারটার পাকা হাত, তাই তো রক্ষে পেলেন। ছেলে পাশ করেছে বলে মন্দিরে গিয়েছিলাম, প্রসাদী ফুল সঙ্গে আছে তাই এই সঙ্কট থেকে আমরাও বাঁচলাম, আর আপনিও।

বিভাষ অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলো ভিড়ের বাইরে। করুণ চোখে একবার চাইলো ভেঙে টুক্‌রো হয়ে যাওয়া বোতলটার দিকে বোতল নয়,—ওর জীবনটাই যেন ভেঙে-চুরে পড়ে আছে ওখানে।

এবারে কি করবে সে। মা যে মাছ নিয়ে বসে আছেন, তার আশায়।—থাকুন মা মাছ নিয়ে। বিড়-বিড় করে বক্‌লো বিভাষ। ফিরবো না—চলে যাবো। পালিয়ে যাবো কোথাও। আবার ভাবলো সে—পালাবো। এই নিষ্ঠুর, এই ভণ্ড পৃথিবীটাকে ছেড়ে পালাবো। এখানে চারিদিকে আছে শুধু ঠগ্ বাজ, দস্যু, খুনের দল। রাশ রাশ অন্ধকারের সাপ দিনরাত ছোবল্ মারছে ওকে। না এখানে আর নয়।

হঠাৎ মনে পড়লো ওর পরীক্ষার রেজাল্টের কথা। নিবিড় অন্ধকারে জ্বলে উঠলো একটি ক্ষীণ আশার আলোর শিখা। সেই আলোর হাতছানিতে, বিহ্বলভাবে এগিয়ে চললো বিভাষ, কলেজের দিকে।

—সেখানেও চরম ব্যর্থতা অপেক্ষা করছিলো ওর জন্য। ভাগ্যের ফলাফল জানা হয়ে গেছে, সফলতার লিস্টে ওর স্থান হয় নি।

দিনের চিতা জ্বলছে পশ্চিম দিগন্তে। সেইদিকে দু'টি জ্বালাভরা চোখ মেলে, গঙ্গার ধারে বসেছিলো বিভাষ। সারাদিন খাওয়া হয় নি, তার প্রয়োজনও আর নেই। এখন আছে শুধু একটি সঙ্কল্প, একটিমাত্র প্রয়োজন। সর্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবীর কোলে একটু স্থান চাই তার।

এখনও নির্জন হয় নি ঘাটটা। আরেকটু অন্ধকার হলেই, লোকজন কমে যাবে। তারপর সকল দুর্ভাগ্য, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যর্থতার বোঝা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে চরম শান্তি লাভ করবে সে।

—খোকা। খোকন রে। বাবা আমার। কোথায় পালালি ধন।

নারীকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদে, চম্‌কে উঠলো বিভাষ। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে পেলো একজন মহিলাকে, কয়েকজন লোক ধরে গঙ্গাস্নান করাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। মহিলার পেছনে আসছে একটি ছোট ছেলে। সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে—দাদাভাই! ও দাদা গো। তুমি কোথায় গেলে দাদা। মহিলাটি সিঁড়ির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলেন—ওরে বিভুধন আমার। একবার ফিরে আয় বাবা।

হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ-শক্ যেন লাগলো বিভাষের অন্তরাত্মায়। মা কাঁদছে। ঐ যে মাথা খুঁড়ে কাঁদছেন মা ওর জন্যে। কাঁদছে সুভাষ ভাইটি, কাঁদছেন স্থবির পিতা, বালিকা বোনটি।

তড়িতাহতের মত ছিট্‌কে গঙ্গার ধার থেকে উঠে গেল বিভাষ। আকুল কণ্ঠে বললো—মা। মাগো। আমি মরি নি মা। আমি বেঁচে আছি। এই যে ফিরে যাচ্ছি মা তোমার কোলে। যত দুঃখ-দৈন্য, যত হতাশা-ব্যর্থতা আসুক না কেন, তোমাকে কাঁদিয়ে, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও পালাবো না মাগো। তোমার আশীর্বাদে আমি সব দুঃখকে জয় করবো মা।

মা গঙ্গার দিকে চেয়ে যুক্তকরে প্রণাম করলো বিভাষ, আপন জননী গঙ্গাদেবীকে। দু'চোখ বেয়ে ওর ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিলো,—গঙ্গা-যমুনার ধারা।

লেখিকার বক্তব্য

[আমার লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা 'শেষ বসন্তের' ভাষা ও আঙ্গিকের প্রাচীনত্বে হয় তো বিস্ময় বোধ করবেন। আধুনিক রচনার বিশ্লেষণীভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব প্রাচীন ভাষা ও আঙ্গিকে কতটা রক্ষা করা যায়—এও একটি পরীক্ষা। প্রকাশকেরা বলেন, চলতি ভাষায় লেখা বই এখনও অনেক পূর্ববঙ্গীয় লেখক বোঝেন না। প্রাচীন লিখনভঙ্গি যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে সেটাও অভিপ্রেত নয়।

এসব কারণ ভিন্ন আরও কারণ আছে। মনে হয় রচনাকার মাত্রেরই বিভিন্ন ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করে যাওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রচনার ভাষা ও আঙ্গিক হওয়া উচিত বিভিন্ন। একঘেয়ে ভাষাভঙ্গির দাসত্ব করে যাওয়া নিজেকে পুনরাবৃত্তি করা মাত্র। প্রাচীন গ্রাম্য বংশের পরিবেশে তাই প্রাচীন রীতি গ্রহণ করলাম। শিল্পীর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত পরীক্ষা করে যাওয়া সমীচীন—তা সে সফল বা বিফল, যাই হোক না কেন।]

সম্পূর্ণ উপন্যাস

পটভূমিক

আমাদের বহু পরিচিত বিশিষ্ট রায়বাড়ির কন্যা ও পুত্রেরা দেশে আসিয়াছে।

তাহাদের পিতা সৌরেন্দ্র রায়ের মৃত্যুকালীন আদেশ ছিল যেন তাহারা তাঁহার শেষকৃত্য তাঁহার জমিদারী পদ্মাপাড়ের পাকিস্তানে করে।

সেখানে সেজছেলে অমিয়েন্দ্রের সহপাঠী হামিদুল্লা হক ম্যাজিস্ট্রেট। অসুবিধার কারণ নাই।

রায়বাড়ির বংশলতিকায় অসংখ্য সন্তান। সন্তান-সন্ততির মধ্যে সম্পা লেখক গৌতম মুখোপাধ্যায়কে ভালবাসিয়াও বাড়ির অমতে তাহাকে বিবাহে সাহস পায় নাই। স্বামী রঞ্জিতের সঙ্গে বোম্বাই শহরে প্রেমহীন জীবনযাপন করিয়া চলিয়াছে সম্পা। এখন সে দেশে আসিয়াছে। দিদি শ্রীলতা প্রথমে প্রত্যাখ্যান পরে ধনী দীপঙ্করকে গ্রহণে সুখী।

সেজছেলে নিখিলেন্দ্র লেখিকা সুভদ্রা মিত্রকে ভালবাসে। সম্পার সাহায্যে পাড়াগাঁ দেখাইতে সুভদ্রাকে সে এখানে আনিয়াছে।

ছোটভাই বিনয়েন্দ্র বন্ধু অরুণাংশুকে আনিয়াছে। প্রভাত রায় জ্ঞাতিকুটুম্ব; খুড়ীমা সাবিত্রী বিধবা-কন্যা বুলু, ছেলে মণীন্দ্র ও হরেন্দ্রকে লইয়া বিষয়সম্পত্তি তদারকে বারমাস থাকেন রায়বাড়ি।

সাতবিঘাব্যাপী বিশাল দ্বিতলবাড়ি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সেখানে কর্মস্রোত, অসংখ্য ঝি-চাকর-সরকার-নায়েব এখনও আছে।

অন্দর ও বাহির দালানের মধ্যে সুইংডোর। বাহিরে 'কাছারি-বাড়ি'। রায়কর্তার বসিবার ঘরের সামনে গোল-বারান্দা। রায়গৃহিণীর অন্দরে হাতীমুখো সিঁড়ির বারান্দা।

শ্রীমতী বাণী রায়

॥ এক ॥

সেকালের সেই সুইংডোর ঠেলিয়া দীপঙ্কর অন্দরে প্রবেশ করিল।

দিশী মিস্ত্রী দ্বারা দরজা নির্মাণ হইয়াছিল তথাপি দ্বারের উদ্দেশ চমৎকারভাবে সফল। কর্তা যখন প্রবেশ করিতেন একটা বনেদী শব্দ, অনেকটা যাঁতাঘোরার মত শব্দ দ্বারের স্প্রিং হইতে উত্থিত হইত। বৌ-ঝি সন্ত্রস্ত হইত।

রায়বাড়ি 'ঝি' অর্থাৎ কন্যাদের অবাধ এবং অগাধ স্বাধীনতা দিয়াছে। অন্যগৃহে তাহারা বধূ কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা পিতৃগৃহের আঙিনায় প্রবেশ করিত তাহারা মুক্ত বায়ুর মতই স্বাধীনা। সীমন্ত হইতে গুণ্ঠন খসিত। সেই গুণ্ঠন আবার যাত্রা সময়ে উত্তোলিত হইত। চলনে-বলনে ক্ষিপ্রতা, সর্বজনসমক্ষে বিচরণ কন্যাদের যতটা স্বাচ্ছন্দ্য দিত তাহা ক্ষুণ্ণ হইত আবার ততটাই বধূদের ক্ষেত্রে। বধূরা মানিয়া লইয়াছিল।

দীপঙ্কর অন্দরের হলঘরে প্রবেশ করিল।

দেওয়াল-আলমারীটির নীচে একখানা বড় তক্তপোষ। সেখানে পুরু ফরাসে রাত্রে শয্যা বিস্তৃত হয়, যখন লোকজন আসে।

এখন সেখানে রায়গৃহিণী অধোমুখে বসিয়া আছেন।

মাতার হাত ধরিয়া শ্রীলতা। দীপঙ্কর চকিতে দেখিয়া লইল শ্রীলতার চোখের পাতা ভিজে কি না।

মাতার অন্যদিকে বড় মেয়ে ললিতা। ললিতা কথা বলে কম। বৃহৎ বনেদী-বাড়ির বৌ হইয়া সে সংসার দেখাশোনা সংসার চালানোর কাজে এতই রপ্ত যে কথাবলায় সময় নষ্ট করে না। সম্প্রতি চোরা-কুঠুরি হইতে বাসন-পত্র উদ্ধার করিয়া কামরুণী অর্থাৎ ঝিদের মার্জনা করিবার নির্দেশ দিয়াছে। বোনদের দেখিয়া মাতার অনিবার্য শোকসিন্ধু উত্তাল হইয়াছে বুঝিয়া পাশে বসিল।

অন্যদিকের তক্তপোষে (এ ঘরে খাট নাই কারণ মেয়েদের বসিবার নিজস্ব ঘর হিসাবে এখানাই ব্যবহার হয়।) বুলুর মা সাবিত্রী, বড়বধূ জয়া ও মেজবধূ সুষমা। মালতী, বিনতা মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়াই স্নানে গিয়াছে।

বাইরের হাতীবারান্দায় ব্যস্তত্রস্ত ছায়া। শ্রীলতা কন্যা ও পুত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত। শ্রীলতার খুব তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছে। আয়া ফিডিং বটল পরিষ্কার করিয়া দুধ ঢালিতেছে।

বিনয়েন্দ্র ছায়ার কাছে পুত্রকে পৌঁছিয়া সোজা পুকুরে গেল এইমাত্র।

সম্পা, নিখিলেন্দ্রসহ সুভদ্রা মিত্রকে তাঁহার নির্দিষ্ট দোতলার ঘরে লইয়া গিয়াছে। পাশের বাথরুমে স্নানের গরম জল টানা হইতেছে। বুলু সকৌতূহলে সঙ্গে গেল।

গৃহিণী সকরুণস্বরে বলিলেন, এসো বাবা। বসো ঐ চেয়ারটায়। আজ তোমরা সকলে একসঙ্গে মিলেছ অথচ তিনি দেখতে পেলেন না। তাঁর ভারি সখ ছিল একসঙ্গে এখানে সকলকে জমায়েত করেন। কিন্তু একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ায় আর হয় নি। তাই বোধ হয় এখানেই শেষ কাজ করবার আদেশ দিয়ে গেছেন।

গৃহিণী চোখের জল মুছিলেন। শ্রীলতা মাতার রিক্ত হাতখানির উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

রায়বাড়ির কঠোর বিধান রায়-পুরুষের মৃত্যু হওয়ামাত্র রায়-নারী নির্বিচারে ত্যাগ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধবা শাঁখা-সিন্দুর-লোহা বর্জন করিয়া হাতে-গলায় হাল্কা গহনা ধারণ করিতে পারেন। লালপাড় ও রং বর্জন করিয়া যে-কোন শাড়ি পরিতে পারেন। অন্যান্য প্রসাধনও অল্পবিস্তর চলে।

এ যুগেও কিন্তু রায়বাড়িতে বৈধব্যের রূপ নিরঙ্কুশ, শাদা থানে, রিক্ত আভরণে এক মুহূর্তে রাজরাণীকে ভিখারিণী না সাজাইলে রায়বাড়ির শান্তি নাই।

শ্রীলতার মনে পড়িল বংশগত প্রথানুযায়ী মাতা প্রতি অপরাহ্ণে শ্বেতপাথরের জল-চৌকীতে প্রসারিত পদে বসিতেন। তাঁহার খাসদাসী পা দু'খানি লালে রঞ্জিত করিয়া দিত। রূপার চিরুণীদ্বারা চুলের জট ছাড়াইত ধীরে ধীরে। গৃহিণী নিজে সুবৃহৎ কবরী রচনা করিতেন। সোনার সিন্দুর কৌটা হইতে সোনার খড়কে দ্বারা সীমন্ত পরিশোভিত করিতেন। সেই কৌটাটি তিনি শ্বশুরগৃহে পদার্পণমাত্র আশীর্বাদী পাইয়াছিলেন। মাতার ড্রেসিং আয়না হীরাপান্নার কানফুল পরা, গলায় চওড়া ঝক্‌ঝকে সোনার হারপরা মুখখানি ধরিত। আলনায় মতিপাড়, রেলপাড়, কস্তাপাড়, হাতীপাড়, ফিতেপাড়, চ্যাটাইপাড়, সিঁথির সিন্দুরপাড়, টেক্কাপাড়, ভোমরাপাড়, লতাপাড়, ফুলপাড়, কল্কাপাড়, প্রজাপতি হইতে সুরু করিয়া নানা নক্সাপাড়, চিড়িতন-ইস্কাবন পাড়,—কখনও জরিগাঁথা, কখনও মুগা বা রঙিন রেশমে গ্রথিত, কখনও জলচুড়িতে চিক্কণ,—বাতাসে দুলিত। শাদা শাড়ির রং ছাড়িয়া মা কত পাড়ের ঐশ্বর্য ও সুচিক্কণ মাজাখোল পাইতেন তাহা অবর্ণনীয়। শান্তিপুরী, টাঙাইল, ধনেখালি, সিমলাই, ঢাকাই, ফরাসডাঙা, বাগেরহাটী, বহরমপুর, মেদিনীপুর, কাঁথি নানাস্থানের সূক্ষ্মবস্ত্র বৃহৎ শাড়ি রাখার লোহার আলমারীটি অধিকৃত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিলের অতি ফাইন নানাপাড় শাড়ি, ছাপা শাড়ি, বম্বে, পুণা, আমেদাবাদী শাড়ি, জয়সুরী, সিল্কী, নানা প্রদেশের শাড়ির হাট বসিত। কখনও শাদা ভয়েলে শাদা লেস, শাদা রেশমে জরি, গরদ-তসর, কড়িয়াল, বেনারসী, মুর্শিদাবাদী, কাঞ্চিভরম, বাঙালোর, চান্দেরী, র-সিল্ক। শাদা শাড়ির হাট বসিত গৃহিণীর বস্ত্রভাণ্ডারে। মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ পূজাপর্ব উপলক্ষে নানাবিধ প্রণামী দিত নানাপ্রকার শাড়িসহ। বিবাহের বছর শ্রীলতার মনে আছে মায়ের প্রণামী একখানি ট্রে ভরিয়া দীপঙ্কর সাজাইয়া দিয়াছিল।

শাদা ধবধবে জরিপাড় বেনারসী, সোনা বাঁধানো চিরুণী, রূপার অতিবৃহৎ সিন্দূরের গাছকৌটা, সোনাবাঁধানো শাঁখা ও লোহা, রূপার ফ্রেমে-ধরা আলতার শিশি ও আয়না। সেই শাড়িই বা মা একবারের বেশি পরিয়াছেন কি?

শাদার শোভায় মুগ্ধ শ্রীলতা বলিত, আমিও তাড়াতাড়ি শাদা শাড়ি ধরব। তা হলে আমার এইরকম সব শাড়ি পরা হবে।

মাতা কন্যার দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলিতেন, নাও না, তোমার যেখানা যেখানা ইচ্ছা তুলে নাও।

শ্রীলতা পলায়ন করিত, না দরকার নেই। একবার ভাঁজ ভাঙার পরেই ধোবাবাড়ি দিতে হবে। আমার রংই ভাল।

বিরাট রায়বাড়ির আঙিনার কোণে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল একঘর ধোবাকে। সে টিনের ঘর তুলিয়া প্রাচীরের আড়ালে বাস করিত বিনা ভাড়ায়। বিনিময়ে রায়-বাড়ির কাপড় কাচিত।

প্রত্যহ কর্তা ও গৃহিণী যে কাপড় পরিতেন সন্ধ্যায় ধোবাবাড়ি যাইত। বৌ ও কন্যারা অবশ্য বার দুই করিয়া নিজেদের আটপৌরে শাড়ি বাড়িতে পরিত। গোটা পরিবারের পক্ষে প্রত্যহ ভাঁজ-ভাঙা শাড়িপরা চলিত না। পরবর্তীযুগে অতটা রসদ ছিল না, বনেদী চালও কমিয়া গিয়াছিল। তবে রায়-পুরুষের প্রতিদিনের বাহির যাওয়ার স্যুট ইস্ত্রিশাসিত হইত, প্রতিদিনের জুতায় কালি উঠিত।

শ্রীলতার ঘরে খাটের উপর কিছুক্ষণ পরে সে দেখিতে পাইল সেই শাড়িখানি। সমুদ্র-তলার হাল্কা গোলাপী প্রবালের মত, পদ্মকুঁড়ি বুকে কোষের রক্তিমাভ গোলাপীর মত যে আধহাত চওড়া পাড়ে হাত রাখিয়া শ্রীলতা শাদা শাড়ি ধারণের বাসনায় লোলুপ হইয়াছিল, সেই শাদা শাড়িখানি ফিনফিনে খোল উড়াইয়া প্রতীক্ষু। মাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সেইসব শাড়ির ঐশ্বর্য আজ কোথায় অদৃশ্য? রিক্তপাড় শাদা থানে রায়গৃহিণীর বরাঙ্গ আবৃত।

মাতার অর্ধাশনক্লিষ্ট হাতখানির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীলতার স্মরণ হইল এই হাত কখনও গোছাভরা চুড়ি, কখনও মকরমুখো বালা, কখনও কারুকার্য-খচিত কঙ্কণে শোভা পাইত। শ্রীলতার উপহার শাঁখাবাঁধানো, লোহাবাঁধানো, মাতা সানন্দে ধারণ করিয়া কন্যা-জামাতাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত পরা শেষ হইয়া গিয়াছে।

মাতার চিরদিনের মত রিক্ত বঞ্চিত মূর্তি সহ্য করা যায় না।

ক্ষুব্ধ শ্রীলতা ভাবিল; আজ যদি মাতা গত হইতেন পিতার কিছুই আসিত যাইত না। হাতের আংটি, কব্জির ঘড়ি খুলিতে কেহ বলিত না। কোঁচানো ধুতি, গিলে পাঞ্জাবী পরা বাদ থাকিত না।

আরও দুর্ভোগ আহারে। রায়গৃহিণীর মাছ ভিন্ন মুখে অন্ন রুচিত না। কাঁটাকুটো দ্বারা নিত্য পৃথকভাবে একটা চচ্চড়ি তাঁহার ভোজনের রূপার থালার পাশে রান্না করিয়া বাটি ভরিয়া রাখিতে হইত। পোষা বিড়ালকুলের প্রীতি উৎপাদনে থালের পাঁশে মাছের কাঁটার পাহাড় জমিত।

আজ মা মুখে ভাত তুলিবেন কি প্রকারে? পঁয়ষট্টি বছরের অভ্যাস একদিনে ছাড়া কত ক্লেশদায়ক বৃদ্ধবয়সে বিধবারা ভাল জানেন।

পাথরের বাসনের আলমারী হইতে গোছা ধরিয়া শ্বেতপাথরের বাসন বাহির হইয়াছিল। সৈন্ধব-নুনসহ কাঁচকলা-আলু ভাতে আলোচালের ভাত, গাওয়া-ঘি মাখিয়া অশৌচে একবেলা খাইয়া আছেন রায়গৃহিণী। রাত্রে কাঁচা দুধ, ছানা ও ফলমূল।

এগারো দিনে অশৌচ অন্তে নিয়মভঙ্গের দিনে সকলের মুখে মাছ কেবল মাতার পাতায় অনন্ত নিরামিষ। খাদ্য-সংযম,

একাদশী-পালন, অম্বুবাচী প্রভৃতি নানা ব্রতপার্বণে সংযম রায়-পরিবারের বিধবার অবশ্য কর্ম।

রায়বধূ অশনে-বসনে একবেলার মধ্যে ব্রহ্মচারিণী হইবে। অন্যথায় অখ্যাতিতে ভুবন ভাসিয়া যাইবে। যাহাদের বাড়ি বিবাহিতা বধূ সজ্জা না করিলে নিন্দা, সেই বাড়িই আবার বিনা দোষে পতিবিহীনাকে কাঙালিনী সাজাইয়া বংশগৌরব রক্ষা করে।

দীপঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। অশৌচে প্রণাম নাস্তি নইলে এখানে অনেকবারই মাথা লুটাইতে হইত।

দু-একটি কথার পরে জয়া উঠিয়া গেল। শাশুড়ীর সহিত আগে সে দেশে চলিয়া আসিয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রাদ্ধ করিবে, জ্যেষ্ঠাবধূ কর্ত্রী। জমিদারী দেখেন মহেন্দ্র, ব্যাপারকর্ম দেখিবে জয়া। মেজছেলে বড় চাকুরে অমিয়েন্দ্রের স্ত্রী ছায়া কলিকাতায় নেতৃত্ব করিলেও এখানে দ্বিতীয়া।

জয়া সর্বপ্রথম রান্নাঘরে গেল। এত বেলায় নিরামিষ রান্না হয় তো অরুচিকর লাগিবে। ভাত বাদ দিতে হইবে ছেলে ও সাবালক নাতিদের বেলায়। কদমমণির নেতৃত্বে রাঁধুনী-বামুন লুচি ভাজিতে বসিয়াছে।

বারমেসে রান্নাঘর দু'ভাগে ভাগ করা। একদিকে খাবার ব্যবস্থা। সারি সারি শালকাঠ, সেগুনকাঠের পিঁড়ি রক্ষিত। এক-একখানার ওজন এত বেশি যে পাতিয়া দিতে বেগ পাইতে হয়। বিশিষ্ট অভ্যাগতদের জন্য পিঁড়ির উপর পুরু গালিচার আসন পড়ে। দালানের মধ্যে অবশ্য টেবল-চেয়ারে খাওয়ার আয়োজন আছে।

কোমর-সমান উঁচু আধাআধি প্রাচীর ঘরকে দু'ভাগ করিয়াছে। প্রাচীর চওড়া তাকে পরিণত। মাথায় জলের তিনটি বৃহৎ পিতল-কাঁসার কলসী, কলসী রাখিবার বিশেষ গর্তে বসানো। একটি কালো পাথরের থালিভরা গাওয়া-ঘির ছোটবাটি ও চামচ, নুনদানী, কাসুন্দির বাটি ও ঝিনুক, পাতিলেবুর টুকরো। ভাতের থালা পড়িলে এইগুলি জনে জনে বিতরিত হয়। পাশেই কলাই-করা থালায় ভাগে ভাগে আচার। বারমাস তেলে পোড়খাওয়া মাটির হাঁড়ি, কড়ির বোয়াম ও কাচের শিশি বোতলভর্তি আচার হবিষ্যি-ঘরের তাকে মজুত। আমসত্ত্বও রাখা আছে। রাত্রে গরম দুধের বাটিতে অথবা ঘনদুধে আমসত্ত্ব ছিঁড়িয়া দেওয়া হয়।

ওই হবিষ্যিঘরের অর্ধ-অন্ধকারে নানা রহস্য শ্রীলতা-সম্পার কিশোর মনকে প্রবুদ্ধ করিত। আমতেল, তেঁতুল-কাসন, মোরব্বা, জ্যাম-জেলি, নানাবিধ আচার, পাঁপর ইত্যাদি তৈরির সময়ে তাহারা দেখিত বৃহৎ বারান্দা ভরিয়া বাড়ির সকলে ও পাড়ার মেয়েরা বসিতেন। আশেপাশের বাড়ি হইতে পাড়ার মেয়েরা প্রায় প্রতিটি কাজকর্মে হাত লাগাইতেন। অনেকে রায়বাড়ির প্রজা, অনেকে অনুগ্রহভাজন। দুর্গাপূজায় ভোগরন্ধনেও তাঁহারা আসিতেন। বাড়িশুদ্ধ সকলের চার-পাঁচদিন আহার, নৈবেদ্য, অর্চনার হাঁড়িভর্তি চিড়ামুড়কি, মণ্ডপের বাতায় ঝোলা কলার কাঁদি, দেওয়ালে বাঁধা আখ লাভ হইত। ভোগ-রাঁধুনী নূতন শাড়ি পাইতেন।

কাজ বেশি হইলেও লোকও বেশি ছিল। তাই মনের প্রভাবে যেন কাজের পাহাড় উড়িয়া যাইত। হাঁড়ি-হাঁড়ি আচার ঘরে উঠিত। কোথায় অদৃশ্য হইত ঘরটির আধো-

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

— ব্রাঞ্চ সমূহ —

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

আলোছায়ায়। কারণ ঘরের অধিকাংশ জানালা রুদ্ধ থাকিত। প্রকাণ্ড বারান্দায় ছোট ও নীচু তক্তপোষে মাদুর বিছানো। সেখানে মেয়েরা বসিয়া পান খাইতেন।

পরের দিন মুখোমুখি রান্নাঘরে থালায় বাহিত হইত আচার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পূর্বে। ডালের সঙ্গে আচার, তরকারির সঙ্গে তেঁতুল-কাসন, ভাজির সঙ্গে কাসুন্দি, দুধের সঙ্গে আমসত্ত্ব, এগুলি রায়-পুরুষের চিরাচরিত খাদ্য ছিল।

প্রচুর ফল বাড়ির ফলের বাগানে উৎপন্ন হইত, সেগুলির সদ্ব্যবহার জ্যাম-জেলি ও আচারে চলিত। ভাতের পাতে কদাচিৎ জ্যাম-জেলি লইলেও স্টিমারস্টেশন হইতে আনীত রুটি, কলিকাতার বিস্কিট, গৃহজাত লুচি-নিমকী-সিঙাড়ার সহিত নিত্য জ্যাম-জেলি দেওয়া হইত।

সাবু ও ডাল দিয়া মেয়েরা পাঁপর মেলিতেন, কেয়াখয়ের বানাইতেন, নানারূপ পানের মশলা ভাজিতেন। বহুসংখ্যক ঠাকুর-চাকর-ঝি থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্ত রায়-বাড়ির বধূকন্যাদের অবকাশ ছিল না।

বিশাল সম্পত্তি ক্ষেত, খামার, বাগানে ভর্তি। কেবল নিজেদেরই যে-সকল শস্য, তাহা রক্ষা করা সুকঠিন। সারাদিনে কাজ ফুরাইত না।

শ্রীলতার মনে আছে কতবার দেশের কর্ম-পদ্ধতি দেখিয়া সে তাজ্জব মানিত। তাহাদের

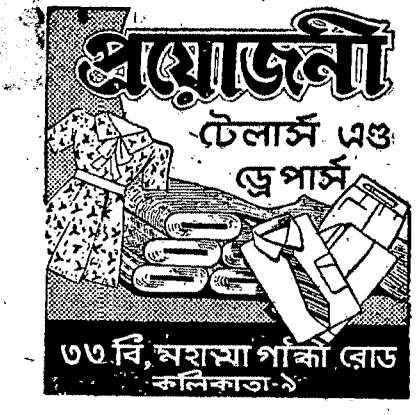

শহরে বাস। সেই সময়ে পিতামহ শেখরেন্দ্র রায় দেশে থাকায় 'রবরবা' অবস্থা। শ্রীলতা, সম্পা ও বোনেরা ভাইদের সঙ্গে ছুটিতে আসিত। পূজার অনেকদিন পূর্বে কাজকর্মের হেতু মা আসিয়া থাকিতেন।

ফ্রকপরা সম্পা ও সদ্য-শাড়িপরা শ্রীলতা হবিষ্যান্ন ঘরের কানাচে লুব্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। ছানা-মাখন-ক্ষীর-সর খাইয়া তাহাদের অরুচি। ওই ঘরে যে লেবুর আচার আছে, জলপাইয়ের আচার আছে, ফিকে সবুজ, তেলেজড়ানো কালচে তুকে তরুণ দাঁতের ছাপ বসাইয়া, জিভদ্বারা চাটিয়া খাওয়ার সাধ। ছড়া তেঁতুলের গুড়ে ডোবা অম্লস্বাদই বা কি চমৎকার!

তাহাদের ঘোরাফেরা করিতে দেখিলেই ডাক পড়িত। ঠাকুরমায়ের নির্দেশে কেউ না কেউ ডাকিয়া নানা সুখাদ্য হাতে দিত, কিন্তু আচারের কথাটি তুলিত না।

ইঁদারার পাড়ে ঘি-এর চাঁচি মুঠো ভরিয়া খাইতে খাইতে সম্পা বলিত, দিদি, চেয়ে আনি?

সরবাঁটা ঘি-এর কড়াই চাঁচিয়া যে লালচে চাঁচি, তাহা শর্করা সহযোগে একটি সুখাদ্য। শ্রীলতা স্বস্তিকা অথবা ক্ষীরের ছাঁচ মুখে বলিল, উঁহু, হাংলা ভাববে।

কি যে বল তুমি? আমাদের নিজের জিনিস চাইলে কি হয়? পাড়ার সবাই যে অরুচি হলেই আমাদের বাড়ি আচার চায়, তার বেলা? যাঁরা আচার তৈরি করলেন, তাঁরাই বা পাথরের বাটি, শিশিবোতল ভরে ভরে কত কত নিলেন।

তেলে টুপটুপে সেই আচার ভাত খাইবার সময়ে অবশ্য মিলিত।

ঘরে মাখন হয় কয়েকদিন অন্তর।

মার্খনতোলা দুধ 'মাঠা' জাগ ভরিয়া রান্নাঘরে কলসীর পিঁড়ের ওপর বসানো। যার ইচ্ছা খাও, পাশেই গ্লাস।

নীচে পিঁড়ে ছোট ছোট খুপরীকাটা। সেখানে 'ছোঁয়ালেপা' মাছ বা তরকারির বাটি ইত্যাদি গোছানো থাকিত। হেঁসেল প্রাচীরের ওধারে। হেঁসেলে তোলা চলিবে না।

হেঁসেলে সারি সারি নীচু উনুন। কাঠ-বাখারির জ্বালে রান্নায় বসিয়া রন্ধনকারীকে উনুনের গর্তে খড়ি ঠেলিয়া জ্বালের তারতম্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইত। গ্যাসের ন্যায় আঁচ কমানো বা বাড়ানো চলিত।

উনুন চওড়া করিয়া সিমেন্টে বাঁধা, ঝিঁকগুলি মাটির। উনুনের পাড়ে কিছু শুষ্ক খড়ি ও সোলা মজুত থাকিত রান্নার সময়ে। রান্না অন্তে সমস্ত সরাইয়া গোবর-মাটি দিয়ে দুইবেলা ঘরের ঝি লেপিত। দুইধারে সারি সারি তাক ও প্রশস্ত মেজে ভর্তি রন্ধন ও উপকরণ।

রান্নাঘরের বারন্দা কিছু অংশ ঘেরা। যেন আরও একটি ছোট রান্নাঘর। দুইটি উনুন কাটা। এখানে জলখাবার, জলগরম ইত্যাদি কাজ চলে। অন্যদিকে সেই বারান্দায় বেশ কয়েকটি পাতা পড়ে—সরকার ও গোমস্তাদের পুরোহিত ও তজ্জাতীয় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ উল্টোদিকে হবিষ্যান্ন-ঘরের বারান্দায় ভোজনে বসেন।

আজ বারান্দায় উনুনে জল গরমের হাঁড়ি। ঘরে লুচি-ভাজা-তরকারির স্তূপ। মাছ-মাংস-বিহীন আহার ক্রিয়াকে সরস করিতে ছানার ডালনা, পায়েস, মালপোয়া। ক্ষীরের হাঁড়িরও মুখ খোলা হইয়াছে।

দোতলা হইতে সম্পা ও নিখিলেন্দ্র নামিয়া আসিল সুভদ্রাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। সম্পা বলিল, দীপঙ্করদা', আপনারও ব্যবস্থা ওপরে। চলুন, নিয়ে যাই।

আমি কি পথ চিনি না?

উত্তরে সম্পা বলিল, তা হোক, আজ জামাইমানুষ—আসুন।

নিখিলেন্দ্র বলিল, তুমি এখানে মায়ের কাছে বোস। আমিই নিয়ে যাই।

ও, তুমি বুঝি এখনি আবার যাবে? যাও না।

সম্পা বারান্দায় চলিয়া গেল। মায়ের রিক্তমূর্তি সে দেখিতে চায় না। সে চায় ভুলিয়া থাকিতে।

হাতীমাথা দালানে দুই চৌরাকুঠুরী হইতে যাবতীয় বাসনপত্র বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারী ভারী নানা দর্শনের তৈজস-পত্রে দালান ভর্তি।

শৈশবে এই দিনটি সম্পা ভালবাসিত। বাসনের গাদার মধ্যে বসিয়া সারাদিন কাটিত তার। কামকরুণীরা বাসনপত্র মার্জনা করিতে পুকুরঘাটে লইয়া যাইবে তাহাও সহ্য হইত না সম্পার।

কলিকাতায় কাচ ও রূপার চলন ছিল অধিক। পিতল-কাঁসার বাসনগুলি সেখানে আধুনিক ও হাল্কা।

এই সকল সাবেকী বনেদী বাসনের রূপ বিচিত্র। সম্পার চক্ষে অদ্ভুত সুশ্রী লাগিত। বেলী বা উঁচু-কাঁধা কাঁসী কি নিরেট সুন্দর। জামবাটিগুলিরই বা গড়ন কি নিটোল। ভারী কাঁসার হাতা জামবাটিতে নাড়াচাড়া

করিয়া সম্পা মনে মনে পুতুলখেলার খেলনার আনন্দ পাইত।

পিতলের পুরু বালতীগুলি হাতে ঝুলাইয়া সম্পা চামচে আকারের প্রকাণ্ড পিতলের হাতা দিয়া কাল্পনিক ব্যক্তিদের মাংস পরিবেশন করিত। বড় বড় পরাতগুলি নাড়ারও সাধ্য ছিল না তার। বগীথালা ও গ্লাসবাটি সে তুলিতে পারিত না।

পূজার অতিকায় ঘণ্টা অতিকষ্টে দু'হাতে নাড়িত সম্পা। পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি পিতলের অপ্সরীর গায়ে মুগ্ধ হাত বুলাইত। শঙ্খ-বসানো তেপায়া, ঠাকুরের তোলা পিতলের চৌকী, সিংহাসন প্রিয় ছিল সম্পার।

শাদা পাথরের বাসনগুলিও সে সাবধানে নাড়িত-চাড়িত। ধবধবে শাদা পাথরের দ্যুতি যেন পবিত্রতা ও ধর্মসাধনার দ্যোতক।

কখনও কামকরুণীর দল বাসনসহ ঘাটে চলিবার পথে পিছু পিছু সম্পাও ছুটিত।

বাঁধানো প্রকাণ্ড ঘাটের পাশে পুকুরপাড়ের মাটিতে বাঁশ ও কঞ্চি পুঁতিয়া বাসন মাজিবার অস্থায়ী ঘাট বাঁধা হইত গোটা কয়েক। সেখানে বাসন মাজা চলিত ব্যাপারের সময়ে।

কামকরুণীরা আমরুলপাতা, তেঁতুল, পদ্ম-পাতা ঘষিয়া বাসন মাজিত ঝকঝকে করিয়া। সেখানে দাঁড়াইত সম্পা।

পুকুরের ওপাশে দীর্ঘ দেবদারু গাছ শ্রেণিবদ্ধ। চিল চক্রাকারে ঘুরিয়া আগার ডালে কখনও বা বসিতেছে। গাছপালায় শ্যামলিত পুকুরপাড়ে জলের স্নিগ্ধ বাতাসে কতদিন সম্পা মনোহরের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

পুকুরের ঘাটে একটা কামরাঙা পাড়িয়া এক কামড় বসাইত সম্পা। টকে দাঁত-মুখ জরিয়া যাইত। নুন পাইলে ভাল হইত। কিন্তু বাড়ির মধ্যে গেলে নির্ঘাৎ বকুনী টক খাওয়ার ফলে। কামকরুণীদের বলিলে আনিয়া দিবে। কিন্তু সম্পা এদের যেন নিজেদের বেতনভোগী বলিয়া মনে করিতে পারিত না।

মনে হইত অতিথি মাত্র নিজেরা। আবার কয়েকদিন বাদে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই ঐশ্বর্যময় বাড়িখানি তাহাদের নয়, বিচিত্র জীবনপদ্ধতিও তাহাদের নয়। তাহারা আসিয়াছে মাত্র।

সুতরাং আধখাওয়া কামরাঙা ফলটি টুপ করিয়া পুকুরের জলে নিক্ষিপ্ত হইত। চারিদিকে কুলকুলে ঢেউ তুলিয়া ডুবিয়া যাইত। মাছের মাথা লোভে লোভে জাগিয়া উঠিত।

সেই বাসন। অনেক যোজন পথ হাঁটিয়া সম্পা ফিরিয়া পাইল সেই সকল পাত্র; যেখানে পিতামহের জীবন ধরা ছিল। পিতা তখন যুবক, দেশে পূজায় অগ্রণী। সেই বাসনে আজ ধরা হইবে পিতার জীবনের শেষকৃত্য।

বাসনগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু বাসনের মালিক নাই! অথবা মালিক বদল হইয়াছে।

মাটির পরিচ্ছন্ন উঠোনে পা দিয়া সম্পা পায়ের ক্যানভাসের চটীটি ছুড়িয়া দিল একপাশে। এখন চর্মপাদুকাধারণ নিয়ম-বিরুদ্ধ। এমন সুকোমল, স্নেহশীতল মাটির স্পর্শ বাঁচাইয়া মালতী ও বিনতা পায়ে চটী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু সম্পা পায়ের পাতায় গাঁথিয়া লইতে চায় মাটির প্রেম। পায়ের তলা কোমল মৃত্তিকাচূর্ণে ধূসর হোক।

দক্ষিণদ্বারী ঘরে সারিসারি মাটির গ্লাস ও খুরি তুলিয়া দিতেছে কুমোর। তাহারাই পূজার প্রতিমার বায়না পায়। বুড়ো দেউড়ী এখন পুরোপুরি সোজা হইতে পারে না। সঙ্গে নাতি। সদর ফটকে বড় নৌকা বাঁধিয়া দেউড়ী মালপত্র যোগান আনিয়াছে।

কোমর বাঁকা দেউড়ী দু'হাত ভরিয়া হাঁড়িকুঁড়ি তুলিয়া দিতেছে ঘরে। পেছনে গ্লাস ও খুরির ঝাঁকা মাথায় নাতি। বারবার তাহাদের উঠোন ধরিয়া যাতায়াতের প্রয়োজন হইতেছে। বুড়ো দেউড়ী দু'হাতে দুইটি মালসা, মাথা নীচু। বাঁকা কোমর, উঠোন পার হইতে সম্পার চোখে পড়িয়া গেল।

তুমি নিজে কষ্ট করে মাল বইছো কেন? চাকররা নিয়ে আসতে পারে।

দেউড়ী অতিকষ্টে কোমর খানিক তুলিয়া বলিল, না দিদি, কষ্ট কি? আমাগরের কাজই তো এই। আপনি কোন দিদি, কন?

আমি সম্পাদিদি। চিনলে না কি?

হ, চিনি না আবার। আপনার বোম্বাই বিয়া হছে।

সম্পার চোখের পাতা স্পন্দিত হইয়া উঠিল। নগরজীবনের জটিলতায় বুড়ো দেউড়ী নামে যে কেহ আছে সম্পার মনের কোণে স্থানও পায় নাই। কিন্তু এখানে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই লোকটি নির্ভুল লক্ষ্যে সম্পার জীবনের গতি ছকিয়া যাইতেছে। যেহেতু সম্পা তাদের জমিদারের একজন সন্তান।

রাজা ও প্রজার এই যে সম্পর্ক, এ কি কেবল নিছক স্বার্থমাত্র?

গৌতম বলিত শিল্পবিপ্লবের পর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হইল স্বার্থের। একদল লোক অন্য একদলের উপর প্রভুত্ব করে নিছক অর্থের মাহাত্ম্যে। কিন্তু এখনও তো পল্লীগ্রামে সেই বিকৃতি দেখা দেয় নাই। কত কি হইয়া গেছে, এখানে তো এখনও প্রাচীন কাহিনীর চিরাচরিত রূপ।

গৌতমকে আনিয়া দেখাইতে হয়।

কিন্তু কোথায় গৌতম?

সম্মুখে বুড়ো দেউড়ী কি বলিতেছে?

সম্পার বিবাহ হইয়াছে কোথায়?

বোম্বাই।

বোম্বাই? সেখানে তো গৌতম থাকে না।

সমস্ত মন-প্রাণ হাহাকার করিয়া বর্তমানে জাগিয়া উঠিল।

গৌতম কোথাও নাই।

শীতল মাটির শৈত্য সম্পার নগরলালিত দেহে অপরিসীম শান্তি বহন করিল প্রতি পদক্ষেপে। এখানে পায়ে পায়ে কে যেন কানে কানে ডাকে: সম্পা—সম্পা—সম্পা—সম্পা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া ছায়াতীরে

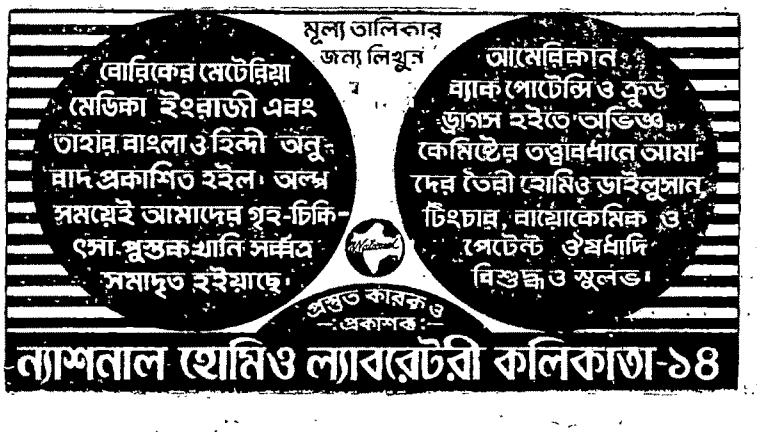

পদ্মের ন্যায় বাড়িখানিকে গাছের ছায়ায় লতার দোলায় দোলায় মাধুর্যময় লাবণ্যে ঘেরে। অন্ধকার লঘু এখানে। প্রশস্ত-অবাধ আকাশের নীচে ইটকাঠের খাঁচার শিকে বাঁধা অন্ধকারের ন্যায় জান্তব বিভীষিকা নয়। আকাশের আলো এখানে ঝরে, তারার আলো এখানে নামে। আর যদি চাঁদ থাকে, সেই চাঁদের পুলকোচ্ছ্বাসে গ্রামায়ানি ভাসে। অন্ধকার হাল্কা মেঘের ভেলায় সাঁতার দেয়।

কতদিন মনে আছে—পায়ে পায়ে ভোগের ঘরের উঠোনের দিকে চলিতে চলিতে মনে পড়িল সম্পার, সন্ধ্যার আলো নামামাত্র দীর্ঘ প্রদীপের শিখাজ্বলা ঠাকুরমায়ের দালানের ঘরখানি তাহাকে ডাকিত। ঠাকুরমা (শেখরেন্দ্র রায়ের স্ত্রী) আলোর কাছে বসিয়া সলিতা পাকাইতেন বেতের ঝাঁপি করিয়া। সেজের আলোয় তাঁহার কাজ চলিলেও ঝক্‌ঝকে পীলসুজে অবজ্ঞা ছিল না। ঘরে ঘরে চাকর বড় বড় লণ্ঠনের আলো রাখিয়া গেছে। গোলবারান্দায় গ্যাসবাতি জ্বলিতেছে।

সম্পার মনে হইত সমস্ত দিনের খেলাধূলা অন্তে ঘরে ফেরার আনন্দ নিশ্চিন্ত আরামে ভরা,—শীতের রাত্রে নরম বিছানায় গরম লেপের আয়াসে তুলনীয়। ধুলো কাদামাখা সম্পাকে বুঝি এখনই ঘরের ঝি হারাণী হাতীবারান্দায় হাতমুখে জল দিয়া টার্কিশ তোয়ালে দ্বারা মার্জনা করিবে। তারপর? ঠাকুরমায়ের গা ঘেঁষিয়া বসিবে সম্পা—সেই সেকালের ছোট মেয়েটি। পীলসুজে তেলবাতি কি অপূর্ব লাগিবে সম্পার ঘুমেভরা মাদুরে দু'চোখে! ঠাকুরমায়ের কাঁচাপাকা কুঞ্চিত চুলে মহাসুগন্ধি তেল, এসেন্সের সমান গন্ধ তেলের। চন্দন সাবানে মার্জিত দেহ ঠাকুরমায়ের সুরভিত।

শেখরেন্দ্র রায় সাহেবী ধরণ-ধারণ ভালবাসিতেন। তিনি অনেক সময় পাশ্চাত্য ভাবে চলিতেন। তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া অতি জেদী শেখরেন্দ্রজায়া নিজের মত চালাইতেন।

কলিকাতায় মিত্র-পরিবারে প্রবেশ করিবামাত্র শেখরেন্দ্রের পরিবর্তন, কাহিনীর পূর্বার্ধে আমরা দেখিয়াছি। মিত্র ভাগিনেয়ী রুচিরার রুচি প্রৌঢ় শেখরেন্দ্রকে আবিষ্ট করিয়াছিল। অতএব শেখরেন্দ্রের নব্যকেতা গৃহিণীর 'দু'চোখের বিষ' ছিল।

তাই শেখরেন্দ্র আপনমনে টেবিলে আহার গ্রহণ করিলেও গৃহিণী সাবেক প্রথা সরোষে আঁকড়াইয়া ছিলেন। রায়বাড়ি পদ্মাপাড়েও জগাখিচুড়ি।

শেখরেন্দ্রজায়া যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, বহু পুরুষ ধরিয়া সেই সকল জীবনযাত্রা প্রণালী সৌরীন্দ্ররায়-মহিষী পরিবর্তন করেন নাই। শহরে আধুনিক জীবনী লিখিত হইলেও পদ্মাপাড়ের দেশে প্রাচীনা প্রতীক্ষায় থাকেন। এতদিন পরে ফিরিয়া সেই প্রাচীন জীবনধারাকে পাওয়া গেল।

সম্পা গল্প শুনিতে চায়। রায়গৃহিণী তাহাকে বৈচিত্র্যময় কাহিনী শোনাইতেন। কখন শ্রীলতা, পার্বতী, জ্যোতি চলিয়া আসিত, সম্পার গল্পে ভাগ বসাইত। অনিচ্ছায় উঠিতে হইত সম্পাকে হারাণীর সঙ্গে। রান্নাঘরে প্রকাণ্ড পিঁড়ের সামনে একবাটি ঘন দুধ, কলা, রাঘবসই নামক বিখ্যাত মিষ্টান্ন। মিষ্টির প্রতি কামড়ে কামড়ে মিছরীর চূর্ণ দাঁতে পিষ্ট হইত।

সারা পৃথিবী তখন সম্পার কাছে ওই রাঘবসই। কামড়ে কামড়ে মিছরীর স্বাদ। আজ পৃথিবী প্রতিগ্রাসে তুলিয়া দিতেছে কাঁকর। আজ পায়ে পায়ে পৃথিবী কি বলে, শোন না সম্পা।

...সম্পা আহার, স্নান ভুলিয়া গেল...
...রসগোল্লা নির্মাণ দেখিতে লাগিল।

সে বলে: সম্পা, তুমি কি জান না, তুমি অন্যরকম। তাই তোমার মতি ছিল সাহিত্যে। খেলাচ্ছলেও কৈশোরে মেকী বস্তু তুমি গ্রহণ কর নাই, বাছিয়া তোল নাই জীবনের ঝুলি হইতে। তাই সম্পা, তোমার এত ব্যথা।

চালাঘরের নীচে ভিয়ান বসিয়াছে। সেখানে এখনও আলো জ্বালা হয় নাই কিন্তু উনুনে আগুনের আভার খোলতাই হইতে সুরু দেখা যায়। কাঠের টুলে বসিয়া ভিনাইকর ফুটন্ত রসগোল্লার কড়াইতে ঝাঁঝরি চালাইতেছে। অপরদিকে অন্য জন বাটা সন্দেশের পাক পরীক্ষা করিতেছে। তাহাদের দলে পনেরো-ষোলজন লোক। পাঁচরকম মিষ্টান্ন দুই হাজার লোকের আন্দাজে প্রস্তুত হইবে। অতএব লটবহরও প্রচুর।

সম্পাকে দেখিয়া প্রধান হালুইকর সসম্ভ্রমে বলিল, আসেন আসেন দিদি। দেখেন আমাগারের কাম কেবা চলতেছে।

হঠাৎ সম্পার মনে হইল এই আয়োজন শোকোৎসব নয়, আনন্দের আয়োজন। গাদাগাদা পাটকাঠির আগুনের নীলাভ দীপ্তি সূচনা করে মহাজীবনের আলোকমার্গ।

সত্যই তো তাই। জীবন শেষ হয় না, অনন্ত জীবন। শুধু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। জীর্ণ আধার ত্যাগ করিয়া অনন্ত ব্যাপ্তি, অগাধ মুক্তি যে আত্মা লাভ করিয়াছে, তার জন্য উৎসব করিতে হয়। তাই এত আহার, এত লোকজন, এত উৎসবমেলা।

হালুইকর বলিল, এ বাড়িতে আমরা আর কি কাম করে দেখাব? আমরা শুনছি যে এই বাড়ির ঠাগ্‌রেণরা নাকি এমন খাবার বানাতে পারেন যে আমাগারের হার মানবের হয়।

সম্পা নিজের হাতের দিকে চাহিল। অশৌচে মলিন কিন্তু বিলাসিনীর হাত। এই হাতে সম্পা মুখে রং চড়াইয়াছে, শাড়ির বিন্যাস ঠিক করিয়া দিয়াছে, চুলের তদারক করিয়াছে, ফুল সাজাইয়াছে, পিয়ানো বাজাইয়াছে। কিন্তু আর কি সে দিতে পারিল? দশজনের রসনা-তৃপ্তির ব্যবস্থাও হাত করিতে পারে না। সম্পা বলিল, তাঁরা জানলেও আমরা

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী
॥ ১৩৭১ ॥

(প্যাস্টেল)

স্তব্ধ অতীত
—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আর কি জানি, বল? তোমাদের কাজ দেখে শিখে নিচ্ছি।

ততক্ষণে একটি বেতের মোড়া পড়িয়া গেছে। দালান হইতে ভিয়ানকরদের একজন দিদির জন্য আনিয়া দিয়াছে। নিজেদের বসা আসন চলিবে না।

সম্পা স্নান ভুলিয়া গেল, আহার ভুলিয়া গেল। মোড়ার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া একাগ্রচিত্তে রসগোল্লা নির্মাণ দেখিতে লাগিল। যেন তাহার জীবনে ওই রসগোল্লার পাত্রটি অখণ্ড মনোযোগের বস্তু।

সম্পার সমস্যাসঙ্কুল জীবনের তার পুরাতন সুরের ছন্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

॥ দুই ॥

আবার সুয়িংডোরের ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ শব্দ উঠিল। মহেন্দ্র সেজভ্রাতা অমিয়েন্দ্রসহ অন্দরে আসিলেন। দাদাদের দেখিয়া শ্রীলতা হাতীমাথা বারান্দায় চলিয়া আসিল। এতক্ষণে খুকুকে একটু দেখাশোনার সুযোগ মিলিল।

অমিয়েন্দ্র শ্রীলতার পরিত্যক্ত স্থানে মাতার পাশে বসিল। মেজবধূ ভাসুরকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। সাবিত্রী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। কাজের বাড়ি বসিয়া থাকা চলে না। রায়-গৃহিণী শান্ত হইয়াছেন।

মহেন্দ্র দীপঙ্করকে বলিলেন, হামিদুল্লা খবর পাঠিয়েছে সে সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। বাইরের কাছারীঘরেই ওর বসার ব্যবস্থা করি। আতরদান, গোলাপপাশ এগুলো নিয়ে সাজিয়ে দিলেই হবে।

দীপঙ্কর বলিল, দরকার আছে কি, দাদা?

আছে বৈকি, তোমাদের বন্ধু হ'লেও সেই তো এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। তাকে আমাদের সমাদর করা উচিত। বাবার আমলে গোলবারান্দার বৈঠকখানায়ই ওঠানো হোত। কিন্তু একটা যজ্ঞের বাড়ি, পুরুৎমশায়রা ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে কথা তুলবেন। ওখানেই ফরাস সাজাতে বলে দিয়েছি বুধে সরকারকে।

অমিয়েন্দ্র বলিল, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা, ক্রফির ব্যবস্থা করতে হবে। হামিদ নারকেলের মিষ্টি ভারি ভালবাসে। খুড়িমার হাঁড়িতে হয় তো তৈরি আছে।

রায়গৃহিণী এতক্ষণে স্বাভাবিক হইলেন। স্বামী তো গেছেন, এখন উপযুক্তভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিতে ছেলেদের পাশে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তিনি বলিলেন, নারকেলের খাবার প্রচুর করা হয়েছে। বড়বৌমা নিজে সমস্ত করিয়েছে।

মাকে প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে নামিতে দেখিয়া ছেলেরা স্বস্তি পাইল। মেজবৌ সুষমার মনে পড়িল তাহার ছেলেমেয়ের এখন একগ্লাস করিয়া গরম দুধ খাবার সময়। অভ্যাগতদের গোলমালে ভুল হইয়া গেল কি না দেখা দরকার। সে-ও উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল, মা, সইমা না কি কয়েকদিনের জন্য এসেছেন পোরজনায়। ওঁরা ওঁদের নারায়ণ শিলাটি নিয়ে যাবেন কলকাতায়। আমরা কাল পোরজোনায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবো। অমিয়, বেশি করে কার্ড ছাপিয়ে এনেছ তো?

রায়গৃহিণী বলিলেন, আর এখন সুরবালা এসে আমার এমন মূর্তি দেখে কি সুখ পাবে? ভাদুড়ীমশাই মাত্র দু'বছরের ছোট ওঁর চেয়ে ছিলেন। দিব্যি সুস্থ আছেন। যা হোক, তোমাদের পিতৃদায়। সকলকেই বলতে হবে।

আহারতৃপ্ত মালতী-বিনতা এক ট্রে-ভর্তি খাদ্য হাতে দোতলায় সুভদ্রার উদ্দেশে চলিয়া গেল। বুলু সেখানেই উপস্থিত। নিখিলেন্দ্রও সেখানে। পুকুরে স্নানান্তে বিনয় আসিল। দীপঙ্কর ও অমিয়েন্দ্রকে স্নানে পাঠাইয়া সে মায়ের কাছে বসিল।

জানো মা, অরুণেন্দু পরশু দিন আসবে।

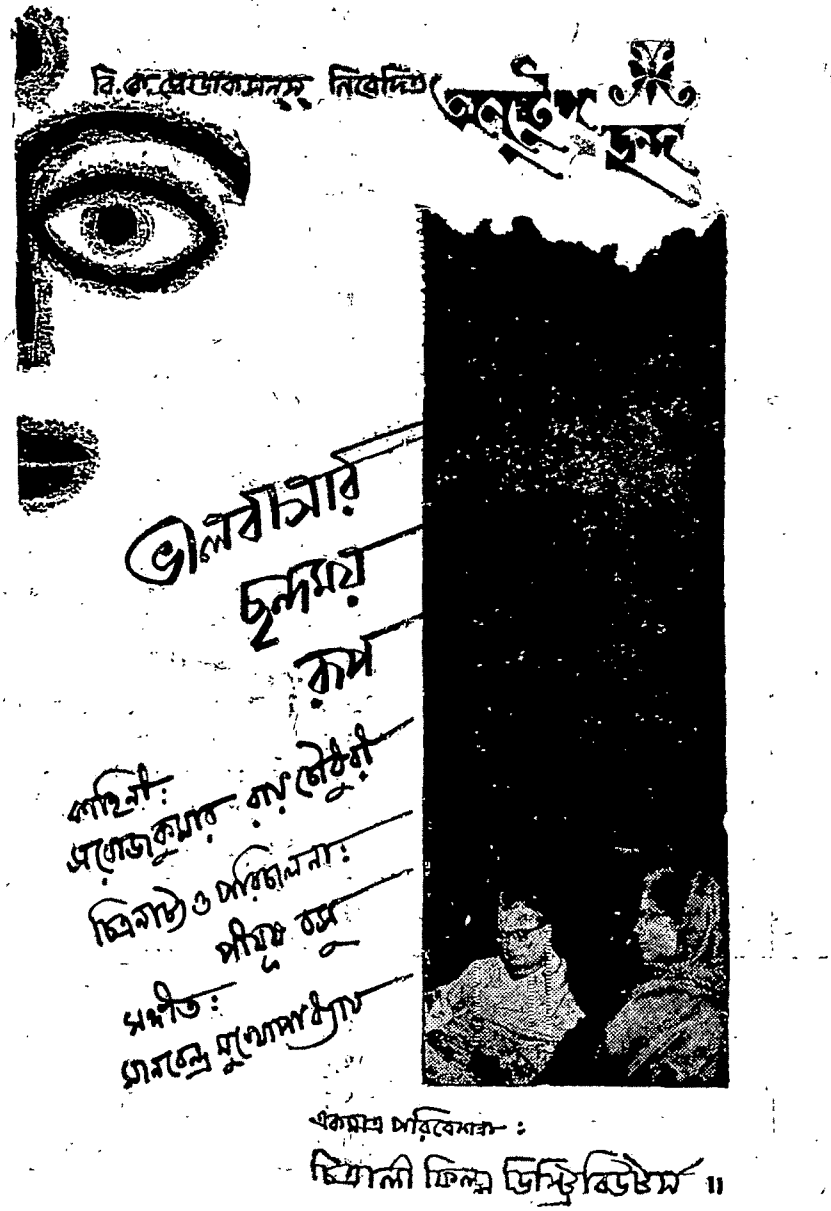

ছোটদি' ওর বন্ধু সুভদ্রা মিত্রকে বলেছে। আমিও তাই অরুণকে বলেছি। সে পাড়াগাঁ, মানে পাকিস্থান দেখে নি। হক সাহেবের কল্যাণে এবারে বহুলোক আনা সম্ভব হয়েছে।

রায়গৃহিণী নিরুত্তর রহিলেন।

বিনয় তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল। ততক্ষণে বুধে সরকার গোলাপপাশ, আতরদানী, বড় হাতপাখা প্রভৃতির জন্য মহেন্দ্রের নিকটে আসিয়াছে। মহেন্দ্রের ঘরে বৃহৎ লোহার সিন্দুকে রূপার দ্রব্যাদি থাকে। মহেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

বিনয় তীক্ষ্নস্বরে বলিল, শোকটা শাল-দোশালা নয় মা, যে গায়ে চাপিয়ে লোককে দেখাতে হবে। শোক মনের জিনিস। তোমার নিজের মনে মনে রাখতে হবে। এত লোকজনের মধ্যে তুমি কেন নিজেকে শক্ত করে দশজনের মত কাজে নামতে পার না? তুমি তো অথর্ব হও নি। বাড়ির সকলের মাথা তুমি। এভাবে মুখ ভার করে এককোণে বসে থেকে সকলের দয়া ভিক্ষা করছো না কি?

রকমারী পোষাক ও বস্ত্রের জন্য
পদ্মাষ্টোর্স
হাতীবাগান • শিয়ালদহ
কলিকাতা
৫৫-৮৩৫৩ • ৩৫-৫৫২৮

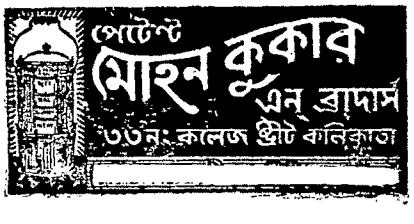

সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের সাকাপ কা কথা শুনিয়া রায়গৃহিণী অতিশয় বিরক্ত হইলেন। এই কাজ যে কোন কাজ মনে করিয়া তাঁহার হাত-পা উঠিতেছে না, সংসারনিয়ন্ত্রণের বল মনে আসিতেছে না, তাহা হাল্কা স্বভাবের তরুণ কি বুঝিবে!

কনিষ্ঠ পুত্রটি রায়গৃহিণীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান। কিন্তু তাহাকে এখন কঠিন তিরস্কারে তিনি প্রস্তুত হইলেন।

তবে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভাষা আসিল না।

এই কয়েকদিনে বিনয় কত রোগা হইয়া গেছে। পানের মত ত্রিকোণ কিশোর মুখখানি তার লম্বাটে ও ন্যাসপাতির ন্যায় পাণ্ডু। চোখের নীচে রাত্রি জাগরণের কালিমা।

রায়গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল ক্ষতি একমাত্র তাঁহারি নয়। এতগুলি সন্তান এতদিনের পিতাকে হারাইয়াছে।

সস্নেহে বিনয়ের একখানি হাত তিনি হাতে ধরিলেন।

মনে পড়িয়া গেল, নিত্য কিছু ফুল হাতে পিতার শয়নকক্ষে নিয়মিত প্রবেশ করিত। যেন ফুলগুলি দিতেই আগমন, অন্যথায় কোন প্রয়োজন নাই, এমনি ভাব ছিল তাহার। আধুনিক তরুণের প্রথায় কাঁধ বাঁকাইয়া অন্যমনস্কভাবে সে পিতার প্রতি গভীর অনুরাগ গোপন রাখিত।

মনে পড়িয়া গেল একদিন কি সন্তর্পণে সে পিতার গায়ে গরম চাদরটি টানিয়া দিতেছিল। তাহার একাগ্র মুখে লেখা ছিল অপরিসীম মমতা। পিতার শেষপুত্র বিনয়—পিতৃবিহনে তাহার দুঃখ সে তো কাহাকে বলিতে যাইতেছে না। বিনয় মাতার হাত ধরিয়া বলিল, ঝেড়ে ফেল জোর করে।

বিনয়, তুই কি বুঝবি? সধবা থাকার সাধ যে মেয়েদের মজ্জায় মজ্জায় থাকে। আমি তো সাধারণ একজন ঘরের বৌ। আমাদের সারা জীবনের সাধ আলতা-সিঁদুর নিয়ে চলে যাওয়া।

আলতা-সিঁদুরে বিশেষত্ব কি আছে, মা? ও তো পাতার রস, রাসায়নিক বস্তু। পুরুষের সম্পত্তি হও তোমরা। পাছে একের অধিকারে অপরে হাত দেয় তাই তোমাদের অঙ্গে অঙ্গে ছাপ। যদি ইচ্ছা থাকে বলে যাও তোমার মৃত্যুর পরে আমিই তোমাকে সিঁদুর-আলতায় সাজাবো।

রায়গৃহিণীর সমস্ত মুখ লোভের ছায়া মুহূর্তে সতৃষ্ণ করিয়া তুলিল। সযত্নে দমন করিয়া তিনি বলিলেন, ওসব অনর্থক কথা রাখ খেতে চল।

যাবো মা, যদি তুমি নিজের হাতে আমার পাতে খাবার দাও। বাবা নেই তুমিই আমাদের দেখবে। এটা কি তোমার দূরে সরে শোক করার সময়? এস, চল।

রায়গৃহিণী পুত্রের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আবার সমগ্র কর্মপরিধির কেন্দ্রবিন্দুরূপে কাহিনীতে তাঁহার নব অভ্যুদয় দেখা গেল।

তারপর যথানিয়মে রায়কর্তা সৌরেন্দ্র রায়ের পারলৌকিককিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। সে যজ্ঞ পুরাণের অশ্বমেধের মত প্রাচুর্যে ও বৃহত্বে বিশিষ্ট। 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম' শব্দে বহুসংখ্যক লোকের আহারক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইল সমুদ্র বহিয়া গেল লোকের আগমনে। বিশাল রায়বাড়ি আর একবার প্রাচীনকালের মত জাগিয়া উঠিল। ভোরের সঙ্গে পুণ্য-ক্রিয়া সুরু হইয়া রাত্রিদ্বিপ্রহরে শেষ হইল শেষ কাঙালীটির পরিতৃপ্ত ভোজনের সঙ্গে। দেশান্তর হইতে নৌকা ভরিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আসিলেন। মাথুর পদাবলীর করুণ মূর্ছনায় শেষ রায়কর্তার শেষ বিদায় ধ্বনিত হইল।

ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরোল,—
কানু কানু করি ঝুর!

॥ তিন ॥

ক্রিয়া অন্তে চপলেন্দ্র চলিয়া গেলেন, কারণ কয়েকটি বড় বড় কনট্র্যাক্ট আছে। তাঁহাকে দেখিবার অজুহাতে সুষমা স্বীয় পুত্রকন্যাসহ চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল ললিতা। ললিতার স্বামী পুত্রকন্যা পাকিস্থানে আসিবার অসুবিধা অজুহাতে আসা বাদ দিয়াছিল। অতএব তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল।

অল্পবয়স্করা অনেকেই কয়েকদিন থাকিয়া যাইবে। অমিয়েন্দ্র আগামীকাল মাতাসহ রওনা হইবে। ছায়া পরীক্ষিৎকে লইয়া অনুগামী। মহেন্দ্র ও জয়াকে বেশ কিছুদিন থাকিয়া যাইতে হইবে। কারণ একবার যখন আসা হইয়াছে তখন যতদূর সম্ভব সম্পত্তি ইত্যাদির বিলিব্যবস্থা করিয়া যাওয়াই সমীচীন। মালতী ও বিনতার পড়া কামাই, কলেজ খোলা। তাহারাও যাইবে।

দীপঙ্করকে লইয়া টানাপোড়েন চলিতেছে। নিখিল সময় হাতে লইয়া

আসিয়াছে। সম্পার স্বামী রঞ্জিৎ আসিতে পারে নাই দুঃখপ্রকাশক টেলিগ্রামটি ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন মহেন্দ্রের নামে আসিয়াছিল। অতএব সম্পাও নিখিলের সঙ্গে থাকিবে। সুভদ্রাকে জোর করিয়া তাহারা ধরিয়া রাখিয়াছে।

বিনয় বন্ধু অরুণেন্দুসহ আশেপাশে যত দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আজ সকালে রায়বাড়িতে প্রভাত নামিল।

নিটোল-নিরবচ্ছিন্ন প্রভাত, শোকের কলুষমুক্ত। কাকের কা-কা ডাকে দোতালার ঘরে সুভদ্রা মিত্রের ঘুম ভাঙিল।

উঁচু খাটে নরম মখমলের মত কোমল শয্যায় সুভদ্রার চোখের আবেশজড়িত স্বপ্নে একটি মূর্তি প্রথম দেখা দিল।

আধময়লা থানপরা, মাকিনের মোটা সেমিজ গায়ে খালিহাত বুলু।

সে বিগতযৌবনা নয়। বেশবিন্যাসে থাকিলে সে হয় তো সুশ্রীনারীর পর্যায়ে পড়িত। পল্লীগ্রামে রক্ষণশীল পরিবারের বিধবা হিসাবে আজ সে একটি নামবাচক সংজ্ঞা মাত্র।

যেহেতু সে স্বামীপুত্রহীনা, অতএব নিঝঞ্ঝাট। খালি হাত-পা। সুতরাং যত বাড়তি কাজ সেখানে ভাজাবড়ি বুলুর ডাক পড়ে।

মাতা সাবিত্রী বারমাসের রান্না বুলুকে করিতে দেন না সত্য, কিন্তু যতটা ফাইফরমাস খাটিতে হয় তদপেক্ষা একস্থানে বসিয়া রান্না করা সহজতর ছিল।

একাদশীদিনে জলগ্রহণের অপরাধে বুলু তরঙ্গিণীশাশুড়ীর খুন্তির ছেঁকায় বর্ধিষ্ণু শ্বশুর লোহাইগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল।

অতএব গৃহের নিভৃতে একাদশীর দিনে মাতা বুলুকে ছানা-ফলমূল সহকারে দ্বিপ্রহরে একগ্লাস মিছরীর সরবৎ ধরিয়া দিতেন। রাত্রে দুই-চারটি নারিকেলের মিষ্টান্ন জুটিত।

সাবিত্রী দেবী ঝড়ের মত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশ্বরের কাছে একাদশীর দিনে ব্রাহ্মণঘরের বিধবাকে জল দিবার অপরাধে মার্জনাভিক্ষা করিতেন। এখন পাকিস্থান হওয়াতে ব্রাহ্মণঘরের আচার নিয়ম বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পাহারা দিবার লোকও নাই। মুসলমানশাসিত পাকিস্থানে যেমন অনেক সহ্য করা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, তেমনি আচার-নিয়মের প্রাচীরেও ফাটলধরা উক্ত হেতু স্বাভাবিক। অন্নের অপেক্ষা বড় কিছু নাই এমত সত্য উদ্ভাবনে পাকিস্থানী বিধবা অনশনব্রত ত্যাগ করিয়াছেন।

ডাক্তারবাড়ির সরযূ তো স্পষ্টই বলেন, আমাগারের আর কি রইলো, কও? শুঠামুটা না খ্যায়া মরি ক্যান? আমাবতীর (অশ্বত্থবাচী) মধ্যে ভাতই খাই।

অনাথ সরকারের বিধবা পিসি বলে, গরীবের সংসার। পোষ্য এতগুলান। অনাথ কনে থিকা কি করবে? বড়লোকের নাগাল আলাচাল পাব কনে? সেদ্দা চালই খাই।

সনাতনধর্মের যে নিজস্ব কোন শক্তি নেই, সেই তথ্য সহসা বিভক্ত পূর্ববঙ্গে প্রচারিত হইয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র ম্লেচ্ছবিনাশিনী মাতাকে আহ্বান করিলেও ম্লেচ্ছ বা যবনশাসন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য খণ্ডন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। দেবমন্দির অপবিত্র হইলে দেবতা কথাটিও কহিতেছেন না।

সুতরাং কিভাবে অখণ্ড সনাতনধর্মে আস্থা থাকে?

আজ সকালে উঠিয়াই বুলু তাহাদের দিকে রান্নাঘরের উনুনে পাটকাঠি ও পাতার জ্বালে কেটলিভর্তি জল চাপাইয়াছে।

ভুঁইমালী পচার বৌ লালপাড় কলের শাড়িখানা মাথা ও গলায় জড়াইয়া দুই হাতে দীর্ঘ নারকেলকাঠির ঝাঁটা ধরিয়া উঠোন গোবরজলে নিকানোর কাজে লাগিয়াছে। মাটির কলসীভর্তি গোবরগোলাজল, পাশে মাটির মালসায় ঢালিয়া ঢালিয়া সারা উঠোনে ছিটানো পূর্বেই হইয়া গিয়াছে।

আঁটসাঁট গড়ন পচার বৌ-এর। মুখে কথাটি নাই। বাবুদের বাড়ি কাজ করিতে আসিয়াছে তাই নোংরা কাজ হইলেও কাপড়খানি পরিষ্কার। পুকুরের অপরপাড়ে দেবদারুগাছের নীচে ছনের চালাবাড়িতে তাহাকে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিতে দেখা গেলেও রায়বাড়িতে তাহাকে নিত্য প্রভাতে ধোপদোস্ত শাড়িতে দেখা যায়।

অপরপাশে তালগুঁড়ির সোপানে প্রায়ই তাহাকে ক্ষারবোলে সিক্ত কাপড় কাচিতে দেখা যায়।

কামরুন্নী ঝি হারাণী গতরাত্রের কতকগুলি হাঁড়ি-কড়াই হাতে ঘাটে যাইতেছিল। পচার বৌকে দেখিয়া দাঁড়াইল, অ ভুঁইমালী বৌ, বাসি ভাত-তরকারী আছে। ঘরে যাওয়ার আগে নিও।

পচার বৌ-এর ধ্যানীবুদ্ধের মত নির্লিপ্ত মুখে কোন রেখা না ফুটিলেও চোখ চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। চল্লিশ টাকা মণের চাল কেনা তাদের মত মানুষের সম্ভবপর নয়। রায়বাড়ির জমি ভোগ করে সে জন্য তারা একবেলা অন্তত ত্রিশদিন ভাত পায়। এখন এঁদের যজ্ঞস্থলে দু'হাতে অকাতর অন্নদানে আবালবৃদ্ধবনিতা কয়েকদিন যাবৎ নিত্য ভাতের মুখ দেখিতেছে।

পচার বৌ এদিক-ওদিক দেখিয়া লোকজনের চিহ্ন না থাকিলেও চাপাসুরে বলিল, একটু বল্যা দিও নে, হারাণী। আমার নজ্জা করে চাতে।

- হারাণী বলিল, নজ্জা কিসের? রোজ কত কত লোকজন খায়া বাঁচতেছে। সরকার নাকি সর্বস্বি জমিদারী লয়া নিবে। কিন্তুক জমিদার না থাকলে কেডা এমনি করে ভাত বিলাবের পারবে আ, কয়ডা দিন যত পারি খায়া লই। তারপর জমিদারও চল্যা যাবে নে, আমরাও না খায়া মরমু।

বালাই আমার, ষাট আমার! তুমি মরব্যা ক্যান? তোমার না সাজাৎ আলি ব্যাঁচা আছে। হাটে থিকা চালডাল রাতবিরাতে তোমার দুয়ারে পৌঁছাবো।

পিছন হইতে ছুকরী কামকরুণী বাসিনী একগাদা রাত্রের ছাড়া কাপড়-চোপড় ভরা সাজি পুকুরঘাটে বহন করিতে করিতে টিপ্পনী কাটিল।

পচার বৌ আঁচল মুখে তুলিয়া চাপা হাসির আভাস ঢাকিয়া ফেলিল। একে সে মানুষটাই চাপা, তায় হারাণীর ওকালতি একগামলা ভাত-তরকারী পাইবার পক্ষে তাহার আশু প্রয়োজন। মুসলমান নাগরের উল্লেখে যদি হারাণী চটিয়া ওঠে তাহার কেস্ খারাপ হইয়া যাইবে।

হারাণী পানদোক্তাটেপা ঠোঁট বাঁকাইল। একহারা শ্যামচিক্কণ দেহখানি তার চল্লিশের কোঠায় নিত্য কায়িক পরিশ্রম ও নিত্য যৌন-ব্যবহার হেতু এখনও মাঝদরিয়ার নৌকা। একবাটি তৈলে প্রসাধন তার প্রত্যহ। তৈলদান করেন তাহার প্রেমিক সাজাৎ আলি।

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের পাকিস্থানে ভয় নাই। তাহাদের কিছু হারাইবার নাই। তাহাদের সমাজবহির্ভূত জীবনে মুসলমান নাগর রাখিলে আসে যায় না।

হাল্কা দেহের উপর লম্বা তামাটে ঘাড়ে তৈলচিক্কণ চুটকী খোঁপা নাচাইয়া হারাণী বলিল, ছুঁড়ির কথা শুনা গাও জ্বলে। সাজাৎ আলির ভারি মুরাদ যে আমারে খাওয়ায়। গতর খাটায়ে খাওয়া নাগে আমার। হ্যাঁ, কব্যা নিছে বলে পরাণের মা, তমুমাঝির বিটি।

পরাণের মা, তমুমাঝির বিটি একটি ছেলে সহ বিধবা হইয়া পিত্রালয়ের বাসিন্দা। বর্তমানে ডামাডোলের বাজারে এক ছেলে সহ তাহাকে সাঙা কেহ করিতে অগ্রসর না হওয়ায় দোরে দোরে গরুর গোয়াল সাফ করিয়া ফিরিত। ছেলে পরাণ ছেঁড়া তেনা পরিয়া গোবর কুড়াইত।

পাকিস্থান অন্য হিন্দুর ভাগ্যে যা-ই আনুক, পরাণের মাতাকে দিল বাদশাহী সনদ। থানার মুসলমান কনস্টেবল বসির হঠাৎ গোবরমাখা পরাণের মাতার আটাশ বছরের জীবনের মধ্যে মানসীর সন্ধান পাইল। গোঁফে চাড়া দিয়া বসির খাকি পোষাকের গরিমা প্রকাশ করিয়া রঙ্গালয়ে অগ্রসর হইল।

তমুমাঝি কন্যাকে গোপনে প্রহার করিলেও প্রকাশ্যে মুসলমান রাজত্বে কথাটি বলিতে সাহস পাইল না। শীঘ্রই পরাণের মা বাড়ির কানাচে ঘর তুলিয়া আলাদা হইল। সম্প্রতি চালে ছনের পরিবর্তে ঢেউখেলানো ধব্‌ধবে শাদা টিন উঠিয়াছে। সরকারী চাকুরে বসিরের রক্ষিতা তমুমাঝির বেটির পদমর্যাদা বাড়িয়াছে। পরাণ হাফপ্যাণ্ট ও ছিটের শার্টে সজ্জিত হইয়া বসির কনেস্টবলকে কাকা ডাকে ও কাকা ও মাতার সশব্দ সুরতক্রীড়ার সময়ে মিটিমিটি চোখ বুজিয়া ঘুমের ভাণে পড়িয়া থাকে।

যখন মাতাকে দিয়া কোন কাজ হাসিল করাইতে হয় ছেলে মাকে ভয় দেখায়, হুঁ হুঁ আমি দেইখা ফেলাছি। তোমারে চোকীর উপর ঠেইল্যা বছির কাক—হুঁ হুঁ! আমি দেইখা ফেলাছি।

মা ব্যাকুল হয়, ধনডা আমার এসব কইতে নাই, ছি! নেও, সিকিডা ধরো, জেলাপি কিনা খায়ো।

বাসিনী বলিল, অগো, তোমাগো অমনি পাকা টিনের ঘর হইবে। ভয় কি? যে ঘাটে কয় না নাও বাঁধছাও।

আলো ছুঁড়ি, তুই না এখনও দালান কোঠা নি বানায়ে নিবের পারিস। তোর বয়াসডা আছে। তা না ঐ জোলার পো নিয়া মত্ত! তার না এক রাঁড় যুটছে। কও না গা, পচার বৌ? তোমারই না ঘরের কথা।

পচার সর্বকনিষ্ঠ খোকা জেলে গ্রামের ক্লার্ক গেবল। অসংখ্য অনায়াস প্রেম-কাহিনীতে জীবন তার পূর্ণ। বাসিনীর মনের মানুষ সে। কিন্তু বাসিনীর একাগ্র সাধনায় খোকাকে বাঁধা যায় নাই। ভিনগ্রামের সদ্যবিধবা জেলেনী পরফুল্ল (প্রফুল্ল) খোকার মনোহরণ করিয়াছে সম্প্রতি।

ব্যর্থপ্রেমিকা বাসিনী জ্বলিয়া উঠিল, নিজের দালান কোঠা বানায়া নাও গা। নোভে নোভে অমন নেড়ে নিয়া শুবের পারব না।

বাসিনীর উচ্চভাষণে হারাণী প্রমাদ গণিল। রায়বাড়ির গৃহিণী শক্ত লোক। যদি কানে ওঠে এখনি হারাণীর পূজার বাসনমাজা কাজ ঘুচিয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি বাসিনীর পিঠে হাত রাখিল, ও বাসিনী, রাগস ক্যান? খোকা আবার তুই থাকতে রাঁড় যুট্যাবে ক্যান? কও না, পচার বৌ।

পচার বৌ এতক্ষণ প্রমাদ গণিতেছিল। খোকা তাহারি দেওর, সুতরাং মুহুর্মুহুঃ তাহাকে সাক্ষী মানা হইতেছিল। পচার বৌ বিপন্ন। হারাণীর ওকালতি ভাতের গামলার স্বপ্ন আনিয়া দিলেও বাসিনীকে সে চটাইতে চায় না। বাসিনী গতকাল তাহাকে একগোছা পান ও কয়েকটা সুপারি দিয়াছে গোপনে। পচার বৌ-এর পান খাইবার সখ অতিশয়। স্বামীর রোজগারে কুলায় না। এতএব সে চুপ করিয়াছিল। এখন হাওয়া অনুকূল দেখিয়া মুখ খুলিল, খোকা মাগী রে দেখবের পারে না। পরফুল্লই সাধাসাধি কইরা আসে। মনে হয় ঝাঁটা ধইরা মাগী রে খ্যাদাই।

বাসিনীর মুখে হাসি ফুটিল, হারাণীও স্বস্তি পাইল। হারাণী বলিল, কদ্দিন পরে প্যাট-ভরা খালাম, কও চে? মনে নেয়, বুড়া করতা যাতে আমরা খাইবার পারি তাই না এখানে ছেরাদ্দ করবার কথা কইল। তেনার যা ছাবতার নাগাল স্বভাব চরিত্তির ছিল! বাপের নাগাল না।

শারদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর
চণ্ডী-চিন্তা ৩৲
চণ্ডীতত্ত্বের এরূপ নিরুপম ব্যাখ্যা আর হয় নাই।
প্রাপ্তিস্থান—৫১, মানিকতলা মেন রোড, কলিঃ ১১

পূজার বিপুল আয়োজন
গোপীনাথ বস্ত্রালয়
সর্ব্ব ভারতীয় বস্ত্র, পোষাক ও ছিট কাপড় বিক্রেতা
আমাদের টেলারিং বিভাগ আছে
কে, এন, সি, রোড হরিতলা, বারাসাত

কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
কোষবৃদ্ধি, একশিরা, দৌর্বল্য প্রভৃতি চিকিৎসার জন্য চিৎপুর এবং হ্যারিসন রোড জংশনের এই ডাক্তারখানার সাইনবোর্ড দেখিয়া দোতলায় আসিবেন।
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৭
ফোন ৩৩-৬৫৮০

বাসিনী বলিল, তাই না ?

বাসিনী অল্পবয়স্কা, অতএব সঠিক সংবাদাদি রাখিতে পারে নাই।

পচার বৌ এধার-ওধার চাহিয়া চাপা-স্বরে বলিল, কিন্তুক ফটিক নাপিতের বৌ ?

সৌরীন্দ্রবাবু সামান্য কিছুদিন সান্ধ্যভ্রমণে নাপিত বাড়ির কানাচে ঘুরিয়া ছিলেন, সকলে দেখিয়াছিল। অধুনা বৃদ্ধ ফটিক নাপিত তখন সদ্য-বিবাহিতা সুন্দরী বধূ ঘরে তুলিয়াছে।

কিন্তু তাহার পরেই সৌরীন্দ্র রায় কলিকাতা চলিয়া যান। ইতিমধ্যে পাশের গ্রামের লাহিড়ী-জমিদার নাপিতানীতে উপগত হইলেন। এ বাড়ি আর জল গড়াইল না।

হারাণী বলিল, আরে না! এই বাড়িতে আর কারুর বারটান হয় নাই।

ক্ষীণ একটি দীর্ঘশ্বাস হারাণী দমন করিল। তাহারও একদিন প্রচণ্ড রূপযৌবন ছিল। মহেন্দ্র কর্তাও যুবক ছিলেন। নানা চেষ্টায় বারবার মহেন্দ্র কর্তার সম্মুখে সে পড়িত। কর্তারও দৃষ্টি ছিল না যে তা নয়। খাণ্ডার পত্নীর ভয়ে তিনি পা বাড়াইতে পারেন নাই। তা হইলে আজ কি হারাণীর সাজাৎ আলির পিঁয়াজ-রসুন সহ্য করিতে হয় বা বাসনমাজার কাজ এত বয়সে করিতে হয় ? রায়কর্তার রক্ষিতাদের মত সে পাকা ঘরে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইত। ফুলির মত জমি পাইত।

বাসিনী কাপড়ের সাজি নামাইয়া বসিয়াছিল উবু হইয়া। কাল একগামলা পান্তা খাইয়া শরীর তাহার সুস্থ লাগিতেছে না। তারপর পরফুল্ল মাগী আবার আসিয়া জুটিয়াছে। বোনাইবাড়ি আসার ঘটা দেখ না ? আসল মতলব খোকাকে ধরা।

হারাণী মাথার খোঁপায় একটা চড় দিয়া অধোগতি হইতে খোঁপাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিল।

ও বাসিনী, ওঠ। নাগরের নামে যে হাত-পাও ছাড়্যা দিলি! এখ্খনি এঁরা সগগলে ওঠ্বেন। কামকাজগুলান সার‍্যা থুই। শ্রীলতা দিদির ঝি-মাগী এখ্খনি ন্যমা দেখবের আসবে কাপড় ধোওয়া হইছে কি না। আহা, মাগীর কপালড়া কি রে! ফেরতা দিয়া কাপড় পর‍্যা চটি পায়ে ফটর-ফটর কর‍্যা বেড়ায় দেখ। লজ্জা করে না ?

পচার বৌ হারাণীর কথায় গোবরের মালসা আবার তুলিয়াছিল। জল ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, কপাল কইরা আসছিল। শহুরা লোকের ঝি হবার পারল। আমাগারের কপাল খালি গোবর ঘ্যাঁইটা গেল।

হারাণী বাসিনীকে ধাক্কা দিল, ওঠ ছুঁড়ি। এতক্ষণ আবার সারামজাদী পাতানী ঘাট ভর‍্যা বাসন লয়া বসছে। আগে কাপড়গুলান কাইচ্যা তোল। জল ঘোলা হয়া যাবে নে।

বাসিনী হাই তুলিয়া বলিল, আর পারি না বাপু। গা'র মধ্যে মাতা-মাতা করে।

হারাণী সন্দিগ্ধচোখে কহিল, গা'র মধ্যি মাতা-মাতা করে ? কেন রে ছুঁড়ি, কিছু বাধালি নাকি, ক!

হেই, হেই, ছিক্কো ছিক্কো! বলি রাত্তিরে শুই একা, আমারে বাধায় কেডা, শুনি ? বাসিনী একলাফে উঠিয়া কাপড়ের ঝাঁকা ধরিল, কাল পান্ত-খাওয়া বেশি হইছে।

অত খালি ক্যান ? চাড্ডা রাখে-ঢাকে খালি না ক্যান ?

খায়া নেই প্রাণ ভইরা। আজ তো আবার পাব নে।

বাসিনী গা দুলাইয়া ঘাটে চলিল, ছয়ডা কামকরুণী আছিল মছমুখী পরযন্ত। এখন চারডা মাত্তর। এত কাম ঠেলে কেডা। সঙ্গের ঝি-চাকর বাগোরের তো নবাব বাদশা। নড়া বসে না। ঐ যে রতনা দিদি আসতেছে। বক্‌বক্ লাগাবে নে। চললাম।

বাসিনী ঘাটে চলিয়া গেল। ওদিকে রায়বাড়ির পুরাতন ঘরের ঝি রতন আসরে নামিল। সারাবাড়িব্যাপী কর্মস্রোতের প্রভাতিক উদ্‌বোধন করার ভার শ্রীমতী রতনবালার। রাত্রির নীল ফিতা দিনের ধারালো কাঁচিতে কর্তন করিয়া কর্মপ্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন তিনি।

রতন হাত দুলাইতে দুলাইতে এদিকে আসিল। পেছনে ঘরের চাকর হারাণ কাচের বাসন হাতে চায়ের ঘরে চলিয়াছে। আর একটি ঘরের ঝি কুড়ানী সেখানে চায়ের জল চাপাইয়াছে এতক্ষণ।

বলি, করছাত্ত কি তোমরা এখানে ? এতক্ষণে উঠান ঝাঁড় হয় নাই। হারাণী, তের কি কামকাজ গিছে ? ঘাটে পাঁজা পাঁজা বাসন। এখানে দাঁড়ায়া গল্প করতেছিস।

না, রতনদিদি, আমি কইতেছিলাম পচার মারে যে তোমার ল্যেগে এক গামলা ভাত আছে। রতনদিদি আলেই পাবানে।

রতন প্রসন্ন হইল, আমি বলে দেখ্যাশুনা রাখি। বামুনঠাকুর বেশি হলেই আঁঠাশালে ঢালবের চায়। কাজ সারা হলে নিয়া যায়ো, পচার বৌ।

বাসন মাজার কামকরণীরা সকালের কাজ সারিয়া বাড়ি যাইবার সময়ে পিতলের একটি গামলাপূর্ণ ভাত ও তদুপযোগী ডাল, তরকারী, বাসিমাছ পায়। এই ভাতটা পান্তভাত। রাত্রে রান্না। ঝিদের প্রাতরাশ। আবার অপরাহ্ণে তাহারা কাজে লাগে। সন্ধ্যায় বাড়ি যাওয়ার প্রাক্কালে গরম ভাত ও টাটকা রান্না লইয়া যায়।

পচার মায়ের খাদ্য বরাদ্দ নাই। তাহার কাজ মাত্র সকালে উঠোন সাফ করা। তবে রায়বাড়ির দরাজ ব্যবস্থায় নিত্যই কিছু না কিছু জুটিয়া যায়।

হারাণী বলিল, চায়ের ঘরে চা হতেছে। বুলুঠাগরেণ আবার উনানে জল চাপায় ক্যান ?

রতন বলিল, কি জানি। আজ না একাদশী। তাই বুঝি সাতসকালে চা খায়া লতেছে।

একাদশীর উল্লেখে সকলেরি মুখ মলিন হইল। ইহারা ছোট জাত, একাদশীর ধার ধারে না। কিন্তু রায়গৃহিণী তাহাদের মনিব, লক্ষ্মীস্বরূপিণী। তিনি একাদশী করিবেন আজ।

রতন বলিল, বুলুঠাগরেণ একাদশীর ভয়ে না শ্বশুর থিকা পালায়া আলো। এখন অবিশ্যি একাদশী করে কেডা ?

হারাণী বলিল, আচ্ছা ওই মেমদিদিমণি কি এহন থাকবেন ?

পা খা ১।১০।৬৪ তাং হইতে ১০ মাসে কোন অতিরিক্ত নাই

নগদ ও সহজ কিস্তিতে বিক্রয় হইতেছে—ন্যাশনাল ইকো। জি, ই, সি। বুশ সিমেন্স TELERED, ট্রানজিষ্টার অলওয়েভ ও লোকাল। গদরেজ চেয়ার, আলমীরা ও প্রেসার কুকার পাওয়া যায়।

এলায়েড রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ

১৫৩।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬ ফোন ঃ ৩৫-৪৬২৬

কুকার রেডিও

মেমদিদিমণি কেডা ?

ওই যে দোতালায় থাকেন ? একা।

রতন মুখ ঘুরাইল, অ ! সম্পাদিদির বন্ধু উনি, সুভদরা দিদি। তা, একা একা থাকবেন ক্যান ?

ক্যান, ক্যান ? কও কি দোকা আছে না কি ? হারাণী গা ঠেলিয়া আসিল। পচার বৌও ঘোমটার ফাঁকে কচ্ছপের মত গলা বাহির করিল।

যা সর‍্যা যা, হারাণী। কব আবার কি ? ওই না নোয়া কর্‌তা দিন রাইত মুখে মুখে পড়্যা আছে। নজ্জাও নাই।

কও কি ? নোয়া কর্‌তা বিয়া করেন নাই। মেমদিদিক বিয়া করলেই তো হাঠা চুইকা যায়।

হারাণীর বাক্যে রতন গম্ভীরভাবে জ্ঞান বিতরণ করিল, বিয়া করবে কি কইরা ? সুভদরা দিদি না কায়াথ !

এই বাড়িতে কায়স্থ বিবাহ এতই অসম্ভব কথা যে কেহ আর পথ দেখিল না। শুধু হারাণী ফিস্‌ফিস্ করিয়া সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিল, তবে কি নোয়া কর্‌তা উয়ারে রাখছে ?

দূর মাগী, জ্যালানী (জেলেনী), কয় কি ? উনি পাড়াগাঁও দেখবের অ্যাছেন।

কুটির শিল্প

বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে

শুধু চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরে
ছোট-ছোট কুটির শিল্পে
নিজেদের নিয়োজিত করুন।
কুটির শিল্পের
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যেমন—

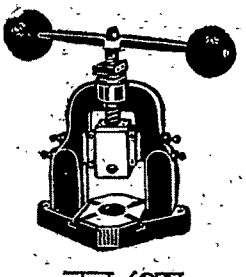

বল প্রেস

ফ্লাই প্রেস, এমবসিং ডাইপ্রিন্টিং প্রেস,
টালি প্রেস, পাওয়ার প্রেস ইত্যাদি
আমরা তৈয়ারী করে থাকি।

নন্দী এণ্ড কোং

১২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া
ফোন : ৬৬-২৩৬১

কলক্যাতায় উনি মস্ত লোক। বই ল্যাখেন।

যাহারা নিরক্ষর তাহারা বই লেখার লোক স্বচক্ষে দেখিয়া অভিভূত হইল।

॥ চার ॥

বুলুর মা সাবিত্রীও ঠিক তাই ভাবিয়াছিলেন।

এত ভোরে বুবি এককাপ চা করে খেয়ে নিমি আজ ?

সাবিত্রী শয়নকক্ষের দেয়ালে কালীঘাটের মা কালীর পটখানা প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন তাঁহাদের নিজস্ব চিলতে রান্নাঘরে বুলু উনুন ও জলের কেৎলি লইয়া ব্যস্ত।

না, আমি আবার পূজো না করে চা খাই কবে ? এ সুভদ্রাদিদির চা হচ্ছে। উনুনে ফুঁ দিতে দিতে ধোঁয়া-রাঙা চোখে বুলু জানাইল।

তা—চায়ের ঘরে তো কুড়ানী জল চাপিয়েছে ?

ওই চা তৈরি হয়ে উপরে পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি। সুভদ্রাদির সকালে বিছানায় শুয়ে চা খাবার অভ্যাস। এ কয়দিন ব্যাপারের বাড়িতে হয়ে ওঠে নি। কাল নিখিলদাদা আমাকে বলে দিলেন, সকালে সুভদ্রাদির চায়ের ভারটা যেন আমি নিই।

আর তুমি একেবারে রাজা হয়ে গেলে ! একাদশীর দিন এখন উনুনে জ্বাল পেড়ে মরো। আমি যাই কাপড় ছেড়ে চায়ের মিষ্টি, খাবার সব বার করে দেই। আজ বড়বৌ ওঠে নি। এ কয়েকদিন যা খাটুনী গেছে ! জয়া কাল বলেছে আমাকে, খুড়ীমা, আজ আমি নয়টায় ঘুম থেকে উঠবো। এদিকে যা করার আপনি করে নেবেন।

সাবিত্রী সাজে কাপড় ছাড়িতে আবার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বুলু চা ভিজাইয়া একটি ভাল কাপ সযত্নে গরম জলে ধুইয়া একটা ছোট বগী থালায় সাজাইল। এ ঘরে ট্রে নাই। একখানা আনিয়া রাখিতে হইবে। সাবিত্রী নিজেদের এলাকায় কিছু জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখেন। একটা খালি হরলিক্সের শিশিতে সরের নাড়ু ছিল—বুলুর বাবার প্রিয় খাদ্য। বুলু অবলীলাক্রমে একমুঠো ঢালিয়া ফুলকাটা পীরিচে সাজাইল।

গতকাল রাত্রে জয়া-বৌদি তাহাকে চারখানা সরভাজা রাত্রে জল খাইতে দিয়াছিলেন। অধিক বেলায় ভাত খাইয়া পেট ভারী ছিল। বিশেষত দশমীর রাত্রে জলযোগের বিশেষ আয়োজনের মধ্যে বুলু দুইখানির বেশি সরভাজা খাইতে পারে নাই। এখন বাকি দুইখানি কোণে ঢাকা দেওয়া পাথরবাটি হইতে তুলিয়া প্লেটে রাখিল।

নিখিলদাদা তাহার হাতে একটিন বিস্কিট দিয়াছেন। বিছানার চায়ে বিস্কিট ভিন্ন কিছু দিতে হয় না বলিয়াছেন। তা হোক, চারিদিকে এত খাওয়া-দাওয়া। দু'খানা শুক্‌নো বিস্কিট কি করিয়া অতিথির সম্মুখে ধরা চলে ? নিখিলদাদাদের বন্ধুকে যত্ন করিলে তিনি কত সন্তুষ্ট হইবেন।

বিস্কিটের টিন হাতে পড়িবামাত্র বুলু বুদ্ধি করিয়া একখানা ফুলকাটা প্লেট আনিয়া নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছে, কিন্তু ট্রে আনার কথা মনে হয় নাই।

শ্বশুরবাড়ির কথা আর মনেও পড়ে না বুলুর। কখনও বা ছোট ননদ আহ্লাদীর কথা মনে হয়। সেই তো উপলক্ষ হইয়া একাদশীর দিন তাহার গোপনে জল-খাওয়ার কথা বলিয়া দিয়া গৃহত্যাগ করাইল। কিন্তু কি লাভ হইল। ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে শ্বশুর লোহাই বাগচী হয় তো কিছু বিষয়-সম্পত্তি দিয়া যাইতেন। লোহাই বাগচী দেহরক্ষা করিয়াছেন, যাবতীয় বিষয় বড়-ছেলেকে লিখিয়া দিয়া। বুলুর নামটি পর্যন্ত কেউ করে নাই।

শ্বশুর অসুস্থ শুনিয়া বুলু দেখিতে যাইতে চাহিয়াছিল। বাবা ও ভাইরা কেউ গা করেন নাই। শেষসময়ে উপস্থিত থাকিলে শ্বশুর কি কিছুই না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন ?

পিত্রালয়ে বুলু স্বস্তি পাইয়াছে। খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধন মারাত্মক নয়। গরু-ভেঁড়ার খাটুনীও নাই। কিন্তু সুখ ? সে কোথায় ?

সুখ বুলুকে কে আনিয়া দিবে ?

পল্লীগ্রামে বালবিধবার কোথাও সুখ নাই। দিনরাত্র তাহার বিবর্ণ, কাজের চাকায় ঘোরে। ছাব্বিশ বছর বয়স তার। জীবন এখনই একঘেয়ে। একটা ছেলেমেয়েও নাই যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাদের ঘিরিয়া থাকিবে।

স্বামীকে বুলুর ভাল করিয়া মনে নাই। কতদিন একাদশীর অনাহারক্লিষ্ট দেহে নিজের সঙ্কীর্ণ তক্তপোষে বুলু শুইয়া মৃত স্বামীর ধ্যান করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু মুখের আদলটি পর্যন্ত মনে আসে না। সেকালে ছবিতোলার

ব্যবস্থা ছিল না। ছবি নাই। কেবল নিত্য-ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদগুলি স্টীলের তোরঙ্গ ভরিয়া আছে। শাশুড়ী বলিতেন এগুলো নেড়ে-চেড়ে রোদে দিও। তবু মনে শান্তি আসবে বৌমা। মনও ঠিক থাকবে। জানো তো ছড়ায় আছে—

পুড়বে নারী উড়বে ছাই,
তবেই নারীর গান গাই।

স্বামী এনট্রেন্স পাশ করিয়া পাবনা কলেজে এফ-এ পড়িতে গিয়াছিলেন। বড়ছেলে 'ঘরগোলা' মূর্খ হইল এজন্য লোহাই বাগচীর এই ছেলেটিকে বিদ্বান করিবার ঝোঁক ছিল। উকীল-মোক্তার হইয়া ছেলে বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টার কলেরায় সকল আশার সমাধি ঘটিল। ভাসুর অসুখ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। ছোটভাইকে একেবারে দাহ করিয়া স্টীলের তোরঙ্গটি সঙ্গে বাড়ি ফিরিলেন।

সেই তোরঙ্গ বুলুর ঘরে কাঠের জল-চৌকিতে সজ্জিত আছে। গৃহত্যাগের দিন বুলু সমস্ত ফেলিয়া আসিয়াছে।

যে স্বামীকে মনে নাই, তাহার স্মৃতিচিহ্নে বুলুর মতি নাই। তবে গয়নাগুলির জন্য মন খারাপ লাগে। সোনার যে এত দাম উঠিয়া যাইবে আগে জানিলে বুলু কোন কৌশলে শ্বশুরের লোহার সিন্দুকের গ্রাস হইতে গয়না ছাড়াইয়া রাখিত।

স্বামীর কানের পাশে একগোছা কোঁকড়া চুল-ভিন্ন কিছুই মনে নাই বুলুর। সামান্য কয়েকদিনের স্বামী-সহবাসে যন্ত্রণা ভিন্ন সে আর কিছুই পায় নাই।

আহ্লাদীর কথা মনে পড়িল। মেয়েটা দারুণ বোকা। নইলে একাদশীর দিন জলখাওয়ার কথা বলিয়া দেয়? ফল এমন হইবে জানিলে কখনই বলিত না। কারণ ওই মেয়েটিই তাহাকে গোপনে ফলফুলুরী আনিয়া দিত, নিজের ভাগের মিষ্টিখাবার খাওয়াইত। বুলু চলিয়া আসিবার পরে আঁকাবাঁকা অক্ষরে মেয়েটা তাহাকে চিঠি পর্যন্ত লিখিয়াছিল। সাবিত্রী উত্তর দিতে দেন নাই।

তারপরে আহ্লাদীর বিবাহ হইয়া যায়। না জানি পরের ঘরে বোকা মেয়েটার কি শাস্তি হইতেছে।

বোকা না হইলে অমন সব কথা—!

প্রথমে তরঙ্গিণী বুলুকে লইয়া কয়েকদিন একঘরে শুইতেন, বুলুর সদ্য-বৈধব্যের পর। তারপর নিজের ঢালা বিছানায় স্বামীর পাশে তিনি ফিরিয়া গেলেন। আহ্লাদীর উপর ভার পড়িল ছোটবৌদিকে রাত্রে পাহারা দেওয়া।

আহ্লাদী বলিত, বাঁচা গেছে। মা-বাবার ঘরে কি শোওয়া যায়? বুড়ো হয়ে ছরে পেয়েছে। এখনও রোজ রাত্রে—ধুড়ুম ধুড়ুম খাটের আওয়াজ।

আহ্লাদী ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার আশায় ভবিষ্যতে অমনি অনাগত রাত্রি তোলা আছে। হাত বাড়াইয়া যথাসময়ে সে পাইবে। তাই বিচলিত সে হয় না।

কিন্তু বুলুর নবযৌবন-দেহে সে রাত্রে কি অপরিসীম যন্ত্রণা বহনকরিয়াছে কথাগুলি!

যে শাশুড়ী তাহার কালো গোছাখরা চুল কাটিয়া দিয়াছেন, তাঁহার মোটা প্রৌঢ় দেহ আজ কামযজ্ঞে অশ্বমেধ ঘোড়ার মত নাচিতেছে!

যে শ্বশুর সংযমের উপদেশে তাহার দিবারাত্রি অসহ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি দেহভোগে নিজের বৃদ্ধত্ব ভুলিয়াছেন, গলিত-পলিত দেহে রতিক্রিয়া চলিতেছে, অথচ এখানে সে নিটোল-কঠিন শরীরকে ব্রহ্মচর্যশিলায় আছাড় মারিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে!

বুলুর মনে হইল যৌন-আরতি যৌবন ভিন্ন শোভা পায় না।

উত্তপ্ত শয্যায় বুলু এপাশ-ওপাশ করিয়া নিজেকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইল।

অনেক বিধবার মত বুলু কল্পনারাজ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে উদ্যোগী হইল।

কিন্তু কাল্পনিক ক্রিয়ায় স্বামীকে সে কখনও মনে করিতে পারে নাই। তাহার মুখের উপর যে সহাস্য-সুন্দর মুখ নামিয়া আসিত সে মুখ তাহার স্বামীর নয়।

দু'খানি বিস্কিট সাজাইয়া চায়ের থালা হাতে বুলু উঠোনের এপাশ দিয়া দোতালার উদ্দেশে পা বাড়াইল। সন্ধ্যামালতীর গাছগুলির দিকে চাহিয়া হঠাৎ বুলুর মনে হইল, আজ একাদশীর দিনে তরঙ্গিণী কি করিতেছেন?

বড়বৌ-এর ঘড়ির কাঁটার মত দুইবছর অন্তর নিয়মিত সন্তান হয়। সে নিশ্চয় সূতিকাগারে।

তরঙ্গিণী অবশ্যই বুলুকে উপদেশ প্রদান করিবার সময়ে ভাবেন নাই শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্যে এমন একাদশীর মরশুম জুটিয়া যাইবে। রায়বাড়ির দোতালা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া যেন জলে-ডোবা মানুষের চোখে শেষ ডাঙার দৃশ্যের ন্যায় বুলুর মনে পড়িল: তরঙ্গিণী আজ কি করিতেছেন?

মগ্নচৈতন্য তারপরেই ছবিগুলি মুছিয়া নিল। যেন কোন অনিবার্য ঘটনাস্রোতের প্রারম্ভে শেষ আশ্রয় ছিল ওই গতানুগতিক দাসত্বের বন্দীশালা। উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলি সেখানে মাথা নামাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিত সত্য, কিন্তু দুরান্তের অভিসারী বসন্ত বাতাস হয় তো অগোছালো শুষ্কপত্রের নিরুদ্দেশ-যাত্রায় তাদের ডাকিত না।

বুলু সন্তর্পণে সুভদ্রার দরজায় টোকা দিল। কোন গভীর স্বপ্নারতি যে চোখের পাতায় পরিসিক্ত, সেখানে প্রথম চিত্র বুলুর ফুটিয়া ওঠা বিচিত্র। কিন্তু গতরাত্রে সুভদ্রার শিয়রে কাচের ছোট কুঁজায় জল দিয়া, বালরদার পাখাটি রাখিয়া, যেমন সন্তর্পণে আজ সে প্রবেশোন্মুখ, তেমনি সন্তর্পণে প্রস্থানরতা ছিল বুলু।

যতদিন সুভদ্রা এখানে ততদিন তার কাছে কাছে একান্ত সেবিকামূর্তি ওই দীনমূর্তি বুলু। যত কাজ ঝি-চাকর সুভদ্রার জন্য করিয়াছে তাহার অনেক বেশি করিয়াছে বুলু। সুভদ্রা কুণ্ঠিত হইলে বলিয়াছে, তাতে কি? আমাকে আপনার ছোটবোন মনে করে নেন না।

অবশ্য নিখিল সুভদ্রাকে দেখাশোনার ভার বুলুকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিয়াছিল—এ কথা সত্য। কিন্তু শুধু কি অন্নদাতাদের প্রতি কর্তব্যবোধে বুলু ছায়ার ন্যায় সুভদ্রার কাছে কাছে ঘোরে?

যেখানে সুভদ্রা, সেখানেই বুলু।

বর্তমান যুগে কৃতজ্ঞতা এত কৃতজ্ঞ হয় না। অন্য কারণও গুহানিহিত শবের প্রকারে থাকে।

সুভদ্রা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতিকোমল শয্যায় পাশ ফিরিল।

সুভদ্রা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি ··পাশ ফিরিল

কি কোমল এই সুকোমল শয্যা! বনেদী কলকাত্তাই বড়লোকের মত সার্টিন ভেলভেট-মণ্ডিত নয় এ শয়ন। কিন্তু সাধারণ তুলোয় ও ছিট লংক্লথের আবরণে বালিশ-তোষকের কোমলতায় একান্ত অবেলায়ও চোখে ঘুম নামিয়া আসে। নূতন শিমূল-তুলোয়, বহুবার ধুনুরীর ধোনা তুলোয় প্রস্তুত বিছানা ডাঁফে (বাঁশের চালি) কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় বাঁধা থাকে। অভ্যাগতের জন্য নামানো হয়। বহুসংখ্যক অভ্যাগত আসিলেও কম পাড়ে না।

বুলুর চিত্র সুভদ্রার জাগরণে শেষ চিত্র। এখন আবার যেন স্বপ্নের ছবি মনের বাহিরে দরজায় মিলিল।

এসো, বুলু।

সুভদ্রা দরজা খুলিয়া ধরিল।

কোণে টেবলে কলাইকরা জাগে জল ও গামলা সাজানো। একখণ্ড সাবান ও তোয়ালে। বিলিতি প্রথায় ওয়াশ বেসিন।

সুভদ্রা মুখে জলের ঝাপ্টার পরে খাটে বসিল। কাশ্মীরী টিপয়তে বুলু চায়ের থালা রাখিয়াছে।—এ কি, এত ভোরে তুমি কেন কষ্ট করে চা নিয়ে এলে? এখনি তো খানসামা দিয়ে যেত।

বুলু কোন উত্তর না দিয়া নতনেত্রে রহিল। নিখিলদাদা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন শুনিলে সুভদ্রাদিদি যে প্রীত হইবেন না এরূপ তথ্য গেঁয়ো বুলু জানে।

বোস, এখানে বোস। এত খাবার কেন? আমি শুধু একটা বিস্কিট নিই। তুমি চা খাবে না?

সুভদ্রার নির্দেশে বুলু জড়োসড়ো হইয়া বিছানার পাশে চেয়ারে বসিল। লাল ফুলখচিত গদি হাতলহীন ছোট চেয়ারখানার বিবর্ণ, কিন্তু প্রাচীন জমিদারী ঐতিহ্য সে বহন করিতেছে ফ্রেমে গিল্টিকরা আয়না-খানির মতই।

বুলু উত্তর দিল, চান করে চা খাব।

চান করে খেতে খেতে ভাতখাবার সময় হয়ে যাবে না?

বুলু বলিল, আজ তো একাদশী।

ওঃ! সুভদ্রার মুখে ফুলদায় সৌখীন পেয়ালার খাঁটি ঘনগব্যদুগ্ধচর্চিত চা তিক্ত হইয়া উঠিল।

গুড মর্নিং ভদ্রাদি'। ঘুমে-ফোলা ভারী চোখে সম্পা প্রবেশ করিল।

ওঃ বেড-টি জুটেছে দেখছি। রাঙাদা' তো ভেবেই মরছিল। এ কি? বগীথালায় এনেছ কেন, বুলুদি'? ট্রে কি হল? আর চা কি কাপে ঢেলে এমনি করে নিয়ে আসে দোতালায়! ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।

সম্পার কথায় অনিপুণতার লজ্জায় বুলুর শ্যামাভ মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে জড়োসড়ো হইয়া গুটাইয়া গেল।

তীব্রস্বরে সুভদ্রা বলিল, কেন ওকে লজ্জা দিচ্ছ সম্পা, ভোতাদুরস্ত চা দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বগীথালায় চা এলে কিছু নূতনত্ব পাবো। তা ছাড়া আজ একাদশীর দিনে ওকে দিয়ে সাতসকালে চা করানো কেন? এখানে ক'দিন এসেও কি বেড-টি খেতে হবে?

না, না। তবে অসুবিধাই বা কি? বুলুদি' একাদশীর দিনে বসে থাকবার মেয়েই নয়।—কি বল, বুলুদি?

চিরদিনের সপ্রতিভ সম্পা সুভদ্রার তীব্রতা কৌশলে ঢাকিয়া দিল।

এত ভোরে আপনাকে বিরক্ত করলাম, ভদ্রাদি' এই বলতে যে আজ যেন তোলা জলে স্নান সেরে নেবেন না। আপনার আবার যা সকাল সকাল স্নানের অভ্যাস। আজ রাঙাদা' আমাদের নদীতে নিয়ে যাবে। সেখানেই স্নান হবে।

নদীতে স্নান হবে। নিজের মনে সুভদ্রা বলিল।

কে কে যাবেন?

আপনি, আমি, ফুলদা, ওর বন্ধু অরুণেন্দু, আর—আর রাঙাদা।'

অন্য সবাই বাদ কেন?

দিদির সর্দি হয়েছে অতএব সে যাবে না। তাকে নিয়ে দীপঙ্করদা' মহা ব্যস্ত। মালতী বিনতা যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বিনি যা দুরন্ত। মা নিষেধ করলেন। আর বিনি না গেলে মালতী যাবে না। দু'টি জোটের পাঁয়রা।

বুলু?

বুলু নিঃশব্দে নৌকাবিহারের প্রোগ্রাম শুনিতেছিল। সম্পা একমিনিট চুপ থাকিয়া বলিল, হ্যাঁ, বুলুদি' তো যেতে পারে। তবে ওর বোধ হয় নদী দেখে অরুচি হয়ে গেছে।

তা হোক, আমাদের সঙ্গে আজ যাবে, কি বল, বুলু?

বুলু মুগ্ধদৃষ্টিতে সুভদ্রাকে দেখিতেছিল। কে বলিবে ইনি বুলু অপেক্ষা বয়স্কা? ঘরোয়া অগোছালো সজ্জায় বা কত সুন্দর।

গোলাপী সার্টিনের পেটিকোট, হাতকাটা হলুদ বেনারসী জামার উপর বড় বড় বেগুনী, ও হলুদ ফুলছাপা হাউসকোট। রাত্রে শয়নের বেণী পিঠে। পায়ে বেগুনী প্লাস্টিকের চটি।

সম্পা সুভদ্রার চেয়ে ভাল দেখিতে, শ্রীলতাদিদির কথাই নাই। মালতী বিনতা কিশোরী হইলেও সুন্দরী সুভদ্রার চেয়ে।

সুভদ্রা সুন্দরী নয়, কিন্তু তবু বারবার যেন তাহাকে চাহিয়া দেখিতে হয়।

এমন সুন্দর মানুষটি তাহাকে কত সমাদর করিতেছে। চিরদিনের হেলাফেলার মানুষ বুলু। আজ এই নৌকাবিহারে সে বাদ যাইত। তাহার কথা কাহারও মনে হইত না।

নদী সে কতবার আর দেখিতে পারিয়াছে? শ্বশুরবাড়ি উঠোনের বাইরে পা দেওয়া নিষেধ ছিল। বাপের বাড়ি নদী অনেক দূরে—পদ্মবিল পার হইয়া যাইতে হয়। বুলুকে কে নদী দেখাইতে লইয়া যাইবে? বড়জোর জলার ধারে হরিবোলা চক্রবর্তীর বাড়ি সে যাইতে পারে। হরিবোলা-কন্যা সুরমা বুলুর সখী। কিন্তু সুরমা বিধবা হইলেও ছেলেমেয়ে আছে। তাহার অন্য জগৎ।

বুলুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, আমি তা হ'লে চান সেরে চা'টা খেয়ে নিই। নদীতে আবার স্নান করা যাবে।

সুভদ্রা গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দু'টি তুলিয়া বলিল, একাদশীর দিন তোমার কষ্ট হবে না, বুলু?

না তো। আমি জল খাই।

সম্পা চাপা দুষ্টুমীর সুরে বলিল, জলখাবার খেয়ে কষ্ট পাও কেন? ভাত খেলেই বা কি? শোন বুলুদি', আজ ভাত তোমাকে চুপিচুপি খাওয়াব। পাপ হয়, আমার হবে।

বুলু অপ্রতিভ হইয়া সুভদ্রা মিত্রের উচ্ছিষ্ট পাত্র তুলিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। সুভদ্রা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

সম্পা বলিল, ও কি হচ্ছে? ঝি নিয়ে যাবে। তুমি কেন? কিন্তু আমার কথার উত্তরটা দিয়ে যাও। খাবে তো? তারি সঙ্গে একটা মুরগীর ডিম সেদ্ধ? এখানে এই ভদ্রাদিদির ঘরে বসে খাওয়াবো। কাক-কোকিলে টের পাবে না।

এবার বুলু সবেগে পলায়ন করিল।

সুভদ্রা বুলুর গমনপথের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া অন্য কথায় আসিল।

বিনি যাচ্ছে না শুনে অরুণেন্দু রাজী হল যেতে?

আপনার চোখেও পড়েছে?

সুভদ্রা নিজের মনে বলিল, ছেলেটি বড় ভাল। কিন্তু তোমাদের ঘরে আর যা হোক গরীব চলবে না।

দেখুন না, দুইবন্ধু মিলে রিসার্চ করছে এম্-এস-সি দিয়ে। ফুলদা' চাকরি নেবে না। ভাল ফল করেও অরুণেন্দুদা' কাজ নিল না। দিনরাত দু'জনে ল্যাবরেটরীতে পড়ে থাকে। ধূলো কাদা, অ্যাসিড, রং মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফেরে। অরুণেন্দুদা'র বাবা বারবার ভাল দেখে একটা চাকুরি নিতে বলেন, সংসার চলছে না। ও শুধু বলে আমাকে আর দু'টো বছর সময় দাও। উনি রিসার্চ করে দিগ্‌গজ হবেন।

...সুভদ্রা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল

এই ধরণের ছেলে কেন যে তোমার বোনকে ভালবাসলো।

যাই ভদ্রাদি', গোছগাছ করি গে। আপনিও রেডি হন। আমাদের চা-জল খাবারও হয়ে এল।

সম্পা তর্‌তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল।

সকলের দুঃখে দয়াবতী, কেবল একজনের দুঃখ তুমি দেখিতে পাও না?

॥ পাঁচ ॥

সাবিত্রী কাপড় ছাড়িয়া হবিষ্যিঘরের হাঁড়িকুঁড়ি হইতে নানারূপ মিষ্টান্নাদি বড় থালায় সাজাইয়া চায়ের ঘরে পৌঁছাইতে চলিলেন।

ক্ষীরের স্বস্তি (ছাঁচ), নারকেলের তক্তি-নাড়ু, সর-ভাজার সঙ্গে গ্রামটির বিখ্যাত মিষ্টি—ক্ষীরচমচম্ ছিল।

কোণের আসনে ততক্ষণ কদমমণি নাক টিপিয়া ববম, ববম শব্দে গালবাদ্যি

করিতেছিল। গৃহিণীর সঙ্গে সে-ও আসিয়াছে।

চায়ের ঘরে কুড়ানী উনুনে জাল দিতে দিতে নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিতেছে।

কুড়ানীর জন্মের পূর্বেই তাহার পিতা শীতেশ্বর মাঝি দেহরক্ষা করে। পাত কুড়াইয়া সে মানুষ, তাই মা পাতানী নাম দিয়াছিল কুড়ানী। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কুড়ানী খিরকুটে ছোট্টটি হইয়া রহিল। পাতানী কোনমতে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া মোটা টাকার বিনিময়ে কন্যা পার করিল। অতঃপর সেই অর্থে গরু-মহিষ কিনিয়া সংসারযাত্রা প্রণালী সুচারুভাবে চলিল পাতানীর। কিন্তু কুড়ানীর স্বামী-ভাগ্য দারুণ মন্দ দেখা গেল। মহেশ কুমোরের ছেলে কাবুল কুড়ানীর স্বামী। সে কুলকর্মে দারুণ অরুচি দেখাইতে লাগিল ও যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়া নিরুদ্দেশ হইল। মহেশ ছেলেকে গালি দিতে দিতে মরিল। অগত্যা কুমোর বড়ি ছাড়িয়া কুড়ানী মায়ের কাছে ফিরিল।

ততদিনে পাতানী গরু-মহিষের আয়ে পায়ের উপর পা দিয়া ঘৃতদধিভক্ষণে রত। পূর্বযুগের কৃচ্ছ্রসাধনায় শীর্ণদেহ আর নাই।

ঘৃতদধির ভাণ্ডে ভাগীদার যোটার সম্ভাবনায় পাতানী অধুনা মোটা দেহ নাচাইয়া বলিল, আলি চল্যা? খাওয়া যুটবা কন থিকে।

কুড়ানী সতেজ উত্তর দিল, ঘরডায় থাকবের আছি। খাওনের লাগ্যা আসি নাই।

নিজে রোজগারের চেষ্টায় কুড়ানী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু পাকিস্তান হওয়াতে বড় বিপদ ঘটিল তাহার। হিন্দু ভদ্রলোক দলে দলে চলিয়া যাইতে শুরু করিলেন। যাঁহারা রহিলেন, ঝি রাখিবার বিলাস কাটাইলেন।

রায়বাড়ির লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলে তখন সেই বাড়িতে কুড়ানী কাজ পাইত। খুড়িমা সাবিত্রীর প্রয়োজন হইলে ডাকিতেন। আলাদা হাঁড়ি কাড়িয়া পাতার জালে কুড়ানী রাঁধিয়া একবেলা খাইত। মা দুধ ঘিয়ের ভাগ দিতে আসিলে সবেগে প্রত্যাখ্যান করিত।

পাতানী গ্রামে বলিয়া বেড়াইত, বেহদ্দ জেদী মেয়াডা। প্যাটের মেয়া, অমনি খ্যায়া থাকে, দেখ্যা কষ্টো হয়। কিছু কিছু দিবার গেলে ত্যাড়া আসে।

কুড়ানী-জীবন ভাগ্যদেবতার প্রসন্নদৃষ্টি বঞ্চিতা, অতএব কমপ্লেক্স জোটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। ভাগ্যদেবতা বাছিয়া বাছিয়া এত লোক থাকিতে তাহাকে অশুভ দিবার বিশেষ টার্গেট স্থিরীকৃত করিয়াছেন এবম্বিধ চিন্তায় কুড়ানী সর্বদা ব্যস্ত। তাহাকে ভাগ্য-দেবতা জন্মের সময়ে রূপহীনা করিয়াছেন, করিয়াছেন পিতৃহীনা।

যদি রূপ থাকিত স্বামী কাবুল ও কান্দাহার না পালাইয়া ঘরে থাকিত।

প্রথম যৌনমিলনের পরেই কাবুল ক্ষেদ প্রকাশ করিয়াছিল 'মাগীর গতর নাই' বলিয়া। যদি ভাল খাওয়া জুটিত তবে দেহে মাংস থাকিত। পিতা থাকিলে ভাল খাওয়া জুটিত কুড়ানী ধরিয়া নেয় যে জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খলে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ—তাই কুড়ানী সামান্যতম অঘটন বা অসুবিধাকেও ভাগ্যের চক্রান্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। কুড়ানীর অসুবিধা ঘটাইবার জন্য ভাগ্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

পথে বৃষ্টি নামিল, কুড়ানী ভিজিল। পরম নিশ্চিন্তভাবে ভিজা কাপড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কুড়ানী বলিল, জানতাম। আমি যখন পথে বাড়াছি তখন যে বৃষ্টি আসবে জানতাম। আমার কপালডাই মন্দ।

চড়কপূজার গাজন—সন্ন্যাসী পথে বাহির হইয়াছে নাচিতে নাচিতে। পড়িমরি করিয়া ছুটিয়াও কুড়ানী নাচ মিস্ করিল। নিশ্চিন্ত সুরে সে অতঃপর জানাইল, নাচ দেখবের পারব না জানাই ছিল। আমি আছি কি না।

এখন উনুনে আগুন জ্বলিতেছে না। রায়বাড়ির লোকেদের এতক্ষণে প্রায় মুখ-হাত ধোওয়া হইয়া গেল বোধ হয়। চায়ের জল কোথায়?

কুড়ানী খড়ি ও শোলা গোছা ধরিয়া চায়ের উনুনে ঠেলিতেছে ও নিজের মনে গজ্‌গজ্ করিতেছে—সাত সকালে উঠ্যা মরে কেডা? না, কুড়্যানী। আমার না তাড়াতাড়ি আছে। তাই আগুন না রেশ কর্যা জ্বলতেছে না। আমার নাগাল কপাল আছে কেডার? উনান জ্বলে না, এদিক গোটা জেবনডা জ্বল্যা জ্বল্য মরতেছি।

হারাণ ততক্ষণ চায়ের বাসনপত্র হাতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। এ ঘরে যা কাপ-ডিশ্ আছে তাহাতে কুলানো শক্ত। তাই দালানের (প্রধান বাড়ি) বুঠুরী হইতে তোলা-বাসন রতনবালার ভাঁড়ারকে আসিল।

হারাণ বলিল, দেখছ না কুড়্যানীর কাণ্ডডা? এখনও চা'র জল হয় নাই। বাড়ির মধ্যি না জামাই রছে? সক্কাল সক্কাল চা দেওয়া নাগে না?

কুড়ানীর আরও একটি মন্দভাগ্য আছে। ভাগ্য কুড়ানীকে দারুণ চরিত্রবতী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। ফলে তাহার অভাবও ঘোচে না এবং দেহসুখও ঘটে না। অতি অনাকর্ষণীয় চেহারা চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকারও অন্যতম কারণ। অতএব কোথাও স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বাড়াবাড়ি দেখিলে সে বিরক্ত হয়।

জামাইয়ের নামে মুখবিকৃতি করিল কুড়ানী, আরে থোও! জামাই! ম্যাগামুখা পুরুষ একডা। দিনরাত্তির বৌয়ের পেছানে হোঁক্-হোঁক্ কর্যা বেড়াতেছে। শ্রীলতাদিদি না নিঃশ্বাস ফেলবের পায়।

রতন ততক্ষণে পৌঁছাইয়া গেছে। ঘরের ঝি বাহিরের ঝিয়ের মত নীচুপদের নয়। সুতরাং সে নিজের খাসদাসীর সম্মান বজায় রাখিয়া কথায় যোগ দিল, আর সম্পাদিদির স্বামী আবার অ্যালই না।

হারাণ প্রশ্ন করিল, সম্পাদিদির মন খারাপ?

মন খারাপ না ছাই! বড়-দাদাবাবুর, আর এহন বড়কর্তাই কই, নামে তার আল, না তেনার আসা হবে না বল্যা? সম্পাদিদি কয়া উঠল, বাঁচা গিছে। আমি তখন কর্তামায়ের পায়ে ত্যালসেবা করতেছিলাম। বড়কর্তা কট্‌মট্ কর্যা তাক্যালেন। তখন দিদি কয় কি, ভালই এখন তাড়াতাড়ি চল্যা যাওয়া নাগবে না।

কুড়ানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল,—সম্পাদিদির সংসারে মন নাই।

ভৃত্যতন্ত্র-পরিচালিত দৃশ্যটির উপর অতএব মনিবতন্ত্র স্থাপিত হইল।

সাবিত্রী খাদ্যাদি হাতে আসিয়া দেখিলেন, একটি উঁচু পিঁড়ির উপর বসিয়া ফ্রাইংপ্যানে ছায়া ডিমের পোচ ভাজিতেছে। অন্দরের এলাকায় হাঁসের ডিম ভিন্ন মুরগীর ডিম চলিবে না।

অসংখ্য দুইধারে উঁচু খুরো-বসানো টুলের আকৃতি পিঁড়ি ছুতোর নির্মাণ করিয়া দেয়। রায়বাড়ির সীমন্তিনী কাজে-কর্মে বসেন।

একখানি টানিয়া সাবিত্রী বসিলেন।

সেজবৌমা, এত সকালে ওঠ তুমি কেন, মা? ওদের বললেই তো করে দিত।

ছায়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে পোচ সাজাইতেছিল। হাসিমুখে উত্তর দিল, ওরা ডিম সেদ্ধ জানে, ভাজা জানে।

পোচ করতে পারবে না। মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে, বিনয় কাল বলছিল। তাই ডিম করে দিচ্ছি। স্টীমারঘাট থেকে আপনার মণীন্দ্র রুটি এনে দিয়েছে। আমি আর মাত্র আজকের দিনটে আছি কি না।

তোমরা চলে গেলে আর আমরা কি নিয়ে থাকবো, মা? শোকের ব্যাপার, তবু তো এত দিনে বাড়িখানা কেমন সেজেছিল। পোড়া পাকিস্থান হয়ে আনন্দ চলেই গেছে। শূন্য বাড়ি-আগলে আমরা পড়ে আছি। কিন্তু মা, আর তো থাকা চলে না। বুলু তো বুড়ো হয়-নি। তার দিকে পাপদৃষ্টি পড়ে। তা ছাড়া ছেলেদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ওনার শরীর ভেঙে গেছে। এখন তোমাদের কাছা-কাছি না থাকলে মনে বল পান না। ছেলে দু'টোর যদি চাকুরি দেখে দাও, আলাদাভাবে ছোট একখানা বাড়ি নিয়ে শেষ জীবনটা গঙ্গাতীরে কাটাতে পারি। চারপাশে যা দেখছি, ভরসা হয় না আর।

সাবিত্রীর দীর্ঘ ভাষণে ছায়া বিপদ গণিল। খুড়োমহাশয় আর এখানে থাকিতে চান না তাহা অনেকবার তাদের কানে দেওয়া হইয়াছে। বৌরা যেন গলিয়া প্রতিশ্রুতি না দেয় তাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অতগুলি লোকের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।

মহেন্দ্রের পাকা জমিদারী মাথায় আসিয়াছে আসল কথাটি। যদি খুড়ো মহাশয়েরা সরেন, বিষয়-সম্পত্তি রসাতলে যাইবে। অতএব তাঁহাদের আবেদন যেন কানে তোলা না হয়।

চপলেন্দ্র বলিয়াছিলেন, ছেলে দু'টোকে না হয় দীপঙ্করকে বলে কাজ দিতে পারা যায়। একটিকে আমিও নিতে পারি। কিন্তু বিয়ে-থা করে ওই আয়েতে কি করে চালাবে ওরা? তখন তো আমাদেরই ঘাড়ে পড়বে।

অসহিষ্ণু অমিয় বলিল, এত বিষয়-সম্পত্তি নাড়ছেন-চাড়ছেন, ভালভাবে থাকছেন। তা না, কলকাতায় যাবার সখ চাগিয়েছে। বাঙাল কলকাতা দেখতে যেয়েই মরে। হামিদ থাকতে পাকিস্থানে কোন ভয় নেই। অযথা এঁরা ব্যাকুল।

ললিতা আসরে উপস্থিত ছিল বয়স মর্যাদায়। সে বলিল, বুলুর জন্যেই ভয় কি না।

জয়া বলিয়া উঠিল, বুলুর জন্যে আবার কি ভয়? রূপসীও নয়। থানপরা কালো চেহারার একটা বিধবার দিকে নজর দেবে কে? না হয়, চুলগুলো কেটে ফেলুক।

বুলুর শাশুড়ী-কর্তৃক মুড়ানো মাথায় সম্প্রতি বেশ কেশ দেখা দিয়াছিল। জয়া আবার মুড়াইবার বিধান দিল।

জয়ার কথা এতই অসঙ্গত লাগিল যে, কেউ কোন কথা বলিল না ললিতা বিরক্ত হইলেও নীরব রহিল। বড়বৌদির কোন কথায় প্রতিবাদ করিলে বড়দা স্ত্রীর পক্ষ নিবেন জানা কথা। সে দুইদিনের জন্য আসিয়াছে, কলহ-বিবাদে কাজ কি?

অতএব পূর্বেই সযত্ন শিক্ষাপ্রাপ্তা ছায়া একই সান্ত্বনার বয়ান গাহিল, কোন ভয় নেই হামিদ হক থাকতে। কলকাতায় এখনি যেয়ে করবেন কি? খাওয়া-পরার দারুণ কষ্ট। কলকাতা আর সেই কলকাতা নেই। পরে পরিস্থিতি খারাপ হলে আমরা তো আছিই। যেয়ে পড়বেন।

যেয়ে পড়ব কি করে, সেজবৌমা? তখন কি বা'র হওয়া যাবে? সে যে বেড়া-জাল, মা। তাই বলছিলাম আগে থেকে তোমরা যদি চেষ্টা করে ওদের দু'টো কাজ—

দুরন্ত ঝড়ের মত সম্পা প্রবেশ করিল, দাও, চা দাও। গলা শুকিয়ে গেছে। বা, খাসা ডিনের পোচ। একটা নেই?

ডিম-চিবানো গলায় সম্পা বলিল, কি মজা, জানো আমরা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি? তুমি যাবে, সেজবৌদি?

আমি গেলে চলবে কেন? কালকে যাত্রার জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে হবে না? মা চলেছেন সঙ্গে।

সাবিত্রী আর্জি বাধা পড়ায় ক্ষুণ্ণ হইলেন।

কখন ফিরবে তোমরা? রান্না ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।

ফিরবো একটা—দু'টো—তিনটে যখন হয়। আজ আমরা ক্লাশ পালাচ্ছি। চা—চা—চা!

রঞ্জিৎ-রাহুমুক্ত পুরাতন সেই সম্পা।

॥ ছয় ॥

অ বুধা এদিক আয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব না ভোরবেলায় উঠে আসছেন। বোধ হয় কাল সেজবাবু যাবেন তাই আজই সকালবেলায় দেখ-শোনা সেরে রাখছেন। যা খবর দে দৌড়ে। আমি কাছারীঘরে বসাই।

অনাথ সরকার জলার ঘাটে নদীগমনের নৌকাখানির তদারক করিয়া এদিকে আসিতেই দেখিল অতিশয় বিপন্নমুখে অপ্রতিভভাবে হামিদ সাহেব ছিপনৌকা হইতে অবতরণ করিতেছেন।

শ্যামাভ সবলদেহে খাকি ট্রাউজার ও বুশসার্ট। মুখে এখনও বাঙালী মুসলমানের কোমলতা। মনে হয় না যেন বিধর্মী কেউ, ঘরেরই ছেলে।

আসুন, আসুন হুজুর। এত ভোরে আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো হুজুরের? বসুন। অনাথ দুই হাত জোড় করিয়া কোমর হইতে ঝুঁকিল। বুধো ঊর্ধ্বশ্বাসে গোলবারান্দায় ছুটিল সংবাদসহ।

হামিদুল্লা বিপত্নীক। গরীব ঘরের নিতান্ত মেধাবী সন্তান। গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক দিবার পরেই বিবাহিত। পাশের গ্রামের আমিনার সহিত অতিশৈশবে হামিদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতা করিমুল্লা বিবাহ স্থির করিলেন। বড় বংশ হইলেও অভাবী-ঘরে হামিদ চাহিয়াছিল নিজে কৃতী

হইয়াও অবস্থার গতি ফিরাইবে। বিদ্যাকালে বিবাহে তার মত ছিল না। পাশের গ্রামের নাবালিকা আমিনা-বিষয়েও কোন আগ্রহ ছিল না। কালো, ছোটখাটো একটা বাচাল মেয়ে। 'শেখের বিটি' হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় আকর্ষণ নাই তার।

বিধাতার বিধানে দরিদ্র মুসলমান হামিদ আবার কবি হইয়াছিল। স্কুলে পড়ার সময়েই লোকচক্ষুর অগোচরে কবিতার খাতা তার ভরিয়া উঠিত। আমিনার মধ্যে সে মানসীর সন্ধান পায় নাই। কিন্তু প্রবেশিকায় প্রথম হইবার পরেই ধনী শেখ একমাত্র কন্যার জন্য তাহাকে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন এবং আট বেয়ারার পাল্কী চাপিয়া একদা অপরাহ্ণে হামিদের বাড়ি হাজির হইলেন হুম-হাম শব্দে গ্রাম্যপথ মুখর করিয়া।

করিমুল্লা হক খানদানী বংশ হইলেও অভাবে স্বভাব রাখিতে পারেন নাই। পুত্রের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন। বেহেস্ত হইতে বর আসিলে কে অস্বীকার করে?

করিমুল্লা হাতদা হাতে বাড়ির বাঁশের 'চ্যাগার' (বেড়া) মেরামতে রত ছিলেন। পাল্কীর হুম-হামে চকিত হইয়া দেখিলেন গরীবের কুঁড়েয় হাতীর পাঁড়া (পদপাত) পড়িয়াছে।

রায়দীঘির জলের ধারে কিশোর হামিদ গালে হাত বসিয়াছিল। বৃত্তি পাওয়াতে হয় তো উচ্চশিক্ষার সুবিধা হইবে। পাবনা কলেজে সে পড়িতে যাইবে। তারপর অধ্যাপকরূপে সাহিত্যচর্চা করিবে।

দীঘির জলে ঢেউ উঠিত, ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিত পাড়ের শিউলি গাছ হইতে। সেই জলের তালে তালে, আলোছায়ার দোলনে কবি কিশোরের মনে কবিতা জাগিত; হিন্দু কবির লেখা :—

তার জলচুড়িটির স্বপ্ন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতাপরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে
সে কাঁদলে পরে মুক্তা ঝরে,
হাসলে পরে মাণিক হাসে।

হাসিকান্নার হীরামুক্তার মধ্যে যে মুখখানি মনে ওঠে সে মুখ যেন রায়বাড়ির কানাচেই দেখা।

হামিদ স্থির করে সে উপযুক্ত হইয়া কোন হিন্দু নারীকে বিবাহ করিবে। মুসলমান মেয়েরা শিক্ষিতা সপ্রতিভ হয় কম। তার তাই পছন্দ হিন্দু মেয়ে সর্ব জাতির সমন্বয় সেই করিয়া যাইবে। হিন্দু ও মুসলমান মিলনের প্রথম সেতু রচনা করিবে হামিদুল্লা হক।

খাতার পাতায় যে সকল কবিতা লেখা হইত তাদের মিল খুঁজিত সে বাহিরে।

সেদিন দীঘির জলে হামিদের একটি আশা ডুবিয়া গেল—অন্য আশা উঠিল। হামিদ শুনিল তার সাদী ঠিক। সাদীর পর তাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইতে হইবে। কলিকাতা! তার আশার বাসা।

কিন্তু মনে সুখ রহিল না হামিদের। আমিনার সঙ্গে বিবাহ স্থির হওয়ার পরে পথেঘাটে দেখায় সানুরাগ দৃষ্টি মেলে নাই। আমিনা মুখ ভ্যাংচাইয়াছে।

ছোট হইলেও, গরীব শ্বশুরবাড়ি আমিনার পছন্দ হয় নাই। স্বামী বিদ্যাভ্যাস করিতে গেলে সে বাপেরবাড়ি আসিয়া বসিল। কালো স্বামী তার ভাল লাগে নাই। কিন্তু শেখ হাকিম জামাই তৈরি করিবেন এই লোভে বিদ্বান খুঁজিয়া তবে বিটি দিলেন।

হামিদের সহিত আমিনার স্বল্প পরিচয় মধুর নয়। রূপহীনা অশিক্ষিতা স্ত্রীকে হামিদ বরদাস্ত করিতে পারিত না বিশেষত যখন স্বভাবটিও কটু। যে মানসী হামিদের মনে ছিল, যে আদর্শ সে খুঁজিত, কোথায় সে?

আমিনার স্বামীকে অদ্ভুত লাগিল। সাধারণ গ্রাম্যমেয়ের মত সদাজাগ্রত দেহক্ষুধার কোন সমর্থন সে কখনও পাইত না স্বামীর কাছে। স্বামীর কাব্যও সে শোনে নাই। যাই হোক শ্বশুরের আদেশে হামিদ যখন বিদেশে আই-সি-এস্ হইতেছে তখনি একটা অঘটন ঘটিল।

পিত্রালয়ে চিরবাসিন্দা হইলেও করিমুল্লা পালপার্বণ উপলক্ষে শেখের বিটিকে আনিতেন দুই-একদিনের জন্য। এমনি এক সময়ে বৈশাখের খরদিনে আমিনা অকস্মাৎ শ্বশুরালয়ে দেহরক্ষা করিল।

খাওয়া-দাওয়া মনোমত হইত না আমিনার শ্বশুরগৃহে। পিত্রালয়ে ননী মাখন মাখা মুখে শ্বশুরবাড়ির সাধারণ রান্না অখাদ্য প্রতিপন্ন হইত। অতএব একথালা পান্তাভাত, পেঁয়াজ ও শুকনো লঙ্কা ও তেল দিয়া আমিনা গিলিল। শাশুড়ী নিষেধ করায় বলিল, খাবই তো। এমনি ছোটলুকী খানা খেয়ে মুখটা বদলাই। ফলে, ঘোর কলেরার দিনে পর্যুষিত অন্ন কলেরা ডাকিয়া আনিল।

হামিদ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া ফিরিল। কিন্তু হায়, শেখের জামাই ফিরিলেও মেয়ে ফিরিল না।

হামিদ বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করে নাই। তার মনে ছায়া ছিল গভীর ছায়া-মানসীর। বাস্তবে মেলে নাই।

বিচারক হিসাবে হামিদের সুনাম হইল; সেই সঙ্গে কবি হিসাবেও সে স্বীকৃতি পাইল। নিঃসঙ্গ হামিদের বিষণ্ণ কবিতায় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের অর্থ খুঁজিত সকলে।

বুঝি বলেছিল—
ফুল ফুটিলে অলি জুটিলে
আমি আসিব,
আঁখি মুছায়ে আঁখি মুছিয়ে
তোমায় হাসাব
আমি হাসিব।...
—আমি আসিয়ে মধু হাসিয়ে
কেঁদে কাঁদায়ে তোমারি হব।
সে ত' এমনি হাসে চাঁদিনী
সে ত' আসে নি—কেমনে বব?

(কবিতাটি মুসলমান গ্রাম্যকবি আজীজের লেখা)।

উক্ত কবিতাটি পাঠ করিয়া সকলে

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিত। গভীর পত্নীপ্রেমে হামিদ এমনি সন্ন্যাসী; সকলেই ধরিয়া লইত।

হামিদকে ফরাসে বসাইয়া জোড়করে অনাথ সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল।

বসুন না।

আমি হুজুরের সম্মুখে বসবো কি করে? আগে খবর পেলে আমরা আপনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রাখতাম।

না, না, ব্যবস্থাটা আর কি হবে? ঘাটে নৌকো দেখলাম কেউ কি আজ কলকাতা যাবেন?

না, হুজুর। এঁয়ারা কেউ কেউ নদীতে বেড়াতে যাবেন।

বেড়াতে যাবেন? নৌকো কেন? আমাকে জানালে আমি বিলে লঞ্চ রেখে দিতাম।

হামিদের কথায় অনাথ বিনয়ে গলিয়া পড়িল, অ্যাজ্ঞে, হুজুর এই আওতায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনার হুকুমে—

হামিদ অনাথের চাটুভাষণে বাধা দিয়া বলিল, মেয়েরাও নিশ্চয় যাচ্ছেন। অসুবিধা হবে।

অনাথ বলিল, হেঁ, দিদিরাও যাচ্ছেন।

হামিদ গোলবারান্দার দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া ধরিল। সে-ও কি যাইবে?

ব্যাপারের বাড়িতে হঠাৎ তার দেখা পাইল হামিদ একযুগ পরে।

প্রথম যৌবনে গ্রামের অনেক তরুণের মত অনুপমা রূপসী শ্রীলতাকে মনে মনে কামনা করিত। শ্রীলতা জানিতও না।

এবার শ্রীলতাকে প্রথম দিনে দেখিয়া হামিদ নিজের পূর্বস্মৃতির তিল সাদৃশ্য পাইল না। ত্রিশোর্ধ্বা শ্রীলতা মাতৃমূর্তি ম্যাডোনা, পাশেই অনুগত স্বামী। পরস্ত্রীর দিকে হামিদ দ্বিতীয়বার তাকায় নাই।

কাঙালী বিদায়ের দিনে হামিদ জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। একদল ভিখারীকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে করিতে দেখিল,—সে জনতার ভিড়ে আটক পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণে পল্লীগ্রামে দুপুরের রোদ প্রখর। রুমালে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া চোখ তুলিল হামিদ।

মণ্ডপের সম্মুখে বড় তৃণাচ্ছাদিত লনে সারি সারি কাঙালী বিদায় হইতেছে। পুকুরের ওধার হইতে এদিকে হয় তো কোন কারণে আসিতে জনতার ভিড়ে চকিতা কিশোরী মূর্তি।

বহুযুগ পূর্বের শ্রীলতা।

লাল চওড়াপাড় কোরা শাদা শাড়িতে তন্বীদেহ বেষ্টিত। ঘষা চুলের অগোছালো আলগা বেণী পিঠে। সেই শ্রীলতা-মূর্তি কৈশোরের, কিন্তু আরও মনোহারিণী, আরও অনুপমা।

এদিক দিয়ে আসুন। হামিদ বলিষ্ঠ সবল হস্তে ভিড় সরাইয়া পথ করিতে লাগিল।

কিশোরী সলজ্জ অনুগমন করিল। পদ্মের মত দুইটি চোখ তুলিয়া একবার চাহিল। আবার চোখ নামাইল।

ভুলিয়া-থাকা কবিতা আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল আবার পঁয়ত্রিশবর্ষ বয়স্ক পরিণত পুরুষ হামিদের মনে—

সে নামালে চোখ আকাশভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে—

এতদিনে অস্তযৌবনতীরে তার মানসী মূর্তি পরিগ্রহ করিল। অতি সম্ভ্রমে অন্দরের দ্বারে তাকে পৌঁছিয়া দিয়া হামিদ বলিল, আপনি অমিয়ের কোন বোন?

আমি ছোট বোন—মালতী।

এখন সেদিনে ফিরিয়া যাই।

॥ সাত ॥

সেদিন বিনতার পাশে শুইয়া মালতী অনেকক্ষণ জাগিল।

এই কবি হামিদুল্লা হক, যাঁহার খ্যাতি সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে শহরে পৌঁছিয়াছে?

অবশ্য মালতী তাঁহাকে দাদার কাছে ছেলেবেলায় দেখিয়াছে। ভাল করিয়া মনে নাই। পরে যা তিনি গিয়াছেন তাও বসিবার ঘরের এলাকায়। সেখানে মালতীর উপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না। কয়েকমাস আগেও হামিদ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মালতী তখন শ্রীলতাদের সঙ্গে দার্জিলিং গিয়াছে।

মালতী হামিদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা জানে। বাড়িতে হামিদের আলোচনা হইত। কবিতার কথা উঠিলে অমিয় সগর্বে হামিদের নাম করিত। মধ্যে মধ্যে সকলকে হামিদের কবিতা পড়িয়াও শুনাইত।

মালতী শুনিয়াছিল অতি দরিদ্রঘরের ছেলে হামিদ কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয় নাই মেধার বলে সে সমাজের শীর্ষে বসিয়াছে।

আধুনিক বাংলা কবিতা হামিদ লিখিলেও তার পুরনো যুগের একটি কবিতাই মালতী কণ্ঠস্থ করিয়াছিল কোন কাব্যসঙ্কলন হইতে। কবিতাটি পড়িলেই তাহার কান্না পাইত।

স্পার অতি প্রকট সাহিত্যপ্রীতি মালতীর মধ্যে কাব্যপ্রীতিরূপে প্রকাশ হইয়াছে। বিনতা সঙ্গীতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়া আলস্যবশত ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধ ওস্তাদ আসিয়া শিক্ষার অনুশীলন না দেখিয়া বিরক্ত হইতেন।

গলা ভাল থাকলে কি হবে? রেওয়াজ না করলে গান আসবে না।

রেওয়াজ করিতে বিনতার ঘোর আপত্তি। এমন কি ওস্তাদের কাছে সপ্তাহে দুইদিন আবদ্ধ থাকাটাও তার চঞ্চল স্বভাবে ভাল লাগিত না। সে ছল-ছুতায় কামাই করিত।

অবশেষে বৃদ্ধ ওস্তাদ সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা জানাইয়া বিদায় লইলেন। রায়গৃহিণী কন্যাকে উচ্চশ্রেণী গায়িকা করিবার স্বপ্ন দেখিলেও বাস্তব জীবনে ঘটিয়া উঠিল না।

মালতীকে কেউ গান শিখিতে ডাকে নাই সে নিজের ঘরে কবিতার বই লইয়া

মশারি
সস্তায় ও সুন্দর
পান্না মশারি ষ্টোর্স
৩৮৬, রবীন্দ্র সরণী (আপার চিৎপুর রোড) কলিকাতা-৭

দিন কাটাইত। গদ্য রচনা সে ভালবাসিত না। আধুনিক গল্প ও উপন্যাস পড়িয়া সে ভয় পাইত।

মালতীর নম্রতা সর্বদাই ঢাকা থাকিত অতি প্রখরা বিনতার অন্তরালে। বিনতা ছিল যেন সম্পারই প্রতিমূর্তি। কথায় তার ক্ষুরের ধার, চলনে ঘোড়ার ক্ষুর। অতি গৌর রং, মুখে উগ্রতা।

মালতী যেন বোনেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী শ্রীলতার মূর্তি ধরিয়া উঠিল। শ্রীলতার মুখে মনোহারিণী সর্পীর বঙ্কিমতা। শ্রীলতাকে ম্লান করিয়া মালতীর মুখে আরক্ত অরবিন্দ ফুটিয়া উঠিল। ডাগর দু'টি চোখে ঈষৎ স্ফীত অক্ষিপত্র; চোখের আকৃতি সদ্য-ফোটা পদ্মফুল। নাকও ওই পদ্মের পাপড়ি ও মৃণাল। ঠোঁট দু'খানি পদ্মপরাগ। সমস্ত মুখে অপরিসীম লাবণ্য। শ্রীলতার মধ্যে ছিল রূপের মার্জিত শালীনতা। মালতী পাইল রূপের অপরূপ লাবণ্য।

শ্রীলতার প্রখর আত্মাভিমানে অনবদ্য মুখে সর্পীর তির্যক বঙ্কিম সাদৃশ্য কখনও ধরা যাইত। কিন্তু মালতী মুখে-চোখে ফুলের মাধুর্য পাইল শুধু। আঠারো-উনিশ বৎসরের তরুণীর ভুবনমোহিনী রূপলাবণ্যের সঙ্গে শ্রীলতাসুলভ পেলবতা তাকে দেখার সামগ্রী করিয়া তুলিল। অতি পবিত্র দিনযাপন কাব্যপরিমণ্ডলে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বে আনিয়া দিল স্বপ্নমদিরতা।

দীর্ঘ শতদলচোখে দুরান্তের কুয়াশাজড়ানো আধো-ঘুম। সে দৃষ্টি কোমল কোমলতার অতলস্পর্শী কূপ। ঠোঁটের হাসিটি যেন প্রথম সৃষ্টিমুহূর্তে মোহিনীর হাসি। কিন্তু এক নিমেষে সে সলজ্জ পলায়নে প্রস্তুত।

যেন জয়বাসনায় কোন কুরঙ্গী উন্নত গ্রীবায় রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। সামান্য কোন আক্রমণের উদ্যোগ দেখিলে সে আবার ভয়ভীতা ব্যাধতাড়িতার ন্যায় একমুহূর্তে অসহায়।

মালতী মানুষটির এই যুগল ব্যক্তিত্ব আলোছায়ার মত খেলা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এ উহাকে শিকার করিতেছে। সে যে কখন কি করিবে বোঝা শক্ত। অথচ সর্বদা প্রখরা বিনতার সঙ্গে সে ফেরে বলিয়া তাহাকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব আরোপ কেহ করে না। হয় তো ভুল করে। কখন সে সলজ্জা, কখন সে সাহসিকা, বলা শক্ত।

এই মালতী মানুষটিকে দেখিয়া কবি হামিদ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বঞ্চিতমনে কবিসুলভ প্রেমতৃষা ছিল। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তাই বিদায়ী যৌবন অতৃপ্ত। নিজের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স সে বিস্মৃত হইল। যে সময়ে মনে প্রথম প্রেম আসে তখনকার বয়সে সে ফিরিয়া গেল।

প্রথম যৌবনে শ্রীলতাকে দেখিয়া ভাল লাগে। শুদ্ধান্তঃপুরের হিন্দুনারীর সহিত মুসলমানের মেলামেশা সম্ভব নয়। দূর হইতে সে পূজা করিত। বাস্তবে শ্রীলতা-মূর্তি আর নাই। কিন্তু আরও মনোহারী বেশে নূতন রূপে সে-ই আসিল।

সারাদিন সেদিন রায়বাড়ির কাঙালী বিদায় লইয়া হামিদের সময় অপরিসীম ব্যস্ততায় কাটিল। বন্ধুর বাড়ি কর্তব্যবোধে সে কাজে আসিয়াছিল। এখন সেই কাজ আনন্দ হইল।

সারাদিন হামিদের চোখ ও কান উন্মুখ। মনে বাজিতে লাগিল হিন্দু কবির গান—

'দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি,
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।'

দেবভাষার চর্চা ছিল হামিদের মুসলমান হইলেও। যেখানে কবিতা সেখানেই সে পাঠস্পৃহায় ছুটিত। অধ্যাপক হইতে না পারিলেও সে অধ্যয়ন ছাড়ে নাই।

জয়দেবের অনুরূপ শ্লোক মনে পড়িল—

'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্,
রচয়িত শয়নং সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানম্।'

মনে মনে একটি অঙ্ক কষিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান পুরুষ। যে-দিকেই ধরা যাক না মানসীর সহিত ব্যবধান অন্তত পনের বছর।

মেয়ের বয়সী! নিজের উপর ঘৃণায় ঠোঁট আকুঞ্চিত করিল হামিদ। মনের কোণ হইতে ফুলের চারাটি উপড়াইয়া তুলসীপত্রের চাষ করিল।

অন্দরের দরজায় কাঙালীদের জন্য কলাপাতা পাঠাইবার কথা বলিতে হামিদ গেল। সেই সময়ে দেখিল মালতী কূয়াতলায় দাঁড়াইয়া তাহাকেই দেখিতেছে। নিজের মূর্তির দিকে বাহিরে আসিয়া তাকাইয়া ছি-ছি করিল। ধূলো ধোঁয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে প্রায় খাকী পোষাক পরিত হামিদ। সারাদিন পল্লীগ্রামে কাজ করিবার ফলে পোষাক অপরিচ্ছন্ন, আকুঞ্চিত। চুল কাকের বাসা। অগ্রহায়ণে এখনও গরম বাতাস। রোদে ছোটাছুটি করিয়া শ্রীহীন মলিন মুখ। সর্বোপরি বয়সের ভার। কন্যাসমানা কিশোরী ফিরিয়াও দেখিবে না।

দেখিতও যদি, কি পরিণতি সম্ভব? শ্রীলতার বোন শ্রীলতার মতই অপ্রাপণীয়া।

গভীর রাত্রি সেদিন জাগরণের ডালা হাতে হামিদের ঘরে কোজাগর করিল। পাবনা সহরে হামিদের থাকিতে হয় জেলাটির দায়িত্বসহ। গভীর রাত্রে বন্ধুদের অন্তর্বর্তী গ্রামে কাজকর্ম শেষ করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। নির্জন গৃহে খানসামার তত্ত্বাবধানে গৃহস্থালী।

বাবুর্চি এককাপ কফিসহ রাত্রে এখন হাল্কা কিছু খাওয়ারও প্রয়োজন নাই শুনিয়া আউট-হাউসে চলিয়া গেল। হামিদের শয়নকক্ষের পাশের ছোট ঘরটিতে খানসামাও রাত্রের অবসর লইল।

বিছানার পাশে আর্মড চেয়ারে কফির কাপ মুখে হামিদ অনেক চিন্তায় চিন্তিত।

উচ্চপদস্থ সুদর্শন তরুণের জীবনে বহু নারী পদক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল। বিদেশেও সে নারী আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছে। প্রথম যৌবনে একান্ত আদর্শবাদী জীবনে প্রতিচ্ছায়া ছিল রায়-দুহিতা। বিবাহ-মনকে বিস্বাদ করিয়া রাখিয়াছিল তারপর। কর্মজীবনের প্রথমভাগে কাজ ছিল কাজ। দ্বিতীয়ভাগে ছিল দায়িত্বের ভার। প্রথম প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়া এখন দেহমন কৌমার্যে অভ্যস্ত।

তবু তো বিদ্যুতের মত হামিদের কালো আশাহীন জীবনের কালো আকাশের দুই-একটি আলো দেখা দিত।

কর্মব্যপদেশে হামিদ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিত। তখন কখনও কখনও বা কোন অনিন্দিতার সাক্ষাৎ মিলিত। উচ্চপদস্থ বিপত্নীক অফিসারকে সমাদরে বহু বাড়ির দ্বার উন্মুক্ত ছিল। নবাব-পরিবারের সে আমন্ত্রণ পাইত নবাবের দৌহিত্রীকে বিবাহের জন্য। তাহাদের সমাজে উচ্চশিক্ষিতার আজকাল প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। সেই মহিলাবৃন্দও হামিদের আশায় উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু হামিদ কাহাকেও কামনা করে নাই। সারাদিন কাজ ও রাত্রে অধ্যয়ন দুই সহচরী-সঙ্গে বেশ ছিল।

দুই-একটা খণ্ড অধ্যায় হামিদ জীবনে যুক্ত হইয়া তাহাকে অবশ্য কয়েকদিনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে।

মনে পড়িল বেহারী মহিলা সাবিত্রী সহায়ের কথা। ভদ্রমহিলা একটি স্কুলে পড়াইতেন। তাঁর স্বামী অসচ্চরিত্র। ভদ্রমহিলা স্বামীকে ত্যাগ করিবার উদ্যোগে বাহিরে কাজ লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু

উক্ত স্বামী মধ্যে মধ্যে সাবিত্রীকে বিরক্ত করিতে আসিত। অতএব পুলিশী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য চাওয়ার কারণ ছিল শ্রীমতী সহায়ের।

সাবিত্রীর চোখ দু'টি বড় চমৎকার। নিত্য-নূতন হাল্কা ছাপা শাড়িতে তনুদেহ সজ্জিত করিয়া তিনি দেখা দিতেন। কাজলপরা টানা চোখ দু'টিরও অসহায় আবেদন কিছুদিন হামিদের পুরুষচিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। একটা কবিতাও লেখে হামিদ—

তেরো শ' পঞ্চাশ যায়—
তোমার আয়তচক্ষে
অগাধ বিস্ময়—

সাবিত্রীর স্কুলে মধ্যে মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান হিসাবে যাইতে হইত হামিদের। তখন দুই আয়তচক্ষে অভ্যর্থনা জানাইয়া সাবিত্রী কাছে কাছেই উপস্থিত থাকিতেন।

কিন্তু সাবিত্রী অধিক প্রশ্রয় পায় নাই। সাবিত্রীর চরিত্রে সেই শালীনতা হামিদ পাইত না, যাহাতে নারীকে সম্মান করা যায়। অন্যের ডিভোর্স করা স্ত্রীর মধ্যে রোমান্সও পাইত না চিররোমান্টিক হামিদ। সুতরাং সাবিত্রীর দিক হইতে বহু আবেদন হামিদের মৌনতার প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিল। অবশেষে সাবিত্রী সহায় পূর্বস্বামীর সহিত ডিভোর্সের পরে একজন স্কুল-ইন্সপেক্টরকে বিবাহান্তে স্থানত্যাগ করিলেন।

সবেরার কথা মনে পড়ে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বোন, নিরুপমা সুন্দরী সবেরা। সেও হামিদকে চাহিয়াছিল। কিন্তু লাজুক হামিদের মনস্থির হইবার পূর্বেই হামিদের জেলাটি ত্যাগ করিবার অর্ডার আসিয়া গেল।

এক বন্ধুর বৌদি বিন্দুকে একবার কর্মস্থলে সে পাইয়াছিল। বন্ধুর বৌদিকে 'বৌদি' ডাকিয়া সে অনাত্মীয় কর্মস্থলে একটু আত্মীয়তার স্বাদ পাইত। যাতায়াত, খাওয়া, বেড়ানো একসঙ্গে হইত।

একদিন নির্জন বাড়িতে হামিদ দেখিল বিন্দুবৌদি অতি সজ্জিত অবস্থায় প্রতীক্ষায় আছেন।

লালপাড় শাদা শাড়ি বটে, কিন্তু অতি চিক্কণ। সমস্ত মুখ যত্নে পরিমার্জিত, অধর আরক্ত। তিনি হামিদের সম্মুখে বসিবার ছোট চৌকিখানির ঢাকা সুজনীর উপর বসিলেন। সম্মুখের চেয়ারে হামিদ।

সরবৎ খাবে? আজ যা গরম।

না বৌদি, এককাপ চা বরঞ্চ দিন।

সুশিক্ষিত ভৃত্য চা আনিল। হামিদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে চোখ তুলিল।

সেই মুহূর্তের বিন্দুতে বিন্দুবৌদির হাত নিজের অতি নীচু জামার গলার ভি-কাটের প্রান্তে পাতলা শাড়িখানির পাড় নামাইয়া দিল। উন্নত বক্ষোজ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জামার কাট্। মুহূর্তে হামিদ পরস্ত্রীর উন্মুক্ত যৌবনসম্ভার হইতে দৃষ্টি নামাইয়া লইল। হামিদ আর ও-বাড়ি যায় নাই।

বিন্দুবৌদি বারবার খবর পাঠাইয়া অবশেষে গুম্ হইয়া রহিলেন। হামিদের উদগ্রযৌবন তখন। পুরুষকে আকর্ষণ করিবার স্বাভাবিক চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু নিজের মনে আছে কি না তাহা বিন্দু ভাবিবারও সাহস পায় নাই।

এদিকে হামিদ যৌবনকাতর দেহকে শাসন করিবার উদ্দেশে মাছ-মাংস ছাড়িল। অতর্কিতে পরস্ত্রী হিন্দুনারীর দেহসম্ভারের স্মৃতি নিঃসঙ্গ শয্যালোলুপ করিয়া তুলিত; তাই হামিদ শয্যায় কম্বল বিছাইল। চেষ্টা করিয়া অচিরাৎ সে অন্য জেলায় বদলী হইয়া গেল।

আজ নিদ্রাবিহীন রাত্রি স্মৃতির ঝাঁপি খুলিয়া দিল। নিজেকে কঠোর তিরস্কার

করিল হামিদ। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমযৌবনা তরুণীর স্বপ্ন দেখা অবাঞ্ছিত!

আলো জ্বালাইয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল জাগরণ উত্ত্যক্ত হামিদ। চুলে দুই-একটি রূপার খোঁচা অকালে জাগিয়াছে। দুই হাত দিয়া চুল ঢাকিবার চেষ্টা করিল অযথা, কোন আশা নাই।

আশা কি কেবল নিজের উৎকর্ষের দ্বারা? কেবল কি বয়সের ব্যবধান?

রায়-দুহিতা মুসলমানের কাছে আকাশের ফুল।

॥ আট ॥

হামিদ মনকে শঙ্করাচার্যের অনুশাসনে বাঁধিলেও নানা অজুহাতে রায়বাড়ি আসা বন্ধ করিতে পারিল না। তাহাকে আসিতেই হইত।

আজ হামিদের প্রাতঃকালীন আগমনের সংবাদে তাড়াতাড়ি অমিয় ছুটিয়া আসিল। কাল সে চলিয়া যাইবে তাই হামিদবন্ধু আন্তরিকভাবে সাক্ষাতে আসিয়াছে।

এই যে এসেছো আমি তোমার ওখানে একবার যাব-যাব করেও যেতে পারি নি। কালকে সকালেই যাত্রা। হিসাবপত্র মেটাতে সময় পাচ্ছি না। তুমি এসেছো, ভালই হোল। দীপঙ্করকে ডাকি। বসে আড্ডা দেওয়া যাক। ছেলেমেয়েরা বেড়াতে যাচ্ছে। নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

সাতবিঘার বিরাট বাড়ি কয়েকটি মানুষ সাময়িক স্থানত্যাগে নির্জনতা আনিবে চিন্তায় হামিদের হাসি পাইল। কিন্তু হাসি চাপিবে না। হামিদ গম্ভীরমুখেই বলিল, কোথায় যাচ্ছে? কে?

অমিয় হামিদের পাশে বসিয়া তাহার পিঠে অন্তরঙ্গ চড় বসাইল—আর ভাই, ছেলেবেলার কথা মনে নেই? নদীতে আমরা সখ করে স্নান করতে যেতাম? এরা তাই চলেছে।

কে কে যাচ্ছে?

কতজন আর একটা পানসীতে যেতে পারবে?

আমার লঞ্চ বিলে আছে। আমি ওধারে কুঠিতে অপেক্ষা করি। এঁরা বিল থেকে লঞ্চ নিয়ে নদীতে যান। নইলে কষ্ট হবে। ওঁরা বিল থেকে নৌকায় বা আমার ছিপে বাড়ি ফিরবেন। আমিও লঞ্চ নিয়ে চলে যাবো।

হামিদের প্রস্তাবে অমিয় সবেগ-আপত্তি দিল, কি দরকার? লঞ্চের দরকার নেই। তুমি কেন কুঠিবাড়িতে পাটের দালালের মধ্যে বসে থাকবে? অবশ্য আজ তোমাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে। মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। আজ তো রবিবার। তোমার কোর্টে ছুটি।

হামিদের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। রায়গৃহিণী গুণের সমাদর জানেন। ছেলেদের অসংখ্য বন্ধুর মধ্যে বিশিষ্ট কবি হামিদ বিশেষ সমাদর পাইত ঠিকই। অবশ্য যাতায়াত তার কমই ছিল। কিন্তু আজকের আদর যেন হতাশার নীল মেঘে রূপালী জড়িপাড়। হয় তো সেও একবার সামনে আসিতে পারে। দাদার বন্ধু তো পর নয়। কি এক ধর্মের ব্যবধানই অতল-গভীর সমুদ্র। সেখানে খেয়া চলে না।

হামিদ বলিল, আমি খাই বা না খাই তার সঙ্গে লঞ্চখানা যুক্ত নয়। এঁদের লঞ্চে নদী বেড়িয়ে আসতে বল।

চটর্ চটর্ চটির আওয়াজ তুলিয়া বড়কর্তা মহেন্দ্র আসিলেন। কলিকাতায় হামিদ ভাই-এর একজন সাধারণ বন্ধু হইলেও এখানে মস্ত লোক। জমিদারী বজায় রাখিতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটকে খাতির করিতে হয়। এই যে হামিদ, এসে গেছ। খুবই ভালো। কয়েকটা বিষয়ে তোমার পরামর্শ নেবার আছে।

বলুন, বড়দা।

তার আগে একটু চা খেয়ে নেবে চল। এখন তো আমাদের চায়ের সময়। এ ক'দিন তোমার যা খাটুনী গেছে! চল, গোল-বারান্দায়।

হামিদ ইতস্তত করিয়া বলিল, চা খেয়েই বার হয়েছি। এককাপ চা এখানেই দিতে বলুন।

অত ভোরে কি আর ভাল করে চা খেয়েছ? চল মা তোমাকে চা খাওয়াবেন নিজে বসে। তুমি যদি না থাকতে বাবার কাজ এখানে এমনভাবে হত না। মা বলেছেন তুমি তাঁর আর একটি ছেলে ছিলে নিশ্চয় পূর্বজন্মে।

হামিদের সমস্ত মন পিপাসু হইয়া উঠিল। পূর্বজন্মে কেন? এজন্মে সে কি রায়বাড়ির কোথাও একটু স্থান পাইতে পারে না?

হামিদ বাঙালী মুসলমান। হিন্দুপ্রধান গ্রামে সে হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিত ও ফলে মনে বিদ্বেষ জন্মায় নাই। এ ছাড়া কবিও বিভিন্ন সাহিত্যের পাঠক হওয়ার ফলে তাহার মন ছিল বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আবেদনে ভরা। হিন্দুনারীর মধ্যে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন মূর্তি ধরে। হামিদ হিন্দুপ্রেমী হইয়া ওঠে। বিদেশ গমনে যা কিছু ধর্মীয় সংস্কারের লেশ ছিল, ছিন্ন হইল।

শৈশব হইতে হামিদ নিজস্ব ধর্মের কোন আচার-আচরণ রক্ষা করে নাই। রোজা, নামাজ প্রভৃতি ধর্ম-অনুষ্ঠান তাহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সে সকল ধর্মের বাহির প্রকাশ হইতে দূরেই থাকিত।

একদা রায়বাড়ির দোল-উৎসবে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন শুনিয়া কৈশোরে হামিদ এক পদ রচনা করিয়া হিন্দু-প্রশংসা ও মুসলমান-ধিক্কার অর্জন করিয়াছিল।

ননদিনী দারুণা,
গুরুজন শাসনে
দগধি দগধি প্রাণ গেল;
দুঃখিনী জীবন হম
কি মত গোঁয়ায়ব;
বিষম যৌবন সম গেল,
জনম কঠিন সম ভেল।

(কবিতাটি কাটোয়ার পল্লিটা গ্রামের কবি মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান রচিত)

বহু মুসলমান হিন্দুসাহিত্য ও সাধনার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন বলিয়া আমরা জানি। বীরভূমের কবি আজীজের কথা সাধারণ্যে বিশেষ প্রচারিত না হওয়া সত্ত্বেও আমরা জানি। এই কবি সেই ঐতিহ্যধারায় আরও একটা শাখা সৃষ্টি করিল।

বিদেশ প্রত্যাগত, বিপত্নীক হামিদ কর্মস্থলে যখন যোগদান করে তখন সে সমগ্র

পাশ্চাত্য-দর্শনের, সাহিত্যের অনুরাগী ছাত্র। সে তখন কোন বিশেষ ধর্ম বা দেশের নয়।

কলিকাতায় যাতায়াতে হামিদ আধুনিক কবিদের মধ্যে সাগ্রহে গৃহীত হইল। তাহার পূর্বযুগের কবিতাগুলি সারল্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা পল্লীগাথার প্রাঞ্জলতা পাইয়াছিল। পরবর্তীযুগের কবিতাগুলি ছিল দৃঢ়বদ্ধ সংহত ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। তাই অনেক পাঠক হামিদের পূর্বযুগের কবিতা ভালবাসে। তেমনি একটি কবিতাই সংকলনগ্রন্থ হইতে মালতীর মনোহরণ করিয়াছিল।

মহেন্দ্রের আগ্রহে অবশেষে গোল-বারান্দায় হামিদকে উঠিতে হইল। সেখানে সে সানন্দে লক্ষ্য করিল যে এতদিন ছেলেদের বন্ধু হইয়া যতটা আপন হামিদ হইতে পারে নাই, এবার রায়কর্তার শেষকৃত্যে কয়েকদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, পাশে পাশে থাকিয়া সে রায়বাড়ির ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছে।

রায়গৃহিণী সে উপস্থিত হওয়ামাত্র একখানি চেয়ারে বসিবার ঘরে বসিলেন। হামিদ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কলিকাতার বাড়িতে সে পা স্পর্শ করিত; কিন্তু এখন শুদ্ধাচারিণী হিন্দু-বিধবার পায়ে হাত দিবার সাহস পাইল না।

রায়গৃহিণী বলিলেন, বোস বাবা। তুমি যা উপকার করেছ, তাতে তোমাকে আমার আর একটি ছেলে বলেই আমি মনে করি।

হামিদ বলিয়া উঠিতে চাহিল,—মনে মনে কেন? বাইরের জগতে মা, তুমি আমাকে নাও না। আমার সমাজে আমি আশ্রয় পাই নাই। হয় তো তোমাদেরই কেউ আমি।

মুখে বিনয়হাস্যে অবশ্য সে বলিল, আমি কর্তব্যকাজ করেছি মাত্র।

কর্তব্য নয় বাবা, উপকার। তুমি না থাকলে এতবড় ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আসতেই আমরা সাহস পেতাম না।

হামিদের উদ্দীপ্ত মন ম্লান হইয়া গেল। কেন যে তাঁহারা সাহস পাইতেন না, কারণ ওই দুস্তর ব্যবধান। যদি হিন্দু-জননী মুসলমানকে সন্তানস্নেহে বুকে ধরিতে পারিতেন, সত্যই যদি মুসলমান হিন্দুনারীকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, তাহা হইলে দেশবিভাগের প্রয়োজন হইত না।

তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাইবার আশায় হামিদ বলিল, এককাপ গরম চা খাওয়ান, মা। আসবার সময়ে ঠাণ্ডা চা জুটেছিল।

তা তো হবেই, চাকর-বাকরের হাতে যে তোমার সংসার। এবার বিয়ে করে সংসারী হও। চা আনছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চায়ের আয়োজন সহ সম্পা উপস্থিত হইল।

বোনদের মধ্যে একমাত্র সম্পার লেনদেন কিছুটা হামিদের সহিত ছিল। সাহিত্য লইয়া নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে সে দাদার বন্ধুকবি হামিদুল্লা হক-এর সহিত সাগ্রহে আলাপ-পরিচয় করিয়াছিল।

হামিদ বলিল, এ কি এ যে বিরাট ব্যাপার! শুধু এককাপ চা খাবার কথা ছিল।

সম্পা বলিল, কবিরা যা খান তা তো যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। তাই এই সমস্ত ঘরের খাবার। চা আসছে পটভর্তি। বিনতা নিয়ে আসছে।

রায়-পরিবারের সৌজন্যে কন্যারা নিজে উপকারী অতিথির পরিচর্যার ভার নিয়াছে।

হামিদ হাসিল। শ্যামবর্ণে শাদা দুধের মত কতকগুলি সুগঠিত দন্তে অতি মৃদু হাসি।

কবিরা কি খান জানতে পারি?

কেন, ফুলের মধু, বড়জোর কয়েকফোঁটা শিশির। এই যে দেখুন নারকেলের মাছ, এগুলো খুড়ীমা করেছেন আপনার জন্যে। আপনার বাড়ি পাঠানো হত।

ছি-ছি! কেন, কেন এত কষ্ট করছেন? আমি তো রোজই খেয়ে যাচ্ছি এসে। পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই।

দীপঙ্কর হামিদের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া অনিচ্ছায় অন্দরমহল হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীলতার ফুটবাথের আয়োজনটা সে আয়ার তদ্বিরে রাখিয়া অতৃপ্ত। এখন বলিয়া উঠিল, প্রয়োজন শুধু গ্রহীতার নয় হামিদ, উপহারদাতারও থাকে। তুমি এখানকার মলিক। খুড়ীমা এখানেই আছেন। তোমার কৃপাদৃষ্টি যেন পড়ে।

হামিদ অপ্রতিভ হইল। ঠিক এই সময়ে তাহার সমস্ত অপ্রতিভতা, জড়তা, অজ্ঞানতা দূরীভূত করিয়া, সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল করিয়া উপস্থিত হইল, এতক্ষণ সতৃষ্ণ হামিদ যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিল।

চঞ্চলা বিনতার হাতে কাশ্মীরী ট্রে-এর উপরে কোজিঢাকা টী-পট। আঁচল কোমরে জড়ানো। যেন সে-ই মালতীর কনিষ্ঠা। পশ্চাতে লজ্জিতা মালতী। বাসন্তী শাড়ির আঁচল কাঁধের উপর হেলায় ফেলা। হাতে কাচের প্লেটে দুইটি ডিমের পোচ্। ছায়া বৌদি পাঠাইয়া দিয়াছে,—মা বলেছেন হক সাহেবের চা খাবার যেন চাকরদাসী নিয়ে না যায়। তোমরা দাও গে।

মালতী ও বিনতা সম্মুখের টেবলে সম্পা-বাহিত ডিশের পাশে নিজেদের হাতের বস্তু রক্ষা করিল।

সম্পা বলিল, এই বিনতা মিস্টার হক, একদিন বাইরের ঘরে বসে যার গান শুনেছিলেন। গলাটা ভাল ছিল। কিন্তু একেবারে মন নেই। আর ইনি সর্বকনিষ্ঠা —মালতী। ভয়ানক আহ্লাদের। ইনি আবার নীরব কবি।

নীরব কবি! আহা, কি সুন্দর! মুগ্ধ হামিদ বলিল, কবিতা লেখেন?

লেখে কি না জানি না, তবে দেখায় না। কিন্তু আপনার লেখার ভক্ত। আপনার তিনখানা বই-ই তো আমাদের দিয়েছেন। মালতী পড়ে।

প্রচণ্ড আনন্দ দমন করিতে হামিদ এবার মুখ নামাইয়া চায়ের পাত্রে কৃত্রিম মনোযোগ দিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে হামিদ বলিল,

শুভ শারদীয়

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মুখার্জী এণ্ড কাজিনস্ (প্রাইভেট) লিঃ

প্রসিদ্ধ লৌহ বিক্রেতা

রেজিস্টার্ড টাটা-ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স

৭ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭ ★ ফোন: ৩৩-১২০৩

আমি এখন উঠি। আপনারা আমার লঞ্চ বিল থেকে নিয়ে নদীতে বেড়াতে যান।

দীপঙ্কর বলিল, তুমি উঠবে মানে? এদিকে যে তোমাকে খাওয়াবার জন্য এঁরা খাসী কাটছেন।

আমাকে খাওয়াবার জন্য এত দরকার কি? আমি নিরামিষ ভালবাসি।

রায়গৃহিণী হামিদের চা খাওয়ার পরে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্রও নাই। অমিয় সকৌতুক পরিহাসে বলিল, সারা জীবনটাই নিরামিষে কাটালে। এবার ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসো। আমিষের সন্ধান পাবে।

মালতীর আরক্ত মুখের দিকে একবার চাহিয়া হামিদ বলিল, একবার শীগ্‌গির যাওয়া দরকার। নূতন কবিতার বইখানা প্রেসে যাবে। কিন্তু এধারে এত কাজ যে ছুটি পাচ্ছি না। কে কে নদীতে যাচ্ছেন?

বেশি লোক নয়। সুভদ্রা মিত্রকে একটু নদী দেখাতে নিখিল সম্পা নিয়ে যাচ্ছে।

নবতম উপন্যাস

অভিজাত প্রকাশন

মানিক গ্রন্থাবলী

(১ম ভাগ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রথীন রায়ের আলোচনাসমৃদ্ধ ও সুসাহিত্যিক অশোক গুহের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'জীবনের জটিলতা' উপন্যাস-রস সহ 'অতসী মামী' ও অন্যান্য ১০টি গল্প। সুশোভন কাপড়ের বাঁধাই। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০·৫০

অন্যান্য বিশিষ্ট নবতম উপন্যাস

রাত্রির সীমানা	গজেন্দ্র মিত্র	৫·০০
তমিনা জাতক	বাণী রায়	৩·৫০
কর্ণাট রাগ	শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
অ্যাকসিডেন্ট	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২·৫০
সীমান্ত	শিশির দাশ	৩·০০
অন্যনয়ন	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
চৌধুরীবাড়ি	বিধনাথ রায়	৪·০০
সন্ধ্যামন্ত্রা	সংকর্ষণ রায়	২·৫০
গোরা ফালার হাট	অশোক গুহ	৮·৫০

জীবন-বেদ

নিরঞ্জন চক্রবর্তী ॥ মূল্য ৫·০০

'চিরায়ত উপন্যাস শুধু কাহিনী নয়—তা হবে শাশ্বত ভাবধারায় প্রোজ্জ্বল। ভাষা সেই ভাবধারার পরিবাহক। এই উপন্যাসখানি জীবনরহস্যের ভাবধারার প্রতীক।" সুধী পাঠকগণের ইহাই মতামত।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১এ, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিনয়, ওর বন্ধু অরুণাংশু। অমিয় উত্তর দিল।

আর একজন যাচ্ছে, বুলুদি'। সম্পা উঠিল।

বুলুদি' গেলে আমরাও যাবো। বিনতা বলিল।

সকলেই যান না কেন? আমার ছিপ আছে। পদ্ম-বিলে লঞ্চ পাবেন।

কিন্তু দায়িত্বটা নেবে কে এত লোকের? আমরা কেউ সঙ্গে যেতে পারছি না।

অমিয়র কথায় হঠাৎ সম্পা বলিয়া উঠিল, কেন মিস্টার হক, হামিদদা' চলুন না। মা ওঁকে তো আমাদের ভাই বানিয়ে দিয়েছেন।

সমস্ত মন হামিদের সুধাপ্লাবনে ডুবিয়া গেল।

॥ নয় ॥

নদীর বুকে সংযাত্রিক লোকেরা ভাসিয়া যাক। আমরা আবার রায়বাড়ির অন্দরের উঠোনে ফিরিয়া আসি।

এইমাত্র সকলে নদীতে রওনা হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছুক দীপঙ্করকে হামিদ টানিয়া লইল। সে শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে কি করিয়া একা যায়? অমিয় কাল কলিকাতা রওনা হইবে। তাহার পক্ষে সম্ভব নয় যাওয়া, কারণ মহেন্দ্র ও তাহাকে হিসাবপত্র হাতে একবার বসিতেই হইবে। হামিদ নৌ-যাত্রীদের সঙ্গেই ফিরিবে ও রাত্রে আহারাদি করিবে। ভোরবেলা হামিদ রওনা হইয়া নিজের কোর্টে পৌঁছাইবে। নৌকায় প্রচুর খাদ্য গিয়াছে। ফিরিতে হয় তো অপরাহ্ণ হইতেও পারে।

রায়গৃহিণী শ্রান্তভাবে হাতীমুখো বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আজ একাদশী। হবিষ্যি ঘরের দ্বার বন্ধ।

ছায়া চায়ের পাট তুলিয়া নৌকা-যাত্রীদের খাদ্য গোছাইয়া এবার বাক্স প্যাকে চলিল। জয়া এতক্ষণে স্নানে গেল।

কদমমণি গৃহিণীর মাথায় তেল বসাইতে লাগিয়া গেল।

ছায়ার হাতে হাতে খাবার সাজাইয়া সাবিত্রী নিজের এলাকায় বিধবাদের জন্য ফল কাটিতে বসিয়াছিলেন। গৃহিণীর কাছে এবার আসিলেন। দিদি আমাদের কথা একটু হামিদুল্লাকে বলে যাবেন। আমাদের দিকে যেন একটু চোখ রাখে। আর, ছেলে দু'টোর একটু কাজকর্ম কলকাতায় দেখে দেবার কথা মনে রাখবেন। ওদের বিয়ে-থা তো দিতেই হবে। মণি আটাশে পড়েছে। হরু-র এই চব্বিশ। মেয়েটি তো চিতা জেলে বসে আছে। ব্যাটার বৌ দেখলে তবু একটু শান্তি পাবো।

সাবিত্রীর মনে আশা, এত করিয়া কয়েক দিন যাবৎ তাঁহারা রায়-পরিবারের সেবাযত্ন করিতেছেন হয় তো কিছু পুরস্কার মিলিলেও মিলিতে পারে।

সাবিত্রীর স্থানত্যাগের বিশেষ কারণ আছে। বন্দরে হর একা থাকে। ক্রমেই বাড়ি আসিবার তাগিদ তার অদৃশ্য। সহকারী হেডমাস্টার অধর গুপ্তের কন্যা পুতুল হরর নাকি মন হরণ করিয়াছে এরূপ গুজব তাঁহাদের কানে আসিয়াছে। সাক্ষাৎ বৈদ্য-কন্যা বিবাহ করিয়া যদি পুত্র কুল নষ্ট করে সেই ভয়ে স্থান ছাড়িতে চায়। এদেশে বৈদ্য কম। কোথা হইতে অধর গুপ্ত তাঁহার অতি বেহায়া কন্যাটিকে সাবিত্রীর মাথা খাইতে আমদানী করিলেন?

তা ছাড়া হামিদ চলিয়া গেলে এখানে কোন হিন্দু নিরাপদে বাস করিতে পারিবে বলিয়া কেহ মনে করে না। পদোন্নতি হইয়া হামিদের অন্যত্র যাওয়ার কথাও শোনা যায়।

গৃহিণী সাবিত্রীর সকরুণ আবেদন শুনিয়াও নির্বাক রহিলেন। পুত্রদের কোন ব্যাপারে তিনি সহজে হস্তক্ষেপ করিতে চান না।

কদমমণি রায়-পরিবারে দীর্ঘদিন আশ্রয় পাইয়া তাহাদেরই একজন বলিয়া নিজেকে মনে করিতে শিখিয়াছে। তা ছাড়া আশ্রিতার সংখ্যা বাড়িলে তাহার ভাল লাগে না। খন্‌খন্ করিয়া বলিল, আজ একাদশী। প্রথম বিধবার বড় মন খারাপ থাকে। আজকে এসব কথা থাক না।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিল, সে তো ঠিক কথাই মাসিমা। কিন্তু দিদি কাল চলে যাবেন এতক্ষণে। তাই একটু বলে রাখলাম। ও মা, অনাথের বৌ আসে না।

অনাথ সরকারের বৌ চাঁদু প্রথম-যৌবনা নয়। তথাপি মনিবগৃহে আগমনের হেতু দীর্ঘগুণ্ঠনবতী। আস্তে আস্তে নবোঢ়া বধূর মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া মনিবানীর পদপ্রান্তে গলায় রঙিন তাঁতের শাড়ির খুন-খারাপী আঁচল জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

বোস বৌ, রতন একে আসন দে।

রতন গৃহিণীর কাছেই উপস্থিত ছিল। ঘর হইতে একখানা বেতের চ্যাটাই আসন আনিয়া বিছাইয়া দিল।

চাঁদু ঘোমটার মধ্য হইতে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, কাল মাঠাগরেণ চলে যাবেন

তাই, একবার পায়ের ধূলা নিবার আলাম। আপনিরা তো যাতেছেন, আমাগারে কনে রাখা যাবেন? আমাগারে সঙ্গে লেন।

গৃহিণী বলিলেন, সবাই যদি চলে যেতে চাও তবে থাকবে কে? মিথ্যা ভয়ে বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে ওখানে বাস্তুহারার ভিক্ষান্ন কি ভাল? এখানে আমার একটি ছেলে তো রইলই। সে-ই দেখবে।

চাঁদুর মুখ আশায় চক্-চক্ করিয়া উঠিল।

সাবিত্রীরও চোখ চক্‌চকে হইল। চাঁদু পরম আশায় প্রশ্ন করিল, কেডা থাকবেন, মাঠাগরেণ?

বড় কর্‌তা না?

গৃহিণী বলিলেন, না। তারা কেউ থাকতে চায় না। থাকবে হামিদ। সে-ই প্রাণ দিয়ে তোমাদের রক্ষা করবে।

ম্যাজেস্টার সাহেব? সে তো আপনারা আছেন তাই গেরামে আসেন রোজ রোজ। নইলে উঁয়ার নাগাল আমরা পাবো কনে থেকে? চাঁদু নিভিয়া গেল।

সাবিত্রী বলিলেন, হ্যাঁ, তবে মানুষের মত মানুষ একটা। সকল মুসলমান অমন হলে তো আর ভাবনা থাকতো না।

গৃহিণী বলিলেন, আগেই জানতাম হামিদ ভারি ভালো ছেলে। এবার নিজের চোখে পরিচয় পেলাম। মুখে হাসি লেগেই আছে। একটাও উঁচু কথা নেই। নিজের বাড়ির মত করে উদয়াস্ত খেটে চলেছে। ও না থাকলে ব্যাপার এখানে তোলা যেত না।

কদমমণি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গৃহিণীর শিরে ঠাণ্ডা তৈলমর্দন করিতেছিল। এখন হামিদের পালে রায়বাড়ির অনুকূল হাওয়া লাগিয়াছে বুঝিয়া মুখ খুলিল।

তোমার অমিয় না বলছিল দিদি, আসবার সময়ে, যে হামিদের কাছে হিন্দু-মুসলমান সকলে সমান। বরঞ্চ হিন্দুরা ভয় পাচ্ছে বলে তাদের দিক সে টেনে চলে।

চাঁদু বলিল, হু, ম্যাজেস্টার সাহেবের কাছে হিন্দুমোছন ভেদ নাই। কিন্তু ঠাগরেণ, এখানে আপনার নায়েব বড় অত্যাচার করে। মাছধরা হলে আমরা ভাগ পাই না, ফলপাকোড় পাই না। মানুষের মাইনাও বাড়ে নাই। আর কুলায় না আমাগারের। একডা বেবস্থা কর্‌যা যান, মাঠাগরেণ।

চাঁদু দুইহাতে রায়গৃহিণীর পা জড়াইয়া ধরিল।

গৃহিণী বিব্রত হইয়া আশ্বাস দিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি মহেন্দ্রকে বলে যাব। পা ছাড়, পা ছাড়।

এমন সময়ে আরও একটি মূর্তি ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত চলনে তাহার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়িতেছে। লাল নক্সাপাড় শাড়ি পরনে, কাঁকালে একটা ছোট ঝুড়ি।

বৃধা সরকারের স্ত্রী রাধা আসিয়াছে। গলির ওপারে বাড়ি। চাঁদুকে মনিববাড়িতে ঢুকিতে দেখিয়া বৃধা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ছুটিয়া গেল ও নিমেষমধ্যে স্ত্রীকে রায়বাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল।

রাধার কাঁকালের ঝুড়িতে কয়েকটা ফল। রায়গৃহিণীর পদপ্রান্তে ঝুড়ি স্থাপনা করিয়া পদধূলি লইল। চেষ্টাকৃত মিহিসুরে বলিল, গাছের দু'টো ফল সেবার জন্যে এনেলাম।

চাঁদু মনে মনে নিজের গালে চড় মারিল। গাছের ফল তাহার নাই, কিন্তু সে গতকাল টাট্‌কা পাটালি তৈরি করিয়াছে। কেন যে একখানা বুদ্ধি করিয়া আনিল না? বাড়ি ফিরিয়া স্বামীর দ্বারা পাঠাইয়া দিতে হইবে।

গৃহিণী রাধাকে বসিতে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে খিড়কীর মঙ্গলঘট-দুয়ারে কলরব উত্থিত হইল। বাসিনী ছুটিয়া খবর আনিল রূপার হাওরমুখো বজরায় গৃহিণীর সখী সুরবালা পোরজোনা হইতে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিখ্যাত জমিদার বংশ। নারায়ণশিলা কলিকাতায় লইয়া যাইতে স্বামীসহ আসিয়াছেন।

মুগাপাড় শাড়ি, গায়ে মুগাকল্কা সাদা জামা। বেশি গহনা ও উগ্র সধবা-প্রসাধন খুলিয়াই সুরবালা সদ্যবিধবা সখীসাক্ষাতে আসিয়াছেন। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ স্বামীসহ রক্ষা করিয়া গেলেও সেদিন বসিতে পারেন নাই সখী কাল কলিকাতা যাইবে। সেখানে দেখা তো হইবেই। তথাপি বিশেষ সৌজন্য দেখাইতে আজ সুরবালার আগমন।

এসো, এসো সুরো। সঙ্গে কে? ভাদুড়ী মশায় নায়ে আছেন না কি? মহেন্দ্রকে খবর দিই!

না, না, উনি আজ আসেন নি। নায়েবমশাই আর ভাগ্নেকে নিয়ে এলাম। সেদিন বসতে পারি নি।

গৃহিণীর চোখে স্বল্পপ্রসাধিতা সুরবালার সিঁথি ও ললাটের সিন্দুর বড় উজ্জ্বল মনে হইল। শাঁখা ও লোহাপরা হাত দু'খানির মত অলঙ্কারবহুল হাত যেন তিনি প্রথম দেখিলেন।

শরৎ মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

১ কে. জি ২ কে. জি ৪ কে. জি ও ১৬ কে. জি. টিনে পাওয়া যায়।

গোপাল অয়েল মিল

২১, বেনারস রোড, সালিখা, হাওড়া

ফোন ঃ ৬৬-২৭১৩

বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, ঘরে বসবে চলো। বৌমা, এদের দু'জনকে তোমার বারান্দায় বসিয়ে জলখাবার দাও। কদম, ফলগুলো তুলে রাখো। নারায়ণের বৈকালীতে কেটে দিও।

এত বেলায় স্নান কর নি? আগে স্নান সেরে নাও না।

থাক, পরেই হবে। আগে একটু তোমার সঙ্গে কথা বলে নি। আজ স্নানে বেলা হল, কারণ ছেলেমেয়েরা সকলে নদীতে গেল। চল, ঘরে চল।

গৃহিণী তাঁহার কক্ষে, রায়গৃহিণীদের চিরাচরিত কক্ষে সখীকে লইয়া গেলেন। রতন ঝি সঙ্গে।

সাবিত্রী চাঁদু ও রাধাকে নিজের এলাকায় ডাকিয়া নিলেন। উভয়ে মনিবগৃহিণীর নিকট স্বীয় আর্জি জানাইতে আসিয়া বিফল মনোরথে একমিনিটে বন্ধু হইয়া উঠিল।

সাবিত্রী ঘরে নাড়ু-বড়ি আনিতে গেলে চাঁদু ফিসফিস করিয়া রাধাকে কহিল, সইমা যেন আর আসার সময় পালেন না। আমরাও একটু সুখ-দুঃখের কথা কবের আছি, উনিও হাজির হলেন।

রাধা বলিল, তবু তো তুমি দুইডা কথা কবের পারছাও। আমি না পা দিতে দিতে ফুস্‌মন্তরে হাজির হলেন।

বাসিনী লোকসমাগমে পুকুরঘাট ছাড়িয়া ভিতরে হাজিরা দিতেছিল। পিছে পিছে হারাণীও গল্পের গন্ধ পাইয়া উপস্থিত।

॥ দশ ॥

সাবিত্রী ঘরে আসিয়া দেখিলেন মণীন্দ্র একমনে চৌকীর উপর বসিয়া ভাগবত পড়িতেছে। সে ও হরেন্দ্র রায়বাড়ির কাজে নিজেদের কর্মস্থল হইতে ছুটি লইয়াছে। তবে হর আজ ছুতা করিয়া একবার বন্দরে গেল। সাবিত্রীর মতে 'চোখখাকী' পুতুলের সঙ্গে দেখা করিতে।

সাবিত্রীর বড়ই বিপদ। কারণ ছোট ছেলে 'অজাত' লইয়া মাতিয়াছে এবং বড়ছেলে মাতিয়াছে ধর্ম লইয়া। উভয়ের অচিরাৎ বিবাহ দিতে না পারিলে দুইটি পুত্রই হাতের বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু পাকিস্থানে সুপাত্রী কে পায়?

শৈশব হইতে মণি অন্যরকম। বন্দরে আড়তদারের ওখানে নিয়মিত কাজে যায়। বেতন মাতার হাতে দেয়। কিন্তু গ্রামের শ্যামরায়ের মন্দিরেই তার বাকি সময়টা কাটে। বাড়ি থাকিলেও ধর্মগ্রন্থ পড়ে।

স্বামী বৃদ্ধ হইয়াছেন। দুই ছেলের রোজগারে ও রায়বাড়ির উপস্বত্ব ভোগে বিধবা কন্যাসহ সংসারটি চলিলেও সাবিত্রী ভবিষ্যতে কোন আশা দেখেন না।

এবারে রায়বাড়ির কর্তাদের দীর্ঘকাল পরে আগমনে তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন। এইবার পুত্রযুগলের পাত্রীস্থ করা, নিরাপদে কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে। বুলু তরুণী, তাহাকে লইয়া থাকা জলের পাতিলে (হাঁড়ি) হাত দিয়া থাকা। যে কোন সময়ে হাঁড়ি ভাঙিবে। কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। ইঁহারা একে একে চলিয়া যাইতেছেন।

মহেন্দ্র ও জয়া দেশে কিছুদিন থাকিলেও সুবিধা হইবে না। জয়া লোকটি শক্ত। তাঁহাকে গরীব আশ্রিতা বলিয়া তাচ্ছিল্য করে। বুলুকে যদি ইঁহারা দয়া করিয়া সঙ্গে লইতেন, তা হইলে সাবিত্রীর ভয় কমিত।

মণীন্দ্রকে ভাগবত পাঠরত দেখিয়া সাবিত্রীর গা জ্বলিয়া গেল। তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, এখানে ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছ কেন? কাল অমিয় চলে যাবে। ওদের কাছে যেয়ে বস না।

ওখানে বাবা আছেন। আমার যাবার কি দরকার? মণীন্দ্র বই হইতে মুখ তুলিল না।

বাড়িতে এত লোকজন, খাওয়া-দাওয়া। তোমার বয়সে কে বুড়োর মত ধর্মের বই পড়ে, শুনি? যাও না, অমিয়কে ধরে-পড়ে বল একটা চাকুরি যোগাড় করে দিতে। তা হলে আমরা কলকাতায় যেতে পারি।

মায়ের কথায় মণীন্দ্র এতক্ষণে ভাগবত হইতে মুখ তুলিল। খোঁচা-খোঁচা মাথার চুল ছোট, চ্যাপ্টা মুখের ছাঁদ জাপানী। সে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, কলকাতায় যেয়ে কি হবে?

সাবিত্রী আরও জ্বলিয়া উঠিল, না, সকলে চলে যাচ্ছে, আমরা এই পচা পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে মরবো, না?

মৃত্যু ভাগ্যে থাকলে যেখানেই যাওয়া যায়, মরতেই হবে। আড়তের কর্মচারী মণীন্দ্র চরম দার্শনিক-তথ্যটি অবহেলায় প্রচার করিল।

সাবিত্রী বলিল, তোমার কথা শুনে গা জ্বলে যায়। নিজের ভাবনায় আছ। এধারে বুলুকে নিয়ে আর কতদিন এখানে থাকবো?

মণি নির্লিপ্তস্বরে বলিল, তা হলে তোমরা চলে যাও। আমি গোঁসাইদাদাকে বলে রেখেছি। এবারে যখন উনি যাবেন, আমি ওঁর সঙ্গে কাঁকোমঠে চলে যাবো।

সাবিত্রী গাছ হইতে পড়িলেন। শ্যামরায়ের পূজারী জটাধর গোস্বামী তাঁহাদের গুরুকুলের বংশধর। গোঁসাই অকৃতদার, সন্ন্যাসী-ভাবাপন্ন। মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে অন্য পূজারীর হাতে শ্যামরায়ের ভার দিয়া দূর ধানবাদের কাঁকোমঠে চলিয়া যান। আবার কয়েকমাস পরে ফিরিয়া আসেন। বলেন, শ্যামরায়ের টানে মঠে থাকতে পারলাম না।

মণীন্দ্র নিয়মিত গোঁসাই-এর নিকট যাইত, তাহা সাবিত্রী জানিতেন। ছোটছেলে অজাত লইয়া নাচিতেছে। তাহা অপেক্ষা সৎসঙ্গে বড় ছেলের দিন কাটিতেছে ইহাতে সাবিত্রী নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু ধর্মও যে উৎপাত হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা সম্প্রতি টের পাইতে তিনি সুরু করিয়াছেন।

ছেলের কাজকর্মে সংসারে মন নাই। মাছ-মাংস খাইতে চায় না। বিবাহের কথা বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। সর্বদা কোন না কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ে।

তথাপি নির্বিবাদে আড়তে কাজ করিতেছে, সংসারের কাজ করিতেছে দেখিয়া সাবিত্রী নিশ্চিন্ত ছিলেন—মনে মনে আশা

বেনারসী, সিল্ক, ডেকরন, টেরিলিন, ট্রিংকল, ওয়াশ-এণ্ড ওয়ার, সর্ব্বপ্রকার তাঁতের শাড়ী ও তৈয়ারী পোষাক।
শাল, আলোয়ান ও সকল রকম শীতবস্ত্র
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা—৭
ফোন: ৩৩-২৩০৩

রাখিতেন সুন্দরী বয়স্থা কন্যা দেখিয়া বিবাহ দিলে উড়ু উড়ু ভাব থাকিবে না।

টিনের কৌটা হইতে নারকেলের তক্তি-নাড়ু বাহির করিতেছিলেন সাবিত্রী সরকার, বৌদের জন্য। হাত কাঁপিয়া গেল। কাজ বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, তার মানে?

শ্যামরায়কে গোঁসাইদাদা আর এখানে রাখবেন না। হামিদুল্লা হক বদলি হয়ে গেলে আর বাস করা যাবে না জেলায়। তাই শ্যামরায়কে তুলে নিয়ে যাবেন কাঁকোমঠে। আমিও চলে যাবো।

এবার সাবিত্রী সত্যই বসিয়া পড়িলেন। চৌকীর প্রান্তে থপ্ করিয়া বসিলেন।

তুমি বড়ছেলে হয়ে মঠে যাবে? আমাদের কি হবে?

কি আশ্চর্য! তোমরা না কলকাতায় যাবে বলছিলে?

কলকাতায় যাবো? হা রে কপাল! হতাশায় সাবিত্রীর স্বর বিকৃত শোনাইল। যাবো কি করে? কে নেবে? তোমরা চাকুরি পেলে তবেই যাওয়া যেত। এঁরা আমাদের ঘাড়ে নেবেন কেন? অথর্ব হন, পঙ্গু হন, সৌরীনঠাকুর থাকলে আমাদের জোর থাকতো। কিন্তু তিনি তো ফেলে রেখে চলে গেলেন, ছেলেদের ওপর জোর কি? তুমি কোথায় শক্ত হয়ে দাঁড়াবে এখন, না কাঁকোমঠের স্বপ্ন দেখছ?

কিন্তু মা, আমি তো আগেই বলেছি আমার ওপর কোন আশা রেখো না। আমার সংসার ভাল লাগে না। এসব কিছুই আমার ভাল লাগে না।

কবে মণীন্দ্র কি বলিয়াছিল তাহা বেদ-বাক্য মনে করিয়া রাখেন নাই সাবিত্রী। ছেলেমানুষের খেয়াল ভাবিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, এখন সেই সামান্য কথাটির গুরুত্ব বুঝিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কাঁদিয়া ফেলিলেন সাবিত্রী, ও রে, মায়ের বুকে এমন শেল দিস্ না।

মণীন্দ্র এবার বই রাখিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা একটা কথা বলতে পারো? ছেলে বিদ্বান হলে, বড় চাকুরে হলে, কৃতী হলে তোমরা আনন্দ পাও, ত্যাগী হ'লে আনন্দ পাও না কেন?

সুদূর পল্লীগ্রামে, সাধারণ একটি ঘরে এক সাধারণ ঘরের ছেলে চরম সত্যের উচ্চারণ করিল সেদিন।

অতি সাধারণ সে, লেখাপড়াও বেশি করিতে পারে নাই। আড়তে বসিয়া হিসাবের খাতা রাখে। পাড়াগাঁয়ের অন্য দশজনের মত বিশেষত্বহীন দিনযাপন করে। প্রত্যহ দাসত্বের পরে কাদামাখা গেঁয়ো পথ দিয়ে বাড়ি ফেরে, মাতার দেওয়া ডাল-ভাত খাইয়া চৌকীর সামান্য শয্যায় শুইয়া পড়ে।

শ্যামরায়ের প্রাঙ্গণে একটি আখড়া আছে। সেখানে গ্রামের ছেলেরা ব্যায়ামচর্চা করে। পল্লীগ্রামের ক্লাব সেটা। মণীন্দ্রের সেখানে যাওয়াটা সকলেই স্বাভাবিক বলিয়া ধরিত।

কবে যে তাহার মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইল, সংসারকে তিক্ত লাগিল, কেউ জানে না।

সাধারণ চেহারা, খোঁচা খোঁচা অসংস্কৃত চুল, জাপানী মুখ। সেই মুখ হইতে বুদ্ধদেবের দর্শন বহির্গত হইল। ঘরটির আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত করিয়া একই প্রশ্ন ধ্বনিত হইল।

কেন?

ছেলেকে আমরা পণ্ডিত করিতে চাই, চাই উচ্চ চাকুরিয়া করিতে। কিন্তু চাই না সন্ন্যাসী করিতে।

কোন মা বলিতে পারেন: আমার কুল পবিত্র হইল। আমার পুত্র সন্ন্যাসী?

পুত্রের অর্থ উপার্জনের কৃতিত্বে মাতার মুখ উজ্জ্বল হয়। সংবাদপত্রে পুত্রের কৃতিত্বের সংবাদ প্রকাশিত হইলে মাতা গৌরবময়ী। কিন্তু কোন মা অনন্যচিত্ত সাধনায় পুত্রকে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ করিতে চান?

তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আর আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেন না।

জননী যদি পথভ্রষ্ট, পুত্র কি করিয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়?

ঘরের মধ্যে যখন একাঙ্ক নাটকের অভিনয় চলিতেছিল বাইরে সম্পূর্ণ অন্য খাতের আলোচনা প্রবাহিত।

বাসিনীকে দেখাইয়া হারাণী রাধাকে বলিতেছিল, ফুসমন্তরের কথাডা যদি উঠ্যালেনই সরকার-ঠাগরেণ, তবে ইয়ারে দেন। খোকা জ্যালার লেগে ছুঁড়ি হেত্থায়ে মরে, দেখেন।

বাসিনী খন্‌খন্ করিয়া উঠিল, যাও দেখি, নিজে ফুসমন্তর শিখ্যা নাওগা। সাজ্জাৎ আলীরে ধর‍্যা রাখবের পারব্যা নে।

হারাণীর রাগ হইল। রায়বাড়ির দুই সরকার-বৌয়ের কাছে সে সম্ভ্রান্ত থাকিতে চায়। বলিয়া উঠিল, সাজ্জাৎ আলীরে নতুন কর‍্যা ধরা লাগব্যানে। যে ধরা দেয় না সেডাকে ধর‍্যা তুই শিখ্যা নে। কামে লাগব্যানে। শুনি খোকা জ্যালা নাকি দেশ ছাড়বের চায়।

অগো, সে তোমার লেগে। সাজ্জাৎ আলী লয়্যা আছো দেখ্যা খোকা জল্যা জল্যা মরত্যাছে না!

বাসিনী রাগ না করিয়া ঠাণ্ডা মাথায় কুটকুট করিয়া বিষকামড় দিল। বয়সে ছোট হইলেও তাহার কথা প্রবীণাকে লজ্জা দেয়।

হারাণী চট করিয়া সামলাইয়া লইল।

কতেছি কি খোকা না সন্ন্যাসী হবের চায়। তা এইবেলা সামলায়া নে। শেষমেশ ম্যাজেস্টার সাহেবের মত একা একা ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা বেড়াবে। উঁয়ারে না লোকে সন্ন্যাসী কয়।

নিজেকে বাঁচাইতে হারাণীর তুলনার অসঙ্গতি দেখিয়া অশিক্ষিতা রাধা-চাঁদুরও হাসি পাইল।

কিন্তু বাসিনীর কাছে অসঙ্গত তুলনা মনে হইল না। খোকাকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের সঙ্গে সমকক্ষ করিলেও তাহার অসঙ্গতি লাগিত না।

প্রেমিকগর্বে বাসিনী তির্যক হইয়া দাঁড়াইল। পা নাচাইয়া বলিল, আপনাগারের সম্মুখে কতেছি, অপরাধ নিবেন না। রাত্তির বেলা ঘরের মধ্যি মেয়ামানুষ ছ্যাড়া দিবের পারলে অনেক সন্ন্যাসীই ভেক ছাড়ে।

বুধের বৌ রাধা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে সোজা মানুষ। তাহার আহারে সুখ, ভ্রমণে সুখ, যৌনমিলনে সুখ। ছেলেমেয়ে, ক্ষেতখামার, স্বামী লইয়া বেশ মনের সুখে আছে।

চাঁদুর সুখ নাই। বুড়ো শীর্ণ স্বামী তাহার মনে ধরে নাই। তায় নির্ধন। অতএব তাহার আহারে সুখ নাই, বিহারেও নাই। সে কথাটা শুনিয়া যেন ঘেন্নার কথা এইভাবে নাসা কুঞ্চিত করিল।

আদিরসের স্রোত কতক্ষণ বহিত কে জানে? কিন্তু ইতিমধ্যে সাবিত্রী দুইখানা ছোট কাঁসার পদ্মকাটা রেকাবে জলখাবার আনিয়া ধরিলেন।

রায়বাড়ির আইনে সমকক্ষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পায় ক্ষীরের জলখাবার। অন্যেরা নারিকেলের। বাড়ির সরকারের বৌ বলিয়া এরা নারকেলের সঙ্গে ক্ষীরের সঞ্চও পাইল। তদুপরি হালুইকরের তৈরি বৃহৎ ক্ষীরচম্‌চম্।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী রতন দর্শন দিলেন। রায়বাড়ির লোকেরা থাক বা না থাক ঘর-বাড়ি রক্ষার জন্য কয়েকটি ঝি-চাকর বারমাস থাকেই। রতন অন্যতমা। ঘর দ্বার খুলিয়া, বিছানা রোদে দিয়া, আসবাব ঝাড়িয়া রাখার ভার রতনের উপর। রতন সর্বদা পদোচিত গাম্ভীর্যে চলিবার চেষ্টা করে।

এই পূজায় এসে দেখতে আপনাকে

আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে
ছ'টি নতুন মারফি মডেল

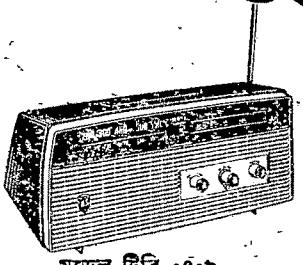

মডেল টিবি ০৭০৯
৯ ট্রানজিষ্টর এবং ডাইওড • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
৪০০৲ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

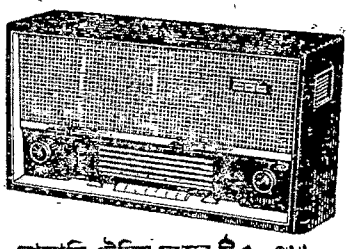

লাক্সারি টেবিল মডেল টিএ ০৩৬৬
৭-ভালভ • ৫-ব্যাণ্ড • পিয়ানো-কি ওয়েভ ব্যাণ্ড সিলেক্টরস্ • একটি ওভাল স্পীকার এবং দুটি টুইটার যাতে হাই-ফাই ধ্বনি উৎপাদন হয়• মিডিয়াম ওয়েভ রিসেপশনের জন্য চক্রাকার ফেরাইট রড-এরিয়াল।
৬৬৮.৩৩ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

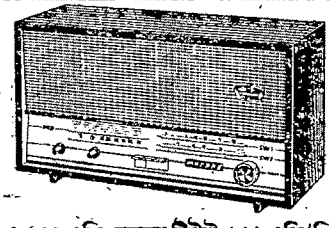

মডেল টিএ০৯২২এসি মডেল টিইউ০৯২২এসি/ডিসি
৬-ভালভ • ৩-ব্যাণ্ড • নিরবিচ্ছিন্ন টোন কণ্ট্রোল • অভিনব পিয়ানো-কি সুইচ • ডিথারুতি লাউডস্পীকার • গ্রামাফোন পিক-আপ সকেটস্ • এক্সটারনাল স্পীকার সকেটস্
৩৯০৲ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

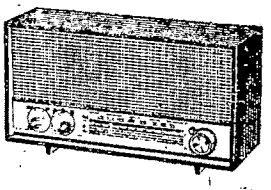

মডেল টিএ/টিইউ ০৮২২
৫-ভালভ • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড • একটানা পরিবর্তনীয় টোন কণ্ট্রোল • সংবেদনশীল ৫" লাউড স্পীকার • গ্রামাফোন পিক-আপ সকেটস্ • এক্সটারনাল স্পীকার সকেটস্ • কাঠের ক্যাবিনেট
২৯৮৲ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত

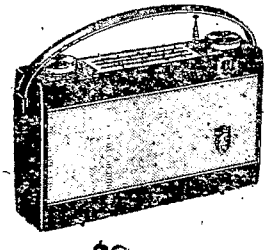

মডেল টিবি ০৫৮৩
৯ ট্রানজিষ্টর এবং ডাইওড • অল-ওয়েভ • ৩-ব্যাণ্ড
(ব্যাটারী ব্যতীত মূল্য)
৩৭৫৲ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

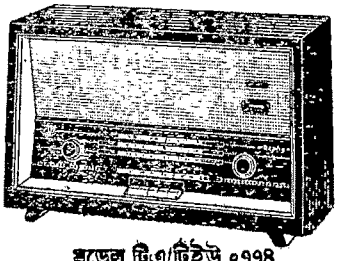

মডেল টিএ/টিইউ ০৭৭৪
৬-ভাল্ভ • ৪-ব্যাণ্ড • পিয়ানো-কি সুইচ.
মিডিয়াম ওয়েভ রিসেপশনের জন্য চক্রাকার ফেরাইট রড-এরিয়াল
৫১৬.৫৭ টাকা একমাত্র উৎপাদন কর সহ।
বিক্রয় কর ও অন্যান্য স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

এখন ৮০০ অপেক্ষা বেশি মারফি ডীলারের দোকানে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে

সর্ব ভারতীয় মূল্য (মহারাষ্ট্র বাদে)

murphy radio

মারফি রেডিও গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

NAS.286a A

এখন বাসিনী, হারাণী, রাধা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে দেখিয়া রতন মুখ সবিশেষ গম্ভীর করিয়া ফেলিল। বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার মত গুরুত্বপূর্ণভাবে বলিল, খুড়ীমা, সইমা ভাত খ্যায়া বার হচ্ছেন। মাঠাগরেণ বল্যা দিলেন লুচি-তরকারী, মাছ যেন উঁয়ার জন্যি করা হয়। নৈকার মাঝি-মাল্লা, সঙ্গের লোকজনগারেক জলপান দেন। নায়েব-বাবু আর ভাগনাকে জলখাবার দিবের হবে। সকলে খ্যায়া অ্যালেও তাগারের দুফুরের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় রাখবেন। হাট থিক্যা এখনও মাছ আসে নাই? বাসিনী আর হারাণীক সকাল থিক্যা কেবল মুখে মুখে গল্প করবের দেখত্যাছি আমি। যা, দেখগা মাছ অ্যাল কি না। তাড়াতাড়ি মাছ কোটগা, যা। আমি বামুন ঠাকুরক কইগা।

পুত্রের আসন্ন সন্ন্যাসচিন্তায় কালক্ষেপ করিবার সময় হইল না সাবিত্রীর। তিনি কাজের চাকায় নিজে চড়কের সন্ন্যাসীর মত ঘুরিতে লাগিলেন।

।। এগারো ।।

তখন রায়-পরিবারে আর একটি চাকা ঘুরিতেছে।

কুশলপ্রশ্নের পরে রতনকে নির্দেশ দিয়া রায়গৃহিণী বিদায় করিলে বাল্যসখী সুরবালা বলিলেন, একটা কথা আছে। তোমার কাছে চাইতে এসেছি।

আমার কাছে আবার তোমার চাইবার কি আছে? আজ আমি ভগবানের অভি-সম্পাতে দুর্ভাগা। তুমি রাজরাণী। প্রার্থনা করি চিরকাল স্বামী ভোগ করে তাঁকে রেখে যাও। আমার মত কপাল যেন শত্রুরও না হয়।

এ কি বলছো তুমি? এমন সমস্ত ছেলে তোমার, মেয়ে তোমার। চেনাজানা কারুর এমন সন্তানভাগ্য নেই। স্বামীই কি সব? এটাও কি ভাগ্য নয়? আমার তো শিব-রাত্রির সল্‌তে সেই একটি মাত্র। তার জন্যেই আজ তোমার কাছে এসেছি।

রায়গৃহিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

সুরবালা ধীরে ধীরে বলিলেন, ছেলের মা হয়েও আমি আজ তোমার মেয়েকে চাইতে এসেছি।

গৃহিণীর বিষণ্ণ-শোকাহত মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরবালা ধনী। তাঁহার একটি ছেলে ডাক্তার। বিদেশ হইতে বহু ডিগ্রীর জোরে অল্প বয়সে প্রকাণ্ড সার্জেন। অতিশয় সুদর্শন।

সম্পার বিবাহের সময়ে স্বল্পবিদেশ-প্রত্যাগত ছেলেটিকে দেখিয়া গৃহিণীর মনে জামাই করিবার বাসনা হয়। কর্তার সহিত মৌখিক আলোচনাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেরা সদ্য সদ্য এক বোনের বিবাহে অর্থব্যয় করিয়াছে। এখনি অন্য বোনের কথা তোলা উচিত হইবে না বিবেচনায় তিনি ক্ষান্ত ছিলেন।

তা ছাড়া সুরবালা একমাত্র অতি উপযুক্ত সন্তানের জন্য কেমন বা কন্যা চান না জানিয়া কি করিয়া অগ্রসর হওয়া যায়?

এখন সুরবালার প্রস্তাবে গৃহিণী সাতিশয় পুলকিত হইলেন।

বলিলেন, তোমার ছেলে হীরের টুকরো। তাকে জামাই পাওয়া ভাগ্য। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হবে, এর চেয়ে আনন্দের কি আছে? উনি চলে গেলেন। দুই কুমারী মেয়ে নিয়ে এখনি চিন্তা সুরু হয়েছে আমার। তোমার কথায় আমি শান্তি পেলাম। বিনির কি এত ভাগ্য!

বিনি? না তো। আমি মালতীকে চাইতে এসেছি।

মালতী! ঠিকই তো। গৃহিণীর মনে হইল মালতী পাশে থাকিতে বিনতাকে কেউ পছন্দ করিতে পারে না।

সুরবালা বলিলেন, বিনিও চমৎকার মেয়ে। কিন্তু সেই কাজের দিন মালতীকে নূতন করে দেখে আমার কর্তা একেবারে ক্ষেপে গেছেন। লালপাড় শাড়ি পরে খোলা বেণীতে কাজ করে বেড়াচ্ছিল। ছেলের সঙ্গে আমার যা মানবে! এখানেই কথা পাকা করে যাব।

গৃহিণী জয়া ও ছায়াকে আহ্বান করিলেন। জয়া তখন রাত্রের দীর্ঘ নিদ্রা ও সকালে স্নানের পরে কুড়ানীপ্রস্তুত কয়েক কাপ চা খাইয়া সুস্থ হইয়াছে। নীল ফুলছাপা পাতলা শাড়ি গায়ে একহাতে চুল গুছাইতে গুছাইতে হাজির হইল।

ছায়া সকাল হইতে কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত। জয়া আজ সকালে ঘুম হইতে না ওঠায় ছায়ার ঘাড়ে 'কন্না' পড়িয়াছিল। এতগুলি লোকের খাবার-দাবার সাজাইয়া এতক্ষণে সে নিজের আগামীকাল যাত্রার জন্য কাপড়-চোপড় গুছাইতেছিল। শাশুড়ীর ডাকে ছুটিয়া আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, অবশ্য বড় মেয়ে রেখে ছোটকে দেওয়া ভাল দেখায় না।

সুরবালা বলিলেন, কিন্তু, ছয়মাসে তুমি মেয়ের বিয়ের সঙ্গে সপিণ্ডকরণ করে উঠতে পারবে।

সে না হয় পরীক্ষিতের উপনয়ন দিয়ে করে নেব। কিন্তু বিনির একটা ঠিক না হলে—

জয়া অস্থির হইয়া উঠিল। চিরদিনই ননদদের বিবাহ লইয়া সে চিন্তিত, সম্প্রতি দুই-দুইটি অবিবাহিত কন্যা রাখিয়া শ্বশুরের পরলোকগমনে তাহার চিন্তা আরও বর্ধিত। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কার্যকরীবুদ্ধি বিশেষ আছে বলিয়া সে মনে করে না। এমন একটা ভাল সম্বন্ধ পাছে হাতছাড়া হইয়া যায় বিলম্বে তাই উতলা হইয়া উঠিল।

সে বলিল, সইমায়ের একটি মাত্র ছেলে। দেরি করে বৌ আনা ওঁর সইবে কি মা? বিনির বিয়েও ছ'মাসের মধ্যে ঠিক করা আর শক্তটা কি, বলুন? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে মনস্থ করলেই দেওয়া চলে। বিয়ে যখন দিতেই হবে বেশি বড় করা উচিত নয়। আখেরে ভাল হয় না।

জয়ার কটকটে কথা চাপা দিয়া ছায়া বলিল, বিনির বিয়ের পাত্রের জন্যে চিন্তা নেই। মেজদার ব্যবসায়ী বন্ধু, যাঁরা আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে একবিঘে জমি কিনে বাড়ি তুলছেন, তাঁদের বাড়ি স্বঘরে ভাল ছেলে আছে। ওঁদের ছোটভাই ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে। বাড়ির কাজকর্ম দেখতে ওই ছেলেটিই আসে রোজ। মনে হয় বিনির ওকে খুব পছন্দ। আমরা ঠাট্টা করলে বিনি খুশি হয়।

জয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, ওম্মা! তাই বুঝি দিনরাত বিনি বারেন্দায় পড়ে থাকে।

সুরবালার সম্মুখে এই ধরণের কথায় গৃহিণী দারুণ অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন, ও কথা যেতে দাও। ছেলেমানুষের কথা! কোথায় কি ঠিক নেই। বস্তী উঠিয়ে ত্রিশ হাজার কাঠা দিয়ে নগদ দামে একবিঘে জমি কিনে অমন একখানা বাড়ি তুলছেন ওঁরা। ওঁদের আবার আমার মেয়ে ছাড়া পাত্রীর অভাব? যাই হোক, তাড়াতাড়ি দিন ফেলবার চেষ্টা করবো। আমার তো ভাই, দিয়ে দিলেই মুক্তি। তায় তোমার ঘরে যাবে। কলকাতা ফিরেই ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে জানাব। তখন মালতীকে আশীর্বাদ করে না হয় রেখো।

আশীর্বাদ ভাই আমি আজই করে যাব। তোমাদের ভাদুড়ীমশাই আমার হাতের বালা দিয়ে একেবারে কথা পাকা করে যেতে বলেছেন। কলকাতায় পৌঁছে হীরের চুর গাঁড়িয়ে পাঠাবেন।

[২০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মানুষের অমর কীর্তি মিশরের পিরামিড

[৫০ পৃষ্ঠার পর]

যে তথ্য সংগ্রহ করলেন, সে হ'ল অভ্যন্তরে একটি চতুষ্কোণ কূপ আর ঐ কূপের চারদিকে কয়েকটি দরজা। প্রত্যেকটি দরজার শেষে এক-একটি কক্ষের প্রবেশপথ। আর আবিষ্কার করলেন পাথরে খোদাই করা মানুষের প্রতিমূর্তি ও সেই প্রস্তরাধারে মানুষের শব। মৃতদেহের পরনে মণিমুক্তাখচিত কারুকার্যময় পরিচ্ছদ। আর তাতে লিখিত পরিচয়জ্ঞাপক কতকগুলি অক্ষর। সে সব অক্ষরের সঙ্গে খলিফার পরিচয় ছিল না বলে তিনি সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না।

প্রথম এবং সর্বোচ্চ পিরামিডের বিবরণ এখানেই শেষ হল।

এবার দ্বিতীয় পিরামিডের কথা। চিওপ্‌স্‌-এর অনুজ সিফ্রনিস্‌ তাঁর অগ্রজ-নির্মিত পিরামিডের পার্শ্বেই আরেকটি পিরামিড নির্মাণ করেন। এর মধ্যে 'স্ফিঙ্কস্‌' নামে পরিচিত অদ্ভুত প্রস্তরমূর্তি আছে। এই মূর্তির দেহ সিংহের দেহের এবং মাথা কুম্ভীরের মাথার মতো। কিছুকাল পূর্বে বেলজানি নামে বিখ্যাত এক পরিব্রাজক এই মূর্তির পদতলের ভিত্তি খনন করে তার নীচে এক গুপ্ত-দেবালয় আবিষ্কার করেছেন।

গিজার নিকটবর্তী তৃতীয় পিরামিডের নির্মাণকর্তা মাইসেনিস্‌-রাজ। এটির উচ্চতা ১৭৪ ফিট। ভিত্তিমূলের এক-এক পার্শ্ব দৈর্ঘ্যে ৩৫০ ফিট। এর দক্ষিণে আরও তিনটি পিরামিড আছে।

এ ছাড়া ছোটবড় আরও অনেক পিরামিড ও পিরামিডের ভগ্নদশা এখনও দেখতে পাওয়া যায় মিশরের নীলনদের পশ্চিম তীরে, গিজা থেকে ১০০ বা ১৫০ মাইল দূরে।

পাথরের ভিত্তির ওপর চূণাপাথরে নির্মিত এই সব পিরামিডের আকার চতুষ্কোণ। চারদিকে উঁচু হয়ে হয়ে সূচ্যগ্র চূড়া দিয়ে যেন এরা আকাশ ছুঁয়ে আছে মানুষের প্রাচীন সভ্যতার। ছুঁয়ে আছে আধুনিক মানুষেরও মন। পিরামিডের দিকে তাকালে আর পিরামিডের কথা মনে করলে মনে হয় যে মানুষ মরলেও মরে না। মানুষই যে আপন কর্মদ্বারা মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী-মন্ত্র লাভ করতে পারে, আর সে মন্ত্র দ্বারা মৃত্যুর দিকে ধাবমান মানুষের গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—মিশরের পিরামিড থেকে সেই কথাই আজও সারা পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

দুটি হাত

[৮৩ পৃষ্ঠার পর]

বড়জোর কোনদিন রমানাথের খাওয়ার কাছে বসে ওর রাণুর গিন্নীপনা আর বাবুয়ার দৌরাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে হেসে মরবে। কখনও কখনও রমানাথও হাসে। তবে সব সময় কি ওই গল্পে মন ভরে?

দিন দিন কেমন যেন পান্‌সে হয়ে যাচ্ছে করুণা। এক-এক সময় মনে হয়—যাক গে সে কথা। গলাটা শুকিয়ে আসছে যেন। এক গেলাস জল চাইতে একবার একটা ডাক দেবে নাকি করুণাকে?

ভাবতে ভাবতে মাথাটা একটু উঁচু করলো রমানাথ। চোখ দু'টোকে টেনে তাকায় করুণার দিকে। উনুন থেকে তাওয়াটা নামিয়ে নিয়েছে করুণা। একটা একটা করে রুটি তুলে দিচ্ছে আগুনের মধ্যে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকে নিচ্ছে চারপাশ। আগুনের আঁচে লালচে দেখাচ্ছে ওর চোখ-মুখ। বিশ্রী দেখাচ্ছে ওকে। সামনের কপালটা চুল উঠে গিয়ে একেই তো কেমন যেন বিকৃ-ওঠা মতন হয়ে গেছে ওর মুখটা। ইস্‌ সবচেয়ে বিশ্রী ওর ওই শির-ওঠা হাতগুলো। সরু সরু চিমড়ে মত আঙুলগুলো আগুনের আঁচে লাল লাল মত হয়ে কিলবিল করে নড়ছে। যেন একটা বড় মাকড়সা। বিরক্তিতে আবার চোখ বুজলো রমানাথ।

ওর চোখের সামনে এখনও ভাসছে দু'টি লীলায়িত করপল্লবের সুঠাম ভঙ্গিমা। কোমল বয়েকটি অঙ্গুলির ছন্দময়ী গতি। রঞ্জিত নখাগ্রের ছন্দায়িত চঞ্চলতা।

কি সুন্দর। আচ্ছা, হাতে কি ওরা মাখন মাখে? তা' না হ'লে এত মসৃণ এত সুকুমার কি করে থাকে গায়ের চামড়া। ওমনি দু'টো হাত যদি জড়িয়ে ধরতো গলার কাছে। তবে···তবে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতো রমানাথ। ভাবতেও কেমন লাগে। অমনি দু'টো হাত বাড়িয়ে কেউ যদি কিছু চায় তাকে কি না দিয়ে উপায় আছে? যেমন করেই হোক ও হাত দু'টোকে ভরিয়ে যে দিতেই হবে। তা যদি না দিতে পারলুম তবে আর পুরুষের বাচ্চা হয়ে রোজ তারিখে বেরোই কেন রোজগারের ধান্দায়।

ওই দু'টি হাতের স্পর্শের লোভে এক মুহূর্তে বানচাল করে দেওয়া যায় জীবনের ধারাবাহিক গতি। মনেও থাকবে না করুণার ওই মাকড়সার মত শুঁটকে আঙুলওয়ালা হাত দু'টোর কথা। করুণার হাত শুধু কাজ করবার জন্যে। এর বেশি ওরা জানেই বা কি? বিতৃষ্ণায় ঠোঁট ওল্টালো রমানাথ।

এমন কি জীবনভোর যদি হাত পেতে থাকে করুণা তবু তাতে ভিখারীকে দান করার মত কৃপাকটাক্ষে হয় তো কিছু একটু দিতে পারে রমানাথ, কিন্তু সে হাত-দু'টোকে ভরিয়ে দিয়ে হাতের মালিকের মুখে খুশির হাসি দেখবার স্বপ্ন জাগে না মনে।

করুণার হাত কৃপণ। ও শুধু জানে কি করে সংসারটাকে বাঁচাবো? কি করে পয়সা বাঁচাবো। পাছে রমানাথ নেশা করে বেশি পয়সা ওড়ায়, পাছে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে পয়সা নষ্ট করে বসে, শুধু তাই বাঁচাবার ফিকিরে ঘোরে ওর হাত দু'টো। আরে বাবা সব সময় কি অত আঁটিসাঁটি ভালো লাগে? তোদের জন্যে সারাদিন খেটেও মরবো আবার অত শাসনও মানবো? আমি শালা কি কলুর বলদ?···

ওই জন্যেই তো এক-এক সময় মনে হয়··· এর বদলে যদি অমনি দু'টো হাত···যাক গে ও কথা। মাথাটা কিন্তু বেজায় ঘুরছে এখনও। গায়ের ভেতরটা যেন ঘোলাচ্ছে সেই সঙ্গে।

শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে আকাশে। রাত প্রায় ভোর হয়ে এলো।

এতক্ষণে একটু শান্ত হয়ে শুলো রমানাথ। মাঝরাত থেকে প্রায় দশ-বারো বার বমি করে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

একপাশে ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে করুণার গড়া রুটি আর তরকারীর রেকাবিটা।

রাতে কিছু খায় নি রমানাথ। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে মাথায়-গায়ে তখনও হাত বুলোচ্ছিলো করুণা। সারারাত জেগে থাকার সুস্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ পড়েছে ওর মুখে।

রমানাথের ঘুম আসছে। চোখের পাতাগুলো ভারী লাগছে যেন। জলের ওপর ভোরের বাতাসে বেশ একটা আরামের আমেজ সৃষ্টি করেছে। করুণার হাত বুলনোটাতেও বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। করুণার হাত দু'টো কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। উষ্ণতার উত্তেজনা এ হাতে যদিও খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু এ যেন কতকালের চেনা। এই সেবাটুকু কতকালের নিজস্ব করে পাওয়া।

চোখ বুজে বুজে তাই এ আরামটুকু উপভোগ করছিল রমানাথ। তারপর একসময় করুণার হাতটা ধরে বুকের কাছে একটু চেপে রাখে সে, বলে—মাথায় আর দিতে হবে না। তুই এই বুকের কাছটায় আর একটু হাত বুলিয়ে দে বৌ, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি।

জীবনের সাধনা

[১১৭ পৃষ্ঠার পর]

তারা ডাক্তার বেইলকে মোক্ষম শিক্ষা দিতে চায়,—কোথায় তিনি? ডাক্তার বেইল ব্যাপার দেখে ততক্ষণে দে চম্পট! খিড়কির দরজা খুলে, আঁস্তাকুড় আর পায়খানার পাশ দিয়ে সোজা পুলিস স্টেশনে। এদিকে জনতা ডাক্তার সাহেবকে ধরতে না পেরে কেবলমাত্র সমস্ত হাসপাতাল তছনছ করেই সন্তুষ্ট হলো না, শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক বিভাগটিকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিল। তারপর বিজয়-গৌরবে যাত্রা করলো পুলিশ স্টেশনের দিকে—ডাক্তার বেইলকে তাদের চাই-ই।

প্রাণের ভয়ে ডাক্তার বেইল নিউইয়র্কের জেলখানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাতে কি হবে?—উন্মত্ত জনতা জেলখানাই আক্রমণ করে বসলো। বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সরকার সৈন্য-বাহিনী তলব করলেন। এতে কি আছে—জনতা আক্রমণ করলো সৈন্যদেরই! তারপরের ঘটনা বুঝতেই পারছেন, গুলীর আঘাতে হাঙ্গামাকারী-দলের কয়েকজন মারা গেলো এবং আহত হলো অনেকেই। বেইল সাহেব দেশছাড়া হতে বাধ্য হলেন।

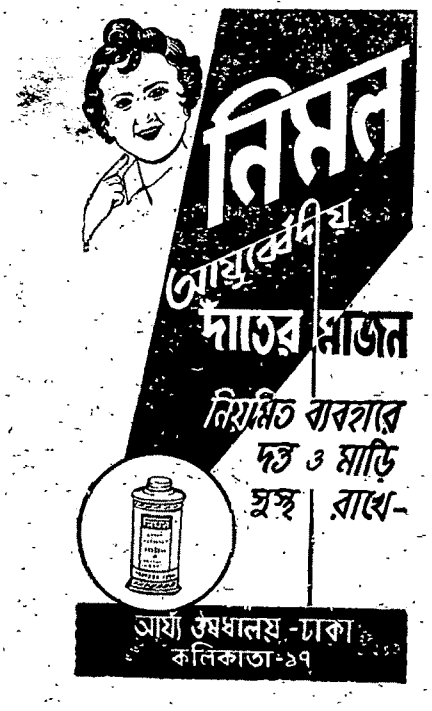

ব্রতভ্রষ্ট

[৮৬ পৃষ্ঠার পর]

এমন আশ্চর্য কথা বীরেন কখনো শোনে নি—এমনটা কি করে সম্ভব হতে পারল? বীরেন ভালো করে দেখল, চিঠিটা শ্রীলেখারই লেখা।

বীরেন বললে, প্রতিজ্ঞা করুন বিয়ে করবেন।

চৌধুরী বললে,—আপনারই হাতে।

তারপর কি হয়েছিল কে জানে,—ওরা কি বিয়ে করেছিলো, বীরেন কোন খোঁজ রাখে নি।

এরপরই অবশ্য বীরেন আনন্দ আশ্রমও ছেড়েছিলো,—এবার যদি বিয়ে করে তো ব্রতপালনের দায়িত্ব থাকবে না। নাঃ, কিন্তু শ্রীলেখাকেও তো আর পাওয়া যাবে না। অবশ্য সেই মায়ারাতটা ফিরে পাবার জন্যে বিয়ে করাও চলে,—কিন্তু সব মেয়েই কি সেই রাত ফিরিয়ে আনতে পারবে?

শ্রীলেখা যে সেদিন পায়ের উপরে ওর ফুলন্ত মুখখানা বার বার ঘষেছিল, বলেছিল,—ছাড়ব না, ছাড়ব না! বলেছিল,—এই একটা রাতের জন্য আমি আবার মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারি।

সেই রাত কি ডাঃ চৌধুরী তাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল?

বোধ হয় না। সত্যিই বোধ হয় সেই রাতটা ফিরে পাবার আশাতেই শ্রীলেখার দুঃসাহসী প্রেম মৃত্যুর মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে দেখছিলো। কিন্তু অমৃত তো পেল না। তা না হলে কেন শ্রীলেখা আবার নার্স হয়ে ফিরে এল হাসপাতালে। কে জানে দ্বিতীয়বার স্বামীত্যাগিনী হোল কি না। আজকে আর সে খোঁজে দরকার আছে বলে মনে হয় না। আজ কি শ্রীলেখাই আর শত চেষ্টা করলেও সে রাতটা ফিরিয়ে আনতে পারবে?

নাঃ, সেই রাতটা আর বোধ হয় কখনোই বীরেন্দ্রের জীবনে ফিরে আসবে না,—তার বদলে বার বার ফিরে আসবে এই ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়ায়ভরা বর্ষার আয়োজন, এই অকারণ দুর্যোগ। তবু একবার গিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে যে—শ্রীলেখা তুমি ভুল করেছিলে। তুমি ভেবেছিলে,—সব দেহের তরঙ্গেই এক সমুদ্রের জল। তুমি প্রেম আর কামে মিশিয়ে ফেলেছিলে। তবু আমি জানি,—তুমি আমাকেই চেয়েছিলে,—চৌধুরীকে নয়,—তুমি প্রেমকেই চেয়েছিলে, দেহকে নয়।

একটি প্রাচীন তামিল গাথা

[৮৮ পৃষ্ঠার পর]

The planetory spheres that constitute
the elemental universe,
With their immeasurable nature
and majestic phenomena.
Vying with one another in delicate
distinctions of harmony,
And enhanced by infinite variety,
past recoknirg—
They're like floating atoms penetrated by rays through narrow slits;
So microscopic they seem when pitted
against His Infinity.
Know Him, who moves the realms
of Brahma and Tirumal,
In their work of creation and preservation; who effects,
Their dissolution—Himself, the
abiding source of involution;
By His seen and unseen manifestations—
He moves the world in it's dynamic
process, the Beauteous one.

এই যে আকাশ, তারা, গ্রহ, এই যে বিপুল বিশ্ব, যাকে মাপা যায় না, ধরা যায় না, অথচ রূপে অপরূপ, বৈচিত্র্যে মনোহর, সীমায় অসীম, যা সংখ্যাগণনার অতীত—তারা তাঁর অনন্তত্বের তুলনায় কতো সামান্য, কতো ক্ষুদ্র—এ যেন ছোট্ট ফাঁক দিয়ে সেই আলোর ঝরণাধারাকে দেখা, ভাসমান অনো-অনীয়ানকে দিয়ে মহতো মহীয়ানকে কল্পনা করা। তাঁকে জানো, তৎবিদ্ধি, ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর (থিরুমল) সৃষ্টি ও স্থিতির কাজকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন তাঁর তিরোভাবের ক্রিয়ার দ্বারা। ধ্বংসের দেবতা তিনি, সব কিছুই লীন হচ্ছে তাঁর কারণ শরীরে,—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট শক্তিতে। সেই তো শিবমায়া। পরম সুন্দর তিনি, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতির মূলে বসে এই ত্রিভুবনকে চালাচ্ছেন তিনি—পরমগতির স্বরূপ পরম জ্যোতির্ময় তাঁকে নমস্কার, শিবায় নমঃ। আজকের দিনের কবির-কথায় বলি—

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ঐ দেবতাকে
মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়
মৃত্যুকে জয় করবেন বলে
... ...
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

আংশিক মূল্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

স্ত্রীলোকের কথা শুনে যারা জীবনের পথে চলে—বঙ্গচন্দ্রবাবু তাদের দলে নন। স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি-সুদ্ধির ওপর তাঁর এতটুকু আস্থা নেই—বরং দারুণ একটা অবজ্ঞাই আছে। আর সেটার শুরুও হয়েছে সেই বাল্যকাল থেকে। তাদের যে কি পরিমাণ বুদ্ধি তার প্রমাণ তো এই নামটাই। এ নাম নাকি তাঁর বড়ঠাকুমার দেওয়া—অর্থাৎ বাবার জ্যেঠাইমার। এ নামের যে কি পরিণাম তা কি কেউ একবারও ভাবলেন না! যে নামে মানুষ ধন্য হয়, যে নামকে অমর করে রাখার জন্যে মানুষ কি না করছে—সেই নামটা রাখার সময়ও একটু চিন্তা করে না তারা—আশ্চর্য! আর মেনিমুখো পুরুষগুলোও সব তেমনি। মেয়েরা না হয় স্বল্পবুদ্ধি—তাদের কথা অমন ভক্তিসহকারে শোনে যে সব পুরুষ, তারা কি?···বড়ঠাকুমা না হয় বলেছিলেন—তাই বলে বাবাও একবার ভেবে দেখবেন না! বড়ঠাকুমা বাবা ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে বঙ্গচন্দ্র নাম রাখলেন, আর বাবাও অমনি ভাবে গদগদ হয়ে সেই নামকরণ শিরোধার্য করলেন। একবারও ভাবলেন না যে, এই ছেলে যখন বড় হয়ে ইস্কুলে যাবে তখন অপর ছেলেরা কি অবস্থা করবে তার। আসলে নিজে কখনও ইস্কুলে যান নি তার হবে কি!

আরও অনেক কথা বলতে পারতেন পিতাঠাকুর সম্বন্ধে—আরও অনেক অভিধা দেওয়া চলত—শুধু নিজের বাবা বলেই চুপ করে যান বঙ্গচন্দ্র। আকাশের দিকে থুথু ফেলতে গেলে নিজের গায়েই ফিরে আসে।

না মেয়েদের কথা শুনতে প্রস্তুত নন তিনি। কোনদিন শোনেনও নি। শুনলে সেই নিঃস্ব অবস্থা থেকে আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারতেন না। তিনি উদ্বাস্তু নন অবশ্য. তবে একদিন—মাত্র সতেরো বছর বয়সেই, কপর্দকশূন্য শুধু নয়—সহায়সম্বলশূন্য হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন দেশে থাকলে কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন চলবে—হত-দরিদ্রের মতো—তার বেশি কিছু নয়, এটা সেই বয়সেই বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। দেশে ফেলে-আসা বিপুল ঐশ্বর্যের গল্প করে যখন তাঁর কর্মচারীরা, তখন তিনি হাসেন মনে মনে। না, দেশে থেকে চাষ করে খাওয়া—সে কোনমতে বেঁচে থাকা মাত্র, তার মধ্যে তিনি নেই।···এই যে মোট চল্লিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ যে বিপুল সম্পত্তি তিনি করেছেন ঘুমুড়িতে অতবড় কারখানা, উল্টোডাঙ্গায় কাঠের গোলা—এবং সর্বশেষ হলেও সর্বাপেক্ষা লাভজনক এই তেলের কল—এর যে কোন একটার আয়ত্ত তো তাঁর পিতাঠাকুরের কাছে অবিশ্বাস্য সম্পদ বলে গণ্য হ'ত! তাঁর কাকা একবার তাঁর গড়িয়াহাটের বাড়িতে এসেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, এতবড় বাড়ি নিয়ে কি করিস রে—এ তো একটা ভাল হাসপাতাল হয়ে যায়!

তাঁর এই সাম্প্রতিক নিউ আলিপুরের বাড়ি দেখলে তো বোধ হয় কাকার হার্টফেল করত!

আর এই গাড়ি। আগেকার গাড়িতেই কাকা চড়তে চান নি। তবু তো সে পুরনো অস্টিন একখানা! হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন কাকা গাড়ি দেখে, দাদা-বৌদি কেউ দেখতে পেলেন না রে খোকা—এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়! এ গাড়ি দেখলে তিনি বোধ হয় বিস্ময়ে এবং ভয়েও নির্বাক হয়ে যেতেন। গাড়ির কাছেই আসতে সাহস হ'ত না তাঁর।

ঐ তো মেয়েছেলের বুদ্ধি! তার কথা শুনলে জীবনে এ গাড়িতে চড়া হত না। এসব গাড়ি তো তাঁর মতো লোকের কাছেও দুরাশার ধন। কালোটাকা ছাড়া এ গাড়ি কেনা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। পুরো পঁচাত্তর হাজার টাকা দাম গাড়িখানার। কে এক নাকি ছোকরা য়্যাক্টার আজকালকার—ফিলিমের বিধুমুখী মার্কা যে সব হিরো হয়েছে এখন তাদের মধ্যে নাকি মাতব্বর ইনি—সেই কিনেছিল। কেনার এক সপ্তাহ পরেই কি এক দুর্ঘটনা হয়—ব্যস এ গাড়ি আর চড়া হ'ল না তার। অপয়া বলে ত্যাগ করল, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী থেকে পুরো টাকাটা নিয়ে অন্য গাড়ি কিনিল। আজ-কালকার ছেলে ওরা? ছোঃ! এখনও এইসব কুসংস্কার গেল না—ওরা আবার নাকি কলেজে-পড়া ছেলে সব, লেখাপড়া শিখেছে! হায় রে কপাল!···তাঁর পক্ষে অবশ্য ভালই হল, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বেচতে পারছিল না—কে দেবে অত টাকা? —শেষকালে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায় বঙ্গচন্দ্রবাবু কিনে নিলেন গাড়িখানা। তাও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সারিয়ে-সুরিয়ে নতুন করে দিয়েছিল।

এই গাড়ি যখন কিনতে যান তখন কি কম বাগড়া দিয়েছিল প্রমীলা। বলে কি না ও অপয়া গাড়ি কিনতে হবে না। যে শখ করে কিনলে সেই ছেড়ে দিচ্ছে—তুমি কোন ভরসায় কিনছ। তারও নিশ্বেস লেগে আছে ও গাড়িতে—আশার জিনিস তার—ও তো ডুবল অপয়া।

ভাগ্যি শোনেন নি স্ত্রীলোকের কথা, নইলে এ গাড়ি জীবনে ভোগ করতে পারতেন না। তাঁর কিছুই হল না—বরং এই বড় গাড়ি রাখার জন্যে বড় গ্যারেজের তাগিদেই নিউ আলিপুরের এ বাড়িটা হয়ে গেল, চাড়ে চাড়ে। তাঁর পক্ষে পয়মন্ত গাড়ি এটা। তেল একটু বেশি পোড়ে? তা পুড়ুক। তার জন্যে তিনি পিছ-পা নন। যক্ষের মতো টাকা আগলে ঘুরে বেড়ানো জীবনভোর—নিজে কোন ভোগ না করে—এটা পছন্দ নয় তাঁর। রোজগারও করবেন ভোগও করবেন—এই হচ্ছে তাঁর জীবনের 'মটো'।

কিন্তু ইদানীং প্রমীলা বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে বাড়িতে থাকাই।

ঐ যে মেয়ে বেবিরাণী কি একটা রবিঠাকুরের কবিতা পড়ে না—তাতে রবিঠাকুর মেয়েছেলের কথায় বলেছেন—'ভাপে ভরা ফানুস'—কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রবিবাবু মেয়েদের ঠিক চিনেছিলেন। আর নাড়াচাড়া করেওছেন তো বিস্তর লোক—চিনবেন না-ই বা কেন! সত্যি, বুদ্ধি-সুদ্ধি বলে যদি একটু কিছু ঘটে থাকে! বলে কি না এত চুরি-জুচ্চুরি ক'রে আর তোমাকে ব্যবসা করতে হবে না। সব বেচে-কিনে দিয়ে এসে বাড়িতে বসো—খানকতক ভাড়াটে-বাড়ি কিনে নাও ঐ টাকায়—তাতেই চলে যাবে। কি দরকারই বা, একটা তো ছেলে তোমার আর একটা মেয়ে, সে বিয়ে হয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে। ছেলের জন্যে কত টাকা রাখতে চাও তুমি? এই বাড়িরই মাটির তলায় যা সোনা পোঁতা আছে, তোমার ছেলে নবাবী চালে চললেও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। তবে আর কেন?

এস. কে. ভট্টাচার্য্য

—এণ্ড কোং—

১৩৮, ক্যানিং স্ট্রীট, (দ্বিতল)

ডিজেল ইঞ্জিন জি, ই, সি,

ইলেকট্রিক মোটর ১ ঘোড়া

—৩০০ ঘোড়া জেনা-

রেটিং সেট প্রভৃতির

একমাত্র নির্ভরযোগ্য

প্রতিষ্ঠান।

এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ফোন: ২২-৭৩৭২ ২২-৫২৭৫

ঐ নাও! কোনমতে ছেলের জীবন কাটাবার সংস্থান ক'রে দেওয়াই যেন জীবনের চরম লক্ষ্য।

আর টাকা কি শুধু প্রয়োজনের জন্যেই রোজগার করে মানুষ? ঠিক যথার্থ প্রয়োজন আর কতটুকু? উপার্জনের জন্যই উপার্জন করা। এ হচ্ছে শক্তির কথা, পৌরুষের কথা। এও একরকমের জয়লাভ—এও একধরণের যুদ্ধ। শুধু যদি প্রয়োজনটাই বড় কথা হ'ত তা হলে হেনরী ফোর্ড আমরণ খাটবে কেন? বিড়লারা এখনও নতুন নতুন ব্যবসা করছে কেন? যদি ঐ রকম একটা ঐশ্বর্য কিম্বা ঐ রকম অসংখ্য ব্যবসা রেখে যেতে পারেন—সেই তো একটা কীর্তি!

তা ছাড়া প্রয়োজনটাও তো আপেক্ষিক। তিনি যদি লাখকতক টাকা দানই করে যান, কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়ে যেতে চান নিজের পয়সায়। সে জন্যেও তো টাকা জমানো যেতে পারে। সেও তো প্রয়োজন। এই তো শোনা যাচ্ছে দু'দিন পরেই চাঁদে যাচ্ছে মানুষ—এরপর হয়ত বড়লোকের রেওয়াজ হবে চাঁদে বাড়ি ক'রে গরমটা সেখানে কাটানো। সে তো বিপুল টাকার খেলা। না, প্রয়োজনও বেড়ে যায় মানুষের। এমন কি মোটা ভাত-কাপড় কথাটারও কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।...

এখন আবার অন্য পথ ধরেছে প্রমীলা।

কোথায় বঙ্গচন্দ্রের দুর্বলতাটা জানে, তাই সেইখানে ঘা দিতে চায়।

দোহাই দেয় ছেলেমেয়ের। বলে, ছাখো, তাদেরও মায়ের বাছা, তোমার যেমন লাগে—তাদেরও তেমনি লাগবে। বিষগুলো আর জেনেশুনে মিশিও না তেলে। কি দরকার—তোমার তো আর লোকসান যাচ্ছে না!

কি বিপদ! একে কি বোঝাবেন বঙ্গচন্দ্র!

তবু যেটা করেন একবার, বলেন—আরে, আমি কি এদেশে একা তেল তৈরি করি? আমি তো কিছুই নয়। হিন্দুস্থানী কলওলারা ছাখো গে যাও লক্ষ লক্ষ মণ তেল বেচছে ফী হপ্তায়। তারা যদি হয় গরুড়—আমি তো ফিঙে। তারা চাঁদ হ'লে আমি জোনাকি! আমার ক' কিলো তেল ওঠে দৈনিক? ক'টা লোক খায়? আমি ভেজাল না মিশোলেই সবাইকার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে?...আর অত কথায় দরকার কি, সেদিন তো খবরের কাগজে পড়লে নিজেই, যে যতগুলো তেলের নমুনা নেওয়া হয়েছিল, সবেতেই ভেজাল, আর সে ভেজালও একরকম নয়, হরেকরকম আর সাংঘাতিক। সরকার হাতে হাতে ধরল, কাগজে কাগজে ছাপা হল—ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিছু করতে পারলে কেউ? ঐ সব তেল তো খাচ্ছে লোকে। ঐ তেলের জন্যেই কাঙ্গাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশি দাম দিয়ে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কি একাই চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। কাল সুরেশকে দিয়ে সরকারী আগমার্কা তেল আনিয়ে ছিলুম, দেখলে তো তারও ছিরি! কি নেই তাতে, দস্তুরমতো মস্তনের তেলের গন্ধ বেরোচ্ছে। বলি, আমার কাছে তো ঢাকা থাকবে না—ঐ কাজ করেই খাচ্ছি। সরকারী মার্কা দেওয়া ঘিয়ে চর্বি, তিলের তেলে চর্বি আর জল—এ সব তো খবরের কাগজেই বেরিয়েছে গো, এ তো আমার বানানো কথা নয় একটাও।

কিন্তু তবু প্রমীলার যেন মন মানে না। অপরের অন্যায়ের নজীরে নিজের অপরাধ কমে কি? সে সর্বদা কণ্টকিত হয়ে থাকে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের তয়ে।

অবশ্য সে বিষয়ে বঙ্গচন্দ্রবাবু যথেষ্ট হুঁশিয়ার। নিজের বাড়ির জন্যে তেল ভাঙ্গানো হয় যখন—নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। কর্মচারীদেরও বিশ্বাস করেন না। ভালো ঘি কেন, উনি বলেন সেরকরা আধসের ঘি মিশোনো আছে, এমন ঘিও তো দুর্লভ। সেইজন্যে গরু পুষেছেন বাড়িতে। দুধও যেমন হয় খাঁটি ঘি-মাখনও হয়। ছানা কাটিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা তৈরি হয়। গাওয়া ঘিয়ে লুচি-কচুরি তৈরি হয় বাড়িতে। ছেলেমেয়েদের বলা আছে, কেউ যেন না কোন বাজারের জিনিস খায়।

খায়ও না বিশেষ কেউ। অন্তত এতকাল খেত না। এখন ছেলেমেয়ে দু'জনেই কলেজে পড়ছে। এখন সামলানো শক্ত। বহুদূরে যায় পড়তে। ছেলে তো হোস্টেলেই থাকে, মেয়ে যায় সেই কলেজ-স্কোয়ারে। এখন কেউ টিফিনও নিয়ে যেতে চায় না ছেলেবেলার মতো। ওখানেই খায় নিশ্চয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। তবে গোপনে বঙ্গচন্দ্রবাবু খবর নিয়েছেন, মেয়ে বিখ্যাত রেস্তোরাঁ ছাড়া খায় না। যেখানে যেখানে খায় আর যা যা খায় তাতে বেশি ভেজাল পেটে যাবার সম্ভাবনা নেই। ভয় ছেলেটার জন্যে—একটেরে পড়ে আছে, কোন ভদ্র খাবারের দোকান কি রেস্তোরাঁ নেই—এক কলেজের ক্যান্টিন ভরসা। কি দেয় সেখানে কে জানে। ভাবনা হয় ঠিকই—তবে সে জন্যে তিনি তেলে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করবেন—এর মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পান না তিনি। তিনি বন্ধ করলেই

তো অপরে করবে না। আর তাঁর ছেলেমেয়ে কিছু বেছে বেছে তাঁরই তেলের তৈরি খাবার খাবে না।

তিনি যদি খাঁটি তেলই বেচেন শুধু—তাতে ওদের কি উপকার হবে? ওরা যা খাবে যা খাচ্ছে তাতে ভেজাল কমবে না একটুও।

পাপ? অন্যায়?

এটাও ঠিক মানতে পারলেন না বঙ্গচন্দ্রবাবু। কে না ভেজাল দিচ্ছে। তেলে-ঘিয়ে-মশলায়, চালে-ডালে—কি সে ভেজাল নেই? কম আর বেশি—ওই তো! মশলায় তো সাংঘাতিক ভেজাল। বঙ্গচন্দ্র ইদানীং হলুদ খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন ঐ ভয়ে। সে সব যারা খাওয়াচ্ছে—কৈ, তারা তো কেউ সমূলে নিপাত যাচ্ছে বলে শোনেন নি। রাশি রাশি চাল ঘরে ধরে রেখে যারা পঞ্চাশ-ষাট টাকা মণ চাল খাওয়াচ্ছে গরীব লোকদের—তাদের মাথায় কার ক'টা বজ্রাঘাত হচ্ছে? এবার যা চাল হয়েছিল, যা চাল আছে লোকের ঘরে-ঘরে—তাতে পঁচিশ টাকা মণ বিক্রি হবার কথা। দক্ষিণ অঞ্চলে বহু লোক আছে তাঁর—তাদের হিসেব অন্তত বঙ্গচন্দ্র কিছুটা রাখেন।

না, ও-সব ভয় করেন না তিনি।

ও-সব ভয় করলে এই ঘোর কলিকালে মানুষকে ক'রে খেতে হবে না। তিনিও ক'রে খেতে পারতেন না। এই এক তেলের কলেই গত তিন মাসে মাসিক দশ হাজার টাকা ক'রে লাভ ক'রেছেন তিনি—পরিষ্কার দশ হাজার হিসেবে। বরং বেশি হবে তো কম নয়।

এমন লাভের ব্যবসা ছাড়তে পারবেন না তিনি। লাভ কমাতেও পারবেন না। এমন নিষ্কণ্টক লাভের মুখ অনেককাল দেখেন নি। অধিকাংশই গোপনে কিনছে, বিনা রসিদে, বিনা হিসেবে। এর একটি পয়সাও দেখাতে হবে না তাঁকে—এর এক পয়সাও ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে না। নিরঙ্কুশ সৌভাগ্য সেধে যখন ঘরে এসেছে—তিনি তাড়িয়ে দেবেন না কিছুতেই। লক্ষ্মীকে অবহেলায় ফিরিয়ে দেবেন না।

কিন্তু নিজের গৃহলক্ষ্মী যদি নির্বোধ হয়, যদি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়—তা' হলে মা-লক্ষ্মী কতকাল টিকতে পারেন? তিনি যে বিমুখ হ'তে বাধ্য।

একটা জিনিস খুব মানেন বঙ্গচন্দ্রবাবু যে, নেই বললে সাপের বিষও থাকে না। মানি না বললে কিছুই মানার দরকার হয় না। কিন্তু যে মানে তাকে হাঁচি-টিকটিকি থেকে শুরু করে বারবেলা ত্র্যহস্পর্শ সবকিছু চেপে ধরে। এই যে হিন্দুরা অশ্লেষা মঘা মানে—কোথাও বেরোতে চায় না, কিন্তু তাই বলে কি গাড়ি খালি যায়? মুসলমান খৃস্টান তাদের কিছুই হয় না—কিন্তু যারা মানে তাদের কিছু না-কিছু লোকসান যাবেই। তিনিই তো জেদ করে বেরিয়ে একবার সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরলেন পথ থেকে—চোরে নিয়ে গেল যথাসর্বস্ব, আর একবার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পড়ে হাত-পা ছড়ে বাড়ি এসে পৌঁছলেন, একটুর জন্যে প্রাণটা বেঁচে গেল, ট্রেন তো এসে পড়েছিল বলতে গেলে, ওদিক থেকে গেটম্যানটা টেনে নিয়েছিল তাই রক্ষা।

সেই কারণেই পরিবারের এই অবিরাম টিকটিক করাটা ভাল লাগে না তাঁর। মুখে যাই বলুন, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করেন মনে মনে। এ নিয়ে প্রমীলার সঙ্গে রাগারাগিও বড় কম করেন না—তুমুল তর্ক ও কথা-কাটাকাটি হয়ে যায় এক-একদিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

১।	**অভয়া মঙ্গল**—(দ্বিজরামদেব প্রণীত) ডাঃ আশুতোষ দাস	মূল্য ৭·০০
২।	**এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থে দৃশ্য-নিদর্শন**—অমরেন্দ্রনাথ রায়	মূল্য ৬·০০
৩।	**ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন**—ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মূল্য ৭·৫০
৪।	**ধর্ম্মমঙ্গল** (মাণিকরাম মুখোপাধ্যায়)—শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত	মূল্য ১২·০০
৫।	**ধর্ম্মমঙ্গল** (ঘনরাম)—ডাঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র	মূল্য ২·০০
৬।	**দাশরথি রায়ের পাঁচালী**—ডাঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী	মূল্য ১৫·০০
৭।	**বিদ্যাপতির শিবগীত**—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	মূল্য ৪·০০
৮।	**বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	মূল্য ৫·০০
৯।	**বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমন্মথমোহন বসু	মূল্য ৭·০০
১০।	**বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৮৫০-১৯০০)**—ডাঃ প্রভাময়ী দেবী	মূল্য ৬·৫০
১১।	**বাংলার বাউল** (লীলা বক্তৃতামালা)—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী	মূল্য ২·০০
১২।	**গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ**—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার	মূল্য ১৫·০০
১৩।	**জ্ঞান ও কর্ম্ম** (শতপুতি সংস্করণ)—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মূল্য ৬·০০
১৪।	**কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী**—ডাঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য	মূল্য ১০·০০
১৫।	**কাঞ্চীকাবেরী**—শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীমতী সুনন্দা সেন	মূল্য ৫·০০
১৬।	**কৃষি-বিজ্ঞান**, ১ম খণ্ড (কৃষির মূলনীতি) ৩য় সং—রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত	মূল্য ১০·০০
১৭।	**লালন গীতিকা** (লালন শাহ্ ফকিরের গান)—ডাঃ মতিলাল দাস ও ডাঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র	মূল্য ৭·০০
১৮।	**মহাকবি গিরিশচন্দ্র** (গিরিশ বক্তৃতামালা)—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	মূল্য ৩·০০
১৯।	**মনসামঙ্গল** (কবি জগজ্জীবন কৃত)—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডাঃ আশুতোষ দাস	মূল্য ১২·০০
২০।	**বিচিত্র চিত্রসংগ্রহ**—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সংগৃহীত	মূল্য ৪·০০
২১।	**নিরুক্ত** (আশুতোষ সংস্কৃত সিরিজ)—ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর ১ম খণ্ড মূল্য ৮·০০, ২য় খণ্ড ৯·০০, ৩য় খণ্ড ১০·০০	
২২।	**পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস**—শ্রীতারকচন্দ্র রায় ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ—মূল্য ৯·০০; ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ)	মূল্য ১২·০০
২৩।	**পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল**—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত	মূল্য ১২·০০
২৪।	**প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো**—শ্রীকুলগোবিন্দ গোস্বামী	মূল্য ৫·০০
২৫।	**পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ**—ডাঃ সুকুমার সেন	মূল্য ৩·০০
২৬।	**শিব সঙ্কীর্ত্তন পালা বা শিবায়ন**—শ্রীযোগীলাল হালদার	মূল্য ৮·০০
২৭।	**শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ**—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	মূল্য ৩·৫০
২৮।	**শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান** (২য় সং) ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার	মূল্য ১৫·০০
২৯।	**সমালোচনা সাহিত্য-পরিচয়** (উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচনা-সাহিত্য—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল	মূল্য ১৫·০০
৩০।	**শ্রীভক্তিসন্দর্ভ**—(শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত মূল অনুবাদ, তাৎপর্য প্রভৃতি সহ) পণ্ডিত রাধারমণ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী	মূল্য ২০·০০
৩১।	**বেদান্তদর্শন-অদ্বৈতবাদ**—ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী ১ম খণ্ড (২য় সং) মূল্য—১৫·০০, ২য় খণ্ড—মূল্য ১০·০০, ৩য় খণ্ড—মূল্য ১৫·০০	
৩২।	**রসকল্পবল্লী**—(পীতাম্বর দাস-বিরচিত অষ্ট রস ব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী) সম্পাদক—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল	মূল্য ১০·০০

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ,
৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯ ফোন—৪৭-১৭৬৬

কিন্তু তবু পারেন না ওর মুখ বন্ধ করতে। বকাবকিটাও খুব জোরে করতে পারেন না তেমন—ঘরের মধ্যে চাপা গলাতেই করতে হয়—কারণ এসব কথাগুলো চাকররা জানে ঠিকই, অনুমান করতে পারে অন্তত—তবু তাদের সামনে আলোচনা করতে যেন কেমন লজ্জা বোধ হয়। এখনও একটু চক্ষুলজ্জা অবশিষ্ট আছে বঙ্গচন্দ্রবাবুর।

অবশেষে সেদিন একটা মর্মান্তিক কথাই বলে ফেললেন তিনি।

বলতে হ'ল তাঁকে—না বলে থাকতে পারলেন না। আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে যদি মরেও যায় আমার চোখের সামনে একটা-একটা করে, তা হলেও আমার ব্যবসা আমি বন্ধ করব না—এই সাফ কথা! এর ওপর তো আর কথা নেই। ব্যস—ঘ্যান্‌ঘ্যানানি বন্ধ করো এইবার। আর যদি মনে হয় এ পাপের পয়সা তোমার সহ্য হচ্ছে না, তা হলে এ পাপপুরীতে আর থাকার দরকার নেই, ছেলেমেয়ের হাত ধরে সটান বেরিয়ে যাও, যেখানে যা পাও সৎপথে রোজগার ক'রে ছেলেমেয়ে মানুষ করো, আমি কিছুমাত্র বাধা দেব না। এখানে থাকতে গেলে, এই পাপের পয়সা খেতে গেলে তা নিয়ে আর ঘ্যানঘ্যান করা চলবে না।

এরপর আর একটি কথাও বলতে পারে নি প্রমীলা, নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে ষাট! ষাট! বলে কান্না চাপতে চাপতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

কিন্তু তাই বলে যে এত শীঘ্র ফলে যাবে কথাটা তা প্রমীলাও ভাবে নি। বঙ্গচন্দ্র তো ভাবেনই নি।

অথচ জানতেন, ছেলেবেলায় শুনেছিলেন মার মুখে যে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই শিব একবার করে 'স্বস্তি' এই শব্দটি উচ্চারণ করেন, ঠিক সেই ক্ষণটিতে যে-যা বলে তা নির্ঘাৎ ফলে যায়।

কিন্তু কথাটা যে এমন সাংঘাতিকভাবে সত্য—তা ভাবতে পারেন নি কখনও।

প্রথম পড়ল মেয়ে বেবিরাণী। একেবারে হঠাৎ, কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকেই।

একদিন সকালে আর উঠতে পারল না বিছানা থেকে। পা দু'টোতে কোন জোর পেল না আর। পা দু'টো টানতে বা পাশ ফিরতেও পারল না। প্রমীলা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

হৈ-চৈ চেঁচামেচি—বাড়িসুদ্ধ লোক ছুটে এল। তখনই পাড়া থেকে তিনজন ডাক্তার ডেকে আনলেন সরকারমশাই। বঙ্গচন্দ্র টেলিফোনে রাজী করাতে না পেরে নিজে গিয়ে দুই পা জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলেন বড় ডাক্তার ব্যানার্জিকে।

স্থানীয় ডাক্তাররা তো কিছু ধরতে পারলেনই না—বড় ডাক্তারও এসে যেন হক্‌চকিয়ে গেলেন। থুথু থেকে শুরু করে রক্ত পর্যন্ত সবরকম পরীক্ষা হ'ল—মায় বঙ্গচন্দ্রবাবুর রক্ত পর্যন্ত। রক্তের চাপ, বুকের ফটো—সব দেখা হ'ল—কিন্তু এরকম ঘটার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না।

অবশেষে হঠাৎ একদিন এক ডাক্তার প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা এ মেয়েটি কি ইদানীং সাদা ময়দা খেয়েছিল? এবং উপরি উপরি ক'দিন—?

দিকদিশাহীন অন্ধকারে যেন একটু আলোর আভাস পায় প্রমীলা। প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ—ও বরাবরই সাদা ময়দা খেতে ভালবাসে আমরা আটা খাই—ও জলখাবার থেকে শুরু করে রাত্রির খাওয়া পর্যন্ত সাদা ময়দার লুচি খায়। ক'দিনই তো খেয়েছে—

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়েন ডাক্তারবাবু। বলেন, ঠিক বলতে পারছি না, এখনও পুরোপুরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যাদেরই এমনি হঠাৎ প্যারালিটিক্ স্ট্রোক হচ্ছে—খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে যে তারা সকলেই সাদা ময়দা খেতে ভালবাসে—বা খায়। এটা কাকতালীয়ও হ'তে পারে সম্পূর্ণ—আবার এমনও হ'তে পারে যে ঐ সাদা ময়দায় এমন সব জিনিস ভেজাল দিচ্ছে, যার বিষক্রিয়া থেকে এই জিনিসটা হচ্ছে—

প্রমীলা কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই স্বামীর দিকে চায়।

সে দৃষ্টিতে তিরস্কার কি অনুযোগ কিছুই ছিল না হয়ত, তবু বঙ্গচন্দ্রকে চোখ নামাতে হয়।

কিন্তু মনে মনে গজরাতে থাকেন, এই তো, এ কি আমি দিয়েছি, না-আমি মিশিয়েছি? তবে? কৈ তেলে যা-ই দিই না কেন—এখনও তো এমন কোন কাণ্ড হয়েছে বলে জানি না!

সেইদিনই শেষরাত্রে টেলিফোন বেজে ওঠে।

ছেলের হোস্টেল থেকে ফোন করছেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কি করে যেন আজ সন্ধ্যার খাওয়ায় 'ফুড্ পয়জনিং' ঘটেছে—একসঙ্গে ছাব্বিশটি ছেলের বিষক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। অনেকটা গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিশের লক্ষণ। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, ভেদবমি তার সঙ্গে। ওঁরা অবশ্য চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থাই করেছেন, জনদুই নার্সও আনিয়ে নিয়েছেন। তবে ওঁদের সিক-রুমে এত জায়গা নেই—কোন হাসপাতালেও সীট পাচ্ছেন না—অতএব হোস্টেলে রেখেই চিকিৎসা চালাতে হচ্ছে। ওঁর ছেলে প্রদীপও এই আক্রান্তদের মধ্যে আছে। যদি ইচ্ছা করেন তো বঙ্গচন্দ্রবাবু এসে দেখে যেতে পারেন অথবা যদি নিয়ে যেতে চান তো য়্যাম্বুলেন্স বন্দোবস্ত করে—

আর শুনলেন না বঙ্গচন্দ্র। আর শুনতে পারলেন না। তাঁর হাত কাঁপছে থরথর করে, টেলিফোনটা ধরে রাখা যাচ্ছে না—

কি করে—আই মীন আপনাদের সরকারী হোস্টেল এমন কি খাবার দিলেন—

ঠিক তো বুঝতে পারছি না ওপার থেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, যতদূর সম্ভব সতর্ক

অল্প পুঁজিতে কাজ কারবার

অল্প টাকায় মেসিনের সাহায্যে নিম্নলিখিত নানা রকমের জিনিষের মধ্যে যেটা ইচ্ছে তৈরী ক'রে আরম্ভ করুন:—

- বিস্কুট
- লজেঞ্জ
- কারি পাউডার
- আটা
- সাবান
- বোতাম
- চক-ষ্টিক
- কাঠের খেলনা
- কৌটা
- বালতী
- টালী
- রবার ষ্ট্যাম্প
- কার্ডবোর্ড বাক্স
- মলম
- নানারকম ঔষধপত্র
- ন্যাপথলিন বল
- কর্পূরের ট্যাবলেট
- চীনামাটির বাসন
- মোমবাতি
- কালির বড়ি এবং প্রিন্টিং ও বুক বাইণ্ডিং ইত্যাদি।

দু'খানি ব্যবসায়িক বই পড়ুন
লাভের ব্যবসা ২৲ সেলস্‌ম্যান্‌শিপ ১৷৷০

ওরিয়েণ্টাল মেসিনারী

পি ১২, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।
(ফোন—২৩-৪৮৪০)

ছই আমরা। কিন্তু জানেন তো তেল পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, বিকেলে আমি ছিলুম না—চাকর কোথা থেকে তেল এনেছে—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে তেলটাতেই গোলমাল ছিল। কারণ যে ক'জন মাংস খেয়েছে রাত্রে তাদের কিছু হয় নি। মাংসটা আমি বলে দিয়েছি চর্বিতে রান্না করতে, কালও তাই রান্না হয়েছে। এরাই মাছ খেয়েছিল—আর সেই সঙ্গে খানকতক করে বেগুনি—। মাছ ছিল কিছু—এখনও আছে, মাছ আমি এবং ডাক্তারবাবু দু'জনেই পরীক্ষা করলুম, মাছে কিছু দোষ নেই। তেলের গন্ধটাই ভাল লাগছে না আমার। হাউ এভার আমি সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবোরেটরীতে পাঠিয়েছি খানিকটা য়্যানালিসিস-এর জন্যে কিন্তু সে তো ধরুন দশটার আগে জানা যাচ্ছে না!

তখনই ছুটলেন বঙ্গচন্দ্রবাবু। ডাক্তার এবং য়্যাম্বুলেন্স নিয়ে। গিয়ে দেখলেন আরও কয়েক জোড়া বাবা-মা শুষ্ক পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও বাইরে দাঁড়িয়ে। উদ্বেগ, রাত্রি জাগরণ এসব তো আছেই, তবু তাঁর মুখের কালি এবং কপালের রেখাটা যেন একটু বেশি স্পষ্ট—অর্থাৎ খুবই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে।

পরিচিত ভদ্রলোক, আসা-যাওয়ায় আলাপ হয়ে গেছে বেশ। বঙ্গচন্দ্র একেবারেই নাম ধরে বললেন, ব্যাপার কি নিশীথবাবু, কেমন আছে আমার ছেলে? আপনারা সব বাইরে কেন? নিয়ে যাওয়া যাবে তো—?

নিশীথবাবু অস্পষ্ট এক ধরণের মাথা নাড়েন। তাতে হ্যাঁ কিম্বা না—কোনটাই বোঝা যায় না। কথাও যেন কইতে পারেন না অনেকক্ষণ, তারপর বলেন, কি জানি কিছুই তো বুঝতে পারছি না, আমাদের ডাক্তার ছাড়াও দু'জন ডাক্তার এসে গেছেন, তাঁরা তো পরামর্শ করেই চিকিৎসা করছেন—কিন্তু কিছুতেই কোন ওষুধ যেন রেসপন্স করছে না। এরকম কখনও দেখি নি। আমার আমলেই আর একবার পচা মাংস খেয়ে এইরকম হয়েছিল কিন্তু সেও তো আমরা ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যেই কায়দা করে এনেছিলুম—এ তো একেবারেই বাগ মানছে না!

এ অবস্থায় এখনই বাড়িতে বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত, সেই কথাই বললেন বঙ্গচন্দ্রবাবু, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাতেও ঘাড় নাড়লেন। বললেন, নিয়ে যেতে পারেন—but at your own risk!..

আপনার সঙ্গে তো ডাক্তার আছেন তাঁকে দেখান একবার। ওঁরা তো বলছেন যে, এখন যা অবস্থা—নাড়াচাড়া চলবে না।... এই তো আরও কয়েকজন গার্জেন এসেছেন—এঁরাও তো নিয়ে যেতেই চাইছেন—কিন্তু ভরসা তো করতে পারছেন না কেউ!

বঙ্গচন্দ্রবাবুর ডাক্তারও পরীক্ষা করে এসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, Too risky. হার্টের যা অবস্থা গাড়ির জার্কিং সইবে না!... আশ্চর্য! এঁরা তো যা করবার সবই করেছেন, আমরাই বা এর থেকে বেশি কি করতে পারব—কিন্তু একেবারেই রেসপন্স করছে না—কেন কে জানে।

ন'টার সময় প্রথম মৃত্যু ঘটল।

আর সেই সঙ্গেই খবরটা পাওয়া গেল।

বড় যে সরকারী ডাক্তার এসেছিলেন তিনিই উত্তেজিতভাবে এসে খবর দিলেন, Its criminal! I say its definitely criminal! কাজ হবে কি নিশীথবাবু। প্রধান যে ইঞ্জেকশনটার ওপর এঁরা নির্ভর করছিলেন সেটাই তো ফাঁকি। একেবারে স্রেফ জল গেছে—জল আর সঙ্গে কিছু অন্য নির্দোষ জিনিস। কিন্তু ওষুধ বলতে তাতে কিছু নেই। এবারে স্যালাইন দিয়েছি আমরা—তাতেও ফাঁকি। কি আবর্জনা

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

নেই তাতে! ইস। ফাঁসি দিলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় না এদের, সেকালের সেই বাদশাহী আমলের মতো কেটে টুকরো-টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত এই যারা ওষুধে ভেজাল দেয় তাদের—

বেলা পাঁচটার মধ্যে আরও ন'জন মারা গেল। মোট দশ। তার মধ্যে প্রদীপও একজন। বাকি সকলে সামলে নিল কোনমতে, তাদের হার্টের অবস্থা তত খারাপ হয় নি—তার মধ্যেই ভাল ওষুধ পড়ে গিয়েছিল। বড় ডাক্তারবাবু নিজে গিয়ে বিশ্বস্ত দোকান থেকে কিনে এনেছিলেন।

সব শেষ করে বঙ্গচন্দ্রবাবু যখন ফিরলেন তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু সেই তত রাত্রেও তাঁর বাগানে তিন-চারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ব্যস্ত হবার আর কোন প্রয়োজন নেই, শক্তিও বুঝি নেই ব্যস্ত হবার। বঙ্গচন্দ্রবাবু ধীরে-সুস্থেই নামলেন গাড়ি থেকে। ধীরে-সুস্থেই খবর নিলেন চাকর ফটিকের কাছ থেকে—কি হয়েছে।

ছেলের খবর পেয়ে প্রমীলা নাকি মেয়ের ঘুমের ওষুধ শিশিসুদ্ধ খেয়ে ফেলেছিলেন। ফটিকই দেখতে পায়, সেই বুদ্ধি করে পাড়ার ডাক্তারবাবুকে খবর দেয়, তিনি বাকি সকলকে ডেকে আনেন। সময় থাকতে খবর দেওয়া হয়েছিল তাই রক্ষা—পাম্প করে পেটের সব বিষ বার করে ফেলা হয়েছে। তবু এখনও বিপদ কাটে নি—দু-তিনজন ডাক্তারবাবু তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। এধারে বিপদের ওপর বিপদ, সুশীলা ঝি এর মধ্যে কখন গিয়ে বেবি দিদিমণিকে টুক্ করে খবরটি লাগিয়ে দিয়েছে—বেবি দিদিমণি চিৎকার করে উঠে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে গিয়েছিল—পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডাক্তাররা বলছেন কি 'এস্ট্রোক' না কি, তারও অবস্থা খারাপ, বাঁড়ুয্যে সাহেব তাঁকে নিয়ে বসে আছেন—দু'টো গ্যাস এসেছে, দু'জনকেই গ্যাস দেওয়া চলছে।···

বঙ্গচন্দ্রবাবু আর ওপরে উঠলেন না। খোঁজও করলেন না কিছু। আধুনিকসজ্জায় সজ্জিত তাঁর ড্রয়িং-রুমে এসে বসলেন ধীরে-সুস্থে। ঠাকুর চা করে নিয়ে এল তাও খেলেন। সরকার ব্যস্ত হয়ে কি বলতে এসেছিল—ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমি এসেছি কাউকে বলবার দরকার নেই, একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে।···টাকা যা লাগে দাও, চিকিৎসায় যেন না কোন ত্রুটি হয়। তবে আমাকে বিরক্ত করো না।

মহার্ঘ ড্রয়িং-রুম। এর এক-একটি আসবাবের খরচে এক-একটি স্বল্পবিত্ত পরিবারের একমাসের খরচ চলে যায়। ওঁর কাকা যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এ ড্রয়িং-রুম দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

ঐ আলোটার দামই আড়াই হাজার টাকা—চোরা-চালানী মাল, কাস্টমস-এর এক দারোগার থেকে কেনা—

না, টাকার অভাব কিছু নেই তাঁর। এই যেখানে বসে আছেন সেখানকার মেঝের নীচে সোনাতে আর জহরতে অন্তত কুড়ি লাখ টাকা তাঁর আছে। এত যে আছে তা কেউ জানে না। আছে তা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা জানে, সেটা তিনিই ইচ্ছা করে জানিয়ে দিয়েছেন নইলে হঠাৎ মরে গেলে সবই নষ্ট হবে—কিন্তু সে থাকাটা যে ঠিক এতখানি তা কাউকে জানতে দেন নি তিনি। এসব কালোবাজারের টাকা এর হিসেব দেওয়া চলবে না। ব্যাঙ্কের লকারকেও বিশ্বাস করেন না তিনি কোনদিন সরকার থেকে জোর করে খুলিয়ে দেখবে। সেসব জায়গায় যা আছে, ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যবসার হিসেবে যা আছে তাও কম নয় সাত-আট লাখ টাকা তো বটেই, তবে তার হিসেব তিনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন, কড়ায়-ক্রান্তিতে।

আরও আছে। প্রতিটি শোবার ঘরে অদৃশ্য লকার আছে একটি করে তাতেও আছে, নগদ টাকা, সোনার বাট ও গিনি। বহু দিনের সঞ্চয় তাঁর। বাড়ি করার সময় এসব লকার আর ভল্ট তিনি করিয়েছিলেন জার্মান মিস্ত্রী দিয়ে—তাদের বহু টাকা দিয়েছেন। জার্মানীতে তাঁর যে সব পরিচিত লোক আছে তাদের আত্মীয়দের এখানে সেই টাকা গুণে দিয়েছেন, তারা দিয়েছে সেখানের টাকা।

প্রমীলা ঠিকই বলে, ছেলে দু'হাতে ওড়ালেও এত টাকা শেষ করতে পারবে না হয়ত। ব্যবসা তিনটে তো আছেই। কিন্তু তাই বলে কি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে এসে বসবেন আর পরলোকের চিন্তা করবেন—মৃত্যুর দিন গণবেন বসে বসে সে তাঁর দ্বারা হবে না। সে তো জীবন্তে মরে থাকা। সে থাকায় মূল্য কি!

ছেলে গেছে, মেয়ে যেতে বসেছে, স্ত্রী পাগল হয়ে যাবে—তা তিনি আর কি করবেন। তাঁর পাপেই এসব হচ্ছে, একথা মানতে রাজী নন তিনি। আরও বহু লোক এই ধরণের পাপ করছে, ঐ তো ওষুধের বদলে জল দিচ্ছে, তারা কি সব নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে একেবারে? আর হলেই বা কি করছেন, জীবনে সার্থকতার কিছু মূল্য দিতে হয়। এও তাঁর সেই মূল্য। সে মূল্য দেবার ভয়ে পিছিয়ে আসবেন না তিনি কিছুতেই।

সকাল আটটার সময় বেবি মারা গেল।

কিন্তু প্রমীলা ভাল হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। যথা লাভ!···

জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান

৩এ, সদানন্দ রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন—৪৬ ২৬৬২

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচ এবং ভৃগুসংহিতামতে ফলাফল প্রাপ্তির একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান। ইহা ভিন্ন পরাশর মতানুসারে কোষ্ঠী ঠিকুজী বিচার ও প্রস্তুত, প্রশ্নগণনা এবং যাবতীয় কবচ প্রস্তুত ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করা হইয়া থাকে।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ—৫১৲ ও ২৫৲ সরস্বতী কবচ—১৫৲ ও ১০৲
নৃসিংহ কবচ—১২৫৲ স্বর্ণ মাদুলীতে নবগ্রহ কবচ—১৫৲ ও ১০৲
ঐ —৫১৲ রৌপ্য মাদুলীতে সর্বেশ্বরী কবচ—১০৲

পরিচালক—পণ্ডিত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিশাস্ত্রী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ঘরে কাটানো ছানার যাবতীয় মিষ্টান্নের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মী নারায়ণ মিষ্টান ভাণ্ডার

২৬২, বি. টি. রোড (টবিন রোড জংশন)

● আমাদের স্পেশাল শোনপাপড়ী ও দধি পরীক্ষা করুন ●

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীলতা খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। তার কপালে অল্প অল্প ঘাম ছিল। মুখ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। হাতের মোটা মোটা বই-এর ছোঁয়ায় সাদা শাড়ি খস-খস করে উঠছিল।

ফাল্গুনের প্রথম মধ্যাহ্ন ফুরিয়ে যাবার আগে টলোমলো আম্রশাখায় ফিকে হলুদ রোদের শেষ স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল। শ্রীলতা ক্লান্ত চোখ মেলে চারপাশ দেখল। আলোর একটা পাতলা রেখা মধুর আবেশের মতন মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

তিনটের সময় শেষ ক্লাশ হয়ে গেছে। কাছাকাছি অনেক মেয়ে জটলা করছিল। জোরে জোরে কথা বলতে বলতে হাসাহাসি করছিল। কেউ কেউ কলেজের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

নিঃসঙ্গ একটা মানুষের মতন এক-একটা ক্লান্ত পা ফেলে মুখ নামিয়ে শ্রীলতাও গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তার এক-একবার আর একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে এখন সোজা বাড়ি চলে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। বেরোবার আগে শুভেশ বলেছিল আজ খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। শ্রীলতা তারও অনেক আগে বাড়ি পৌঁছতে চাচ্ছিল।

ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। রাখাল হয় তো খেয়াল করে কিছুই করবে না। সারাদুপুর পড়ে পড়ে ঘুমুবে। চায়ের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে শুভেশকে।

শ্রীলতা অস্থির হয়ে উঠল।

গেটের বাইরে শ্রীলতার জন্যে বরুণ দাঁড়িয়েছিল। তার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে শ্রীলতার চলার গতি আরও শ্লথ—আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। একটা মোটা বই তার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। বইটা তুলতে ইচ্ছে করেই অনেক সময় নিল শ্রীলতা। ঘন সবুজ ঘাস দেখল। আকাশ দেখল। থেকে থেকে ক্লান্ত কোকিলের এক-একটা চকিত রব বেজে উঠছিল। শ্রীলতা তা-ও শুনল।

শ্রীলতার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তার আরও ক্লান্ত লাগছিল। সে-ও শুভেশের মতন একটা শোককে—একটা ব্যথাকে বুকের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

একটু আগে শুভেশকে টেলিফোন করেছিল শ্রীলতা। সে কিছু বলবার আগেই শুভেশ বলে উঠল, লতা?

হ্যাঁ।

কোথা থেকে কথা বলছিস?

কলেজ থেকে।

খুব জোরে শুভেশ হেসে উঠেছিল, যাক, শেষ অবধি তা হলে কলেজে আসতে পেরেছিস?

হ্যাঁ, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্রীলতা আর একবার শুভেশকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, দু-কাপের বেশি চা কিন্তু তুমি কিছুতেই খাবে না—

নাঃ, আবার হাসির মৃদুধ্বনি ভেসে এসেছিল।

কিন্তু তা হলেও শ্রীলতা জানত অফিসে বসে চায়ের বদলে ইচ্ছে করেই কাপের পর কাপ কফি খাবে শুভেশ আর অনেক রাত অবধি ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করবে। বারবার উঠে জল খাবে।

এক-একবার শ্রীলতাকে লক্ষ্য করে বলবে, এখনও ঘুমোস নি? রাত অনেক হল। এবার ঘুমো—

একদিন শ্রীলতা খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিল, তুমি না ঘুমোলে আমিও ঘুমুব না।

একটা ক্লান্তভঙ্গি করে হেসেছিল শুভেশ, অনেক কফি খেয়েছি। ঘুম আসছে না।

কতবার বারণ করেছি! তা-ও শোন না।

খুব করুণস্বরে শুভেশ বলেছিল, আমার মনে থাকে না রে।

শ্রীলতা তার কথা বিশ্বাস করে চুপ করল। আর যতক্ষণ শুভেশ ঘুমোল না তার চেয়েও বেশিক্ষণ সে জেগে থাকল।

আজকাল সত্যিই শুভেশের কিছু মনে থাকে না। কণিকার মৃত্যুর পর একটা রুদ্ধ অনুতাপ তাকে তার কর্মের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। এক-একবার তাকে দেখতে দেখতে শ্রীলতার মনে হয় তার গোটা জীবনটাই শীতঋতুর মতন শ্লথ মন্থর হয়ে গেছে। তার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আক্রোশ নেই। এক জায়গায় একটা পুরানো গাছের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিন্ন লোকের আর একজন মানুষের নিবিড় অস্তিত্ব অনুভব করেই সে তৃপ্তি পায়।

কফি না খেলেও অনেক রাতে শুভেশ অন্ধকার ঘরে একটা বেতের হাল্কা চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। ভাবনায়-ভাবনায়, অনুতাপে যন্ত্রণায় তার শরীর বোধ হয় অসাড় হয়ে যায়। যদি এতরাত অবধি একটা অসহায় মানুষের মতন শুভেশ না বসে থাকত তা হলে ঘুমিয়ে পড়ত শ্রীলতা।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুম আসে না। একটা নীরব আরাধনার মধ্যে দিয়ে সে-ও শুভেশের নিবিড় একাকীত্বের ভাগ গ্রহণ করবার জন্যে মনে মনে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। খুব স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও শ্রীলতার মনে হয় নিঃসঙ্গতার অধিক চাপ শুভেশকে যন্ত্রণার অতলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সে তখন তাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। একটা নিবিড় মমতায় তার দু'নয়ন আবেশে ভারী হয়ে ওঠে।

শুভেশকে অন্ধকারে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে মা-র মৃত্যুর কথাটাও বাসি হয়ে যায় শ্রীলতার কাছে। সে-নিঃসঙ্গ অন্ধকার, সে-ভয়াবহ একাকীত্ব শুভেশের কর্মময় জীবনকে তুষারশুভ্র প্রস্তরখণ্ডের মতন হিমশীতল করে রেখেছে—নির্বাসনের সেই হিমানীবিজনে প্রতিদিনের কলহাসির ভুবন থেকে শ্রীলতাও প্রগাঢ় অনুকম্পায় পৌঁছে যাবার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে।

তার মুখ থেকে হঠাৎ একটা ডাক ছুটে আসে, বাবা!

একটা ঝড় চমকে প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিব্রত থাকে শুভেশ। একটু পরে হঠাৎ একটা ঘুম থেকে জেগে-ওঠা মানুষের মতন ভেঙে-ভেঙে বলে, এখনও জেগে আছিস?

একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবার জন্যেই শ্রীলতা শুভেশকে ডেকেছিল। কিন্তু সে যে তাকে এতক্ষণ দেখেছে—ভাবনার মধ্যে দিয়ে তার ভিন্নলোকে বিহারের সাক্ষী হয়ে সে-ও জেগেছিল একটা থরোথরো কুণ্ঠার ভারে সেকথা শ্রীলতা স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

সে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এখন কত রাত হয়েছে বাবা?

বেশি না। এগারোটা সাড়ে-এগারোটা বোধ হয়।

না না, শ্রীলতা হেসে বলে, আমিই তো সাড়ে দশটার পরে শুতে এলাম।

শুভেশ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, জল খাবি?

তুমি খাবে? এনে দেব?

দে, ম্লান হেসে শুভেশ বলে, ভয় করবে না?

না না, শ্রীলতা মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। আলোর সুইচে আঙুলের চাপ দেয়। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর ছোট ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে বলে, বারোটা বাজতে দশ। কাল অফিস যেতে পারবে?

শুভেশের গলা থেকে ত্রস্তস্বর বার হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে শ্রীলতা খাবার ঘরে এল। একটা জানলা খোলা ছিল। সিক্ত রূপোলি আলো কুয়াশা কেটে-কেটে ঘরের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়েছিল।

একটা গেলাস হাতে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল শ্রীলতা। নির্জন রাতে শেষ শীতের পুঞ্জ-পুঞ্জ কুয়াশা ঝিম-ঝিম করছিল। রাস্তার আলো-গাছ অস্পষ্ট হয়েছিল। বাইরে তাকিয়ে অল্পক্ষণ শ্রীলতা দাঁড়িয়ে থাকল।

একটু পরে জলের গেলাস হাতে নিয়ে সে শুভেশের সামনে এসে দাঁড়াল। দুই হাতে মাথা চেপে শুভেশ চোখ বন্ধ করেছিল। তার কপালের কাছে একটা মশা উড়ছিল। শ্রীলতা তার গায়ে মশার কামড়ের চিহ্ন দেখল।

বাবা!

জলের গেলাস হাতে নিয়ে শুভেশ শ্রীলতার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ জল খেল না। শ্রীলতাকে দেখতে-দেখতে শুভেশ বলল, তোর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

না না।

দিনরাত বাড়িতে বসে থাকিস! এত কাজ করবার কি দরকার তোর? রাখাল, যশোদা—ওরা করতে পারে না?

শ্রীলতা হেসে বলল, ওরাই তো সব করে।

আস্তে আস্তে জল খেল শুভেশ। গেলাসটা শ্রীলতার হাতে দিয়ে বলল, সংসারের ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই তোর মা শেষ হয়ে গেল।

শ্রীলতা হঠাৎ একটা পাখির মতন বলে উঠল, মা-র কথা বল বাবা।

তুই তো সবই জানিস, খুব জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে শুভেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

সে প্রথম-প্রথম নীরব থাকলেও শ্রীলতা জানত এখন শুভেশ অনেকক্ষণ কণিকার কথা বলে যাবে। মা-র কথা শুনতে না চাইলেও আর একটু পরে স্মৃতির এক-একটা আলোড়ন, অনুতাপের দাহ, যন্ত্রণার আবেগে জলকল্লোলের মতন শুভেশের বুক চিরে-চিরে বেরিয়ে আসত।

আরও অনেকক্ষণ ঘুম আসবে না শুভেশের। পরে, অনেক পরে শ্রীলতা যখন তাকে জোর করে বিছানায় পাঠাবে তখনও সে জেগে থাকবে। তারপর বাইরে আলো ফুটে উঠবে। দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও ঘরের অন্ধকার অল্প অল্প করে মুছে যাবে। প্রথম পাখি ডাকবে। রাস্তায় শব্দ হবে। মানুষের গলার স্বরও শোনা যাবে। তখন ঘুমিয়ে থাকবে শুভেশ। আলোর ভুবন তাকে কোনমতেই বিচলিত করবে না।

খাট থেকে সাবধানে মাটিতে নামবে শ্রীলতা। আস্তে একটি একটি করে জানলা-দরজা খুলে দেবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখবে। সদ্য-ঘুমভাঙা ঠাণ্ডা আকাশের দিকে তাকাবে। ভিজে পেয়ারা পাতা থেকে অনেকক্ষণ পর-পর টপ-টপ শিশির গলে-গলে পড়বে।

আরও পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মশারি অল্প সরিয়ে শ্রীলতা খুব আস্তে শুভেশকে ডাকবে, বাবা!

এক ডাকেই জেগে উঠবে শুভেশ। বেদনার ভারে ক্লান্ত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাকে দেখতে-দেখতে শুভেশের আবার কণিকার কথা মনে হবে। আস্তে আস্তে অনিচ্ছায় সে চায়ের কাপে চুমুক দেবে। চা জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু প্রতিদিনের সংসার তখন শ্রীলতাকে অন্য কাজে টানবে।

জলের খালি গেলাসটা আয়নার কাছ থেকে তুলে নিয়ে শুভেশ হাতের মুঠোয় খুব জোরে চেপে ধরে বলল লতা, তুই বিশ্বাস কর, আমি তোর মা-কে, কোন দুঃখ দিই নি—

আর জল খাবে?

শুভেশ মাথা নাড়ল, কিন্তু তোর মা অনেক দুঃখ পেয়েছিল—আমারই জন্যে তার সুখ ছিল না।

শুভেশকে শান্ত করবার জন্যে মৃদুস্বরে শ্রীলতা বলল, বাবা, এবার ঘুমোও।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর শরীর একেবারে ভেঙে যাবে, শুভেশ উঠে দাঁড়াল, শুয়ে পড়।

আলো নিবিয়ে দেব?

আমি দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি কর। আর এক মিনিটও জেগে থাকতে পারবে না—রোজকার মতন শ্রীলতা আবার বলল। শুভেশ না ঘুমোলে সে-ও ঘুমোতে পারছিল না।

আলো নিবিয়ে দিল শুভেশ। তার অল্প-অল্প ঘুম পাচ্ছিল। তা হলেও সে আবার কথা বলল, কাজ-কাজ করে আমি তোর মা-কে বড় অবহেলা করেছি। কি করব, কাজ ছাড়া আমি বাঁচতে পারতাম না।

শ্রীলতা মৃদু ধমক দিল, বাবা!

শুভেশ চুপ করল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। আবার আপন মনেই বলতে থাকল, কিন্তু আর আমার কোন কাজ নেই। শুধু অফিস আর বাড়ি। লতা, আমি আর বাইরে থাকতে পারি না। ব্যবসায় অনেক টাকা লাভের সম্ভাবনা থাকলেও না—

বাবা!

ঘুমোচ্ছি রে, এদিক-ওদিক করে শুভেশ বলল, তোর মা আমাকে ঘরে ধরে রাখতে চেয়েছিল। আমার টাকা পরিশ্রম উন্নতি—এ সবের চেয়ে আমার বিশ্রাম—আমার অবসর তার কাছে অনেক বড় ছিল। আমি তাকে বড় অবহেলা করেছি।

শ্রীলতা মিষ্টি করে বলল, ঘুমোও!

তোকে আমি বুকে করে রাখব লতা। সব কথা শুনব। তোর মা সব দেখতে পাবে!

ঘুমের ভাণ করে শ্রীলতা একদিকে ফিরে থাকল। তার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। শুভেশের সব দুঃখ জুড়িয়ে দেবার ইচ্ছায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আজ সকালে রাখাল আর যশোদাকে খুব বকাবকি করেছিল শুভেশ, তোমরা কিছু কর না—কিছু দেখ না। সব নতুন এলে নাকি? লতার লেখাপড়া নেই?

রাখাল শ্রীলতাকেই দোষ দিয়েছিল,

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে

লিলি বিস্কুট

দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট
কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট

15-1011

লিলি বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

দিদিমণি আমাদের কিছু করতে দেয় নাকি বাবু? সব তো নিজেই—

থাম, খুব মজা পেয়ে গেছ, না? কলেজ কামাই করে সে সব করছে আর তোমরা আরাম করছ—শ্রীলতার দিকে ফিরে শুভেশ একটু আস্তে বলেছিল, আজ ঠিক কলেজে যাবি—না গেলে আমি খুব রাগ করব। যা হয় হবে। এসব আজেবাজে কাজ নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না তোকে—বুঝলি?

আজও শ্রীলতার কলেজে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শুভেশের মেজাজ দেখে সে ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

ঠিক?

হ্যাঁ বাবা।

শুভেশ হেসে বলেছিল, কলেজ থেকে আমাকে ফোন করিস।

শ্রীলতা আবার বলেছিল, হ্যাঁ, করব।

বরুণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কলেজের বড় মাঠ পার হয়ে গেটের দিকে খুব আস্তে এগিয়ে আসবার সময় এসব কথা মনে হল শ্রীলতার। দূর থেকে সে এখন বরুণকেও দেখল। সাদা সার্ট। নীল ট্রাউজার্স। কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরুণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

এত দেরি?

একটু দেরি হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম,—সব অস্থিরতা মুছে দিয়ে খুশির আবেশে বরুণ কথা বলল, আজও তুমি কলেজে আস নি।

এসেছি তো, মিডলটন স্ট্রীটের ওপর দিয়ে পর-পর অনেক গাড়ি যাচ্ছিল বলে শ্রীলতা একটু জোরে বলল, আসতে চাই নি। বাবা জোর করে পাঠালেন—

আমি আর একটু দেখে তোমাদের বাড়িতে চলে যেতাম—

না না, আশঙ্কার একটা ছায়া—শ্রীলতার মুখে কাঁপছিল, বাড়িতে না।

কেন? তোমার বাবা রাগ করবেন?

শ্রীলতার মুখে হাসি ফুটল, বাবা তো দুপুরে বাড়িতেই থাকেন না।

শ্রীলতা ক্লান্ত হচ্ছিল বলে বরুণ তার হাত থেকে মোটা-মোটা বইগুলো নিয়ে বলল, তবে বারণ করছ কেন?

রাসেল স্ট্রীট পার হবার সময় পলকে দু'দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা শুধু বলল, না।

বরুণের স্বর অধীর মিনতির মতন মনে হল, কেন বল না?

এখন তো অনেক কাজ পড়েছে, অন্য দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা একটা যন্ত্রের মতন বলে যাচ্ছিল, তুমি অতদূরে কষ্ট করে যাবে—হয় তো ভাল করে তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারব না!

ছাড়া-ছাড়া ক্লান্তস্বরে বরুণ বলল, আজকাল আমার সঙ্গে তুমি তো কথাই বলতে চাও না!

শ্রীলতা আবার হাসল, বলি তো!

না, শ্রীলতার বইগুলো শক্ত করে চেপে ধরে বরুণ বলল, আমিই কথা বলি। তুমি শুধু উত্তর দাও। কখনো কখনো তা-ও দাও না। চুপ করে থাক।

শ্রীলতা কয়েকমুহূর্ত ভাবল। চৌরঙ্গীর কলরব শুনল। নির্জন অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেতে চাইল। আলোর উৎসব তাকে ক্লান্ত করে তুলছিল। বিরক্তি দিচ্ছিল।

একটু পরে সে থেমে থেমে ভাঙাস্বরে বলল, বরুণ, তুমি কিছু মনে কর না। আমি কি বলি—কি করি আমি জানি না।

হঠাৎ অভিমান প্রকাশ করার লজ্জায় বিব্রত হয়ে বরুণ বলল, আমি কিছু মনে করি না। মনে করব কেন! তার কথায় দরদ উথলে উঠছিল, মা না থাকলে সংসার একেবারে তছনছ হয়ে যায়।

শ্রীলতা মুখ নামিয়ে বলল, হ্যাঁ—সব বড় বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, একটু চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, তোমার মা'র বয়স কত বরুণ?

আমার মা'র? খুব অবাক হল বরুণ। মনে মনে হিসেব করে বলল, বোধ হয় আটচল্লিশ।

আমার মা-র বয়স ঠিক আটত্রিশ, শ্রীলতা কি ভাবতে ভাবতে বলল, তোমার মা'র চেয়ে তোমার বাবা ক' বছরের বড়?

চার-পাঁচ বছরের।

আমার বাবা আমার মা-র চেয়ে আট বছরের বড়, শ্রীলতা হঠাৎ খুব হাসল, আর আমি আমার বাবার চেয়ে আটাশ বছরের ছোট।

শ্রীলতাকে হাসতে দেখে বরুণ খুশি হয়ে বলল, আর তুমি আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট তাই না?

শ্রীলতা অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, হবে।

চৌরঙ্গীর ওপর বরুণ আর শ্রীলতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ময়দানে ছায়া নেমেছিল। শ্রীলতার কিছু ভাল লাগল না। তার সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাকে একটা পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল।

বরুণ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

এখন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল শ্রীলতার, বল কোথায়?

কিছু খাবে?

শারদীয়া উৎসবে

আমরা জানাই সকলকে অভিনন্দন!

আর আহ্বান করি উৎসবের অবসরে আমাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়ে নূতন রসের আস্বাদন করতে—

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের	—	উড়িষ্যার দেব-দেউল	॥ ৫·৫০ ॥
ঐ	—	বাংলার নব জাগরণের স্বাক্ষর	॥ ৪·৫০ ॥
আশাপূর্ণা দেবীর	—	শুক্তি সাগর (উপন্যাস)	॥ ৩·৫০ ॥
সুভাষ সমাজদারের	—	ঝড় জানে অরণ্যকে (উপন্যাস)	॥ ৩·০০ ॥
দীপক চৌধুরীর	—	রোটেপিঙ (উপন্যাস)	॥ ৫·০০ ॥
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের	—	দময়ন্তীর শাড়ি (গল্প সংকলন)	॥ ৩·০০ ॥
নরেন মিত্রের	—	একটি ফুলকে ঘিরে (ঐ)	॥ ২·৫০ ॥
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের	—	হনিমুন (ঐ)	॥ ৩·৫০ ॥
অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের	—	রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য	॥ ১০·০০ ॥
ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের	—	ম্যানহাটান ও মার্টিনি	॥ ৫·০০ ॥
দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের	—	একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে	॥ ৬·০০ ॥
ঐ	—	অপরূপা চাম্বা	॥ ৬·০০ ॥

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

না, শ্রীলতা বলল, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাব।

বরুণ হাসল, সংসারের কাজ, না?

হ্যাঁ।

চল, ওই ময়দানের বেঞ্চে একটু বসি—ওই যে গাছের ছায়ায়—

চল।

একটা খুব বড় বটগাছের নীচে ঘাসের ওপর আগেই ঝপ্ করে বসে পড়ল শ্রীলতা। কথা বলল না। কোনদিকে তাকাল না। মনে মনে শুধু বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবল। বরুণ সে তার খুব কাছে বসে আছে সে কথাটাও শ্রীলতার মনে থাকল না।

কি ভাবছ লতা?

না।

বরুণ বলল, দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই আমাকে আসানসোলে চলে যেতে হবে। সেখানে একটা ভাল চাকরি পেয়েছি—

শ্রীলতা তার কথা শুনে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আসানসোলে যাবে? ভালই তো!

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে দেখাই হবে না—তা-ও কি ভাল?

শ্রীলতা জোরে-জোরে ময়দানের ঘাস ছিঁড়ছিল, হয় তো ভালই!

বরুণের মুখ বিষণ্ণ হল, না, ভাল না। এক-একবার ভাবি কলকাতার বাইরে যাব না।

আমার বাবা কাজকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন—আমার মা'র চেয়ে অনেক বেশি।

আমি তেমন পারব না।

পারবেই, শুভেশের কথা ভাবতে-ভাবতে শ্রীলতা খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, কাজ ভালবাসতেন বলেই বাবা এখন মা-কে ভালবাসতে পারছেন।

একটু চুপ করে থেকে বরুণ বলল, আমি আসানসোলে যাবার আগে তাঁর সঙ্গেও দেখা করে যাব।

কি দরকার!

আমার কথা উনি কিছু বলেন না?

শ্রীলতা যেন বরুণের কথা শুনতে পায় নি এমন ভঙ্গি করে বলল, আমার বাবা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। উনি মা'র কথা ছাড়া আর কিছুই বলেন না।

বরুণ জিজ্ঞেস করল, উনি কেমন আছেন?

একই রকম, শ্রীলতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

বরুণ শান্তস্বরে শ্রীলতাকেও সান্ত্বনা দিতে চাইল, তোমাদের বাড়িতে তো বড় আর কেউ নেই—

আমি ছাড়া বাবার আর কেউই নেই—একটা বন্ধুও না—

জানি।

শ্রীলতা থেমে থেমে বলল, বাবাকে ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

তুমি তো কোথাও যাও না লতা!

না, একটা কঠিন কথাকে খুব সহজ করে বলবার চেষ্টা করল শ্রীলতা, বাবাকে একা ফেলে আমি কোনদিন কোথাও যেতে পারব না, একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলল, তুমি আসানসোলে যাবে তো?

বরুণ তা শুনেও বলল, আমাকে চিঠি লিখবে লতা?

শ্রীলতা হাসল। কিছু বলল না। বরুণের সান্নিধ্য আর এক অনুভূতির আমেজে সে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বরুণকে শ্রীলতা আর সময় দিতে চাইল না।

বরুণ বলল, আমি প্রায়ই কলকাতায় আসব।

এসো।

আমি তোমাকেই দেখতে আসব।

শ্রীলতা বলল, আমার ভয় হয়, আমার সঙ্গে দেখা করলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। তুমিও আমার মতন অদ্ভুত হয়ে যাবে।

লতা, তার একটা হাত ধরে বরুণ বলল, এসব কেন বল? তোমার শোকের চেয়ে আমার স্বার্থকেই বড় করে দেখলে!

বরুণ দেখল না যে সে শ্রীলতাকে স্পর্শ করেছিল বলে একটা কঠোর যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। হাত আস্তে মুক্ত করে নিয়ে শ্রীলতা আকাশ দেখতে-দেখতে বলল, আমার মা-র কথা আমি ভুলে গেছি বরুণ।

সব ঠিক হয়ে যাবে লতা।

শ্রীলতা মুখ নামিয়ে বলল, না।

কি না?

আর কোন পরিবর্তন হবে না সব যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকবে।

থাক না, বরুণ হেসে বলল, আমিও থাকব।

শ্রীলতা আরও জোরে-জোরে ঘাস ছিঁড়ল। তার হাতে খুব লাগছিল। তা হলেও সে থামল না।

কণিকার মৃত্যুর পর শুভেশ শ্রীলতার জন্যে অনুকম্পার যে-ভুবন গড়ে তুলেছিল সেখানে বরুণের কোন স্থান ছিল না—সে কথাটা স্পষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারছিল না বলেই শ্রীলতা ঘাস ছিঁড়ছিল।

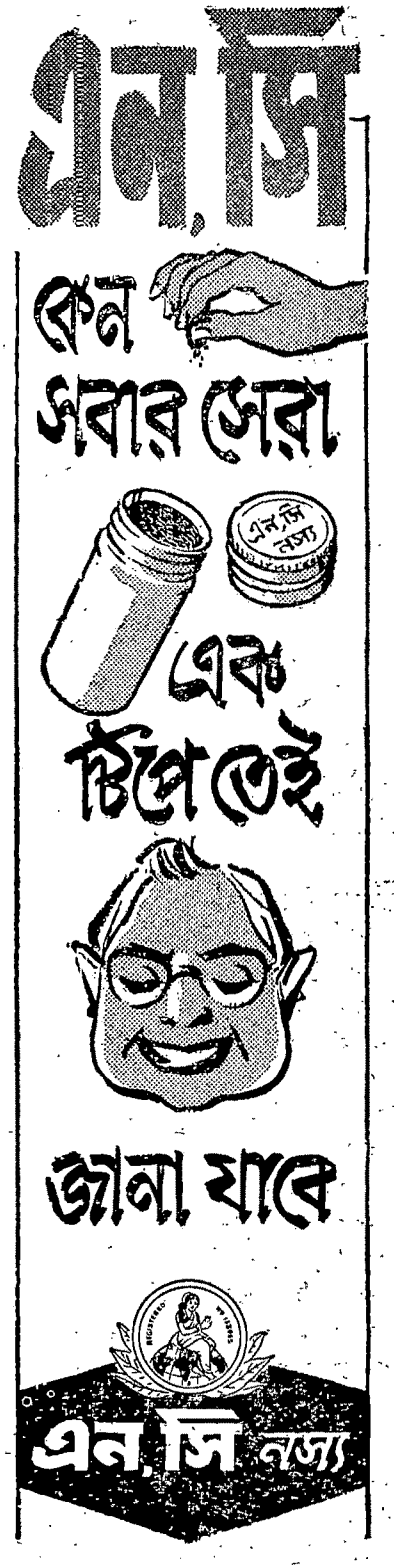

শ'এর সঙ্গে কিছুক্ষণ

সুধীরচন্দ্র সরকার

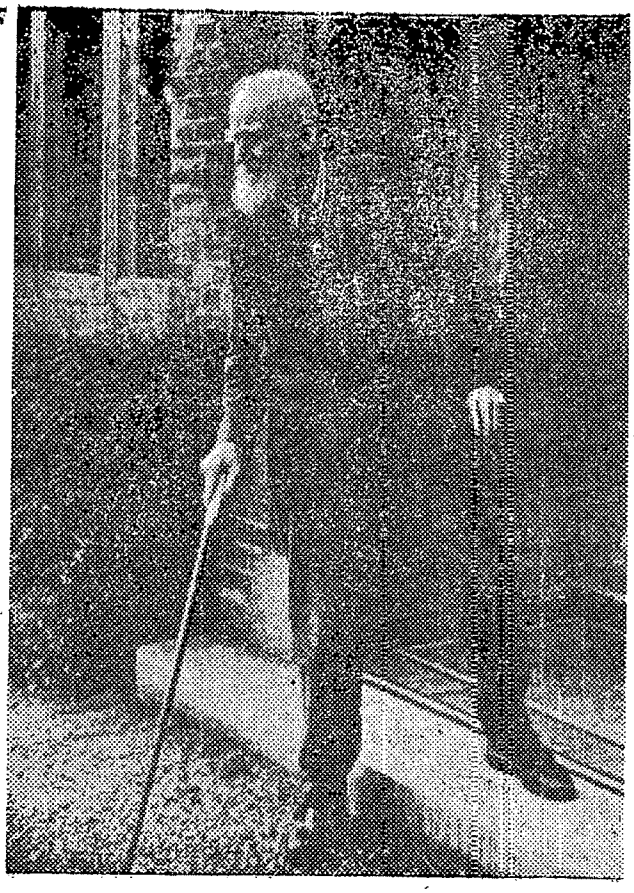

● জর্জ বার্নার্ড শ'

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে জর্জ বার্নার্ড শ' একটি স্মরণীয় ও বরণীয় নাম। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা, আধুনিক যুগ ও জীবনের মনীষাদীপ্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সর্বোপরি ব্যঙ্গাত্মক বক্রোক্তি, মন্তব্যের গভীরতা ও কটাক্ষ তাঁকে সাহিত্যজগতে বিশ্রুতকীর্তি করে রেখেছে। যে-সব ভারতবন্ধু বিদেশী পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার দাবী পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করেছিলেন, বার্নার্ড শ' তাঁদের অন্যতম পুরোধা। জাতিতে আইরিশ এই মনীষী স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও একান্তভাবে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি একজন খাঁটি সমাজতন্ত্রী এবং সেই সূত্রে 'ফেবিয়ান' দলভুক্ত।

লণ্ডন শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে হার্ডফোর্ডসায়ারের একটি ছোট্ট গ্রাম সেণ্ট লরেন্সে শ'র জীবনের শেষার্ধ কাটে। ১৯০৬ সালে এই গ্রামে এসে একপ্রান্তে একটি কুটির বেঁধে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ১৯৫০ সালের নভেম্বরে ৯৪ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন। সেণ্ট লরেন্সের ঐ অংশ এখনও শ'র রাখা নাম 'শ'জ কর্নার' নামে খ্যাত। মৃত্যুর পর শ'র সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি 'ন্যাশন্যাল ট্রাস্ট'-এর হাতে এসেছে। তাই এই কুটিরটিও যেন এখন জাতীয় সম্পত্তিরূপে রক্ষিত হয়েছে।

গত ২৬শে জুলাই এই প্রজ্ঞাতীর্থ সেণ্ট লরেন্সে গিয়ে শ'র পল্লীভবন দর্শন করে নিজেকে ধন্য মেনেছি। এই গ্রামে অতি-বাহিত অর্ধশতাব্দীর পল্লীজীবনে শ'কে ঘিরে কত কথা কত কাহিনী এখানকার লোকের মুখে মুখে ফিরছে, এর কুটিরে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে বিধৃত তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের নিখুঁত রেখাচিত্র।

বাস্তববাদী শ'র এই গ্রামে এসে বাসা বাঁধার পেছনে এক গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত পেয়ে অবাক হতে হলো, সে হচ্ছে এই—এখানে মেরী এ্যান সাউথ নামে এক মহিলার সমাধি রয়েছে। স্মৃতিফলকে তাঁর জন্ম ১৮২৫ সালে ও মৃত্যু ১৮৯৫ সালে লেখা আছে, এতে জানা যায় তিনি ৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ফলকে আরও একটি কথা উৎকীর্ণ আছে—'Her time was short.' এই স্মৃতিফলকটি পড়ে শ' স্থির করলেন এই গ্রামেই তিনি বাস করবেন। কথিত আছে—এই মহিলার মত দীর্ঘায়ু হবার বাসনা নিয়েই নাকি সমাধি-সংলগ্ন ভূমি কিনে নিয়ে কুটির তৈরি করে এখানেই বসবাস শুরু করে দেন। বলা বাহুল্য শ'র আশা মিটে ছিল। তিনি ঐ মহিলার চেয়েও বেশি পরমায়ু পেয়েছিলেন।

দেখে মনে হলো প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর কুটিরটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে দোতালা হলেও কুটিরটি ছোট্ট। একতলায় মোট চারখানা ঘর, ঘরগুলি অবশ্য প্রশস্ত। এইগুলিতে এখন শ'র ব্যবহৃত জিনিসপত্র বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

১৯০৬ সালে এখানে এসেই শ'-এর The Doctors Dilema প্রথম অভিনীত হয়, এর আগে Arms and the Man, Caesar and Cleopatra, John Bulls other Island ও Candide লিখে শ'র খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কুটিরে ঢুকবার মুখে দরজায় একটা অদ্ভুত ধরণের পিতলের তৈরি শ'র প্রতিকৃতি সম্বলিত হাতল। এটি কোন বন্ধুর উপহার হাতলের উপর লেখা Man and Super man। শ'-এর ব্যবহৃত জিনিসগুলির কয়েকটি রাখা হয়েছে কুটিরের ডান দিকের ঘরে—এতে আছে অনেক রকমের টুপি, দস্তানার বাক্স এবং ছড়ি, এদের মধ্যে একটি টুপিই চোখে পড়ে, খুব জমকালো এই টুপিটি। শ' দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে ব্যবহার করেছিলেন। এসব দেখে বোঝা যায় শ' সৌখীন মানুষ ছিলেন, ছাতার সখও কম ছিল না তাঁর। প্রায় ১৫টি নানান ধরণের ছাতা তিনি ব্যবহার করতেন সব কয়টি এই সংগ্রহশালায় সযত্নে রাখা হয়েছে। কাছেই একটি বাস্কেট চেয়ার পাতা আছে। শুনলাম এই চেয়ারে বসে জুতো-মোজা পরে সেজেগুজে তিনি রোজ গ্রামে বেড়াতে বেরুতেন। দেয়ালের গায়ে ঝুলানো শ'র প্রিয় পিয়ানো, নাট্যকার বার্নার্ড শ'র খ্যাতি যেমন জগৎ-জোড়া সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। শুধু তাই নয়, ছদ্মনামে তিনি সঙ্গীতের সমালোচনাও করতেন তার প্রমাণও এখানে পাওয়া যায় পুরাতন পত্র-পত্রিকায়। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন 'সাইরেনে'র কান্নার সুর সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতো নির্বিকার শ' তখন তাঁর পিয়ানো

বাজিয়ে গানের পর গান গেয়ে যেতেন। পিয়ানোর ধারেই তাঁর অনেকগুলি গানের বই ও স্বরলিপি রাখা হয়েছে।

শ'-এর পড়ার ঘরটিতে ঢুকলে থমকে দাঁড়াতে হয় দর্শকদের। ডেস্কের উপর কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল—বহু বইপত্র-অভিধান সব এমনভাবে ছড়ানো রয়েছে মনে হয় এইমাত্র এখানে বসে লিখছিলেন, এই ঘরে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার ছবিও টাঙানো। অপর একটি ডেস্কে সাজানো আছে নোবেল পুরস্কারের সনদসহ আইরিশ আকাদেমী অফ লেটার্স হতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের পদক ও অন্য অনেক উপহার। শ'র পাশে বসতেন তাঁর সেক্রেটারী মিস প্যাচ। এখানে একটি ছোট গ্রন্থাগারও রয়েছে। তার দেয়ালে পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীদের প্রতিকৃতি টাঙানো। শ' কুশলী চিত্রশিল্পীও ছিলেন, পাকা ফটোগ্রাফার হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। জীবনের ৫০ বৎসরকাল ক্যামেরা ছিল তাঁর নিত্যসহচর। তিনি যে দু'টি ক্যামেরা ব্যবহার করতেন সেগুলিও এখানে আছে।

চিন্তাবিদ বার্নার্ড শ' অনেক সময় কৌচে হেলান দিয়ে চিন্তা করতেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে। কখনও স্রেফ বিশ্রাম নিতেন। সেই কৌচটির পাশে শ' সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র। আর আছে ইয়েটস্, লেডী গ্রেগরী, উইলিয়ম আর্চার, সিডনী ওয়েব, ব্যারী ও চেস্টারটনের ছবি। একের পর এক ছবি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ দু'টি সুদৃশ্য প্রতিকৃতির উপর চোখ পড়তে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম। সেই সঙ্গে এই মহা মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হয়ে এলো—প্রতিকৃতি একখানি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্যটি মহামানব মহাত্মা গান্ধীর।

পড়ার ঘরটির পাশেই ড্রইং-রুম, এটি মিসেস্ শ'র ঘর বলা চলে। এখানে বিয়ের আরো আগের শ'-পত্নীর একখানি বিরাট প্রতিকৃতি রয়েছে। ১৯৪৩ সালে পত্নীর মৃত্যুর পর শ' এই ঘরে বড় একটা আসতেন না। এখানে চিমনী পিশের উপর কারুকার্য-খচিত জোয়ান অব আর্কের প্রতিমূর্তি বসানো হয়েছে। ১৯৩৮ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রের জন্য শ' এই মূর্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন, শেক্সপীয়ারের মূর্তিও এখানে দেখলাম। এ ছাড়া আর যেসব মূর্তি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রখ্যাত ভাস্কর রোঁদার খোদাই করা শ-এর মূর্তিসহ অন্যান্যদের তৈরি শ'-এর দু'-তিনটি মূর্তিই প্রধান।

এরপর আমরা এলাম ডাইনিং-রুমে। এখানে শ' অনেকক্ষণ কাটাতেন।

নিরামিষাশী শ' দুপুরে পড়তে পড়তে খেতেন। অনেক সময় তাঁর দু'ঘণ্টারও বেশি লেগে যেত এইভাবে খাওয়া শেষ করতে। সন্ধ্যায় কিন্তু সকাল সকাল সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আগুনের সামনে বই পড়তেন। কখনও বা রেডিও শুনতেন। শেষ বয়সে শ' মধ্যরাত্র পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে দিতেন।

ড্রইং-রুমের সামনে খোলা বারান্দা, এই বারান্দা পার হলেই নরম সবুজ ঘাসে-ঢাকা প্রশস্ত মাঠ। ঐদিন সেই মাঠের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে শ'র Back to Methuselah আবৃত্তিও অভিনয় হয়েছিল। অত্যন্ত অনাড়ম্বর সহজ সরল পদ্ধতিতে এই অভিনয়ও করা হয়। মাত্র তিনটি চরিত্র—আদম, ইভ ও সারপেন্ট। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে আমরা ৩০০ জনেরও অধিক দর্শক এই অভিনয় দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

এই মাঠের পরের আরণ্যক পরিবেশ প্রাচীন ভারতের তপোবনীয় প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্যামল তরুবীথি-কায় ঘেরা এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ। অন্ধকার পথের বাঁকে হঠাৎ এক শ্বেতবসনা নারীমূর্তি দেখে গা ছম-ছম করে। নিকট কাছে গিয়ে দেখবেন এটি সেন্ট জোয়ানের মূর্তি। কোন এক গুণমুগ্ধ ভাস্কর শ'কে এই মূর্তি উপহার দেন। এই নির্জন বনভূমি শ'র মনকে টানতো। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনগুলি ছাড়া শ' এখানে না এসে পারতেন না। হাজারো কাজ ফেলে তিনি হাজির হতেন ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার পর। এই ঘন বনের মধ্যে একটি কাঠের ঘুরন্ত গ্রীষ্মাবাস ছিল। অগণিত বন্ধু-বান্ধব, গুণগ্রাহী ও গুণমুগ্ধদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য শ' অনেক সময় গোপনে এখানে পালিয়ে আসতেন। ছোট ঘরের মধ্যে কোনমতে ঢুকে পড়ে বাঁচতেন। এখানে একটি ছোট্ট টেবিল রয়েছে। এই টেবিলের সামনে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যেতেন। কখনও বা এই টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতেন। এখনও সেই টেবিল এবং টেবিলের উপর কালি, কলম, দোয়াত, পেন্সিল, ছুরি ইত্যাদি সবই সাজানো রয়েছে। এমন কি ফুলস্কেপ কাগজ পর্যন্ত চাপা দেওয়া রয়েছে, যেন নাট্যকার শ' তাঁর কোন বিখ্যাত নাটকের যবনিকাপাত ঘটিয়ে এইমাত্র উঠে গেলেন। সূর্য-প্রেমিক শ' বরাবরই আলোর পিয়াসী ছিলেন। তাই সূর্যরশ্মির দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর ছোট কাঠের ঘরটিকে ঘুরিয়ে দিতেন এবং মুখোমুখি বসে কলম চালিয়ে যেতেন।

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জ্ঞান-তপস্বী বার্নার্ড শ'র অর্ধ-শতাব্দীর মহনীয় জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যতীর্থে সেদিন তিনঘণ্টাকাল অতিবাহিত করে আমরা আবার লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে এলাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে।

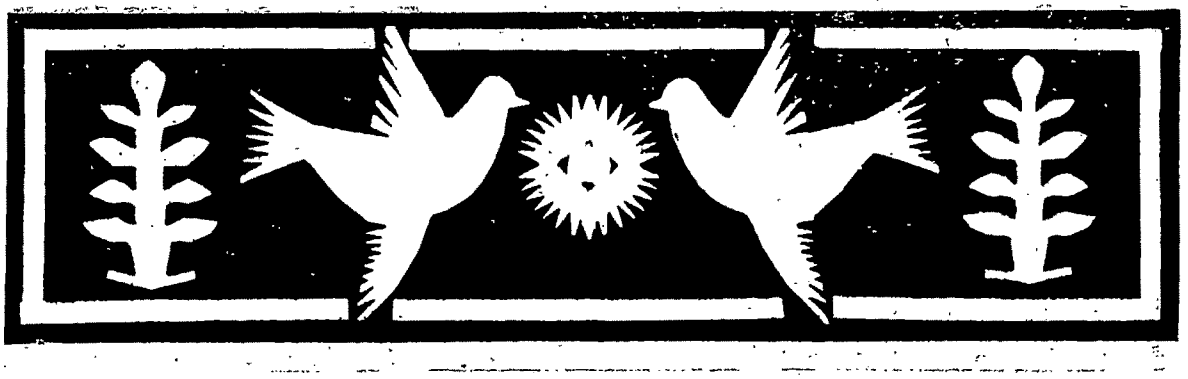

মহিষাসুর

শিবরাম চক্রবর্তী

স্বর্গ অচল হচ্ছিল তোমার অভাবে—
চালু হচ্ছিল না তুমি আসছিলে না বলে।
স্বর দাঁড়াতেই পারে না—নিজের থই পায় না
তোমার বিরাট কাঁধের ব্যঞ্জনা নিয়ে
তুমি এসে না দাঁড়ালে।

অন্নকে করো পরমান্ন,
স্বরকে সরস্বতী,
নিজে নঙ্ অর্থক হয়েও
অনর্থকে করো অর্থময়,
করো সার্থক—
তোমার যোগেই ওদের ব্যঞ্জনা,
অবর্ণের বর্ণনা তুমি,
তুমি ব্যঞ্জন।

শিবের নভোজটায়
আলোকের জালে জড়িয়ে ছিল যে সুরধুনী—
সেই অমৃত-নিস্যন্দিনীকে তুমি ছাড়া বলো কে
টানতে পারে এই মর্ত্যে?
আদিম উদ্গাতির কোনো অর্থ হয় না
অধোগতির শেষে গিয়ে না পৌঁছলে—
সুরধুনীও ব্যর্থ হয় মৃদঙ্গে এসে ছাড়া না পায় যদি
রসাতলের জন্যেই নয় কি রসায়ন?
তাই তো, কেবল মহেশ্বর একাই নন—
তুমিও ধারণ করেছো সুরধুনীকে।

তুমিও যে মুক্তির ভগীরথ—মোক্ষের মূলাধার—
মহিমার উৎসমুখ—
তুমি মহিষাসুর।

আকাশের মহত্ত্ব কি নিষ্ফল হত না
তোমার মহীত্বে তাকে ঠাঁই না দিলে?
আকাশভরা আলোর গান কি ব্যর্থ হয়ে যেত না
তোমার মৃদঙ্গে এসে না বাজলে

রূপ আর বাণী,
বীর্য আর সিদ্ধি,
সবাই কি নিরাশ্রয় হত না
নিজেদের আলোকের অরণ্যে?

সর্বস্বান্ত হয়ে থাকত না কি নিজের নিরুক্ত অক্ষমতায়
একান্ত সর্বনাশের অস্তিমে—
তোমার অশান্তির মধ্যে উন্মুক্তি না পেত যদি?

তাই তো দেখা যায়, ভগবতীর ঝোঁক তোমার দিকেই বেশি যেন।
তাঁর ঝুঁকি কেবল তুমিই নিতে পেরেছ॥

অভিনেত্রী

বন্দে আলী মিয়া

সোনার হরিণী কাঁদে অরণ্যের নিবিড় গুহায়
তোমার কুসুম রাতি আসিবে না জীবনে আবার,
কামনা জাগে কি বলো কপোতীর দুইটি নয়নে!
হে মাধবী, আজি বুঝি আমাদের বানপ্রস্থ দিন!

আমার পুরানো দিন গাঁথা আছে তোমার জীবনে
তুমি কি জ্বালাতে চাও শেষ দীপ বাসর রাতের!
জীবনের অপরাহ্ণে নামে হের প্রদোষের ছায়া
তাসের প্রাসাদ হায় ভেঙে পড়ে পথের ধুলায়।

ক্ষমা করে হে মাধবী,—পথশ্রমে শ্রান্ত আমি আজ
নিরন্ধ্র আঁধার ঢাকা আকাশের গ্রহ-নীহারিকা।
আদিম ওঙ্কারধ্বনি দিকে দিকে নিখিল ধরায়—
তোমার দু' চোখে জলে ধরিত্রীর তপস্যা প্রদাহ।

পৃথিবীর পরমায়ু পলে পলে হলো নিঃশেষ
হে মাধবী, চেয়ে দেখ কেশ তব হয়েছে ধূসর,
অভিনয় শেষ অঙ্ক জমেছে গো তব মঞ্চ 'পরে—
ফেলো না দীরঘ শ্বাস অভিনেত্রী মাধবী আমার।

ভাদ্রসন্ধ্যা

বিষ্ণু দে

ভাদ্রের বিদায়ী সন্ধ্যা, আশ্বিনের আসন্ন বন্দরে।
দেখি, ভাবি নির্নিমেষ।
হে পৃথিবী!

তোমাদের কিছুতে যায় না ভোলা। হে স্বদেশ!

রূপেগুণে ভোর প্রাণ, মানবিক চোখ কান স্পন্দিত হৃদয়
ঢেউ তোলে অভিরাম, নন্দিত চৈতন্যে দোলে,
অবিশ্রাম পাড় ভাঙে, অভ্যাসে অপরাজিত,
যেন জীবনের সৌন্দর্য অমর। এবং মানুষ অলৌকিক
সৌন্দর্য যাদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব আপ্লুত
অকস্মিক অশ্রুস্নানে হাস্যস্মিত,

যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা,
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন; বক্ষের পাহাড়,
বাহুর নক্ষত্রবৃত্ত, চিরস্থায়ী পরিবর্তনের খোদাই আকাশে বন্ধনীবি।
অথচ আমরা চিরপরিবর্তনীয়—এখন এখানে দ্রুত,
মুহূর্তেই ওখানে নিঝুম।

ভাদ্রের আলোয় ম্লান, শরৎ সজল আকাশের শরীরে উজাড়।

মেঘ, ঢেউ, বালিয়াড়ি, উপনউর্মিল সূর্যের প্রতিভা,
আলোর তরঙ্গে দোলা।

তারপরে? ঘর; অনিদ্রা বা অন্ধকার নীলাকাশে আসমুদ্র ঘুম॥

বিচার

গোপাল ভৌমিক

ডুকরিয়ে কাঁদে না মেয়ে, শুধুই ফোঁপায় :
আল্‌তো করে বাঁধা তার সুন্দর খোঁপায়
জড়ানো ফুলের মালা
পড়ে না উচ্ছ্বাসে খুলে
অভিযোগে দেখি তাই সবাই মুখর।
এ শুধু সৌখীন কান্না
সব কিছু ভুলবার
সাজানো আসর।

যা-কিছু লোকেরা বলে বিছুটাও তার
সত্য বলে ধরে নিয়ে
একদল জোটে সমঝদার—
গণতন্ত্রে তাই তো নিয়ম।
অথচ সে মেয়েটার মন
ভোটের বিষয় নয়,
নয় বুঝি হাটের সওদাও :
বহু মূল্যে কেনা কান্না
বহু-সুখজাত হাসিটাও
অর্থহীন মনে হয় না দিলে সে ফাও।

একটি মনের মৃত্যু

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

অপ্সরা-কিন্নর মৃত্যু! অচেতন মনের আকাশ,
দুরন্ত প্রত্যাশা নিয়ে নিয়ন্ত্রিত জীবন সঞ্চার—
আদিম সহজ তৃষ্ণা চোখে শুধু ঘুম নিঝুম
নগ্নরাত্রি উপবাসী,—মুছে দেয়
স্বেচ্ছা অধিকার।

মৃত্তিকা সবুজ তৃণ, প্রত্যূষের মূক প্রতীক্ষায়
হয়ত প্রহর গোণে, যে প্রহর শুধুই জিজ্ঞাসা।
স্বপ্নের সোনালী তারা প্রতিদিন তার অবক্ষয়,
ফিরোজা রঙের নেশা, দিকপ্রান্তে
ক্লান্ত ভালোবাসা।

তবু এ মুহূর্ত নয়, সে মুহূর্ত বঞ্চিত কবর
গাছেরা দেয় নি ছায়া, পাখিদের নেই কলরব।
অনির্বাণ দীপ নেই, শুধু দেখি শোণিতের রং—
পরিচয় লিখে রাখে : রণক্লান্ত মানুষের শব।

তবুও খবর লিখি : সে খবরে অধিকার নেই,
ভাষার বঙ্কিমগতি। কাজ করি তবু অবিরত।
মনের জিজ্ঞাসা নিয়ে প্রতিদিন করি আয়ুক্ষয়,
রবে তো সঞ্চয় কিছু, বলে যাবো জীবনের ব্রত।

বুড়োটা

মায়া বসু

খুড়থুড়ো একবুড়ো
বালির উপর সাজিয়ে বালির চূড়ো
আপন মনে একলা বসে থাকে ;
এদিক-ওদিক চারদিকেতেই
তীক্ষ্ণ নজর রাখে।
হাঁটুর মধ্যে মুখটি গুঁজে,
পিটপিটিয়ে চায়
কে আসে আর এ পথ দিয়ে,
কেই বা চলে যায়?

বালির উপর সাজিয়ে বালির চূড়ো
আপন মনে বসে থাকে,
আদ্যিকালের বুড়ো।
উথাল-পাথাল সাগর জলের
ঢেউগুলোকে গোণে,
মাটির উপর কানটি পেতে,
কি জানি কি শোনে?

কাছে গিয়ে কইলে কথা,
চুপটি করে থাকে,
দূরে গেলে খুঁজে পেতে।
আবার কাছে ডাকে।
চোখ পাকিয়ে কুঁচকে দুটি ভুরু,
এমনি করে তাকায়, ভয়ে
বুক যে দুরু দুরু!
হেসে ফেলে আবার আমায় হাসায়।
ভয় করতে ভুলিয়ে দিয়ে
তাকেই ভালবাসায়!

একটু পরেই কি ভাবে, কে জানে?
নিঠুর হাতে আমার বুকে
কঠিন আঘাত হানে।
কাঁদায় আমায়—আকুল করে কাঁদায়!
সেই বুড়োটা ফেলল আমায়,
এ কোন গোলকধাঁধায়?

সাঁকো

হরপ্রসাদ মিত্র

চলেছি নিশ্চিন্দিপুরে, পথে-একটা সাঁকোর আড়াল।
মনে হচ্ছে এই সাঁকো সইবে না এ-যাত্রার এ-ভার।
ঝিঁঝি ডাকছে, অন্ধকার,—নীচে জল,
নির্জন, নির্জন···
ইচ্ছেতে বাধাতে মিলে
এইখানে সন্ধ্যার সন্ধিতে
রাত্রি যতো বড়ো হয় তো তার চেয়ে
বড়ো মনে হয়।

হয় তো এই পথ আরো বহুবার পেরিয়েছি,
কিন্তু তা
কোনো স্মৃতিসূত্র দিয়ে গাঁথা নেই
সেই তো মুস্কিল।
শুধু অন্ধকার গতি ; তাই আজ মনে হচ্ছে প্রাণ।
যতোই অদ্ভুত হোক,
খুঁজছি তবু প্রাণেই বিশ্বাস

বিশ্বাসের অলিগলি, যুক্তির সিঁড়িও
পৌঁছোবে নিশ্চিন্দিপুরে—
অন্ধকারে জানে এই সাঁকো
যাত্রীকে বলছেই তাই—'চলো, কিংবা
এখানেই থাকো।'

পরোয়ানা

শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়

এই তো জাগলে তুমি
ঘুম ঘুম নতুন আলোর চোখে
এ পৃথিবী তোমার।
সব তারার চোখেই
তোমার চোখের আলো।

একটু পরেই কিন্তু
শান্ত শান্ত ভ্রূগুলো হবে লকলকে তলোয়ার
আর চোখগুলোয় নেচে উঠবে
এক রকমের ঝলকানি।
আর—
ওদের রসনার ধারে ধারে
খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে তুমি।

তারপরই তোমাকে গ্রাস করতে আসবে
মিথ্যের পাহাড়ের
শ্বাপদচক্ষু লোহিত
অন্ধকার গুহার মুখ।

যদি পার হারিয়ে যেতে ওদের মধ্যে
মরে বেঁচে গেলে আর পাঁচজনার মতই।

আর—
যদি অথৈ পাহাড়ে পাহাড়ে ডুবতে পার
মুক্তোর খোঁজে
হয় তো পাবে এ জীবনের বিনিময়ে
কালের হৃদয়ের স্বাক্ষর,
শিলালিপির পরোয়ানা।

তিমিরাভিসার

রাণা বসু

ফুল আমি ভালোবাসি না,
ফুল আমায় ব্যথা দেয়।

যাব না, যাব না করে
কি জানি কেন
একদিন ফুল-বাগানে ঢুকেছিলুম।
দেখলুম কতো রঙিন প্রজাপতি
এক ফুল থেকে অন্য ফুলে
উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

রঙের নেশা আমার মনকে চঞ্চল করল।
কেন একটি প্রজাপতিকে ধরব বলে
দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলুম।
কি যন্ত্রণা,
সে একমুঠো ফুল
আমার মুখের উপর ছুড়ে দিল।
মুখখানা আমার লাল করা ছাড়া
অন্য পথ ছিল না॥

অকথ্য

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

প্রিয় পদাবলী আমার, সে আজ শোনায় অন্যজনে,
তার বুকে হানে সূক্ষ্ম-চিকণ প্রণয়ের ছলা-কলা,
পড়তে পড়তে কি কথায় হেসে মাঝপথে থেমে গিয়ে
চোখাচোখি হতে, যাচাই করে যে তার মন, চঞ্চলা!

এমনি রঙ্গে মাতিয়েছিল সে আমাকেও কৌতুকে
মুখস্থ তার চাতুরী—যা দিয়ে করেছিল জেরবার,
শুনি লোকে বলে অভ্যাসে না-কি প্রেমেও মরচে পড়ে,
নতুন কষ্ট-পাথরে কি তাই পরখ করছে ধার?

শান দিয়ে ফের সাজিয়ে রাখছে পুরানো অস্ত্রগুলি,
ভ্রূ-ভঙ্গে ঘন-ঘটা প্রলয়ের ইশারা, সর্বনাশী,—
দেখেও দেখি না, সে খোঁজে সুযোগ ঘটাতে বজ্রপাত,
হায় রে মানবী, প্রকৃতির ক্রীতদাসী!

বুঝেও বুঝি না, কথায় কথায় চোখ ভরে তার জলে,
নিজের গলায় বয়ে চলি তাই সর্বনাশের ফাঁস,
অকথ্য বহু দুঃখ আছে—যা নীরবে সইতে হয়
কেন না, মানুষও প্রকৃতির ক্রীতদাস।

জাগরণ

শিবদাস চক্রবর্তী

আমাদের এই জাগরণ—
এ এক প্রত্যয় থেকে আর এক প্রত্যয়ে উত্তরণ।
সত্য-শিব সুন্দরের ধ্যান-ভাঙা চোখে
অতর্কিতে জেগে-ওঠা সংশয়ের বিমূঢ় আলোকে
কণ্ঠে নিয়ে নব অঙ্গীকার
না করে স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহ্যের পূর্ণ প্রত্যাহার।

আমাদের এই জাগরণ—
এ শুধু প্রস্তুতি নয়, সুকঠোর আত্মসমীক্ষণ।
এখনো আদিম বর্বরতা
আশ্চর্য! বিঘ্নিত করে দেশে দেশে শান্তি ও সখ্যতা।

এখনো সাম্রাজ্যবাদী লোভ
বিশ্বব্যাপী গণচিত্তে জাগায় বিক্ষোভ।

এতকাল ধরে যারা মৈত্রী আর প্রীতির পূজারী,
বুদ্ধ-গান্ধী-কবিগুরু যে জাতির পথের দিশারী—
তাকে আজ নিতে হবে কঠিন শপথ
মাত্র হে স্মরণে রেখে জাতীয় আপৎ।
প্রাণ বলো, মান বলো, সবচেয়ে খাঁটি—
জীবন্ত জাতির কাছে, স্বদেশের মাটি।

একটি মুখ

সুধাংশু দে

প্রশ্ন ছিল অনেক
প্রশ্নের পর কেবলি প্রশ্ন···
হাট বসেছিল আকাশে অগুণতি তারার
কেবা কার খোঁজ রাখে···
চলার পথে ভিড় ঠেলে
ভেসে উঠেছিল বিচিত্র কত মুখ
কি বলতে চায় কেইবা জানে···
অনেক প্রশ্নের পর একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে
কে দেবে উত্তর তার!
অনেক তারার মধ্যে রাত্রিসিক্ত যে-তারাটি
কে দেবে সন্ধান তার!
হাজারো প্রশ্নক্লান্ত মুখ;
যে-মুখে সম্বুদ্ধ নিজেকে খোঁজে
কোন্ শিল্পী আঁকবে সে-মুখ!

শরতে আজ সোনার দিনে

সুধীর বেরা

শরতে আজ সোনার দিনে
কি সুর বাজাবো।
পরাণ খুলে আপনা ভুলে
কি গান বা গাবো।
সোনার রঙে আকাশ সোনালি
শ্যামলে আর সবুজে ভাই
দেখ রে মিতালি—
বনে বনে।
দশদিকে ঐ সুর জাগালো
পাখির কাকলি॥
জগৎ জুড়ে ঐকতানের
মহাসভাতে—
আমি সেথায় ভগ্ন বীণায়
কি সুর বাজাবো।
তন্ত্রীছেঁড়া পরাণ খুলে
কি গান বা গাবো॥
ঝর্ণা যেথায় কলকলিয়ে
সুর মিলিয়ে যায়,
ভ্রমর মাখে গুঞ্জরিয়া
ফুলের রেণু গায়,
পাহাড় কোলের বিজন বনে—
নাচে হরিণী।
আমি সেথায় ভগ্ন বীণায়
কি সুর বাজাবো।
তন্ত্রীছেঁড়া পরাণ খুলে
কি গান বা গাবো॥

পারি নি

সুধীরকুমার গংগোপাধ্যায়

তবু বেদনার রেশ থাকে মনে,
তবু লোভ, তবু ভয়।
জীবনে যতই পড়ে পড়ে থাকি
পিছনে—ততই বলেছি মনকে
নির্বেদ হও, পলায়ন করো।
দু'হাতে সরাও দুঃখ তোমার;
যেন কিছু নয়, কিছু নয় এরা—
যেন আমি খুশি, সকালবেলার
হাসির মতন, আলোর মতন
আমি উজ্জ্বল, আমি সমাহিত।
সব বেদনার উপরে আমার
মনের শান্তি, সব পরাজয়
মিথ্যে আমার চিত্ত জয়ে।
যতই বোঝাই মনকে তবুও—
তবু থাকে ব্যথা, নিজেরে ব্যর্থ
ভাবিবার ভুল তবু লোভ আনে;
হীনমন্যতা কাঁটার মতন
তবু থেকে যায়।

মিছিল

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন জীর্ণ নগ্ন অস্থিসার দেহ,
হাতে হাতে ধরাধরি সংখ্যাতীত নারী আর নর
চলেছে মিছিল করে। শুষ্ককণ্ঠে
ফোটে না'ক স্বর,
তবুও চীৎকার করে, কি যে বলে বোঝে না
তা কেহ।

দুরন্ত মধ্যাহ্ন সূর্য ছড়ায় অনল অনুলেহ···
গাড়ি ঘোড়া, লোকজন, তবু যে নিঝুম শহর,
হঠাৎ তরঙ্গ আসে, আসে যেন মানুষের ঝড়
বুকের কপাট ভেঙে দাবী করে তোমাদের স্নেহ!

কোথায় একান্তে ছিল এত লোক দৃষ্টি অগোচরে
বিস্মিত শহর ভাবে, অচেনার আলো-অন্ধকারে
পিছনেতে ফেলে-আসা অতীতের আদি
আপনারে
আপনি তাকিয়ে দেখে। মিছিলের শ্রান্ত
পদভরে
সভ্যতার শবযাত্রা চোখে কারো পড়ে কি
না পড়ে,
শতাব্দী লুকিয়ে শুধু একা একা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র

প্রতিমা রায়

সম্রাট! তোমারে করেছি আমি
নিঃস্ব এক ভিখিরী সমান,
তুমি মোরে দেছ রাজপাট,
ধরণী করেছ মোরে দান।
তবু দান রাখে নাই কিছু
নিঃশেষিয়া হইয়াছে শেষ
তাই ক্ষত্র রাজদেহে আজ
উঠিয়াছে নব চীরবেশ।
হাতে ধরি জায়া-পুত্রে তব
দাঁড়ায়েছ পথ 'পরে আসি
তথাপি দিয়েছি ব্যথা রূঢ়
তীব্র-ভাষে কহিয়াছি হাসি
এ নহে তোমার স্থান রাজা—
এ যে তব দান কন্যা ভূমি
চলে যাও বারাণসীধামে
এ ধরণী ছেড়ে যাও তুমি।
নতশিরে বন্দি এ চরণ
মৌন মুখে গিয়েছিল চলে
স্পন্দিত হয়েছিল দেশ
ব্যথাহত ক্রন্দনের রোলে।
কত অল্প সময়ের মাঝে
করেছিলে কত বড় কাজ
তখনো যে এ পাষাণ মনে
জাগে নাই তৃণসম লাজ।
এইখানে হয় নাই শেষ
দুঃখ তব ছিল আরো বাকি
রোহীদাস সহ শৈব্যা তুমি
বেচি দিলে ব্রাহ্মণেরে ডাকি।
দুঃখ তব দুঃখ হয় নাই
সংযমের বরপুত্র তুমি,
কষ্টে তুমি ভ্রষ্ট হও নাই
শ্মশানে করিলে বাসভূমি।
মৃতপুত্র শোকাকুলা মাতা
দেখি তাও হও নি কাতর,
শোক-দুঃখ দারিদ্র্যে একাকী
করেছিলে জয় বীরবর।
ঋষি হয়ে বুঝি নাই আমি
হে রাজন, তোমার হৃদয়,
রাজা হয়ে করে গেলে তাই
অনায়াসে ঋষিচিত্ত জয়।।

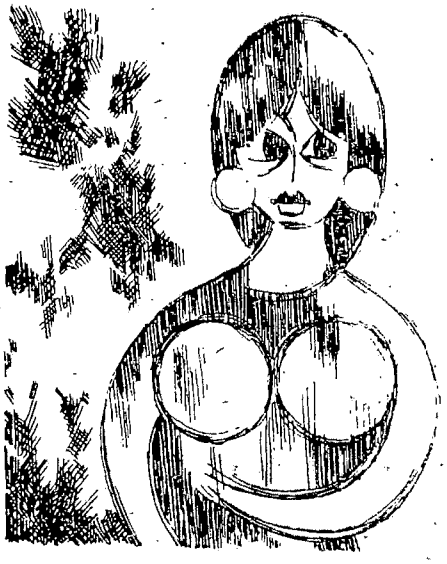

টপ্‌লেস্

বিশ্বানন্দ মুখোপাধ্যায়

অর্থাৎ মেয়েটি আলট্রা মডার্ন।
যে মেয়ে ঊনিশ শতকের
জামা-কাপড়ের পুঁটলিতে
নিজের দেহকে লুকিয়ে রেখেছিল পুতুলের মত
হঠাৎ যেন খাপখোলা তরোয়ালের মত
সেই মেয়েটিই বেরিয়ে এলো
বুকের বন্ধন খুলে।
যেন দু'টি জলপদ্ম
একসঙ্গে তার ভরা দেহের দীঘিতে ফুটে উঠলো
চারদিক থেকে লোভাতুর দৃষ্টি
আর ছি-ছি রব খবরের কাগজে।
বিংশ শতকের মেয়ে
কিন্তু কি ভীষণ শেমলেস্
তার কটীতে জাঙ্গিয়া পরা বটে
কিন্তু উপরটা টপ্‌লেস্।

◎ ◎

টপ্‌লেস্ মেয়ে।
উপরটায় একেবারে ফাঁকি এবং ফাঁকা
কিন্তু বাঁশী নয় যে, ফুঁ দিলে বাজবে
অজন্তার গুহা নয় যে, চিত্রলেখার পয়োধরে
শিল্পলোকের স্বপ্ন
কঠিন পাথর কেটে
বিন্দু বিন্দু মধু হয়ে ঝরে পড়বে!
টপ্‌লেস্!
কিন্তু নীচের দিকে একফালি ন্যাকড়া
এত আঁটোসাঁটো যে,
মনে হয় এখনি ফেটে পড়বে
আর কার্পাসের বুক-ফাটা তুলোর মত
ঊনিশ শতকের লজ্জা
বেরিয়ে আসবে বিশ শতকী জরায়ুর
ঝিনুক মার্কা আড়াল হতে!

◎ ◎

এদিকে খবর এলো :
বিকিনী দ্বীপের প্রান্ত থেকে
সমুদ্র ক্ষেপে উঠেছে
কেড়ে নেবে না কি কোমরের শেষ পর্দাটুকু
চোখের পর্দার মাথা খেয়ে ?
অথবা সচ্চরিত্র দম্পতীর রৌদ্রস্নাত দেহ
ফেনায় ফেনায় ভিজিয়ে দেবে
তপ্ত বালুবেলার
উত্তপ্ত প্রার্থনায় ?

টপ্‌লেস্ !
শুধু সমুদ্রপারের মেয়ে নয়
এই সভ্যতার পার্বত্য সমারোহ
সে-ও টপ্‌লেস্ ।
আছে তার অতল গহ্বর
আছে তার বিচিত্র মুখব্যাদন
কিন্তু মাথা ? মাথা কই ?
এ দুর্বার ধনতান্ত্রিক সভ্যতা
মুণ্ডহীন স্কন্ধের মত
লাখ্ লাখ্ মানুষকে
পিলে খাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে—
ওই টপ্‌লেস্ মেয়েটা
ড্রেন পাইপ-পরা ছেলেটার মতই
একসঙ্গে এই সভ্যতার বাসরঘরে
—বাসরঘরে নয়,
যন্ত্রশালার লাখ্ লাখ্ টাকার
চাকার তলায়
বিচিত্র আলিঙ্গনে চাপা পড়বে ।
আর বিট্‌লে কবিদের মত ড্রেনের দুর্গন্ধে
মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে !

কিন্তু এই সভ্যতার শেষে
এই শতাব্দী পার হয়ে
আমরা কি আবার ফিরে যাবো
সেই আদিম যুগের বন্য যুবতীর
টপ্‌লেস্ বুকে ?
কারণ, এই সভ্যতার শিরঃপীড়া
মুদ্রার মালিশে আর সারবে না,
অতএব তার মুণ্ডু কেটে
টপ্‌লেস এই শতাব্দীকে
ভাসিয়ে দাও বিকিনীর জলে !
—যেখানে এ যুগের নির্লজ্জ তরুণী
নগ্ন সন্তরণে
উন্মত্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে !

ছোটদের পাতা

পরিচালক : বিষ্ণুশর্মা

এলেন দশভুজা

'রাত পোহাল ফর্সা হ'ল লাইন দিতে যারে
ওঠ্‌রে সোনা ছুট্টে যানা, নইলে পাবি নারে।
ভোরেই উঠে যাই যে ছুটে দাঁড়াই সারি সারি
গল্প শুনি, পহর গুণি, বখনো মারামারি।
এমনি করে লাইন ধ'রে দিন এগিয়ে চলে,
হঠাৎ দেখি তাই তো একি, সোনালী রোদ ঝলে
বর্ষা শেষে শরৎ এসে ভুলিয়ে দিল সব,
চারদিকেতে সমারোহ পূজার কলরব।
লাইন দিয়ে সবাই মিলে করব মোরা পূজা,
বছর পরে মোদের ঘরে এলেন দশভুজা!

—বিষ্ণুশর্মা

বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকাল। বাংলা দেশের সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। বর্গীদের হাঙ্গামা দেখা দিল সে-সময়।

মধ্য-ভারতের রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার সুদক্ষ রণকুশলী সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত সহ বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হইল। অত্যাচারের পর অত্যাচার, লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠন, গ্রামের পর গ্রাম আগুনের লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত করিয়া বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হইল। যখন এই সংবাদ নিরীহ প্রজাদের কানে পৌঁছিল, তখন তাহাদের ভয় ও ত্রাসের অন্ত রহিল না।

সকলের মুখে এক কথা—রাজ্য যে যায়-যায়! দলে দলে তাহারা রাজ-দরবারে আসিয়া মহারাজের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইল। প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সৈন্য ও সেনানায়কেরা আসিয়া সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

ভক্তরাজা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমরা কেন এত ভয় পাচ্ছো? তোমাদের এখন একমাত্র কাজ হবে রাজ্যের জাগ্রত দেবতা, বিপদভঞ্জন মদনমোহনকে প্রাণভরে স্মরণ করা—আকুল হৃদয়ে ডাকা। পবিত্র হরিনামে মাতিয়ে তোল বিষ্ণুপুরের পথ-ঘাট—তিনিই একমাত্র দেবতা যিনি তাঁর অপার করুণাবলে নিরাপদ আশ্রয়ে সবাইকে স্থান দিতে পারেন। দেখবে বিপদের মেঘ কেটে গিয়ে আবার গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবে।

সারা শহরে তিনি ঢেঁড়া পিটিয়ে নগরবাসীদের আশুকর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া নরনারী সব একযোগে মিলিত হইয়া পথে পথে হরিনাম কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্ত বিনম্র হৃদয়ের জয় মদনমোহন, জয় মদনমোহন ধ্বনিতে বিষ্ণুপুরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। মহারাজের বাইশ হাজার মুলকী ভৃত্যেরা তাহাদের হাতিয়ার ফেলিয়া দিয়া এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিল।

॥ দুই ॥

রাত্রির অন্ধকারে দুঃস্বপ্নের মতো বর্গীরদল বিষ্ণুপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিল। শহর হইতে কিছুদূরে নদীর বাঁকে প্রশস্ত মাঠে তাহাদের আস্তানা। দলপতি পদে রহিয়াছেন ভাস্কর পণ্ডিত।

কয়েকদিন পরেই অতর্কিতে দলবল লইয়া বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিল। আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য রাজ্যের কেহই প্রস্তুত ছিল না। স্বয়ং রাজা গোপাল সিংহ তো এ ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

ভাস্কর পণ্ডিত যখন অমিতপরাক্রমে অগ্রসর হইতেছিলেন···তখন বহুদূর হইতে শুধু ভাসিয়া আসিতেছিল ঘন ঘন হরিনাম ধ্বনি—আর বারবার এইবার রাখ মদনমোহন গুণমণি গানের মধুর সুর-লহরী।

রঘুজী ভোঁসলে সুযোগ্য সেনাপতি সহসা থমকিয়া গেলেন—তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হলো এক অলৌকিক দৃশ্য। অশ্বের বল্গা টানিয়া তিনি নামিয়া পড়িলেন। হঠাৎ এক তীব্র আলোর কণায় তাঁহার চোখ দু'টি ঝলসিয়া গেল।

পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলেন নীল পোষাক পরিহিত এক অশ্বারোহী খুরে ধূলা ছুটাইয়া গড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখনই ভাস্কর পণ্ডিত বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সৈন্যগণ, তোমরা যেমন করে পার, ঐ ছুটন্ত ঘোড়সোয়ারের পেছনে আরো জোরে ঘোড়া চালিয়ে ধরে নিয়ে এসো লোকটাকে আমার সমুখে।

কিন্তু সেই ঘোড়সোয়ারকে ধরিবে কে? সে নিমেষে আকাশের ভাসমান মেঘের মতো কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভাস্কর পণ্ডিত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না—কে এই দুঃসাহসী বীর। সে-সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজাদের ছিলো অনেক কামান ও বন্দুক। তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম ছিলো দলমাদল।

দেখিতে দেখিতে দলমাদল কামান হইতে অজস্র গোলার বর্ষণে বর্গীরা দলে দলে প্রাণ হারাইতে লাগিল। মৃতদেহের স্তূপে স্থানটি পূর্ণ হইল। তোপের মুখে আর তাহারা বেশিক্ষণ তিষ্ঠাইতে পারিল না। বিষ্ণুপুর জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিত নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বর্ধমানের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

তারপর···

রাজা গোপাল সিংহ সদলবলে মদনমোহনের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জয় মদনমোহন রবে অগণিত নরনারী আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন ঃ

সুকোমল অঙ্গে পরিশ্রম
কৈলে মদনমোহন
আপনার গড় রাখলে প্রভু,
আপন লুপ্ত বৃন্দাবন॥

সত্যি কথা

শ্রীঅতীন মজুমদার

মুখে তে তোর লেগেই আছে ভগবানের নাম,
কিন্তু দুধে জল ঢেলে স্রেফ নিস্ যে খাঁটি দাম
বল্ তো বাপু সত্যি করে কোন্ দেশী এ ধর্ম,
কোন্ বিবেকে করিস্ রে তুই এমন অপকর্ম?
ভগবান তো দেখেন ঠিকই, কেউ না দেখুক আর,
পরকাল তো আছে জানিস,—
নেই কিরে ভয় তার?

রাম রাম রাম—জিভটা কেটে
গয়লানী কয়,—দাদ,
সত্যি কথাই বলছি আমি মানুষ সিধে-সাদা,—
দুধেতে জল দিই না মোটেই—ভগবানই জানেন,
জলেতে দুধ দিই বটে, তা'
জানেন আর না-মানেন।

ছোট্ট মেয়ে মিনকুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন খুব ভোরে মা গঙ্গাস্নান করতে যান—তখনও বাড়িতে কেউ জাগে না। সঙ্গে যায় দাসী রামপিয়ারীর মা—বহুকাল সে মায়ের কাছে আছে, মায়ের সব কাজ করে।

মেয়েটিকে মা কাছে ডাকেন—দ্বিধাহীন-ভাবেই কাছে দাঁড়ায় সে। তার পরিচয় নেন মা—।

শোনা যায়—তার এক কাকা তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে কোথায় চলে গেছে—বলে গেছে এই বাড়িতে এক মা আছেন, তিনি তাকে জায়গা দেবেন।

সুদূর বাঁকিপুরের কোন এক গ্রামে তাদের বাড়ি। মা নাই, পিতা থাকলেও সে কোথায় থাকে কি কাজ করে তা সে জানে না। কাকার কাছে ছিল, কাকা কলকাতায় এসে তাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে, সেই জন্যই এখানে তাকে রেখে গা ঢাকা দিয়েছে।

করুণাময়ী মা আশ্রয় দিলেন মিনকুকে। ময়লা ফ্রকপরা আট-নয় বৎসরের একটি মেয়ে। তৈলবিহীন মাথায় একরাশ চুল, গায়ের রং কালো, শুষ্ক চেহারা, দেখলে মমতা হয়।

মা তাকে রীতিমত মানুষ করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। ছোট পৌত্রী রুণুর ফ্রক তাকে দেওয়া হল, আপাদমস্তক সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে মাথায় তেল দেওয়া হল, মাথায় চিরুণীও পড়লো।

বড়ছেলে পুলিস অফিসার শ্রীকান্ত আহার করতে বসে দেখতে পেলেন মিনকুকে—তার পরিচয় নিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন, দরজায় কুড়িয়ে-পাওয়া একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি যা কাণ্ড করছো মা,—দেখো যেন পস্তাতে না হয়।

মা অবাক হয়ে যান! বললেন, পস্তাতে হবে কেন?

শ্রীকান্ত বললেন, পুলিসে কাজ করে অনেক কিছু জেনেছি মা। চোর-ডাকাতের দলে এ রকম ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকে অনেক সময়, এরা এমনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয় যাতে সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায় না। অজ্ঞাতকুলশীল একটা মেয়েকে তুমি যেরকম অবাধ স্বাধীনতা দিচ্ছো,—সে আবার সর্বনাশ না করে; তাই বলছি—ভেবে কাজ করো।

মা হাসেন, বললেন, কি যে বলিস বাপু তুই,—এইটুকু মেয়ে নাকি ডাকাতদলে গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। না বাপু,

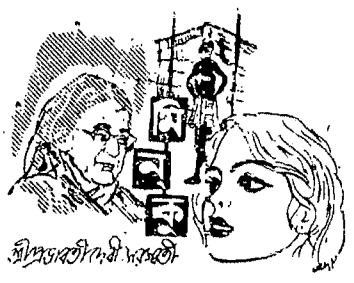

ও সব খারাপ চিন্তা করিস নে। মেয়েটা সত্যি ভালো,—ওকে মানুষ করতে দে।

শ্রীকান্ত আর কথা বলেন না।

মিনকু থেকে গেল।

দিন পনেরো যেতে না যেতে তার চেহারার অনেক উন্নতি দেখা গেল,—প্রকৃতিও অনেক বদলে গেল। শ্রীকান্তের কন্যা রুণুর মিনকু না হলে চলে না। স্কুলে যেতে আসতে তার সঙ্গী মিনকু, বাড়ির কাছেই স্কুল থাকায় দুপুরের টিফিনটাও মিনকু পৌঁছে দিয়ে আসে।

স্কুলে রুণুর ক্লাস-রুমের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেখে, তারও ইচ্ছা হয় সে লেখাপড়া শেখে, কিন্তু এ কথা রুণু ছাড়া আর কাউকে বলতে পারে না।

অবশ্য অবসরমত গোপনে রুণু তাকে একখানা বই যোগাড় করে পড়ায়। ক্লাস থ্রির মেয়ে সে,—সমবয়স্কা হলেও শিক্ষাদানের সময় সে গম্ভীরভাবে থাকে।

মিনকুর উপর বাড়ির সকলেরই স্নেহ পড়েছে। আহা, জগতে কেউ আপনার লোক নাই, বড় হতভাগা মেয়েটা—থাক এখানে, পাঁচজনের সঙ্গে মানুষ হোক।

কিছুদিন বাদে—হঠাৎ ছোটভাই সুশান্তের দামী ঘড়িটা টেবিলের উপর হতে কোথায় উধাও হয়ে গেল, অনেক খোঁজ করেও পাওয়া গেল না। দাস-দাসীদের অনেক জেরা করলেন শ্রীকান্ত যদিও তারা অনেক-কালের পুরাতন লোক, তবু বিশ্বাস তো করা যায় না।

মিনকুকে জেরার মুখেই তার কান্না দেখে থমকে গেলেন পুলিস-অফিসার শ্রীকান্ত।

রুণু দৃঢ়কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলো—না বাবা, মিনকু কক্ষণো নেয় নি, ওর অত ছোট নজর নয়। তা ছাড়া ও ঘড়ি নিয়ে কি করবে?

মাও সেই কথা বলেন, রুণুর মাও বাধা দেন। থেমে যেতে হল—তবু সন্দেহ যায় না শ্রীকান্তের। মেয়েটা রুণুর সঙ্গে স্কুলে যায়-আসে, দুপুরে টিফিন নিয়ে যায়, কে জানে কারও সঙ্গে পথে মেশে কি না।

মাঝে মাঝে বাড়ি হতে টুকরো অথচ বেশ মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যায়। শ্রীকান্তের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়।

অথচ শিশুর মত সরল মেয়েটি তাঁর রুণুর সঙ্গে খেলা করে, সন্দেহ হলেও ধরা যায় না।

সেদিন রাত্রে—

শ্রীকান্ত তখনও জেগে—ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে তিনি জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন।

পাশের ঘরে খুট করে দরজা খোলার শব্দ হয়, কে যেন বার হয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দরজা খোলে।

সন্দেহ হয় শ্রীকান্তের, সন্তর্পণে দরজা খুলে রিভলভার নিয়ে তিনি বার হন।

ছোট্ট মানুষটি অন্ধকারে রেলিং ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। পিছনে পিছনে অতি সন্তর্পণে নামেন শ্রীকান্ত।

নিচেয় এসে পৌঁছালো মিনকু। দরজায় ভিতর হতে চাবি দেওয়া থাকে, এ চাবি থাকে মায়ের কাছে। মায়ের ঘরে মিনকু শোয়, কাজেই চাবি সংগ্রহ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয় নি।

ছোট হাতে অন্ধকারেই তালায় চাবি গলাতে চায় সে, বাইরে তখন ফিস ফিস করে কারা কথা বলছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে—

শক্তভাবে মিনকুর হাত চেপে ধরেন শ্রীকান্ত। ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মিনকু—

চুপ—চুপ কর রাসকেল—

তার চুলগুলো মুঠো করে ধরেন শ্রীকান্ত—সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করেন। সমস্ত বাড়িখানা মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। শ্রীকান্তের আহ্বানে সবাই নেমে এলো।

এ কি—মিনকু? মা আর্তনাদ করে ওঠেন, রুণু দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে।

বাইরের লোকেরা ততক্ষণ পালিয়েছে, বাইরেও প্রতিবেশীরা এসে পড়েছে।

শ্রীকান্ত বললেন, হ্যাঁ, এই তোমাদের মিনকু। ছয় মাস আগে মিনকু যখন এলো তখনই আমি তোমাদের সতর্ক করতে গিয়েছি কিন্তু তোমরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। এই মিনকু একটা ডাকাতদলের স্পাই। লোকের বাড়িতে এসে বিশ্বাস

উৎপাদন করে, ছোটখাটো জিনিস সরায়। আজ আমি ব্যাঙ্ক হতে টাকা তুলে এনেছি, রুণুর কাছে মিনকু তা শুনেছে। দলের পাণ্ডা এরই বাপ, প্রতিদিন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছে মিনকু টাকার কথা বলেছে। ওরা ঠিক করেছিল মিনকু রাত্রে দরজা খুলে দেবে, কয়েকজন ভেতরে ঢুকে সব লুটপাট করবে। মিনকু জানে আজ আমি বাড়ি থাকব না; নাইট ডিউটিতে যাব। কত নিশ্চিন্তভাবে এরা কাজ করছে দেখেছো? ছোট্ট মেয়েকে আর তোমরা বিশ্বাস করবে? বলতে বলতে তিনি মিনকুর চুল ধরে ঝাঁকুনী দেন, মিনকু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে।

মা তাকে পুত্রের হাত হতে ছাড়িয়ে নেন। বলেন, আজ থাক, কাল সকালে যা করবার করিস বাপু, এ রাত্রেই এইটুকু মেয়েটাকে আর মারধর করিস নে।

মিনকুকে নিয়ে তিনি উপরে যান।

দু'হাত দিয়ে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে ছোট্ট মেয়ে মিনকু—খালি বলে, আমার বাবা আমায় মেরে ফেলবে। আমি আসতে চাই নি, আমায় খেতে দিত না, মারধর করতো; তাই আমি এ কাজ করতে রাজী হয়েছি ঠাকুরমা।

মায়ের মন বিগলিত হয় করুণায়।

শ্রীকান্তকে বললেন, এবারটা ওকে ক্ষমা কর শ্রীকান্ত, ওকে দেখলেই ওর বাবা মেরে ফেলবে—মারাটাও আশ্চর্য নয়। আমি আর ওকে বাইরে পাঠাব না, বাড়িতেই থাক, লেখাপড়া করুক মানুষ হোক।

রুণুর সমবয়সী এতটুকু মিনকু কতই বা বয়স, মাত্র নয় বৎসর যদি হয়—শ্রীকান্ত বিচলিত হন।

সুশান্ত অভয় দেয়—আমি ওকে পড়াব দাদা—যে কোন জায়গায় আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি বাপু আর বাড়াবাড়ি করো না, একটা বাচ্চা মেয়ে, আমাদের রুণুরই মত। ওকে মানুষ হতে সুযোগ দাও, একবার পরীক্ষা কর।

শ্রীকান্ত বললেন, বেশ, কিন্তু ওকে ভাল করে বলে দাও, এবার কিছু হলে আমি ওকে থানায় পাঠাবো।

ছোট্ট মেয়েটি তখন চোখ মুছচে।

* * *

সেই মিনকু এখন সত্যই মানুষ হয়েছে। কৃতিত্বের সঙ্গে সে প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। রুণুর আনন্দের শেষ নাই। মিনকুর কৃতকার্যতায় যেন তারই গৌরব।

মা বলেন, যাক—একটা মেয়ে তো মানুষ হল। বি, এ, ডিগ্রিটা নিলে ওর যদি ইচ্ছা হয় বিয়ে দেব।

মিনকু মাথা নাড়ে—না ঠাকুরমা,—আমি রুণুর সঙ্গে আরও পড়ব, এম, এ, ডিগ্রি নেব, আমি মানুষ হতে চাই, বিয়ে আমি করব না।

পরম স্নেহে শ্রীকান্ত রুণু ও মিনকুকে কাছে টেনে নেন—বলেন, হ্যাঁ; আমার দু'টি মেয়েই যেন এম, এ, ডিগ্রি নিতে পারে—আমিও তাই চাই।

সেই ছোট্ট মিনকু আজ একেবারে বদলে গেছে।

আমাদের হাবুলকে নিয়ে গোটা ইস্কুলের ছেলেরা একেবারে হিম্‌সিম খাচ্ছে।

ও যখন খুব নীচু ক্লাশে পড়ে—তখন থেকেই ওর মনের কোণে একটা আশা বাসা বেঁধেছে—ও সবাইকার নেতা হবে।

ইস্কুলের ছুটির পর মাঠে যখন খেলাধুলা চলে—সেই সময় হাবুল পাশের বকুল গাছটার একেবারে মগডালে উঠে সবাইকে আদেশ দেয়—কিভাবে খেলাটা চালনা করতে হবে।

ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, উত্তর দেয়, আমার মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি আমি। আমি যেন একদল বীর সৈনিককে সংগ্রামের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলছি।

এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও সৈনিকদল জয় তোমাদের অনিবার্য।

তখন আর আমি হাবুল থাকি না, নেপোলিয়ান কিম্বা তৈমুরলঙ হয়ে পড়ি—!

হাবুলের এইজাতীয় কথা বলবার ধরণ দেখে ছেলেরা হাসতে থাকে। অনেকে ফোড়ন কেটে বলে,—হ্যাঁ, সত্যিকারের সেনাপতি বটে!

হাবুল ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে শুধু যুদ্ধের কাহিনী পড়ে।

আর সব ছেলেরা পড়ে ভূতের গল্প কিম্বা গোয়েন্দা-কাহিনী। কিন্তু হাবুলের হাতে রয়েছে নানা দেশজয়ের কথা। বিভিন্ন অঞ্চলের বীরত্ব-কাহিনী আর সংগ্রামের কথা। ও যখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই সব বীরত্ব-কাহিনী পড়ে, তখন নিজের অজান্তে সেই সময়ের সেনাপতি কিম্বা নেতার আসন গ্রহণ করে বসে। পড়তে পড়তে হঠাৎ বই বন্ধ করে উল্লাসে আস্ফালন করে, অগ্রসর হও সৈনিকগণ, ওই দুর্গশিরে আমাদের পতাকা তুলে ধরতে হবে।

বাড়ির লোকেরা হাবুলের এই হুঙ্কার শুনে বলে, ওই যে আবার সুরু হল যুদ্ধ!...

সত্যি, যুদ্ধই বটে!

হাবুল রাত্রে ঘুমের মধ্যেও যুদ্ধ করে।

বিপক্ষদলের সেনাপতি তাকে আক্রমণ করেছে। চলেছে তরোয়ালে-তরোয়ালে তীব্র সংগ্রাম। কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারছে না। এমন সময় সেনাপতি হাবুলের ঘোড়াটা হোঁচট্ খেয়ে পড়েই একেবারে অক্কা পেলে। বিপক্ষদলের সেনাপতি এসে ওর বুকে সোজাসুজি তরোয়ালটা একেবারে বসিয়ে দিচ্ছে,—প্রাণের ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে হাবুল...সেই চীৎকার শুনে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে গেছে।

হাবুলের জ্যাঠামশাই চোখ কচলে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, হুঁ! বুঝতে পেরেছি। আমাদের হাবুল সেনাপতির সংগ্রাম সুরু হয়েছে মাঝরাত্তিরে। এই বলে তিনিও মাঝরাত্তিরে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে সুরু করে দিলেন।

এইভাবে সেনাপতি হাবুলের সংগ্রাম-মুখর দিনগুলি এগিয়ে চলে।

ইস্কুলের একটা 'ম্যাগাজিন' ছেপে বের করা হয়। তাতে হাবুলের বন্ধুরা কেউ লেখে

কলকাতা কেউ গল্প, প্রবন্ধ কেউ বা প্রবন্ধ কাটছিল।

কিন্তু হাবুল সেখানে নেই।

হাবুল বলে, ওতে অকারণ সময় নষ্ট হয়।

হাবুল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে গিয়ে ধরে, আমি নিজে প্রতিদ্বন্দ্বী বিপক্ষদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবো, তারই একটা ফটো পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে হবে।

হাবুলের প্রস্তাব শুনে ইস্কুলের ছেলের দল কানাকানি আর হাসাহাসি সুরু করে দেয়।

হাবুল দুঃখ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

—হায় রে! এই করে বাঙালী ছেলেরা ভীতু আর কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে!

হাবুলের কাতর-ক্রন্দনে কেউ কর্ণপাত করে না।

বিদ্যালয়ে বন-মহোৎসব হবে।

অনেকরকম গাছের চারা নিয়ে আসা হয়েছে। শিক্ষকরা কিছু চারা পুঁতবেন, আর ছেলের দল বিভিন্ন ব্লক আর খেলার মাঠের চারপাশে নানা জাতীয় চারা লাগিয়ে দেবে।

হাবুলের ওপর ভার পড়েছে—খেলার মাঠের ধারে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা পুঁতবার। সবাইকার অজান্তে হাবুল তার এক জানা-শোনা ফটোগ্রাফারকে জোগাড় করে এনেছিল।

সেই ফটো নিয়ে হাবুল ম্যাগাজিনের ছাত্র-সম্পাদককে ধরেছে—ভাই, এই বন-মহোৎসবের ফটোটা আমাদের পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে হবে।

ছেলেটি তাকিয়ে দেখে, স্বয়ং হাবুলচন্দ্রের বৃক্ষরোপণের দৃশ্য। একটি ছেলে তার মাথার ওপর ছাতা ধরেছে, মালির কাছ থেকে গাছেতে জল দেবার ঝারিটি জোগাড় করে আর একটি ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে,—আর বিজয়ী বীরের মতো স্বয়ং হাবুল গাছের চারা রোপণ করতে যাচ্ছে।

ছেলেটি তখন ফটোখানি দেখে হেসেই খুন! বললে, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার!

—কি! আমাকে নিধিরাম সর্দার বলা! হাবুল একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

তারপর কথা কাটাকাটি আর বেশিদূর এগুলো না। হাবুল গিয়ে সটান ছেলেটিকে জাপটে ধরল।

তারপর সুরু হ'ল মারামারি।

সেনাপতি হাবুলের সঙ্গে সেই রোগা-পটকা সম্পাদক পেরে উঠবে কেন?

[illegible]

সেই থেকে সেদিন পর্যন্ত হাবুলকে আর কেউ ঘাটায় না।

সব থেকে মজার ব্যাপার,—ম্যাগাজিন যখন ছেপে বেরুল,—সবাই অবাক হয়ে দেখলে, হাবুলের বন-মহোৎসবের ফটোটি ছাপা হয়েছে।

সেই ফটোতে হাবুল মুচকি মুচকি হাসছে। যাক্! তাহলে লড়ায়ের পর দুই জনের সন্ধি হয়ে গেছে ইস্কুলশুদ্ধ ছেলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এই ঘটনার মাস দু'য়েক পর একটা ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ এলো।

পাশের গ্রামের বিদ্যালয়। তারা হাবুলদের ইস্কুলকে আহ্বান জানিয়েছে—ফুটবল ম্যাচ দিতে।

চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ছেলেদের খেলোয়াড়দলের যে ক্যাপ্টেন—তাকে গিয়ে হাবুল ধরে বসল, ভাই, আমাকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড করে নিয়ে যেতে হবে। একবার লড়ে দেখবো।

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, আ রে হাবুল, তুই ত' চিরদিন সেনাপতিত্ব করে এসেছিস! ফুটবল খেলার তুই কি জানিস?

সঙ্গে সঙ্গে হাবুল গরম হয়ে উঠল। বললে, নিবি কি না বল আমাকে?

ক্যাপ্টেন সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সামনে এতবড় একটা ম্যাচ। এর ওপর ইস্কুলের সুনাম-দুর্নাম নির্ভর করছে, পাগল ক্ষেপিয়ে কোনো লাভ নেই। হাবুল সেনাপতি হঠাৎ ঘুষি চালিয়ে দেবে কি না—তাই বা কে বলতে পারে?

তাই ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে নিয়ে যাবো বৈ কি! ফুটবল ম্যাচও ত' একটা রীতিমত লড়াই। তার ভেতর সেনাপতি না থাকলে চলে?

শুনে খুশি হল হাবুল সেনাপতি।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সজোরে হ্যাণ্ডসেক্ করে বললে, আর তা ছাড়া বিপদ-আপদ কোথা থেকে আসে কেউ বলতে পারে? একজন নেতা কিম্বা সেনাপতি সঙ্গে থাকা খুবই দরকার।

ক্যাপ্টেন দেঁতো হাসি হেসে উত্তর দিলে, ঠিক! ঠিক!

শিস দিতে দিতে সহাস্যমুখে নেতা হাবুলচন্দ্র পোষাক ঠিক করতে চলে গেল।

যথা সময়ে নির্দিষ্ট মাঠে ফুটবল খেলা সুরু হল।

হাবুলের ইস্কুলের ছেলেরা খেলাধুলাতে এমনিতেই বেশ চৌকস। ওই অঞ্চলে ফুটবল খেলায় তাদের বেশ সুখ্যাতি আছে।

প্রথম দিকে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে এমনভাবে চেপে রেখে দিলে যে, ওরা মাঠের অর্ধেক-অংশ ছাড়িয়ে এদিকপানে গা বাড়াবার সুযোগই পেলে না।

তারপর পর পর দু'টো গোল পাশের গাঁয়ের ইস্কুলকে দিয়ে দিলে।

চারদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেন না, হাবুলরাই শত্রু-অঞ্চলে এসে পড়েছে। চারদিকে ওদেরই সমর্থক। ওরা ক্রমাগত আপত্তি জানিয়ে গোলমাল সুরু করে দিল। একদল স্থানীয় ছেলে বললে, রেফারীর মীমাংসা ঠিক হয় নি। আবার নতুন করে খেলা সুরু করতে হবে।

কিন্তু হাবুলদের ইস্কুল সে-দিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে খেলা চালিয়ে যেতে লাগলো, আর সেইসঙ্গে বিপক্ষদলকে আরও একটা গোল খাইয়ে দিলে।

তখন কে কার কথা শোনে!

বিপক্ষদল বোধকরি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। মাঠের পাশে একটা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা ছিল একটা পাগলা ষাঁড়। দু'টি ছেলে গিয়ে সেই ষাঁড়টাকে মাঠের মাঝখানে ছেড়ে দিলে।

এখন মুস্কিল হয়েছিল এই যে, হাবুলদের দলের ইউনিফর্মের রঙ ছিল লাল। পাগলা ষাঁড় বেছে বেছে সেই লাল রঙের দিকে ধাওয়া করলে, আর দুই-একজনকে কাৎ করে ফেললে।

ততক্ষণে হাবুলের মগজে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি এসে বাসা বেঁধেছে।

সে মাঠের মাঝখানে এসে একটা লাঠি হাতে দাঁড়াল। তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠল—

সৈন্যগণ, অগ্রসর হও—এ যুদ্ধ আমাদের জিততেই হবে। বিপক্ষদল রণক্লান্ত,—তাদের সবাই একযোগে আক্রমণ করো। পাগলা ষাঁড়কে সাম্‌লাবো আমি—সেনাপতি নিজে।

হাবুলের রণহুঙ্কারে দলের ছেলেদের মনোবল ফিরে এলো। তারা আশে-পাশের গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এমন তীব্রগতিতে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করলে যে, তারা অনেকেই আহত হয়ে রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল।

এগিয়ে [illegible] তরবারি [illegible] আক্রমণ [illegible] আক্রমণ করবার সুযোগ [illegible]

হঠাৎ দেখা গেল, সেনাপতি হাবুল অপূর্ব কৌশলে ষাঁড়ের একটা চোখের ভেতর লাঠিটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পাগলা ষাঁড় তখন প্রাণের দায়ে-পালাতে পথ পায় না! যুদ্ধে জয়লাভ করে হাবুলের দল বিজয়গর্বে নিজেদের গ্রামে ফিরে এলো।

সেনাপতি হাবুল এসে ঘোষণা করল,—সমর-জয়ের বিজয়োৎসব করতে হবে—

এ যুগের বিজয়োৎসব হচ্ছে নাট্যাভিনয়। নাটক বাছাই করা হল—পুরুরাজের বীরত্ব। সেকেন্দার সাহ আর পুরুরাজার সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত।

সেনাপতি হাবুল বললে, আমি বীর পুরুরাজার পার্ট করবো।

সবাই বললে, বেশ হবে, ভালো হবে। পুরুরাজার বীরত্বব্যঞ্জক কথাগুলো সেনাপতি হাবুলের মুখে শোনাবে ভাল।

তখন সেকেন্দার সাহের ভূমিকা দেয়া হল ক্লাবের ক্যাপ্টেনকে।

দু'জনে রিহার্সেল যেভাবে মাতিয়ে রাখতে লাগলো—তাতে ইস্কুলের ছেলেরদল ভবিষ্যদ্বাণী করলে, ওরা দু'জনেই নাটক একেবারে জমিয়ে দেবে। আর কোনো অভিনেতার দরকারই হবে না।

দর্শকদল জুটে গেছে—অনেক। সাতখানা গাঁ ভেঙে লোক এসেছে ছেলেদের অভিনয় দেখতে।

প্রথমটা সুরু হল বেশ।

তারপর নাটকের মাঝামাঝি সেকেন্দার সার সঙ্গে বীর পুরুরাজার যুদ্ধ।

হাবুল চীৎকার করে বললে, ওরে-ওরে পররাজ্যলোভী শয়তান, আজ ভারতবাসীর বীরত্ব অবলোকন কর—

সেকেন্দার সাহ তরবারি খুলে এগিয়ে এলো, এই সময়টায় পুরুরাজা বন্দী হবে।

কিন্তু বীর সেনাপতি হাবুলকে হটায় কে? সে বললে, এসো,—রণসাধ মেটাবো তোমার—

বলে স্টেজের ওপর সেকেন্দার সার সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ সুরু করে দিলে—কিছুতেই হটবে না।

ফলে সেকেন্দার সাহকে [illegible] সুরু করতে হল। কিন্তু [illegible] করে ফুটছে—সেই হাবুল সেনাপতির সঙ্গে পেরে উঠবে কে? যুদ্ধ করতে করতে হাবুল ঘন-ঘন রণ-হুঙ্কার দিতে লাগলো।

দর্শকদলও বেশ মজা পেয়ে গেল। তারাও চীৎকার করতে লাগলো, চালাও হাবুল সেনাপতি। হাবুল যুদ্ধে হারতে জানে না। তরবারি বাগিয়ে শত্রুর গায়ে কসিয়ে দিলে।

দর্শকদল সেটাকেও মজা মনে করেছিল। কিন্তু সেকেন্দার সাহ যখন মঞ্চের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল তখন মাস্টারমশাইরা সচেতন হয়ে উঠলেন।

একজন শিক্ষক চীৎকার করে উঠলেন, ওরে—আগে ড্রপ ফেলে দে—

কিন্তু এখানে ত' ড্রপ ফেলবার কথা নয়। যার ওপর ভার—সে ফেলবে কেন?

তখন মাস্টারমশাইরা ছুটে গিয়ে জোর করে ড্রপ ফেলে দিলেন।

সবাই একসঙ্গে ছুটে গিয়ে সেকেন্দার সাহকে টেনে তুললেন।

চোট্‌টা খুব জোরই লেগেছে। সেই সঙ্গে রক্তও পড়ছে খুব।

দর্শকদলের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন।

তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন, দারুণ রক্তপাত হয়েছে। আমি ইন্‌জেকসন দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করে দিচ্ছি। কিন্তু ওর দেহে রক্ত দিতে হবে। তোমাদের মধ্যে কার স্বাস্থ্য ভাল—এগিয়ে এসো।

বীর সেনাপতি হাবুল এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

এখানেও সে রণ-হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এলো। যেন যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলে, বীর সেনাপতি হাবুল হাজির থাকতে আর কে রক্ত দেবে শুনি?

এই বলে আস্তিন গুটিয়ে তার ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে আদেশের সুরে বললে, আসুন ডাক্তারবাবু, কতটা রক্ত চাই—আপনি আপনার যন্ত্র দিয়ে তুলে নিন—!

[illegible]

[illegible] বাড়ি [illegible] আরো একটা [illegible] পড়া।

[illegible] বুঝলেন, কিছুই [illegible] ভাল না লাগছে।

[illegible] মনটা [illegible] পাশের [illegible] হয়েছিল। [illegible] গল্প কর।

দিদিমা [illegible] লোকের বাড়িতে ভালো ভোজ অনেক [illegible] পয়সা গহনা চুরি [illegible] পেরে ধরে নিয়ে [illegible] করে রাখল, আর [illegible] মারল।

বিজু বললে, না, ও ত' দুষ্টু-চোরের গল্প। তুমি লক্ষ্মী-চোরের গল্প বল। তাকে কেউ চাবুক মারবে না।

দিদিমা বললেন, এক যে ছিল লক্ষ্মী-চোর। সে ভাল ভাল খাবার খেতে খুব ভালবাসত। তার জ্বালায় সে বাড়ির গিন্নি সারাদিন খাবারঘরে তালাবন্ধ করে রাখতেন। লক্ষ্মী-চোর সুবিধা পেলেই উঁকি মেরে দেখে নিত ঘরে কি আছে। সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, দুধ, ছানা, খাবারঘরে কত কি সাজানো থাকত। লক্ষ্মী-চোর যে চুরি না করলে একেবারেই খেতে পেত না তা নয়। মাঝে মাঝে গিন্নি তাকে একটা-দু'টো সন্দেশ কি এক-আধবাটি দুধ দিতেন। কিন্তু ঐটুকুতে সে খুশি হত না। তাই মাঝে মাঝে অন্য বাড়িতেও সে খাবারের খোঁজ করতে যেত। সব বাড়িই বড়লোকের বাড়ি নয়। কাজেই সব বাড়িতেই সন্দেশ-রসগোল্লা থাকত না।

যে সব খোলা দিয়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরে সে যেত সেখানে হয়ত একটু চিংড়িমাছের টক কি পুঁটিমাছের চচ্চড়ি পাওয়া যেত। লক্ষ্মী-চোর তাই খেয়েই চুপি চুপি পালিয়ে যেত। আবার অনেক বড়লোকের তিন-চারতলা বাড়িতে লুকিয়ে খাবারঘরে ঢুকে পড়তে পারলে খাবার টেবিলের উপর ছানার পায়েস কি রুইমাছের ফ্রাই পাওয়াও

কিছু আশ্চর্য ছিল না। লক্ষ্মী-চোর খেয়ে পালাত, কিন্তু কেউ ওকে ধরতে পারত না।

বাড়ির লোকেরা যাকে সামনে পেত তাকেই ধরে বকৃত, ভাবত ওরাই বুঝি খেয়ে নিয়েছে। তারা রেগে গিয়ে ভীষণ জোরে মাথা নেড়ে বলত, কখ্খনো আমরা খাই নি। বাড়িতে চেঁচামেচি বকাবকি শুনে লক্ষ্মী-চোর লুকিয়ে-লুকিয়ে হাসত। তার আরো লোভ বেড়ে যেত। সারাক্ষণ মনে ভাবত, কি খাই, কি খাই?

বাড়ির লোকে ভালবেসে যা খেতে দিত, তাতে তার পেট ভরা উচিত ছিল। কিন্তু মনটা ভরত না, তাই ভাবত পেটও বুঝি ভরে নি। এইজন্যে সে ঠিক করলে বড় বড় নেমন্তন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ে প্রাণভরে খাবে। তাদের ত' অঢেল খাবার হয়, লক্ষ্মী-চোর যদি একটুখানি খেয়ে আসে তাতে আর কার কি ক্ষতি হবে? সে ত' আর গহনা-চুরি-করা দুষ্টু চোর নয়।

এমনি করে বিয়ের নেমন্তন্নর মাসে সে নানা বাড়িতে ঢুকে খেয়ে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ একটা বড়বাড়িতে ভাঁড়ারী বামুন ওর চুরি ধরে ফেলল। সে গুণ্ডা বামুনটার প্রাণে দয়া-মায়া নেই। সে লক্ষ্মী-চোরকে দেখেই জোরে একটা ডাণ্ডা ছুড়ে মারল। বেচারীর একটা পা ভেঙে গেল। একটু চুরি ক'রে খাওয়া ছাড়া আর কিছু ত' সে করে নি। তবু তার এমনি শাস্তি হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লক্ষ্মী-চোর গিন্নিমার বাড়িতে পালিয়ে এল। আর বাইরে যেতে পারে না, ভাঙা পা-টা ক্রমে পেকে উঠতে লাগল।

ওর কষ্ট দেখে গিন্নিমার বড় দয়া হল। আহা বেচারী ছেলেমানুষ। তিনি ওকে কোলে করে তুলে গাড়িতে চড়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলেন। মস্ত বাগানওয়ালা বিরাট একটা হাসপাতাল। কত যে রুগী এসেছে তার ঠিক নেই। তাদের এক-একজনের এক-এক রকম চেহারা। কেউ বিরাট পাহাড়ের মত কালো মূর্তি নিয়ে এসে চেঁচাচ্ছে যেন গণ্ডার, কেউ ছোট্ট এতটুকু, গলার স্বরও তেমনি মিহি। অনেক রুগী হেঁটে-হেঁটেই হাসপাতালে এসেছে, কেউ বা গাড়ি চড়ে আবার কেউ বা মানুষের কোলে চড়ে। যার বেশি কষ্ট সে চেঁচাচ্ছে, যার কম সে কিছু একটা অল্প অল্প খাচ্ছে। যার মোটরগাড়ি নেই সে রিক্সাতে এসেছে, কেউ ঠেলা-গাড়িতেও চড়েছে। কেউ কথা বলে না।

লক্ষ্মী-চোরকে দেখে ডাক্তার বললেন, এর ত' অপারেশন করতে হবে।

তোমরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি, দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে, এবারকার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যালের পরীক্ষাতে যে ছেলেগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল তাদের কেমন ছবি বেরিয়েছিল? সেই ছবিতে তাদের চেহারা দেখে কি মনে হলো? আমার তো মনে হলো যে তারা যতই মেধাবী হোক কিন্তু কেউই সুস্থ-সবল-সুপুষ্ট নয়। রোগা ডিগডিগে তাদের চেহারা। এই বয়সেই প্রত্যেকের চোখে চশমা। দেহের তেমন বাড় নেই। বয়সের চেয়ে অনেক ছোট দেখায় আর দেখলে মনে হয় যেন ভাল করে খেতে পায় না। তাদের বাপ-মা কি ভালো করে তাদের খেতে দেয় না? কখনই তা নয়, তারা সকলেই ভালো ঘরের ছেলে, খাবার ভাবনা নেই। তবে তাদের অমন অপুষ্ট অপটু চেহারা কেন? তার কারণ আর কিছু নয়, কেবল লেখাপড়ার দিকেই তাদের যত কিছু যত্ন, কিন্তু শরীরের দিকে অবহেলা, কোন যত্ন নেই। তার মানে এই নয় যে তারা বাস্তবিকই অসুস্থ। তা নয়, তারা এমনিতে সুস্থই আছে। কিন্তু দেহের যাতে সমুচিত উন্নতি ও পুষ্টি হয় সেদিক দিয়ে চেষ্টা নেই। শুধু খেতে পেলেই দেহের পুষ্টি হয় না, তার জন্যে দেহের কিছু অনুশীলন করতে হয়।

অনুশীলন ছাড়া কোনো জিনিসেরই সম্যক বিকাশ হয় না। অনুশীলন মানে কি? অভ্যাস। বিদ্যা শিখতে হলে তোমরা তার অনুশীলন করো অর্থাৎ প্রত্যহ লেখাপড়ার অভ্যাস করো। নিত্য অভ্যাস করতে থাকলে তবে বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাতেই পরীক্ষায় অমন কৃতকার্য হওয়া যায়। সকল বিষয়েই তাই। গান শিখতে হলেও তার অনুশীলন চাই, বাজনা শিখতে হলেও তাই, কোনো কাজকর্ম শিখতে হলেও তাই। অনুশীলন ছাড়া কোনো দিকেরই স্ফুরণ হয় না। লেখাপড়ার অনুশীলন করলে তাতে বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ে, অর্থাৎ মনের স্ফুরণ হয়। কিন্তু শুধু মনের স্ফুরণ হলেই তো চলবে না, শরীরের দিকেও চাই স্বাস্থ্যের স্ফুরণ। নইলে কেবল একতরফা স্ফুরণের কোনো সার্থকতা নেই। বিদ্যাবুদ্ধি তোমার যতই হোক না, শরীরটা যদি হয় রুগ্ন আর পুঁয়ে-পাওয়া, তা হলে সেই বিদ্যাবুদ্ধিকে তুমি কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগানো যায় দেহেরই দ্বারা, সেই দেহকে অপুষ্ট ও অপটু রাখলে চলবে কেন? দেহ যদি মজবুত ও সাবলীল না থাকে তা হলে কোনো শিক্ষাকেই সমুচিতভাবে কাজে লাগানো যায় না।

সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। আমার এক আল্‌সেশিয়ান কুকুর ছিল। তার দু'টি বাচ্চা হলো। দুই বন্ধু সে দু'টিকে চেয়ে নিলে, একজন পাকপাড়ার আর একজন কলকাতা শহরের। বছরখানেক পরে আমার দেখতে ইচ্ছে হলো যে বাচ্চা দু'টি কেমন আছে, কত বড়ো হয়েছে। প্রথমে গেলুম কলকাতার বন্ধুর বাড়ি। সেখানে দেখি কুকুরটা বড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু মোটা হয় নি, পাগুলো সরু লিক্‌লিকে। দেখলাম যে বন্ধু তাকে সর্বদাই বেঁধে রাখে। তাকে অনেক রকম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে সামনের পা দু'টো তুলে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে পারে,

---

শুনে সে ত' ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। খোঁড়া পা নিয়ে কেঁদে ছুটে পালায় আর কি! অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে ডাক্তারের টেবিলে শুইয়ে মুখটা বেঁধে দিল, যাতে চেঁচাতে না পারে। অরপর হাত-পা বেঁধে অপারেশন করে ব্যাণ্ডেজ করে আবার গিন্নিমার কোলে লক্ষ্মী-চোরকে তুলে দিল। এতক্ষণে তার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। তার কান্না থেমে গেল। বাড়ি ফিরে এসে হেসে বলল, মিউ মিউ।

গিন্নিমা বললেন, ও থ্যাঙ্ক ইউ বলছে।

বিজু বলল, ও মা, ও বেড়াল বুঝি?

দিদিমা উত্তর দিলেন, তবে তুমি কি ভেবেছিলে?

বিজু বললে, ঐ হাসপাতালটায় বেড়ালকে নেয়?

দিদিমা বললেন, ওটা যে জানোয়ারদের হাসপাতাল। গরু, মহিষ, ছাগল, পাখি, কুকুর, বেড়াল—এই সব রুগী।

সেলাম করতে বললে সেলাম করে, শুতে বললেই শুয়ে পড়ে, কিন্তু স্বভাবটা তার বেজায় খেঁকি হয়েছে, কেউ কাছে গেলেই কামড়াতে আসে, আর প্রায় সর্বক্ষণই ঘুমিয়ে থাকে।

তারপরে গেলাম পাকপাড়ার বন্ধুর বাড়ি। সেখানকার কুকুরটা দেখলাম বেশ তাগড়া জোয়ান হয়েছে। সে সর্বদাই ছাড়া থাকে দেখলাম। খবর নিয়ে জানলাম যে বাইরের মাঠে সে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, বল নিয়ে লোফালুফি করে, আর রাত্রে বাইরের বারান্দায় বসে পাহারা দেয়, কোথাও কোনো শব্দ হলেই সে হাঁকডাক শুরু করে।

তখন বুঝলাম যে একই কুকুরের দু'টি বাচ্চার মধ্যে এতখানি তফাৎ কেমন করে হলো। প্রথম কুকুরটিকে নানারকম সহবৎ শেখানো হয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখাতে শরীরের কোনো অনুশীলন অর্থাৎ মেহনত অভ্যাস করানো হয় নি, তাই শরীরের কোনো উন্নতি হয় নি। তার যা কিছু শিক্ষা হয়েছে তা বিশেষ কিছু কাজেই লাগে না। কিন্তু দ্বিতীয় কুকুরটির শরীরের রীতিমত অনুশীলন হওয়াতে শরীরের যথেষ্ট পুষ্টি হয়েছে আর সেইজন্যে তার গুণগুলি কাজেও লাগছে।

তাই বলছিলাম যে তোমাদের দু'টো দিকেই নজর দিতে হবে, শুধু একদিক দেখলে চলবে না। মনেরও অনুশীলন চাই, আবার সেই সঙ্গে দেহেরও অনুশীলন চাই। মনের যেমন অনুশীলন হয় লেখাপড়ার অভ্যাসের দ্বারা, তেমনি দেহের অনুশীলন হয় পরিশ্রম করার অভ্যাসের দ্বারা। সর্বক্ষণ কেবল পড়াশোনাতে লেগে থাকলেই চলবে না, তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত ছুটোছুটি করতে হবে, খেলার মাঠে দৌড়তে হবে, কিছু ব্যায়াম করতে হবে, অর্থাৎ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের দ্বারা পরিশ্রম অভ্যাস করতে হবে। আমাদের দেহের মাংসপেশীগুলির এই বিশেষ নিয়ম যে, খাটুনির দ্বারা চালু রাখলেই তারা পুষ্ট হয়ে ওঠে, আর না খাটালেই শুকিয়ে রোগা হয়ে যায়, যেমন লোহার অস্ত্র ব্যবহার করলেই ধারালো থাকে, আর ব্যবহার না করলেই তাতে মরচে ধরে যায়। শরীরকে যেমন ভাবেই খাটানো হোক তাতে কিছু যায়-আসে না, কিন্তু তাকে যেন কেবল বসিয়ে রাখা না হয়। কিশোর বয়সে ও যৌবন বয়সে প্রত্যেকের ব্যায়াম অভ্যাস করা খুবই দরকার।

তাই বলে এমন কথা বলছি না যে, ব্যায়াম করে তোমরা আণ্ডা হও বা গুণ্ডা হও। পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হবে আর গুণ্ডামিতেও ফার্স্ট হবে এমন কথা কখনই নয়। ব্যায়াম করবে কেবল শরীরের পুষ্টির জন্য, শরীরকে সক্ষম ও সাবলীল রাখবার জন্য। ডন-বৈঠকই করতে হবে বা কুস্তি লড়তে হবে তার কোনো মানে নেই। ফুটবল প্রভৃতি খেলাও ব্যায়াম। ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এগুলোও ব্যায়ামের কাজ করে। পায়ে হেঁটে খুব খানিকটা চক্কর দিয়ে আসা, তাও একরকম ব্যায়াম। আজকাল অনেকে আসন অভ্যাস করে, তাও ভালো কথা। মোট কথা, যেমন করে হোক শরীরকে কিছু খাটিয়ে নেওয়া চাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা হওয়া চাই। তবেই দেহটা মজবুত, ঘাতসহ ও কষ্টসহিষ্ণু হবে, আর তা কাজের উপযোগী হবে।

তবে খাবার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে বৈ কি। তোমাদের দেহের পুষ্টির জন্যে বিশেষ করে দরকার প্রোটিন খাদ্য। প্রোটিন কাকে বলে তা তোমরা সকলেই বুঝবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এইগুলোই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রোটিন। পাশ্চাত্য দেশে সকলে মাংস ও ডিম যথেষ্টই খেতে পায়, কিন্তু আমাদের দেশে তা ওদের মতো নিয়মিত-ভাবে খাওয়া হয় না। কিন্তু আমরা মাছ ও দুধ নিয়মিতই খেতে পারি। বিশেষ করে দুধ খাওয়া তোমাদের দরকার, পুষ্টির জন্যেও বটে আর মস্তিষ্কের উন্নতির জন্যেও বটে। দুধ না খেলে যে মস্তিষ্কের ক্ষমতা কম হয় এ-কথা রীতিমত পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে—বিলেতে ও আমেরিকাতে অনেকগুলি স্কুলের ছাত্রদের বোর্ডিং-এ। এই পরীক্ষার জন্যে যে বোর্ডিং-এ একশোজন ছাত্র থাকে তাদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজনকে প্রত্যহ দুধ খেতে দেওয়া হলো, আর দ্বিতীয় পঞ্চাশ জনের বেলা দুধ বাদ দেওয়া হলো। বাকি সব রকমের খাদ্য সমান সমান রইল। ছয় মাস যাবৎ এই পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, ক্লাসের পড়াশোনার কাজে প্রথম পঞ্চাশজন যতটা এগিয়ে যেতে পারলে, দ্বিতীয় পঞ্চাশ জন তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে রইল। তার পর এই দ্বিতীয় পঞ্চাশজনকেও দুধ দেওয়া হতে লাগল। তখন দেখা গেল যে দুই দলই পরীক্ষাতে সমান ফল দেখাচ্ছে।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই দুধ খেতে নারাজ হও। তার কারণ তোমরা হয় তো ভাবো যে দুধটা হলো শিশুর ও রোগীর খাদ্য, রুচি ছেলের মতো ঢক্‌ঢক্ করে দুধ খেতে যাই কেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, দুধ সকলেরই খাদ্য। কেউ কেউ বলে যে দুধ খেতে ভালো লাগে না। কিন্তু সেটা অভ্যাসের অভাবে। অভ্যাস থাকলেই দেখবে যে দুধ খুবই সুস্বাদু জিনিস, এমন কি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যায়। গায়ে যদি জোর পেতে চাও তা হলে ব্যায়ামও করতে হবে আর দুধও খেতে হবে।

আমরা তখন ছোট। পাড়ার বিপিনদা'র সঙ্গে আমাদের খুব পেট-শোট্ ছিল। কিন্তু বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। মনে হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। আর আমাদের বয়স তখন কতই বা হবে,—এই বারো কি তেরো, তার বেশি নয়। বিপিনদা'র বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর দু'টি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। বিপিনদা'দের কোথাও ভি-একটা বাঁধি-আয়ের সম্পত্তি ছিল, তাইতেই তাঁর সংসার চলতো, বেশ সচ্ছলেই চলতো।

বিপিনদা' অধিকাংশ সময় তাঁদের বৈঠকখানা ঘরের মধ্যেই থাকতেন। আমরা পাড়ার কজন ছোট তাঁকে খুব পছন্দ করতুম, তিনিও আমাদের খুব ভালবাসতেন; নানারকমের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আমাদের শোনাতেন। যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই থাকতো গাঁজা এবং গুল, কিন্তু তাঁর বলবার গুণে, সে-সব আমাদের এত ভালো লাগতো যে, তা আর বলবার নয়, আর সেইজন্যেই তিনি আমাদের মনের মধ্যে অমর হয়ে রয়েছেন।

শীতকাল। সকালবেলা। আমরা চারজন—নীলু, আমি, ফণে আর পতা বিপিনদা'র ঘরে ঢুকলুম। তিনি কিছু জলযোগ করছিলেন। তখন চায়ের চল হয় নি। তিনি খাবার পর জল খাচ্ছিলেন। খান-দুই সিঙ্গাড়া, বোধ হয় খেতে পারেন নি ব. ইচ্ছা করেই খান নি, শালপাতার

ঠোঙাটার মধ্যে পড়েছিল একটা টেবিলের ওপর। হ্যাঁ, টেবিলও সেটাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে, যদিও নবাবী আমলের সেই টেবিল এখন ত্রিভঙ্গ ডেভিলের রূপ নিয়ে তার চিরকালের স্বাধিকার বজায় রাখবার চেষ্টায় তখনো মেজের ওপর কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে।

আমরা যেতেই বললেন—বোস্। ঐ সিঙ্গাড়া দু'খানা আর খেতে পারলুম না। তোরা খেয়ে ফেল। আধখানা করে চার ভাগ করে খেয়ে নে। মাঝে-মাঝেই এরকম বিপিনদা'র ঘরে গিয়ে আমরা খেতুম। তবু একটু ভদ্রতা দেখাবার ইচ্ছেয় ফণে বললে—না বিপিনদা' রেখে দাও, পরে তুমি খেয়ো।

বিপিনদা' বললেন—আর কুটুম্বিতে করতে হবে না, খেয়ে ফ্যাল; জানিস ত' সিঙ্গাড়াতে ব্রহ্মা-বিষ্টু-মহেশ্বরের অধিষ্ঠান!

আমরা বলে উঠলুম—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সিঙ্গাড়ার ভেতর?

হ্যাঁ,—জানিস না ত'; সিঙ্গাড়াটা দেবতাদের ভারি প্রিয় খাদ্য। তাই, সিঙ্গাড়ার ওপর ওঁরা চেপে বসে আছেন। দেখেছিস্ ত' অন্য কোন খাবারে শিং নেই, কিন্তু সিঙ্গাড়ায় আছে। শিং মানে শৃঙ্গ। ওর তিন শৃঙ্গে বড়ো-বড়ো তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—মৌরসী অধিকার নিয়ে চেপে বসে আছেন।

পতা বললে—তাই বুঝি আপনি সিঙ্গাড়া খেতে খুব ভালবাসেন?

ভালবাসি মানে? ভাত একদিন না খেলে আমার চলে, কিন্তু সিঙ্গাড়া না খেলে কিছুতেই চলবে না।

পরেরদিন সকালে আমরা বিপিনদা'র ঘরে গিয়ে দেখি, বিপিনদা' বেশ আরাম করে হুঁকো হাতে ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ করে তামাক খাচ্ছেন। বললেন—বস। বসে একটা জোর টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

নীলু বললে—আপনার হুঁকোর মধ্যেও ব্রহ্মা-বিষ্টু-মহেশ্বর আছে?

নিশ্চয়ই; জানিস না ত' সে-সব কথা, বস, বলছি।

ব্যস! একটা গুল-গল্পের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। হুঁকায় আরো দু'পাঁচটা টান দিয়ে, জানালার কোণায় সেটাকে ঠেসিয়ে রেখে, বিপিনদা' সুরু করলেন—শোন। অনেককাল আগে, কোলকাতার উত্তর অংশ—যেখানটাকে এখন বাগবাজার বলে, ওখানে খুব বন-জঙ্গল ছিল। সেই বনে একবুড়ো বাঘ থাকতো। বাঘটার গায়ে শক্তি ছিল না, দাঁত প্রায় সবই পড়ে গেছলো। সে বনের ছোট ছোট ইঁদুর, খরগোসগুলোকে ধরে ধরে আস্ত গিলেই খেত, তারপর গঙ্গার ধারে গিয়ে, একপেয়ে বকের মত চুপ করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকতো। যদি কোনো ইলিস কি অন্য মাছ কিনারার দিকে হঠাৎ এসে পড়তো, সে ঝপ করে তাকে মুখ দিয়ে ধরেই গিলে খেয়ে ফেলতো। তাতে অবশ্য তার পেট ভরতো না, কিন্তু কি আর করবে; শেষকালে চোঁ চোঁ করে কলসী দু-চার গঙ্গাজল খেয়ে সে বাকি পেটটা ভরিয়ে চলে আসতো।

ফণে বললে—আহা! বাঘ মশায়ের তা হলে ত' খুবই কষ্ট হত!

হ্যাঁ। তারপর এখন একদিন—সগগো থেকে ব্রহ্মা, বিষ্টু, মহেশ্বর পৃথিবী বেড়াতে এসে পথ ভুলে এই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বনের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে তাঁরা বাঘের সামনে এসে উপস্থিত! দেখেই ত' তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ!

বাঘ বললে—এসো, তোমাদের কোনো ভয় নেই; আমি তপস্যা করবার জন্যে গঙ্গার ধারে এসে আছি।

ওঁরা তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন, বাঘের কথা ওঁদের কানে গেল না।

বাঘ একটু সরে এসে বললে—আমি কারো রক্ত-মাংস খাই না; কারুকে পেলে আমি আস্ত গিলি, আবার তাকে আস্ত উগরে ফেলি। তাতে সে সগ্‌গে চলে যায়।

খুব ভয়ে-ভয়ে, কাঁপতে-কাঁপতে ব্রহ্মা বললেন—আমরা ত' সগ্‌গো থেকেই আসছি, সেখানেই থাকি!

ও! তাই নাকি? তা হলে তোমরা সগ্‌গের সগ্‌গে চলে যাবে। বলে বাঘ ওঁদের দিকে আরো একটু সরে এসে, ঝপাৎ করে ল্যাজের একটা শব্দ করতেই, ওঁরা তিনজনে লাফিয়ে উঠে একেবারে সোঁ-সোঁ!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তার মানে?

তার মানে—একেবারে আকাশের দিকে ভোঁ দৌড়!

পতা শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটু এদিক-ওদিক চেয়ে, বোধ হয় দেখে নিলে, সেই বাঘটা কিম্বা তার ভূত এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে কি না। বিপিনদা'র মুখের দিকে চেয়ে বললে—তারপর?

বিপিনদা' বলে চললেন—এখন, দেবতারা ভয়ে লাফিয়ে উঠে পালাবার সময়, তাঁরা তাঁদের তিনটে হাতের জিনিস ফেলে পালিয়ে ছিলেন। ব্রহ্মা ফেলে গেছলেন তাঁর কমণ্ডলু, বিষ্ণু মানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাঁশি, আর মহেশ্বর মানে শিব তাঁর গাঁজা খাবার কল্‌কে। বাঘ ত' কবে অক্কা পেয়েছে, কিন্তু সগ্‌গের জিনিস বলে ঐ তিনটে দ্রব্য নষ্ট হতে পারে নি। হাজার হাজার বছর ধরে ওগুলো সগ্‌গের জ্যোতি নিয়ে সেই বাঘের বনে পড়েছিল। তারপর কালে কালে বন কেটে শহর হল, বাজার বসলো। বাঘের বনে বাজার, তাই জায়গাটার নাম হল—বাগবাজার। তারপর থেকেই দিন দিন লোকজনের বসতি, ভিড়। ঐ তিনটে দ্রব্য তখন মানুষের হাতে এসে পড়ল। তারা করলে কি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুটার ওপর শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিটা জোরে সেঁটে বসিয়ে দিলে আর বাঁশির মাথায় চাপিয়ে দিলে মহেশ্বরের মানে শিবের কল্‌কেটা। তখন মা গঙ্গা সেই মহা পবিত্র জিনিসটিকে দেখতে এসে, খানিকটা কমণ্ডলুর মধ্যে ঢুকে থাকলেন। কল্‌কেটার মধ্যে শিবের জন্যে খানিকটা সগ্‌গের খাস অম্বুরী তামাক সাজাই ছিল, অগ্নিদেব ছুটে এসে তার ওপর অধিষ্ঠান করলেন। আর—

আর আপনি এখন তাই ভুড়ুক্-ভুড়ুক করে খাচ্ছিলেন না?—পতা বলল।

ঠিকই বলিছিস।···তা, যা এখন সব; আমি একবার বাজারে যাব—বলে বিপিনদা' উঠে দাঁড়ালেন।

আমরা যেন বাগবাজার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আমাদের পাড়ার রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম।

আজ বিপিনদা'র সেই বাড়ি ভাঙা-চোরা অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু বিপিনদা' আর নেই।

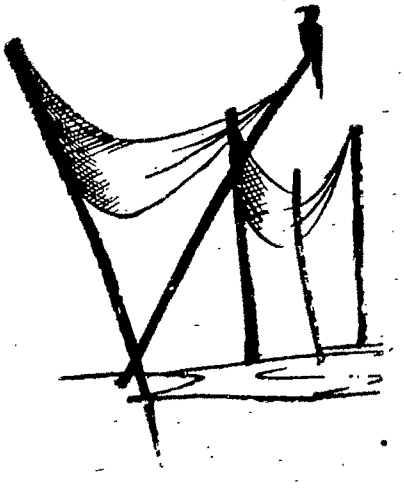

'কহিলা হবু,—শুন গো গবু রায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র,
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়ে
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র ?'

হবুচন্দ্র রাজার এই দুঃখ কাহিনী কবির কলমে চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে গেছে। অবশ্য কবি রাজার দুঃখ দূর করবার একটা উপায় ঐ কবিতারই এক বৃদ্ধের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিয়েছিলেন এবং হবুচন্দ্রও হয় তো শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে ক'রে পৃথিবী থেকে ধূলোর উপদ্রব দূর হয় নি। আজ এত বছর পরেও আমরা ধূলোর উৎপাতে ত্রাহি-ত্রাহি করছি।

উৎপাত বলে উৎপাত! এই একটু আগে হয় তো টেবিল-চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করলাম; বড় রাস্তার ওপর বাড়ি, হাওয়া আসবে বলে জানালাটা একটু খুলে রেখেছি; ওমা! কিছু পরেই দেখি আবার যে-কে সেই! টেবিল-চেয়ারে সেই গিজ্-গিজ্ করছে ধূলো। সত্যি, এত ধূলো কোথা থেকে আসে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানা দরকার ধূলো জিনিসটা কি। এর জবাবে আবার পাল্টা প্রশ্ন করা যায়—কি নয়? পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় জিনিসই ভাঙ্গলে প্রথমে টুকরো-টুকরো হয়, তারপর গুঁড়ো হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত যে অবস্থায় এসে দাঁড়ায় তাকেই বলা হয় ধূলো। কাজেই ধূলো বলতে একরকম জিনিস বোঝায় না, কোথাকার ধূলো তারই ওপর অনেকখানি নির্ভর করে সেই ধূলোর স্বরূপ। যেমন ধর শহর অঞ্চলে। সেখানে মেলাই কল-কারখানা ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানকার ধূলোয় কয়লার গুঁড়ো পাওয়া যাবে সবচেয়ে বেশি। খোলা ময়দানের বুকে যে ধূলো তার মধ্যে পাওয়া যাবে কণা, বালির কণা, গাছের শুকনো পাতার গুঁড়ো আরও এটা-ওটা-সেটা। তেমনি রাস্তার ধূলোর মধ্যেও পাবে যত রাজ্যের পাথরের কুচি অর্থাৎ পাথরের গুঁড়ো, ইট-সুরকির গুঁড়ো, পিচের অংশ ইত্যাদি। মাটির গুঁড়ো তো আছেই!

ঘরের ভিতর বা ছাদের ওপর জমা ধূলো নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখবে তার মধ্যে নেই এমন জিনিস নেই। পাথরের কুচি, কয়লার গুঁড়ো, পাখির পালক, শুকনো পাতা, ফুলের রেণু, মায় জীবজন্তুর হাড়ের টুকরো পর্যন্ত মিশে রয়েছে তার মধ্যে। অবশ্য খালিচোখে এসব বোঝা

যায় না—কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দেখলে এসব স্পষ্ট বোঝা যায়।

মরুভূমির বুকে যে স্তূপাকার বালি—সেও কিন্তু ধূলো ছাড়া কিছু নয়। নানারকম পাথর—বিশেষ করে বেলেপাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গুঁড়ো হয়ে হয়ে অবশেষে ঐ বালির চেহারা পেয়েছে। অবশ্য কি করে তা হ'ল সে কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। তবে বলা যায়—এ সবেরই কারণ নানা রকম প্রাকৃতিক উৎপাত। যেমন হাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, রোদের তাপ, তুষারপাত ইত্যাদি। এ ছাড়া নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়া, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ এবং বিশেষ করে জীবাণুর উপদ্রবও তাচ্ছিল্য করবার নয়। এমনিভাবে, ধরতে গেলে আমাদের চোখের সামনেই, নিত্য ধূলো তৈরি হচ্ছে। এমন কি মরুভূমিও গড়ে উঠছে। আজ যেখানে মরুভূমি দেখছ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক পরেও হয় তো সেখানে শ্যামল বন-জঙ্গল ছিল, হয় তো জীবজন্তু বা মানুষের বসতিও ছিল। আজ যেখানে সাহারা মরুভূমি হয়েছে একদিন সেখানটাও না কি ছিল ঘন অরণ্য আর জীব-জন্তুর আবাসভূমি। অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও এ কথার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তেমনি সমুদ্রের নীচেও প্রচুর ধূলো আছে। এগুলো বেশির ভাগই তৈরি হচ্ছে মরা সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল গুঁড়ো হয়ে। জলজ উদ্ভিদের গুঁড়োও আছে। আবার নদীর সঙ্গে ভেসে-আসা হরেকরকম জিনিসের (যাকে আমরা এককথায় ময়লা বলি) গুঁড়োও আছে তার মধ্যে। যদি কখনও এইরকম এক চিমটি সমুদ্রের ধূলো যোগাড় করতে পার, আর অণুবীক্ষণ দিয়ে তা পরীক্ষা করবার সুযোগ হয়, তা হ'লে দেখবে কি অদ্ভুত কারিকুরি তাদের গায়ে! পণ্ডিতেরা এই বিশেষ ধরণের ধূলোর নাম দিয়েছেন ডায়াটম।

এ ছাড়া আরও একরকম ধূলোর কথা বলা যায়। সে হচ্ছে আগ্নেয়গিরির ধূলো। আগ্নেয়গিরিগুলি যখন সজাগ হয়ে ওঠে—যখন আগুন ওগরাতে সুরু করে, তখন তার মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ মণ ধূলোও বেরিয়ে আসে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে। সময় সময় তার পরিমাণ এতবেশি হয় যে, মাসের পর মাস আকাশকে অন্ধকার করে রাখা তার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। এই ধরণের মধ্যে প্রচুর গন্ধকও থাকে।

ধূলো হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ। ওদের মধ্যে যে কণাগুলোর আকার একটু বড় সেগুলিই শুধু আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু যেগুলো আরও সূক্ষ্ম সেগুলো বাতাসের সঙ্গে এমনভাবে মিশে জড়িয়ে থাকে যে চোখে দেখে তাদের ঠাহর করা মুশকিল। সূক্ষ্ম, তাই অসম্ভব হাল্কা সেগুলো। তাই সহজেই বাতাসের ওপর ভেসে ওঠে, তার পর সেই বাতাসেই ভর দিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, শুধু দেশ-দেশান্তরেই নয়,—দূর আকাশেও উঠে যায় তারা। মাইলের পর মাইল যত ওপরেই ওঠ না কেন, ধূলোর হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। বাতাসের রাজত্ব ছাড়িয়ে, এমন কি পৃথিবীর রাজ্যের বাইরে অনন্ত মহাকাশের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে এই ধূলো। অবশ্য সেগুলো ঠিক পৃথিবীর ধূলো নয়। মহাকাশে যেসব জ্যোতিষ্ক পদার্থ উল্কা ইত্যাদি ছুটে বেড়ায় তাদেরই হয় তো ভাঙ্গা অংশ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুঁড়ো, অথচ মজা, এই সব ধূলিকণাও নাকি গ্রহ-উপ-গ্রহদের মতই নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ছোট্ট ধূলোর এই কাণ্ডকারখানার কথা শুনে অবাক হচ্ছ? কিন্তু আরও কত কাণ্ড যে ওরা করছে তা যদি জানতে!

যদি বলি, ধূলো না থাকলে আমাদের পৃথিবী আর আকাশের চেহারাটা একেবারেই অন্যরকম হত—এত অন্যরকম যে সে চেহারা আমরা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারি না। বাতাসে ধূলো না থাকলে সে বাতাস হ'ত অসম্ভবরকম স্বচ্ছ,—কারণ বাতাসের তো কোন রং বা রূপ নেই! সেই স্বচ্ছ বাতাসের ভিতর বহুদূর পর্যন্ত আমাদের চোখের দৃষ্টি চলে যেত। আচ্ছা, আকাশের চেহারা কেমন হ'ত? সেও কি ঐরকম আরও ঘন নীল হ'ত? না, মোটেই নয়। আকাশের যে নীল রং আমরা দেখি তা ঐ ধূলোরই জন্য। ধূলো সূর্যের আলোর অন্যান্য রংগুলি শুষে কেবলমাত্র নীল রংটা ঠিকরে দেয়, তাই আকাশকে অমন নীল দেখায়। কারণ সারা আকাশ জুড়েই যে এই ধূলিকণা ছড়িয়ে

আছে। সকালে সূর্যোদয়ের সময় আর সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় আকাশের পূব আর পশ্চিম দিক্‌টা কিন্তু নীল থাকে না—কে যেন সেখানে আবীর গুলে ছড়িয়ে দেয়। কে সে জান? সেও এই ধূলো। ঐ সময় সূর্যের আলো সোজাভাবে আসে না—বাঁকা-ভাবে অনেকখানি ধূলোর স্তর ভেদ করে তাকে আসতে হয়। সেই সময় সূর্যের লাল আলোও সে আর শুষে নিতে পারে না—আর সেই আলোই ঠিকরে এসে আকাশটাকে অমন আবীর রং-এ রাঙিয়ে দেয়।

ধূলো না থাকলে আকাশ যে শুধু নীলই দেখতে তাই নয়, দিনের বেলা যে প্রখর সূর্যের আলোয় সারা পৃথিবী ঝলমল করে, তাও হ'ত না। ধূলোর গায়ে সূর্যের আলো পড়ে চারদিকে ঠিকরে পড়ে বলেই দিনের বেলা আমরা অত আলোর মধ্যে বাস করি। না হ'লে কেমন হ'ত জান? সমস্ত আকাশটা দিনের বেলাও দেখাত রাতের মত অন্ধকার শুধু তার এককোণে জ্বল্‌জ্বল্ করে সূর্যটা জ্বলত,—ঠিক যেমন হয় সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময়ে। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা—যা আমরা আজকাল রাতে ছাড়া দেখতে পাই না—তা তখন দিনের বেলাই দেখা যেত। হবেই তো, তাদের আড়াল করবার জন্য প্রখর সূর্যালোক থাকত না যে!

এই তো গেল আলো আর রং-এর কথা, গরমের কথাও ধর না! সূর্যদেব তো সর্বক্ষণ পৃথিবীর ওপর তাপ ঢেলে চলেছেন। কিন্তু সে তাপের সবটা কি পৃথিবী পাচ্ছে? না, আকাশের বিরাট ধূলোর রাশি তার অনেকটা অংশ লুফে নিয়ে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, আর তারই ফলে পৃথিবীটা অসম্ভব রকম গরম হতে পারছে না। আমরাও ঠাণ্ডা হয়ে সেখানে বাস করতে পারছি।

বর্ষাকালে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়, শীতকালে কুয়াশা হয়। ধূলো না থাকলে তাও হত না। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেই বাষ্প বাতাসের মতই গ্যাসের চেহারা নিয়ে দূর আকাশে ঘুরে বেড়ায়, আর সেই বাষ্প ধূলিকণার সংস্পর্শে এলে তবেই গলে গিয়ে জলকণার সৃষ্টি করতে পারে। বাষ্প গলে জলকণা হলে তবেই না কুয়াশা আর মেঘের সৃষ্টি হবে! আবার সেই মেঘ যখন আরও গলবে—গলে জল হয়ে যাবে—তখনই না বৃষ্টি নেমে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়বে! সুতরাং দেখছ, ধূলো না থাকলে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যেত। তবে সে মরুভূমিতে নিশ্চয়ই একটাও বালির দানা থাকত না, কারণ বালিও তো আসলে ধূলো। সে রকম মরুভূমির কথা তাই আমরা কল্পনা করতে পারি না।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, ধূলোকে তাচ্ছিল্য করলেও ধূলো যে কোন কোন ভাবে আমাদের কত উপকার করে তা আমর ভেবে দেখি না। কিন্তু অপকারও কি করে না? করে বৈ কি। নিষ্পাপ, অকপট বন্ধু বলে কেউ আছে নাকি?

আমাদের নানারকম অসুখ-বিসুখের জীবাণু ধূলোই বয়ে নিয়ে বেড়ায়। সর্দি-কাশি থেকে সুরু করে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা—আরও কত মারাত্মক মারাত্মক রোগের বিষ ধূলোর ভিতর দিয়েই আমাদের শরীরে ঢুকছে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, এইসব রোগের কারণ হচ্ছে—নানারকম সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জীবাণু—কিংবা তার চেয়েও সূক্ষ্মতর ভাইরাস্। এই জীবাণু আর ভাইরাস্ ধূলোয় চড়েই বাতাসে ঘুরে বেড়ায়, আর সুযোগ বা ফাঁক পেলেই মানুষকে আক্রমণ করে। এ ছাড়াও নানারকম অপকারিতা আছে ধূলোর। সৃষ্টি নোংরা করতে, অপরিচ্ছন্ন করতে যেমন ওস্তাদ, তেমনি কল-কারখানার কাজে বাধা দিতেও ওর জুড়ি নেই। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে যা সামান্য একটু ধূলো লাগলেই অচল হয়ে পড়ে,—বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে 'ধূলোর বিষক্রিয়া'।

কিন্তু বিজ্ঞানীরাও তো ছেড়ে কথা কইবার লোক নন! তাঁরা ধূলোকে যন্ত্রের সাহায্যে ছেঁকে বাতাস বিশুদ্ধ করবার ব্যবস্থা করেছেন। জীবাণুকে ঘায়েল করবার জন্য নানারকম ওষুধ-বিষুধ ছড়িয়ে ধূলোকে নির্দোষ করারও চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া উল্টে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধূলো থেকে শাঁসালো জিনিসগুলো বার করে নিয়ে তা নানারকম শিল্প-ব্যবসায়ে খাটাবারও মতলব করছেন। অনেক জায়গায় সফলও হয়েছেন। যেমন ধর, বড় বড় শহরের ধূলোয়, আগেই বলেছি, কয়লার গুঁড়ো খুব বেশি। অথচ এই কয়লার গুঁড়ো হচ্ছে শক্তির একটা মস্তবড় ভাণ্ডার। যদি সেখানকার ধূলো থেকে ঐ কয়লার গুঁড়োকে কোন কৌশলে বাছাই করে নেওয়া যায়—তা হলে ঐ ধূলোই হয় তো হবে মানুষের একটা বড় সম্পদ। এই উদ্দেশ্যে একবার নিউইয়র্ক শহরের ওপরকার বাতাসে কতটা ধূলো আছে তার হিসেব নেওয়া হয়েছিল, তাতে জানা যায়, ওখানে মাথার ওপর মাত্র দু'শ' ফুটের মধ্যেই কম করে বাষট্টি হাজার মণ ধূলো আছে—যার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই কয়লার গুঁড়ো। বিজ্ঞানীরা বললেন, এই ধূলো সংগ্রহ করতে হবে, তারপর তা থেকে কয়লার গুঁড়ো বার করতে হবে। যদি তা সম্ভব হয়, তবে তাই থেকেই এত বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে যে, তা দিয়ে দিনের মধ্যে অন্তত ছ'ঘণ্টা গোটা শহরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিদ্যুৎশক্তি জোগাড় হয়ে যাবে।—আলো, পাখা, খুঁটিনাটি ঘরের কাজ (আজকাল তো ওখানে সবই প্রায় করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে)—এ সব তো বটেই, কল-কারখানাগুলোরশুদ্ধ যত বিদ্যুৎশক্তি দরকার সব।

শুধু চোক-ধাঁধানো হিসেব দেখানো নয়, এভাবে যে সত্যি ধূলো থেকেও বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে বিদ্যুতের চাহিদা খানিকটা মেটানো যায়, তাও হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

এর পরেও কি ধূলোকে তুচ্ছ ধূলিকণা বলে তাচ্ছিল্য করবে?

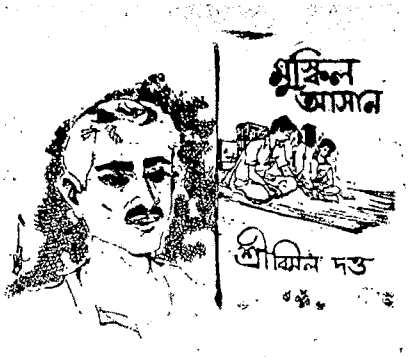

তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। কলেজে পড়ি আর সকালে-বিকালে ছেলে পড়াই। সেসব যুগে এভাবে ছাড়া উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ সাধারণ ঘরের ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বরাবরই এইভাবে পড়াশুনা চালিয়ে এসেছি।

একবার একটি ছেলেকে পড়াতে গেলাম। নাম তার যা হোক্ একটা ছিল, কিন্তু এখন ত' সে বড় হ'য়ে গণ্যমান্য হয়েছে,—তাই নামটা গোপনই করলাম। ধরো তার নাম 'সুন্দরলাল'। সন্ধ্যাকালে পড়াতে যেতাম। একদিন যথারীতি পড়াতে গিয়ে দেখি ছাত্র নেই, তার জায়গায় বসে আছেন ছাত্রের বাবা ব্রজসুন্দরবাবু।

ব্যাপার কি? অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। ব্রজসুন্দরবাবুর সঙ্গে দু' ঘণ্টা পড়াবার কথা হয়েছিল। একদিন মিনিট পনেরো আগে চলে আসি। তাতে ব্রজসুন্দরবাবু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে থেকে নজর রাখতেন ঠিক কন্‌ট্রাক্ট মত কাজ হচ্ছে কি না। কাজেই ছাত্রের

স্থানে তাঁকে বসে থাকতে দেখে ভাবলুম ছাত্রের আসতে দেরি আছে বলে কি তিনি নিজে পড়ে দু'ঘণ্টা পুষিয়ে নেবেন নাকি?

আমাকে দেখে বললেন, আসুন, মাস্টা-মশাই, বসুন। বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি।

মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, মুস্কিল ত' আমি কি করবো—আমি কি মুস্কিল-আসান নাকি?

তারপর ছ্যাঁৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সুন্দরলাল একবার বাপের কাছে জুতোপেটা খেয়ে বাড়ি থেকে পালায়। এবারও কি—সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, পালিয়েছে বুঝি?

ভদ্রলোক বললেন, অ্যাঁঃ পালাবে? খাঁচা কিনে আটকে ফেলেছি।

বলেন কি ভদ্রলোক! ছেলেকে খাঁচায় রেখেছেন আটকে? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি?

ব্রজসুন্দরবাবু তাঁর লাউয়ের মত ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকেন, কাল ত' ন'টায় আপনি চলে গেলেন। তারপরই কাণ্ডটা ঘটল। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিরাট একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা ঘরে ঢুকে একেবারে লোহার সিন্দুকের উপর এসে বসল।

মনে মনে স্বস্তি পেলাম। সুন্দরলাল না, তবে।

ব্রজসুন্দরবাবু বললেন, লক্ষ্মীপ্যাঁচা—স্বয়ং লক্ষ্মীর বাহন—তার উপর লোহার সিন্দুকের ওপর আশ্রয় করেছে। বলি আমরা ত' হিন্দু—বলে ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণাম করলেন, ছেড়ে দিই কি করে? সেই রাতে এ বাজার ও বাজার করে সেই আপনার শ'—বাজার থেকে খাঁচা কিনে পাখিটাকে বন্দী করলুম।

হেসে বললাম, এবার আপনার ভাগ্য খুলে যাবে।

বড় খুশি হলেম ব্রজসুন্দরবাবু, আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে কি না হতে পারে। গত কয়েক বছর শেয়ার বাজারে বিস্তর লস্ খেয়েছি বড়বাজারের বাড়িটা বিক্রি হয়েছে, নিমতলার বস্তিও বন্ধক পড়েছে—এখন যা করেন মা লক্ষ্মী; প্যাঁচা যখন পাঠিয়েছেন তখন তিনি স্বয়ং আসতেও ত' পারেন। তাই ওকে যত্ন করতে ত্রুটি করি নি। কিন্তু পেঁচারা কি খায় বলতে পারেন?

সর্বনাশ! এ সম্বন্ধে ত' সেই শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগে মাত্র পড়েছি। প্যাঁচা ছোট ছোট ইঁদুর, পাখির ছানা, মাছ ইত্যাদি খায়। তাই বললাম, মাছ দিয়েছিলেন কি?

নিশ্চয়ই একপো পুঁটি মাছ, দু'টো ইঁদুর, একটা চড়াই পাখি মেরে পর্যন্ত দিয়েছি কিন্তু কিচ্ছু দাঁতে কাটছে না—কাল রাতে কিচ্ছু খায় নি, আজও সমস্ত দিন বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বোধ হয় কুবেরের রত্নভাণ্ডারের হিসেব করছে—কি বলেন?

বললাম, হতে পারে—আমি ত' ও বিষয়ে কিচ্ছু জানি না—

ইতিমধ্যে সুন্দরলাল এনামেলের বাটি হাতে ঘরে ঢুকলো—ব্রজসুন্দরবাবু বললেন, এনেছিস দে—যাই দেখি নতুন বাসনে করে খেতে দিই। আচ্ছা মাস্টা-মশাই, ডেমরে মাছ কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন? সেই যে পার্শেমাছের মত দেখতে দু'পাশে বড় বড় ঠেলা-ঠেলা চোখ?

নিউ মার্কেটে খোঁজ করতে পারেন।

শুনেছি প্যাঁচারা ডেমরে মাছ খেতে ভালবাসে। কিন্তু নিউ মার্কেটে পাওয়া যায় নি—তাই আমার বড়ছেলে আনন্দলালকে পাঠিয়েছি 'টেরিটি' বাজারে, চীনেরা নাকি ডেমরে মাছ খেতে ভালবাসে।

সুন্দরলাল সবে বই গুছোচ্ছে কর্তা ফিরে এলেন—সুন্দর, তুই একবার পুরুতমশাইয়ের বাড়ি যা। তাঁর বিধান নিতে হবে। মাস্টা-মশাই আজ ছুটি আপনার। বাড়ি যান।

ছাতা বগলে বাড়ির পথ ধরলুম।

পরদিন যথারীতি পড়াতে এসে দেখি সুন্দরলাল মন দিয়ে অ্যালজ্যাব্রা কষছে।

কি ব্যাপার? প্যাঁচা কেমন আছে?

সুন্দরলাল হেসে বললে, সে ফুড়ুৎ—

চেয়ারে বসে পড়লাম। অ্যাঁ পালিয়েছে!

ব্রজসুন্দরবাবু ঘরে ঢুকলেন, ছেড়ে দিলুম, মাস্টা-মশাই, পাপ নেবে কে? যদি না খেয়ে মরে ভারি অলক্ষণ হবে যে! পুরুতমশাইকে ডেকেছিলাম—তিনি বললেন, ওরা সোনার খাঁচায় থাকে মশাই—লোহার খাঁচায় থাকবে কেন? তবে হ্যাঁ যদি সোনার খাঁচায় না রাখতে পারেন ত' কাঞ্চনমূল্য হিসেবে ব্রাহ্মণকে অন্তত ভরিখানেক সোনার দাম দিতে হবে। কে মশাই, ও সব বুজরুকিতে ভোলে? খাঁচার দরজা খুলে স্রেফ ছাদে বসিয়ে দিলুম। কখন আপন ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে পালিয়েছে। আপন ইচ্ছায় এসেছিল, আপন ইচ্ছায় গেছে, মাস্টা-মশাই, মাঝখানে আমার খরচ ত' কম হ'ল না? খাঁচা তেরোটাকা, বাটি দেড়টাকা, পুঁটিমাছ, ডেমরে মাছ, যাতায়াতের খরচ,—পুরুত-ঠাকুরের প্রণামী, লক্ষ্মীমার চিনির নৈবেদ্য—বিস্তর খরচ হয়ে গেল।

ব্রজসুন্দরবাবু কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

সুন্দরলালকে জিজ্ঞাস করলাম, খাঁচাটা?

সে বললে, দাদা একটা টিয়াপাখি কিনে এনেছে শিয়ালদহ থেকে। পাখিটা ভাল জাতের। পড়ালে পড়বে।

হাসতে হাসতে বললাম, নিজেই পড়বে, না তোমার মত মাস্টার লাগবে?

সুন্দরলাল বললে, সবাই মিলে পড়াবো।

আমি বললাম, সেই ভালো—এখন অঙ্কটা কষে ফেলো দেখি।

মানুষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি ফিরি দিগ্বিজয়ে—
সেকেন্দারের সাথে,
নেপোলিয়ন সঙ্গে থাকে
সেণ্ট হেলেনাতে।
নরকে দেখি নেকড়ে হয়ে
তাড়িয়ে মানুষ খেতে,
ফাঁসির ইঁড়িক্ দেখি
নুরেনবার্গ তুরস্কেতে।
মানুষ অতি হিংস্র যে
অমৃত নয় রক্ত চাহে,
মানুষ মারাই পেশা তাদের
তাতেই তো পায় 'বাহবা' হে।
সভ্যতার তো উন্নতি খুব
মুখে বৃহৎ বৃহৎ কথা,
ইহার চেয়ে অসভ্য কি
নগ্ন আদিম বর্বরতা?
এত লোক তো মরতো নাক'
এমন মারণ অস্ত্র কোথ?
'হিরোশিমা' করতে ধরা
তীব্র তাদের একাগ্রতা।
বুদ্ধ এলেন শিক্ষা দিলেন
চলছে যেমন সে চলি তো
কর্মধারা তেমনি চলে
মানুষ মারা বদ্‌লেনি তো।
পশুত্বের যে অনুরাগী
গতি তাহার থামেনি তো,
মানুষ যতই সভ্য হউক
ডালে থেকে নামেনি তো।

নয়ওয়ের একটি উপকথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র

এক গাঁয়ে থাকে এক বুড়ো চাষী। তার তিন ছেলে।

বুড়ো তার ছেলে তিনটিকে একদিন ডেকে বলে, বাবারা! আমার দিন তো ফুরিয়ে এলো। তোমাদের তিনজনকে তিনটি জিনিস দিয়ে যাবো। তোমরা এমন কোন দেশ যদি খুঁজে বার করতে পারো যেখানকার লোকে জিনিস তিনটি কখনও দেখে নি, তা হলে তোমাদের কপাল ফিরবে।

এই বলে বুড়ো চাষী বড়ছেলেকে একটি মোরগ, মেজকে একখানি কাস্তে আর ছোটকে একটি বিড়াল দিলে।

ছেলেরা ভাবলে, এমন দেশ কি কোথাও আছে যেখানকার লোকে এই তিনটে সাধারণ জিনিস দেখে নি?

যা হোক, বুড়ো চাষী তারপরই মারা গেল।

বড়ছেলেটি মোরগটিকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সেই দেশের খোঁজে যেখানে তার কপাল ফিরবে। কিন্তু সে যে দেশেই যায় সেখানেই দূর থেকে দেখতে পায় গির্জার চূড়ায় রয়েছে একটা মোরগ। বাতাস যেদিক থেকে বয়ে আসছে মোরগটাও ঘুরছে সেদিকে। আর, গাঁয়ে গাঁয়ে এদিকে-ওদিকে ডাকছে মোরগ-মুরগী। এই দেখে সে হতাশ হলো।

সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো এক দ্বীপে। সেখানকার লোকে চোখে দেখা তো পরের কথা, মোরগের নামই শোনে নি! আর কি করে যে সময়ের হিসেব করতে হয় তাও জানে না।

সে তার মোরগটা তাদের দেখিয়ে বলে, দেখ তো কি রকম জমকালো প্রাণী এটি। রোজ রাতে এ তিনবার তিন সময়ে ডাকে। শেষবার ডাকলে বুঝবে ভোরের আর দেরি নেই। আরও মজার কথা, পরিষ্কার সূর্যের আলোতেও এ কখন কখন ডাক দেয়। তখন কিন্তু সাবধান হবে। বুঝবে, আবহাওয়া বদলাতে চলেছে।

দ্বীপবাসীরা সে কথা শুনে ভারি খুশি হলো।

তারা সেদিন সারারাত জেগে রইলো আর তিন প্রহরে তিনবার মোরগটার ডাক শুনলো। তার শেষ ডাকের একটু পরেই সূর্য উঠলো। তারা জেগে জেগেই সূর্য ওঠা দেখলো।

তখন তারা বড়ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, প্রাণীটা কি বিক্রির? কি দামে ওকে বেচবে?

বড়ছেলে বললে, একটা গাধা যত সোনা বইতে পারে ততখানি সোনা পেলে আমি ওকে বেচবো।

তারা তাতেই রাজী হলো।

বড়ছেলে মহানন্দে সোনা-দানার ভার নিয়ে কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে এলো।

ভাইয়েরা তা দেখে অবাক।

মেজভাই বললে, আমিও যাবো।

এই বলে মেজভাই কাস্তেখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

তাকেও ঘুরতে হলো কত দেশের কত গাঁয়ে। কিন্তু তেমন দেশ আর পায় না, যেখানকার লোকে কোনদিন কাস্তে দেখে নি। ঘুরতে ঘুরতে শেষে এসে পৌঁছলো এমন এক দ্বীপে যেখানকার লোকে কোনদিন কাস্তের নামই শোনে নি। তারা কাস্তে দেখে অবাক। তারা কাস্তেখানা কিনতে চাইলো।

মেজভাই কাস্তের বদলে তাদের কাছ থেকে নিল একটা ঘোড়ায় যতটা সোনা বইতে পারে ততটা সোনা।

সেও কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে এলো অনেক ধন-দৌলত নিয়ে।

তাই দেখে, ছোট ভাইয়েরও ইচ্ছে হোল বেরিয়ে পড়তে। তাই সেও একদিন বিড়ালটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সেও ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো এক দ্বীপে। সে দেশের লোকে কখনও বিড়াল দেখে নি। সেখানে আবার ইঁদুরের ভারি উপদ্রব। দিন-রাত কুটুর-কাটুর, খুট-খাট। কেটে-কুটে সব ছারখার। ইঁদুরের অত্যাচারে লোকেরা অস্থির। দ্বীপের রাজাও ভেবে পান না কি করে এই ক্ষুদে শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করবেন।

এদিকে ছোট ছেলেটির বিড়ালটিও ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে লোম খাড়া করে, গোঁফ ফুলিয়ে, চোখ পাকিয়ে তৈরি। একটা ইঁদুর যেমনি দেখা অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো।

তাই না দেখে প্রজারা ছুটলো রাজার কাছে। রাজা মন দিয়ে তাদের কাহিনী শুনলেন।

প্রজারা বললে, মহারাজ! আমাদের মঙ্গলের জন্যে জানোয়ারটাকে যে কোন দামে কিনতে আজ্ঞা হয়।

রাজা রাজী হলেন। তাই ছোটভাই অন্য দু'ভাইয়ের চেয়ে বেশি ধন-দৌলত নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

এদিকে রাজবাড়িতেও ছিল ইঁদুরের উপদ্রব। বিড়ালটাকে প্রথমে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হোল। বিড়াল মনের আনন্দে ইঁদুর শিকার করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবাড়ি ফাঁকা, কিন্তু ইঁদুর-শিকার করতে করতে বেচারী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ। সে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে ডেকে উঠলো, ম্যাও, ম্যাও।

তাই শুনে সকলে বিষম ভয় পেয়ে গেল।

রাজামশাই তখনই সভা ডাকলেন। সভায় অনেক সলা-পরামর্শের পর ঠিক হোল, বিড়ালের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হোক, সে যদি এই মুহূর্তে স্বেচ্ছায় রাজবাড়ি ছেড়ে চলে না যায়, তা হলে জোর করে তাকে তাড়ানো হবে।

অমনি রাজাজ্ঞা নিয়ে এক ছোকরা-দূত ছুটলো বিড়ালের কাছে। সে বিড়ালকে জিগ্যেস করলে, আপনি এখনই রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে রাজী কি না?

বিড়াল ডাক ছাড়লো, ম্যাও, ম্যাও।

দূত মনে করলো বিড়ালটা বললে, না, না।

রাশিয়ার মস্কো শহরে ১৯৩০ সালের কথা। হাসপাতালে এসেছে গুরুতর আহত একজন লোক—গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটার ফলে হাড় ভেঙ্গে গিয়েছে, তার সঙ্গে ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়ে চলেছে। সার্জেন য়ুডিন ও তাঁর সহকারী মেরী ঠিক করলেন অবিলম্বে রক্তদানের প্রয়োজন। রক্ত পরীক্ষা করে শ্রেণী নির্ণয় করা হ'ল, বিরল এক শ্রেণীর রক্ত—সহজে এই শ্রেণীর দাতাদের পাওয়া যায় না—ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন সকলে—অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে আর বুঝি তাকে বাঁচান গেল না।

সহকারী মেরীর মনে পড়ল একটা কথা, আমার কাছে রক্ত আছে বললেন মেরী।

—তোমার রক্ত কি ঐ গ্রুপের না কি? য়ুডিন তাকালেন সহকারীর দিকে।

—না তা নয়, আমি একবোতল রক্ত ফ্রিজে রেখে দিয়েছি।

—তাতে কি হবে সে ত' জমে গেছে নিশ্চয়।

—না সোডিয়াম সাইট্রেট সলিউসনে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

—কিন্তু—সার্জেন য়ুডিন দ্বিধা বোধ করলেন।

—লোকটা ত' মরবেই একবার চিন্তা করতে দোষ কি?

মেরী সার্জেনের চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সাগ্রহে। তবে তাই হোক। কাজে লাগলেন তাঁরা। বোতলের রক্ত ফ্রিজ থেকে বার করে আনা হ'ল বেশ তাজা দেখতে। অপারেশান থিয়েটারে সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে উৎসুক হয়ে। অজানা জিনিস দিয়ে পরীক্ষা চলছে একজনের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে।

শিরার মধ্যে রক্তবাহী নলের ছুঁচটা ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত রুগীর ধমনীর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে—উদগ্রীবদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন সার্জেন য়ুডিন ও তাঁর সহকারী মেরী। জয় না পরাজয়? রোগীর শ্বাস যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে—পাণ্ডুর মুখে ধীরে ধীরে রক্তিম আভা দেখা গেল—সাফল্যের হাসি ফুটল সার্জেন য়ুডিন আর মেরীর মুখে।

এই থেকেই ব্লাড ব্যাঙ্কের সুরু। রক্তকে সংরক্ষণ করে অনেকদিন পরেও তাকে জীবন বাঁচানোর কাজে লাগানো গেল।

১৯৪১ সালের কথা। হম্বুলুলুতে বসে ডাঃ ফরেস্ট পিনকারটন হিটলারের দম্ভ আর সর্বগ্রাসী যুদ্ধের কথা ভাবছিলেন, ডাঃ পিনকারটন জানতেন যুদ্ধ সুরু হলে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা—আধুনিক অস্ত্রের বলির সংখ্যা যে কি পরিমাণ হবে তার কিছুটা আন্দাজ তিনি করেছিলেন। তাই তিনি রক্ত সংগ্রহের কাজে মন দিলেন—লোকের কাছে চাঁদা তুলে নিজেই সব যন্ত্রপাতি কিনে ব্লাড ব্যাঙ্কের পত্তন করলেন। অনেকে সাহায্য করলেন—অনেকে আবার ব্যঙ্গ করতেও ছাড়লেন না। কবে যুদ্ধ হবে তার জন্যে এত খরচ করাকে তাঁরা অপচয়ের পর্যায়ে ফেলে নানারকম বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে সুরু করলেন। ডাঃ পিনকারটন তাতে নিরাশ হলেন না, নিজের পকেট থেকেই ব্যয় করলেন খরচ চালাতে।

অকস্মাৎ ডিসেম্বর মাসেই সুরু হল যুদ্ধ। জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পার্ল হারবার আক্রমণ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় সাতশ' লোক গুরুতর আহত হ'ল। এবার সকলে বুঝল ডাঃ পিনকারটনের দূরদর্শিতা। ব্লাড ব্যাঙ্কের দরজা দিয়ে ট্রাক বোঝাই রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। রক্ত সরবরাহ চলতে থাকল নিরবচ্ছিন্নভাবে, শত শত আহত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল।

আমাদের দেশেও ব্লাড ব্যাঙ্কের কাজ চলছে। সম্প্রতি চীন আক্রমণের সময় জোয়ানদের পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পাঠিয়ে অনেক জীবনই রক্ষা পেয়েছে। বড় বড় অপারেশানে এবং দুর্ঘটনায় অন্যান্য আহতদের প্রাণ বাঁচাবার কাজে অনেক শহরে হাসপাতালের সঙ্গে ব্লাড ব্যাঙ্কও জন্ম নিয়েছে।

দূতের কথা শুনে মন্ত্রীরা বললেন, দেখা যাক।

তখনি রাজবাড়ির চারধারে বড় বড় কামান বসানো হলো। গুড়ুম গুড়ুম করে কামান গর্জে উঠলো। গোলা ছুটলো। রাজবাড়ির গায়ে গিয়ে লাগলো। পুষিমণিও গোলার শব্দে লেজ তুলে জানালা দিয়ে লম্বা। ওদিকে গোলন্দাজেরা কিন্তু সে রাজবাড়ির মধ্যেই আছে মনে করে সমানে কামান দাগতে লাগলো। দেখতে দেখতে রাজবাড়িটা গেল ধুলোয় মিশিয়ে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি।

দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন ঔরংজীবের প্রপৌত্র দ্বিতীয় আলমগীর।

বাদশাহীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। মারাঠারা দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে পড়েছে, যে কোন সময় তারা নগর লুঠ করবে। বয়স কম হলে বাদশা হয় তো রুখে দাঁড়াতেন, কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে সবকিছু সামলে চলার মত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। সবকিছুই তিনি ছেড়ে দিলেন উজির ইমাদ উল্ মুল্‌ক্-এর উপর। যে ব্যক্তিত্ব থাকলে বাদশাহী চালানো যায় ইমাদের তা ছিল না।

পেশোয় রঘুনাথ রাও পাঠালেন মলহর রাও হোলকারকে। মলহর বললেন—চল্লিশ লাখ টাকা অবিলম্বে চাই, না হলে দিল্লী লুঠ করবো।

ইমাদ টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু টাক আসবে কোথা থেকে, রাজকোষ তো শূন্য। খাজনা আদায় করার জন্য যত উজির-নাজির ছিল তারাই সব লুঠে নিয়েছে।

ইমাদ ব্যবসাদারদের ডেকে বললেন—টাক দিতে হবে।

ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে ন' লাখ টাকা জোগাড় হলো।

তারপর নাগরিকদের মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে ধরা হলো। দিতে না পারলেই বেদম প্রহার। গরীব লোকেরা পাঁচ টাকাও দিতে পারলো না, মার খেয়ে বাদশার দরবারে গেল, বললো—হুজুর, আমাদের টাকা কোথায়?

কিন্তু বাদশা কোন কথা শুনলেন না।

দিল্লীর দোকান-পাট, বাজার-হাট বন্ধ হয়ে গেল। জুলুমের ভয়ে কেউ আর পথে বেরোয় না।

এদিকে বাদশাহী সৈন্যরাও ক্ষেপে উঠলো—মারাঠারা লাখ লাখ টাকা নিয়ে যাবে আর আমরা তিন বছর করে মাইনে পাই নি, এবার আমরাই নগর লুঠ করে খাব।

সৈন্যরা নগর লুঠ করতে বেরুলো।

ইমাদ সেনানায়ক আকিবৎ মহব্বৎ খাঁকে ডেকে পাঠালেন, বললেন—তুমি ফৌজের কর্তা, তুমি কিছুই দেখছ না?

—কি করবো, আমার ফৌজ তিন বছর মাইনে পায় নি।

—কিছু টাকার জোগাড় করো, কিছু কিছু মাইনে দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করো।

—দফায় দফায় পাঁচলাখ টাকা ধার করেছি আর কেউ ধার দিচ্ছে না।

—কেন, গত বছর তোমার বন্ধু জহুরীমলকে তুমি সুপারিশ করে রাজা খেতার দেওয়ালে, সে তো মস্ত বড়লোক। সে কি তোমাকে দু-চারলাখ টাকা ধার দিতে পারে না?

—তার কাছ থেকে পাঁচলাখ টাকা নিয়েছি।

—আরো দু'লাখ নাও।

—চেয়েছিলাম, সে বললে—আর টাকা নেই।

—বাজে কথা বলেছে। চোখ রাঙাও দেখবে টাকা বেরিয়ে আসবে।

—বন্ধু লোক যখনই চেয়েছি তখনই দিয়েছে এখন চোখ রাঙাই কি করে?

—আগে নিজে বাঁচো, তারপর বন্ধুত্ব। টাকা না দেয়, ওর বাড়ি লুঠ কর।

—জহুরীমলের বাড়ি লুঠ করবো?—

—হ্যাঁ। টাকা চাই। সৈন্য নিয়ে যাও, লুঠ করো। যাও।

আকিবৎ বেরিয়ে এলো। কি করবে সে ভেবে পেলে না। জহুরীমলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অনেক দিনের, আপদে-বিপদে নানা-ভাবে সে বহুবার আকিবৎকে সাহায্য করেছে, তার বাড়ি সে এখন লুঠ করবে কেমন করে?

এদিকে ইমাদ তার এক বিশ্বাসী মনসব-দারকে ডেকে বললো—মহম্মদ খাঁ, আকিবৎ খাঁয়ের উপর নজর রাখবে। যদি জহুরী-মলের বাড়ি লুঠ করতে সে পিছিয়ে আসে তার দুনিয়াদারি খতম্ করে দেবে।

মহম্মদ মাথা দুলিয়ে চলে গেল। সে সময় দিল্লীর উজির-নাজিরদের প্রিয়পাত্র হতে হলে নির্বিচারে মানুষকে খতম্ করার অভ্যাস রাখতে হতো, মহম্মদ খাঁ সে বিষয়ে পাকা লোক।

আকিবৎ গেল জহুরীমলের কাছে, জহুরীমল বাড়িতেই ছিল। আকিবৎ বললো—টাকা চাই, যে ভাবেই হোক লাখখানেক টাকা তোমাকে আজ দিতেই হবে।

জহুরীমল বললো—একশো টাকা নেই, তো লাখ টাকা।

—টাকা না দিলে তোমার বাড়ি লুঠ করার হুকুম হয়েছে।

—লুঠ করেও বিশেষ কিছুই পাবে না।

—নগদ টাকা না পার হীরে-জহরৎ দাও, বেচে টাকার জোগাড় করে নেবো।

—সেদিনকার দু'লাখ টাকা, তোমাকে হীরে-জহরৎ বেচেই দিয়েছি, আর সোনাদানা ঘরে কিছু নেই। এসো তোমাকে সিন্দুক-গুলো সব দেখিয়ে আনি।

—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু উজির সাহেবকে বোঝাব কি করে? তোমার এমন কোন আত্মীয়বন্ধু নেই যার কাছ থেকে তুমি লাখখানেক টাকা ধার পেতে পার?

—যারা আছে তাদের অবস্থা আমারই মত। দিল্লীতে আজ কু'জন লোকের হাতে লাখ টাকা আছে বল ত'?

—তা' হলে আমি এখন কি করি?

—বেশ, তুমি আমাকে একটু সময় দাও, আমি সন্ধ্যার মধ্যে ক'জন লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

—শুধু কথা বলা নয়, টাকার জোগাড় তোমাকে করতেই হবে, আমি সন্ধ্যায় আসবো।

আকিবৎ পথে নামতেই মহম্মদ ধরলো আকিবৎকে, তার সঙ্গে আরো ক'জন ঘোড়-সওয়ার। মহম্মদ বললো—আমাদের মাইনের কি হবে?

—কাল একটা ব্যবস্থা করবো।

—কাল কেন? আজই—এখনই।

তারা আকিবৎ খাঁর জামা চেপে ধরলো।

আকিবৎ বললো—এ কি! জানো আমি কে?

মহম্মদ হা-হা করে হেসে উঠলো।

আকিবৎ খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে মহম্মদ খাঁ পিছন থেকে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিল। আকিবৎ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। মহম্মদ সঙ্গীদের বললো—এবার ওই রাজাসাহেবের বাড়ি লুঠ করো, অনেক হীরে-জহরৎ আছে।

মহম্মদের সঙ্গীরা চড়াও হলো রাজা জহুরীমলের বাড়ি।

জহুরীমল চোখের উপর আকিবতের হত্যাকাণ্ড দেখলো, তাড়াতাড়ি সে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। মহম্মদ হাঁক দিল—দরজা খোলো, নয় তো দরজা ভাঙবো।

জহুরীমল ভিতর থেকে বললো—দরজা খোলা হবে না, কি দরকার আগে বল?

—আমাদের টাকা চাই।

—টাকা আমার নেই।

—আছে কি না আমরা দেখতে চাই।

—তোমাদের দেখাবো কেন, তোমরা কে?

—উজির সাহেবের হুকুম।

—ফরমান দেখাও।

—দরজা খোলো।

—না।

মহম্মদ হুকুম দিলে—দরজা ভাঙো!

ফটকের মাথায় ছোট একটা বারান্দা ছিল, জহুরীমল সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো হাতে বন্দুক, বললো—উজির সাহেবের ফরমান আগে চাই, না হলে ফটকে হাত দিলেই গুলী চালাবো।

মহম্মদ হা-হা করে হাসলো। বললো—কাফেরের সাহস হয়েছে, চোখ রাঙাচ্ছে। দরজা ভাঙো!

মহম্মদের দল দরজায় ধাক্কা দিল। সাধারণ বাড়ির সাধারণ দরজা, কয়েকটি লাথি

গিনুর আবিষ্কার

শ্রীনরেন্দ্র দেব

'গিনুদি' ছোট্ট মেয়ে, বয়স মাত্র পাঁচ।
নন্দীর পুতুল যেন! মুখটি ক্ষীরের ছাঁচ।
দু'টি চোখে খুশি ভরা, হেসে হেসে কথা কয়,
সবার খবর রাখে ঘুরে ঘুরে বাড়িময়।
পাশের গলিতে ছিল ছোটদের ইস্কুল,
সেখানেই গিনু পড়ে, আঁকে ছবি, বোনে 'উল্'
পারে সে লিখতে নাম, মনে রাখে সব পড়া,
ইংরিজী বাংলায় শিখেছে অনেক ছড়া।
বড়ো সে লক্ষ্মী-মেয়ে, সকলেই ভালোবাসে
জানতে, শিখতে চায়—
'মেঘে কেন জল আসে?'
'ছাগলে তো ঘাস খায়। কুকুরে খায় না কেন?'
'গাধা কি সত্যি বোকা?' প্রশ্ন কতো কি হেন।
একদিন গিনু বলে,—'ছিলুম কোথা মা আমি?
গাছের ডালেতে নাকি? বলেছেন রাঙামামী!
জন্ম হবার আগে কোথায় ছিলুম বলো?
দেখে আসি সে দেশটা, পুজোর ছুটিতে চলো।'
মা বলেন, 'বোকা মেয়ে! কিছু তোর মনে নেই
গুঁড়ি মেরে ছিলি তুই আমার এ পেটেতেই।'
গিনু শুনে মনে মনে ভাবলো কি যেন, শেষে,
জড়িয়ে মায়ের গলা উল্লাসে বলে হেসে—
বুঝিচি, বুঝিচি, তুমি 'কাঙারু'
ছিলে মা, না গো?
পেটের থলিতে ভ'রে রাখতে আমাকে, মাগো।
শুনে মা বলেন হেসে মেয়ের দু'গালে চুমি
'কাঙারুর ছানা গিনু, মানুষ হয়েছো তুমি!'

পড়তেই দরজা ঝনঝন করে উঠলো। জহুরীমল বুঝলো এ দরজা আর বেশিক্ষণ টিকবে না। সে এবার বন্দুক বাগিয়ে ধরলো, তাক করলো মহম্মদের পানে। কিন্তু ঠিক সেই সময় পাশ থেকে একটি গুলী এসে লাগলো জহুরীমলের উপর। সে ঘুরে পড়ে গেল একেবারে নীচে, ফটকের সামনে। মহম্মদ চীৎকার করে উঠলো—বহুৎ আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।

পাশের ঝরোখা দিয়ে জহুরীমলের মেয়ে সবকিছু দেখছিল, পিতার মৃত্যু দেখে সে আর্তনাদ করে উঠলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মহম্মদের দল দরজা ভেঙে ফেললো। হুড়মুড় করে এসে ঢুকলো বাড়ির মধ্যে। বাড়িতে জহুরীমলের বুড়ি-মা আর মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। শহরের অরাজক অবস্থার মধ্যে দাস-দাসীরা পালিয়ে গিয়েছিল। বুড়ি-মাকে সামনে দেখে মহম্মদ বললো—এই বুড়ি, টাকা পয়সা কোথায় আছে বল?

—আমি জানি না, দেখে নাও।

মহম্মদের সঙ্গীরা ঘরে ঢুকে সব তচনচ করতে সুরু করে দিল।

ওদিকে রান্নাঘরে আগুন দেখা দিল। অপমানের ভয়ে জহুরীমলের মেয়ে ঘরে আগুন দিল। ঘরের একপাশে জ্বালানীকাঠ ও খড় ছিল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। দেখতে দেখতে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লো। খানিকটা হৈ-চৈ করে মহম্মদের দল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রীষ্মকাল দিল্লীর সে অঞ্চলে তখন জলের খুব অভাব, দেখতে দেখতে বাড়ি পুড়ে শেষ হয়ে গেল। পিছনের উঠানে দেওয়ালের পাশে বসে বুড়ি-মা সব দেখলো, শেষে বিড়বিড় করে বলে উঠল—বংশে আর কেউ রইল না, আমি একা।

সেইদিন থেকে বুড়ি সেই প্রাঙ্গণেই থাকে। প্রতিবেশীরা কোনদিন কিছু দিলে খায় নইলে উপোসেই কাটে। পোড়া-বাড়ির পানে তাকিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

জহুরীমলের বন্ধু কেউ কেউ বলছে—বুড়ি-মা চল আমাদের কাছে গিয়ে থাকবে।

বুড়ি বলেছে—না এখান থেকে আমি কোথাও যাবো না, এইখানেই মরবো।

—কেন, এই জমিটা বেচে তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও না?

—কি হবে আর ঠাকুর-দেবতায়? সারাজীবন ধরে তো অনেক পূজা-অর্চনা করেছি, তার তো এই ফল হলো, আর কেন।

উঠানের ভাঙা পাঁচিলে হেলান দিয়ে বুড়ি উদয়-অস্ত একভাবে বসে থাকে।

কেউ কেউ বলে—বুড়ি এই জায়গা ছাড়তে পারে নি কেন জান, হীরে-জহরতের মায়ায়। জহুরীমল জহরতের কারবারী ছিল, ডাকাতির ভয়ে বাড়ির কোন জায়গায় সব পোঁতা আছে, বুড়ি তা জানে তাই নড়তে চায় না।

পাড়াপড়শীরা বুড়ির যত্ন করে। কবে কখন্ কার উপর প্রসন্ন হয়ে হীরে-জহরতের সন্ধান বলে দিয়ে যায় ঠিক কি! জহুরীমলের জহরৎ তো কম ছিল না।

উজির ইমাদের কানে কথাটা পৌঁছায়। মহম্মদ খাঁকে ডেকে ইমাদ বললো—খাঁ সাহেব, জহুরীমলের বাড়ির খবর কিছু রাখো?

—বাড়ি তো আর নেই, উঠানের এক গাছতলায় বুড়িটা পড়ে আছে।

—বুড়িটা ওখানে আছে কেন?

—আর যাবার কোন জায়গা নেই।

—কিন্তু লোকে বলছে জহুরীমলের হীরে-জহরৎ পোঁতা আছে মাটির নীচে, বুড়ি সে সবের মায়া ছাড়তে পারে নি।

—হতে পারে।

—তুমি একটু কৌশলে খবরটা নেবার চেষ্টা কর।

—আপনি হুকুম করলেন—অবশ্য চেষ্টা করবো।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর মহম্মদ খাঁ রাজস্থানী পোষাক পরে রাজপুত সেজে জহুরীমলের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো।

প্রতিবেশীরা দেয়ালের পাশে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে দিয়েছিল, কয়েকটা বাঁশের মাথায় একটা দরমার ছাউনি। ছাউনির নীচে বুড়ি-মা বসেছিল মহম্মদ এসে দাঁড়ালো। বললো—কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?

বুড়ি তাকালো তার মুখের পানে; বললো—ঠিক তো চিনতে পারছি না, এখন চোখে কম দেখি।

সে তো হবেই, এতো বড় একটা ধাক্কা সহা তো কম কথা নয়!

—তবু তো বেঁচে আছি।

—জীবন মৃত্যু ভগবানের হাতে!

মহম্মদ উবু হয়ে বসে পড়লো, নীচু গলায় বললো—আমার নাম পান্নালাল, এ বাড়িতে আমি অনেকবার এসেছি। একসঙ্গে কারবার করছি পনেরো-ষোলো বছর, কিন্তু হঠাৎ এমন হবে কে জানে? বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি। লখনৌ গিয়েছিলাম, যাবার আগে লাখখানেক টাকার জহরৎ জহুরীমলের জিম্মায় রেখে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি এই ব্যাপার, এখন কি করি। আপনি জানেন কিছু, কোথায় সে হীরে-জহরৎ রাখতো। শুনেছি শোবার ঘরের মাটির নীচে ওর একটা সিন্দুক ছিল, জায়গাটা যদি আমাকে দেখিয়ে দেন তো আমি নিজেই বের করে নিই।

বুড়ি মহম্মদের কথাগুলি শুনলো, চাঁদের আলোয় ভাল করে তাকালো মহম্মদের মুখের পানে, তারপর বললো—এই রাতের অন্ধকারে দেখার কি সুবিধা হবে?

—এই অন্ধকারই তো ভাল, কারও নজরে পড়বে না।

—চল, তা হলে দেখিয়ে দিই। কিন্তু সিন্দুক খুলে তোমার জহরতগুলোই শুধু বেছে নেবে, অন্য জিনিসে হাত দেবে না, অঙ্গীকার কর।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি কথা দিচ্ছি।

বুড়ি এবার উঠে দাঁড়ালো, লাঠিটা হাতে নিয়ে বললো—চল।

মহম্মদ মহা উৎসাহে বুড়ির সঙ্গে চললো।

পোড়াবাড়ির ইট-কাঠ-রাবিশের ঢিবি হয়ে গেছে। বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে কোনমতে সেই ঢিবির উপর দিয়ে এগিয়ে চললো, ঠিক মাঝখানে গিয়ে বললো—এই জায়গা খুঁড়তে হবে।

যো হুকুম হুজুর

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

হামলাগড়ের আমলারা সব যে-যার নিজের কার্যে
চোরাগোপ্তা ঢুকে প'ড়ে হবু রাজার রাজ্যে
লুঠ ক'রে আর লোপাট করে মেরে ধরে দেদার
তচনচিয়ে দিলো যখন এধার ওধার সেধার,
শান্তিপ্রিয় হবুচন্দ্রের ভাঙলো তখন ঘুম।
চললে নিজের প্রজাদেরই ধর-পাকড়ের ধুম।
তারপরেতে হামলাগড়ের বাদসার ফোন ধরে
বলেন, হুজুর জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাফ ক'রে
বলুন কি কি করতে হবে আমায় খেসারতে?
আপনার সব আছে হেথায় বহাল তবিয়তে।
বাদসা তখন ফোনেই দিলেন হবুচন্দ্রে হাঁকড়ে।
বলেন, তোমার দেশের যত দাঙ্গাবাজে পাকড়ে
হামলাগড়ে পাঠিয়ে দেবে, বিচার করবো আমরা।
জ্যান্তে খুলে নেবো তাদের দেহ থেকে চামড়া।
আমার লোকে যা পেয়েছে চাপিয়ে তাতে আরো
প্লেনে করে পাঠিয়ে দেবে যত শীগ্‌গির পারো।
আর শুনছো, আমলা যারা গেছে এবং যাচ্ছে
শুনি যেন সবাই তারা তোয়াজ আদর পাচ্ছে।
বুঝেছো তো? বেচাল হলেই বাধিয়ে দেবো যুদ্ধ।
যো হুকুম হুজুর বলেন হবু, আমি তো নই বুদ্ধু।

মহম্মদ ধীরে ধীরে রাবিশ সরাতে সুরু করলো। হাতে একটা বল্লমের মত লাঠি ছিল, তার খোঁচা মারে আর দু'হাত দিয়ে তুলে তুলে ফেলে।

বুড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর কোন এক সময় বললো—মাথার পাগড়িটা খোলো, গায়ের জামা খোলো, অতো জোব্বা-কামিজ পরে কি একাজ হয়?

মহম্মদ পাগড়ি খুললো, জামাও খুললো। তারপর উবু হয়ে বসলো রাবিশ খুঁড়তে। বুড়ি চাঁদের আলোয় নিরীক্ষণ করে দেখলো মহম্মদকে। তারপর পায় পায় এসে দাঁড়ালো মহম্মদের পিছনে ঢিবিটার উপর। বুড়ির দিকে মহম্মদের নজর ছিল না। জহরতের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে।

বুড়ি হাতের লাঠিটার মাথায় ভালো করে হাত বুলালো। মুণ্ডিটা রূপা দিয়ে বাঁধানো আছে। দু'হাত দিয়ে লাঠিটা ঠিকমত বাগিয়ে ধরে বুড়ি আপ্রাণ শক্তিতে এক ঘা বসিয়ে দিল মহম্মদের মাথায়। আঁক্ করে একটা শব্দ করে মহম্মদ ঘুরে পড়লো আর সাড়া নেই। বুড়ি একবার তাকিয়ে দেখলো তারপর আর সেখানে দাঁড়ালো না।

পরদিন সকালে মহম্মদের দেহ পড়শীদের নজরে পড়লো, সবাই অবাক হলে—এভাবে ওর মাথা ভাঙলো কে?

বুড়ি বললো—কাল সারারাত দেখেছি এখানে জহুরীমহলের ভূত ঘুরছে, সেই বোধ হয় মেরে গেছে। লোকটি কে?

যারা চিনতো তারা বললে—উজির ইমাদ সাহেবের মনসবদার।

বুড়ি বললো—ওকেই তো উজির পাঠিয়েছিল এই বাড়ি লুঠ করতে, সেই লোক তো?

—হ্যাঁ, সে-ই।

—তা হলে ঠিকই হয়েছে। প্রেতাত্মা শত্রুকে ঠিকই চিনেছে। চিনে মেরেছে।

অনেককাল পরে বুড়ি পাগলের মত খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলো—শাস্তি ঠিকই হয়েছে, বড় আমোদ হচ্ছে।

পড়শীরা বুড়ির মুখের পানে তাকিয়ে রইল। বুড়িই লোকটাকে মারে নি তো? কিন্তু সত্তর বছরের বুড়ি একটা জোয়ান মনসবদারকে মারতে পারে—একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। মৃত্যু রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।*

---

* ইমাদ ও আকিবৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যদুনাথ সরকারের 'ফল অফ দি মুঘল এম্পায়ার' দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নতুন ভূগোল

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সিংহলেতে বন-বাদাড়ে সিংহ না কি অগণ্য?
লাওসেতে লাউ প্রচুর ফলে। নইলে ও নাম কি জন্য?
সস্তা দরে লাক্ষা চাও তো লাক্ষাদ্বীপে যাও চলে।
সেরা জাতের ময়না পাবে ময়নাগুড়ির জঙ্গলে।
মাঞ্চুরিয়ায় মানকচু খুব? বালিতে কি সব বালি?
কলাম্বিয়ায় শুধুই কলা? যবদ্বীপে যব খালি?
হাওয়াই দ্বীপে সদাই হাওয়া? মোম্বাসাতে মোমবাতি?
কোস্টারিকায় কোস্তা মেলে? হাতিয়ায় কি নেই হাতী?
জাম্বেজিতে বেজীগুলো সত্যিই কি খুব তেজী?
জামতাড়াতে জাম পাওয়া যায় এক পয়সায় সাত কেজি?
হাভানাতে সবাই হাবা? ডাব্লিনে ডাব সস্তা কি?
গজনীতে গজদন্ত মেলে বস্তা বস্তা কি?

হিরাটেতে প্রচুর হীরা—ভাবতে মনে নেই বাধা।
হীরের চেয়ে কিম্বার্লির বালি না কি নামজাদা?
লিভারপুলের কলের জলে লিভার হবে ফের তাজা।
তারপরেতে খাজুরিয়ায় গরম-গরম খাও খাজা!
কুল্টিতে কুল কি সুস্বাদু! প্যারাগুয়ের বেশ প্যারা!
মাংস যদি চাও সেরা তো ভেরাক্রুজের খাও ভেড়া!

বহুমূলাতে মিস্টি মূলা কিন্‌তে পারো একবোঝা।
সবাই বলে মোজার জন্যে বিখ্যাত খুব ফরমোজা!
নীলগিরিতে নীলের চাষে ব্যস্ত কি সব মাদ্রাজী?
বাগদাদে খুব বাগ-বাগিচা; দাদের গুজব—কারসাজি!
গণ্ডামেতে ভাবছো বুঝি সবাই টানে গঞ্জিকা?
মল্লিকপুর কল্পলোকেই ফোটায় কেবল মল্লিকা!
গ্যাংটকে ফল কি টক, কি টক! ভামোতে ভাম অসংখ্য!
শিয়ালকোটের শিয়ালগুলোর নেইকো মনে আতঙ্ক!

মণিপুরে মণির দ্যুতি,—কবি-মনের কল্পনা!
পণ্ডিচেরির সিন্ধুকূলে চেরী ফলায় কোন্‌জনা?
মতিহারির মোতির মালা রূপকথাতেই দেয় জ্যোতি!
ব্যাপারীদের মাথায় সেথা তামাক এবং লাভ-ক্ষতি!
সান্তিয়াগোয় শান্তি পাবে',—ভাবছে কেবল মূর্খ রে!
আসক্তি যার নেইকো মোটেই তারই গেছে দুঃখ রে!
পেট-রোগারা ঐ ছুটেছে জলন্ধরের জল খেতে!
ভুটান দেশের ভুট্টার স্বাদ ভুলবে না এ জন্মেতে!
মিথ্যা কথার ইন্দ্রধনু তৈরি ক'রে হই সুখী!
সত্যনিষ্ঠ সজ্জনেরা নিন্দে করুন—নই দুখী!

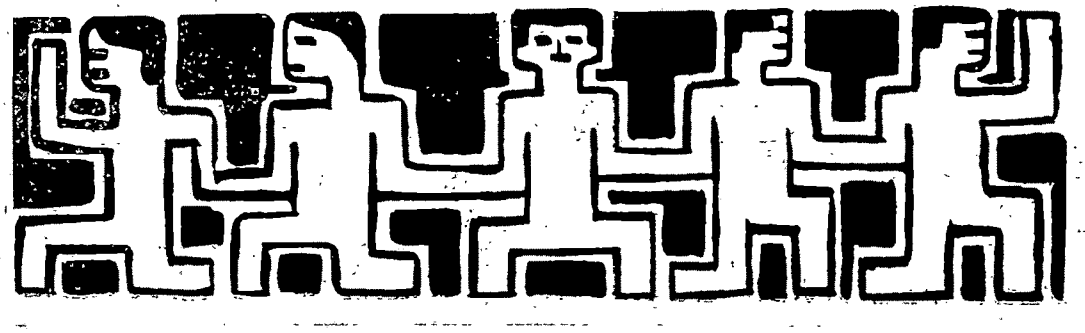

গুলদস্তাঁ বা ফুলের তোড়া

আজ পাকড়াশী

বর্তমানের কয়েকজন মুসলমান কবি বা সায়র-এর উর্দু কবিতা বা সের আর নজম দিয়ে আমি আমার এই গুলদস্তাঁ বেঁধেছি। এইসব নাম না-জানা ফুলের গন্ধ, বর্ণ আপনাদের খুশি করতে পারবে কি না জানি না; তবু পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি? হয় তো ভাল লাগতে পারে।

যদি বলি এতে আছে, গুলজাওরি, নর্গিস, চামেলি, রাতরাণী আপনারা বলবেন সে আবার কি? এ সব আবার কি ফুল? যেই শুনবেন—ডালিয়া, ড্যাফোডিল, যুঁই, হাস্নুহানা অমনি বলবেন, ওহো তাই বল? ঠিক এমনিই মনে হবে এই কবিতাগুলি পড়ে। সুতরাং আশা করি আমার এই ফুলের তোড়ার শোভা, বর্ণ, গন্ধ আপনাদেরও আনন্দ দেবে।

অনেকের ধারণা উর্দু কবিতায় শুধু থাকে সুরা আর শাকি, গুল আর বুল-বুল। গুল মানে বাগান, ফুল এই সব। কিন্তু সেইখানেই যে এর পরিণতি নয় সুরায় মাতাল কবিও যে আবার ভগবত-রসে মাতাল হয়, জীবনের বৈচিত্র্যও যে তাকে মাতাল করে এইটুকু প্রমাণ করতে চাই।

দু' লাইনে যা বলা যায় তা হল সের। চার লাইনে রুবাই, আর বড় কবিতা হল নজম বা গজল। যে কবি যেখান থেকে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁর নামের সঙ্গে সেই স্থান জুড়ে গিয়ে পদবী হয়েছে।—জিগর মুরাদাবাদী সের :—

দিল কি সুকুল, রূহ কি আরাম আগয়া,
মৌত আগঈ কি দোস্ত কা পয়গাম আগয়া।
এক হাতে শরীরের শান্তি,
অন্য হাতে আত্মার মুক্তি নিয়ে
হে মরণ তুমি আমার পরম
মিত্রের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ।

মজাজ লখনৌয়ী :—

কবিগুরুর কথায় মানুষের কাছে বিশ্ব যখন তিলে-তিলে নিঃস্ব হয়ে আসে, তখন তার ওষ্ঠে ভুবনভরা হাসি ওজন দরে মেলে। ঠিক তেমনি নিঃস্ব অবস্থায় পড়লে মানুষের কাছে চাঁদের শোভাও ম্লান হয়ে যায়, অন্য রূপ নেয়। এঁর 'আওয়ারা' কবিতার কয়েকটি লাইন—

'ইক মহল কি আয় সে
নিকলা উয়ো পিলা মাহতাব
জৈসে মুল্লা কা আমামা,
জৈসে বনিয়ে কি কিতাব,
জৈসে মুফলিস্ কি জওয়ানী,
জৈসে বেওয়াকা শবাব।'

'একটা মস্তবাড়ির আড়াল থেকে ঐ হলদে রং-এর চাঁদ বেরিয়েছে, চাঁদের ঐ হলদে রং যেন মোল্লার হলুদ আলখাল্লা। যেন বেণের হিসেবের হলদে খেরো, যেন ভিখিরী মেয়ের যৌবন, যেন বিধবার সাজ।' আর কিছু নয়।

শকীলবাজায়োনী রুবাই—
অজল্ হুয়াথা মেরি শকিল
কিসমৎ মে গম উঠানা
খুলি যো আঁখে ইস্ অঞ্জুমন্
মে নজর মিলিথি আসমাসে পহলে।
উঠা যো মীনা বজস্তে শাকি,
রহনা কুছ ঔর জপ্ত বাকি।
হরতক ম্যায় কস্ পুকার উঠা,
ইহাঁয় সে পহলে, ইহাঁয় সে পহলে।

ভেবেছিলাম আমার ভাগ্যের লিখনই বুঝি এই যে, সারাজীবন আমাকে দুঃখ সইতে হবে। কারণ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চক্ষু মেলেছিলাম ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে। তাই ঐ আকাশের রোদের জ্বালা, আর ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-এর পালাই হবে আমার জীবনের পাথেয়।

কিন্তু যে মুহূর্তে প্রকৃতি-সুন্দরী সেই মেয়েটি হাতে মধুরসেভরা শরাবের পেয়ালা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকৃতি মধুশালার চতুর্দিক থেকে ডাক উঠল, আগে এদিক থেকে সুরু কর, আগে এদিক থেকে সুরু কর। প্রকৃতির পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের পান করাও, মাতাল করে দাও তোমার অপরূপ শোভায়।

জিগর মুরাদাবাদী—দেশ বিভাগের সময় লেখা।

জন্ম।

হায় জখ্মে জয়নাত জো হিন্দু হায় ইন দিনোঁ,
হায় দাজেঁ জিন্দগী জো মুসলমাঁ হায় আজকথ।
শাইস্তগী কে ভেস্ মে রূহে দরিন্দজী,
ইন্সান কে লিবাস মেঁ শয়তা হায় আজকথ।
ফিক্রে জমীল খোয়াবে পরিশাঁ হ্যয় আজকথ
শায়র নহিঁ হ্যয় উয়োহ জো গল লখ্বাঁ
হ্যয় আজকথ।

আজ যে হিন্দু হয়ে জন্মেছে সেও যেমন পাপ করেছে, মুসলমান হয়ে যে জন্মেছে সেও তেমনি জন্মে অধর্ম করেছে। সভ্যতা শিষ্টাচারের বেশ বদল হয়েছে আজ পশুতায়, আজ মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে শয়তান হয়ে উঠেছে। ন্যায়বিচার আজ স্বপ্নের মত বিদায় নিয়েছে। আজকের দিনেও যে মনের আনন্দে গজল লেখে, সে কবি নয়।

জীগর মুরাদাবাদী এবার এঁর কয়েকটি নজম আর গজল লিখব।

ইস্ক-ভালবাসা, আসিক—প্রিয়—মাসুকা—প্রিয়তমা—হপ্ন—সুন্দর।

নজম :—

পহলে শরাব জিস্ত থি অব জিস্ত হায় শরাব।
গুদাজেঁ ইস্ক নহিঁ কম জো ম্যয় জওয়াঁ নরহা,
ও হি হায় আগ মগর আপ মে ধুঁয় ন রহা।
জিগর আহ অজাঁমো আগাজেঁ উল্ ফত,
সুকুত আখির-আখির ফুপাঁ অব্বল অব্বল।

আমি আগে সুরার নেশায় মাতাল ছিলাম, সুরাই ছিল আমার জীবন, আর আজ জীবনই হয়েছে আমার সুরা। এই জীবন-বৈচিত্র্য, এই বেঁচে থাকার নেশা, পলে পলে নিজের মধ্যে তোমাকে অনুভব করার নেশা, এরই বা তুলনা কোথায়? আজ আমার তারুণ্যের সেই চপলতা নেই বলে এই নয় যে আমার মধ্যে প্রেমের দ্রাবক রসে ভাটা পড়েছে। বরং আরও গাঢ়তা এসেছে। স্বাভাবিক নিয়ম তো তাই। প্রেমারম্ভ আর প্রেমের অন্ত এতে তো অন্তর হবেই। একটি চাওয়া, অন্যটি পাওয়া। আরম্ভে যে ব্যাকুলতা, পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তার যে জ্বালা যে শঙ্কা ছিল, বিরহের যে বেদনা ছিল আজ তার রূপ বদল হয়েছে। সেই কান্না, দ্বন্দ্ব আজ শান্তিতে রূপায়িত। আগুন তেমনি জ্বলছে, কিন্তু আজ সে অগ্নি নির্ধূম।

গজল :—

(১)

দিল মেঁ কিসিকে রাহ্ কিয়ে যা রাহা হুঁ ম্যয়
ঔর কিতনা হাঁসিঁ গুনাহ্ কিয়ে
যা রাহা হুঁ ম্যয়;
ফর্দএ অমল সিয়াহ্ জিয় যা রাহা হুঁ ম্যয়।
ঔর রহ্মত কো বেপনাহ্ কিয়ে
যা রাহা হুঁ ম্যয়,
গুলসন পরস্ত হুঁ মুঝে গুলহি নহি আজিজ্,
পর কাঁটো সে ভি নিবাহ্ কিয়ে যা রাহা হুঁ ম্যয়া
ইউ জীন্দগী গুজার রহা হুঁ তেরে বগ্এর
জৈসে কোই গুনাহ্ কিয়ে যা রহা হুঁ ম্যয়।

Dealers :

Registered Tata, IISCO & Hindusthan Dealers, Asbestos Cement Sheets, Horse & Bullock Shoe Nails Merchants and General Order Suppliers.

P. PAUL & BROTHERS Pvt. Ltd.
39/B & 30, Nirmal Chunder Street
CALCUTTA-12.

for all types of
WATCHES
CLOCKS & TIMEPIECES

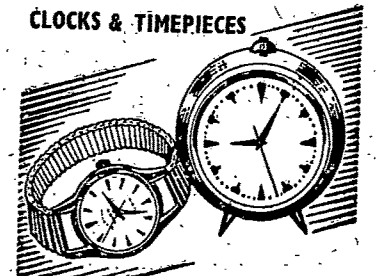

Consult
H. B. DEY & SONS
146-I, B. B. GANGULY ST. CALCUTTA-12

সারপ্রিয়
রবীন্দ্রের সন্দেশ ও মূর্তি
শ্রীরবীন্দ্র নাথ আশ
১৫৭, বিবেকানন্দ রোড, ফোন ৩৫-১৭১০

(২)

হমেঁ মালুম হায় হমসে শুনো,
মহশর মেঁ কেয়া হোগা।
সব উসকো দেখতে হোঙ্গে,
উয়ো হম কো দেখতা হোগা॥
জহন্নুম হো কি জন্নত, জো ভী হোগা
ফয়সলা হোগা।
ইয়ে কেয়া কম হায় হমারা
ঔর উনকা সামনা হোগা।
ইয়ে মানা ভেজ দেগা হমকো কহশর সে
জহন্নুম মেঁ।
মগর জো দিল পে গুজরেগী
উয়ো দিলহী জানতা হোগা॥
সমঝতা কেয়া হায় তু দীওয়ান গানে—
ইস্ক কো জাহিদ।
ইয়ে হো জায়েঙ্গে জিস্ জানিব
উসী জানিব খুদা হোগা॥

(৩)

মেরা জো হাল হো সো হো, বর্কে—
নজ্‌র গিরায় জা।
মঁয় ইঁয়ূহী নালাকশ্, রহুঁ, তু ইঁয়ূহী মুস্করায় জা॥
লহজা—ব—লহজা, দম—ব—দম,
জলওয়া—ব—জলওয়া আএ জা।
তশ্না—এ—হুশ্নে—জাত হুঁ তশ্নালবী
বড় হায় জা॥
জিতনি ভি আজ পি সকুঁ,
উজ্‌র নকর পিলায় জা
মস্ত নজর কা ওয়াস্তা, মস্তে—নজর বনায়ে জা॥
লুত্‌ফ সে হো কি কহর সে,
হোগা কভী তো রূ—ব—রূ।
উস কা জহাঁ পতা চলে, শোর ওঁরহি মচায় জা॥
ইস্ক কো মুতমইন ন রখ, হুস্নকে এতমাদ পর।
উয়ো মুঝে আজমা চুকা, তু উসে আজ মায় জা॥

১। আমার মনের মধ্যে আমি তোমার জন্য আসন পেতে রেখেছি, পথ করে রেখেছি। যদি বল পাপ, তবে কি সুন্দরভাবে পাপ করে চলেছি আমি। আমার জীবন-খাতার শেষ পাতাটি পর্যন্ত কালো করে দিয়ে যাচ্ছি আমি। ভগবান! তাঁকেও শুদ্ধ এমনভাবে পাপের পঙ্কে ডুবিয়ে নিরাশ্রয় করে ছেড়েছি যে আমাকে তাঁর ক্ষমা করার ক্ষমতাই নেই।

বাগান আমি ভালবাসি, কিন্তু শুধু তার ফুল, ফল, পাতা নয়, তার কাঁটাগুলি পর্যন্ত আমার একান্ত প্রিয়। সুতরাং জীবনে শুধু সুখ নয়, দুঃখও আমার প্রিয়। এই যে আমি তোমাকে না পেয়ে তোমার বিরহে দিন কাটাচ্ছি এটাই তো আমার কাছে মস্তবড় পাপ মনে হচ্ছে।

২। শোন, আমি জানি এর শেষ পরিণতি কি? সকলে মৃত্যুকে ভয় পায়? কিন্তু সেই মরণই আমার কাছে আসতে ভয় পাবে। নরকে যাব কি স্বর্গে যাব, তার বিচার পরে হবে, কিন্তু এই বা কি কম যে, স্বর্গ-নরকের মালিক স্বয়ং আসবেন আমার বিচার করতে? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আমার মনের এই প্রেমের ফল্গুধারার গতি কোনদিকে তা আমিই জানি। তবে এটুকু জেন সত্যকার প্রেম যেখানে, খোদার আসনও সেখানে।

৩। সুতরাং আমার যা হবার তা হবে, তুমি আমার মনের মধ্যে বসে এমনি করে কটাক্ষ হানতে থাক। একটার পর একটা আঘাত দিয়ে এমনি করেই আমার মনটা তুমি বেদনার্ত করে তোল, আর আড়ালে বসে হাস। কিন্তু তবু আমার মনের গহনে তুমি নানারূপে, নানাবেশে, ছবির পর ছবি হয়ে ভেসে যাচ্ছ আর তোমাকে পাবার তৃষ্ণা আমার বেড়েই চলেছে। মাতাল করে দাও আমায় তোমার প্রেমে, আমাকে ডুবিয়ে দাও তোমার ভালবাসায়। বেহুঁস করে দাও প্রেমের শরাবে। তোমার চিন্তায় লীন করে দাও আমায়। ওজর তুল না, আপত্তি কোর না। শাস্তি পাব কি ক্ষমা পাব সে যখন বিচার হবে তখন দেখা যাবে, কিন্তু তুমি যদি সুন্দরের পূজারী হও, তবে আমার মনের এই সুন্দর-নির্মল প্রেমকে আঘাত দিয়ে কালো করে দিও না। আমার এই রক্তাক্ত অন্তর দিয়ে প্রেমের কি জ্বালা তা মর্মে মর্মে বুঝেছি, এবার তুমি একটু অনুভব কর এই আমার অনুরোধ।

* * *

সায়রীন—মহিলা কবি।
সায়রীন—মনুয়া, রুবাই :—
গ'র মজ রোঁ সে হো দূর
তো ভিল হায় মজবুর,
তব ভি মেরী উলফত্ সে
দিল তেরা হো সখমুর।

আমাকে তোমার দৃষ্টির নাগালের বাইরে রেখে নিজের মনকে বাঁধতে চাও? তবু আমার ভালবাসার শরাব তোমার মনকে মাতাল করবে, আমার এই নির্মল প্রেমের জ্যোতি তোমার মনে প্রতিফলিত হবেই।

এই মহিলা কবির রুবাইটি ফুলের তোড়ার ফুল নয়, একটি লতা। আমি এই লতাটি দিয়ে আমার গুলদস্তা বাঁধা শেষ করলাম।

আগমনী বিজয়ার গান

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ

লোক-সঙ্গীতে ও ধর্ম-সঙ্গীতে জাতির মানবিক ও মানসিক জীবনধারা সুর তোলে—সেই সুরেই ধরা পড়ে জাতির সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনা। বাঙালীর মাতৃ-সঙ্গীত—যে সঙ্গীতসমূহে কখনো করুণ-সুরে, কখনো আনন্দোচ্ছ্বাসে বাঙালী আগমনী-বিজয়ার গান গেয়েছে, সে সঙ্গীতগুলির তুলনা লোক-সঙ্গীতরূপে—আবার ধর্ম-সঙ্গীত-রূপেও পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যের সঙ্গে হতে পারে না; এগুলির মর্মস্পর্শিতা ও অনন্যসাধারণ তন্ময়তা জাতীয়-জীবনের অভিব্যক্তিরূপেই চিরন্তন-মাধুর্যবর্ষী হয়ে আছে। গানগুলির কথা ও সুর পুরানো হয় না—নিত্য নবরস সৃষ্টি করে চলেছে।

ধর্মের আধ্যাত্মিকতা এ গানগুলিকে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞায় নিরস করে নি—আগমনী-বিজয়ায় মাতৃবন্দনারূপে এ গানগুলি চিন্ময়ী মহাশক্তিকে বাঙালী-ঘরের আদরিণী কন্যারূপেই বরণ করার মন্ত্র-দীক্ষা দিয়েছে।

শিব ও উমাকে নিয়ে বাঙালীর সঙ্গীত—উমা কখনো কালী আবার কখনো অন্নপূর্ণা। এই সঙ্গীতগুলির সুরধুনী ধারায় মর্ত্যে অমর্ত্যের বার্তা রটে। কবি যখন বলেন—

আজ শুভনিশি পোহাল তোমার
এই যে নন্দিনী এল
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি
দূরে যাবে দুঃখ রাশি
ও চাঁদের মুখের হাসি
সুধারাশি ক্ষরে ক্ষরে।

তখন জননীর হৃদয়টি কন্যাস্নেহে মধুর হয়ে ওঠে। চাঁদমুখের হাসিতে সংসারকে আলোকিত পুলকিত করে। মাতা—গিরিরাণী কখনো আদরিণী কন্যার স্নেহমধুর আব্দারে স্বামী গিরিরাজের নিকট অনুযোগ করছেন—

গিরিরাজ! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে,
উমা কেঁদে করে অভিমান,
নাহি করে স্তন্যপান
নাহি চায় ক্ষীর-ননী-সরে।
অতি অবশেষে নিশি
গগনে উদিল শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।

স্নেহময় এই পরিবেশের চিত্র অপূর্ব—বাঙালী ঘরের কন্যাটি চিরন্তনী প্রতীক হয়ে এখানে চাঁদ ধরতেই যেন বায়না ধরেছে। আবার এর আধ্যাত্মিক অর্থও আছে—গিরিরাজ মূল অব্যক্ত সত্তার প্রতীক, মেনকা অভিব্যক্তি সত্তার প্রতীক। উমা কুণ্ডলিনী-শক্তি। গগনে উদিত শশী হচ্ছে সহস্রদলের মহাবিন্দুতে মহাজ্ঞানরূপ পরম-শিবের প্রকাশ। এ গেল আধ্যাত্মিকতার কথা—লৌকিকদৃষ্টিতে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতে যে সুর উদাত্ত—সেখানে আমরা চিরদিনের বাঙালী সংসারের সুখ-দুঃখের স্বাদ পাই।

মাতা স্বপ্ন দেখলেন কন্যাকে—স্বামীকে সেই স্বপ্নের কথা বলছেন করুণ-কাতর সুরে—

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে
চৈতন্য হারিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাইল।

চৈতন্যরূপিণী উমা—মাতার কাছে কন্যারূপে, আবার সাধকের কুণ্ডলিনীরূপে দেখা দিয়েই পালানোর ব্যথায় যখন অধীর হয়ে উঠে, তখন—

মা হওয়ার যে কত জ্বালা
যাদের মা বলবার আছে
তারাই জানে,
তিলেক না হেরিলে মর্মব্যথা পাই
কর্মসূত্রে সদাই টানে।

মেনকাকে শান্তি দিতে গিরিরাজের কুণ্ঠা নেই—কন্যাকে তিনিও চান। গিরিরাজ উমাকে নিয়ে এসে পত্নীকে বলছেন—

এই নাও গিরিরাণী!
তোমার উমারে,
ধর ধর হরের জীবন ধন।
কত না মিনতি করি
তুষিয়া ত্রিশূলধারী
প্রাণ-উমা আনিলাম নিজপুরে।

উমা হরের জীবনধন—গিরিরাজ সে কথা জানেন। উমাকে কাছে পেয়ে তখন মেনকার মা হওয়ার সকল জ্বালা মেটে—কিন্তু কোথায় উমা—মাতা বলছেন—

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার
প্রাণের নন্দিনী
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এল
রণরঙ্গিণী।

স্নেহবিহ্বলা জননী উমাকে তারপর হয়ত বুঝতে পারলেন। তখন জননীর চোখে আবার অশ্রুর বন্যা—শ্মশানেশ্বর শঙ্কর-গৃহিণীর প্রাণ কন্যার জন্য কাঁদে, তাই বলেন—

এই যে খেদ হয় সকল লোকে কয়
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামে দুর্গতি খণ্ডে
সেই দুর্গার দুর্গতি
এ কি প্রাণে সয়!

আগমনী গানে মাতা এভাবে নিজেকে কন্যাস্নেহে বিগলিত করে তুলেন—প্রতিবেশীরা ভোলানাথের নিন্দে করে, মাতা সে সব কথা শুনে কন্যাকে বলছেন—

কেমন করে হরের ঘরে
ছিলি উমা বল মা তাই,
কত লোক কত কথা বলে,
শুনে প্রাণে মরে যাই।
ছাই ভস্ম মেখে অঙ্গে
জামাই বেড়ান ভূতের সঙ্গে
ও মা তুমিও না কি তারই সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখ ছাই।

জামাতার প্রতি শাশুড়ীর অভিমানে মন ভরে ওঠে—মেয়েকে আর শ্মশানে-মশানে ঘুরতে দেবেন না ঠিক করেন মনে মনে, বলেন—

এবার নিতে এলে পরে
বলব উমা ঘরে নাই।

বাৎসল্যরসের প্রাণময়তায় এই অনুভূতি বিষাদের ছবি চোখের উপর অঙ্কিত করে। কিন্তু কন্যা উমাকে উদ্দেশ করে প্রার্থনা গান বাতাসে ভেসে আসে—

একবার বিরাজ মা
হৃদিকমল আসনে,
ভুবনভরা রূপটি একবার
দেখে নিই মা নয়নে।

আবার উমাকে না দেখে কাতর ক্রন্দন বাতাসে বাতাসে—ভক্ত অভিমানে বলছে—

কেন মিছে মা মা করিস
মায়ের দেখা পাবে নাই,
থাকলে এসে দিত দেখা
সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত
পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে এলাম উষাগত
কেন আর যন্ত্রণা পাই!
মা গেছে নামব্রহ্ম আছে
তরিবার ভাবনা নাই।

মেনকা শুনছেন—

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই
তোর মনের মত।
যে হয় পাষাণের মেয়ে
তার বুকে কি দয়া থাকে।
দয়াহীনা না হলে কি
লাথি মারে নাথের বুকে।

সন্তানদের—উমার যাদের নিয়ে সংসার—তাদের আর্তি মাতার হৃদয়কে অস্থির করে তুলে। মাতা পরিশেষে জগন্মাতার পরিচয় পেলেন মঙ্গলার প্রমুখাৎ—তখন—

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছে কাশীতে
রাজরাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।
সংসারশুদ্ধ লোকে বলে
শিবের সেদিন আর নাই।
যারে পাগল পাগল উচ্চরোলে
বিবাহের কালে
সবাই দিল ধিক্কার—
এখন সেই পাগলের সব
অতুল বৈভব
কুবেরের ভাণ্ডার।

এইভাবে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীত, সুরে সুরে বিশ্বমাতার প্রতি জননীর বাৎসল্য রস ফুটে উঠেছে। এই লোক-সঙ্গীত একাধারে ধর্ম-সঙ্গীতরূপে অধ্যাত্মচিন্তা মন্দাকিনীকেও প্রবাহিত করে চলেছে—অধ্যাত্ম-রসপিপাসু নর-নারী আত্মিক-উপলব্ধি এই সকল সঙ্গীতে খুঁজে পান। আবার ঘরে ঘরে এই সঙ্গীতের রসে বাৎসল্যরস প্রবাহিত করে চলেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনে এ ধরণের লোক-সঙ্গীত সে সঙ্গে ধর্ম-সঙ্গীতও জাতির জীবনে শান্তির সন্ধান দেয়, কল্যাণের বিস্তার করে। যে নিরঞ্জন-জ্যোতির চাঁদের আলো আলোরূপে উমা খুঁজছে—যে জ্যোতির সন্ধান সাধক করে অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে আর লোক-জীবনে এই আলো শারদীয় আকাশে উদ্ভাসিত করে আগমনী-বিজয়ার চিরন্তনী সঙ্গীত গাথার আনন্দ।

সাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্যায়ন আধুনিকতার দৃষ্টিতে যে স্তরেই থাকুক না কেন যেটি আমরা ভালবাসি এই সুর—আমাদের কল্পনা ও মনকে এই সুর অভিভূত করে আছে। এই লৌকিক-অধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও এই আগমনী বিজয়া ঐতিহ্য-বোধের সঙ্গে জড়িত আছে বলেই এই গানে ধর্মমতের বিরোধ নেই, এখানে জননী, পিতা ও কন্যা এবং জামাতা একটি বিরাট ভাবের দ্যোতনা নিয়ে চিরন্তন হয়ে আছে। এ গানে জীবনের সুর বেজেছে বলেই—এ গান এত সুমধুর।

With Compliments of :—

Bengal Waterproof Works (1940) Ltd.

32, Theatre Road

Calcutta-16

Phone No. 447111 (3 Lines)

দশটা পঁয়তাল্লিশে

ছবি বসু

গঙ্গার গা ঘেঁষেই সুরু হয়েছিল গলিটা, বড় বেশি ছায়াঘন সেই পথ,—দু'পাশ জুড়ে বড় বড় গাছের সারি, ছোট ছোট বুনো গাছের কুঞ্জ আর মনসাকাঁটার ফাঁকে-ফাঁকে দু'টি-একটি বড় দীঘি আর পানাপুকুর, খরার দিনে সেগুলি শুকিয়ে যেন হাড়গোড় বার হয়ে যায়, এই বর্ষার সময় আবার এই পথের দু'কোল জলে টুপটুপ করে যেন কুমারী মেয়ের যৌবন উথলে ওঠে জংলা দীঘির গায়ে, ছায়াময় এই নির্জনতায় আইবুড়ো মেয়ের হিলহিলে সিঁথির মত সরু পথে চলতে তখন কেমনধারা গা ছমছম করে।

তবু এ পথ দিয়েই মাধুরী দাসগুপ্তা যাবে বিশেষ করে এই বর্ষার দিনগুলিতে, কলেজে যাবার পথ আরও রয়েছে আর সে পথও এমন কিছু ঘুরপাক নয়, সব রাস্তাগুলোই আগে-পাছে গিয়ে বি টি রোডে পড়েছে, একটু এগোলেই পেয়ে যাবে শহরতলীর সেই মহিলা কলেজ, সব রাস্তাতেই লোক চলাচল করে। রিক্সা, মোটর, লরি চলেছে, বস্তাবস্তা পাট লরি বোঝাই হয়ে হামেশা যাতায়াত করছে আর সব রাস্তায়।

রাগ করে মা বলেন—পাঁচজনের মাড়ানো রাস্তায় চলবে কেন? ঐ সৃষ্টিছাড়া রাস্তায় কি মানুষ চলে? কিছুতেই যদি কথা শোনে।

মাধুরী বোঝে মা'র আপত্তি কেন।

পথটা শুধুই নির্জন নয়, আলো-ছায়ায় ঘিরে কেমন যেন অন্যরকম, বিশেষ করে সেই জোড়াদীঘির মাঝখানের পথটা, ঠিক যেন সুয়ো-দুয়ো দুই কন্যার মত পথের প্রায় দু'পাশ জুড়ে দু'টি দীঘি—দু'জনে ছুঁই-ছুঁই করেও পরম বিতৃষ্ণায় তারা গা ঠেকাঠেকি রোধ করেছে, সেই জায়গাটিতে দাঁড়াতে যেন গা থরথর করে মাধুরী দাসগুপ্তার, সে শুনেছে ঠিক কয়েক বছর আগে পর পর দু'টি মেয়ে পূবদিকের দীঘির সেই কালো জলে ডুবে মরেছে, লোকে বলে একজন নাকি এমনিই পা হড়কে পড়েছিল। আর একজন মরেছে ভালবাসার যন্ত্রণায়।

সে যাই ঘটুক না কেন, লোকের কথায় কান দেবার মেয়ে মাধুরী নয়। ওরা এ পাড়ায় নতুন এসেছে। এতকাল ছিল বৌবাজারের এক কানা গলির মধ্যে। শুকনো হাড়গিলে পিঁজরাপোলের গরুর মত বিবর্ণ-শ্রীহীন ঘেঁষা-ঘেঁষা ঘর-দোর ছেড়ে শহরতলীর শ্যামলতার মাঝে এসে মাধুরী দাসগুপ্তা যেন এক রঙিন জগতের আচ্ছন্নতায় মৌন হয়ে গেছে। কলেজে যাবার পথ পাঁচটা ছেড়ে আর দশটা রইলেই বা তার কি! এ পথটাই সে বেছে নিয়েছে। এই জংলা পথের ভেজা মাটির গন্ধে রহস্যময় পরিবেশে পথ চলতে তার কিসের নেশা লাগে।

কিন্তু মাধুরী দাসগুপ্তা লক্ষ্য করছে এ পথের আকর্ষণ শুধু তার একার নয়। ছোট গাড়ি হলে কি হবে এই একচিলতে মাটিতে গাড়ি চালাতে বুকের পাটার দরকার হয় না? রোজই একবার দেখতে পায় সে গাড়িটাকে বিশেষ করে, যেদিন তার থাকবে দশটা পঁয়তাল্লিশের ক্লাশ। গাড়ির চালকের ভাবখানি যেন—হঠাৎই সে এ পথে এসে পড়েছে। এ ছাড়া আর কোন উপায়ই তার ছিল না। দু'পাশে দুই সতীনের মত উদ্ধত আক্রোশে বর্ষার দুই দীঘি, তার মধ্যিখান দিয়ে গাড়িটা আসে যেন মাধুরীকে তাড়া করে একেবারে ঠেলে ঐ দীঘির শ্যাওলার মধ্যে তাকে ফেলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি। আক্রোশে তার চোখজোড়া তেতে ওঠে, যেন খরাবেলার দারুণ দহনে সে জ্বলছে।

গাড়িতে শুধু চালক ছাড়া আর কাউকে সে দেখে নি, আর মানুষটাকে দেখতেও কেমন অদ্ভুত লাগে। কালো পাথরের গা খুঁড়ে যেন শিল্পী সৃষ্টি করেছে পৌরুষের এক প্রতিমূর্তিকে। কিন্তু কেমন একটা উদাসীন নিস্পৃহ চেহারা, গাড়ি চালাচ্ছে যেন নেহাৎই দায়ে পড়ে।

লোকটার আচরণ আর চেহারায় কোনই মিল খুঁজে পায় না মাধুরী। কোন কেরামতি দেখাবার আর জায়গা নেই? বি টি রোডে যাবার আরও কত ত' পথ রয়েছে, তবে? এ তাকে জব্দে ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কাঁচারাস্তার কাদায় মাধুরীকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে তারপর তাকে পানাপুকুরের গভীরে ডুবিয়ে মারবার ফন্দী ছাড়া একে আর কি ব্যাখ্যা দেওয়া চলে? তারপর পুকুরের পাঁকে আর লতার ফাঁসে ওর এই হাল্কা-নরম শরীরটাকে বেঁধে ফেলবে।

ভাবতেই মাধুরীর গা শিউরে ওঠে। এ মাসে মাধুরীর রোজই দশটা পঁয়তাল্লিশে ক্লাশ, রোজই নিঃশব্দে গাড়িটা তাকে অনুসরণ করে এসে আচমকা পেছন থেকে হর্ন দিয়ে উঠবে ঠিক সেই জোড়াদীঘির মধ্যিখানের ডাঙায়।

মাধুরী কালা নয় কিংবা রাস্তা জুড়ে শুয়ে থাকা বলদও নয়।

এই সময় ভাবে ঝটকা মেরে পেছন ফিরে বেশ মনের মত কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কি ভাবে বলবে, গলার স্বর কতখানি তুলবে, মনে মনে তার তালিম দিতে যেয়ে মাধুরীর নাকের পাটা কাঁপতে থাকে, চোখ দু'টো আচমকা সিঁদুরে হয়ে ওঠে। তবু বলা আর শেষ পর্যন্ত হয় না। রোজকার মত একপাশে সরে দাঁড়াতে যেয়ে হোঁচট খেয়ে তার চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়। বোবা হয়ে উদ্ধত মন আর দৃষ্টি নিয়ে চোখা-চোখি হয় মানুষটার সঙ্গে, সে চোখ কি মাধুরী দাসগুপ্তাকে দেখছে না চেয়ে রয়েছে সেই দীঘির অতল অন্ধকারে! এ লোকটি যেন অপরাধের বোঝা মাধুরীর পায়ের গোড়ায় উজাড় করে দিয়ে বলতে চাইছে—উপায় নেই, এ রাস্তায় গাড়ি তাকে চালাতেই হবে। এর জন্য মাধুরী যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে তা নিতে তার দ্বিধা নেই।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম আস্তে আস্তে মুছতে থাকে মাধুরী। এক হাত দিয়ে বই-খাতা জড়ো করে প্রায় বুকের ওঠা-নামার কাছে তুলে এনেছে। বই-খাতার গায়ে গায়ে ঘামে-ভেজা হাতের ছোপ লেগেছে, ছেঁড়া চটি পরে পা টেনে-টেনে

বি টি রোডের দিকে এগিয়ে চলে মাধুরী দাসগুপ্তা, সামনে দিয়ে হর্ন বাজিয়ে দিব্যি চলে গেল গাড়িটা।

আশ্চর্য একটুও যদি সিভিক সেন্স থাকে। শেষ পর্যন্ত জেদ চেপে যায়, সেই বা কেন এ পথ ছেড়ে দেবে?

অবশ্য কলেজে যাবার আরও পথ আছে, মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেশ সর্টকাট হয়, টপ করে বাস রাস্তায় এসে পড়া যায়। আর তা ছাড়া কেউ পেছু নিয়েছে সন্দেহ হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে তাকে বেধড়ক পেটান যায়।

কিন্তু মাধুরী এসব কিছুর মধ্যেই যেতে চায় না, বর্ষার সজল-কালো মেঘের ছায়া ডোবা পুকুরে, দীঘির শালুক ফুলে, পদ্মপাতায় ঘোর জমিয়েছে, সেই ঘোরের নেশা মাধুরীর চোখের পাতায় নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে।

—তোরা হলে কি করতিস বেলা? তুই কি বলিস নন্দিতা?

মাধুরীর গলার আকুলতা নতুন মূর্ছনায় যেন বেজে ওঠে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে কলেজের সহপাঠিনীরা, যেন সেতারে মীড়ের গমক একই সুরে কেঁপে ওঠে—মাধুরীর গলার স্পন্দন তারা সবাই টের পেয়েছে, যেন এটা কোন সমস্যাই নয়। একটা মিঠে-হাওয়ার দুলুনিতে সবাই যেন দোল খাচ্ছে।

—আমরা হলে কি করতাম জানিস। ডলি সরকারের কণ্ঠ সরস হয়ে ওঠে—স্রেফ মানুষটার গাড়িতে চড়ে বসতাম।

● আমরা হলে কি করতাম জানিস—স্রেফ মানুষটার গাড়িতে চেপে বসতাম

মাধুরী দাসগুপ্তা চমকে ওঠে।

—বলতাম এই ত' এসেছি, অত ঘুরে মরছই বা কেন?

আরক্তমুখে মাধুরী উঠে পড়ে।

নন্দিতা হাসি লুকিয়ে চোখ গোল-গোল করে বলে—আচ্ছা রাগটা পরে ঘটা করে জাহির করিস। আসলে সত্যি কথাটা বল।

—সত্যি কথা।

—হ্যাঁ সত্যি কথা, তুই প্রেমে পড়েছিস।

—ঐ অসভ্য লোকটার সঙ্গে? মাধুরী মারমুখো হয়ে বলে।

নন্দিতার চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। —মিছে বলছিস মাধুরী, মানুষটা আর তার গাড়ি দু'টোর কোনটাই উপেক্ষা করবার মত নয়। দস্তুরমত জেলাসি হচ্ছে, আমার পেছনেও ত' একদিন ধাওয়া করতে পারে। আমার একটুও ভয় করবে না। বরং বেশ··· কেমন যেন···ইয়ে···ভাবব এই বুঝি প্রপোজ করে বসল।

মাধুরী তাই ঠিক করল ও রাস্তাটা এবার সে ছেড়েই দেবে। মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তা···সকলেরই সে পথে চলবার অধিকার আছে। থাক গে যাক এ অধিকার তাকে ছাড়তেই হবে, এ ছাড়া আর কি-ই বা উপায় আছে?

শুধু শুধু উপায় খুঁজতে যেয়ে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আপশোস এই মুখ বুজে শুধু জুলুমই সয়ে গেল, একদিনও যদি মনের মত দু'টো কড়া কথা বলতে পারত।

তবু এই ভাল হয়েছে। হুকুমচাঁদ জুট মিলের শ্রমিকবস্তীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু' পাশের পানাপুকুরের শালুকের স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে, ঘরে বাঁধা পাতিহাসের পাখার ঝটপটানি চোখে পড়ে না, এখন দেখে নীচু নীচু টানা বস্তী-ঘরের মেয়ে-পুরুষের জটলা, নাইট সিফ্‌টের বিলাসপুরী শ্রমিক অঙ্গদেশের মেয়ে-শ্রমিকদের সাথে গল্প করছে, বস্তীর অন্ধকার ছেড়ে তাদের এক একটি জটলা উছলে পড়েছে রাস্তার আনাচে-কানাচে। এদের মাঝে একপাল মুর্গী আর শিশুর দল হৈ-হৈ করে বেড়ায়। একটু যেন বিব্রত মনে হয় মাধুরী দাসগুপ্তাকে, কেমন যেন হিসাব করে তাকে পথ চলতে হয়। তবু এই ভাল, রাস্তাটা খটখটে, হঠাৎ জোর বৃষ্টি এলে কোথাও না কোথাও আশ্রয় জুটে যাবে।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন···

আবার কবে যেন সেই মনসায়োপ আর বকফুলভরা রাস্তায় ভিজে মাটি আর সোঁদা সোঁদা গন্ধের মাঝে ব্যাকুল আগ্রহে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে মাধুরী দাসগুপ্তা, সেদিন জোর ঝড় উঠেছে, জোড়া পুকুরের মধ্যিখানে মাটি কাঁপছে থর থরিয়ে, দুই সতীন দীঘি মাটি পেরিয়ে গলাগলি হয়ে যায় বুঝি, হাওয়ার দমকের সঙ্গে সুতোর মত আঁকাবাঁকা ঘোলাটে আকাশ পর পর ঝিলিক খেয়ে গেল, গুমগুম আওয়াজে মেঘ ডেকে উঠল, তারপর তুমুল বৃষ্টি।

মাধুরীর যেন কি হয়েছে! গাড়ির আওয়াজ পেছনে পেয়েও সে ফিরেই চায় না। ঝড়ো গাছপালার মত পতপত করে উড়ছে তার কপালের চুলগুলো, সঙ্গে সঙ্গেই ধারা-স্নানে আবার তারা নেতিয়ে পড়ে। হঠাৎ পেছন ফিরে পথ জুড়ে চেঁচিয়ে উঠল মাধুরী দাসগুপ্তা—গাড়িটা থামিয়ে দরজা খুলে দিন, হাঁ করে মজা দেখছেন কি? ভিজব নাকি এমনি করে? এই ঝড়-বৃষ্টিতে আমায় চাপা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিন এই দীঘির জলে—কেমন?

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা, আর কোন দ্বিধা না করেই সপসপে ভিজে জামা-কাপড়ে চালকের পাশে বসে পড়ে দরজা এঁটে দিল মাধুরী।

বৃষ্টির ধারা অশান্তভাবে পড়ছে দু'পাশের পানাপুকুরে, ডুবো লতার ঝাড়ে, জংলা গাছের—কাঁটার গায়ে, চাপা রাগে মাধুরীর নাকের পাটা কাঁপছে, মনের জ্বালা আর বৃষ্টির জলে চোখ ঝাপসা হয়েছে, আরক্তচোখে যেন তার আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

—কি ভেবেছেন, রোজ রোজ আমার পিছু নেন কেন? বলুন! জবাব দিন, ভীতু কাওয়ার্ড কোথাকার, এই ত' আমি পাশে বসে আছি। কেন মুখ তুলে চাইবার সাহস নেই নাকি?

লজ্জা আর অপমানের বেদনায় মানুষটা বুঝি চমকে যেয়ে মাথা হেঁট করে! হিমে জমে-যাওয়া জমাট দৃষ্টি নাকি মানুষটার? একবারও সে মাথা তোলে না। মাধুরীর তীক্ষ্ণ জিহ্বা যেন হিংস্র নাগিনীর মত তার সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলেছে। মাধুরী কি হার মানবে লোকটার এই অনড় ধৈর্যের কাছে!

সামনের ঝাপসা কাচটা বারকয়েক রুমাল দিয়ে পুঁছে নেয় মানুষটা, অস্বস্তি লাগে মাধুরীর। কি রে বাপু এ কি বোবা নাকি!

ধীরে ধীরে গাড়িটা এসে উঠল বি টি রোডের পিচঢালা রাস্তায়—বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে।

—আপনি এখানেই নামবেন? কলেজ গেটের মুখে এসে পাশের মানুষটি প্রশ্ন করে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি গায়ে মেখে মাধুরী দাসগুপ্ত গাড়ি থেকে নামতে নামতে ভাবে বড় তাড়াতাড়ি সে পৌঁছে গেল।

সারাটা দিন কেমন অস্বস্তি নিয়ে কাটে, চোখ তার অকারণেই ছলছলিয়ে ওঠে। এ কি করল মাধুরী দাসগুপ্তা? এত ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা কেমন করে জমলো দু'খানা এঁদো ঘরের কলেজ-পড়ুয়া মেয়ের?

বর্ষায় ভিজে ভিজে আপিস থেকে বাবা ফিরলেন, ব্যস্ত হয়ে গরম চা ক'রে মা বলেন—আদা দিয়ে চা করেছি, চট্ করে গরম থাকতেই খেয়ে নাও ত' বাপু!

বাবা বলেন—খুকিকে ডাক! মেয়েটা ত' রোজই ভিজছে। প্রতিমাসেই ভাবি, একটা ছাতা কিনে দেব।

বলতে বলতে বাবা থেমে যান।

জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে হাওয়ার সন্ধান করতে করতে মাধুরী ভাবে ছাতা কেন? স্বপ্নের মত একটা গাড়ি যেন তার পিছু নিয়েছে। বলছে—ভিজবে কেন, এই ত' আমিই রয়েছি, নয় তো ভিজবে সে—জোড়া পুকুরের মধ্যিখানে সেই একচিল্‌তে জমিতে দাঁড়িয়ে জোলো-হাওয়া আর জংলা পাতার গন্ধে আকুল হয়ে পাশাপাশি দু'জন ভিজবে।

পরের দিন ঠিক সেই সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মাধুরী দাসগুপ্তা। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সংযত করে শান্ত করেছে।

আর একটু পথ—ডানে-বাঁয়ে বেঁকে দু' পাশের জংলা গাছ ঠেলে এগোতেই জোড়া-পুকুর, যা ভেবেছিল সে ঠিক তাই হয়েছে, গাড়িটা থেমে রয়েছে সেই মধ্যিখানের এক চিল্‌তে মাটি জুড়ে। দরজাটা খোলা যেন, মাধুরীর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে। তারই জন্যে সত্যিই অপেক্ষা করছে মানুষটা। আজ আর মাধুরীর রাগ হয় না এই ত' সে চেয়েছিল যেন। আত্মপ্রসাদে মনটা তার ভরে উঠেছে।

রুদ্ধনিশ্বাসে আবেগ সামলিয়ে সামনের দিকে চায় মাধুরী।

আজ আর নির্বিকারতা নেই, যেন কথাটা বলে ফেলতেই বদ্ধপরিকর হয়েছে মানুষটা। মাধুরীর মাথাটা আপনা থেকেই নেমে আসে, পাশে পুকুরে জলপদ্ম ভাসছে, একপাল পাতিহাস ডানার ঝাপট দিয়ে চলেছে।

—আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আমার অপরাধের জন্যে, পরিষ্কার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর?

মাধুরীর চোখের পাতায় কিসের যেন ঘোর লাগে। ফিসফিস করে কি যে সে বলে তা নিজেই সে জানে না।

মাধুরীর গলার স্বরের থরথরানি যেন টের পেয়েছে মানুষটি। তার গলায় ঝরে পড়ে একটা সমবেদনার আর্তি—ভুল একটা আপনারও হয়েছিল।

—ভুল? মাধুরী এবার মাথা তুলে মুখোমুখি চায়।

—হ্যাঁ ভুলই, আপনার জন্য এ পথে রোজ আসি না, একথা হলপ করে বলতে পারি।

—মিথ্যে কথা? মাধুরী এবার ব্রীড়া কাটিয়ে নাগিনীর মত ফুঁসে ওঠে।

—মিথ্যে নয়? ঐ দেখুন ঐ জোড়া-পুকুরের ডুবো ঝোপের গায়ে এখনও জড়িয়ে আছে তার একমুঠো চুল, দেখুন সত্যি বলছি। দশটা পঁয়তাল্লিশে রোজই দেখা হত ঠিক এইখানে!··

মাধুরী আতঙ্কে শিউরে ওঠে···। ঘন পাঁক আর কালো জল ঠেলে কে এগিয়ে আসে।

—তবে কি যে সুইসাইডের গল্প শুনেছিলাম বলতে-বলতে মাধুরীর গলা ভেঙে যায়।

লোকটি মাথা নাড়ে। তার বিস্ফারিত চোখ আশে পাশে কাউকেই চেয়ে দেখছে না। শুধু কিসের এক জ্বালা আর হতাশা নিয়ে চেয়ে থাকে জোড়াপুকুরের শালুক আর পদ্মপাতার পানে। হিমের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি মানুষটার, মাধুরী কি উন্মাদের সঙ্গ নিয়েছে? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাধুরী, পা দু'টো যেন ওর এই সর্বনেশে জায়গায় গেঁথে গেছে।

—কি হল? সামনের মানুষটি এবার বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ঘোর কেটে যেয়ে সে যেন স্বপ্নের জগতকে পেরিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাধুরী দাসগুপ্তার সঙ্গে।

—ভুল করেছেন তাতে লজ্জা কি? আমি কিন্তু খুশিই হয়েছি আপনার সাহস দেখে, নিঃশব্দে মাধুরী আবার পথ চলতে সুরু করে। পেছন থেকে মানুষটি কি একটা যেন বলে উঠল না?

কিন্তু পিছু আর সে চাইবে না, ছায়াঘন কালোজল বুঝি তাকে তাড়া করে আসছে। আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বি টি রোডে সে উঠে পড়বে।

তারপর আর কোনদিনও এই পথে চলবে না মাধুরী দাসগুপ্তা।

শারদীয় অভিনন্দন—

কে, সি, ঘটক এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিঃ

৯৪ বৎসরের পরিচিত

বিশিষ্ট বাঙ্গালী লৌহ ব্যবসায়ী

রেজিষ্টার্ড টাটা-ইস্কো এবং

হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স

৩ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

ফোন ঃ—৩৩২৯৩৬ এবং ৩৩৪৫৪১

॥ কবিতা ॥

যোজনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'সব সেতু ভেঙে যাক্
আমি আর ওপারে যাব না।'
বলেছিল ঋভু কোনো
নির্নিমেষে আপনার নাভিতে তাকিয়ে,—
'নিজেকে ছড়ালে শুধু
একই কান্না বারে বারে শোনা,
স্বরগ্রাম সাধা শুধু একই যন্ত্রণার।
আমি তাই নিজের গভীরে
মগ্ন হয়ে বুঝে নেব
এ সৃষ্টি ও এ সত্তার সার।'

সমস্ত নদীর সাথী অনাদি জলায়
নীরব কৌতুক হয়ে
আজো সেই সত্যশুভ্র ধর্মরূপী বক
থাকে না কি চিত্রার্পিত যেন?

শুধালে সে দেবে বুঝি আশ্চর্য উত্তর,—

'অর্থ নয় ব্যঞ্জনা মদির,
আলোর তাৎপর্য নয় সূর্যাস্তের ছটা,
একান্ত বিযুক্ত সত্য নির্যাস ও পুষ্পের মঞ্জরি।
সকাম তৃষ্ণায় প্রতি মুহূর্ত না পান করো যদি
অনন্তও অলীক কল্পনা।
নিত্যনব যোজনা-ই
এ সত্তার হেতু ও আহুতি।'

জন্মদিনে

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি মোর জীবনের অপরাহ্ণকালে—
কে তোরা আঁকিলি ভালে
চন্দনের রেখা
অন্তরের প্রীতি দিয়ে লেখা।
হাতে দিলি ফুল,
প্রীতির পরশসিক্ত সৌরভে আকুল?

কবে একদিন,
স্মৃতি তার হয়ে এলো ক্ষীণ,
জীবনের ভেলাখানি ভেসেছিল স্রোতে
মার কোল হোতে,
তারপর মাস বর্ষ কত
হইয়াছে গত;
নানা ভাবে নানা কাজ করি
জীবনের তরী
ভিড়িয়াছে কত শত ঠাঁই
ঠিকানা তো নাই।

জীবনের নানা কর্ম মাঝে
পরিচয় লিখিয়াছে
কত মানুষের সাথে,
ঝড় ঝঞ্ঝা মাঝে দিবসে ও রাতে
কাটিয়াছে বেলা,
কখনো করেছি খেলা,
যবে দুঃখময় রাতি
কাটিয়া ফুটেছে প্রাতে অরুণের ভাতি।
এত হোল জানাশোনা
এত আনাগোনা।
তারি মাঝে কারো কাছে
প্রীতি মিলিয়াছে,
কারো কাছে অবহেলা
বর্ষ হতে বর্ষ কত কাটিয়াছে বেলা।
অবশেষে হেথা এসে হল পরিচয়
তোমাদের সাথে দিন কয়;
তারি মাঝে মরি মরি,
হৃদয়ের পাত্রখানি দিলে ভরি
প্রীতির সুধায়;
বিস্ময়ে অবাক আমি ভাবি বসে তাই,
বিধির প্রসাদ কিগো, তোমাদের হাতে
আসিল রাঙাতে
জীবনের আকাশের অপরাহ্ণকাল
আজি এ সকাল।

তুমি খুশি হবে বলে

জগদীশ ভট্টাচার্য

তুমি খুশি হবে বলে কবিতার ফুল ফুটিয়েছি ;
তুমি কি নেবে না ?
জনারণ্যে পথ হেঁটে হেঁটে
কত মুখ দেখি আর দেখি।
দীর্ঘহ্রস্ব ছায়া ফেলে ফেলে
তারা আসে, তারা চলে যায়॥
আমার চলার পথে একদিন তুমিও এসেছ।
দেখে দেখে
মনে হ'ল তোমাকে আরেকবার দেখেছি
কোথায়।
দেখেছি অথচ মনে নেই॥
স্মৃতির লকেটে ছিল মিনে-করা মানসীর ছবি ;
তার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে
মনে হ'ল তুমি যেন সেই—
সেই নারী
একদিন যাকে ভালবেসে
জীবনের সব সুখ খুইয়েছিলাম।
সেই নারী
বহু জন্ম-জন্মান্তর পার হয়ে হয়ে
এল আজ আমার জীবনে।
দূরযানী পথিকের পথের দোসর হয়ে এল॥
বাসনার সোনা দিয়ে একদিন গড়েছি
তোমাকে।
আজ তুমি ক্ষণিকের সহযাত্রী কবির কল্পনা॥
তুমি খুশি হবে বলে কবিতার ফুল ফুটিয়েছি ;
তুমি কি নেবে না ??

বুকের ভিতর

আনন্দ বাগচী

আঁচলে লণ্ঠন বেঁধে দূর মফস্বল অন্ধকার
কা'কে যেন খুঁজছে এখনো
রজনী হয়েছে আরো ঘন
মশারির নীচে যেন শুয়ে পড়ল শব্দের সংসার।
কেবল নিঃশব্দে ফুল ঝরে, বটফল ঝরে পড়ে
গভীর ঘুমের মধ্যে ছিজলের ফল যেন
টুপটাপ পুকুরের জলের কবরে।
লেভেল ক্রসিং পার হয়ে চলে যায়
ক্ষুব্ধ শেয়ালের ডাক
বাঁশঝাড়ে জ্বলছে জোনাক।
আকাশে সহস্র আলপিন
বিঁধে আছে
কার যেন বুকের ভিতর
এখন ক্রমশ জমছে গল্পের শহর।।

দূর-দিগন্তে

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

দুই দিকে ঢেউ, মধ্যে দীঘল চড়া—
রৌদ্রের গানে নেচে নেচে হেসে ওঠে,
হৃদয় আমার বল্গাবিহীন ঘোড়া
এ-পথ ধরেই দূর-দিগন্তে ছোটে।

দুই দিকে ঢেউ, এককালে ছিল মাঠ—
বসতির পাশে ফসলের গান শুনেছি,
কলসের ডাকে চমকে উঠেছে ঘাট—
ঘাটেই দাঁড়িয়ে চোখের পদ্ম গুণেছি।
দুই দিকে ঢেউ, কিছু নেই, গেছে ভেসে ;
পাল তুলে মন-মাঝিরাও কই ভাসে না ;
আকাশ নিঃস্ব, কৃষ্ণচূড়ার দেশে
গেছে সব পাখি, ফিরে আর তারা
আসে না !

চোরাবালি পথ, জানি না পথের শেষ,
দু'পাশে পথের পাড় ভাঙে, নাচে বন্যা,
আর কতদূরে রাক্ষসীদের দেশ—
কে জানে কোথায় বন্দিনী রাজকন্যা !
তবুও আমার হৃদয়কে ডেকে বলি :
কেবলই চলার আনন্দে চলো, থেমো না,
দূর-পিয়াসের দিশাহারা কথাকলি
এ-পথের শেষ খুঁজে পাবে, হার মেনো না।

দুই দিকে ঢেউ, মধ্যে দীঘল চড়া,
রৌদ্রের গানে নেচে নেচে হেসে ওঠে,
হৃদয় আমার বল্গাবিহীন ঘোড়া—
এ-পথ ধরেই দূর-দিগন্তে ছোটে॥

বাদল দিনে

রমা চৌধুরী

আজি ঝরো ঝরো এ বাদল দিনে,
আমি শুধু এঁকেছি অনেক ছবি ;
কবি, তুমি একবার হৃদয় পাতো,
অঞ্জলির এ কানায় ভরা থাক ;
স্বপ্নের সুধা ভার আছে যতো !
নিখিলের সব ফুলে মালা গেঁথেছি,
সব সুরেই আমি গান গেয়েছি ;
নূতন ক'রেই তোমারে চেয়েছি,
নূতন ক'রেই তোমারে পেয়েছি,
সুরে সুরে তাই পথ খুঁজি কতো ;—
—তোমারই স্বপ্ন দেখি অবিরত !!

ম্যাগ্নোলিয়া

সুনন্দা দাশগুপ্ত

আজ আমার ম্যাগ্নোলিয়াতরু
ভরে গেছে ফুলে।
কর্মবহুল দিনে
আমার স্বপ্নলোকের সান্ত্বনা।

মনে পড়ে—
রোগশয্যায় চেয়েছিলে একটি
ম্যাগ্নোলিয়ার কুঁড়ি।
তোমার নিরানন্দ দিনে
সিঞ্চন করবে অরূপলোকের সৌরভ।
অস্তরবির শেষ আভা
রাঙিয়েছিল তোমার পাণ্ডুর কপোল,
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।
সে কথা রাখতে পারি নি।
মধুকর মন বাঁধা পড়েছিল নবতর কমলবনে!

তোমার ক্ষীয়মান একক সত্তা
নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে
বিরাটতর পটভূমিকায়
চেনা পৃথিবীর ছোট সীমানার বাইরে।
দীর্ঘ অতীতের প্রহরা এড়িয়ে
আজ মনে পড়ল তোমার রোগম্লান ছবি :
ক্লান্ত ললাটের প্রান্তে আকীর্ণ রুক্ষ চূর্ণকুন্তল
আর শীর্ণ অনামিকায় জ্বলজ্বলে চুণীর দীপ্তি ;
হৃদয়নিংড়ানো একবিন্দু রক্তিম আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিশ্রুতি রাখি নি সেদিন।
প্রার্থনা করি নি ক্ষমা চাইবার অবকাশ।
আজ আমার কৃশাঙ্গী ম্যাগ্নোলিয়া
পুষ্পসম্ভারে ঐশ্বর্যময়,
তবু কি এক রিক্ততা তার সর্বাঙ্গ ঘিরে।
কথা রাখি নি তোমার
তাই এতদিন পরে
তীব্রমধুর স্মৃতিমথিত ম্যাগ্নোলিয়ার
শুভ্র দ্যুতিতে—
নীরব তিরস্কারের দাহ।

দ্বিতীয় নায়ক

দুর্গাদাস সরকার

কৈশোরে হৃদয় নিল একজন, যৌবনে প্রত্যয়
অন্যজন। হৃদয়ের কত মূল্য জানে শল্যবিদ।
আর একা কবি জানে, কত না প্রত্যয়ে গড়া ভিত্।
তবু প্রত্যেকেরই মনে প্রতিক্ষণে সংক্ষুব্ধ সংশয়!
—বলো তুমি কি যে চাও, লাবণিতে কোন্ সে জিজ্ঞাসা
কবিকে বিদগ্ধ করে, দেয় শল্যবিদেরে ছুরিকা?
দিকে দিকে মৌনচিত্তে জ্বলে অনির্বাণ অগ্নিশিখা,
আকাশ মূর্ছিত, আর ওই সূর্যে রক্তিম পিপাসা?
সুন্দরের বেদী থেকে, বলো তুমি, কে ফেরাবে মুখ—
যদিও যাবে না ফিরে কোনোদিন কৈশোর-প্রেমিক।
মঞ্জুল বেদনা নিয়ে চলে যাবে কেবল উৎসুক
কবি তাকাবে পশ্চাতে যদি ডাক শোনে সে নির্ভীক।
এখনো নীরব তবু! দাও ডাক, যদি আসে ফিরে।
খণ্ড খণ্ড হৃৎপিণ্ড গড়াবে কি পবিত্র মন্দিরে!
পালিয়ে গিয়েও কেন বিনা ডাকে ফিরে আসতে হয়?
জেনে শুনে হতে হয় আবার প্রশ্নের মুখোমুখি?
হয় তো মনের মধ্যে বাঁকা চাঁদ মারতে পারে উঁকি
সে-আশায় আসতে হয় পুনরায়, ভয়ঙ্কর ভয়
যতোই থাকুক মনে। বিজিত সৈন্যের জন্যে জয়
যেভাবে হরণ করে একমাত্র অসামান্য ঝুঁকি
তেমনি দুয়ারে গিয়ে সজোরে কড়াটা নেড়ে, সুখী
বাসা ভাঙতেই হয়; কেন জানো? কারণ হৃদয়
লোহার দরজা নয়, কাচ নয়, তারো চেয়ে বেশি,
কতো বেশি মনই জানে। তাই আসতে হয় ডাক শুনে,
এবং না ডাক দিলে আসতেই হয়। শুধু দিন গুণে
যদিও সময় যায় মাঝখানে, ছদ্মবেশী
আরেক নায়ক রাখতে চায় একদিন প্রশ্নের মতোই
একটি কুণ্ঠিত মুখে ক'টি প্রশ্ন অতল অথৈ।

আরো কিছুদিন

সুশীলকুমার গুপ্ত

আরো কিছুদিন আমাকে সময় দাও।—এখনো আমার
বাগানে ফোটে নি রক্তগোলাপের ঝুঁড়ি।
এখনো বাজে নি ঘণ্টা, সৌখীন মেঘের রঙ্গালয়ে
এখনো হয় নি শেষ স্বাতীর নাটক, অরণ্যের
জট খুলে খুলে মন সমতল প্রান্তরের সহজ বিশ্বাসে
হয় নি বাউল, নীল হরিণের পাল
ভোলে নি বাঘের ভয়, এখনো আকাশ
নক্ষত্রের শব নিয়ে যায় নি তো ভোরের শ্মশানে!
আরো কিছুদিন আমাকে সময় দাও। গড়ে নেব আমি
আকাঙ্ক্ষার মাটি দিয়ে সমর্পিত পবিত্র প্রেমের
টেরাকোটা, স্মৃতিকল্প জানালার মুখে
জড়াব আইভিলতা, ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে
টবে টবে জেলে দেব ইচ্ছার আকাশ, সাদা দেয়ালে দেয়ালে
শৈশবের ফটোগুলি টাঙিয়ে টাঙিয়ে
আয়নায় রৌদ্রের মতো জ্বলতে থাকব; সে সময় তুমি
ভোরের পাখির মতো, হাওয়ার মেঘের মতো এসে ধরা দিও।

রূপসী

[আধুনিক চেক কবি *Josef Hora*-এর কবিতার অনুবাদ]

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী কোন নারী নয়,
সে হলো আমাদের এই সুন্দরী পৃথিবী,
সেখানেই আমাদের সৃষ্টি।
তার আদি নেই, অন্ত নেই, যৌবনের অফুরন্ত স্রোত
চিরন্তন নদীর মত বয়ে চলেছে।
আমার যৌবনের চক্ষু দিয়ে তাকে আমি মালা পরাই
আমার রক্ত ঢেলে দিই তার চরণের তলে।

ঐ যে চড়ুই পাখি গ্রামের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে
সংগীতের ফোয়ারা তুলেছে,
সে হলো আমার হৃদয়ের পুষ্পপ্রতীক,
সূর্যাস্তের আগে পৃথিবীর শান্ত-সংগীতের প্রতীক আমি।
এই মহাসংগীত পৃথিবীর সংগে একাত্ম হয়ে রয়েছে

অরণ্য শোভায় শায়িত প্রেমিককে বিভ্রান্ত কোর না,
শস্যক্ষেত্রে চন্দ্রালোকের অমৃত উপভোগ কর,
ওগো পৃথিবী মা! তোমার সুন্দর মধুবর্ষী ঘুমের ছায়া
আমার ওপর নামুক,
তোমার ঐ তারকারাজি থেকে
তোমার ঐ পপলার গাছ থেকে॥

মলয়-লিপিকা

ছায়া দেবী

তোমারে যবে পাঠানু লিপি নীরব রাতে আজিকে ধীরে,
বিভোর হাওয়া উড়িয়ে নিলো সুদূর পারে, নাহিক ফিরে।
নিদমহলে মদির নেশায় ভাসাই যবে মেঘের ভেলা,
মনের নভে আবেশ রচে রঙিন নেশার অবহেলা!

চলার স্রোতে আপন মনে অবসরের দিবস গোণা,
মায়া নিশার ছায়ার লিপি নিত্য করে অন্যমনা।
অঙ্গ মাঝে নিদাঘ জ্বালা একলা চেয়ে পথের পানে,
চন্দনিকার মলয়শ্বাসে হারিয়ে যাওয়া সুরের টানে!

জানো তো বঁধু স্বপ্নমায়া মধুর শুধু ক্ষণিকতরে,
অধরা ফুলে ধুরিলে ভুলে পলকমায়া চমকি সরে!
চকিত নেশা রূপের ছায়া ঘনায় বুঝি নয়নে ঘোর,
জ্যোৎস্না রাখী তারকা গাঁথি অলখে রচে মণির ডোর!

উদাস মনে স্বপনতৃষী গগন বনে কাহারে মাগে?
নিথর নিঝুম দিগন্তিকা দীপ্ত তারই অনুরাগে!
বিষাদ ঘিরে জীবন-তীরে বিলীন হলো আলেয়া নেশা,
মুগ্ধ চাঁদে কুহক-মেঘ আলোর সাথে মাধুরী মেশা!

শেষ বসন্ত

[১৬০ পৃষ্ঠার পর]

সুরবালা অতিস্থূল পাকা সোনার বাঘমুখো বালায় হাত রাখিলেন।

এতক্ষণে জয়া হাঁফ ছাড়িল। পাকা সোনার বালা ও পাকা কথা তাহার সাংসারিক পাকা মনে যথেষ্ট ভরসা। সে আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, মা, আপনার বড়ছেলেকে খবর দিই?

ছায়া বলিল, কিন্তু মেয়েকে সইমা পাচ্ছেন কোথায়? সে না নদীতে বেড়াতে গেছে।

যাক না। আমি আমার মায়ের জন্যে নৌকা বেঁধে বসে থাকবো। আমার লক্ষ্মীকে বেঁধে তবেই ফিরব।

রায়গৃহিণী বলিলেন, আমার দুঃখের সময়ে তুমি আমার মেয়েকে এত আদর করে নিচ্ছ এই আমার মহা সান্ত্বনা। জয়া, যাও মহেন্দ্র, অমিয় এদের খবর দাও। ছায়া, শ্রীলতা বোধ হয় ঘরে শুয়ে আছে ওকে বলগে।

শ্রীলতা দীপঙ্করের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া ঘরে শুইয়াছিল। ছায়া প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল। তোমার বোনের যে বিয়ে লেগে গেল এই হট্টগোলের মধ্যে।

শ্রীলতা সংবাদ শুনিয়া প্রশ্ন করিল, মালতীর মত হবে?

না হবার কারণ কি? এমন পাত্র, এমন ঘর তো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া চেনাজানার মধ্যে। তোমাদের আহ্লাদী ছোটবোনের জন্যে ভয়-ভাবনা থাকবে না। মালতীর তো অন্য কোন দিকে বা'রটান নেই। বরঞ্চ বিনি হ'লেই মতামতের প্রশ্ন উঠত। মা কথা দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীলতা চুপ করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া মালতীর জীবনে বসন্ত আসিবার পূর্বেই শেষ বসন্ত রচিত হইয়া গেল।

কখন যে মুকুল ধরিল, ফুল জাগিল কেউ জানে না। যখনি দৃষ্টি সজাগ চাহিল, তখনি দেখা গেল গুচ্ছ-গুচ্ছ ম্লান গোলাপী ফুলের ঝালরে পল্লবতল সমাচ্ছন্ন। বিদায়ী বসন্ত কখন যে প্রস্থানক্ষেপ করিয়াছিল কেউ জানে না। কেবল বিলুপ্তির চিহ্ন সে রাখিয়া গেল ওই চ্যুত পুষ্পদলের পর্ণে-পর্ণে—পত্রে-পত্রে।

ঝরা বাতাসে ঝরা ফুলের আরতি। আজ আমার কাহিনী পুষ্পঝরার কাহিনী।

॥ বারো ॥

'ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল-কন্যা চন্দ্রাবতী।'

—মৈমনসিংহ গীতিকা।

ইস্, আপনার মাথায় যে স্বয়ং ভগবান পুষ্পবৃষ্টি করছেন। না, আপনাদের তো ভগবান নয়, খুদা।

নদীর উপর লঞ্চে আবার রায়বাড়ি ভাসমান। সকলে না আসিলেও যাহারা আসিয়াছে, তাদেরই কথার কাকলীতে খরস্রোতা পদ্মানদী উদ্বেল।

তীরের একটি গাছ লঞ্চে-দণ্ডায়মান হামিদের কালো তরঙ্গায়িত চুলের গুবক স্পর্শ করিল। লাল-লাল বন্যকরবী দল ঝরাইল হামিদের মাথায়।

সস্পার পরিহাসে হামিদ মাথার ফুল ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, আমারও ভগবান। যিনি ভগবান, তিনিই খুদা। আলাদা করে দেখবেন না।

দীপঙ্কর বিমনা ছিল। পদ্মবিলের রমণীরূপ পার হইয়া কাশফুলে শোভিত হৈমন্তী পদ্মাতীরে নৌকা ভাসিয়াছে। নদীপারের শোভা অনুপস্থিতা প্রেয়সীকে কেবলি মনে করাইতেছে। এখন সজাগ হইয়া সস্পাকে বলিল, ভগবানকে বেশ ভাগ করতে শিখেছ, না মেমসাহেব? তোমার দেবতা তো যীশুখৃষ্ট।

আর আপনার হচ্ছে কুবের, না? হামিদদা,' আমার অন্যায় হয়েছে। মাফ করুন।

লাজুক হামিদ না না—সে কি বলিতে বলিতে ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। তাহারি ফাঁকে চোখ পড়িল দুই সুকোমল নেত্রে মালতী তাহাকেই দেখিতেছে।

দীর্ঘদেহী হামিদ দীর্ঘদেহী দীপঙ্করের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। দীপঙ্কর পুরুষালী বলিষ্ঠতায় ভূষিত। রুক্ষ-রৌদ্রদগ্ধ মূর্তি। কিন্তু হামিদের পৌরুষ অতি ভদ্রশালীন সৌকুমার্যে মণ্ডিত। অধরে-নয়নে কোমলতা, সহাস্য প্রফুল্লতা।

বিনতা জলে হাত ডুবাইবার চেষ্টায় ছিল। সতর্ক হামিদ তাহাকে নিরস্ত করিল।

এখন জোয়ার। হঠাৎ জলে ডুবলে তোলা যাবে না। তা ছাড়া এদিকটায় হাঙরের ভয় আছে।

হামিদ, একবার তুমি না শুধু হাতে একটা হাঙর মেরেছিলে?

সে ছেলেবেলায়। ও কথা যেতে দাও। তাড়াতাড়ি হামিদ কথাটা চাপা দিতে চাহিল।

দীপঙ্কর সুভদ্রা মিত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, জানেন মিস মিত্র, হামিদ কেবল কবি, ভাল ছাত্র বা দক্ষ রাজপুরুষ নয়—সে একজন ব্যায়ামবিদ পালোয়ান। ছেলেবেলায় রোজ একসের ছোলা চিবিয়ে খেত। লাঠি, তলোয়ার, কুস্তি সবটাতেই দক্ষ ছিল। আমাদের চার-পাঁচজনকে পিঠে করে মাঠে ছুটতে পারত—লেগে থাকলে হামিদ দ্বিতীয় শ্যামাকান্ত হতে পারত।

তাই নাকি? আজ সুভদ্রা মিত্র অতিশয় অন্যমনস্ক। সে জলের স্রোতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। চোখ ফিরাইয়া বলিল, তবে তো মিস্টার হক্ হচ্ছেন answer to maiden's prayer.

হ্যাঁ, কুমারীর প্রার্থনা মূর্তি ধরে উপস্থিত। কুমারী যাঁরা আছেন, ভেবে দেখুন।

দীপঙ্কর পরিহাসচ্ছলে কথাটা বলিলেও সুভদ্রার দিকে খরদৃষ্টি পাতিল। নিখিল সুভদ্রাকে চায় সে জানিত। কিন্তু সুভদ্রার মন জানিত না। যদি নিখিলের ভাগ্যে নাই জোটে তবে সংস্কারবিমুক্তা অত্যাধুনিকা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
'কৃষ্ণচরিত্র' ২৷৷০ পুনর্মুদ্রিত
'ইন্দিরা' বার আনা উপন্যাস

শ্রীউপগুপ্ত রচিত
'সত্যি-কথা' ১৲ রসরচনা ২য় মুদ্রণ

১৩০৪ সালে রাজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক বেতারে কথিত
'রাধা মদনমোহন' ৩য় মুদ্রণ পাঁচ টাকা
বিষ্ণুপুর ও বাগবাজারের মদনমোহন জীউর ঐতিহাসিক গল্প। ১২টি ফটো সম্বলিত।

রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্র মিত্রের রচনা পাঠ করিয়া বলিয়াছেন: "পড়য়াদের মনকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে—"
'প্রাণের রেবা' ছোট গল্প ৩৷৷০ ২য় মুদ্রণ
নাটিকা: সাক্ষী-গোপাল ২য় মুদ্রণ ১৲ টাকা

আর, কে, পাব্লিশিং কোং : শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র
১১।এ গোকুল মিত্র লেন, মদনমোহনতলা, কলিকাতা-৫

লেখিকা সুভদ্রা মিত্র সংস্কারবিমুক্ত উপযুক্ত পুরুষ, বিশেষত তাহার বন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়া কেন প্রতিভার নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিবে না? উদয়শঙ্করের মত নূতন পদবী সৃষ্টি করিতে কেন অন্য কেউ পারিবে না?

সুভদ্রা অন্যমনা হইলে রায়বাড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। এখনও খোলাখুলি রায়বাড়ি আলোচনা করিতেছে না। তাহাদের স্বভাব তা নয়। কিন্তু জাতিগত সমস্যাটি সকলেরি সম্মুখে দৃশ্যমান।

দীপঙ্কর জাতিভেদে, শ্রেণীভেদে বিশ্বাস করে না। সম্পা যে মনোমত মানুষ গৌতমকে বিবাহ করিতে পারে নাই তাতে সে ক্ষুব্ধ। কিন্তু রায়বাড়ির কোন সমস্যা শ্রীলতাকে পীড়া দিবে। তাই দীপঙ্কর রায়বাড়ির সমস্যা চায় না। দুই-একবার সুভদ্রাকে হামিদের

অল্প মূলধনে লাভের ব্যবসা

সোডা ওয়াটার মেসিন

সামান্য কিছু মূলধনে আপনি যে কোন জায়গায় একটি ছোট সোডা ওয়াটার প্রস্তুতের কারখানা করতে পারেন এতে মাসে পড়ে ১৫০।২০০৲ মত আয় হয়।

১ ডজন বোতল সোডা ওয়াটার করতে খরচ হয়

মাত্র ২৫ নয়া পয়সা

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :—

এসেন্স এণ্ড বোতল সাপ্লাই (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

১৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, পোঃ বক্স নং ৩৭২
কলিকাতা - ১

মহাজাতি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস

১২৭, নরসিংহ দত্ত রোড
হাওড়া ● ফোন : ৬৬২২২৭

দিকে সে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছে। সে কবি হামিদ, কি স্থান-মাহাত্ম্যে সর্বেসর্বা হামিদ বলিয়া দীপঙ্কর বোঝে নাই।

হামিদ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। এখনও আরক্ত হইয়া ওঠে সে। তাড়াতাড়ি কথাটায় তালি দিতে সে বলিল, দীপঙ্করের কথায় বিশ্বাস করবেন না। খাদ্য জুটত না বলে ছোলা খেতাম। অল্পবয়সে পাড়াগেঁয়ে ছেলের মত অনেক গুণ্ডামীও করেছি। এখন আদালত আর আসামী নিয়ে কাটে।

নিখিল জনবৃদ্ধি দেখিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এত তোড়জোড় করিয়া, সম্পাকে হাত করিয়া সুভদ্রাকে নিরিবিলি নদীভ্রমণে আনিয়াছিল। কিন্তু হায়, কিভাবে সমস্ত কল্পনা তাহার মাঠে মারা গেল। বাড়ির জনবাহুল্যে সুভদ্রার সহিত একটাও কথা হয় না। এখানেও তাই ঘটিল। এখন আবার হামিদকে লইয়া দীপঙ্করের বাড়াবাড়ি দেখিয়া সে ক্ষুণ্ণ। পাদপ্রদীপের সবটাই আলো হামিদমূর্তিতে পড়িতেছে।

বিনয় একধারে অরুণাংশুর সঙ্গে বসিয়াছিল। নিখিলের দিকে কটাক্ষ হানিয়া বলিয়া উঠিল, দীপঙ্করদা', হামিদদা' তো একবার বিয়ে করেছিলেন ছেলেবেলায়। যারা একবারও বিয়ে করে নি তেমন-তেমন ব্যক্তির আগে ব্যবস্থা করুন।

সম্পা বলিল, ছেলেদের মধ্যে আপাতত তো তিনটি দেখছি। তুমি, তোমার বন্ধুবর আর সাক্ষাৎ কুমার কার্তিক আমাদের রাঙাদা'।

বিনয় বলিল, আমার ব্যবস্থা এ নৌকায় হওয়া সম্ভব নয়। এটা ঈজিপ্ট নয়। অরুণ পড়ুয়া। একজন মাত্র বাকি থাকেন।

নিখিল ভাইবোনের প্রতি অতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। কিন্তু, সুভদ্রা আনন সরমে রক্তিম হইল না তো। কেবল বাচ্চা মেয়ে মালতীটা বসিয়া বসিয়া আরক্তিম হইতেছে। যেন যত রং বিধাতা এখনি ওর মুখে ঢালিয়া দিলেন।

অরুণাংশু বিনতার কাছে একটু সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, আপনি সায়েন্স নিয়েছেন শুনলাম। কেমন লাগছে?

কথাবার্তার প্রধান স্রোত হইতে বিচ্যুত হইয়া অরুণাংশুর তাহার সহিত আলাপ জমাইতে আসা বিনতা পছন্দ করিল না।

ভ্রূভঙ্গ উত্তর দিল, নূতনত্ব কি আছে আর? আপনারও যেমন লেগেছে, আমারও ঠিক তেমনি লাগছে।

কথাটা কিছু নয়, কিন্তু বলিবার সময়ে দাম্ভিকা রায়দুহিতার কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গিমা কথাগুলিকে অপমানকর রূপ দিল। অরুণাংশুর শ্যামাভ মুখটি ম্লান হইয়া গেল।

বিনয় উচ্চহাস্যে জবাব দিল, এতক্ষণে একটা হাসির কথা শোনালি বিনি। ম্যাট্রিক থেকে একজন রেকর্ড নাম্বার পেয়ে প্রথম হয়ে এসেছে, আর একজন প্রতি পরীক্ষার আগে তৈরি হয় নি বলে পরীক্ষা দেয় না। দু'জনের কাছে সায়েন্স একরকমই লাগে বৈ কি।

বিনতা অপমানে, রাগে লোকজন ভুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ফুলদা,' যা-তা বোল না বলছি। কেন তুমি এমন করে বলবে? আমার ইচ্ছা, আমি পরীক্ষা দিই না।

বিনতা কাঁদিয়াই ফেলিল।

নিখিলেন্দ্র বলিল, বিনয়, তুমি বড় বেশি কথা বলছো।

সম্পা বলিল, এইজন্যে মা বিনিকে আসতে নিষেধ করেছিলেন। হামিদদা' আপনার চার্জে সকলে এসেছি। আপনি মীমাংসা করে দিন।

হামিদ বিনতার মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া বলিল, চায়ের কাপে যখন তুফানই উঠল, তখন চায়ের আয়োজন মিস্ বিনতা রায়ের হাতে দেওয়া হোক।

অরুণাংশু ততক্ষণ সেখান হইতে উঠিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেছে। বিনয়ও উঠিল। বিনতার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, অতিথির সম্মান রাখা শিখবে কবে? বন্ধুর সহিত সেও বাহিরে চলিয়া গেল।

হামিদের লোকজন বড় বড় ট্রে ভরিয়া চা, সন্দেশ, রসগোল্লা ও চমচম বিতরণ সুরু করিল।

এ কি, এত খাবার! কখন এ সবের ব্যবস্থা করলেন? আমাদের সঙ্গের খাবারগুলো কি হবে?

সম্পার প্রশ্নে হামিদ উত্তর দিল, ফেরৎ যাবে। এতদিন রোজ আপনাদের খেলাম। এবার আমার পালা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। ও কি—আপনি, আপনি শুধু চা নিলেন কেন?

মালতীর হইয়া সম্পা উত্তর দিল, ও আবার মিষ্টি পছন্দ করে না। কবি-ভাবাপন্ন হলে কি হয় মালতীর নাম মাংসাশী মালতী।

হামিদ সাগ্রহে বলিল, লঞ্চের কিচেনে সব ব্যবস্থা আছে। তীর থেকে মাংসও

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির
মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

জাতীয় উৎসব

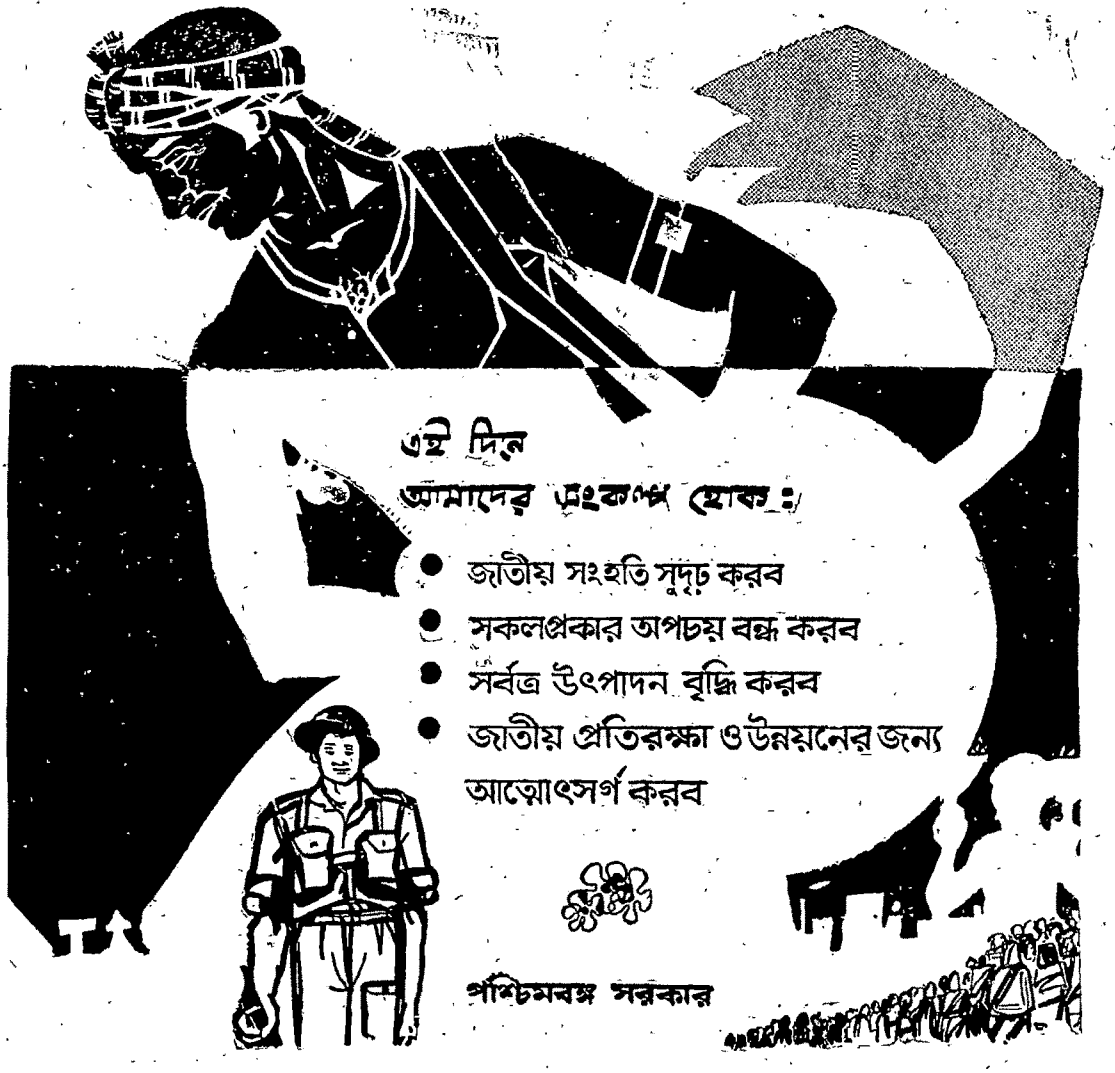

এই দিন
আমাদের সংকল্প হোক :

- জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব
- সকলপ্রকার অপচয় বন্ধ করব
- সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব
- জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংগ্রহ করছি। কিন্তু, হঠাৎ হামিদের উদ্দীপ্ত মুখ ম্লান হইয়া গেল, আমার বাবুর্চি মুসলমান।

দীপঙ্কর বলিল, আমাদের মালতী মুসলমানের রান্না খাবে না এমন একটা হাস্যকর ধারণা তোমার হল কি করে? দার্জিলিং-এ মালতীর জন্যে আমায় যে মুসলমান বাবুর্চি খুঁজে আনতে হয়েছিল। ও বলে মুসলমান ভিন্ন মাংস রান্না জানে না।

অতি পরিতৃপ্ত হামিদের ঝল্‌মলো মুখের দিকে চাহিয়া সম্পা বলিল, আমি মাফ-চেয়েছিলাম, এবার আপনার মাফ চাওয়ার পালা। আপনি যে অন্য ধর্মের লোক আমরা ভুলে গেছি। তা ছাড়া আমরা কেউ ধর্ম-টর্ম মানি না।

মাংসের ব্যবস্থা করিয়া হামিদ ফিরিলে বিনতা বলিল, কফিও তো আছে আপনার, না।

হ্যাঁ। একটু পরে দিতে বলেছি।

নিখিল বলিল, এত কষ্ট কেন করছেন, মিস্টার হক আমাদেরই আপনাকে খাওয়াবার কথা। আপনি না থাকলে কি হত আমাদের।

না, না, সে কি কথা? আপনারা জমিদার, নিজেদের রাজত্বে এসেছেন। আমি সামান্য চাকুরে মাত্র। সকলের সেবা করাই আমার কর্তব্য কাজ।

কর্তব্য রেখে দাও কবি। কবিতা শোনাও। বহুদিন তোমার মুখে কবিতা শুনি নি। মাংস হতে হতে কবিতা হোক। স্নান নদীতে ঢোল না জোয়ার লেগেছে জলে। নৌকায় জোয়ার আসুক।

দীপঙ্করের কথায় হামিদ বলিল, কবিতা আমার কি শোনাবার মত? কি-ই বা লিখি। মাংস হতে দেরি আছে। এতক্ষণ না খেয়ে থাকলে কষ্ট হবে যে। এগুলো চলবে?

হামিদ মালতীর সামনে একটিন বিস্কুট ধরিল।

মালতীর উজ্জ্বল দুই চোখে ভুবনবিজয়িনী জাগিয়া উঠিল, ঠোঁটের বঙ্কিমরেখায় লাস্য ফুটিল। এতক্ষণে সে সহজভাবে কথা বলিল, না খেয়ে আবার রইলাম কি করে? আসবার আগেই তো একপালা হয়ে গেছে।

নির্নিমেষে হামিদ তাহার দিকে চাহিয়াছিল। সমগ্র হেমন্ত প্রকৃতি যেন জলযাত্রায় উপস্থিত। ধানী-রংয়ের শাড়ির আড়ালে শুভ্র বাহু ও কণ্ঠ তীরের কাশফুলের স্মৃতি আনে। ঝরা পাতার কালিমা চুলের থাকে-থাকে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যেন তার এই অতি নিজস্ব মালতী মিলাইয়া আছে।

কিশোরী মধ্যবয়সী পুরুষকে চাহিবে না। না চাক, ক্ষতি নাই। হামিদ যাহা চাহিয়াছিল এতকাল পরে পাইয়াছে। পবিত্রতার মূর্তরূপে, মূর্তিমতী কবিতারূপে মানসী বিলম্বে আসিলেও আসিয়াছে।

মালতীকে প্রথম দেখিবার পরে গৃহে ফিরিয়া বিনিদ্র রাত্রে হামিদ যে কবিতা লিখিয়াছিল সেই কবিতা কেবল কবিতা নয়, তাহার ডাইরি।

বহু বিলম্বে আসিয়াছ তুমি,
তবু আসিয়াছ এই তো ভালো;
তৈলবিহীন প্রদীপে দেখ তো
জ্বলে কি না জ্বলে নতুন আলো।
স্তিমিত হয়েছে যৌবনশিখা
মনের খবর লয় না কেহ,
আমি শুধু জানি অন্তর তাপে
হয় কিনা হয় তাপিত দেহ।
তুমি আসিয়াছ ভালই করেছ,
এ ধরণীতল নবীন আজো,
পথের ধূলায় আমি সাজিয়াছি,
ফুল-পরিমলে তুমিও সাজো।*

(* কবিতাটি সজনীকান্ত দাসের লেখা)

শুধু কি ধর্ম ব্যবধান? স্বপ্নময়ী কিশোরীকে দিবার মত কি আজ আছে হামিদের? তরুণ অরুণাংশুর মত কেউ মালতীর পাশে মানায়।

অধিকন্তু আবার বিপত্নীক নামের ছাপ। স্ত্রীকে হামিদের একেবারে মনে নাই। ভাল পরিচয়ের পূর্বেই হামিদ চলিয়া গিয়াছিল ইংলণ্ডে। ফিরিয়া আমিনাকে সে আর দেখিল না। কাহারও মৃত্যুতে স্বাভাবিক করুণা ভিন্ন অন্য কোন ভাব তার মনে হয় নাই বলিয়া হামিদ মনে মনে লজ্জিত ছিল।

আজ আমিনার নামও হামিদ ভুলিয়া গিয়াছে।

তথাপি সে তো বিপত্নীক নামে আখ্যাত। রায়বাড়ির ছেলে মনে করাইয়া দিল হামিদ পূর্বে আর একবার বিবাহিত।

কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা দ্বারা আজকার জলযাত্রা হামিদ বিবর্ণ করিয়া তুলিবে না। হামিদের জীবনের অনন্ত সঞ্চয় এই জলযাত্রা। পাইবার বস্তুতে সে মন দেয় নাই, প্রাপ্তির আশায় তার ভালবাসা নয়। হামিদের প্রেমের জন্ম ও মৃত্যু একটি দোলনায়।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে, স্বচ্ছ নদী তরঙ্গময় জলে, তীরে হরিৎ-লাল ফুলের মেলায়, স্নিগ্ধ

With Best Compliments

FROM

Chung Wah Restaurant

Phone No. 23-5220

সবুজ জলজ গুল্মের দোলনে ময়ূরপঙ্খী চলিয়াছে। আর তারি বুকে চিরদিনের সেই সুচিরা রাজকন্যা। অক্ষয়স্মৃতির শিকলে বর্ণবিচিত্র ছবিখানি বাঁধা থাকিবে জীবনের অক্ষয়বটের মূলে। দূর হইতে হামিদ প্রেমের সাধনা করিবে জন্মান্তরের প্রত্যাশায়।

অজস্র কবিতা মনে আসিতে চায়। হামিদের শেষ বসন্ত।

অতিকষ্টে রমণীয়ার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইল সে। বিধর্মীর সহিত নাম যুক্ত হইলে রক্ষণশীল পল্লীগ্রামে রায়দুহিতার অমর্যাদা ঘটিবে।

কিন্তু দৃষ্টি ফিরাইলে দৃষ্টির সম্মুখে হামিদ বিস্মিত হইয়া দেখিল সেই এক মূর্তি। জলভ্রমণে ঈষৎ আন্দোলিত মালতী মূর্তি। হামিদের সমগ্র পৃথিবী সে আবৃত করিয়াছে। যেখানে যত রূপ, যত রস তারই কেন্দ্র মালতী রায়। তাকিয়া আশ্রয়ে কার্পেটে হেলিয়া বসা জীবন্ত সরস্বতী। বিদ্যা ও কাব্যের আজীবন সাধন-প্রতীক।

বিনয় ও অরুণাংশুকে সাধ্যসাধনা করিয়া হামিদ ভিতরের ঘরে আনিয়াছিল। বিনয় বিনতার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া তোয়াজের সুরে বলিল, বিনি, একটা গান শোনা। নাঃ, এটা তুই ভালোই জানিস।

অনুনয়-বিনয়ের পরে কুপিতা বিনতা অবশেষে গলা খুলিল—

আমার মল্লিকা বনে
যখনি ধরেছে কলি,
আমি তোমারি লাগিয়া
তখনি বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি।

পূর্বের আঘাত বিস্মৃত হইয়া অরুণাংশু কান পাতিয়া রহিল। বন্ধু বিনয়ের বাড়ি প্রথম দিন প্রবেশের সময়ে এই কণ্ঠ গানের আহ্বানে অরুণাংশুকে কাছে ডাকিয়াছিল। সেইদিন কণ্ঠ বলিয়াছিল :—

আমি চিনি গো চিনি
তোমায় ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে,
ওগো বিদেশিনী।

সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের পরে যেন শ্রান্ত অরুণাংশু সেদিন আশ্রয় পাইয়াছিল। কত যুগ-যুগান্তের চেনা সুর। এই কণ্ঠ যেন সে প্রথম জাগরণের মুহূর্তে কানে শুনিয়াছে। রাত্রে নিদ্রার অতলে নিমজ্জনের পূর্বে শুনিয়াছে।

অবশেষে একদিন গায়িকার দেখা মিলিল। ফটকের কাছে অরুণাংশু বিনয়ের সঙ্গে বিদায়প্রাক্কালে সম্ভাষণ শেষ করিতেছিল। দুইটি কিশোরী গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ি প্রবেশের মুখে আলাপ হইল।

উজ্জ্বল কোন জলধারার মত সাবলীল বিনতা দুইহাত ললাটে ঠেকাইল, আপনি বুঝি ফুলদা'র সেই আদর্শ ভালছেলে বন্ধু?

বিনতার পশ্চাতে যে কিশোরী নির্বাক ছিল, তাহাকে চিত্রে-আঁকা রূপকথার রাজকন্যা বলিয়া মনে হয়।···কোন শিল্পী রং-তুলির সাধনায় বিনয়ের ছোট বোনটিকে ধরিতে চাহিবে।

কিন্তু অরুণাংশু শিল্পী নয়, সে বৈজ্ঞানিক। বিনতার মুখে বিভিন্ন বর্ণপরিবর্তন তার হাতে রসায়নের বিভিন্ন রূপায়ণ বলিয়া

প্রতীয়মান হইল। হাতের টেস্ট-টিউবে যেমন দুই-একফোঁটা সলিউশন ঢালিলে তরল পদার্থের তাৎক্ষণিক রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তেমনি বিনতার মুখ ক্ষণে-ক্ষণে রং বদলায়। সমস্ত সত্তায় তার চঞ্চলতার পাখা উড়ানো। চঞ্চল রক্তবর্ণ অতি গৌর বর্ণে টল্‌মল্ করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে রং বিরক্তিমণ্ডিত নীলাভ। চোখের দৃষ্টি স্থির থাকে না। বসুন্ধরার সর্বত্র যে সর্বদা প্রবহশীল জীবনী-উৎস, সেই এনার্জি যেন ম্যাটারে রূপ ধরিয়াছে বিনতা রায়ের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিকের সাধনা সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে নূতন প্রাণের সাধনা। জীবন্ত কোন লীলা খোঁজে সে। শিল্পীর সাধনাপার্শ্বে প্রকাশিত হইলেও অরুণাংশু বিজ্ঞানী-মনের সন্ধান দিয়া গতির উৎস বিনতাকে পছন্দ করিল।

চলনে গতি তার দ্রুত, সে বিদ্যুৎশিখা। কণ্ঠে তার ধ্বনির প্রকাশ। পৃথিবীর কোলাহলের সমন্বয় সেখানে। সর্বদা প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছ্বসিত, ছোটখাটো ভঙ্গির মধ্যে সজীবতা, চোখে প্রখর সপ্রতিভতা।

রাত্রে মলিন সজ্জায় দীন পরিবেশে

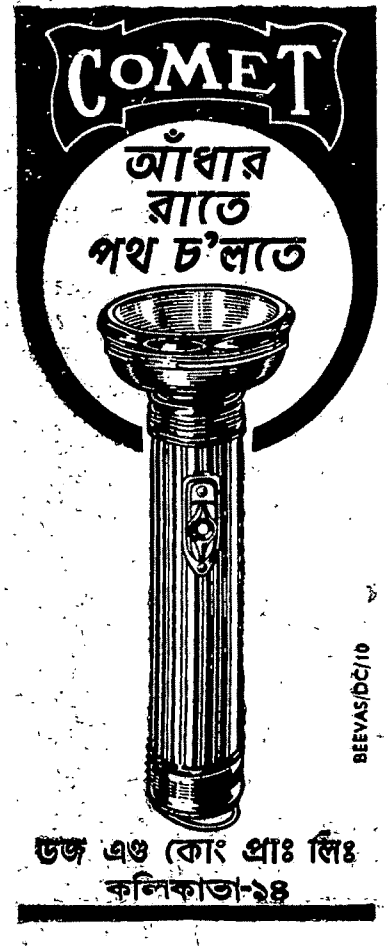

ডজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-২৪

অরুণাংশু একটি শপথ গ্রহণ করিল। বি-এস-সি ও এম-এস-সি পরীক্ষায় তাহার নাম যথারীতি শীর্ষে থাকিল। অক্লান্ত পরিশ্রমে রসায়ন-চর্চা করিতে লাগিল তপস্যা প্রথায়। ভাগ্য তাহাকে অর্থ দেয় নাই, আভিজাত্য দেয় নাই। রূপ দিতেও ভুলিয়াছে। হাতে শুধু একটি রজ্জু, সেই রজ্জু বিশ্বমঙ্গলের মত আকাঙ্ক্ষিতার কাছে টানিয়া লইবে।

কয়েকখানা গানের পরে বিনতাকণ্ঠ নীরব হইল। নৌকার দোলায় মধুরকণ্ঠের রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকলেরই মধুর লাগিতেছিল। কিন্তু বিনতা আর গানে সম্মত নয়। অরুণাংশুর বিমুগ্ধভাব তার অপ্রীতিকর লাগিতেছিল।

ইতিমধ্যে মালতী বিনতার কানে-কানে কিছু বলিল।

বিনতা বলিল, বা রে, আমি একা গান গেয়েই বা মরবো কেন? দীপঙ্করদা' না কবিতা শুনতে চাইছিলেন।

এইবার হামিদের পালা। এতগুলি লোক, বিশেষত অধিকসংখ্যক নারীর সম্মুখে নিজের গোপন কবিতা বাহির হওয়ার প্রস্তাবে হামিদ নদীর শীতল বাতাসেও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

দীপঙ্কর বলিল, কবির মুখে তার কবিতা শোনার সুযোগ আমরা হেলায় হারাতে প্রস্তুত নই।

হামিদ কোনমতে কথা পাল্টাইবার জন্য বলিল, আমার থেকে অনেক বড় সাহিত্যিক এখানে উপস্থিত। আমার মত একটা সামান্য লোককে ছেড়ে ওঁকে ধর না, দীপঙ্কর।

সুভদ্রা মিত্র বুলুর পাশে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্যপাশে নীরব নিখিলেন্দ্র।

সুভদ্রা উত্তর দিল, আমি কথা-সাহিত্যিক কবি নয়। আমার সাহিত্য পাঠের বস্তু, শ্রুতির নয়।

সম্পা বলিল, কিন্তু 'বিদ্বান জন' উপন্যাসে কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে। কোটেশন চিহ্ন দিয়ে নিজেকে অচিহ্নিত রাখতে চাইলেও লোকে ধরে নেয় সেগুলো আপনারি লেখা। না, ভদ্রাদি'?

না। সেগুলো আমার চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিকের লেখা। নাম দিতে নিষেধ ছিল।

কে তিনি?

গৌতম মুখোপাধ্যায়।

এই বিবাহের পরে প্রথম সম্পা গৃহের পরিধির মধ্যে গৌতমের প্রকাশ্য নামোচ্চারণ শুনিতে পাইল।

সম্পার সহসা নির্বাকতার উপরে বিনয়ের রাক্য ভাসিল, না, হামিদদা', বাজে কথায় ফাঁকি দিলে চলবে না। আমরা শুনবই আপনার নিজের লেখা। নইলে এখনি লঞ্চের মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে চলুন।

সঙ্কোচকে পরাভূত করিয়া হামিদের বুদ্ধি মন্ত্রণা দিল: নিজের কবিতা ওকে শোনাও। এ সুযোগ কি আর আসে?

মাথা নীচু করিয়া হামিদ আস্তে আস্তে বলিল:

বর্ষায় ফোটে নি ফুল, বসন্ত ব্যাকুল
পারে নি বীজের মুক্তি দলের মোচন;
হিমানীর হিমচুমো দিল কি জীবন?
লাগল না সে ফুলের বীজ কি মুকুল।...

কবিতাটি শেষ হইলে বিনয় বলিল, হামিদদা' কেন আত্মগোপন করে পল্লীগ্রামে পড়ে আছেন? চাকুরি ছেড়ে শহরে আসুন। আপনি কলিকাতা-কবীন্দ্র হয়ে যাবেন।

বিনয়, তুমি বলছো বটে কিন্তু আমার এত শক্তি নেই যে শহরকে মুগ্ধ করবো।

চাপা গলায় সুভদ্রা বলিল, শহর তো এখানেই উপস্থিত।

নিখিল চকিত। সুভদ্রার মুখে এতক্ষণে রংয়ের ছোঁয়া। উদাসীনতার মূল শিকড় উৎপাটিত। সে কি কবিতা শুনিয়া অথবা কবিকে আবিষ্কার করিয়া?

নিখিলের মনে পড়িল, জীবনে কখনও সে কবি হইতে চেষ্টা পায় নাই। প্রেমে সে বেশকে সৌখীন করিয়াছে; চেহারাকে উজ্জ্বল করিয়াছে; কর্মে উন্নতি খুঁজিয়াছে; কিন্তু একটিও দুইছত্র কবিতা লেখে নাই। নানা কৃতিত্ব ও সমৃদ্ধির পরিচয়ে সে সুভদ্রা-মনোহরণে অভিযাত্রী। কিন্তু এই সুভদ্রা দ্বাপরের রাজকন্যা নয়। বীর্য ভিন্ন, ঐশ্বর্য ভিন্ন হয় তো অন্য বস্তুরও চালান চাই।

যদি নিখিল কবিতা লিখিত, তা হইলে আজকের জলযাত্রায় নায়ক হইত সে। ভাল মানুষ হামিদ কেবলি তাদের সেবা-পরিচর্যায় নিযুক্ত রহিত। খোলা আকাশের নীচে পদ্মার বুকে এমন পটভূমিকা শহরজীবনে কল্পনাতীত। সুভদ্রা কি চিরনিষ্করুণা থাকিত?

অসংখ্য নারীপ্রার্থিত নিখিলেন্দ্রের নিজের যোগ্যতায় পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পদ্মাসলিলে বিশ্বাসের জয়পতাকা ঈষৎ কম্পমান।

হামিদের কয়েকটি কবিতার পরে কফি আসিল। সকলে যখন কফি সেবনে ব্যস্ত, বিনতার কানের কাছে আবার মালতীর মুখ।

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষককে

শারদীয়

অভিনন্দন

নারায়ণপুর কোল্ড ষ্টোরেজ

নারায়ণপুর (হুগলী)

শঙ্কর কোল্ড ষ্টোরেজ

দশঘরা (হুগলী)

খাইবার ও বীজ আলু সংরক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত।

৩০ বৎসর যাবৎ চাষীদিগের সেবায় নিয়োজিত।

বিনতা ঠক্ করিয়া নিঃশেষিত পেয়ালা রাখিয়া আবার বলিল, সেই কবিতাটা বলুন না হামিদদা', সেই 'আমের মঞ্জরী' কাব্য-সংকলনে আপনার পুরনো কবিতাটা? আপনি এখন যতই আধুনিক কবিতা লিখুন না কেন, আপনার অল্পবয়সের ওই কবিতাখানা চমৎকার।

হামিদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কোনটা? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

বিনতা বলিয়া ফেলিল, ওই যে সেইটা—মালতী বলছে—'বুঝি বলেছিল।' এটা মালতীর মুখস্থ আছে আগাগোড়া।

আবেগে হামিদের কফিপাত্র কাত হইয়া বস্ত্র কফি-রেখাঙ্কিত করিল। সৌভাগ্য তাকে রাজা করিয়া ছাড়িল।

আপনার জামা যে গেল। বিনতার কথায় হামিদ তাড়াতাড়ি পাত্রটি নামাইতে গেল। আগাগোড়া দামী গালিচা আস্তৃত। সরকারী জিনিস। ওদিকে খানিকটা খোলা পাটাতন। সেখানে ট্রে-হস্তে খানসামা।

কোথায় ভরা উচ্ছলিত পেয়ালা রাখা যায় বিনতার পশ্চাৎ হইতে দুইখানি পদ্মহস্তের অঞ্জলি প্রসারিত হইল, দিন, আমি খানসামার কাছে দিচ্ছি।

কিন্তু যে—এঁটো! আমার এঁটো যে।

তাতে কি?

মালতীর চোখ স্থিরদৃষ্টিতে হামিদের চোখে লগ্ন হইয়া রহিল। ভীরু কিশোরীর চোখ নয়। উজ্জ্বল-প্রখর বিজয়িনীর চোখ। প্রগাঢ়, গভীর ও মাদক।

কৃতার্থ হামিদের হাত সভয়ে—সসম্ভ্রমে সেই শ্রীমতী করপল্লবে পাত্রপ্রদানের সময়ে একবার দুইটি আঙুলের স্পর্শে শরীর-মন ভরিয়া লইল। শ্রীমতী করবিমুখী নয়।

আকাশের মুক্ত পাখির মতই এবার হামিদের গলায় কত সুর জাগিল। আর তাহাকে কোন অনুরোধ করিতে হইল না। একটি শ্রোতার উদ্দেশে তার গলায় কবিতার পর কবিতা উচ্চারিত হইতে লাগিল। প্রথমে মালতীর প্রিয় কবিতা—

—বুঝি বলেছিল,—

নীরদ লুকালে ধরণী শুকালে
যখন আকাশ সুনীল হবে,
স্নাত শশধর তারকানিকর
হাসিতে ভরিয়া রবে;
আমি আসিয়ে মধু হাসিয়ে
কেঁদে কাঁদায়ে তোমারি হব।
সে ত' এখনি হাসে চাঁদিনী
সে ত' আসে নি—কেমনে রব?

—আজীজ

॥ তেরো ॥

সুভদ্রার চিন্তা:

বুঝি বলেছিল,—
কথা ঠেল না, কোথা যেও না
দেখ ভুলো না ভুলালে কেহ—

এই কবিতাটা যখন 'দীন কবি' এই ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশিত হয় আমরা সেন্টিমেন্টাল বলে হেসেছিলাম। কিন্তু কবির মুখে মন্দ শোনাচ্ছে না তো! তবে কি এই ধরণের কবিতার এখনও আবেদন আছে? কিম্বা পরিবেশ ভাল লাগাচ্ছে?

অন্য কবিতাগুলি চমৎকার। হামিদুল্লা হক প্রথম শ্রেণীর কবি আমি জানতাম কিন্তু এতবড় কবি আগে বুঝি নি।

অন্য দেশ হলে ইনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যেতেন। কলকাতার লোকেরা কবিকে দেখেই নি। কপাল গুণে এঁর যোগাযোগ বেশি রায়বাড়ির সঙ্গে। সেখানে খট্‌খটে শুক্‌নো জমিতে রবিশস্যের চাষ হয়, কিন্তু ফুল ফোটে না।

মালতী ফুলটি কিন্তু দিব্যি ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য, কারুর চোখে পড়ছে না ব' পড়েও নি! বয়সের তফাৎ দেখে, মুসলমান জেনে সকলে নিশ্চিন্ত আছে।

কাঙালী বিদায়ের দিনই চোখে পড়েছিল আমার। ক্রমাগত হামিদের অন্দরের দরজায় এটা-ওটা চাইতে আসা। মালতীর আগাগোড়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা। সকলে জানল মালতী কাঙালী বিদায় দেখছে।

যে-রকমভাবে হামিদ মালতীর দিকে তাকাচ্ছিল, অমন দৃষ্টি বহুদিন কোন পুরুষের চোখে দেখি নি।

নিখিলেন্দ্রের দৃষ্টি আর সহ্য হচ্ছে না আমার। এতটা বিরক্ত বোধ করব জানলে পাকিস্থানের গ্রাম্ দেখবার লোভেও আসতাম না। বৌদ্ধদর্শনে লোভই সর্ব দুঃখের মূল। নদী বেড়াবার লোভে যদি না আসতাম, নিখিলেন্দ্র এমন ন্যক্কারজনকভাবে গা ঘেঁষে বসতে পারত না।

কিন্তু না এলে হামিদের কাব্য শোনা হত না কবির মুখে। হামিদের কবিতার বিশেষত্ব, প্রায় নিজস্বভাবে ওঁর লেখা। সাধারণত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বা পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা লেখেন প্রায়ই নীরস ও দুর্বোধ্য কবিতা। হক-কবির কবিতায় পাণ্ডিত্যের ছাপে কতকগুলো জমাট। দর্শন ও ইন্‌টেলেক্‌টের ছাপে কতকগুলো কঠিন। আবার পাশে-পাশেই দেখা যায় কোমলতার প্রেমের কবিতা। লিরিকধর্মী এই

রয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ

১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। ফোন: ৩৫-৫৫৮০

॥ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ॥

এ এম আই ই (ইণ্ডিয়া), বি ও এ টি, টার্ণার, ফিটার, মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ড্রাফটস্‌ম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান, রেডিও প্রভৃতি কোর্সসমূহে নূতন সেসনে ভর্তি চলিতেছে। স্কুল ফাইনাল পাশ না করা প্রার্থীগণকেও বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করা হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ডাকযোগেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

॥ কমার্স বিভাগ ॥

টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড ১, ৩, ৬ মাসে গ্যারাণ্টি দিয়া ফুল কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। বুক-কিপিং ও একাউণ্ট্যান্সী মাত্র ছয় মাসের গ্যারাণ্টিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজী বলা/লেখা বিদেশিনী মহিলাদের দ্বারা শিখুন।

॥ টিউটোরিয়াল বিভাগ ॥

এস এফ, হাঃ সেঃ, প্রি-ইউ ও ডিগ্রী কোর্সে বিশেষ অভিজ্ঞ প্রফেসারদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। এস এফ পরীক্ষায় "পাশ না করিলে গ্যারাণ্টি ফি ফেরৎ" স্কীমে ভর্তি নেওয়া হইতেছে। জার্মান ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে।

॥ শাখা ॥

৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; ২, পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা; ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর; ৮৭/২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার; ১০৮, সাউথ সিঁথি রোড, দমদম; ৬/১, পাঁচু খানসামা লেন, শিয়ালদহ; বি সি রোড, বর্ধমান; স্টেশন রোড, হাবরা; এবং নূতন দিল্লী ও বম্বে।

কবিতাগুলোয় কখনও বা গানের ধুয়া পাওয়া যায়।

বেছে এই ধরণের কবিতাগুলিই উনি বলছেন কেন? প্রতীকধর্মী ওঁর কবিতাগুলোও চমৎকার। গুণদেব শর্মা সেগুলোর ওপর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। হামিদের ওই কবিতাটা—

ও মেয়ে, এখানে এসো—এ যে সরোবর।
তীরে বোস, জলে মেলো আঙুলের চাপ;
মুহূর্তে বাতাসে বয় নিদাঘের তাপ।
সুতরাং জলে নামো, অতল সলিল;
তাম্রতটে জলরেখা বাদামী সর্পিল।

প্রতীকী কবিতার উদাহরণ হিসাবে দু-একটি সভায় আমি কবিতাটি উদ্ধৃত করেছি। এখন উনি ওটা বললেও পারতেন। জলের উপর ভাসছি বলে কি কবিতাটা আমার মনে পড়ছে? না, যে দেহমিলনের ইঙ্গিত কবিতাটি বহন করছে তার জন্য মনে হল?

এই যে পরিপূর্ণ পুরুষ, তার চাহিদা কি অবশেষে মালতী!

অবাক হ'তে হয় কেন যে প্রতিভাশালী পুরুষ রায়-মেয়েদের প্রেমে পড়ে? শুধু ললিতা কোমলাঙ্গী হওয়া ভিন্ন কি আছে ওদের? বিনতা অবশ্য সুন্দরী হলেও ললিতা নয়, তবু অরুণাংশু ওকে ভালবেসেছে।

অরুণাংশু প্রতিভা। অন্য ধরণের প্রতিভা। ওরা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।

ওরা গায়ক বোঝে, কবি বোঝে, চিত্রকর বোঝে। কিন্তু অরুণাংশুর সাধনামূলক প্রতিভা চিনতে পারে না।

বোনেদের মধ্যে নিকৃষ্ট বিনতা, সর্বপ্রকার ভোগে ওর লোভ।

অরুণাংশুর সঙ্গে মিল নেই। কি ফল হবে দু'জনের দেখায়?

বিনতার অন্যদিকে মন শুনেছিলাম।

হামিদের কবিতা শোনা সত্যিই একটা উচ্চাঙ্গের আনন্দ। এবার কলকাতায় ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবো। এমন কবিতা একা শুনে আনন্দ নেই। বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে শোনাব।

কিন্তু—মালতী?

আশ্চর্য, আশ্চর্য! সুভদ্রা মিত্র, তুমি অবশেষে মালতী নামক নাবালিকাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? গল্প-উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চরিত্র তুমি নির্দয় বিশ্লেষণে দ্বিখণ্ডিত করো। তোমার অ্যানালিসিস করবে কে?

কেন হামিদ, পদ্মার জলে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বেছে বেছে প্রেমের কবিতা-গুলোই বলছে, তুমি তো জানো।

হামিদকে নিয়ে টানাটানি কোর না।

মালতী পাবে না, কারণ রায়বাড়ি মালতীর জন্মভূমি।

কিন্তু হামিদ হচ্ছে ভয়াবহরূপে মনোগামাস্ একমুখী টাইপের পুরুষ।

দ্বিমুখী হলে তুমি কি আশান্বিত হ'তে? স্বীকার করো শুধু কবি হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও হামিদ উৎকৃষ্ট।

শয্যাসঙ্গী হিসাবে আরও। কিন্তু ও তো জানে না। নিজের কাছে ও নিজেই আবিষ্কৃত হয় নি। কবিতা, সাহিত্য, কাজ, পরোপকার ইত্যাদির বন্যায় ভাসমান সত্তা হামিদের—বটপত্রে শ্রীকৃষ্ণের মত নির্দোষ শৈশবময়। কিন্তু যখনি ওর পুরুষ-সত্তা জেগে উঠবে ও হবে দুর্বার।

মালতী উদ্ভিন্ন-যৌবনা বলে কি হামিদের অবচেতন লোভ ওর অজ্ঞাতসারে ওকে কিশোরীগমনে লুব্ধ করেছে?

বয়স্কা মহিলা অভিজ্ঞতার ছাপে চিহ্নিত, ওর ভাল লাগতে পারবে না।

ভাল লাগলেই বা কি লাভ?

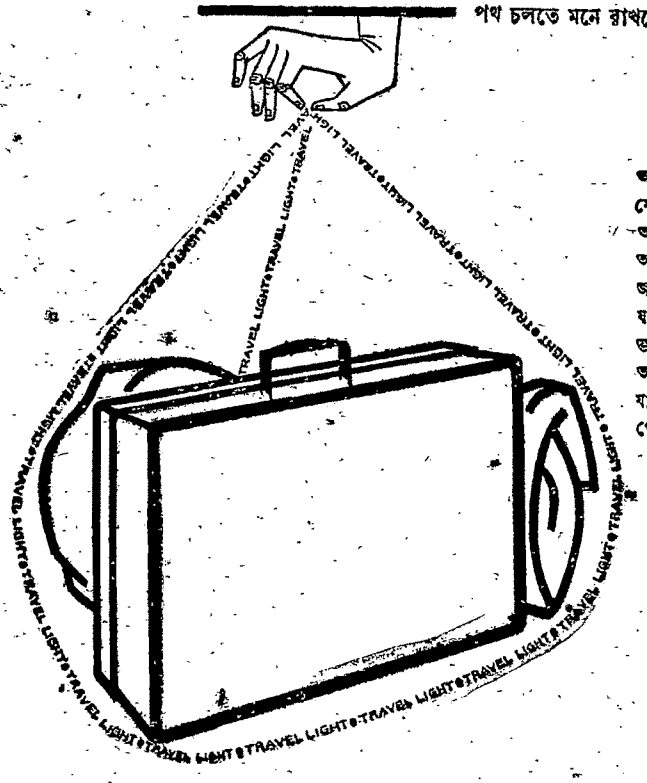

অল্প স্বল্প, নিতান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র সঙ্গে করে আপনি রেলের কামরায় ঢোকামাত্রই দেখবেন সহযাত্রীরা যেন হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। কারণ আপনার মালপত্র যত্রতত্র না ছড়িয়ে, অন্য যাত্রীর বসার অসুবিধা না ঘটিয়ে সহজেই বেঞ্চের তলায় বা সুবিধামত জায়গায় রাখা যায়।
যাত্রাপথে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি মালপত্র স্বচ্ছন্দে লাগেজ ভ্যানে রেখে দিতে পারেন।
অল্প মাল নিয়ে চলুন, এতে আপনারও আরাম, অন্য যাত্রীদেরও স্বস্তি। সবাই আপনাকে সহযাত্রী হিসাবে পেতে চাইবে

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

আমার মন একজায়গায় কখনও বাঁধা পড়ে না। আমাকে তাই অনেকে নিম-ফোম্যানিয়াক বলে। কিন্তু ওই বিশেষণ সম্পূর্ণ ভুল।

দেহ আমার প্রাপণীয় বস্তু নয়। আমার মন যেখানে চায় সেখানেও আমি দেহবাদী নই।

বাস্তবিক বিবাহের প্রয়োজন কি?

সন্তান যে চায় না কেন সে বিবাহরূপ বন্ধন চাইবে?

যৌনভোগ বিবাহ ব্যতিরেকে হয়। কিন্তু আমি তো চাই নি।

যারা চায়, বলবো তারাও যেন বিবাহ না করে। যদি গৃহ চাও, সন্তান চাও তবেই বিবাহে মন দাও।

ধৈর্য চাই, একঘেয়েমির অভিশাপ বহনে অরুচি যেন না হয়। তবেই বিয়ে কোর।

আমার জীবন কি চমৎকার! কোন পৌরুষ উপস্থিতি আমাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় না। সমস্ত দেহে-মনে কখনও বিকার নেই। পরিষ্কার ধোপ-দুরস্ত পট্টবস্ত্রের মত আমার শরীর। কোন হাতের ছাপে আকুঞ্চিত নয়।

না, ব্যাচিলর্স্ হ্যাবিট আমার ধরে গেছে। এখন মনে হয়, বোধ হয় আর বেশি কাছে কেউ এলে সহ্য হবে না।

বিছানা আমার এখন বিশ্রামাগার, প্রমোদালয় নয়। সারাদিনে অজস্র লেখা, অবিরত লোকসঙ্গ, বর্তমান সভ্যতা বহনের শ্রান্তির শেষে আশীর্বাদের মত পাই আমার দক্ষিণ জানালার নীচে শাদা শয্যাটি। বাতাসের আরামে চোখে ঘুম নামে। আর একটি যন্ত্রজর্জর দিনের জন্য প্রস্তুতি।

প্রথম বয়সে খাট থেকে মেঝেয় পা দিলেই মনে হ'ত কি আনন্দ পৃথিবীময়! অনুরূপ অনুভূতিকেই 'জয় অফ্ লিভিং' বলা হয়।

আর এখন?

এখন মনে হয় আবার এই দিনটি কাটাতে হবে! আবার এই দিনটি কাটানোর মধ্যে কতটা নিজের সামঞ্জস্য বিধান আছে? অসংখ্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে শিল্পিসত্তাকে অনাহত রাখা সবচেয়ে শক্ত।

চারপাশে নিত্য বিরোধ, আয়োজন সর্বদা মানুষের সুষুপ্ত সত্তাকে আঘাত দেবার, অপমান করবার। এমন একটা জগতে নিজের প্রশান্তি বজায় রেখে সৃষ্টিকর্ম সম্ভব নয়।

তাই মেকী মালে আজ বাংলা-সাহিত্য ভরা। কিন্তু এত মেকীর মধ্যেও সম্মুখের লোকটি মেকী নয়। মেকী টাকার টাঁকশালে হঠাৎ বেজে উঠল খাঁটি ধাতু।

আমি কিন্তু কি ধাতুতে গড়া বুঝি না নিজে। কাকে কোনদিন চেয়েছিলাম কি?

বোধ হয় না। সম্পূর্ণভাবে না।

খুঁজে ছিলাম মানুষ।

কিন্তু তা হলে নিত্যানন্দ সরখেল কি দোষ করেছিল! নিজের সম্পূর্ণ আয়টা সে জনহিতে দিত নিঃশব্দে। বিলাস-বাহুল্য ছিল না। হাঁটুর ওপর খদ্দর, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, চুল ছোট করে ছাঁটা। কোন দুস্থ তার দরজা থেকে ফিরত না। নিরলস কাজ নিয়ে দিন কাটত তার।

নিত্যানন্দ মন্ত্রিত্ব পেয়েও এতটুকু বিগড়ায় নি। তাকে কেমন গেঁয়ো চাষা বলে মনে হত? মনে হত অমার্জিত বেশবাস যেন অসংস্কৃত অন্তরের বাহ্যপরিচয়। আস্তে কথা বলত নিত্যানন্দ। লোকটি ছিল শান্ত। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে সে নেতা। ওর অনুগামী দল কম নয়। দলাদলি না করলেও শুধু চরিত্রমাধুর্যে ধন্য হয়ে উঠেছিল ওর জীবন। ওর নিজস্ব কন্‌স্টিটুয়েন্সিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গিয়েছিলাম। দেখেছি। কিন্তু বড় আটপৌরে মনে হত। কোন গ্ল্যামার ছিল না।

তবে গ্ল্যামারের রাজা অনিরুদ্ধ রায় কি দোষ বা করল? সে ছিল রূপবান, রুচিবান। সর্বোপরি অভিনেতাসুলভ একটা অভিনয়ের মুখোস পরা থাকত।

পায়ের জুতো থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পালিশ ছিল তার। রূপও ছিল। প্রতিভাও পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম মেকী, মেকী!

প্রেমে পড়ে থাকতে হলে অন্ধবিশ্বাসী বা ফ্যানাটিক্ হতে হয়। আমি তা নই।

ধীরে ধীরে রোদ গরম হয়ে উঠছে। সূর্যতপ্ত এই নদী, খোলা মাঠ। এখানে মানুষ প্রকৃতির অংশ হয়ে যায়। পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু নিঃশব্দে ভেসে যাওয়ার সুখ খণ্ডিত হচ্ছে মানুষের চিন্তার প্রতিঘাতে। নৌকোর মধ্যেও গরম হয়ে উঠেছে।

মানুষের কি ভবিষ্যৎ? আমার মত দু'কলম লেখা কোথায় ভেসে যাবে এই নদীর স্রোতের মত! মানুষের ভবিষ্যৎ দু'হাতে ধরেছে সেই সমস্ত মানুষেরা, যারা অ্যাটম বোমা তৈরি করছে। আমরা কেবল চোখ মেলে দেখে যাব—তারপরে আমাদের মৃত্যু—শীতল, অতি তুচ্ছ।

আজ মানুষের জন্মসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মাথা নাড়ছেন। আমাদের সরকার

পূজার অভিবাদন—

গ্যাঞ্জেস প্রিন্টিং ইঙ্ক ফ্যাক্টরী

—লিমিটেড—

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কালি প্রস্তুতকারক

কলিকাতা • বম্বে • মাদ্রাজ • দিল্লী

পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে ব্যগ্র। কিন্তু যারা বোমায় হাত দিয়েছে তারা জানে আর একবার তারা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ পরিষ্কার করে দেবে। হিরোশিমা।

যুদ্ধে এই নিস্তেজ গ্রাম জাগে নি, শুধু খাদ্য বস্ত্রমূল্যবৃদ্ধির কশাঘাত খেয়েছে। আবার যুদ্ধে বাড়তি আয়ের পথও দেখেছে। দুর্ভিক্ষ ছন্নছাড়া করেছে এদের। তবু ছিল। কিন্তু পাকিস্তান শেষ করে দিল।

তবু তো পাকিস্তানে হামিদুল্লা হক আছে। বুলুকে কি বলছে হামিদ, শুনি। বলছে—দিদি, তীরে নৌকো রাখি। একটু নেমে মুখে জল দিন। আমার হিন্দু মাঝি আছে একজন। ওই এনে দেবে। বড় রোদ। আপনি তো আর কিছু খাবেন না। আমারও মনে ছিল না এত রোদে বুলুর তেষ্টা লাগতে পারে, অথচ ওরই পাশে বসে ক্রমাগত খেয়ে চলেছি। মনে করে বলল কি না হামিদ।

বাঃ, সম্পা কি করছে? একটা ন্যাপকিন্ ঢাকা ঝুড়ি দেখেছিলাম। ওইটা খুলে আস্ত ফল বার করছে। তীরে নেমে কেটে খাওয়াবে বুলুকে।

সম্পা বোধ হয় একমাত্র লোক রায়বাড়িতে, যে সাধারণ লোকের সঙ্গে মেশে। তাই তাদের কথা সম্পা ভাবতে পারে।

কেবল মনের জোরের অভাবে গৌতম মুখোপাধ্যায়কে পেল না। ডারবি টিকেটে প্রথম প্রাইজ কেটেও নিতে পারল না। কারণ সম্পা রায়দুহিতা।

বুলু বড় জড়ভাবাপন্ন। বিধবা হয়ে পাড়াগাঁয়ে আছে বলেই কি এমন দেহে-মনে জড়তা ঘিরবে। লজ্জায় নীচু হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলছে, না, না। দরকার নেই।

হামিদ পীড়াপীড়ি করছে। বুলুর না, না।

নিখিলেন্দ্র কি বলছে? এত রাগ করে বেচারী বুলুর দিকে চেয়ে নিখিলেন্দ্র এ-ধরণের কথা কেন বলল?

যদি নাই কিছু মুখে দেবে তবে এলে কেন? এবার আমাকে কথা বলতে হবে। বলছি—মিস্টার হক, আজ একাদশী। একবার বাড়ি থেকে জল খেয়ে বেরিয়েছে বুলু। আর তো সন্ধ্যার আগে খাবে না।

॥ চোদ্দ ॥

সাবিত্রী অপরাহ্ণের দিকে নিজের ঘরের বারান্দায় বেলের সরবৎ নির্মাণে বসিলেন। এখন রায়গৃহিণীকে একগ্লাস বেলের পানা দেওয়া দরকার। অনভ্যাসের একাদশী বারম্বার তৃষ্ণা আনে।

একটু বেশি করিয়া প্রস্তুত করা উচিত। অনেকগুলি বেল ফলবাগান হইতে মিয়াজান চাকর দিয়া গেছে। সরবৎ করিয়া দিলে সকলে খাইবে। আগে রায়গৃহিণীর সরবৎ দেওয়া যাক।

নিজের বারান্দায় জল, গুড়, তেঁতুল, ছাঁকনী, পাত্র সমস্ত আনুষঙ্গিক জোগাড় করিয়া হবিষ্যিঘরের বারান্দা হইতে একটি বেল আনিয়া অন্যমনস্কভাবে সাবিত্রী ফাটাইলেন। দেখা গেল কাঁচা।

আবার উঠিয়া উঠোন পারে হবিষ্যিঘরের বারান্দা হইতে আর একটা বেল হাতে আসিলেন এটি ফাটাইবার পূর্বে খেয়াল হইল দেখা যাক পাকা কি না। সেটিও পরীক্ষায় ফেল করিল।

সাবিত্রী এবার সবগুলি পরীক্ষায় বসিলেন। তাঁহার মন মণীন্দ্রের সহসা গোপন তথ্য উন্মোচনে অতিশয় অন্যমনস্ক। বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একটি একটি বেল সরবতের আশায় আনিয়া যে লাভ নাই এতক্ষণে মনে পড়িল। কিন্তু সমস্ত বেলগুলিই কাঁচা।

রতনকে বলিলেন, মিয়াজানকে কাঁচা বেল পাড়িবার জন্য তিরস্কার করিয়া একটি পাকা বেল আনিতে।

কিন্তু রতন গালে হাত দিল, অ খুড়িমা,

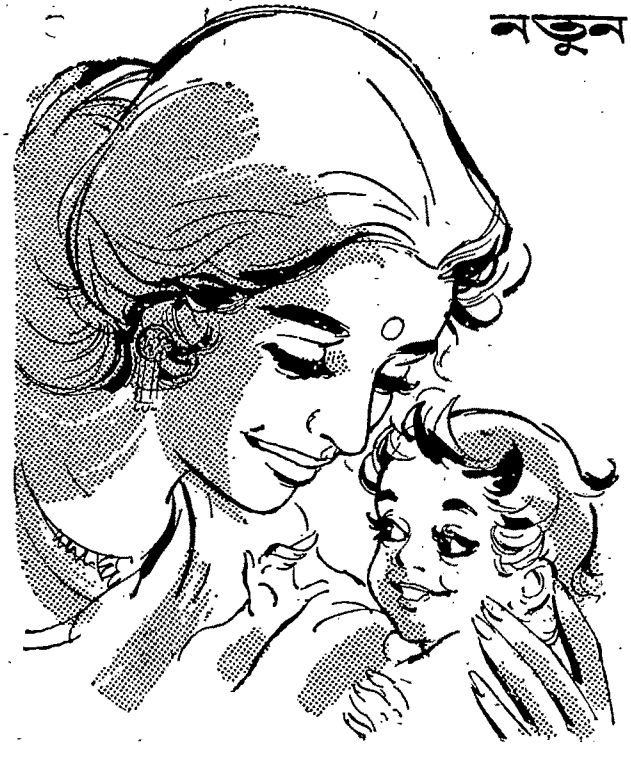

নতুন জীবনের
নতুন প্রয়োজন।

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

ভাইনো-মল্ট

এ কি কন আপনে? ব্যাল পোড়ায়া সরবৎ করাবেন বল্যা বড়বৌদি না কাঁচা ব্যাল প্যাড়ায়া রাখছেন। আপনাগারের নাগাল ব্যালপানা শহুরা নোক খায় না।

সাবিত্রী অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, তা হলে জয়া এতক্ষণ সরবৎ করল না কেন? দিদি নতুন বিধবা, তেষ্টা পেয়েছে।

আরে, বৌদিরা এতক্ষণে ননদের বিয়ার আহ্লাদে মত্ত হইছে। বাহুরা বসছেন। আমারে দিয়া পাটি প্যাড়াছে। কুড়ানী ব্যারবাড়ি থিক্যা দূর্বা তুল্যা আনছে। মাল্‌তী দিদিডা কেবল নাই। অ্যালেই আশীর্বাদ হয়া যাবে নে। গয়লা-বাড়ি রাঘবসইর বায়না গিছে। এখনি দিয়া যাবে নে।

আসন্ন সন্ন্যাসী ছেলের চিন্তায় অন্যের বিবাহ প্রসঙ্গ ভাল লাগিল না সাবিত্রীর। ভগবান কেবল রূপ-ঐশ্বর্য দিয়া ক্ষান্ত নন, রায়বাড়ির ভাগ্যও দিয়াছেন। অথচ সেই পরিবারের বৌ তিনি এত বঞ্চিত কেন?

মণি শ্যামরায়ের মন্দিরে চলিয়া গেছে। এখানে অমিয়কে বলিয়া-কহিয়া চাকুরি-সংগ্রহে সে বীতস্পৃহ। ছোট ছেলেটি সরিয়া পড়িয়াছে বন্দরে সামান্য ছুতায়।

ভারাক্রান্ত মনে সাবিত্রী বলিলেন, তা হলে কদমমাসীকে ডেকে আন। আমি শহুরে সরবৎ বানাতে জানি না।

সাবিত্রী হবিষ্যিঘরের পোষাক লাল-পেড়ে তসরে নারায়ণের বৈকালীর যোগাড় করিতে গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা নামিল। রায়বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। রায়গৃহিণী এখনও পুত্রকন্যা গৃহগত হইল না বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। জয়া পাছে ননদের আশীর্বাদ ও বিবাহ ভাঙিয়া যায় চিন্তায় ঘরবার করিতে লাগিল। ছায়া খাবারদাবার নষ্ট হইয়া না যায়, তারই খবরদারী করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে আবার নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে ছুটিল।

কদমমণি ততক্ষণে রতনের সাহায্যে দালানের বড় ঘরখানি জুড়িয়া শীতলপাটী পাড়িয়া রূপার রেকাবী ভরিয়া ধান-দূর্বা ও চন্দনবাটি সাজাইয়াছে। যদিও ইন্‌ফরমাল তবুও রায়দুহিতার আশীর্বাদ কি না। বাইরে জানাইবার সময় আসে নাই। তব বাড়ির মধ্যে চাপা উৎসবের স্রোত অনিবার্যবেগে বহিয়াছে। হাতীমুখো বারান্দায় একটি কচি আম্রপল্লবযুক্ত মাটির নূতন ঘটে মঙ্গলঘট স্থাপিত। কিছুদিন পূর্বের শ্রাদ্ধবাসর এখন বিবাহবাসর।

শ্রীলতার সর্দি কমিয়া গেছে। সে সইমায়ের কাছে বসিয়াছে। মহেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। বড়ভাই-এর সঙ্গে বৈষয়িক কর্মের আলোচনান্তে অমিয় বৈকালিক স্নানে গিয়াছে। শ্রীলতার আয়া শুভদিন উপলক্ষে খুকুকে বেনারসী ফ্রক পরাইয়া ছায়ার পুত্র পরীক্ষিতের সঙ্গে বাহিরের লনে খেলা দিতেছে। কাকার বিরহে পরীক্ষিতেন্দ্র ম্রিয়মাণ। বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে খেলায় তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। নেহাৎ হাতে কিছু নাই, কাকা বাড়ি নাই তাই পরীক্ষিতেন্দ্র অর্ধ উৎসাহে পাতাফুল ছিঁড়িয়া খেলায় যোগ দিল।

দেখো খুকু, এটা কেমন পাঁঠা। পরীক্ষিৎ একটা কচুগাছের ডগা বুধের দ্বারা পাঁঠার আকারে বানাইয়া নিয়াছে।

পদ্মাপাড়ে ছেলেমেয়ের খেলনা কিনিবার পয়সা থাকে না। প্রকৃতির নিকট বিনামূল্যে যা পায় তাই তাদের খেলার উপকরণ।

অজস্র কচুগাছ চারিপাশে ছড়ানো। নরম কচুর দণ্ড তুলিয়া ছুরি দিয়া দু'টি পা, লম্বা কান ও কাটা মুখ তুলিয়া শিঙের আকারে দুইটি কাঠি গোঁজে। তারপরে কাঠ ও মাটি দ্বারা বলিবেদী করে। একজন ঠেপা ধরিয়া রাখে ও মুখে ভ্যা ভ্যা করিতে থাকে। অন্যজন ধারালো খেলার দা দ্বারা ব্যাঁচাৎ শব্দে দ্বিখণ্ডিত করে। পল্লীগ্রামের অতি প্রিয় খেলা এটাই।

পূজা, বিশেষত দশভুজা পূজা সেখানে প্রধান উৎসব। পূজার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু শিশুর চক্ষে বলিদান। তাই পাঁঠাবলি খেলা বারবার খেলিয়া শিশু উৎসবের দিন ডাকিয়া আনিতে চায়।

মাংস বাঙালদের প্রিয় খাদ্য। পল্লীর বাজারে বিক্রয় হয় না। ভাগে পাঁঠা কাটিতে হয়। অতএব শহরের ন্যায় সুলভ নয়। তাই খেলার পাঁঠায় হয় তো রসনাতৃপ্তিও মনে মনে হয়।

খুকু গোলাপফুলের মত মুখটি তুলিয়া বলিল, এতা পাঁঠা।

খুকু দুই-একটি কথা মাত্র শিখিয়াছে। কিন্তু হালের শিশুর প্রথায় অনেক কথা বলিতে চায়।

পরীক্ষিৎ উৎসাহিত হইয়া বলিল, এটা বাচ্চা পাঁঠা, খুকু তুমি পাঁঠা নেবে? পাঁঠা কাটবে?

এতগুলি কথার মধ্যে চেনা কথাটি খুকু বাছিয়া লইল; তারস্বরে মধু-ঝরানো গলায় বারবার বলিতে লাগিল, বাত্তা, বাত্তা, বাত্তা।

সঙ্গে সঙ্গে কোমরে লেসের এপ্রন দোলাইয়া চুলে শাদা ফিতার ফুল নাচাইয়া, অতসী-রংয়ের জামা উড়াইয়া চলনগলির প্রহরীমার্কা ফটকের দিকে সে ছুটিল। আয়া সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল, খোকীবাবা, যেও না ওদিকে, জল আছে।

পরীক্ষিৎ নিজের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া বাধা দিল, খুকু, জল ওদিকে। যেও না, ডুবে যাবে।

খুকু আবার চেনা শব্দটি তুলিয়া লইল, দল, দল, দল।

খুকুকে রোধ করিতে না পারাতে পরীক্ষিৎ ও আয়া দু'জনে দু'হাত ধরিল। খুকু তাদের টানিতে টানিতে ফটকের কাছে উপস্থিত

যাবতীয় ইলেকট্রিকের দ্রব্যাদি, ফিলিপস্ রেডিও, ফিলিপসের WATER HEATER ইলেকট্রিক উনান, ঘর গরমের যন্ত্রাদি, সুইচ, প্লাগ, তার, কাঠের দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি ইস্ত্রি করণের ইস্ত্রি বা IRON প্রভৃতি পাইবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া গৃহস্থালী যন্ত্রাদি মেরামতের জন্য প্রসিদ্ধ।

PHILIPS
novo sonic
RADIO
A NEW WORLD IN SOUND

PHILIPS
bring you the
VENUS
AUTOMATIC
WATER HEATER

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

চ্যাটার্জ্জী ব্রাদার্স

৭ নং পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

SOPHER
AUTOMATIC
ELECTRIC IRON

হইল। কারণ ওপাশের শব্দ খুকুর কানে আসিয়াছে।

ছিপ ও নৌকাভরা সংযাত্রিকের প্রত্যাবর্তন পদ্মবিলে লঞ্চ ছাড়িয়া তারা আসিয়াছে।

নৌকা রায়বাড়ির ফটকে থামিবার পূর্বেই হামিদ লাফাইয়া সিঁড়ির বুকে নামিল। তারপর নৌকা টানিয়া ধরিয়া, মাঝি-মাল্লা হাঁ-হাঁ করিতে করিতে, নিজ হাতে খোঁটায় বাঁধিয়া ফেলিল। কয়েকঘণ্টা জলযাত্রায় তাহার বয়স যেন দশটি বছর কমিয়া গেছে। লজ্জা ও ভীরুতা অপসারিত। মুসলমান বলিয়া সে হিন্দু বাড়ি পরিধির মধ্যে সসঙ্কোচ পদক্ষেপে আর নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখে নাই। ঘন সন্ধ্যার ছায়া তখন জলের পাশে বাঁশঝাড়ে আরও অন্ধকারময়।—হাজাক্ হাতে খানসামা অগ্রসর হইবার পূর্বেই ছইঘেরার মধ্য হইতে দ্রুত বাহির হইল মালতী। হাত বাড়াইয়া দিল। হামিদের দৃঢ় করগ্রাসের বিলম্বিত স্পর্শ দুইটি দেহে আগুন জ্বালিয়া দিল তৎক্ষণাৎ। একমুহূর্তে ব্যবধান লুপ্ত হইল।

অতি নিবিড় গভীর আলিঙ্গনে কঠিন বুকে যাহাকে সূত্রমাত্র ব্যবধান বিরহিত অবস্থায় আবদ্ধ করিতে সাধ যায়, অনন্তকাল বক্ষ হইতে যাহাকে নামাইতে ইচ্ছা হয় না, তাহাকেও লোকসমক্ষে মুক্ত করিতে হয় স্পর্শসংযোগ হইতে। হামিদ মালতীর হাত ছাড়িয়া সরিয়া আসিল।

অদূর গোয়ালে কৃষ্ণগাভী কাজলী শুধু দৃশ্যটি দেখিতে পাইল। মালতী বঙ্কিম কটাক্ষে একবার প্রতীক্ষু হামিদকে কৃতার্থ করিয়া অতি স্বাভাবিকভাবেই—লনে দাঁড়াইল।

নিখিলেন্দ্র সুভদ্রাকে নামিতে সাহায্য করিতে যাওয়ামাত্র সে আমার দরকার নেই, বুলুকে দেখুন বলিয়া নামিয়া গেল। বুলুটা নির্বোধ, চিরকাল নদীর দেশে থাকিয়াও ন্যাকা। নিখিলদা,' ধরো, বিনি যা নৌকা দোলাচ্ছে! পড়ে না যাই, বলিয়া হাত বাড়াইল।

রাগে দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিখিল এক হ্যাঁচকা টানে বুলুকে সিঁড়ির বুকে আনিয়া ছাড়িল। হুমড়ি খাইয়া বুলুর নিজেকে সামলাইয়া লইতে হইল।

বিনতা নৌকা দোলাইতে দোলাইতে বলিতেছে, এবার আমি ঝাঁপ খাবো। এই এই ঝাঁপ খেলাম।

অরুণাংশু যে দৃষ্টি দিয়া অণুবীক্ষণে জীবাণু খোঁজে সেই দৃষ্টি দ্বারা বিনতাকে পরীক্ষা করিতেছে।

পরীক্ষিতেন্দ্র বিনয়েন্দ্রের নিকটস্থ ততক্ষণে।

আলো ও অমিয়েন্দ্র ইতিমধ্যে ঘাটে আসিল।

অমিয় বলিল, এত দেরি? হামিদ না থাকলে তো ভাবনায় পড়ে যেতাম। সইমা দুপুরে এসেছেন। আবার এখনি রওনা হবেন। শুধু তোমাদের আশায় বসে আছেন। মালতী ভেতরে যাও, মা ডাকছেন।

সতৃষ্ণ হামিদের সম্মুখ দিয়া অনিচ্ছুক মালতী খিড়কী দ্বারে প্রবেশ করিল।

কেন? কেন? মা নিশ্চয় মালতীকে একা ডেকে কিছু দেবেন। দেখি গে।

এক্লাফে তীরে পড়িয়া বিনতা মালতীর পিছন পিছন ছুটিল।

অমিয়েন্দ্র হাসিল, তোমার ভাগ্যে রম্ভা। মালতীর ভাগ্যে ভারী সোনার গয়না। যাও। হামিদ, চলো বসবে। এসো।

আমি বাইরেই বসি। হামিদ কাছারি ঘরের ফরাসে বসিল।

অমিয় দেখিল এখন একটি শুভকর্ম আসন্ন। অতএব সইমায়ের সম্মুখে হইলেই বা ম্যাজিস্ট্রেট,—হামিদকে গোলবারান্দা বা বসিবার ঘরে না নেয়াই সমীচীন।

সে বলিল, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি। তুমি বিশ্রাম করো। এককাপ কফি খাও।

অনেক হয়েছে ওসব। আর খাব না। আমি বসছি। তুমি ভেতরে যাও।

তাকিয়া অবলম্বন করিয়া হামিদ অর্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

খুকু বাবা, বাবা ডাকিয়া দীপঙ্করের কোলে উঠিয়াছে।

দীপঙ্কর ভদ্রতার খাতিরে একবার কাছারিঘরে ঘুরিয়া গেল।

আর, দীপঙ্করের কোলে খুকুকে দেখিয়া হামিদকে শিহরিয়া উঠিতে হইল আবার।

শ্রীলতার কন্যা মালতীর রূপ চুরি করিয়া শিশু মূর্তিতে চোখের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। মন্মথাহত হামিদ মুদ্রিতনেত্রে ফরাসে পড়িয়া রহিল। লন জনশূন্য।

ভিতরবাড়ি হইতে হঠাৎ অতি-প্রবল শঙ্খধ্বনি ও চাপাকণ্ঠের কয়েকটি উলুঝঙ্কার সন্ধ্যার নির্জন পরিবেশ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাসিয়া আসিল। সেই শব্দে হামিদ মনে করিল রায়বাড়ির গৃহদেবতা নারায়ণের আরতি বোধ হয় হইতেছে। মনে মনে হিন্দু দেবতাকে সে-ও প্রণাম জানাইল।

বিহ্বলা মালতী ভাল করিয়া কিছু বুঝিবার পূর্বেই তার আশীর্বাদের খসড়ায় স্বাক্ষর পড়িল। ভাল ও পাকা আশীর্বাদের অনুষ্ঠান কলিকাতায় দিনক্ষণ দেখিয়া হইবে।

মালতী কিছু জানিবার আগেই পল্লব-সুকুমার ক্ষীণ মণিবন্ধে সোনার হাতকড়া উঠিল।

গৃহিণী মেয়েকে সাজাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সুরবালা বাধা দিলেন, এমনই ডাকো। আমায় এক্ষুণি রওনা হতে হবে, নইলে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। থাকতে যখন পারছি না, দেরি করে লাভ কি? পথঘাট ভাল নয়। আর মাকে আবার নতুন করে দেখব কি?

অগত্যা মালতীকে তখনি ডাকা হইল। ঘরময় পাটী, দরজায় মঙ্গলঘট, রেকাবে ধান-দূর্বা এ সমস্ত মালতী ভাবিয়াছিল বোধ হয় মাতার একাদশীর দিনে কোন পাড়াগেঁয়ে অনুষ্ঠান। বাড়িশুদ্ধ সকলকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াও সে ধরিয়া নিয়াছিল যে সইমায়ের কাছে সকলে দেখা করিতে আসিয়াছে। আনন্দ উত্তেজনায় পরিপূর্ণ মনে অন্য চিন্তার স্থানও ছিল না।

গৃহিণী আদেশ করিলেন সইমাকে প্রণাম করো। মাথা তুলিতেই মালতী বিস্ময়ে অনুভব করিল তাহার হাত সইমায়ের হাতে ধরা পড়িয়াছে। কঠিন ভারী কোন বস্তু তাহার দু' হাতে ঠেলিয়া তোলা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি কানে তালা লাগাইয়া দিল। সাবিত্রী, জয়া, কদমমণি উলু দিয়া উঠিলেন। কুড়ানী, রতন প্রাণপণে জোড়া শাঁখে ফুঁ দিল। মহেন্দ্র, অমিয়েন্দ্র বোনের সৌভাগ্যে প্রদীপ্ত মুখে উপস্থিত রহিলেন।

গৃহিণী সময়োচিত গাম্ভীর্যে বলিলেন, তোমার বাবা গিয়েছেন মালতী। তোমাদের জন্যে চিন্তার অবধি ছিল না আমার। কিন্তু তুমি আবার বাবা পেলে। নূতন মা-ও পেলে। সুরবালার হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

সুরবালা মালতীর মাথায় ধান-দূর্বা ও কপালে চন্দনের টিপ দিয়াছেন। গৃহিণী আর একবোঝা ধান-দূর্বা স্তম্ভিত মেয়ের মাথায় চাপাইলেন।

এ কি? মালতী অবাক হইয়া একটি প্রশ্নই করিতে পারিল।

জয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, মা খুলে বলুন না। বেচারী সারাদিন হৈ-চৈ করে এসে এখন হক্‌চকিয়ে গেছে। ঠিক বুঝতে পারছে না।

গৃহিণী ধর্মগুরুর অমোঘ নির্দেশে ঘোষণা করিলেন, তোমার ভাগ্য। সইমা তোমাকে তাঁর ছেলের বৌ করবেন।

পলকে মালতী শাদা হইয়া গেল। সুরবালার পুত্রকে সে সম্পার বিবাহে দেখিয়াছে। মাতার মনোগত ইচ্ছাও সে জানিয়াছে। তবে তাহার ধারণা ছিল ছোটদি' বিনতার আগে বিবাহ হইবে রায়বাড়ির চিরাচরিত প্রথায়। তাহার প্রশ্ন এখনি উঠিবে না।

অন্য সময়ে এত উপযুক্ত পাত্র হয় তো মালতীর মনে নিরানন্দ আনিত না। কিন্তু এখন অতর্কিত আঘাতে সমগ্র সত্তা তার খান্‌খান্ হইয়া গেল। জলযাত্রার রোমাঞ্চভরা মনে এত শীঘ্র যে মৃত্যুবাণ বিঁধিবে সে কল্পনায়ও জানে নাই।

সুরবালার পুত্র রূপবান। কিন্তু আজ মালতীর জগৎ এক শ্যামাভ পরিণত পুরুষের পৌরুষদীপ্ত আলোকিত। সে গান কণ্ঠে আসিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন, আজ পাকা আশীর্বাদ না হলেও শুভদিন। তোমরা সবাই ওর মাথায়

সর্দ্দি, কাশি ও আনুষঙ্গিক রোগে

ও, আর, সি, এল, এর
সালফাডায়রমিন
ব্রণ, পোড়া, কাটা, দাদ, ঘা, চুলকানি
খোস ও যাবতীয় চর্ম্মরোগে।

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

রেসপেরোসিন

কুমারেশ হাউস, সালকিয়া, হাওড়া

মাছ ধরার ও খেলাধূলার যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রেতা

সেন ব্রাদার্স— ১৫৷১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

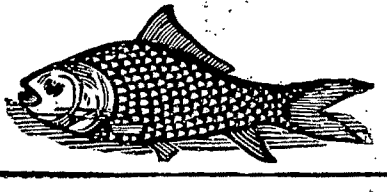

ধান-দূর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করো। মালতী, প্রণাম করো সকলকে।

মালতী কাহাকেও প্রণাম করিল না। মাথা নীচু করিয়া হাতের মুঠি শক্ত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অবনত মাথায় ধান-দূর্বা পড়িতে লাগিল ক্রমাগত। শঙ্খধ্বনিরও বিরতি রহিল না। সম্পা একপাশে কাঠের মত দাঁড়াইয়া পূর্বের আর একটি আশীর্বাদের প্রহসন মনে করিল।

বাহিরের ফরাসে প্রেমব্যাকুল হামিদ অপার কৃতজ্ঞতায় হিন্দুদেবতাকে প্রণাম করিল।

॥ পনেরো ॥

সুভদ্রা উপরে চলিয়া আসিয়াছিল। মালতীর ভাগ্যটা দাঁড়াইয়া দেখিবার সখ ছিল না।

চুলে চিরুণী চালাইয়া ঘেরা বাথরুম হইতে হাতমুখ ধুইয়া ঘরে ফিরিতে সে দেখিল তাহার বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে মালতী। দুইহাতে মুখ ঢাকা। শরীর কান্নার আবেগে ফুলিয়া উঠিতেছে।

সুভদ্রা একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে মালতীর ঘনচুলে ঢাকা মাথাটির উপর হাত রাখিল। তারপরে বলিল, তুমি এখানে শুয়ে থাকো। আমি নীচে যাই।

মালতীকে একা-একা দুঃখপ্রকাশের সুযোগ দিয়া সুভদ্রা সেকেলে সরু সিঁড়ি ধরিয়া নামিল। দ্বিতল জনশূন্য। একতালায় জনস্রোত। আনন্দে উথলিত, উৎসবে বিস্ফারিত জনতা ঘর হইতে ঘর, উঠোনে প্রবাহিত। ঝিয়ের দল কাজ ফেলিয়া মত্ত। রতন তাড়া দিতে ভুলিয়াছে।

পোরজোনার দলটির আহারাদি লইয়া সকলে ব্যস্ত। তাঁহারা এখনই রওনা হইবেন। সুরবালাকে গৃহিণীর ঘরে গালিচা আসন পাতিয়া রৌপ্যপাত্রে আহার্য সাজাইয়া সকলে ঘেরিয়া আহার করাইতেছে।

একবার সুভদ্রার ইচ্ছা হইল উৎসবমুখর বাড়িখানির ব্যস্ততার আড়ালে সে হামিদকে গোপনে ডাকিয়া মালতীর কাছে নেয়। ঘরে হামিদকে ঠেলিয়া বাহির হইতে দ্বার ছিট্‌কিনিবদ্ধ করিয়া আসে।

মালতীফুলে ভ্রমর বসিবার অপেক্ষা মাত্র। আর চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকিবে না। অটুটকুল রায়বাড়ি জব্দ হইবে। সম্পার পরিস্থিতি পুনরাবৃত্তি হইবে না।

কিন্তু এই পল্লীগ্রামে সম্ভব নয় এমনভাবে সমাধান। অথচ—হামিদকে এতক্ষণ নিশ্চয় কেউ বলে নাই কিছু। সরল বিশ্বাসে সে অপেক্ষা করিতেছে।

কৃষ্ণের মূর্তির ন্যায় মোহনমূর্তি হামিদের। রমণী-মন বশ হয় গানে নিশ্চয়। তাই কৃষ্ণের অধরে বাঁশী। গান হামিদের কণ্ঠে কবিতা।

হামিদকে ডাকিয়া দেই মালতীর শয্যায়। এখনই দেহের তীরে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইবে। প্রত্যাশায় মালতীফুল অটুটদল কোরকে কম্পিত। দীর্ঘ সংযমে ক্লান্ত হামিদের বন্ধন আর থাকিতে চায় না।

উন্মোচিত প্রেম। দেহশতদল উন্মোচিত হোক প্রেমস্পর্শে। মালতীর অঙ্গাবরণ উন্মোচন ভাণ্ডের নবনীত অনাবৃত করা। আর হামিদ? নিরাবরণ সেই শ্যাম পূর্ণযৌবন দেহ দর্শন করিলে হয় তো আমারও বন্ধ্যা মনে ফসল ফলিবে।

এক মুহূর্তে সুভদ্রা মিত্র অশাসিত হৃদয়-বৃত্তি দমন করিয়া লইল। তারপর দৃঢ়পায়ে বাহিরের দিকে গোলবারান্দা পার হইয়া কাছারিঘরে চলিল।

নিখিলেন্দ্র তখন প্রাধনে ব্যস্ত। মালতীর আশীর্বাদের পরেই সে বাথরুমে ঢুকিয়াছে স্নানাদির উদ্দেশে। আজ সুভদ্রাকে ধরিয়া সে হেস্ত-নেস্ত একটা করিবেই। সারা রাস্তা হামিদের কবিতা নিখিলকে উত্তেজিত করিয়াছে। এখন মালতীর বিবাহ সংবাদে সে আরও অস্থির হইল। এত বড় ভাইয়ের দিকে তাকায় না কেউ। নাবালিকার বিবাহেই খুব আগ্রহ। হামিদের দিকে বারবার সুভদ্রার দৃষ্টিক্ষেপ সে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ। দেরি করা চলে না।

সকলে ব্যস্ত। স্নান সারিয়া তাড়াতাড়ি পোষাক পাল্টাইয়া সে সোজা দোতালায় উঠিবে। অধিক অপেক্ষায় রাজী নয় সে।

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

● ইলেক্ট্রো প্লেটিং সামগ্রী ●

● নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল ● ডাইনামো ●

● পলিশিং মেশিন ● এবং পলিশিং করিবার যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহকারক।

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ * ফোন—৩৪-৪৮-৪৬

শোরুম—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ * ফোন—৩৪-৩১৭৩

সুভদ্রা মিত্রকে কাছারিঘরের দিকে দুই-একজন যাইতে দেখিলেও গ্রাহ্য করিল না। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে শহুরে মেমদিদির দরকারী কাজের কথা থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। সেটাই স্বাভাবিক।.....

বুধে ও অনাথ সরকার খুবই বিব্রত। পোরজোনার লোকেদের তদারকীর উপর স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের খবরদারী ঘাড়ে চাপিয়াছে। অনাথ বয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত শান্ত। সে কাছারির বারান্দায় গরুড়পক্ষীর মত মোতায়েন। নায়েব গিয়াছে জীবন্ত কই-মাছের সন্ধানে। অমিয়েন্দ্র কইমাছের ভক্ত।

৺শারদীয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রাহকদিগকে জানাইতেছি

ইঞ্জিনের পার্টস, পাম্পিংসেট, ইলেকট্রিক মোটর ও সুইচ, ধানকল, আটাকল, চিড়া-কুটা মেসিন ও তাহার পার্টস আমরা সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। কটনমিল, জুটমিল ও কোলিয়ারির যাবতীয় ষ্টোরস্ সরবরাহ করি। মফঃস্বলের ক্রেতাদিগের একমাত্র শ্রেষ্ঠতম পরিবেশক। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

ভরদ্বাজ মেসিনারী

সাপ্লাই এজেন্সী

২০, নেতাজী সুভাষ রোড, (একতলা)

কলিকাতা-১

ফোন : ২২-২৮৫৫

আত্মরক্ষা ও শিকারের যাবতীয় সরঞ্জামাদির জন্য

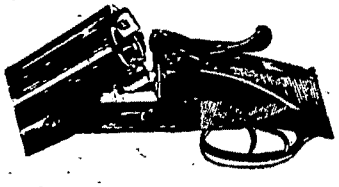

গ্রাম : তামাক্ষা ফোন : ২২-১০৬৩

এন্, সি, দাঁ এণ্ড কোং, বন্দুক বিক্রেতা

৯, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা - ১

ব্রাঞ্চ :—রাঁচী ও কোডার্মা (হাজারীবাগ)

সঙ্গে কেরোসিনের খালি টিনভর্তি জলসমেত জীবন্ত কই ভ্রমণ করিবে। কলিকাতায় দুই-তিনদিন জীয়াইয়া খাওয়া চলিবে।

বুধে ছোটাছুটি করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে অনাথের গরুড়মূর্তির কাছে উপস্থিত হইয়া দু'টো সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া লইতেছে।

সে ভারী চামড়ার চটি টানিয়া অনাথের নিকট উপস্থিত। কোমরে হাত রাখিয়া অতি নিজস্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বুধে বলিল, খেটে-খেটে মলাম। চারদিকে চা ঢালা-ঢালি। শালা আমাদের কেউ এককাপ চা-ও দিল না!

অনাথ বলিল, চারদিকে যে হুড়াহুড়ি চলছে! কে কারে দেখে? এক এক ব্যাপার মিটতেই আর এক ব্যাপার ঘাড়ে চাপল।

বুধে বলিল, ভাগ্যি মালতীদিদির। বিনা চেষ্টায় কেমন ঘরবর পাল! আমার বৌ পারুজোনার বাড়ি দেখেছে। সে কি রবরবা (উচ্চ সমৃদ্ধি) অবস্থা!

অনাথ বলিল, আরে সুভদ্রাদিদি যে, কামকরুণীরা ওনাকে মেমদিদি কয়, আসছেন না? এদিক পানেই। দেখ কাণ্ড, এত লোকের মধ্যে বারবাড়ি কি ওনার আসা লাগে?

জ্ঞানবৃদ্ধের মত বুধে জ্ঞাপন করিল, অনাথদাদা, তুমি ভারি সেকেলে নোক। শহুরা নোকের কি ঘরবা'র থাকে? ম্যাজেস্টার সাহেবের কাছে আসছেন। সকলেই তো আসে।

অনাথ বলিল, সে তো ঠিকই। ঘরের বৌ-এর পরযন্ত ওনার কাছে আসা লাগে। বুঝি কোন দরখাস্ত দিবের আসছেন।

বুধে চাপাসুরে ক্ষয়া পানের ছোপে রঙিন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

এতক্ষণে একটা কথার মত কথা কইলে, অনাথদাদা। পাকিস্তানে মেমদিদি আবার কি দরখাস্ত দিবেন? মনে নেয় ম্যাজেস্টার সাহেবরে মনে ধরছে ওঁর।

কিন্তুক, চাঁদু শুনে আসছে কামকরুণীদের কাছে রাঙাবাবুর না কি মেমদিদির দিকে টান।

আরে, তাতে কি? রাঙাবাবু কি জাত দিয়া ওনাকে বিয়া করবেন? মেমদিদি খৃস্টান শুনছি। ম্যাজেস্টার সাহেবকে ওনার মনে ধরছে।

অনাথ বলিল, দেখো, মেলা কথা বাড়াও না চলে আস এখান থিকে। এই সময়ে বাইরের লোক থাকা ভাল না।

মেমদিদিকে ম্যাজেস্টার সাহেবের সঙ্গে অবাধ প্রেমের সুযোগ দিতে উভয়ে সরিয়া গেল।

হামিদ চোখ বন্ধ করিয়া তাকিয়া-আশ্রয়ে স্বীয় সৌভাগ্যচিন্তনে মগ্ন ছিল। তাহার অতিতীক্ষ্ণ শিকারীসুলভ কর্ণে মৃদু পদধ্বনিও ফাঁকি দিতে পারিল না। চোখ মেলিয়া হামিদ দেখিল তীব্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সুভদ্রা সন্নিকটে।

ধড়মড় করিয়া হামিদ উঠিল, আপনি? বসুন, বসুন।

ফরাস ছাড়িয়া একটি চেয়ার হামিদ অগ্রসর করিয়া দিল। সুভদ্রা বসিলে নিজেও চেয়ারে বসিয়া হামিদ বলিতে লাগিল, আজ ভারী আনন্দ হল। আমার সৌভাগ্য আপনাদের নদীতে নিয়ে যেতে পারলাম। আপনি বোধ হয় এদিকে কখনই আসেন নি। আমাদের দেশ কেমন লাগল?

মিস্টার হক্, ঠিক ড্রইংরুম-টক্ চালাতে আমি এখন আসি নি।

সুভদ্রার স্বরের উত্তাপে হামিদ হতবাক্ হইল। পূর্বে কার্যপরিধির মধ্যে বহু মহিলার সহিত পরিচয় হইলেও এমন একটি লেখিকা সে আগে দেখে নাই। কি বলা যায় ভাবিতে আরম্ভ করিল হামিদ।

আপনি এখানে নিশ্চিন্ত। ওদিকে কি হচ্ছে, জানেন?

হামিদ খাড়া হইয়া বসিল, কি? কি হয়েছে?

শঙ্খধ্বনি, হুলুরব শুনলেন না?

ও তো ঠাকুর পূজা হচ্ছে সন্ধ্যেবেলায়।

ঠাকুর পূজোয় অত কোলাহল ওঠে না। আপনার,—মানে, আশীর্বাদ হল বিয়ের।

আশীর্বাদ? কই, অমিয় তো বলল না কিছু? কার? অশুভ সূচনার প্রত্যন্ত বাতাসে হামিদের মন কাঁপিতে সুরু করিল।

মালতীর।

একটিও শব্দ না করিয়া, বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য না দেখাইয়া হামিদ স্থিরভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিল। কেবল মুখ দেখিতে দেখিতে টেবলের ব্লটিং-প্যাডের মতই শাদা হইয়া গেল।

সুভদ্রার তীব্রদৃষ্টি কোমলতায় পরিসিক্ত।

কিছু বলছেন না?

দৃশ্যমান চেষ্টার পরে হামিদ ধীরে ধীরে বলিল, আমি কি বলতে পারি? আমি অন্য ধর্মের অপাংক্তেয় লোক। তিনি যাতে সুখী হন তাই আমি চাই।

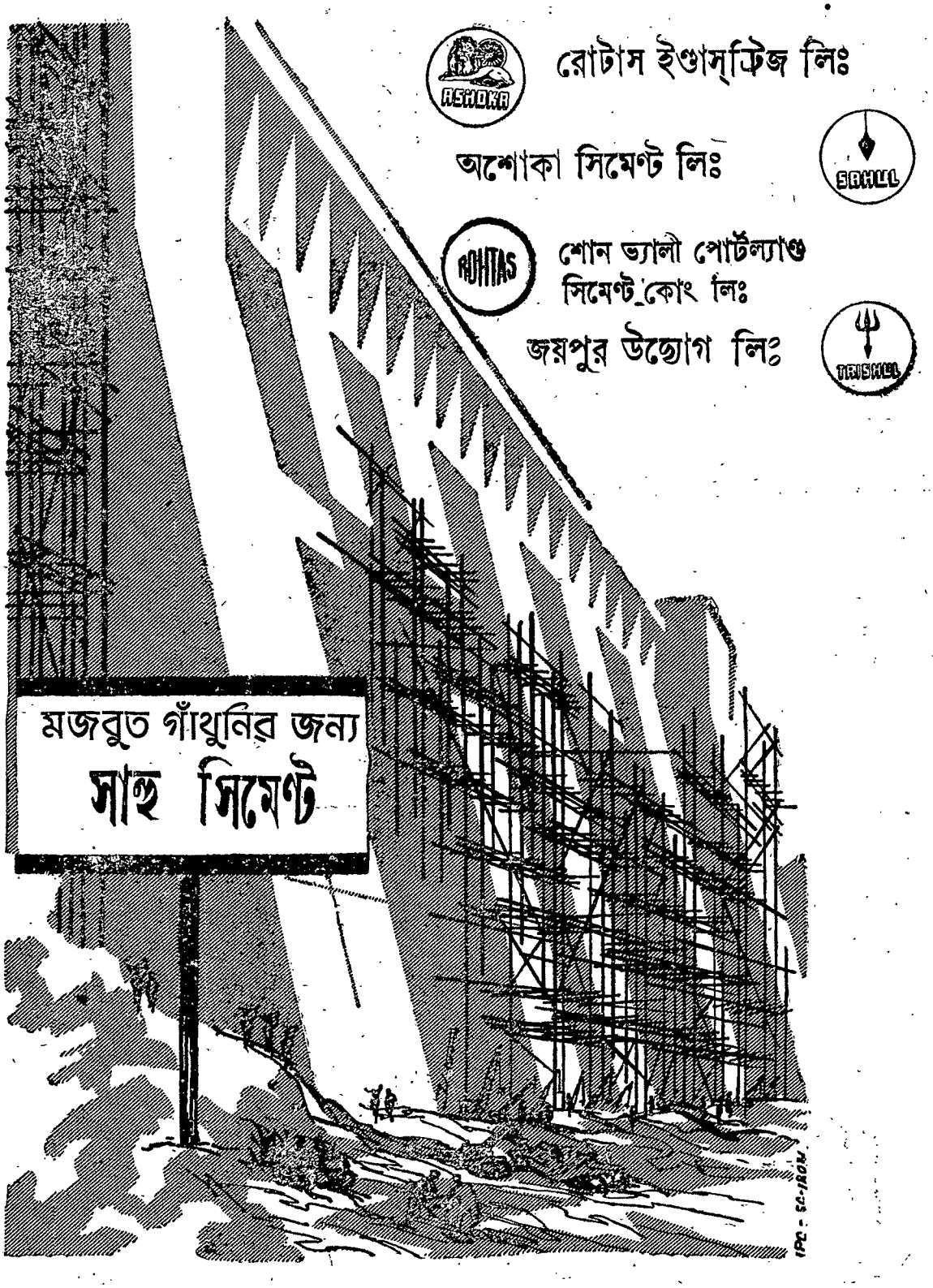
রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
ASHOKA
অশোকা সিমেণ্ট লিঃ
SAHU
ROHTAS
শোন ভ্যালী পোর্টল্যাণ্ড
সিমেণ্ট কোং লিঃ
জয়পুর উদ্যোগ লিঃ
TRISHUL
মজবুত গাঁথুনির জন্য
সাহু সিমেণ্ট

কেমন পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন না ?

তেমনিভাবে হামিদ বলিল, প্রয়োজন নেই। উপযুক্ত পাত্র না পেলে ওঁরা রাজী হবেন কেন ?

ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা ! কিন্তু মালতীর যে সুখ হবে এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ?

সুখ নিজের মনে। ছেলেমানুষ, সুপাত্রে পড়লেই সুখী হবেন।

আপনার নিজের সুখের ব্যবস্থাটা কি অতঃপর ! শ্যামাভ মুখ হামিদের অন্তর দীপ্তিতে শুচিসুন্দর হইয়া উঠিল, আমি তাঁর সুখ চাই। আমি—আমি একটা প্রৌঢ়, তায় অন্য জাত। আমি তাঁকে কি দিতে পারতাম ?

আপনার বয়সে কেউ প্রৌঢ় হয় না। আপনি তাকে দিতে পারতেন, চিরকাল যা রায়বাড়ির মেয়েরা চেয়ে চেয়ে পাচ্ছে না। খাওয়া-পরার অভাব নেই, প্রচুর বিলাস সুখ, কাজ নেই। তাই তারা চেয়ে মরছে—প্রেম।

সুভদ্রার তীক্ষ্ণস্বর অত্যন্ত জ্বালাময়।

হামিদ কথা বলিল না। মনের অতীব সঙ্গোপন বস্তুকে বাহিরে আনিয়া তৃতীয় ব্যক্তির সহিত আলোচনা সে করিবে না বোঝার পরে সুভদ্রা নিরস্ত হইল।

সুভদ্রা উঠিল।

আপনাকে সংবাদটা দিতে এসেছিলাম। জেনে রাখুন মালতীর সুখ নেই। আমার ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদছে।

হামিদের স্থৈর্য খসিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া পূর্বেই সুভদ্রার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন চঞ্চল হইয়া অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিয়া উঠিল, মালতী কাঁদছে ? কেন, কেন ?

সুভদ্রা স্থিরদৃষ্টি মেলিয়া লক্ষ্য করিতেছিল।

কেন আপনি জিজ্ঞাসা করে আসুন না।

হামিদ হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সেখানে আমি যাব কি করে ?

ছয়ফিট লম্বা একজন পুরুষকে কি শিখিয়ে দিতে হবে দোতালায় উঠতে হয় কি করে ?

আমি—আমি চলে যাচ্ছি। অমিয়কে দয়া করে বলে দেবেন আমার জরুরী কাজ পড়ল।

সে কি ? এমন নাটকীয় প্রস্থান ভিন্ন আপনার কি বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুই করবার নেই ? অমিয়বাবুর মা আজ আপনাকে যত্ন করে খাওয়াবেন বলে নানা আয়োজন করেছেন। কি ভাববেন ওঁরা, পোরজোনার ব্যাচ বিদায় হলেই তো আপনার খবর পড়বে।

না—আমি থাকতে পারছি না।

হামিদের ব্যথানীল মুখের দিকে চাহিয়া সুভদ্রা চিবাইয়া-চিবাইয়া বলিল, বেশ পারছেন। তাকিয়া হেলান দিয়ে বসুন। লোকচক্ষে খারাপ দেখাবে এমন হঠাৎ চলে গেলে। লোক জানাজানি না হলেই তো আপনারা, সভ্য মানুষেরা নিশ্চিন্ত।

ঘর হইতে বাহির হওয়ার মুখে গলায় সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিল সুভদ্রা—গোটা পৃথিবী কি রায়বাড়ির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ? পৃথিবীতে অনেক জায়গা। সেখানেও তো রায়বাড়ির মেয়ে বের হয়ে আসতে পারে। আপনারও পায়ে গতি আছে।

॥ ষোল ॥

অতিদ্রুত নিখিলেন্দ্র প্রসাধন সারিয়া লইল। সে সুপুরুষ। দেশে-প্রবাসে নারী তাহাকে কামনা করে। অতএব মনে জয় সম্পর্কে আশ্বাস আছে।

জাতিকুলের সীমানা ত্যাগ করিয়া সে আজ যোগ্যা নারী সুভদ্রা মিত্রকে গ্রহণ করিবে। রায়বাড়ির প্রাচীরের বাহিরে সে চলিয়া যাইবে। এত ত্যাগ যার জন্য, সে কি মূল্য দিবে না।

কঠিন-উদাসীন সুভদ্রা-মন। বিচিত্র মনের লীলা। কিন্তু যে পুরুষ সর্বনারী-প্রার্থিত, তাকে প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন ওঠে না।

বুদ্ধিমতী সুভদ্রা। পড়ন্ত যৌবনে যোগ্য প্রার্থীকে ফিরাইবার ভুল করিবে না।

সুভদ্রা শিল্পিসুলভ ফ্লার্ট-ভাবাপন্ন। প্রেম লইয়া ক্রীড়া তার অভ্যাস। তাই উদাসীনতার ভাণ।

ভাল না বাসিলে আসিত না।

নিখিল গরদের পাঞ্জাবী, মুগাপাড়-ধুতি পরিয়া মুখে-চোখে প্রচুর প্রসাধন-প্রলেপ চড়াইয়া নিঃশব্দে নির্জন দ্বিতলে উঠিল।

বেড-লাইটের প্রয়োজনে একটি নীল বাল্ব পরানো সেজ্ এ ঘরে নিখিল নিজ হাতে সাজাইয়াছিল। মৃদু নীলাভ আলো মাত্র জ্বলিতেছে।

ক্ষীণ দীপ্তিতে বদ্ধঘরের নীলপর্দা-ঘেরা অন্ধকারে নিখিল দেখিল সুভদ্রা খাটে শয়ান। মুখ দেখা যায় না।

একবার দ্বিধা করিল নিখিলেন্দ্র। ইতস্তত করিল। কিন্তু তার উদ্দেশের পক্ষে অনুরূপ পরিস্থিতি আশাপ্রদ। যেজন বিবাহ প্রস্তাব করিবে, ভালবাসার কথা বলিবে, তার নির্জন ঘরে প্রবেশ অসঙ্গত নয়।

খাটের পাশের ছোট চেয়ারটিতে নিখিল উপবেশন করিল।

সারা ঘর সুভদ্রার বিশেষ প্রিয়, নিত্য ব্যবহার্য ল্যাভেণ্ডার গন্ধ মাখানো। সাবান, এসেন্স, মাথার তেল, পাউডার, স্নো, ল্যাভেণ্ডারে পরিসিক্ত সুভদ্রা মিত্রের।

সমস্ত মন দেহের সঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল নিখিলের। সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে বালিশের অবলুণ্ঠিত মাথায় হাত রাখিল সে।

সুভদ্রা প্রতিবাদ করিল না।

নিখিলেন্দ্র তখন আরও বিজয়াভিলাষী। অতি আদরের স্বরে বলিল, এমন শুয়ে কেন আছো ?

এক মিনিটে আপনি হইতে তুমি সম্বোধনে নামাইয়া নিখিল শয়নের আরও নিকটস্থ হইল।

এবারও সুভদ্রা নির্বাক।

নিখিলের অধরে জয়ের হাস্য দেখা দিল। সে ভুল করে নাই। মেয়েমন বোঝা তার পক্ষে কঠিন নয়।

এবার আরও একটি ধাপ অগ্রসরে প্রবৃত্ত নিখিল দুইহাতে সুভদ্রার দুইহাত ধরিয়া অতি আদরে তাহাকে তুলিতে উদ্যোগী হইল। গলায় আরও আদর ঢালিয়া বলিল, শরীর খারাপ লাগছে না তো? তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিত নিখিলের সম্মুখে প্রতীয়মান হইল প্রেমিকার মুখ নয়—ছোটবোন মালতীর মুখ।

অবরুদ্ধ ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে মালতী বলিল, আর রাঙাদা, একটু শুয়ে থাকতেও কি দেবে না?

বিরক্তিতে, ব্যর্থপ্রয়াসে অপ্রতিভ নিখিল তিক্তস্বরে বলিল, নীচে ওঁরা এখনও চলে যান নি। তুমি ওপরে একা এসে শুয়ে আছ কেন? একবার বলবে তো যে তুমি এখানে!

বলার কি আছে? ওঃ, তুমি বুঝি অন্য কেউ বলে আমাকে ভেবে নিয়েছিলে? ও, তাই!

মালতীর ক্রন্দনস্ফীত মুখে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য দেখা দিল।

নিখিল আরও বিরক্ত হইল, ব্যাপার কি? কাঁদছিলে তো দেখছি। এত ভালো একটা বিয়ে ঠিক হল। আনন্দের কথা। এমন একা-একা কান্নার কি আছে? না কি, কাউকে মন দিয়েছ? একটি তো নানা কাণ্ড করে শেষে বিয়ে করলেন। বিনিরও বিষয়ে কথা শুনছি। তোমাদের এ অভ্যাসটি বিলক্ষণ আছে।

মালতী শাড়ির আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল দেখিল তাহার এই লজ্জিতা-কিশোরী বোনটি আরও মারাত্মক।

চোখে-মুখে তার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বড়দিদি ললিতার ন্যায় ব্যর্থ প্রেমের আগুন নয়। শ্রীলতার ক্ষণবিদ্রোহের আগুন নয়। সম্পার মত বিদ্যুৎ নয়। এই আগুন দাবানল। সমগ্র অরণ্যের ছায়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতে সমর্থ।

মালতী সেই আগুনজ্বালা স্বরে বলিল, কেন? মন দেওয়াটা তোমারি একচেটে না কি?

দ্বিতল কাঁপাইয়া মালতী নীচে নামিয়া গেল। নিখিলেন্দ্র অস্ফুটস্বরে, 'ড্যামনেশন' বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখিল ছায়ার মত ম্লানমূর্তি বুলুকে।

বিরক্তি তীব্র ক্রোধে রূপান্তরিত হইল নিখিলের।

বুলু কয়েকদিন হইল ছায়ার ন্যায় তাহাকে

এবার মা যে রূপে আসছেন।

শিল্পী—সুরাহা

অনুগমন করিয়া বিরক্তিভাজন হইয়াছে। সুভদ্রার কাছে একা থাকিবার উপায় নাই নিখিলের। বুলুকে ধমক দিল সে, তুমি আবার চোরের মত এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বুলু থতমত খাইয়া বলিল, তোমাকে দোতালায় উঠতে দেখে এলাম। ভাবলাম যদি কাজ থাকে কোন।

তোমার সঙ্গে আবার আমার কাজটা কি শুনি? দিনরাত আমার পেছনে পেছনে ফেরো তুমি কি মতলবে, বলতে পারো?

বুলুর মুখ নীল হইয়া গেল। একাদশীর দিন বাড়ি ফিরিয়া ইঁদারাপাড়ে গা ধুইয়া আসিতেই নিখিলকে দ্বিতলে উঠিতে দেখিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে। মাতার দেওয়া জলখাবারের থালী ফেলিয়া আসিয়াছে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বুলু বলিয়া ফেলিল, আমার কি মতলব থাকতে পারে, নিখিলদা'? তোমাকে শুধু চোখে দেখতে পেলেই আমি খুশি।

কেন? ক্ষীণ চাঁদের আভায় খোলা ছাদে নিখিলের রমণীমোহন মুখ বিভীষণ দেখাইল।

বুলু করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, সে দিনগুলো কি ভুলে গেছ, নিখিলদা'?

কোন দিন?

মনে পড়িল। দূরান্ত পার হইয়া কৈশোরস্মৃতি ভাসিয়া আসিল।

গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে নিখিলেন্দ্র দেশে ছিল। বুলু তখন কুমারী। তারপরে আষাঢ় মাসে বুলুর বিবাহ হইয়া যায়। বুলু না কি বিবাহে অসম্মত ছিল। চিরকুমারী অবস্থায় চিরদেবসেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিল। ফল হয় নাই। নিখিলেন্দ্র শহরে বসিয়া আর বুলু—এপিসোডে মাথা ঘামায় নাই।

লিচুগাছের তলায়। থোকা-থোকা লিচু তুলিতে নিখিল দেখিল গাছের অদূরে বুলু ঘোরাঘুরি করিতেছে।

ডালটা একটু নুইয়ে ধর না বুলু। চমৎকার লাল লিচু ধরেছে।

নিখিলদা'র কাজে কৃতার্থা বুলু সাহায্য করিতে আসিয়াছিল।

নির্জন দ্বিপ্রহর। কোথাও জনমানুষ নাই। খাঁ-খাঁ রৌদ্রেও গাছের ছায়া শীতল। লতাডালজড়িত কুঞ্জবনে অর্ধনগ্না বুলুর জীবনে প্রথম পুরুষ রায়পুরুষ তরুণ নিখিলেন্দ্র রায়।

তারপর সেই গ্রীষ্মাবকাশের নর্মসহচরী বুলুর অবদান সামান্য এক নিদাঘঋতু পর্যন্ত মাত্র। নিখিল আর কখনও ফিরিয়া তাকায় নাই।

বিরুদ্ধসম্পর্কিত উচ্চপর্যায়ের পুরুষটি কিন্তু বুলুর জীবনে প্রথম শুধু নয়, শেষ পুরুষ হইয়া রহিল। একজনের খেলা অন্যের জীবনলীলা।

নিখিলের পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সকাল হইতে বারবার ব্যর্থ হইয়া সে জ্বলন্ত ছিল। সম্প্রতি ছোটবোনের কাছে বোকা বনিয়া, আশাহত নিখিলের বুলুর উপরেই আক্রোশ বাড়িল।

এ-সব কথা মুখে আনতে লজ্জা হয় না তোমার? একটা গেঁয়ো মূর্খ বিধবা তুমি। তোমার মুখে ভালবাসার কথা। দাঁড়াও, খুড়ীমাকে বলে তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

নিখিল সিঁড়িতে পা বাড়াইল।

বুলু এবার কাঁদিয়া ফেলিল, কাউকে কিছু বোল না, নিখিলদা'। তা হলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি এতদিন চুপ করেই তো আছি। আজ হঠাৎ বলে ফেললাম। তুমি একদিন ভালবেসেছিলে বলেই—

বাধা দিয়া ক্ষিপ্ত নিখিল বলিল, ভালবেসেছিলাম! আমার আর কাজ নেই? একটা মূর্খ কুচ্ছিত পাড়াগেঁয়ে ভূতকে ভালবাসবো আমি? গায়ে পড়ে এসেছিলে, ফল পেয়েছিলে। তোমার দাঁড়াবার জায়গা সত্যিই রাখব না আমি। দাঁড়াও।

জায়গা কেউ কারো যোচাতে পারে না, নিখিলবাবু। এখানে জায়গা না হ'লে অন্যত্র হবে। আমি বুলুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। যাও বুলু, মাকে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও গে। কালই আমরা রওনা হচ্ছি। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদো না। যাও।

সুভদ্রা মিত্র। উঁচু সিঁড়ি বাহিয়া কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে সে শুনিয়াছে।

বুলুকে নীচে নামাইয়া সুভদ্রা ঘরের দিকে পা বাড়াইতেই নিখিল পথরোধ করিল।

এটা কি হল, শুনি?

সুভদ্রা অবহেলায় উত্তর দিল, কি আবার হবে? আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি, বিনে পয়সার সেবিকা পাবার আশায় নয়। নিজের পায়ে ওকে দাঁড় করাব। এখানে পড়ে থাকলে আরও একবার ও লম্পটের ভোগ্য হবে।

আরও একবার! মানে প্রথম বারের লম্পট আমি।

আপনি লম্পট নন, আপনি সাধারণ পুরুষ মাত্র। যা এই গ্রামে বসে জমিদারকুল করে গেছেন, তাই আপনি করেছেন মাত্র। দায়িত্ব না নিয়ে ভোগ।

সুভদ্রা ঘরের দিকে চলিল।

দাঁড়াও। অতি উত্তেজনায় নিখিল সম্বোধনে দূরত্ব রাখিতে পারিল না আর।

এই কল্পনা করে তুমি বুঝি আমার প্রতি বিরূপ?

আমাকে তুমি ডেকে লাভ কি, নিখিলবাবু? আমাকে কেউ তুমি ডাকে কি আপনি ডাকে তাতে আমার আসে যায় না। কিন্তু আপনি আগাগোড়া আপনি ডাকতেন বলে বলছি। কোন দরকারে যখন তুমি ডাকটা লাগবে না, তখন কি—লাভ?

দরকারে লাগবে না কেন, শুনি? আপনি বোধ হয় আমার মত লম্পটের মুখদর্শন করবেন না আর?

ঘরের দিক হইতে ফিরিয়া সুভদ্রা রেলিং-এ হেলান দিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ক্ষীণ হাসি।

সে কি? মুখদর্শন করবো না কেন? আপনি এত আদরযত্নে অতিথি-সৎকার করলেন, আমি অকৃতজ্ঞ হবো না। পার্টি ডেকে আপনাকে বন্ধুদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব, এই আমার বন্ধু। পাকিস্তান দেখা ওঁর জন্যেই হয়েছে। বিশিষ্ট জমিদার।

নিখিল সুভদ্রার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরিহাস করছেন? আমাকে এত অযোগ্য মনে হোল কেন?

সুভদ্রা অন্যমনস্কস্বরে বলিল, কোথাও আপনার সাধনার ছাপ নেই। আইন পড়ে তারপরে ছেড়ে দিলেন। সোজা একটা চাকুরি নিয়ে চললেন সহজ পথে আরামে। স্বাধীন ব্যবসায়ী হতে হলে বহু পরিশ্রম করে ধাপে ধাপে উঠতে হয়। অথচ আপনি ভাল ছাত্র ছিলেন। আইনশাস্ত্রে হয় তো কোন অবদানও রেখে যেতে পারতেন, কিন্তু সাহেবী ফার্মে সাহেব সেজে দশটা-পাঁচটা করা আপনার বেশি ভাল মনে হল। আপনার জীবন এক প্যাকেট মাখন।

নিখিলের চক্ষুস্থির। সে অফিসে ছোটকর্তা, তাহার মোটা অঙ্কের মাহিনা। এই নিশ্চিত সুবর্ণযুগ ছাড়িয়া ব্রিফলেস্ উকীল

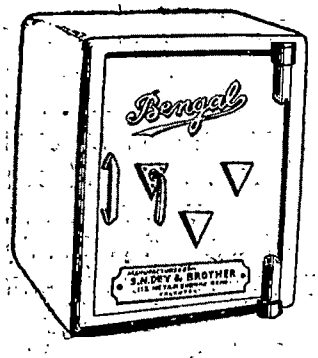

চোর ডাকাতের হাত হইতে মূল্যবান জিনিষপত্র এবং টাকাকড়ি রক্ষা করিবার জন্য "বেঙ্গল" ব্রাণ্ড লোহার সিন্দুক ও কেবিনেট-ই নির্ভরযোগ্য।

—প্রস্তুতকারক—

শচীন্দ্রনাথ দে এণ্ড ব্রাদার্স

১১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

হইতে বলিতে পারে কেউ? কি মারাত্মক মেয়ে, বাবা!

নিখিল বলিল, আচ্ছা আমার জীবন না হয় এক প্যাকেট মাখন। কিন্তু আমার এতদিনের ভালবাসাও কি মিথ্যা?

সুভদ্রা ঘৃণাভরে বলিল, ভালবাসার আপনি কি জানেন?

আমি জানি না? একজন কাউকে দেখিয়ে দিন না, যার কাছ থেকে শিখে নিতে পারবো।

আকাশে চাঁদের দিকে মুখ তুলিয়া সুভদ্রা বলিল, দেখুন গে, যান। আপনাদের কাছারি-ঘরেই আছেন।

বিদ্যুৎচমকের মত এক চিন্তা নিখিলের মাথায় উদয় হইল, ওঃ! তাই আমার ওপর এমন রাগ? হামিদুল্লা হকের সঙ্গেই কোন ব্যবস্থা হোল না কি?

হামিদুল্লার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। যার সঙ্গে তাঁর মানসিক ব্যবস্থা থাকে, তাকে বাইরের ব্যবস্থায় টেনে না আনলেও হামিদুল্লার ক্ষতি হয় না। নিশ্চিন্ত হোন, হামিদের মন অন্যত্র বাঁধা পড়েছে।

সুভদ্রা আলিসা ছাড়িয়া পা বাড়াইল?

নিখিল বলিয়া উঠিল, হামিদকে দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। কিন্তু একটা নির্বোধ মেয়ের ঘটনায় আপনি কেন আমাকে শাস্তি দেবেন? আমার বয়স তখন কত কম! ভুল কি হয় না!

চাঁদের মত রহস্যময় হাসির সঙ্গে সুভদ্রা বলিল, কি জানি! কার কখন ভুল অতর্কিতে হয়ে যায়। সেটাই আবার সারাজীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। বুলু অবশ্যই নির্বোধ। নইলে এই পাড়াগাঁয়ে সহস্র কুসংস্কারের মধ্যে থান-কাপড়ে একাদশী করেও একজনকে মনে স্থান দিয়ে রেখেছে। অসামাজিক প্রেম বহনের শক্তি আছে ওর। আদর্শ আছে! ধন্য আদর্শ! বিধবার স্বামী-চিন্তার পরিবর্তে পরপুরুষ চিন্তা। মনে মনে নিখিল সুভদ্রার আদর্শবাদের ধারণায় সাতিশয় বিস্মিত হইল।

মুখে বলিল, আমার কথাটা বিবেচনা করে দেখুন। কি চাই আপনার, যা আমার নেই?

সুভদ্রা একবার প্রাসাদ-অট্টালিকার চারদিকে দেখিল। উজ্জ্বল গৌর মনোহর মূর্তির দিকে চাহিল।

যা চাই, আপনি কখনও দিতে পারবেন না। আপনার নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস এত দৃঢ় যে কোন ত্রুটি নিজের মধ্যে খুঁজে পাবেন না। আত্মপ্রসাদ আর আত্ম-গৌরব দিয়ে আপনারা নিজেদের সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছেন। নিজেদের দোষ দেখতে আপনাদের শেখানো হয় নি। আপনার নিষ্ঠুরতা যে অমানুষিক, আপনি কি বোঝেন না? আমি নীচে যাচ্ছি। বুলুর মায়ের সঙ্গে কথা বলে নিই গে। আপনি ঘরে যান, আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখুন।

ক্ষিপ্রগতি সুভদ্রা নীচে নামিয়া গেল। খোলা ছাদে, মুক্ত আকাশের জ্যোৎস্নায়, চির-জাগ্রত চাঁদের নীচে শেখরেন্দ্র রায় আর একবার তৃতীয় পুরুষে পরাজিত হইলেন।

॥ সতেরো ॥

পোরজোনার ভাবী কুটুম্ব লোকজনসহ চলিয়া গেছেন। বাড়ি এখন শান্ত।

সুভদ্রা নীচে নামিয়া দেখিল হাতীমুখো বারান্দায় একটি জটলা।

সুভদ্রাকে দেখিয়া সম্পা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ভদ্রাদি, আপনি বুলুকে বাঁচালেন। আমি অন্যের গলগ্রহ। নইলে আমিই ওকে আমার কাছে নিয়ে যেতাম।

সাবিত্রী কৃতজ্ঞতা ছলছল চোখ তুলিয়া সুভদ্রাকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি হতবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। একদিনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান সংসার ত্যাগের অভিলাষ জানাইয়া দিল, মেয়ের কলিকাতা যাত্রা স্থির হইয়া গেল। শহরের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি পাইলেন অনাত্মীয়ার হাত হইতে।

জয়া হাঁড়িমুখে হাওদায় বসা। তাহারা বুলুকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব কানে তোলে নাই। এখন তাদের ডিঙাইয়া বাইরের লোক তাদের অপদস্থ করিয়া দিল।

ছায়া নিজেদের ঘাড়ে না পড়ায় বুলুর সৌভাগ্যে মন খুলিয়া আনন্দ করিয়াছে। এখন দুই হাত আবাধা চুলের গোছা ঠেলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু একদিনে কত কি ঘটে গেল বলুন তো, মিস মিত্র? আপনারা নদী বেড়াতে গেলেন। পোরজোনার ওঁরা এলেন। মালতীর আশীর্বাদ হয়ে গেল। বুলুর কলকাতা যাওয়া ঠিক হল। এধারে ম্যাজিস্ট্রেট বাড়ি বসে আছেন।

সুভদ্রা বলিল, মালতী কোথায়?

সে লজ্জায় তখন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ছায়া স্নেহের হাসি হাসিল।

সম্পা বলিল, বেচারী মালতী! বলা নেই, কওয়া নেই, দুম্ করে ওকে বসিয়ে দিলে তোমরা আশীর্বাদে। ওঃ, আজ সারাদিনটা যেন রাবারের মত লম্বা করে কেউ টেনে আনছে! কত কি ঘটছে। অশেষ আজকের দিনটা।

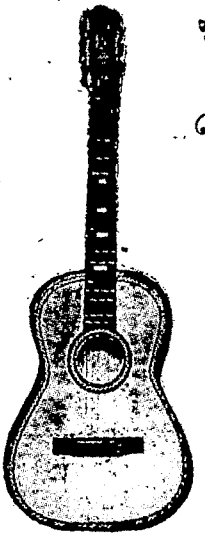

সুরের সুরধুনী
আজ সারা বিশ্বে
যে যন্ত্রের হৃদয়
মধুচ্ছন্দা কোরছে

তাহাতে আমাদের অবদানের দাবি রাখি। আমাদের সিলেক্টা গিটার সুরের ষোল-কলা রূপদান করে। সর্বপ্রকার সুর ও বাদ্য-যন্ত্র প্রভৃতি আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

শরৎ সরদার এণ্ড সন্স

শো-রুম : ৬নং রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-১
(লোয়ার চিৎপুর) ফোন : ২২-৬৭৬৬
কারখানা : ১৮৬।৯ গোপাললাল ঠাকুর রোড,
কলিকাতা—৩৫
ফোন : ৫৬-৩৮৪৮

শান্তিরস সালসা
(ট্রেড মার্ক রেজিষ্টার্ড)

সর্ব্বপ্রকার বাতবেদনা, রক্তদুষ্টি চর্ম্মরোগ নাশ করে ও দেহে শক্তি বৃদ্ধি করে।

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

হেড অফিস-৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৭
ব্রাঞ্চ-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
পো: বক্স নং-৮৯৪৭

সুভদ্রা বলিল, জনান্তিকে হয় তো আরও ঘটছে।

শীতলপাটি, রূপার রেকাবী তুলিতে তুলিতে কদমমণি বলিল, এ যেন হল, ওঠ ছুঁড়ি তোর বে।

তাহার কথায় সকলে হাসিয়া ওঠায় সুভদ্রাভাষণের বিষয়ে কেহ অন্য চিন্তা করিল না।

দীপঙ্করের তাগিদে শ্রীলতা আবার শোবার ঘরে চলিয়া গেছে। মহেন্দ্র সারাদিন বিছানায় গড়াইতে পারেন নাই। হামিদের জন্য বিশেষ করিয়া মাংসের পোলাউ হইতেছে। যাহাতে রাত্রের ভোজনে সুবিচার করা চলে তাই মহেন্দ্র বিছানায় শ্রান্ত ক্লান্ত-ভাবে একটু বিশ্রাম নিতেছেন।

গৃহিণী দালানের ফরাসে শুইয়াছেন। একাদশীর উপবাসে ক্লিষ্ট দেহ তাঁর। তায়, স্বামী বিহনে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া চোখে জল আসিতেছে। পিত্ত নিবারণার্থ রতন সরিষার তেল ও জল একত্র করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় মালিশ দিতেছে।

অরুণাশু, বিনয়, পরীক্ষিৎ বাহিরের ঘরে। খুকুকে ঘুম পাড়ানো হইয়াছে।

বহুক্ষণ ম্যাজিস্ট্রেটকে সরকারদ্বয়ের হেফা-জতে রাখা হইয়াছে। অমিয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহিরে গেল।

বিনতার ভাগ্যে একটুর জন্য বন্ধন পড়ে নাই। তা হইলে সে তো গিয়াছিল আর কি। গলায় গান ঝরাইয়া সে কোণের ঘরে নভেল লইয়া বসিল। পলাতকা মালতীকে ধরিয়া লইয়া দীপঙ্কর শ্রীলতার ঘরে গেল।

গৃহিণী বলিলেন, রাত পোহালেই যাত্রা। তোমরা কাজকর্মে হাত দাও। হামিদকে খাওয়ানো হলেই আমি শুয়ে পড়বো। রান্না হয়ে গেছে সব?

ছায়া বলি, হ্যাঁ, মা। খাবার টেবিল-চেয়ারের ঘরে, না গোলবারান্দায় দেব?

উত্তর দিবার আগেই সুইংডোর ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অমিয়।

কি কাণ্ড, মা! হামিদ চলে গেছে। এই চিরকুটে লিখে গেছে—

ভাই অমিয়,

বিশেষ জরুরী কাজ আছে। ক্ষমা কোর। মাকে বোল তাঁর খাওয়ানো আমার ভাগ্যে নেই। চললাম।

সমস্ত তৈরি, দু'টো খেয়ে যাবার সময় পেল না? একবার বলেও তো যেতে পারতো! আশ্চর্য!

সম্পা বলিল, জরুরী কাজের কথাটা কি হঠাৎ মনে হল? সারাদিন একবারও বলেন নি তো।

জয়া উত্তর দিল, আসল কথা হিন্দুবাড়ির আশীর্বাদে শাঁখ উলু শুনে ভয়ে পালিয়েছে।

সাবিত্রী বলিলেন, তা ঠিক বলেছ মা। লোকটি এত শান্ত, এত বিবেচক। মুসলমান বলে সর্বদা হিন্দুবাড়ি এলে একটু সরে সরে থাকেন। তাই তোমাদের অসুবিধা হবে ভেবে চলে গেছেন।

এই ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যা কেউ খুঁজিয়া পাইল না। অমিয় বিষণ্ণচিত্তে মাথা নামাইয়া দীপঙ্কর ও মহেন্দ্রকে খবরটা দিতে গেল।

ঠিক এই সময়ে পুকুরের পাড় হইতে একটা গোলমাল ভাসিয়া আসিল। অতি ক্ষীণ চাঁদ তখন আকাশে। একটা কান্নার শব্দ। আর্ত চীৎকারে কেউ যেন হা-হুতাশ করিতেছে।

সাবিত্রী বলিলেন, ওমা, পুকুরের চালিতে (পাড়ে) কাঁদে কে? কুড়ানী, দেখে আয় না মা।

কুড়ানী বিরসমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বিবাহ-মিলন এই সকল লইয়া মাতামাতি ভাল লাগে না তার। বিবাহের শেষে যা, জানাই আছে। হয়, ঐ রাজরাণী রায়গৃহিণীর একাদশী, কিম্বা কুড়ানীর পাত কুড়ানো। লোকে কেন এবম্বিধ লৌকিক আচারে মূল্য দেয় কুড়ানী বোঝে না। কেবল বৈবাহিক ব্যাপারে হর্ষপুলক তাহাকে ভারাক্রান্ত করে। কুড়ানী গভীর দার্শনিক।

পরিপূর্ণ মিলন-উৎসবে কোথাও কান্নার আওয়াজ কুড়ানীর ভাল লাগিল। ছিনে শুক্‌নো শরীর দুলাইয়া যথাসম্ভব খরপায়ে কুড়ানী চলিল।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, হারাণী ও পচার বৌ দুই দিকে ধরিয়া আনিতেছে রোরুদ্যমানা বাসিনীকে। ঘরের চাকর হারাণ পেছনে।

বাসিনী শুধু রোরুদ্যমানা নয়, তার অবস্থাও ভয়ানক। বেশ পরিচ্ছন্ন ফিটফাট তরুণী সে। এখন তার বাঁধা খোঁপা খসিয়া পিঠে, চুল এলোমেলো। শাড়ির আঁচল উঠোনে লুটাইতেছে। দুই হাতে বুক ও মাথায় করাঘাত করিয়া ভাঙা গলায় সে বিলাপী।

সম্পা হাতীমুখো বারান্দা হইতে দ্রুত নামিয়া নিকটস্থ হইল।

এ কি ব্যাপার? ওর কেউ মারা গেছে?

পচার বৌ সাধারণত মনিবদের সম্মুখে কথা বলে না, এখন উত্তেজনার মুখে হারাণীর উচ্চকণ্ঠকে ডুবাইয়া বলিয়া চলিল: খোকা পরফুল্লকে নিয়ে মণিদিদিগারের বাড়িত (তে) জনখাটার কামে লাগছে। ওনাগারের পাছদুয়ারের ঘরে যাম্না দুই মাগী-মর্দ উঠছে।

হারাণী এখন পচার বৌয়ের গলার নিঃশ্বাসপাতনের ফাঁকে নিজের ক্যান্‌কেনে গলা চড়াইল—আমার গা মাতা-মাতা করতেছে কয়দিন ব্যাপার খায়া, তাই আপনাগারের চালির উপর শিকা দু'ডা গোন্দভ্যাদাল (গন্ধভ্যাদাল) পাতা নি তুলতাছিলাম। এমন সময় দেখি ছুঁড়ি পাগলের নাগাল মাথা খুটত্যাছে।

পচার বৌ আবার নেত্রীত্ব লইল, কারণ তাহার ছাওর খোকাকে লইয়া কাণ্ডটির প্রধান বক্তা তাহারই হওয়া উচিত। সে বলিল, খোকা চল্যা গিছে ভোর রাত্তিরে। ঘরের ক্যালেঙ্কারি কাউক কওয়া যায় না। চুপে ছিলাম। ছুঁড়ি খবর পাছে বোকালে। তখন থিক্যা আমার মরে বইসা কাঁদতেছে।

সকল প্রকার ট্রানজিসটার রেডিও, গ্রামোফোন রেকর্ড ও ফটো ফিল্ম বিক্রেতা ও মেরামতকারক

দি শিয়ালদহ গ্রামোফোন মার্ট

১৬৫, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ (বহুবাজার) ফোন:—৩৪-১৯৭৯

ডাঃ ক্যাণ্ডকচন্দ্র বসুর

না না লা

সকল প্রকার ব্যথা ও বেদনা নাশ করে

অশোক কর্ডিয়েল

হরমোন যুক্ত

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

নারীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরে

টাইকোসোডা

অম্ল, অজীর্ণ ও উদরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ

ক্যাঁদতে ক্যাঁদতে এখন ক্ষেপা উঠছে। কতেছে মনিববাড়ি যাই, বিচ্যার চাই, হেনা-তেনা ছাতামাতা কথা।

জয়া রুক্ষস্বরে বলিল, নষ্ট মেয়েকে নিয়ে একটা পুরুষ পালিয়েছে। মনিব তার কি বিচার করবে? খোকার বৌ নেই, প্রফুল্লের স্বামী নেই। আইনে আটকানো চলে না।

সাবিত্রী বলিলেন, ওঠ বাসিনী, সরে যা। কত বর তোর জুটবে। খোকা এমন কি।

বাসিনী চুপ করিয়াছিল। লাল দুই চোখ ও বিপর্যস্ত মুখভাবে সে যে প্রকৃতিস্থ নাই স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল।

এবার সে গানের অনুকরণে ভাঙা বেসুরো গলায় বলিল, ওগো, সে যে আমার মনের মানুষ।

ফাঁকি দিয়া পানের পাখি
উড়্যা গেল, আর অ্যাল না,
আর অ্যাল না।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এক হাত, কোমরে এক হাত বাইজী ঢং-এ দেহ দুলাইয়া বাসিনী নাচের চেষ্টা করিল।

উঠোনসুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রতন বলিল, তাই বাসিনী সাত তাড়াতাড়ি চল্যা গিছে আজ। এখন মাথাডা খারাপ কইর‍্যা অ্যাল।

গৃহিণী অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এখানে ওকে এনেছ কেন? বাড়ি নিয়ে যাও।

পচার বৌ মনিবানীর বিরক্তি দেখিয়া গুটাইয়া আবার শামুক-খোলসে প্রবেশ করিয়াছিল। মিন্‌মিন্ করিয়া বলিল, আমি আনব ক্যান? ছুঁড়ি নিজেই ক্ষ্যাপা হয়া আসতেছে। গায়ে হচ্ছে হাতীর বল। ধর‍্যা রাখবের পারলাম না।

সম্পা বলিল, বিচার চায় ও কি না!

বিনতা গোলমাল শুনিয়া আসিয়াছিল, বলিল, যার যাকে ইচ্ছা ভালবাসবে, তার বিচার কি?

বাসিনী কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একদৃষ্টে বিনতার দিকে চাহিয়া কাঁপা গলায় জড়িতস্বরে বলিল, কি কলেন দিদি, বিচ্যার নাই? আপনে এতডা ল্যাখাপড়া কইর‍্যা এমন কথাডাই কলেন? আমি না গওনা বেচ্যা খোকাক এতডি ট্যাকা দিছি। কছিল ঘর তুইল্যা আমাক নিবে। হায় রে কপালডা! সোনার মাকড়ি, নাকছাবি, রূপার চুড়ি, হাঁসুলি সক্কল গিছে আমার। হে ভগমান, দেখ তমি। মাগী মরুক, ওলাউঠ্যায় মরুক। হো, হো, হো!

হঠাৎ বাসিনী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কুড়ানী এতক্ষণ অতি প্রসন্ন মুখে নাটক দেখিতেছিল। সারাদিনের মধ্যে এইবার তাহার মুখ-চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত। প্রীত সন্তুষ্ট গলায় সে রায় দিল, ইয়াক (একে) রোজা ডাইক্যা ঝাড়ন লাগে। অপত্থাবতায় দিষ্টি দিছে।

হারাণ বলিল, সাজাৎ আলী ভাল রোজা জানে।

বাসিনী হাসি বন্ধ করিয়া এবার ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিল, ইস্ ইস্! উয়ার সাজাৎ আলী আছে। সক্কলের সাজাৎ আলী আছে। আমার সাজাৎ আলী নাই ক্যান?

হারাণী নিরতিশয় অপ্রতিভ হইয়া বাসিনীর হাত টানিল, ভাল কথা কইছে কুড়্যানী। মিয়াজানেক কই গা রোজা ডাকিব্যার। আয়, চল, বাড়িত চল।

গৃহিণী বলিলেন, ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে। ডাক্তার ডেকে দেখাও। রতন, অনাথ সরকারকে আমার নাম করে বল, পাঁচটা টাকা দিয়ে দিক।

বাসিনী হঠাৎ শান্ত হইয়া গেল। হারাণী ও পচার মা হাত ধরিয়া পুকুরের পাড় দিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেল। গৃহিণীর অনুমতি গ্রহণান্তর স্বতঃপ্রবৃত্ত কুড়ানী জীবহিতে উদ্যোগী হইয়া সঙ্গে গেল সহায়তার জন্য।

আশ্চর্য কলম

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এই যে দাদা, একদিনে বেরিয়েছে—
নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম
'খাই-খাই।'
চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা,
পণ্ডিত, মূর্খ যে কেউ
চোখ বুজে
রাতারাতি লেখক হতে পারে।
এ কলম হাতে থাকলে
বসা বা দাঁড়ানো, চিৎ বা উপুড়
যে কোনো অবস্থায়
প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায়—
কোনোরকম তাগবাগ বা রাখঢাকের
দরকার হয় না।
দিনকে রাত, সোজাকে কাত,
হতাশকে হাত করতে
এ কলমের জুড়ি নেই।
মনে রাখবেন, নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফা চাঁদের আশ্চর্য কলম
'খাই-খাই।'
রাঘববোয়াল থেকে চুনো-পুঁটি
হরেক সাইজের পাওয়া যায়;
দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।
এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়
বলবেন।

রান্না মুখরোচক করে
কৃষ্ণী
গুঁড়া মশলা
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্নাইস) প্রাঃ লিঃ
পোস্তা, কলিকাতা-৭ মিল—কাশীপুর

একমুহূর্তে রঙ্গমঞ্চ নিস্তব্ধ হইল। একটি অতি উত্তপ্ত বাসনামথিত একাঙ্কিকার শেষে শান্ত পল্লীশ্রী আবার ঘুমন্ত। চোখের পাতায় শিশির তার নিশীথ বাতাসে কম্পমান। ফুলের মর্মে মধু তার আহার্য। সে অনাঘ্রাতা কিশোরী।

বিনতা নভেলে ফিরিল। যে-যার কাজে গেল। সম্পা শুধু উদ্বেলিত। একটি নিরক্ষরা দাসী প্রেমকে যে মূল্য দিয়াছে, সম্পা পারে নাই কেন?

প্রেমিক পলাতকা, তাই বাসিনী উন্মাদ। আর সম্পা নিজে গৌতমকে বিসর্জন দিয়াছে। আজ কোথায় সম্পা, কোথায় গৌতম?

সুভদ্রা নিঃশব্দে ছিল। বিচিত্র দিনটির অঙ্গে কত প্রেমের বিচিত্র রূপ ধরা দিয়াছে তাহারি রং-এ তার সৃজনশীল শিল্পিমন অভিভূত।

সুভদ্রা আস্তে দোতালায় চলিয়া আসিল। আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া চলনবিলের দিকে চাহিয়া রহিল।

হামিদের নৌকা হয় তো এতক্ষণে পদ্মবিলে। সেখানে সেই লঞ্চ, যেখানে হামিদের প্রেম আশ্রয় পাইয়াছিল। সেই লঞ্চে আবার একা সে ফিরিয়া যাইতেছে।

একা! কত একা! হামিদের ছিপ যেন ময়ূরপঙ্খী হইয়া উড়াল দিয়াছে। রূপকথার আর এক রাজপুত্র রায়বাড়ির দরজা হইতে ফিরিয়া গেল।

স্বপ্নের কুয়াশা-ঘেরা পদ্মবিল, তারপরে নদী। সেই দ্বিপ্রহরের হাসি-গল্পে, আনন্দে মুখরিত পথ বাহিয়া, নীরবে একটিও কথা না বলিয়া, হামিদ ফিরিয়া চলিয়াছে।

দুইধারে ফুলের গাছ। হামিদের মাথায় যেমন ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তেমনি অসংখ্য ফুলের ঝরা দল। হামিদের বসন্ত। ঝরাফুলের বসন্ত। শেষ বসন্ত। হামিদের শেষ বসন্ত।

সুভদ্রার ইস্পাত-উজ্জ্বল চোখে একবিন্দু অশ্রু চাঁদের আলোয় টলমল্ করিয়া উঠিল। যক্ষপ্রাসাদের লোলুপ জিহ্বা মেলিয়া রায়-বাড়ির অলিন্দ, বাগান, কক্ষ সকলকে গ্রাস করিয়া রাখে। নীরব আকাশের নীচে জমাট কঠিনতা। সেখানে মন নাই। ঐশ্বর্যময় রায়বাড়ি নির্নিমেষ পাহারায় চাঁদের নীচে প্রহর জাগিতেছে।

সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুইটি মানুষের অব্যক্ত বেদনায় রায়বাড়ির ছাদের জ্যোৎস্না নীলাভ হইয়া উঠিল।

বসন্ত শূন্যহাতে ফিরিল॥

সমাপ্ত

কোলকাতায় বৃষ্টি

॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥

কোলকাতার পথে বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি—
অবিরাম বৃষ্টি, এই মিনিট চল্লিশ :
তাতেই আকুল আমি, ঠিক ক্লান্ত কেরাণীর মতো।
ট্রাম নেই বাস নেই, পথঘাট একাকার
আকাশ ও পৃথিবীর এ কি কোলাকুলি!

অফিস ফেরৎ আমি কেরাণী কি?
কিম্বা এক বিরহের সুগভীর সমুদ্রের পারে
বন্দী যক্ষ, বাড়িতে রয়েছে প্রিয়া,—
হয় তো উদ্বেগশীর্ণ, দুশ্চিন্তা বিধুর;
সদ্য এক মৃতবৎস প্রসবান্তে একান্ত দুর্বল,
জানালার পাখি ধরে পথিক বধূর মতো;
অফিসে আবদ্ধ স্বামী, বুঝি সেই বিরহেই
বৃষ্টির ছোঁয়ায় তার মন আনচান।
আমিও বিরহী যক্ষ, মনিবের অভিশাপে
জর্জরিত; তবু বৃষ্টি অকস্মাৎ কোলকাতার বুকে
স্বল্পক্ষণ—যেহেতু তা অবিরাম—তাতেই বিরহী মন
সঙ্গ নেয় আকাশচলতি ওই মেঘে।

পথে নামি অফিসের নির্বাসন শেষে :
ট্রাম নেই বাস নেই, গভর্নর হাউসের গাছগুলো
আহ্লাদে উদ্যতবাহু, টকটকে সবুজ সোহাগে
কোন নব মেঘদূত বুঝি লেখা হয়!

সামনে সড়ক নেই, শুধু জল, জল, জল—
কি উল্লাসে জল জমে,
ছায়া পড়ে আকাশের পুঞ্জিত মেঘের
সমুদ্রের ছোঁয়া এনে কোলকাতার পিচের এ পথ
কেরাণীর মনে আঁকে
অগম পারের কোন বিরহ-বিলাস!
এ কোন সমুদ্রস্বাদ? বন্দী যক্ষ মুক্তি পায়—
গৃহে তার ক্ষীণপ্রাণ কেরাণী-প্রেয়সী
গহন গাঙের পারে বিরহ-বিধুর!
কোলকাতায় এ চল্লিশ মিনিটে
বৃষ্টির কুহক আনে; ভীরু এই কেরাণীর
প্রাণে মনে আর আনে
সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল, তার নিশ্চিন্ত আস্বাদ!

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

['নব-সন্ন্যাস' বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একখানি উল্লেখযোগ্য বৃহৎ উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি লেখক নিজে দৈনিক বসুমতীর শারদীয় সংখ্যার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে রূপ দিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ আগ্রহের সঙ্গে এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন। আমরা এই সঙ্গে লেখকের চিত্র ও গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি প্রকাশ করলাম। —স]

কয়লাখনি অঞ্চলের একটি জায়গা গঞ্জডিহি। আদর্শবাদী যুবক টুলু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সন্ন্যাসী-জাতীয় মহাপুরুষদের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানকার মিড্‌ল্ স্কুলের হেডমাস্টারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। মাস্টারমশাই একজন প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী, কথাবার্তা চালান একটু হাস্যপরিহাসের মধ্যে দিয়ে; টুলুর নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা দেখে তাকে অধ্যাত্মবাদ থেকে বাস্তব-জীবনবাদের দিকে টেনে নিয়ে আসবার লোভে একদিন তাকে একটা কয়লার খনিতে নিয়ে গেলেন—জীবনকে তার বিভীষিকা আর গ্লানির মধ্যে দেখাবার জন্যে।...

সেখানে আর সব দেখবার সঙ্গে টুলু চম্পাকে দেখলে—সুন্দরী, প্রত্যুৎপন্নমতি নিম্নস্তরের মেয়ে। ট্রাজিক পরিবেশে একটি কুলি-মেয়ের সন্তান প্রসবও দাঁড়িয়ে দেখলে—মা মারা গেল—টুলু মাস্টারমশাইকে বলে শিশুটি পোষ্য নেওয়ার

লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু চম্পাই তাকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

টুলুর মনটা খনির এই নূতন অভিজ্ঞতায় একটা রূঢ় ধাক্কা খেলে—অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই সময় সন্ধান পেলে মাইল চারেক দূরে একজন সন্ন্যাসী-মহারাজ এসেছেন—টুলু মনস্থির করে ফেললে—সেবাধর্ম, সে তো নিতান্ত ঐহিক। মহাপুরুষ তারই জন্যে আবির্ভাব হয়েছেন—তাকে এই ঐহিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে।

একদিন গভীর রাত্রে টুলু সন্ন্যাসী সন্দর্শনে চলল—পথেই নিতান্ত নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে চম্পার সঙ্গে দেখা—সে সন্ন্যাসীমহারাজেরই নিয়োজিত একজন বর্ষীয়সীর সঙ্গে আশ্রমে অভিসারে চলেছে। টুলুর মোহ ভাঙল—অনেক কষ্টে, মাস্টার-মশাইয়ের ভৃত্য চম্পার পিতামহ বনমালীর অসুখের নাম করে চম্পাকে ফেরালে—চম্পা ধূর্ত, মিথ্যাটা বুঝতে দেরি হোল না, তবে টুলুর লোভে ফিরল—

গঞ্জডিহির-কুলি-অঞ্চলে টুলু কাজ করতে লাগল—বুদ্ধিমতী, অন্যান্য নানা গুণের অধিকারিণী চম্পাকেও তার পাপের জীবন থেকে ফেরানো তার জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। বস্তির সেবা-উন্নয়ন কাজে টুলুর সংঘর্ষ বাধল খনির ম্যানেজার আর সহকারী ম্যানেজারের সঙ্গে—একটি দীর্ঘ ইতিহাস, এর মধ্যে চম্পার অংশটা বিশিষ্ট—টুলু তাকে আর তার পোষ্য সেই খনিতে জন্মানো ছেলেটিকে (হীরা) আস্তে আস্তে টেনে তুলছে—চম্পা সহজে বাগ না মানলেও একদিন নিজের পাপের পথ ছেড়ে মাস্টারমশাইয়ের স্কুলের পাশে তার ঠাকুরদা বনমালীর বাসায় এসে উঠল—তার মনটা নির্মল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে—মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'একটি মেয়ে সুধরে উঠলে একটা জাতি বেঁচে যায়—টুলু সেই ব্রতে সফল হয়ে আসছে তবে চম্পা যে ভালো হচ্ছে, নিজেকে শুদ্ধ করে তুলছে

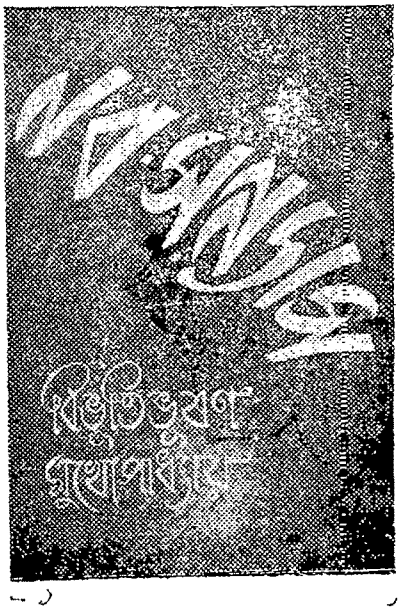

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট

তা একটা অসম্ভব আশা নিয়েই—সে টুলুর স্বপ্ন দেখে—

ইতিমধ্যে সরকারের চর মাস্টারমশাইয়ের সন্ধান পাওয়ায় তাঁকে হঠাৎ অন্তর্ধান হ'তে

হোল। ম্যানেজারের প্রবল শত্রুতার মধ্যে টুলুকে কাটাতে হচ্ছে—তবু সে অনমনীয়—তার পেছনে ম্যানেজারের গুপ্তঘাতক নেমেছে—চম্পা জানে—টুলু স্কুলে থাকে রাত্রিতে—চম্পা সমস্ত রাত জেগে পাহারা দেয়।

চম্পার সঙ্গে তার 'মিতিন' (সই) প্রহ্লাদের বৌ আর প্রহ্লাদ এসে এখানেই উঠেছে—চম্পার ব্যবস্থা—সে টুলুর কাছে লোক চায়—

এদিকে বস্তির কাজ এগিয়ে চলেছে—একটা নূতন স্কুলের ব্যবস্থা করছে ঐ অঞ্চলে—বস্তির লোকেরা সাহায্য করছে।—এইসময় হঠাৎ দু'টি ব্যাপার হোল—লোকমারফৎ মাস্টারমশাইয়ের গোপন চিঠি এতে নিজে আসল পরিচয় দিয়েছেন তিনি অর্থাৎ তিনি অগ্নিযুগের একজন বিপ্লবী—প্রচ্ছন্নভাবে দিকে দিকে কাজ ক'রে যাচ্ছেন—নিছক সমাজসেবা ইত্যাদি বাইরের কাজ করলেও তিনি টুলুকে অন্তরে অন্তরে সেই বিদ্রোহের জন্যেই তোয়ের হতে বলেন যে, বিদ্রোহ স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম।—টুলুর নূতন অস্বস্তি—স্কুলের আয়োজন চলতেই থাকে, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি বর্ষার দিনে উড়ো পাখির মতোই তটিনী তার স্কুলে আশ্রয় নিলে—সঙ্গে দু'টি ভাই—মাইল তিন দূরে ছোট্ট একটি পরিবার—বৃদ্ধা মা আর এই দুটি ভাই—তটিনী শিক্ষিতা গরীবের ঘরের মেয়ে ···টুলুর এই শিক্ষায়তনে কাজ করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল।

কিন্তু এই স্কুলের কাজে চম্পাকেও নামাতে যাওয়ার ভুলটা ক'রে বসল টুলু—তার নিজের মনের শুচিতার জন্যই—একেবারে উল্টো ফল হোল—ম্যানেজারের চোখেও লেগেছিল। চরিত্রের সন্দেহ হওয়ায় সমস্ত বস্তি বিমুখ হয়ে উঠল—মাঝপথেই থেমে গেল সব কাজ—

আরও একটা ব্যাপার হোল এই নৈরাশ্যের মধ্যে একদিন চম্পার আচরণে টের পেলে সে তার অন্তরের মধ্যে সেই লালসা নিয়েই জেগে রয়েছে—তাকে জয় করবার জন্যে আবার সেজে এসেছিল—

একটা শেষ চেষ্টা করবে টুলু—সাঁকরেলে তটিনীর বাড়ি গিয়ে তাকে স্কুলের কাজে ডেকে আনবে—কথা দিয়েছিল সে—নয় গঞ্জাডিহি ছেড়ে সাঁকরেলেই স্কুল খুলবে—

সাঁকরেলে যেতে নটাই দাসের গাড়িতে তার সঙ্গে (নিজের পরিচয় না দিয়ে) কথাবার্তায় বুঝল কলঙ্ক অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে—আর তটিনীর বাড়ি গেল না।··· নৈরাশ্যের মধ্যে এই কলঙ্ক প্রলেপে যেন মরিয়া হয়েই টুলু ফিরল—মনস্থির করে ফেলেছে—কলঙ্ককেই নেবে স্বীকার করে—চম্পার হাতে আত্মসমর্পণ করবে তার সমস্ত ব্রত জলাঞ্জলি দিয়ে।

এসে দেখে চম্পা একখানি চিঠি রেখে হীরাকে নিয়ে বিদায় হয়েছে—লিখেছে সে তার ভুল বুঝেছে, তবে কাছে থেকে আর নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলে না—চলল টুলুর হীরাকে মানুষ করবার ব্রত নিয়ে—

আরও নৈরাশ্য—সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে যেন। টুলু বাসায় ফিরে দেখে একটি লোক অপেক্ষা করছে—এই মাস্টারমশাইয়ের চিঠিটা নিয়ে এসেছিল সেদিন। বললে একটু দূরে মাস্টার-মশাই তার জন্য অপেক্ষা করছেন। মাস্টারমশাই জানালেন তাঁর পেছনে গোয়েন্দা তৎপর হয়েছে—একেবারে গা ঢাকা দিচ্ছেন—যাতে টুলুর ওপরও সন্দেহ না হয় সেইজন্যে তাকে নিজের বাড়ি রাজসাহীতে চলে যেতে বললেন—আন্তর্জাতিক যুদ্ধের আভাস রয়েছে, এই তাঁদের সুযোগ, টুলুকে ডেকে নেবেন সময়ে—

টুলু মাস্টারমশাইয়ের পিস্তলটা চেয়ে নিয়ে ফিরল—

বাড়ির কাছে আসতেই অন্ধকার রাত্রে দূর বস্তিতে একটা তীব্র কোলাহল—ম্যানেজার টুলুর দলের সঙ্গে সংঘর্ষে বস্তির সর্দার রমণী ঘোষকে খুন করিয়ে রটিয়েছিল পালিয়েছে—বস্তিবাসীরা টের পেয়েছে, তারই হৈ-চৈ। একবার মনে হোল এদের সঙ্গে গিয়ে ম্যানেজারের এবার চরম প্রতিশোধ নেয়। তারপরই বস্তিবাসীদের ওপর ঘৃণায় (ওকে মিথ্যা কলঙ্কিত করার জন্য) ফিরে বাসার দোর খুলতে যাবে—খোলা রিভলভার হাতে টুলু অপেক্ষমাণ পুলিসের হাতে পড়ল। আজকে রাত্রে বস্তি অভিযানের মূলে যে সেই, এটা প্রমাণ হতে দেরি হোল না। আট বৎসরের মেয়াদে টুলুকে কর্মজীবন থেকে বিদায় নিতে হোল।

মেদিনীপুর। আটবছর পরে যেদিন বেরিয়ে এল। চম্পার সঙ্গে একটু নাটকীয় পরিস্থিতিতে হোল দেখা। জেল বদলি হয়ে টুলু যেখানে যেখানেই গেছে, চম্পা অনুসরণ করেছে, সঙ্গে হীরা। চম্পা মাস্টারমশাইয়ের কথা জানালে—'৪২-এর বিদ্রোহে তিনি পুলিসের গুলীতে মারা যান। সাগরদহে একটা আশ্রম করে ছিলেন তার আগে—

সাগরদহে আশ্রমটা বাউরি কর্মী নরোত্তমের হাতে। একেবারেই অহিংস-আন্দোলনের আদর্শে গড়া আশ্রম—নিরুপদ্রবে কাজ চলছে। তাঁত, চরখা জন-শিক্ষা, আরও সব। নিশ্চিন্ত হয়ে বসল টুলু। এ আশ্রম '৪২-এর আন্দোলনে একেবারে যোগ দেয় নি বলে সুনাম আছে সরকারের কাছে। শান্ত জীবন চলেছে—চম্পা কপালে সিঁদুর দেয়—নয় তো দু'জনে থাকার উপায় নেই তো—হীরা মাস্টারমশাইয়ের (ওর দাদু বলে পরিচিত) শেখানো যুদ্ধ-বিদ্রোহের খেলা খেলে দল জোগাড় করে—

নরোত্তম অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ—স্বল্পবাক, কি যেন লক্ষ্য করতে থাকে—তারপর একদিন টুলুর কাছে আশ্রমের স্বরূপ আর মাস্টার-মশাইয়ের আদর্শের কথা ব্যক্ত করলে—এর

নীল আকাশে শুভ্র মেঘের দল যখন
লঘুপক্ষ হংসবলাকার মতো সঞ্চরণশীল,
তখন বুঝবেন শরৎ এসেছে, সঙ্গে
নিয়ে এসেছে অবকাশের আনন্দ।
নির্বিঘ্ন যাত্রায় আপনার এই
অবকাশের আনন্দ নিবিড় হোক্।

পূর্ব রেলওয়ে

SIEMENS
INDIA

সিমেন্স রেডিও

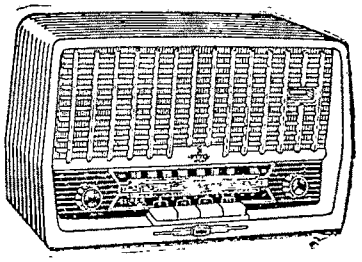

আর, এ ১০১ এ· সি ও এসি/ডি·সি ৬ ভালব, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড। মূল্য ২৭০৲ ও স্থানীয় কর।

৬৯১ ডব্লিউ ও

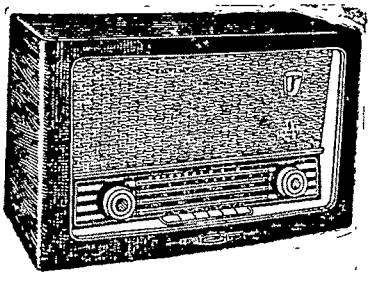

এ·সি· ও এ সি/ ডি· সি ৬ ভালব ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড। মূল্য ৪১৫৲ ও স্থানীয় কর।

৬৯২ ডব্লিউ ও

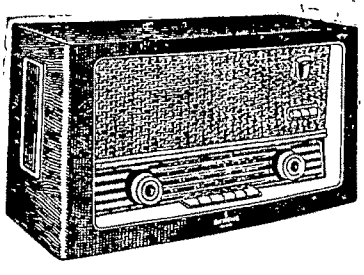

এ· সি ও এ· সি/ ডি· সি ৬ ভালব ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড। মূল্য ৪৭৫৲ ও স্থানীয় কর।

৭৯০ ডব্লিউ (এ· সি)

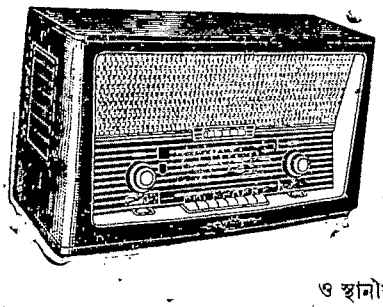

৭ ভালভ ৬ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৮+৪ পুশবাটন ৫ লাউড স্পীকার মূল্য ৯৯৩·৩৩ ও স্থানীয় কর।

নিকটবর্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ও আন্দামানের পরিবেশক :—

নান এণ্ড কোং

৯এ ডালহৌসী স্কোয়ার,
৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

শান্ত ভাব (নামও শান্তি আশ্রম) সরকারের চোখে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আগস্ট আন্দোলনের চেয়েও একটা বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে —আশ্রমকে ভেতরে ভেতরে তোয়ের হতে হবে—টুলু ক্লান্ত ছিল, প্রথমটা আর ও পথে যেতে রাজী হোল না—তার পরেই বাংলার দুর্ভিক্ষ এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বড় আর মেদিনীপুরের দক্ষিণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। এই ব্যাপারে গবর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য টুলুকে যেন আবার জাগিয়ে তুললে।

এই সময় ঘটনাচক্রে আবার তটিনীর সঙ্গে দেখা। সে ২০।২৫ মাইল দূরে মহকুমা শহরে স্কুলে চাকরি করে—ভাই দু'টি বড় হয়েছে—সাগরডিহিতে আসে সবাই বন্যা দুর্ভিক্ষের মধ্যে সরকারের অন্যায় ঔদাসীন্যে টুলুকে আবার ক্ষেপিয়ে তুলেছে—মেদিনীপুরের চারিদিকে যে গোপন বিদ্রোহের আয়োজন হয়ে চলেছে, তার সঙ্গে যোগ রেখে চলল ভেতরে ভেতরে—নদীর ধারে বহু দূরে জঙ্গল, সেখানে দলে দলে বন্দুকে হাত পাকানোও চলল।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনেক লোক আশ্রমে, তাদের খাদ্যের অভাব—চাল জোগাড় করতে টুলু তটিনীর বাসায় এল—তার স্কুলের সেক্রেটারির মধ্যস্থতায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালের পারমিট পাওয়া গেল—টুলু যখন সেটা নিয়ে সাগরডিহির কাছে থানায় ফিরল, দেখা গেল, নিতান্তই অল্প এবং তাও প্রচুর সর্তের ওপর চালের পারমিট—

বিদ্রোহ পূর্ণ হয়ে উঠল—চাল লুট করে আনতে হবে—তারই অভিযানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে মাঝপথে তটিনীর সঙ্গে দেখা —সে সেক্রেটারির সাহায্যে একটা মাড়োয়ারীর আড়ত থেকে চাল নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছে—কাজ এগিয়ে চলেছে, চম্পা খুশি, নরোত্তম কিন্তু সেই পরিমাণেই অসন্তুষ্ট—মাস্টারমশাইয়ের আদেশ পালিত হচ্ছে না—

এরই মধ্যে চম্পা আর তটিনীর জীবন। চম্পার কপালের প্রবঞ্চনা—সেই সিঁদুর তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে—চম্পা ভয় পাচ্ছে। তটিনীর ভক্ত চম্পা, কিন্তু এক-এক সময় টুলুর মনে হয় তার চিন্তা তাকে দুর্বল করছে। এই ব্যাপারের মধ্যেই তটিনী একটা ছুটিতে মাসখানেক এসে সাগরদহে রইল; এই ঘনিষ্ঠতার পর তটিনী চলে যেতে টুলু আরও স্পষ্ট ক'রে নিজের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারলে; চম্পার কাছেও লুকুলে না। একটা জটিলতা চলল—

এদিকে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠছে চারিদিকে—নরোত্তম খবর আনে—কোথায় parallal govt. গঠিত হয়েছে, কোথায় বিদ্যুদ্বাহিনী কি কাজ করছে···

গোয়েন্দা লেগেছে, 'শান্তি-আশ্রমে'ও খানাতল্লাসী হবে। একদিন হোলও,—এর যে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ তারই বশে চম্পা অসুখে পড়ে গেল। অবশ্য টুলু সাবধান ছিল, খানাতল্লাসিতে কিছু পাওয়া গেল না।

বিদ্রোহের ব্যাপার ঘোরালো হয়ে আসছে—একদিন অসুখের অব্যবহিত পরেই চম্পা গভীর রাত্রে গোপনে নরোত্তম আর টুলুর দ্বারা রাইফেল আমদানির ব্যাপারটা দেখল।

একদিন টুলু একটা 'উইলের' দলিল এনে দিতে গেল চম্পাকে। খুবই ভীত-বিরক্ত হ'য়ে উইলটা নিতে চাইলে না চম্পা, তবে যা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে অস্বীকার করতে পারল না নিজের কাছে—এক রাত্রে জটিল চিন্তা—চম্পা তটিনীকে আসতে চিঠি লিখলে--ও নিজে হীরাকে নিয়ে টুলুর পথ থেকে সরে দাঁড়াবে—আরও চিন্তা, এমন একটা মহাব্রত নষ্ট করবে কেন?—চিঠি ছিঁড়ে ফেললে—

তারপরও ভয়—তার এই সর্বনাশা ভালোবাসার জন্যই যদি আবার দুর্বলতা আসে ···সব সম্ভাবনাই মিটিয়ে দেবে—খানাতল্লাসীর দিন পুলিসের অত্যাচারের ভয়ে বিষ সংগ্রহ করে রেখেছিল—গভীর রাত্রে তাই কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে হীরাকে বুকে করে শুয়ে পড়ল চম্পা।

ওদিকে বিদ্রোহের দিন ঠিক হয়ে গেছে —একসঙ্গে উঠে না দাঁড়াতে পারলে—একে একে পিষে দেবে গবর্নমেণ্ট—খানাতল্লাসীর ধুম পড়ে গেছে। টুলুর আর উৎসাহ নেই—উপায়ও নেই—তবু ঠিক করল চম্পার শেষ কাজটা তটিনীর ওখানে গিয়ে নিরিবিলিতে না সেরে ও কিছুই করবে না—

তাই যাচ্ছিল হীরাকে নিয়ে ছই-দেওয়া বলদ-গাড়িতে। রাত্রে হীরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে—হেড লাইট জেলে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়ির পাশে—নরোত্তম নেমে দাঁড়িয়ে জানালে আজ রাত্রেই পুলিশ আশ্রমে হানা দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে—

মনের একটা অপরিসীম দ্বন্দ্ব—তারপর টুলু ঠিক করে ফেললে—সবই ত্যাগ করলে—এসব কি জীবনের দিক থেকে শেষ আহ্বান —চম্পার কাজটুকু নিরুপদ্রবে সারা—

আবার কার মোহে পড়বে কে জানে? —গেলই না তটিনীর বাড়ি, গাড়োয়ান গিরিধারীর হাতে উইলের খাম আর সেই সঙ্গে তটিনীর নামে একটা চিঠি দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল—সামনে মৃত্যুই, তার মধ্যেই জীবনকে পূর্ণ করতে চলল টুলু—

নীচের রক্তিম ঠোঁটটি দাঁতে কামড়ে রইল গৌরী ঠিক যেন রসাল একটি কমলা-কোয়ায় নখ বসেছে। দাঁড়িয়ে রইল জাফরীর সামনে। সামনে পাণ্ডুয়ার আকাশ —সন্ধ্যায় নীল, বোধ করি বেদনায় নীল হয়েছে। কাঠমণ্ডুর আকাশ এমন নীল হয়ে আছে কি না কে জানে!

অপমানে যন্ত্রণায় গৌরীর ছোট্ট উজ্জ্বল চোখের কোলে কালিমার চিহ্ন।

আজ পঁচিশটি বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে তার ইলিয়াস শাহ-র এই হারেমে। নেপাল-কন্যা গৌরী ইলিয়াস শাহের লুঠের মাল। কাঠমণ্ডুর বরফ চূর্ণ রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে ভগবান পশুপতিনাথকে তিনটুকরো করে ভেঙে ফেলেছে বাংলার নবাব এই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।

মাত্র দু'মাস আগে তিলক বাহাদুরের প্রাসাদকক্ষ থেকে সে নিজের চোখে দেখেছে ইলিয়াস শাহ-র অমানুষিক হত্যা আর লুঠ।

বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকগুলোকে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে গলা কেটে কেটে মৃতদেহের স্তূপ বানিয়েছে সৈন্যরা। রাজা জয়রাজ মল্লর তিরিশ হাজারের ওপর নেপালী সৈন্য বরফ চূর্ণর ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে, বর্শায় আর তীরে বিদ্ধ হয়ে পশুর মত হাত পা ছুঁড়েছে। ইলিয়াসের সৈন্যর খোলা তরবারির ঘায়ে দু'খণ্ড তিনখণ্ড হয়ে গেছে।

নেপালের বহু সর্দার-কন্যাদের নিরাবরণ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে জন্তুর মত, পরে সৈন্যরা ভাগাভাগি করে নেবে।

আর তিন সহস্র সৈন্যের সেনাধ্যক্ষ তার স্বামী তিলক বাহাদুর প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছে।

ছিঃ, তিলক কেন মরল না! কেন সে প্রাণের ভয়ে পাহাড়ের কোলে গোপন আশ্রয় নিল? একবারও কি ভাবল না গৌরীর কথা, ঘরের আর কারো কথা?

কমলা-কোয়ার মত নীচের ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল গৌরী। নরম ঠোঁটটি যেন দাঁতের চাপে ছিঁড়ে ফেলবে।

ইলিয়াস শাহ বেছে বেছে তাকে পছন্দ করল। কি দুর্ভাগ্য গৌরীর।

হাত-পা বাঁধা নরম খরগোসের দলের গাদা গাদা মেয়ে ঠেসে রাখা হয়েছিলো বিরাট কয়েকটি কক্ষে। গৌরীকেও রাখা হয়েছিলো।

ভয়াবহ হত্যা আর লুঠ শেষ হবার পর বেতের চাবুক নিয়ে ঢুকল প্রহরী। অন্ধের মত শন শন্ করে চাবুক চালাতে লাগল মেয়েগুলোর ওপর। সব সারবেঁধে দাঁড়াতে হবে।

অল্-সিজিস্তান—সুদূর ইরানের সিজিস্তানে যার জন্ম, সেই শ্যামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নবাব আলী শাহ্‌কে গুম্-খুন করে বাংলার মসনদে বসে প্রথমেই আক্রমণ করল নেপাল।

সেই ইলিয়াস সারবন্দী মেয়েগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে। কাকে তার পসন্দ হবে কে জানে!

টানা টানা রক্তিম দু'টো চোখ, শুভ্র প্রশস্ত কপালে একটা বেঁধা তীর উপড়ে ফেলে দাওয়াই দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ইলিয়াস শাহ্। কি কথা হোল কে জানে!

গৌরী স্পষ্ট দেখল কোমর থেকে বাঁকা ছুরিখানা বার করে নিমেষে মেয়েটার পেট চিরে দিয়ে কি একটা চিৎকার করে উঠল শামসুদ্দীন। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো প্রহরী এসে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গবাক্ষ দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

গৌরীর ভয় করে নি। তিলক বাহাদুরের কক্ষবাসিনী নেপাল-কন্যা গৌরী যুদ্ধ কি তা জানে! ও শুধু ভাবছিলো, লোকটা কি জঘন্য নিষ্ঠুর আর পশুর মত পাপী!

ঘৃণায় তার ছোট চোখ দু'টো যেন জ্বলছিল।

শামসুদ্দীন থামল।

—ইয়ে হায়।

বলে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ গৌরীর দু'টি স্তনের মাঝখানে বাঁকা ছোরাটা একটু চেপে ধরল। একটু বোধ হয় বিঁধেও গেল ছোরাটা।

আজ গৌরী ভাবে, সেদিন ছোরাটা কেন আমূল বিঁধে গেল না তার বুকে?

ইলিয়াস শাহ্ চলে গেল। একটি

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েই সে পসন্দ্ করল, আর গৌরীকে তাই নিয়ে আসা হোল পাণ্ডুয়ার হারেমে। পঁচিশটি বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে তারপর। হারেমে এসে তাকে কলমা পড়িয়ে নেয়া হয়েছে। দু'টো বাঁদীকে সর্বসময় তার পেছনে রাখা হয়েছে। গোসলখানায় আর খাদ্যে-খাবারে তাকে অন্য বেগমদের, চেয়ে অনেক বেশি তোয়াজ করা হচ্ছে, কিন্তু গৌরী নীরব।

কি করে সে ভুলবে তিলক বাহাদুরকে? নিষ্কলুষ চরিত্রবান তিলক বাহাদুর এক হাতে মুক্ত তরবারী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন

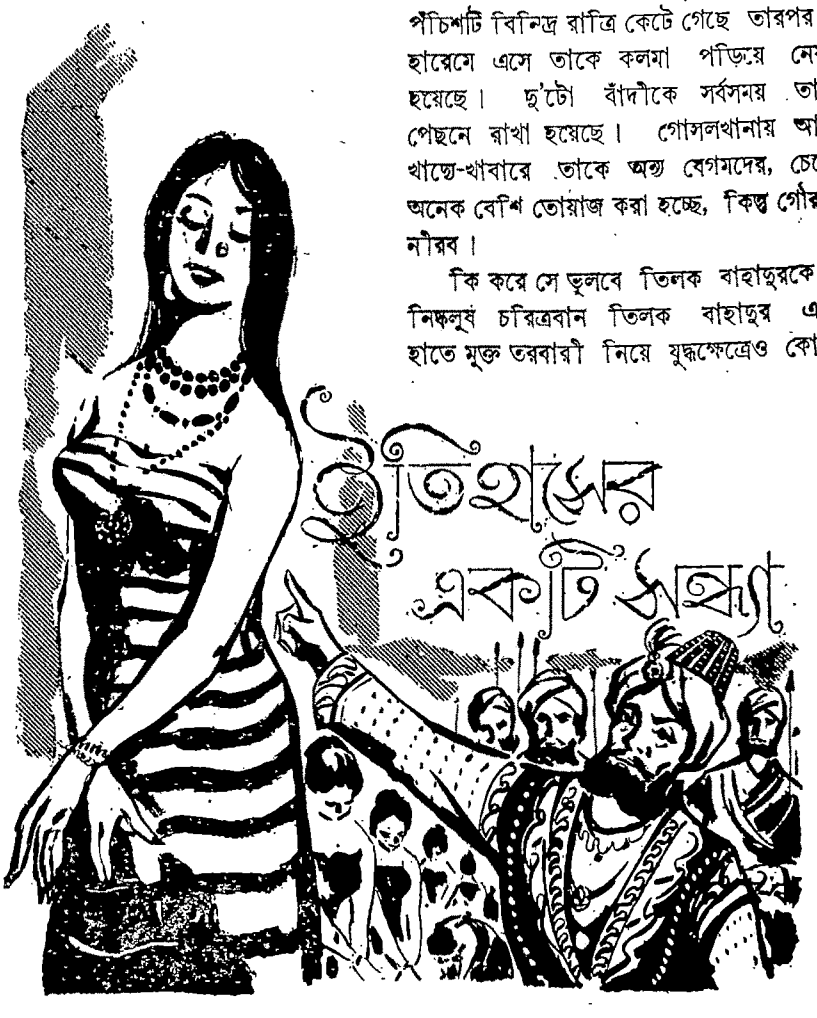

দিন ভোরে পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে পূজো না করে কোন কাজ করে না। গৌরীকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। কিন্তু এই কি ভালবাসা? তিলক বাহাদুর কি জানে না গৌরী আজ কোথায়?

জাফরীর ফাঁকে ফাঁকে চোখের দৃষ্টি আর যায় না। ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

গৌরী প্রতিশোধ নেবে। সকলের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

পঁচিশটি রাত্রির একরাত্রিও শামসুদ্দীন হারেমে আসে নি। খোজা কামরুর কাছ থেকে শুনেছে সে নাকি উড়িষ্যা আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। হারেমে আসবার অবসর নেই তার।

কামরুকে ভাই বলে ডেকেছে গৌরী। প্রথম দিন থেকেই কামরু তাকে স্নেহের চোখে দেখেছে।

হারেমের খোজা সর্দার প্রৌঢ় কামরুদ্দীন বহিন্ বলে তাকে ডেকেছে।

তাকে কথায় কথায় জানিয়েছে। সোনার গাঁও অঞ্চলের ছোটখাট জমিদার ছিল তারা। আলাউদ্দীন আলী শাহ্ তাদের পরিবারের সবাইকে হত্যা করে শৈশবে তাকে ধরে নিয়ে এসে খোজা করে রেখেছে। হিন্দু জমিদারের সন্তান আজ খোজা সর্দার কামরুদ্দীন।

—আমার দিদির কোল থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে এলো জোর করে। তখন কি কিছু বুঝতাম? দিদিকে বড় ভালবাসতাম। আমার দিদির মুখখানা যদ্দুর মনে আছে, অনেকটা তোমার মত।

গৌরীকে তাই বোধ হয়, ভালবাসল কামরু।

কথায় কথায় গৌরী তাকে বললে—আমাকে ছেড়ে দিতে পারো না এখান থেকে?

কামরু তার কোমরবন্ধে তরবারির হাতলে হাত রেখে বললে, পারি বহিন, কিন্তু তুমি পালাতে পারবে না। ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়লে আমার ভী গর্দান যাবে।

কথাটা হয় তো সত্যি। পরমা রূপসী যৌবনবতী গৌরীর পক্ষে পাণ্ডুয়া থেকে সুদূর নেপালে পালিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

ভেবেছে। রাতের পর রাত ভেবেছে গৌরী, কি করা যায়?

একদিন সুযোগ এলো।

খোজা কামরুদ্দীন বললে,—আর ভাল লাগছে না বহিন্। নবাব বড় অত্যাচার করছে। খুন-খারাবী জবরদস্তী—হরদম লেগে আছে। ভাবছি দিল্লী চলে যাব। শাহন্‌শা ফিরোজ শাহ তোঘলক বড় দরদী আদমী। ওখানে কোন কাজ-কাম পেলে থেকে যাব।

গৌরীর মাথায় চকিতে বুদ্ধি এলো।

—তবে একটা কাজ করতে পারবে ভাইজী?

—বলো?

—সম্রাটকে ইলিয়াস শাহ-র অত্যাচারের কথা জানাতে পারবে?

কামরু দাড়িতে হাত বোলাল। বেদনার্ত চোখে বললে—এসব কথা কি আমার বলা সাজে? আমি একটা জেনানা-মহলের পাহারাদার।

গৌরী বললে,—তবে? তবে না হয় আমি একটা চিঠি দেব। তুমি চিঠিটা শাহ্‌ন শাকে দিয়ে দিয়ো। এদিকে আমি—

গৌরীর ছোট ছোট চোখ দু'টো ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় জলজ্বল করে উঠল।

খোজা সর্দার কামরু তাকাল।

গৌরী দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ফিরোজ শাহ দিল্লী থেকে বাংলা আক্রমণ করছে জানতে পারলেই—আমি তোমাদের ইলিয়াস শাহকে খতম করে দোব।

—চুপ!—ভয়ে কেঁপে উঠল কামরু—ফিন্ ও কথা বোল না। কেউ শুনতে পেলে তোমার গর্দান যাবে।

নেপাল-কন্যা গৌরী পাহাড়ী বাঘিনীর মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

সেই নির্ধারিত তারিখ এসে গেছে। গৌরীর জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতির তারিখ। দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ্ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছে পাণ্ডুয়ার দিকে। ১৩৫৩ খৃস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর।

অযোধ্যা পেরিয়ে সরযূ নদী পার হয়ে খানায়া গোরখপুর এসে পৌঁছোল সম্রাট ফিরোজ শাহের বিপুল সৈন্যবাহিনী। সত্তর হাজার ঘোড়সওয়ার আর চারশ' সত্তরটি হাতী। প্রাসাদের চেয়েও বিশাল দশ-বারোটি তাঁবু। তীর, ধনুক, বর্শা, তরোয়াল, খড়্গ, সঙ্গে রইল আরাদা আর মঞ্জানিক। দুর্গের বাইরে আরাদা স্থাপন করে শূল ক্ষেপণ করা হবে আর মঞ্জানিক থেকে সহস্র সহস্র বিষাক্ত শর।

হিসামুলমুলুক সুলতান ফিরোজ বিদ্যুদ্বেগে এগিয়ে আসছে গঙ্গাতটে বাংলার জলাভূমির দিকে।

ইলিয়াস শাহের প্রশস্ত কপালে বলী-চিহ্ন স্পষ্ট হোল, রামদা' আর বর্শা হাতে বাংলার পাইক সৈন্যরা নিশ্চয় দলে দলে ছাগের মত বলি পড়বে, বাংলার কাদামাটি আর গঙ্গার শাখা-প্রশাখা মোগল সৈন্যের আঘাতে রক্তাক্ত পিচ্ছিল হয়ে উঠবে।

ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়ার প্রাসাদের চারদিকে পরিখা খনন করতে আদেশ করল, চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। হিন্দু সেনাপতি সহদেব পরামর্শ দিলো, পাণ্ডুয়ায় সুরক্ষিত দুর্গ নেই। ইকডালার দুর্গে গিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। মালদহের গঙ্গার শাখানদীর তীরে দুর্ভেদ্য ইকডালার দুর্গ। জলা-জংলাভূমি চারদিকে। বর্ষা পর্যন্ত কাটাতে পারলে ফিরোজ শাহের সৈন্য আর হাতী ঘোড়া বাংলার বর্ষায় জ্বরে আর মশার কামড়ে ভীষণভাবে ঘায়েল হবে।

ইলিয়াস শাহ্ চিন্তায় পড়ল।

হারেমের নিভৃতকক্ষে বসে গৌরী আপেলের মত রক্তাভ মুখে সরবৎ খাচ্ছিল। তেজী নতুন কোন বেগমকে ভাঙ আর অফিমের সরবৎ দেয়া হয়, তাকে দুর্বল করার জন্যে। গৌরী জানত না সরবতে কি আছে, তবে, সরবৎ খেলে উত্তেজনা কমে, ঝিমুনি আসে ও। আনন্দের উত্তেজনায় বেসামাল হয়ে পড়ছিল, পর-পর দু'গেলাস সরবৎ খেলো ও।

ও জানে তিলক বাহাদুর এ সুযোগ ছাড়বে না। খোজা সর্দার কামরু দিল্লী থেকে তাকে গোপনে খবর পাঠিয়েছে। নেপালের তিলক বাহাদুর সম্রাটের সঙ্গে, দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করবে বলে সে শুনেছে।

গৌরীর উত্তেজনার শেষ নেই।

তিলক বাহাদুর আসছে। এ যুদ্ধে ফিরোজ শাহ-র জয় অবশ্যম্ভাবী। তিলক বাহাদুর নিশ্চয় হারেমে ঢুকে তার খোঁজ করবে। কিন্তু তাকে পাবে না।

না, তাকে আর পেতে পারে না। নেপাল-কন্যা গৌরী আজ আর গৌরী নেই, সে আজ নাইয়ার বেগম। পায়জামা, ঘাগরা, কাঁচুলী আর ওড়না চুণী-পান্না বসানো ছোট টুপির পেছনে আতরধূপে-ধোয়া চুলের লম্বা বিনুণী, সে আজ নাইয়ার বেগম।

ইলিয়াস শাহ-র উদ্যান-সঙ্গিনী হবে আজ। আজই তার কাজটি করবার দিন এসেছে।

D.N. SINGHA & CO.
HOWRAH CALCUTTA INDIA

CABLE – "RAINWATER"

We export to countries

THE UNITED STATES OF AMERICA
IS PURCHASING 300000 PIECES OF
'D.N.SINGHA & CO' BRAND CAST IRON
PIPES & FITTINGS PER YEAR.

and

THE UNITED KINGDOM
IS CONSUMING 100000 PIECES OF
'D.N.S.' BRAND CAST IRON MANHOLE
COVERS PER YEAR.

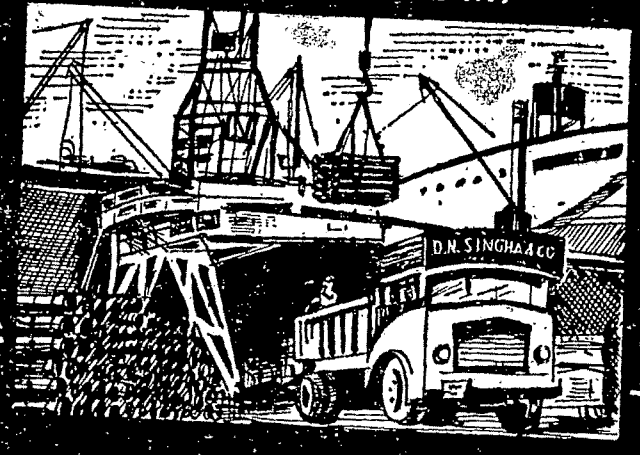

D.N. SINGHA & CO

AGENCIES ALL OVER THE WORLD

উদ্যান-প্রাসাদে ইলিয়াসের শেষ প্রেমোদ-রাত্রি আজ। পর পর তিনরাত্রি তার ডাক পড়েছে। ইলিয়াস শাহ তাকে ইনাম দিয়েছে প্রচুর তার যৌবনকে গত দু'রাত্রি নিঃশেষে লুটে নেবার চেষ্টা করেছে। বাধা দেয় নি নাইয়ার বেগম। আজ আর নাইয়ার বেগমকে দেখবে না ইলিয়াস শাহ্। আজ দেখবে নেপালের পাহাড়ি বাঘিনীর ভয়াবহ রূপ। শিরাজ—একটু শিরাজ পান করে যেতে হবে তাকে। উগ্র নেশায় সে আশ-পাশের সব ভুলে গিয়ে দুর্দম সাহস নিয়ে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বুকের তলা থেকে পেটটা চিরে দেবে—যেমন সে এক নেপালের মেয়ের পেট চিরে দিয়েছিলো তার চোখের সামনে।

বাঁদীকে অনেক বলে-কয়ে পুরো দু'-পিয়ালা শিরাজ পান করল গৌরী।

সন্ধ্যার পরে চারজন বাঁদী তাকে নিপুণ-হাতে সাজিয়ে দিলো। দু'খিলি পান মুখে ফেলে হারেমে শেষ দরওয়াজায় গিয়ে তাঞ্জামে চেপে বসল গৌরী।

তাঞ্জাম এসে পৌঁছোল উদ্যান-প্রাসাদে চাতালে।

নামলো গৌরী। ভেতরে ঢুকে দেখল বিরাট ফরাস, এই ফরাস আজ রক্তে ভেসে যাবে। স্পষ্ট দেখতে পেলো, ইলিয়াস শাহের বিশাল দেহটা ছটফট করছে ফরাসের ওপর আর তাজা জমাট রক্তে ফরাসটা লাল হয়ে উঠছে ক্রমে।

—সেলাম বেগম সাহেবা!

চমকে তাকালো গৌরী। একটি খোজা তাকে সেলাম করে দাঁড়াল।

মাটির দিকে তাকিয়ে জানালো শাহন্‌শা তাকে সেলাম জানিয়েছে। উদ্যানের-শিলাসনে বিশ্রাম করছে।

গৌরী চলল তার সঙ্গে।

কিছু দূর গিয়ে দেখল বিরাট গোলাপ-বাগের মাঝখানে ছোট একটি স্বচ্ছ পুকুর। তার ঠিক ওপর শ্বেতপাথরের একটি বড় আসনে ইলিয়াস শাহ্ বসে রয়েছে।

পেছন ফিরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বোধ হয় কোন গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে।

গৌরী একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। খোজা সেলাম জানিয়ে চলে গেল পাহারায়।

একদৃষ্টে ইলিয়াস শাহ্-র দিকে তাকিয়ে রইল গৌরী।

টাটকা শিরাজের প্রতিক্রিয়ায় মাথার রগগুলো দপদপ করছে। সুন্দর মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

না আর দেরি নয়। এই অবসর। এই সবচেয়ে বড় সুযোগ। এ সুযোগ হারান চলবে না।

পায়জামার তলা থেকে নিমেষে বার করে আনল খাপশুদ্ধ ছোরাটা। হাতলটা মুঠোয় খাপ থেকে খুলে খাপটা বাঁ হাতে এক গোলাপকুঞ্জের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

রক্তবর্ণ মুখখানি যেমে উঠল ওর।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এলো—একেবারে ইলিয়াস শাহ্-র পেছনে।

ছোরাশুদ্ধ হাতখানা তুলতেই বিদ্যুতের মত পেছন ফিরে ইলিয়াস শাহ ওর হাতখানা ধরে ফেলল।

মুখটা নীচু করতেই গৌরী দেখতে পেলো পুকুরের স্বচ্ছ জলে তার স্পষ্ট ছায়া। নিমেষে বুঝল গৌরী, তার ভুল হয়ে গেছে।

ইলিয়াস শাহ ভাগ্যবান। পুকুরে তার হাতের ছায়া দেখে ধরে ফেলেছে।

তবু শেষ চেষ্টা। নেপালের পাহাড়ি রক্ত তার শিরায় দুরন্ত হয়ে উঠল। ইলিয়াস শাহের হাতের কব্জীতে একটা ভীষণ কামড় বসাল গৌরী।

ইরানী শামসুদ্দীন ইলিয়াস অসামান্য শক্তিধর। বিরাট দেহখানা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গৌরীর গলা আর তলপেট চেপে ওকে বেঁকিয়ে ফেলল। হাঁটুর ওপর বেঁকিয়ে রেখে ছোরা বার করল।

গৌরী চেঁচাবার চেষ্টা করল—আজ বেঁচে গেলে, কিন্তু ফিরোজ শাহ তোমার কবর খুঁড়তে আসছে।

—শয়তানী, হারামী-কা-বাচ্ছা—!

বলতে বলতে ইলিয়াস শাহ গৌরীর গলাটা কেটে ফেলে ওকে উঁচু করে তুলে ধরে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ঝুপ করে একটা শব্দ হোল।

বিশাল দেহ নিয়ে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ পুকুরে সে জায়গাটায় অনেকগুলো বুদ্বুদ উঠে ক্রমে জলটা লাল হয়ে এলো। নেপালের পাহাড়ি মেয়ের তাজা রক্তের দিকে তাকিয়ে ইলিয়াস শাহ ভাবল, বাংলার জলকাদা-মাটি এমনি করে রক্তাক্ত হয়ে উঠবে।

ফিরোজ শাহ-র কাছে তার নিস্তার নেই। ইলিয়াসের ঘর্মাক্ত মুখখানা বড় করুণ।

পাণ্ডুয়ার সন্ধ্যার আকাশটা আজ যেন বেদনায় নীল হয়ে গেছে।

চর্মশিল্পে যুগান্তর আনিয়াছে "শিল্পশ্রী"র শিল্প-সম্ভার

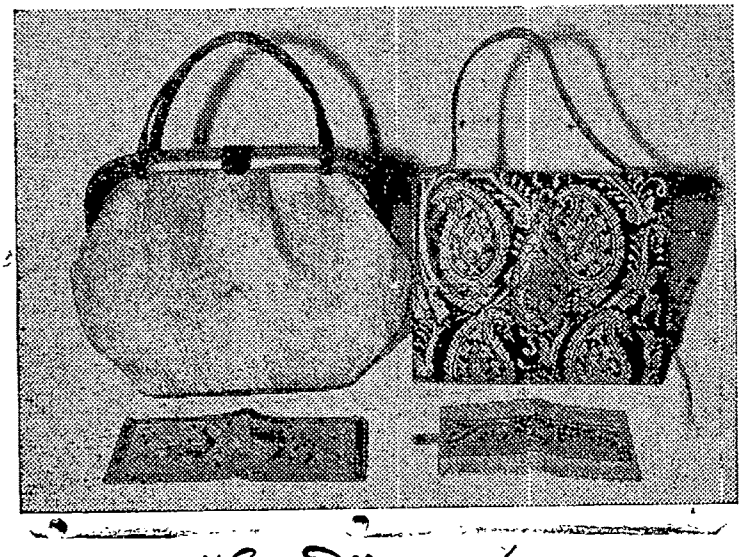

"শিল্পশ্রী" ওয়ার্কস

উপরের বাঁদিকের ব্যাগটা নারিকেল গাছের ছোবড়া হইতে অতি আধুনিক ভাবে তৈয়ারী।
যে কোন সৌখীন চামড়ার কাজ—মণিব্যাগ, ওয়ালেট, বুক-কভার, ডায়েরী-কভার যা চান পাবেন।

৭ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন: ৩৪-৩৭৩৪ :: গ্রাম: যাদৃশী, কলিকাতা

মুক্তি

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

'ঠাঁই নাই'। ভয়ানক ভিড়। গ্রীষ্মের লেলিহান গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে কেউ গেছেন মুসৌরী, ডালহৌসি, রাণী খেত। কেউ বা দেরাদুন, সিমলা, কসৌলী। দেরাদুন, মুসৌরীর বহু যাত্রী গাড়িতে করে দু পাঁচদিনের জন্য এসেছেন হরিদ্বারে। তাই হোটেলে কোনো জায়গা নেই। সন্ন্যাসীদের আখড়াগুলো পর্যন্ত যাত্রীর ভিড়ে ভরে গেছে। কনখলে বার-পাঁচ-ছয় এসে উঠেছিলাম। সন্ন্যাসীবন্ধু জানালেন সকালের গাড়িতে কলকাতা থেকে কেদারবদ্রীর একদল যাত্রী এসে পড়েছেন। আশ্রমে তিলধারণের স্থান নেই। একজন আবার একটু ভৎর্সনার সুরে বললেন, এখনও দেখছি যেই ভবঘুরে সেই ভবঘুরেই রইলে। একটু জানিয়ে আসতে পারো না। ডাকঘরগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কি?

তাই তো। একখানা চিঠি লিখে এলে এতো হাঙ্গামা পোয়াতে হত না।

সত্যি কথা।

এরা সবাই ঠিকই বলছেন। আমি যে এইটুকু জানি না তাও না। আসল কথা হল প্ল্যান-পরিকল্পনা করে বেড়ানো যায় না। সরকারী টুর করা হয় তো চলতে পারে জল্পনা-কল্পনা করে বেড়িয়ে বেড়ানোর সুখ অর্ধেক কমে যায়। শুধু তাই নয়। অধিকাংশ সময়েই সে কল্পনা কেঁচে যায়। বেড়ানো আর হয়ে ওঠে না। কার্শিয়াঙের পাহাড়ের মেঘখণ্ডের মতন যখন-তখন এলোমেলোভাবে আকাশে, ঘরে, ঘুরে খানিকটা বৃষ্টি ছড়িয়ে যাবার মতন হঠাৎ বেরিয়ে পড়ার নেশায় একটা অপরূপ মাধুর্য আছে যেটা শুধু অনুভবই করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত।

হোটেলে জায়গা নেই। আশ্রমে জায়গা নেই। ভোলা গিরির ধর্মশালায় জায়গা নেই। বিষ্ণুমন্দিরের সরাইখানা লোকে লোকারণ্য। কোথায় যাই?

সবাই বললেন গঙ্গার তীরে একটা বৈষ্ণবদের আখড়া আছে। বাঙালীদের প্রতিষ্ঠান, চেষ্টা করে দেখুন না কেন।

ধীরে ধীরে রিক্সায় বসে যেখানে হাজির হলাম, সেটা গঙ্গার কিনারায় বললেও নেহাৎ ভুল হবে না। শত-শত তীর্থযাত্রীর দল চব্বিশঘণ্টা মঠের সামনে দিয়ে যাচ্ছে 'হর কি পৌড়ী'তে স্নান করতে। হরিদ্বারের সবচেয়ে বড় ঘাট হলো হর কি পৌড়ী।

আখড়াটি ছোট হলেও অনুপম। সাদা রঙ। স্নিগ্ধ ভাব।

মোহন্ত এগিয়ে এলেন। আমাদের দিকে না তাকিয়ে দূরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, কৃষ্ণের জীব এসেছো। জায়গা না থাকলেও করে দিতে হবে বৈকি। সত্যি কথা ঘর খালি নেই। গ্রীষ্মকাল। তোমরা আমার ঘরেই থাক। আমি নাটমন্দিরের বারান্দায় চলে যাচ্ছি।

হাতে স্বর্গ পেলাম। সন্ন্যাসীকে কষ্টে ফেলার জন্য মনে মনে একটু বেদনাও জাগল।

দু-একদিনের ভিতরই সবার সাথে পরিচয় হয়ে গেল। উজ্জ্বল কাঞ্চন রঙের সন্ন্যাসিনী কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। সেটা যে আমি লক্ষ্য করেছি, সেটা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। অসম্ভব তীক্ষ্ণদৃষ্টি, উজ্জ্বল চোখ, স্বর্ণোজ্জ্বল দেহের রঙ।

হর কি পৌড়ীর কাছেই মনসা পাহাড়। গঙ্গার ওপারে চণ্ডী পাহাড়। চণ্ডী পাহাড়ের মন্দিরটি হাজার দু-এক বছরের পুরোনো। কয়েক বছর আগেও জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে খেয়া-নৌকোয় প্রবল স্রোত ঠেলে ওপারে যেতে হত। কুম্ভমেলার সময়ে যে পাকা ব্রীজ তৈরি হয়েছে তার কল্যাণে তীর্থযাত্রার পথ সুগম হয়েছে। যাত্রীর সংখ্যা তবুও পূর্বেই বোধ হয় ছিল বেশি।

দূর থেকে দেখা যায়, লাল রঙের নিশানগুলো। পথিকের পথ-প্রদর্শনের সহায়ক। এই চণ্ডী পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অঞ্জনার মন্দির।

অঞ্জনা।

পথে ছোট একটা প্রাচীন কালীমন্দির।

পাহাড়টার নাম অঞ্জনা পাহাড়। কেউ বলেন চণ্ডী পাহাড়। পুরোনো সন্ন্যাসীরা বললেন, এর নাম নীল পর্বত।

গভীর জঙ্গল। জঙ্গলে বন্য পশুর ভিড়। চণ্ডীদেবীর মন্দিরে গভীর রাতে রোজ একটা বিরাটাকারের বাঘ আসে। যাত্রীদের তাই সন্ধ্যার পূর্বেই নীচে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে।

চণ্ডী পাহাড়ে বহু লোক আপন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্য প্রার্থনা জানায়। সবার প্রার্থনাই পূর্ণ হয়। এদের একাধিক যাত্রীর সাথে এখানে একাধিকবার দেখা হয়েছে। তাদের মুখেই শুনেছি। তারকেশ্বরে যেমন তীর্থযাত্রীর দল ইঁট বেঁধে রাখেন, এখানে মানত করার পন্থা প্রায় সেই

রকমই। ইটের বদলে লাল নিশান। যাঁর অভীপ্সা সিদ্ধ হয়, সে এসে একখানা করে ঝাণ্ডা উড়িয়ে যায়।

আখড়ার সন্ন্যাসিনী তখন মন্দিরে একা ছিলেন। যাত্রীর দল স্নান করতে গেছেন—বুদ্ধপূর্ণিমায় স্নান। মোহন্ত ঠাকুর বোধ হয় কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করছিলেন। এ সুযোগ ছাড়লাম না। সোজাসুজি সন্ন্যাসিনীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গেলেন না স্নান করতে? বুদ্ধপূর্ণিমার স্নান?

সন্ন্যাসিনীর জবাব শুনে হতবাক হলাম, পুণ্যের কথা বলছো? পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় তো বেরুই নি বাছা!

—সে কি?

সন্ন্যাসিনী সাধারণ রমণী নন।

আর একটা কথা। এ মুখ আমার পরিচিত। কোথায় কবে দেখেছি ঠিক মনে পড়ছে না। তবে যতদূর মনে পড়ছে কোনো তীর্থস্থানেই। ঠিক এই বেশেই। তখনও এঁর মুখের জ্যোতি এরকম দীপ্তিময়ই ছিল।

মার্জিত বাংলা বলেন। উচ্চারণভঙ্গী স্পষ্ট। কণ্ঠস্বর মধুর। কারুর ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

ঠিক পুণ্যের আশায় নয়, তবুও উত্তর ভারতের অনেক পুণ্যভূমিতেই বেড়াবার সৌভাগ্য ঘটেছে। কবে তারই কোন্ তীর্থক্ষেত্রে এ অপরূপ লাবণ্যবতীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, সেইটেই ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না কেন?

সন্ন্যাসিনী নিজেই সন্দেহ ভাঙ্‌লেন।

আমাকেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা পরিব্রাজক, বলো তো তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি আগে?

আমি বললাম, ঠিক ঐ প্রশ্নই আমার মনে এতক্ষণ ধরে ঘুরছে। বলুন তো কোথায় দেখেছি আপনাকে?

বৈষ্ণবীটি জোগাড় করলে কোত্থেকে? কবে? আগে তো দেখি নি তোমার সাথে।

ট্রানজিসটারের বাংলা বই
বিনা সাহায্যে সেট নির্মাণ করুন
প্রাকটিক্যাল ও থিওরিটিক্যাল
বেতার তথ্য (প্রতি খণ্ড) ১০৲
১ম ও ২য় খণ্ডে—ভালভ সেট নির্মাণ
৩য় খণ্ডে—ট্রানজিসটর সেট নির্মাণ
ভি-পি-তে ২৫% অগ্রিম দেয়
শীল রেডিও ঃ- ১৪, দুর্গা পিথুরী লেন, বহুবাজার, কলিকাতা-১২

বললাম, ঠিকই বলেছেন। চলার পথে সহযাত্রীর দলে উনি কবে এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করি নি। আজকাল ওঁকে ছাড়া কোথাও মন টেকে না।

এ যে একেবারে ঠিক আমার দশা!

সন্ন্যাসিনীর স্বগতোক্তিতে চমকে উঠলাম।

বললাম, কৈ বললেন না তো কোথায় আমাদের দেখা হয়েছে?

আজও চোখ বন্ধ করলে···

সন্ন্যাসিনী বললেন, কে জানে বাবা? জীবনটাই একটা পুতুলখেলা। তবে হ্যাঁ অনেক সময়ে হঠাৎ দেখা লোককে যখন অত্যন্ত চেনা বলে মনে হবে, জানবে এর ভিতর পূর্বজন্মের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

মনে মনে বললাম, এ যে হেঁয়ালি গাইছে!

বললাম, পুণ্যসঞ্চয়েও বাসনা নেই। ভ্রমণেও বিশেষ আকর্ষণ আছে বলে মনে হচ্ছে না তবে এ বৃথা ছুটোছুটি কেন? যতদূর মনে পড়ছে কুরুক্ষেত্র স্টেশনে বা থানেশ্বরের মন্দিরে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। ট্রেন ফেল হওয়াতে আমরা অনেকক্ষণ আটকা পড়েছিলুম। বলুন ঠিক কি না?

সন্ন্যাসিনী বললেন, নিশ্চয়ই তাই হবে। তোমাদের স্মৃতিশক্তি প্রবল। আমার আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। কে জানে কবে কোন্ পথে-ঘাটে অজ্ঞান হয়ে কবে পড়ে থাকব?

কিন্তু কেন? কেন এ বৃথা শ্রম? বলতে আপত্তি আছে? একান্ত ব্যক্তিগত না হলে বলুন না কেন এ বৃথা ছুটোছুটি?

তোমার কতটুকুই বা বয়স। জীবনের কিই বা দেখছো? কিই বা জেনেছো? তবে শুধু জেনে রেখো, যতটা সহজ মনে করছো জীবন-প্রবাহ ঠিক ততটা সহজ নয়। এতে জোয়ারের সাথে সাথে যেমন ভাটা আসে, তেমনই আসে বদ্ধভাব। আমার জীবনে এসেছিল।

সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। বর্ধমানের ছোট্ট একটা গ্রামে আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী দেখতে ছিলেন অপরূপ রূপবান।

বৃদ্ধার স্বর্ণোজ্জ্বল গালে রক্তিম আভা ডালিমফুলের মত জলজল করছিল।

সত্যি বলতে কি ছোটবেলা থেকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতন আমিও মহাদেবের পূজো করে এসেছি। ছোট বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর একটা সমস্যা দেখা দিল। চোখ বন্ধ করে মহাদেবের পূজো করতে বসলে আর পূজোয় মন বসে না। চোখ বন্ধ করলেই আমি যেন আমার স্বামীকে দেখতে পাই।

বলেই সন্ন্যাসিনী চোখ বন্ধ করলেন। দু-এক ফোঁটা জলই বোধ হয় পড়ছিল চোখ দিয়ে। সেটা আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন। আজও তাই। আজও চোখ বন্ধ করলে আমার স্বামীর হাসিভরা মুখটুকুই চোখে ভাসে।

বেশ চলছিল সংসার।

স্বামী খুবই ধর্মপরায়ণ, পণ্ডিতলোক ছিলেন। নিরীহ, স্বল্পভাষী। আমার সাথে কথা-বার্তা বলতেন। বুঝতেই তো পারছো, একে পাড়াগাঁ, তারওপর যৌথ-পরিবার। সেখানে অবসর কোথায়?

হঠাৎ একদিন গ্রামময় রটে গেল মদন-গোপাল পণ্ডিত সন্ন্যাসী হয়েছে। ক'দিন থেকেই উনি বাড়িতে ছিলেন না। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে। আমিও ভেবেছি নিশ্চয়ই যজমানের বাড়িতেই গিয়েছেন। এই আংটিটুকু ঐ যজমানের দেওয়া টাকা দিয়েই কিনে একদিন লুকিয়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন। কি করে জানবো আমার কপাল ভেঙেছে। আমার স্বামীর নামই ছিল মদনগোপাল। গ্রামের মেয়েরা, বউ-ঝির দল দল বেঁধে এসে সমবেদনা জানালো। তখন আমার সুশীতলের বয়স ছ' মাস। সুশীতল আমার ছেলের নাম।

এক দুই করে বছর দশ-বারো কেটে গেল। ছেলে দেখতে দেখতে বালক থেকে কিশোরে দাঁড়ালো। অবিকল তার মুখ।

এর ভিতর একদিন বাড়ির সবাই মিলে আমার হাতের শাঁখা লোহা খুলে দিল। সিঁথির সিঁদুর মুছে দিল। আমি সবাইকে বললুম, আমি জানি সে মরে নি। তোমরা আমাকে ও বেশ পরিয়ো না। তারা কেউ

বিশ্ববিখ্যাত
জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব তন্ত্র বিশারদ

বাজজ্যোতিষী এম্ আর এ এস্ (লণ্ডন) প্রেসিডেন্ট অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ) ইনি দেখিবামাত্র মানব জীবনের

(জ্যোতিষ সম্রাট)

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী (অর্থাৎ **ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভার** মনীষীগণ) কর্তৃক প্রশংসিত।

বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ।

ধনদা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয়। (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য) সাধারণ ব্যয়—৭৷৷৶০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৷৶০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৷৶০

সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯৷৷৵০, বৃহৎ—৩৮৷৷৵০ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। ব্যয় ৯৵০ বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৵০, মহাশক্তিশালী—১৮৪৷০। (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। **মোহিনী কবচ** ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়, ১১৷৷০, বৃহৎ ৩৪৵০ মহাশক্তিশালী ৩৮৭৮৵০

গুণমুগ্ধ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি.

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হাঁর হাইনেস মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্যকুমার মুখার্জ্জী, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার ফজলআলী কে-টি, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ জে, পি, মিত্র।

প্রশংসাপত্র সহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। হেড অফিস—৫০—২, (ব) ধর্মতলা ষ্ট্রীট (প্রবেশ পথ ৮৮.২, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন", কলিকাতা—১৩। ফোন: ২৪-৪০৬৫। সময়—বৈকাল ৫টা—৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস—** ১৪৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫ ফোন: ৫৫-৩৬৮৫। সময়—প্রাতে ৯টা—১১টা।

মানল না। বারো বছর পর নাকি বিধবার নিয়ম মানতে হয়।

ধীরে ধীরে বুঝলাম সংসারে আমাদের জায়গা শুধুমাত্র পরগাছার মতন। ছেলেটি কিন্তু খুবই মেধাবী ছিল। ঠিক তার বাপের মতনই। যে স্বামীকে দেবতার মতন ভালবাসতাম, মনে মনে তার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের ভাব জন্মাল। কেন জানি না। একথা তুমি ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রাণীটিও জানে না। আমার ছেলে সুশীতলও নয়। এই বারো-তেরো বছর শুধু পড়াশুনোর ভিতরই কাটিয়েছি। কেন জানি পুজো-অর্চনায় আর মন টিকতো না, মন বসাতে পারি নি। মনে হলো এই ছেলেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই আমার জীবন হবে সার্থক। আমার আর কোনো ধ্যান-ধারণা পূজা-অর্চনা বলে কিছু রইলো না। শুধু ঐ সুশীতল।

তোমাকে আগেই বলেছি যজমানের কাছ থেকে পাওয়া টাকা থেকে তিনি আমাকে কিছু গয়না করিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও কিছু গয়না ছিল। সামান্য কিছু টাকাকড়িও ছিল।

সুশীতলের হাত ধরে ভিটে-বাড়ি ছেড়ে আমি কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ একাকিনী। কি বলবো তোমাকে—মানুষের বাড়িতে রান্না করেছি। বড়লোকদের বাড়িতে মেয়েদের সেবা করার চাকরী করেছি। নীরবে তাদের লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। তুমি ছেলের মতন, বলতে লজ্জা করে, শয়তানের লোভাতুর দৃষ্টিতে বাড়ির পর বাড়ির চাকরী বদলেছি। শুধু জীবনের একটি স্বপ্নকে রূপ দিতে।

সুশীতল বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনো করেছে। যেদিন সে প্রথম স্কলারশিপের টাকা এনে হাতে তুলে দিল, সে রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। যেন কাকে খুঁজেছি দু' চোখে এপাশে-ওপাশে। শুধু বলতে চেয়েছি, দাঁড়াব, জীবনে দাঁড়াব, তোমার ছায়া ছাড়াও রৌদ্রতাপে এ কোমল চারাটুকু মরে নি। কিন্তু তাকে কাছে পাই নি।

রূপের মোহে একটি প্রাণীকে কাছে টানতে পারি নি, সেই রূপের জন্যই শহর ছাড়তে হলো। গ্রামে ফিরে দেখলাম এখানে আর প্রবেশাধিকার নেই। তারা বলল, তুমি স্বামীর ভিটে ছেড়ে শহরে পালিয়েছো, তুমি কুলটা। আবার এলাম শহরে। তা ছাড়া ছেলেকে শহরে রেখে প্রাণটাও আই-চাই করে। কোথাও টিকতে পারি না দু' প্রহর।

শহরে এসে শুনলাম সুশীতল ডাক্তারী পড়বে। সবাইমিলে জানাল খরচ নেহাৎই কম। বৃত্তির টাকাতেই হয়ে যাবে। বই কেনা, বোর্ডিং-এর খরচ জোগাড় করলেই হয়ে যাবে।

আবার চাকরী নিলুম। বড়লোক না হলেও, নেহাৎ দরিদ্র কোন কালেই ছিলুম না। বাসন পর্যন্ত মাজতে হয়েছে। না হলে অতগুলো টাকা দেবে কেন?

ছেলের অধ্যাপকদের সামনে পর্যন্ত কোনদিন দাঁড়াই নি ভয়ে। ছেলের সম্মানে আঘাত লাগতে পারে না কি?

সেই ছেলে দাঁড়িয়েছে।

শুধু কলকাতা থেকে নয়, সে বিলেত থেকে পাশ করে এসেছে ডাক্তারী। আজ শহরের সে একজন নামকরা ডাক্তার। যথেষ্ট পসার। আমি আজ তীর্থে তীর্থে যে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার খরচও সেই ছেলেই জোগাচ্ছে। তবে সে জানে না আমি কেন ঘুরছি। সে চায় তার মায়ের পুণ্যসঞ্চয়।

মনে পড়লো সকালেই শ্রীমতী বলছিলেন, 'জানো গো এ ছুরি সন্ন্যাসিনী মাসির ছেলে বিলেত থেকে কিনে পাঠিয়েছিল। বিশ্বাস হয়—ওঁর ছেলে বিলেত ফেরত?

বলেছিলুম, কেন হবে না?

এবার মনে পড়েছে শুধু কুরুক্ষেত্রই নয়, তোমার সাথে তারকেশ্বরেও আমার দেখা হয়েছিল। মনে পড়ে?

বললাম, আপনার কি মনে হয় তিনি আজও বেঁচে আছেন?

কি বলছো তুমি? মনে হয় মানে? আমি জানি তিনি জীবিত। আমার মন বলে মৃত্যুর আগে তাঁর সাথে আমার নিশ্চয়ই দেখা হবে। তীর্থে তীর্থে শুধু তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুধু এইটুকুই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মুক্তি পেয়েছো কি? মুক্তি?

বললাম শুধু এরই জন্য এত পরিশ্রম?

—বলো কি তুমি? এটা কি সামান্য জিনিস? দু'টো মুক্তির স্বাদই যে পেয়েছে, সেই বলতে পারে কোনটা ভালো? আমার জীবনে আমি নিশ্চয়ই পেয়েছি মুক্তি। বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আমার আর কিছুই নেই। তাঁকে শুধু একটিবার জিজ্ঞাসা করতে চাই—তাঁর জীবনে তিনি পেয়েছেন কি মুক্তির স্বাদ?

প্রভাত দেবসরকার

চৈত্র-দুপুরের নিশ্বাসটা ক্রমে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে; ধুলো উড়ছে ঘূর্ণি হয়ে গ্রাম-পথ-সীমায়; দূরে কোন মুকুলিত আম্রশাখায় কোকিল ডাকছে। গ্রামটা দুপুর-রাতের মত নির্জন, খাঁ-খাঁ ক'রছে।

হঠাৎ চড়বড় ক'রে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো। কিছু সময়ের জন্যে গ্রামটা মুখর হল। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ল। তখন পূজো-পার্বণ উপলক্ষে গ্রামে বাজনা-বাদ্যি বাজতো। নিরঞ্জন মাকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ঢাক বাজছে, মা?

নিরঞ্জনের মা বললেন, ধারের বাড়িতে পূজো হচ্ছে! আজ অন্নপূর্ণা পূজো!

নিরঞ্জন বললে, ওঁরা এখনো পূজো করেন? কেউ তো নেই ও বাড়িতে!

মা বললেন, মেয়েটা কিন্তু এসে বছরে বছরে পূজো করে যায়! শহরে বাস করলেও বংশের আচার-অনুষ্ঠান ভুলে যায় নি! পাল-পার্বণ বজায় রেখেছে।

তবু গ্রাম নিভে আছে। এক ঢোল এক কাঁসিতে কত আর গ্রাম জাগবে! সতী-ই বা বাপের পূজো বজায় রেখে কতদিন গ্রামে আসতে পারবে? আজও বিয়ে হয় নি তাই—

দুঃখ ক'রে মা বললেন, আর ওরই এমনি বরাত, এখনো একটা বর জুটলো না!

নিরঞ্জন বললে, অত পূজো করলে কখনো বর জোটে? আজকাল বরেরা অত বোকা নয়!

চালাকও নয়! ওর বাবা তো বিষয়-সম্পত্তি কম রেখে যায় নি—ঐ একটিমাত্র মেয়ে! মা আপশোষ করলেন।

তার ওপর সতী দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। এই কিছুদিন আগেও সতীর বিয়ের বয়স নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বেশ আলোচনা হত। সতীর মা 'রাজপুত্রের সন্ধানে' মেয়েকে বুড়ি করে ফেলেছে, সতীর যা 'ছিরি খুলেছে' আর বিয়ে হবে না, 'বিয়ে আর হয় না অত বাছতে গেলে!' 'ভগবান তা হ'লে মেয়ে না করলেই পারতেন' ইত্যাদি।

সেইসঙ্গে সতীর মায়ের বিয়ের কথাও উঠতো। সে নাকি আর এক কাণ্ড, ইতিহাস! সতীর মা উজ্জ্বল বর্ণাও নন, সুন্দরীও নন। টাকার থলি সামনে ধরে তবে সতীর বাবার বিয়েতে মত করান গিয়েছিল! সতীর দাদামশাই পুরো পাঁচ বছর ধরে ধরপাকড়, কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। সহজে হয়েছে অমনি?

ছেলেবেলায় নিরঞ্জনরা অনেক শুনেছে! এবাড়ি-ওবাড়ি আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে, শিক্ষিত বেকার ছেলেদের চাকরি নিয়ে তখন মায়েরা অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করতেন; হতাশায় ক্ষোভে দুঃখে ভাগ্যকে দোষ দিতেন। একটি মেয়ের যথাসময়ে বিয়ে কি একটি ছেলের যথাসময়ে চাকরি, সে-সময় মধ্যবিত্তের আশার অতিরিক্ত ছিল! যেন একটি গোপন পাশাকে গৃহস্থরা নানা ছলে আড়াল ক'রে রাখতো—অনেক ভয় অনেক সংশয় ছিল তা প্রকাশ করার। লজ্জাও।

আজ সে-সময় হয় তো নেই, সে সমস্যাও না। কিন্তু তার মর্মবেদনা ঠিকই আছে। সতীর মত যে-সব মেয়েরা সে-সময় পেরিয়ে এ-সময়ের উপযুক্ত হতে পারি নি, তাদের কি হবে? বিগত-যৌবনের কোন্ বরাভয় ওদের আছে?

মা বললেন, একটা ছেলে দেখিস না, তোদের তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে!

নিরঞ্জন অবাক হল। জ্ঞাতি সম্পর্কে একটি অনূঢ়া মেয়ের জন্যে মা'র হঠাৎ ভাবনা কেন? তা ছাড়া মেয়েটি মেলামেশায় তাদের খুব নিকটও নয়। বছরে একবার কি দু'বার গাঁয়ে আসে, বিষয়-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ ক'রে চলে যায়! নিরঞ্জন বললে, ওর মামারা তো আছেন! তাঁরা দেখতে পারেন না?

দেখলে আর এতদিনে মেয়েটার বিয়ে হয় না! মা দুঃখ করলেন, আমার খুকীর চেয়ে বড় মেয়েটা, তারই তিনটে ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেল!

নিরঞ্জন বললে, তোমরা বর দেখে দিলে ওর পছন্দ হবে কেন?

মা বললেন, হবে। তুই দেখিস্ না, এখনো দেখতে যা আছে তাতে পছন্দ হবে। না হয় বয়েসওলা বর হবে—ওকে আমি—

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তে মা থেমে গেলেন। নিরঞ্জন চেয়ে দেখলে, সতী কেমন যেন ইতস্তত ক'রছে ঘরে ঢোকবার জন্যে।

মা ডাকলেন, আয় ভেতরে আয়।

একটু অপ্রস্তুতের মত চাবিটা হাত বাড়িয়ে নিল ···

a beautiful woman's constant companions

are not her family and friends,
her near and dear ones,
but her box of beauty aids
which help her to look beautiful
anytime, anyplace — always and forever.
ask her and she'll tell you ...
her constant companions are

AFGHAN SNOW
BEAUTY AIDS

afghan nail polish

kiss of fire lipstick

afghan face powder

afghan snow

E. S. PATANWALA, BOMBAY-77. (INDIA)

সতী মাথা নীচু ক'রে ঘরের মধ্যে এল। মা'র পাশে বসল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কবে এলি?

সতী অস্ফুটে বললে, পরশু এসেছি!

নিরঞ্জন লক্ষ্য করলে, সতী কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। কত যেন তার সঙ্কোচ! এ সতীকে নিরঞ্জন চেনে না।

মা বললেন, কিছু বলবি?

এবার সতী অভিমান করলে, পূজো-বাড়িতে আপনারা কেউ এলেন না! আপনারা না এলে—

নিরঞ্জন ফস্ করে বললে, নেমন্তন্ন না করলে লোকে যায় কি করে?

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, না রে না, সময় পাই নি—এই এবার যাব!

সতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে, বাড়ির লোকদের নেমন্তন্ন করতে হয় জানতুম না! কোনদিন তো নিজে করি নি পূজো—

মা হেসে বললেন, না না, তুই ওর কথা শুনিস্ নি! ওই বলে তোকে রাগাচ্ছে!

সতী মুখ নীচু করে বললে, কোন অন্যায় হলে আপনারা মানিয়ে নেবেন কাকীমা, দেখছেন তো মাথার ওপর কেউ নেই!

কথাটা হঠাৎ বড় করুণ শোনায়। নিরঞ্জন অপ্রস্তুত বোধ করে। নিমন্ত্রণের কথাটা তার তোলা উচিত হয় নি। সামান্য নিয়মরক্ষার পূজো! বেচারী কি করবে, মা নেই, বাবা নেই, দেখাশোনারও কেউ নেই!

আপন উক্তির প্রত্যাখ্যান ক'রে, নিরঞ্জন মাকে তাড়াতাড়ি বললে, মা তুমি এখুনি যাও! আমি গুছিয়ে নিয়ে যাব'খন।

মা বললেন, তোর জন্যেই তো আমার দেরি হয়ে গেল! কেবল চেঁচামেচি করবি তো!

সতী আড়চোখে নিরঞ্জনের দিকে চাইলে। কে বলবে একটু আগে জ্ঞাতি-শত্রু বলে লোকটাকে মনে হয়েছিল। এমন-ভাবে নেমন্তন্নের কথাটা তুলেছিল যেন মস্ত অপরাধ করেছে সে!

নিরঞ্জন বললে, চেঁচামেচি না করলে কেউ তোমরা মান? আর কতক্ষণ পরেই তো রওনা হতে হবে!

সতী বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় রওনা হবে রঞ্জনদা'?

কোথায় আবার, সেই কর্মস্থল কলকাতা! নিরঞ্জন কৌতুকের সুরে বললে।

কাল ছুটি নেই? সতী জিজ্ঞেস করলে।

কেন? নিরঞ্জন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

সতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, অন্নপূর্ণার ভাসান!

নিরঞ্জন হেসে বললে, অন্নপূর্ণারা যদি আবেদন করেন সরকার কি করবেন বলা যায় না। বলে আজই ছুটি নেই আবার কাল!

আর কোন প্রশ্ন না ক'রে সতী উঠে পড়ল। দোরগোড়ায় এগিয়ে গেল।

মা বললেন, তুই যা, আমি এখুনি আস্‌ছি।

নিরঞ্জন সুটকেশ গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললে, মা তুমি যাও আমি চললুম!

কি মনে করে মা বললেন, আজ নাই বা গেলি, কাল ভোরে উঠে যাস!

নিরঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, না না, সে বড় অসুবিধে হয়। কেন আজ রাতটা থাকলে তোমার কি সুবিধে হয়?

মা বললেন, সুবিধে আর কি! আবার কবে আসবি?

প্রতি সপ্তাহে তো আসছি! আরো আসতে বল? নিরঞ্জন মা'র মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজলে।

মা মাথা নাড়লেন। তিনি জানেন, ছেলের কাছে কাছে থাকা সম্ভব নয়। শহরে

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়
সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা - উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে: 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের কালি
ব্লু ব্ল্যাক, রয়েল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৫০ ও ৭০০ এম এল সাইজে পাওয়া যায়

প্রস্তুতকারক: সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

তিনি থাকতে রাজী নন, শহরে বাসা করার প্রস্তাব তিনিই অনেকবার বাতিল করেছেন। এই গাঁয়ের বাড়িতে ভিটে আগলে থাকতে তাঁর ভাললাগে। নিরঞ্জনও পেড়াপিড়ি করে নি। সে শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি থেকে সারা সপ্তা অফিস করে, শনিবার দেশে আসে, মাকে দেখে পরের দিন ফিরে যায়। এই চলছে কয়েক বছর। একদিক থেকে ব্যবস্থাটা নির্ঝঞ্ঝাট!

ঘরের বাইরে এসে মা ডাকলেন, আয়! যাই একবার মেয়েটার কাছে।

নিরঞ্জন সুটকেশ হাতে, বাইরে এসে দাঁড়াল। ওবাড়িতে বাজনা থেমেছে, স্তব্ধ দুপুরের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আছে। বহুকালের পুরনো বাড়ির পাঁজরাগুলো যেন কাঁপছে। ছাতের কার্নিশে অশ্বত্থ ছায়ার পাতা তির-তির করছে। গ্রাম ছেড়ে তাদের পরিবারের প্রায় সবাই চলে গেছে। নতুন গ্রাম গড়ার পরিকল্পনায় পুরনো প্রাণ সব উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

ইচ্ছে করলে মাকে নিয়ে সেও শহরে থাকতে পারে। তার দায়িত্ব কিছু নেই, মা আর ছেলে! চাকরি খুব খারাপ করে না সে। কিন্তু—

মা ঘরের দোরে তালা-চাবি লাগালেন। সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিরঞ্জন তখনো দাঁড়িয়ে, কি যেন সে ভাবছে!

মা পিছন দিয়ে ডাকলেন, আয়! আছিস যখন ওবাড়ির ঠাকুরটা দেখে যা!

হঠাৎ যেন খুবই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে নিরঞ্জন, বললে, ঠাকুর-ফাকুরে আমার বিশ্বাস নেই। আমি চললুম।

নিরঞ্জন প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। ধারের বাড়িতে বোধ হয় পূজোর আরতি আরম্ভ হল। ঢাকঢোল বেজে উঠলো!

পূজো, যাত্রাগান, উৎসব সব একসঙ্গে হতো। পারিবারিক বলে গণ্য হতো, বনতুলসী গ্রামে বোসেদের পূজো; কত তার নাম গ্রামান্তরে!

সেদিন আর নেই। ক্রমে সে পূজো ভাগাভাগি হয়ে গেল, যে যেমন পারলে নিজের নিজের পূজো অনুষ্ঠান করলে; কিন্তু কারও পূজো আর বজায় নেই, সামর্থ্যে কুলোয় নি। কেবল ধারের বাড়ির এই পূজোটা এখনো চলছে। বাপের কীর্তি মেয়ে বজায় রেখেছে। অথচ ওরই না করবার কথা! বাপ মরলো, মা মরলো, কি সুখে ও অন্নপূর্ণা পূজো করছে ঢাকঢোল বাজিয়ে কে জানে!

সতীর বাবা যখন অন্নপূর্ণাপূজো আরম্ভ করেন, তখন জ্ঞাতিরা বলেছিল, পয়সা হ'য়েছে তাই অন্নপূর্ণাপূজো করছে। জানতে বাকি নেই কিসের অত পয়সা!

কৃপণ কুশীদজীবী বলে নাম ছিল সতীর বাবার! তা না হলে পয়সার জন্যে অমন একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে—কুৎসিৎ ছিলেন সতীর মা, সতীর বাবা কার্তিকের মত।

ওঁদের সন্তান সতী একটু ভিন্ন ধরণের হয়েছিল। জ্ঞাতি-গোত্র আর পাঁচটির মত সতী কোনদিনই নয়। সমবয়সী না হলেও নিরঞ্জন ওকে খুব কমই ছেলেবেলায় দেখেছে। জ্ঞাতিরা তখন গ্রামে সবাই ছিল, বলতো, অহঙ্কার! বাপের পয়সা আছে, দাদামশাই বড়লোক, কলকাতায় বাড়ি আছে—

তখন বেশ ফুটফুটে ছিল সতী। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে কখনো-কখনো বাইরে আসতো, মাটিতে পা দিত টিপ টিপে খুব সাবধানে, ফুলবাগানে গিয়ে একটি-দু'টি ফুল সন্তর্পণে কুড়তো কি কুড়তো না।

বনতুলসীর বোসেরা সুন্দরের বংশ নয়; তার মধ্যে সতীকে সুন্দরীই মনে হতো। ওর মা দেখতে যাই হোক, মেয়ে দেখতে ভাল। সেই ছেলেবেলায়, তারপর আর

মনে পড়ার মত কখনো সাক্ষাৎ হয় নি নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন একটু অপ্রস্তুতের মত চাবিটা হাত বাড়িয়ে নিলে।

অদূরে দাঁড়িয়ে সতী বললে, কাকীমার আসতে দেরি হবে, আপনি ততক্ষণ ঘর খুলে বসুন!

তারপর? নিরঞ্জন কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সতী জিজ্ঞেস করলে, কিছু বলছেন?

ঘরে ঢুকে সুটকেশ নামিয়ে নিরঞ্জন বললে, পূজো বুঝি এখনো হচ্ছে!

সতী বললে, না, শেষ হয়ে গেছে!

এরই মধ্যে? গলার স্বরটা কেমন যেন নিরঞ্জনের।

সতী হাসলে, অন্নপূর্ণাপূজো আর কতক্ষণ ধরে হয়?

কে জানে? সেই কবে দুর্গাপূজো দেখেছি, ওসব তো দেখি নি কোনদিন—নিরঞ্জন অজ্ঞতা স্বীকার করলে।

আপনি তো কোনদিন আসেন না আমাদের পূজো দেখতে; সতী যেন সুযোগ পেয়েছে অভিযোগের।

আসবো কি, ছুটি থাকলে তো! ছুটি-ওয়ালারা অন্নপূর্ণাকে স্বীকারই করে না! নিরঞ্জন কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বললে।

ছুটি নিলেও তো আসেন না! সতী অভিমান করলে।

নিরঞ্জন হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দিতে বললে, পূজো-টুজো আমার তেমন ভাল লাগে না!

ওবাড়িতে আবার ঢাকঢোল বেজে উঠল।

নিরঞ্জন বললে, ওকি? এই বল.ল পূজো শেষ হয়ে গেছে!

ম্লান হেসে সতী বললে, বিসর্জনের বাজনা!

নিরঞ্জন বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, তারও বাজনা? মজা তো!

সতী বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হল। সে যেমন ক'রে বিশ্বাস করে, তার মত করে কেউ পূজোটা বিশ্বাস করুক, সে না চাইলেও—কোথায় যেন লাগে। নিরঞ্জন তার সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই, বয়সে বড়; তার কাছে অন্তত কিছু প্রত্যাশা সে করে আপন বিশ্বাসের সমর্থনে।

এত দুঃখ-শোকে, হতাশায় বাপের পূজোটা সে বজায় রেখেছে এই আশায় এই ক'রে হয় তো বাসনা তার গোপন বাসনা একদিন চরিতার্থ হবে। কিন্তু কি সে বাসনা কুমারী কন্যার?

সতী ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। নিরঞ্জন ভাবলে, কথাটা এমনি করে তার বলা উচিত হয় নি। কিন্তু সত্যিই সে পূজো-টুজো বিশ্বাস করে না। এ যেন একধরণের ছলনা, নিজেকে ঠকান কেবল!

পূজো ক'রে বেচারীর কি চেহারা হয়েছে! এত ভক্তি কিসের জন্যে? আরো যেন বিগত-যৌবনা সতীকে দেখে নিরঞ্জন বিরূপ হয়ে ওঠে। লোকে বলে, উপাস্য দেব-দেবীর পূজো-অর্চনা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়—জীবন সার্থক হয়—

সতী কি এমনি-এমনি পূজো করে! কথাটা জিজ্ঞেস করলে সতী হয় তো কিছু বলতো না, আরো ক্ষুণ্ণ হত।

বিশ বছর আগে, তখন বোসেদের রমরমা রম অবস্থা, দোল-দুর্গোৎসব নিয়ে বারমাসে তের পার্বণ হত! সতী বড়একটা যোগ দিত না। বেশিরভাগ সময় সে কলকাতায় মামারবাড়ি থাকতো নিরঞ্জনদের রাগ হতো। ধারের বাড়ির মেয়েটাকে বড় অহঙ্কারী মনে হত। নেপথ্যে সতীর মন্তব্য কানে আসতো—বড় দম্ভপূর্ণ! সতীর বয়সী মেয়েরা বলতো সতী নাকি ঠাকুর-দেবতা মানে না, শিবপূজো লক্ষ্মীপূজো নিয়ে ঠাট্টা করে। আরো নাকি অনেক বড়মানষী চাল করে।

সে-সতীর আর কিছু নেই। নিরঞ্জনের ধারণার সঙ্গে মেলে না। আজ কেমন যেন

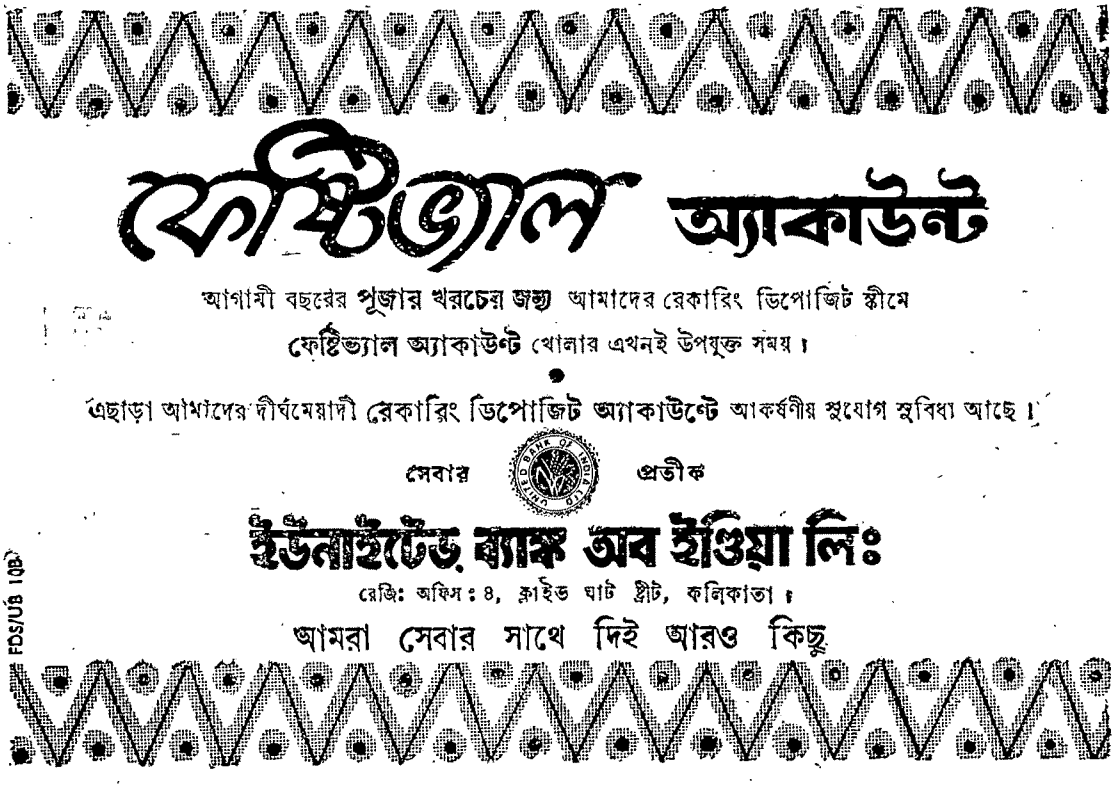

কষ্ট হয় ওকে দেখলে। বংশের ওর বয়সী মেয়েরা স্বামীর ঘর করছে, সুখে-দুঃখে তবু জীবনের একটা মানে খুঁজে পেয়েছে। কি ও? কে ওকে এই পূজো নিয়ে থাকতে বলেছে?

নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল, সান্ধ্য-আকাশে একটা-দু'টো অনুজ্জ্বল তারা ফুটেছে—সতী যে পথে গেছে সেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। নিরঞ্জনের উঠানটা জঙ্গলে ভরে আছে। পাশের বাড়ির ছাদের আলসেয় ভূতের মত কি যেন একটা গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে।

মা অনেক পরে ফিরে এলেন। পুজোবাড়ি থেকে নিরঞ্জনের জন্যে রাতের খাবার এসেছিল।

নিরঞ্জন মাকে বললে, একেবারে ছাঁদা বেঁধে এনেছ! বেশ যা হোক!

মা বললেন, মেয়েটা কিছুতে ছাড়লে না, বললে আর রাঁধবেন কেন, এখানেই খাবার করে নিয়ে যান।

খেতে খেতে কথা হল। মা বললেন, দেখিস না একটা পাত্র তোর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে! বড় কষ্ট হল মেয়েটার কথা শুনে! দূর থেকে মানুষের কতটুকু আমরা দেখতে পাই বল!

দূরে কেন কাছেও মানুষকে দেখা যায় না। সতীর যুবতী বয়সের চেহারাটাও চোখে ভাসছে—মাটিতে পা ছুঁয়েছে কি ছোঁয়ায় নি, শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে, পিঠময় কেশভার ছড়িয়ে আছে, মামারবাড়ি থেকে মেয়ে গাঁয়ে এসেছে বেড়াতে, দুলালী হয়ে বেড়াচ্ছে!

মরবার আগেও জামাই নিয়ে কি কল্পনা ছিল সতীর মায়ের—কৃতী, ধনী, মানী কত কি! চাওয়ার শেষ ছিল না।

হঠাৎ মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তুই কলকাতায় যাবি বলে বেরিয়ে যে বড় গেলি না আজ?

উত্তরটা সোজা হলেও, সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন উত্তর দিতে পারলে না। মনের হয় তো কোথাও লুকোচুরি একটা আছে। কেন, নিরঞ্জন বুঝতে পারে না, মাকে স্পষ্ট ক'রে বলে না।···

আর একটা চৈত্র-দুপুরে নিরঞ্জন গ্রামে এসেছে। সেই দুপুর নির্জন, তপ্ত-শ্বাস, নির্লিপ্ত! গ্রামের বাস প্রায় উঠে গেছে, পুরনো বাড়িতে আরো আগাছা জন্মেছে, পাকাবাড়ির ভাঙা কার্নিশে, আলসেয় অশ্বত্থ-বটের চারারা যৌবন-দশায় পৌঁছেচে।

নিরঞ্জন খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশটা ধু-ধু নীল পাথরের মত। বোসেদের সব পূজো-পার্বণ গিয়ে একশরিকের অন্নপূর্ণা পূজোটা ছিল, ফুলকাকার মেয়ে প্রতি বছরে এসে ঢাকঢোল বাজিয়ে তবু বাড়িটাকে জাগাত!

আশ্চর্য পরিবর্তন সব চোখের ওপর। আর কিছুদিন পরে সে-ও আর গাঁয়ে আসবে না। মাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করেছে। মা বিয়ের জন্যে ষড় পেড়াপিড়ি করছেন। নিরঞ্জন বলেছে, এই বয়সে আর কেন, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে এই বেশ আছি। মা শোনেন নি।

কে জানে আরো কত পরিবর্তন আছে!

হঠাৎ যেন ঢোলের বাজনা শোনা গেল। নিরঞ্জন ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। ঠাকুরদালান পেরিয়ে ধারের বাড়ির দিকে এগুলো।

নিরঞ্জন লোকটাকে চিনলে। যশোদা-রমণ পাল, ইদানীং সতীর বিষয়-আশয় দেখতো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার?

যশোদা ঢোলসহবৎ ক'রে বললে, বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল।

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, কিনলে কে?

যশোদারমণ মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে আমি—

নিরঞ্জন পিছন ফিরলে, সম্পূর্ণ খবরটা নিলে না।

যশোদা ঢুলীদারকে তাড়া দিয়ে বললে, আর একবার বাজা, লোকে জানুক!

নিরঞ্জনের মনে পড়ল, গত বছরে অন্নপূর্ণা-পূজায় ভাসানের দিন সতী কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরেছে। মামার-বাড়িতে কি যেন হয়েছিল। আর সেই বছর থেকেই পূজো বাদ হয়েছে গ্রামে।

দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে নিরঞ্জনের মনে হল, একসময় মেয়ের বিয়েতে ভদ্রলোকের যে টাকা খরচ হয়েছিল, হাতে পেয়ে ছেলেরা সে টাকা উসুল ক'রে নেয় নি তো? এত তাড়াতাড়ি ফুলকাকার বিষয়-সম্পত্তি সব শেষ হয়ে গেল কি করে?

Puja Greetings :—

UNITED INDUSTRIAL COMPANY.

Govt. Contractors,
Exporters and Importers.

Dealers in :
Hardware, Pipes & Colliery Stores.

Mechanical, Structural & Electrical Engineers.

167, Old China Bazar Street, Calcutta-1
Phones : **22-8420 & 22-5436**

আজকের ছায়াছবির সমস্যা

লেখক

ও সি গাঙ্গুলী

একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছে—'Art is not a pleasure trip, it's a battle field'. এটা সবরকম শিল্পক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের ছায়াচিত্র-জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এর বিপরীত দর্শন বা মনোভাব। এখানে সমস্তটাই যেন একটা হাল্কা ধরণের ব্যাপার। তার কারণ বোধ হয় আমাদের দেশে ছায়াছবিটাকে একটা হাল্কা আমোদ-প্রমোদ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। না হলে এই বাঙলা দেশের চারুকলা, সাহিত্য, সঙ্গীতে এবং শিল্পকলার আর আর শাখা এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ছায়াছবির এই দশা কেন? এর নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে, যদিচ আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, বাংলা ছবি তার চমৎকারিত্বে নাকি বিশ্বের দরবারে আকাঙ্ক্ষিত আসন পেয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

সে তো কেবল একজনের প্রচেষ্টার ফল,—তাতে করে কি সারা বাঙলা দেশের ছায়াছবি-জগতের কথা বোঝায়? এ দেশে প্রতি বৎসর যত ছবি তৈরি হয়ে থাকে, তার মধ্যে ক'টা ছবি বিশ্বের শিল্প-জগতের কষ্টিপাথরে পরখ হবার মত যোগ্যতা রাখতে পারে? আর যাও দু-একটার রাখার সম্ভাবনা ছিল, তাদের কি আমরা সমূলে বিনাশ করে দিই নি আমাদের রসজ্ঞানের অভাবে? যেমন আমার মনে আছে, উদয়শঙ্কর ও শ্রীঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কল্পনা' ও 'অযান্ত্রিক' অত ভালো দরদীমনের ছবি দু'টির প্রতি কি আমরা অবিচার করি নি? এর কারণ অনুন্নত রসজ্ঞান! কোনো সভ্য দেশ একটা বিশেষ শাখায় বড়ো হয়ে উঠতে পারে না, যদি না তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে। যখন অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল প্রমুখ চিত্র-শিল্পীদের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁদের শিল্প-কলাকে যথার্থ যাচাই ও হৃদয়ঙ্গম ক'রে জন-সাধারণের সামনে হাজির করবার মত রসজ্ঞ, গুণী; আনন্দকুমার স্বামী, হ্যাভেল ও অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের মত লোকের সহায়তা দেশ পেয়েছিল;—এঁরা ছিলেন সত্যিকারের সমালোচক, রসজ্ঞ, গুণিজন, Critic মানেই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মত শিল্পের নামে শিল্পের পিণ্ডী চট্‌কানোর কারবারী নয়।

● 'প্রথম প্রেম' চিত্রের একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যারাণী

● 'একটুকু বাসা' চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে ছবির উৎকর্ষ বিচার হয়ে থাকে তার Box Office-এর দক্ষিণ্যে অর্থাৎ সম্পূর্ণ আর্থিক সাফল্যের উপর। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে বিশ্বের সংখ্যা-হীন স্বনামধন্য শিল্পীর ছবির চেয়ে Esquire Magazine-এর পাতায় Verga নামক শিল্পীর আঁকা অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি বহুলপরিমাণে অর্থোপার্জন করেছে; তবে কি প্রখ্যাত শিল্প-কলার চেয়ে Verga Girl's উন্নত ও উচ্চমার্গের সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে হবে? যদিও স্বীকার করছি, ছায়াছবি নির্মাণের পিছনে বহু অর্থ ব্যয়িত হয়ে থাকে এবং সেই জন্যেই, এর জন্যে যিনি অর্থসাহায্য করেন তিনি যেন পথে না বসেন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি কিছুটা রাখা উচিত, সে কথা সর্বান্তকরণে স্বীকার করতে রাজী আছি।

কিন্তু এ-কথাও মেনে নেওয়া যায় না যে, ছায়াছবির ব্যবসা ও সর্ষের তেলের কারবার সমগোত্রীয়। তা যাঁরা ভাবেন তাঁরা তা হলে অনায়াসেই সর্ষের তেলের ব্যবসা করতে পারেন,—Art-এর নামে এ ভণ্ডামি শোভন নয়, সঙ্গতও নয়।—

বিশ্ববরেণ্য জন রাসকিন তাঁর Lectures on Art-এ বলেছিলেন:

'Life without Industry is guilt. Industry without Art is Brutality.'

এ গেল এক ধরণের সমস্যা, আরেকটি শিরঃপীড়া হল, আমাদের দেশের ছায়াছবির

● পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত 'সুভা ও দেবতার গ্রাস' চিত্রের নায়িকা লিলি চক্রবর্তী

● 'সন্ধ্যাদিপের শিখা' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

সমালোচক,—এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই অতি সাধারণ মোটামুটি শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, রুচিবোধ বা সৌন্দর্যবোধের অভাব। এঁরা না-বোঝেন অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের ছবি, না-বোঝেন, এল গ্রেকো বা পল ক্লী, অথবা হাকুসাই বা ওস্তাদ মন্‌সুরকে। অথচ ভাষাবিন্যাসে এঁরা কতকগুলো Abstract কথা সংযোজনা করে নিজেদের ঘুলিয়ে যাওয়া চিত্তের এলোমেলো ভাবকে ভাষাযুক্ত করে ঘুলিয়ে তোলেন দর্শকদের বিচারবুদ্ধিকে। এঁদের মুখ থেকেই শুনেছি—অধুনা বিশ্বসম্মানিত বাঙলা ছায়াছবির দুর্বলতার কথা, আবার সেই ছবিই যখন বিদেশ থেকে সম্মান কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে, সেই মুহূর্তে দেখেছি এঁদের লেখার মধ্যে Adjective-এর কতো না ছড়াছড়ি!

আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় বাঙলা ছায়াছবির সত্যিকারের সৃজনীক্ষমতা বাড়াতে গেলে দরকার আনন্দকুমার স্বামী প্রভৃতির মত সত্যিকারের শিল্পরসিক ও গুণী সমালোচক, যাঁরা সত্যিকারের ভালো জিনিসকে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারেন, আবার প্রয়োজনবোধে শিশুসুলভ হাল্কা-অবাস্তব ছবিকে নির্মমভাবে আঘাত হানতেও পারেন। না হলে বাঙলার ছায়াছবির অগ্রগমন কিছুতেই সম্ভব হবে না, এর রূপ এমনই অপরিস্ফুট থেকে যাবে ও একদিন সত্যই সর্ষের তেলের ব্যবসার সঙ্গে মিলিত হয়ে Industry নামক সরীসৃপের উদরপূর্তিই শুধু করবে, আর তারই অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট সিনেমা-পত্রিকাদের দোষগুণ বিচারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ, 'অযান্ত্রিকে'র মত ছবিকে দ্বিধাহীনচিত্তে দূরে ফেলে দিয়ে Art-এর নামে সস্তাদরের অবাস্তব রুচিহীন ছবিকে নিয়ে মাতামাতি করে, গায়ের জোরে ঘোষণা করতে চাইবে—ছায়াশিল্প জগতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির মিথ্যা ধোঁকাবাজির কথা। তার পরিণামে হবে, শিল্পের উন্নতির নামে শিল্পের বিকৃতি। কোন মহৎ শিল্পই ফাঁকিবাজির দ্বারা পুষ্ট হতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় সাধনার। এখানে ছায়াচিত্র-জগতে দেখা যায়, সাধনা মানে Film making সম্বন্ধে মোটামুটি Technique-টুকুই জানা, তার বেশি নয়। যদিও Technique-এর জ্ঞান প্রয়োজনীয়, তবে Technique হল ভারবাহী পশুর মত, ভার বহন করাই তার কাজ, গন্তব্যস্থান নহে, সে জানে যে ওকে চালনা করছে। ছবির ব্যাপারে সে ব্যক্তি একেবারে আনাড়ি, যে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ বা গোলাকার আকৃতি দেখেই খুশি হয়ে ওঠে। ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রেখে দেখছে না। গোড়াতেই যা তাকে আহ্বান করে, তার কাছে ধরা দিয়ে বসে, কারণ, ইন্দ্রিয়ের রাশ টেনে ধরবে এমন কোন উচ্চতর বিচারবুদ্ধি তার নেই। সেই জন্যে Technique জানাই শিল্পের বড় কথা নয়, মনের ভাবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই যে, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করতে চায়। এবং সেইটাই হোলো বড় কথা। এই আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীনকাল ধরে কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপির সৃষ্টি; কারণ, আমি যা চিন্তা করেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তা কোনদিন মরবে না। অতএব যেকোনো ভাবকে প্রথমে নিজের করে নিয়ে সকলের করানোই হচ্ছে ললিতকলার গোড়ার কথা।

তারকাপুঞ্জ কি অস্তগামী

রমেন চৌধুরী

ভারতীয় চিত্রাকাশে নক্ষত্রের সমারোহ নেহাৎ কম নয়। সাগর-পারের তারকাপুঞ্জের মতো না হলেও, ভারতীয় নক্ষত্ররাজির দীপ্তি চোখ ঝল্‌সানোর মতোই। মূল্যের দিক থেকে এরা আমাদের নাগালের বহু ঊর্ধ্বে—মেঘলোক ছুঁইছুঁই করে আছে। রূপ যতো না হোক, রূপার স্তূপ বুঝি গৌরীশৃংগের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে চায়। তা হোক না, ভক্তবৃন্দ তাতে কাতর নয় নিশ্চয়! ছবির রাজ্যের আরাধ্য দেব-দেবীর দৌলতের প্রতি ভক্তের লোভ নেই, ভক্ত শুধু বিমুগ্ধ-চোখে চোখের দেখা দেখেই খালাস। হয় তো তারা ভ্রান্ত, কিন্তু এ ভ্রান্তি অযৌক্তিক নয়। এরা তো রক্তলোলুপ রাক্ষস নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। তেলে-ঘিয়ে বিষ মিশিয়ে দেশের জনসংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনবার পাপ-চক্র সৃষ্টি করে না। বড়ো জোর সরকারী রাজস্বের খাতে কিঞ্চিৎ দুধের বদলে জল ঢেলে দিয়ে থাকে।—কেন এই প্রবণতা নক্ষত্রলোকে বিরাজ করছে, তার প্রতিবিধান কোন্ পথে—সে তাত্ত্বিক আলোচনায় এ রচনার অবকাশ সীমিত। এখানে শুধু জিজ্ঞাস্য—চিত্রাকাশের তারকারাজি কি নতুন দিনের প্রখর আলোয় আকাশে মিলিয়ে যাবে? না, আসন তার চিরদিনের?

প্রথমেই বলা প্রয়োজন—প্রাধান্য কেউ কাউকে দেয় না। কোনো সময়েই নয়। এটা অর্জন করতে হয়। এবং একবার অর্জিত হ'লে ক্রমেই তা' বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। না হ'লে কেউ দাতব্য করতে বসে নি—ব্যবসায়ীর দল তো একটি কাণাকড়িও স্বেচ্ছায় কাউকে দিতে পারেন না প্রাণে ধরে। ন্যায্য থেকে বঞ্চিত করতেও হয় তো বাধছে না—এমন ঘটনাও ঘটে। সেক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ তারকাকে প্রশ্রয় দেবে কোন্ নির্বোধ? কাজেই ঘুরে ঘুরে যখন দেখা যায় 'অমুক' চন্দ্র 'তমুক' বিভিন্ন চিত্রের শীর্ষে বিরাজিত—ধরে নিতে হবে এ-ছাড়া নান্যপন্থাঃ!

পথ কেন নেই? খুবই আশ্চর্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যাঁরা সাধারণ দর্শক, স্টুডিও-চত্বরের ত্রিসীমানায় হাজির-হবার সৌভাগ্য বা অবকাশ যাঁদের হয় নি, তাঁরা হয় তো ঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না। ছবিতে অভিনয় করতে হ'লে অনেকরকম অভ্যাস করতে হয়—অর্থাৎ শিল্পীকে অনেক কিছু ওয়াকিবহাল হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—ক্যামেরার অভিজ্ঞতা, (কিভাবে দাঁড়ালে প্রয়োজনীয় ছবিটি চিত্রশিল্পী বিনা বাধায় সুন্দর করে গ্রহণ করতে পারবেন, এটা রীতিমত অনুশীলন-সাধ্য) তীব্র আলোকের সামনে অবিচল হয়ে কাজ করা (চারপাশে পাঁচ শো হাজার কিলোর আলো যখন ফট্‌ফট্ করে সশব্দে জ্বলে ওঠে, তখন অনেকেই চোখ পিট্‌পিট করে ওঠেন—নতুনরা তো অবশ্যই) তারপর নানা ধরণের হৃদয়-দৌর্বল্যও আছে।

● সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' চিত্রের একটি উত্তেজনাময় দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

● 'শেষ তিন দিন' চিত্রের নায়িকা সুমিতা সান্যাল

বর্তমান নিবন্ধকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত একটি উদাহরণ এখানে পরিবেশিত হচ্ছে, এর একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা; কোনো একটি ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলছে, সে দৃশ্যে একটি নবাগতকে তার দর্শনীয়

চেহারা এবং কায়দাদুরস্ত ভাব-ভংগির জন্যে ছোট একটি ভূমিকা অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিলো। কথা সামান্যই, কেবলমাত্র 'হিপ হিপ হুর্‌রে' বলে দাঁড়াতে হবে। রিহার্স্যাল তো ভালোভাবেই সমাধা হলো—শুরু হলো দৃশ্যগ্রহণ। পরিচালকমশাই 'স্টার্ট' করিয়ে দিয়ে সরে এলেন, নায়ক-নায়িকা তাকিয়ে আছেন সেই নবাগতের আগমনের আশায়—ছোক্‌রাটি তো এগিয়ে এলো, কিন্তু ওকি··· ওভাবে লুটিয়ে পড়ছে কেন? সবাই ছুটে এসেছেন অকুস্থলে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, জনৈক সহকারী সময় মতো ধরে ফেলেছেন সেই ক্ষুদ্র ভূমিকার শিল্পীটিকে।

ততক্ষণে 'জল আন', 'পাখা চালিয়ে দে' প্রভৃতি চীৎকারে স্টুডিওর ফ্লোর গম্‌গম্ করে উঠেছে। ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে দেখি সেই স্মার্ট ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেছে!

ঘণ্টাখানেকের জন্যে সব পণ্ড! তারপর অন্য শিল্পীকে নিয়ে দৃশ্য গৃহীত হলো। কিন্তু এই এক ঘণ্টার 'খরচ' কতো বরবাদ হলো? সে হিসাব খতিয়ে দেখলেন শুধু নির্মাতারা।—

তাই যাঁরা জোরগলায় নতুন মুখ আমদানির জন্যে দাবী জানান, তাঁদের সৎপ্রচেষ্টাকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েও বলতে পারা যায়, ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। সুদর্শন নায়করা সুন্দরী নায়িকা রাতারাতি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রথমত যোগ্য শিল্পীর দেখা পাওয়া যায় না, এ তথ্য বারবার অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হওয়া গেছে। বহু কষ্টে যদিও বা সন্ধান পাওয়া গেছে উৎসাহীজনের, কিন্তু সবই মাকাল ফল। চেহারা ভালো, হয় তো কথা বলতে পারে না, আবার যে ভালো অভিনয় করতে পারে, চেহারা তার মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

খুঁটির জোরে কিংবা 'নতুন মুখ নিশ্চয়ই ধরে দেবো'—এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পরিচালকের সৌজন্যে মাঝেমধ্যে এমন শিল্পী আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা কিন্তু রিটার্ন-টিকিট কেটেই আসেন। একটা বাঙলা ছবি তৈরি করতে আজকাল খুব কম করে আড়াইলক্ষ টাকা (সেরা তারকা বাদে), তারকাসমন্বিত ছবির নির্মাণ-ব্যয় চারলক্ষ অতিক্রম করতে বাধ্য—সে ক্ষেত্রে নতুন মুখ আশা করা সম্ভব হলেও, সে প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ সুদূরপরাহত। তারকায় খরচ হয় সত্যকথা, সে খরচ উঠে আসার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আছে তার মধ্যে—নতুন শিল্পীতে ব্যয় বর্জনের সম্ভাবনার সঙ্গে অর্থাগমের অনিশ্চয়তা বিরাজিত। শিল্পী-তালিকায় নতুন নাম দেখলেই পরিবেশক এবং প্রদর্শককুল উৎসাহ হারিয়ে বসেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রম কি নেই—কিন্তু ব্যতিক্রমই তো সত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

আমাদের প্রশ্ন হলো, আজকের এই 'তারকা'-র আধিপত্য ফুরিয়ে আসছে কি না? একই তারকা চিরদিন চিত্র কিংবা মঞ্চের আকাশে অম্লান দ্যুতিতে বিরাজ করে না—কাল পূর্ণ হলে (কিংবা অকালেও) লোক-লোচনের অন্তরালে সরে যেতে বাধ্য। আম ফুরোলে যেমন আম্র-র উপস্থিতি; যাদবের প্রয়াণে মাধবের সমাগম তেমনি অবধারিত। তাই মনে হয়, আকাশে তারা থাকবেই, কারণ আজকের নবাগত কয়েকদিনের মধ্যেই আসন পাকা করে নিয়ে তারকার দলে উন্নীত হয়ে গেলে, তখন তার করুণা-ভিক্ষায় সকলকেই নতজানু হ'তে হবে। গোড়াতেই বলেছি প্রাধান্য কেউ স্বেচ্ছায় দেয় না, সেটা অর্জন করতে হয়। কষ্টার্জিত তারকা-পরিচিতি মুছে ফেলতে কেউ-ই পারবে না—লিখিত অলিখিত কোনো আইন-বলেই নয়!

সমাপ্তির পথে • • •

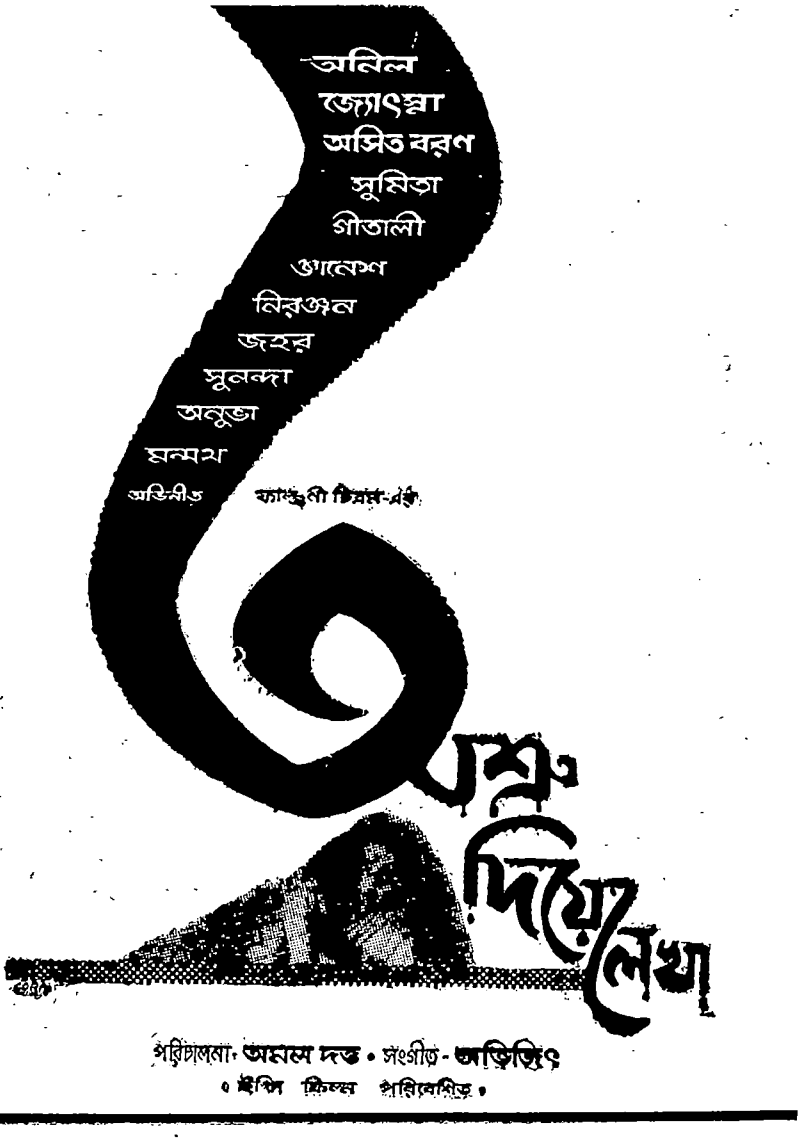

আশা দেবী

লিখতে লিখতে মেয়েটা যেন অসুস্থবোধ করছে এমনি মনে হলো। পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেশন দিচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম—একবার। এগিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি উঠে এলো এগিয়ে: একটু বাইরে যাব—স্যার?

: যাও—সংক্ষেপে জবাব দিলাম।

মনে হলো ও বমি করবে।—সেবার ও বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো যখন চোখে-মুখে জল।

: বমি করলে নাকি?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: হ্যাঁ, শরীর বড্ড খারাপ লাগছে।—কি যে করবো।

: কেন? কি হয়েছে?—আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

: কিছু না, এমনিই খারাপ লাগছে বড্ড—

এবার যেন আমি খানিকটা অনুমান করতে পারলাম বলে মনে হলো—তাই অনুমানকে প্রমাণ করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম: খেয়ে এসেছ?

: হ্যাঁ—খুব সংক্ষেপে কথাটা সে বললো।

: হ্যাঁ মানে? আমার মনে হচ্ছে তুমি খেয়ে আস নি, তাই শরীর এতো অস্থির লাগছে। একে পরীক্ষার খাটুনি, তাতে না-খাওয়া!—আচ্ছা কত দূরে থাকো?—

: বারাসত।

: সে কি! তোমার কলেজ সকালে, তুমি অতদূর থেকে আসো—আর কিছু খাও নি? ক'দিন আগে আমি লক্ষ্য করেছি তোমার অসুখ করেছিল—। যাও গিয়ে বোসো,—আমি কিছু খাবার ব্যবস্থা করছি—

টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে—। একটি মেয়ের ওপর একজন অধ্যাপক এতটা ইণ্টারেস্ট নিচ্ছেন—সবাই যেন বেশ একটু কৌতূহল বোধ করতে লাগলো। কিন্তু আমি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললাম একটা বেয়ারাকে: ওর জন্যে একটু মিষ্টি আর একটু জল এনে দাও—ও লিখতে লিখতিই খাবে। নইলে একটু দুধ এনে দাও—

দুধ এলো কিন্তু মেয়েটি খেতে ভীষণ আপত্তি করতে লাগলো। ভারি রাগ হলো: বললাম—না খাও যদি তা হলে তোমাকে আর পরীক্ষা দিতে দেব না আমি, হল থেকে বের করে দেব।—খাও—খেয়ে নাও।

ধীরে ধীরে মেয়েটি চোখ তুলে চাইলো আমার দিকে। এবার আমিও ওর দিকে চাইলাম কি ভীরু আর কি শান্ত ওর চোখ দু'টো। সুন্দরী ওকে কেউ বলবে না, কিন্তু এমনি একটা শ্রী আছে ওর সর্বাঙ্গে যে, ভারি ভালো লাগে মেয়েটিকে।

আমি আবার কাজে মন দিয়েছি। কেউ কাগজ চাইছে—কারুর জিজ্ঞাসা আর কত সময় আছে—কেউ বলছে একটু সময় দিতে হবে।

কিন্তু এরই ফাঁকে লক্ষ্য করলাম সমীরা লিখছে না, বসে আছে বাইরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে। ওর চোখে জল।

আমি একটা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলাম চেয়ার টেনে নিয়ে।

নায়িকা গরীব, ভারি গরীব। গাউন কেনবার সামর্থ্য নেই। সারাদিন সে হোটেলে কাজ করে—বাড়িতে ভাই বোন বুড়ো বাবা মা। তাদের ভরণ-পোষণের সব দায়িত্বই ওর ওপর। সারাদিন খাটে—তবু নিশ্বাস ফেলবার কোন অবকাশ পায় না।

বসন্ত আসে কত ফুল ফোটে।—বাগানের বুক আলো হয়ে যায়, আরো বেশি কাজের মধ্যে তাকে ডুবে যেতে হয়। আরো নিজেকে ভুলে থাকবার জন্যে—। শীতের নিঃসঙ্গতা নেমে আসে বনে—ফুলের সমাধি দেখতে দেখতে কাজে যেতে হয় মেয়েটিকে—গায়ে গরম জামা নেই—কাঁপতে কাঁপতে যেতে হয়।

একদিন প্রেম এলো ওর জীবনে—

: পেপার স্যার!

উঠতে হলো কাগজ চায়। বই রেখে এবার পায়চারী করতে লাগলাম।

আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে। সময় নেই—প্রায় সবাই খাতা দিয়ে যাচ্ছে—সমীরাও উঠলো—। খাতাখানা আমার হাতে দিলো। কিন্তু যেন বেরিয়ে যেতে পারছে না—। ওর পা টলছে।

পরের পরীক্ষার দিন আবার অসমাপ্ত গল্পটায় মন দিলাম। একই ঘরে ডিউটি পড়েছে। প্রেমের অংশ এসেছে, বেশ জমবে বলেই মনে হচ্ছে এবার। দুঃখের একঘেয়ে প্যান-প্যানানিও আর ভালো লাগছে না।

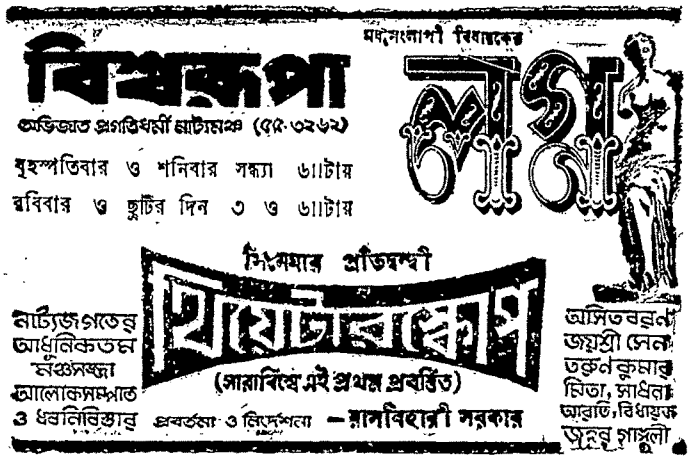

জীবনে নায়িকার প্রেম এলো।—মেয়েটি যেন খুশি হয়ে উঠলো। হঠাৎ একবার তাকালাম সমীরার সীটের দিকে? ওকি এসেছে আজ পরীক্ষা দিতে? দেখলাম এসেছে। লিখছে—আর বারবার বাইরের জানালা দিয়ে বাগানের মধ্যে চোখ ফেরাচ্ছে। আমার দিকে আর চাইছে না —লজ্জা পাচ্ছে মনে হলো।

আমি আবার বইটায় মন দিলাম। নায়িকার বিষণ্ণ-ম্লান মুখের দৃষ্টি আর তার ক্লান্ত চোহারা দেখে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি গরীব, কিন্তু ভারি মিঠে ওর চরিত্র আর ভারি কোমল স্বভাব। ওর যে অবস্থা খারাপ, তা ছেলেটি বুঝতে পারে।

নাঃ, ইনভিজিলেশন দিতে দিতে পড়া যায় না। বারবার ওরা ডিস্টার্ব করে তার চেয়ে পরেই পড়বো।

কলেজ ছুটির পর আজ কিছু অন্য কাজ ছিল, সে-সব সেরেই বাড়ি যাব ঠিক করলাম। আগে বাড়িতে গেলে আর বেরুতে ইচ্ছে হয় না। কাজেই কাজটা পড়েই থাকছে—আজ সব জড়তা ত্যাগ করে বাসে চেপে বসলাম।

খানিকটা যেতেই লক্ষ্য করলাম, আমার আগেই একটি ছোকরার সঙ্গে পেছন ফিরে বসে যে কথা বলছে, সে সমীরা। অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে গল্প করছে দু'জনে। আজ ওকে ভারি খুশি লাগছে। হয় তো—এই মুহূর্তে পরীক্ষাটা হয়ে গেছে বলে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছে আর মনটাও ভারি হাল্কা হয়ে গেছে। কিন্তু একটু বেশিরকম আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে না? যেন মুখের কালো ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে— যেন চোখের দৃষ্টিতে আরো বেশি উজ্জ্বলতা এসেছে বলে মনে হলো। কলেজে বরাবরই ভারি চুপচাপ করে বসে থাকতো, কিন্তু আজ ভারি প্রগলভা বলে মনে হলো। সঙ্গে ওটি কে? হয় তো আত্মীয়-স্বজন—হয় তো বা অন্য কেউ—যাক গে আমার অহেতুক এত কৌতূহলের কারণ কি। ও পেছন ফিরে বসেছিল বলে আমায় দেখতে পায় নি—আর দেখতে পায় নি বলেই ও এতো নিঃসঙ্কোচ ছিল।

আবার হাতের উপন্যাস খুলে কাহিনীটিতে মনোনিবেশ করলাম। বসবার জায়গা মিলে-ছিল। সেই প্রেম—ছেলেটি বোঝে ভারি গরীব ওরা। দিন ওদের চলে না, কিন্তু সে সব কথা ও লুকোতে চায় ওর কাছে। কখনও যদি ছেলেটি বলে আমি তো তোমাকে বিয়ে

জাতীয় পতাকার
মতদৃঢ়
গৌরবদীপ্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

প্রাচীনতম এই চিকিৎসাকেন্দ্রে ধবল-কুষ্ঠ, শ্বেতদাগ, ফোলা, অসাড়তা, সোরাইসিস, একজিমা, দূষিত ক্ষত ও নানাপ্রকার কঠিন চর্মরোগাদি নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা নিরোধ ও নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে রোগ লক্ষণ বিবরণ জানুন।

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন: ৬৭-২৩৫৯)

শাখা: ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

এই ইস্পাতের যুগে
বাসগৃহ বা অফিস
সুসজ্জিত করে তুলতে
সুদৃশ্য আধুনিক
স্টীল ফার্নিচার
অপরিহার্য

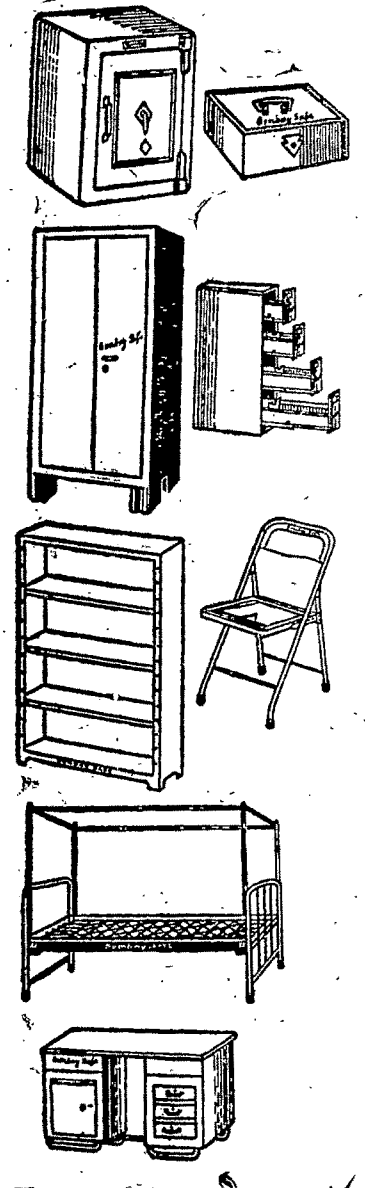

বম্বে সেফ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস
প্রাঃ লিঃ
৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-১১৮১ ও ২২-৮৭১৬
অনুমোদিত ডীলার :
ইউনিভার্সাল মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন
২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

করবই—তা হলে তোমার আমার কাছে এত সংকোচ কেন? যদি টাকার দরকার হয় বল না কেন? শুধু শুধু খেটে খেটে শরীরটা নষ্ট করছো। না—না আমি এ হতে দেব না।

হেসে বলে মেয়েটি: আমার কোন অভাব নেই। তুমি আমায় ভালোবাসো, এর চেয়ে বেশি আর কি আমি আশা করতে পারি।

: তুমি আমাকে একটুও চেন না।—

: খুব চিনি—যখন দরকার হবে—তোমার কাছেই তো চাইবো।

: চাইবে তো—মনে থাকবে? ঠিক?—

ম্লান শেফালিকার মত মুখখানা তুলে মেয়েটি বললে: ঠিক মনে থাকবে আমার—দেখো তুমি।

: দেখবো—

সখীরা এবং সঙ্গের ছেলেটি এবার নেমে গেলো সামনের স্টপে। আমারও নামবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে—দক্ষিণেশ্বর পথে গাড়ি চলেছে। বইটা আর যেন পড়তে ভালো লাগছিল না। বাইরের দিকে জানালা দিয়ে তাকালাম।

বাইরে বসন্ত এসেছে। কলকাতায় এসব কিছুই বোঝা যায় না। শুধু বাড়ি আর বাড়ি—শুধু ইট আর কংক্রিট।

পথের দু'ধারে নেড়া আমড়াগাছগুলো যেন অভিষেকের সাজে সেজেছে। দু'ধারে শিমূলের বন যেন হোলী খেলছে বুকের রক্ত দিয়ে—একি আনন্দ! আমার গা যেন শিউরে উঠলো।

না! এখনও তো দেরি আছে। বইটাই পড়ে ফেলি। আবার সুরু করলাম।

একদিন ওরা দু'জনে রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিল। ছেলেটি বললে: একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, যদি অপরাধ না নাও।

সুন্দর মুখখানা লাল করে মেয়েটি বললে: বলো?

একবার দ্বিধা করলো তারপর ছেলেটি বললে: তুমি কি বাড়িতে পেটভরে খাও না?

একবার কি যেন চিন্তা করলো মেয়েটি, তারপর উত্তর দিলো: খাই, খুব খাই। কিন্তু কেন একথা বলছো?

: তোমার মুখ দেখে যেন আমার কেমন মনে হলো। তুমি যেন আমার কাছে কি যেন লুকাচ্ছ।—এত ম্লান কেন তুমি?

আবার সেই হাসি: আমি খুব ভালো আছি।

: আমি জানি আমাকে তুমি কিছুই বলবে না।

: সব বলবো একদিন—সময় হোক—

: একদিন চলো, আমরা সারাদিন বেড়াবো। রেস্তোরাঁয় খাব, সিনেমায় যাব, তারপর রাতে গিয়ে আমি নিজে তোমার বাবা-মাকে সব বলে আশীর্বাদ চেয়ে নেব।

বইটা বন্ধ করে ব্যাগে পুরে এবার নামতে হলো। আমার গন্তব্যস্থান এসে গেছে।

পরের দিন কলেজের ক্লাশের শেষে স্টাফ-রুমে বসে আছি। অফ-পিরিয়ড—একটু চা খাচ্ছি। সমীরা এসে দাঁড়ালো।

: স্যার, একটা কথা ছিল।

: বলো—বলেই তাকালাম। আবার সেই সন্ধ্যার মেঘের মত ম্লান—আর ছায়াচ্ছন্ন। চোখের ভেতরটা কেমন ঘোলা ঘোলা, হাতে কাচের চুড়ি। বড় জীর্ণ, বড় কঙ্কালসার ওর চেহারা—আগে কিন্তু ওকে এমন কখনও মনে হয় নি।

: স্যার, একটা টিউশনি জোগাড় করে দিতে পারেন?—মেয়েটি বললে।

: টিউশনি—? কেন কি করবে?—অর্থাৎ তুমি নিজের জন্যেই চাও?—সংক্ষেপে বললাম নিজেকে সামলে নিয়ে।

: হ্যাঁ—আমার জন্যেই।—সমীরা মাথা নামালো।

: তুমি আর কোথাও কিছু করো—আমি জানতে চাইলাম।

বললে: হ্যাঁ, সকালে কলেজে পড়ি দুপুরে একটা স্কুলে কাজ করি। বিকেলের জন্যে একটা টিউশনি হলে ভালো হয়।

: এত করলে পড়বে কখন—আর বলতে গিয়েছিলাম, এত টাকা টাকা করলে কি পড়া হয়?

কিন্তু সমীরা বলতে দিলো না। মুখের থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে: কি করবো স্যার, বাবা পাগল, মা মারা গেছেন বিষ খেয়ে, দু'টি ভাইকে পড়াতে হয়, সংসার চালাতে হয়। পাশটা করা আমার খুবই দরকার কিন্তু টাকাও তো চাই—

বললাম: চেষ্টা করবো। অন্যদিন এসো, এখন আমার কাজ আছে। কি যেন বলতে

"আলোয়
আলোকময়
ক'রে হে
এলে
আলোর আলো"
— রবীন্দ্রনাথ

কিরণ ল্যাম্প

প্রস্তুতকারক:
ভারত ইলেকট্রিক্যাল
ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
কলিকাতা-১

সহজ কিস্তিতে রেডিও কিনুন

প্রথমে ৪৭৲ ও পরে ১৬৲ করিয়া ১৮ মাসের কিস্তিতে পাওয়া যায়

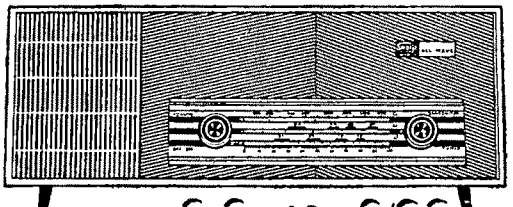

Sharp
JHANKAR

মডেল নং ভি সি ০৫৩ এসি/ডিসি
মূল্য ৩০৫৲ এক্সাইজ ডিউটি ও বিক্রয়কর সহ

শার্প-ঝঙ্কার
হায়াকাওয়া ইলেক্ট্রিক কোং, লিঃ, জাপানের সহযোগীতায় প্রস্তুত।

অন্যান্য মডেলও সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়

মডার্ণ রেডিও সার্ভিস

৪৮, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট।
কলিকাতা-১৬
ফোন: ২৪-২২৩৪

৮, চৌরঙ্গী রোড।
(কে, এল, এম-য়ের বিপরীত দিকে)
ফোন: ২৩-৭২১৩

১৫-এল, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।
(ঘড়ি ঘরের বাম পার্শ্বে)
ফোন: ২৪-১৯৬৫

রবিবার সকাল ৯॥০টা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকে।

OBEYAS/MR/12

চাইলো সমীরা। কিন্তু বলতে আর আমি দিলাম না, কেন যেন ওই পাশে বসে থাকা ছোকরাকে দেখে মনটা ভারি বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। বারবার বলতে ইচ্ছে করল: সেদিনকার শাড়ি, ব্লাউজ—মুখের হাসি আর প্রসাধন দেখে তো মনে হচ্ছিল না যে তোমার টাকার কোন অভাব আছে!

কিন্তু কিছুই বললাম না। ঘণ্টা বাজলো। নিয়মিত অভ্যাসে আবার খাতা হাতে ক্লাশে গেলাম। তারপর দেড়শো ছাত্রীর সামনে অভ্যস্ত বক্তৃতা সুরু করে দিলাম।—সমীরা মিশে গেল অসংখ্য চেনা-অচেনা মুখের মধ্যে।

আরো কেটে গেল ক'টা দিন। একটা ছুটির প্রসন্ন সকাল, এক পেয়ালা চায়ের প্রত্যাশায় বসে আছি, তখনও গৃহিণীর দয়া হয় নি। কিন্তু খবরের কাগজ এখনও এলো না কেন? ভারি খারাপ লোকটা, কখনও ঠিক সময়ে কাগজ দেয় না। এ মাসের পর ওকে ছাড়িয়ে দেব।

কিন্তু এমন প্রসন্ন সকালটা কাগজওলা নষ্ট করে দেবে? আমি সেই প্রেমের নবেলের উপসংহারপর্ব পড়তে সুরু করলাম।

আজ ভারি সুন্দর একটি দিন। মেয়েটি সারাদিন কাজ সেরেছে আর অবসর খুঁজেছে—আজ তার জীবনের একটি দিনের মত দিন। কিন্তু যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে—ততই ওর উত্তেজনা বাড়ছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো—কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে আজ আর খাবার অবকাশ তার হলো না। রাত গভীর হতে লাগলো। মেয়েটির জন্যে ছেলেটির উৎকণ্ঠা আরো বাড়তে লাগলো।

হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলো। এখনও কেন এলো না মেয়েটি। ছেলেটি খুঁজতে বেরুলো।

খানিকটা যেতেই দেখলে মেয়েটি আসছে—যেন মুখখানা ওর ছাইয়ের মত সাদা—টলছে, হাঁটতে পারছে না। ছেলেটি ছুটে গিয়ে ধরলো: কি হয়েছে—কি হয়েছে তোমার

: কিছু না—কিছু না। বলেই ছেলেটির বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লো সে।

চিৎকার করে উঠলো ছেলেটি: এ কি! —কিন্তু মেয়েটি তখন ঢলে পড়েছে ওর বুকে।—ঠাণ্ডা শরীরটা থেকে জীবন যেন অনেক আগেই তার উত্তাপ নিয়ে সরে গেছে—শুধু যেন একটা মৃত এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে।

পরে ছেলেটি শুনেছিল যে মেয়েটি প্রায়ই অনাহারে থাকতো এবং রাতে ক্ষিদের তাড়নায় ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খেতো। ওতে র‍্যাটকিলার বিষ মেশানো থাকতো, তাই খেয়ে খেয়ে শেষে মরতে হলো মেয়েটিকে। ছেলেটি চিৎকার করে কেঁদে বলেছিল: ও তো কখনও বলে নি আমাকে এ কথা!

কাগজটা এসেছে। খুলেই চমকে গেলাম। একটি কলেজের ছাত্রীর শোচনীয় মৃত্যু—ছাত্রীটির নাম সমীরা রায়—কলেজ—

আমি কাগজ বন্ধ করে টেবিলে রাখলাম। আর পড়তে পারলাম না।

শারদীয় অভিনন্দন—

নন্দী এণ্ড কোং রেজিঃ ষ্টকিষ্ট টাটা-ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল

রাজকুমার এণ্ড ব্রাদার

বিশিষ্ট লৌহ ব্যবসায়ী

রেজিঃ অফিস: ২০।২বি, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—(৭)

৩৩১৭৭৭—অফিস
৩৩৩৭০৮—গোডাউন
৬৭৪১০৭—ষ্টীল ইয়ার্ড
} ফোন { রেসিডেন্স ৪৬২৪৫১

উৎসবে ও উপহারে

রাজুর জুতো

সুন্দর ও মজবুত

ফোন ৩৪-২৪১২

রাজু এণ্ড কোং

৭৫/এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকতম
ও
অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন
কলিকাতা—১২
ফোন ৩৪-৩৩৫৬

লক্ষ্য করলাম এতটুকু স্থান ছেড়ে রাখেন নি বাড়ির বর্তমান মালিক, যেখানে ভবিষ্যতে তাঁর করদাতারা এতটুকু উদার উন্মুক্ত বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে। সে কিন্তু স্থির করে রেখেছিল, কতখানি জায়গা ছেড়ে রাখবে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। যেখানে রোজ সন্ধ্যায় একান্তে বসে ওরা দু'জনে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবে জীবনের বৈচিত্র্যকে।

জিজ্ঞাসা করবেন, আমি এ সব কথা জানলাম কি করে? ঐ জমিটা, যার বুকের উপর আজকের ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটাকে নিষ্করুণভাবে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—তাকে যেদিন দেখা হল, পছন্দ করা হল; কেনা হল; আর—যাক্ গে সে কথা ভেবে আর দুঃখ করে লাভ কি?—সৌমেনের ঐ সব অবিস্মরণীয় দিনগুলোতে যে আমিও উপস্থিত ছিলাম, আলিপুর রেজিস্টারী অফিসে সন্ধান করলে আজও দেখতে পাবেন আমার স্বাক্ষর।

হৈমন্তীও জানতো। জানতো অবহেলিত কিশোর সৌমেনের অভিমানক্ষুব্ধ মনেই একদিন এই আকাঙ্ক্ষার সূচনা হয়েছিল। সৌমেনের সঙ্গে বিয়ের আগে, অন্তরঙ্গতার প্রথম সোপানে, সৌমেনের প্রতিটি কথা হৈমন্তী এক-এক করে জেনে নিয়েছিল। সৌমেন তখন ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়ছে আর হৈমন্তী ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এ। দু'জনের অর্থনৈতিক ব্যবধান দুস্তর; সুতরাং সামাজিক দূরত্বও অনতিক্রমণীয়। প্রাচুর্য বলেই হয় তো একজন অর্থের সদ্ব্যয়ের উপায় নির্ধারণের জন্যে অর্থ-নীতিতে—টাকার উপর বিশেষ পাঠ নিতে ব্যস্ত। অপরজন তখন টাকার একান্ত অভাবে ছেলে পড়িয়ে ইংরেজী কাব্যের সার উদ্ধারে রত। তবুও কেমন করে জানি দু'জনের মনেই ভাললাগার ছোঁয়াচ লেগেছিল, এক বসন্ত-অপরাহ্নে কলেজ-ফেরা পথে।

আর অনুরাগের অনেক বিবশ করা সন্ধ্যায়, স্বপ্নগড়া ভবিষ্যতের গায়ে রঙ লাগাতে লাগাতে, হঠাৎ কেন জানি থেমে যেত সৌমেন। ফেলে-

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া ন্যায্য মূল্যে পছন্দসই চশমার জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান।

ঘোষের আই ক্লিনিক এণ্ড অপটিক্যাল ইনডাষ্ট্রী

৪৯০, জি. টি. রোড, শিবপুর, হাওড়া।

ফোন: ৬৭-৩৩৭২

নক্সা

শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসা পিছনের রিক্ততার ইতিহাস, এইসব অনুরাগরঞ্জিত সন্ধ্যাগুলোকে কেমন যেন এক ধূসর আস্তরণে আবরিত করে দিত। আর এমনি সব মুহূর্তেই হৈমন্তী জেনে নিত সৌমেনের এই না-পাওয়া জীবনের কাহিনী। বাবার মুখ কবে হারিয়ে গেছে বাল্যের বিস্মৃতির অন্তরালে। কিন্তু তার নিঃস্ব মায়ের করুণ মুখখানাকে এখনও ভুলে যেতে পারে নি সৌমেন। কত সাধ ছিল তাঁর মনে—ছেলে বড় হবে; ম'নুষ হবে, বৌ আসবে—ঘর-সংসার হবে। আর সেই সব আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরণ করার জন্যে কি আপ্রাণ প্রয়াসই না তিনি পেয়েছেন। ছেলেকে মানুষ করে তোলার জন্যে লোকের কাছে হাত পর্যন্ত পেতেছেন। কিন্তু ছেলেকে সীমারেখায় পৌঁছে দেওয়ার আগেই জগতের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়েছে তাঁকে। আর তারপর ভাসতে-ভাসতে এসে উঠেছিলাম কোলকাতায় মায়েরই এক দূর-সম্পর্কের পিসীর বাড়িতে পাথুরেঘাটায়। সে বাড়ির সিঁড়ির নীচের সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানার কথা ভাবতে গেলে সৌমেন আজও শিউরে ওঠে।

আমি সেই পাথুরেঘাটার সিঁড়ির নীচের ঘরখানার কথা বলছিলাম। কিন্তু শুধু কি ঘরই? সেই ঘরখানাকে ঘিরে, সে বাড়ির অন্যান্য ঘরের মানুষেরা? প্রকৃতির কাছে ঐ ঘরখানার মত, ওদের কাছেও আমি অবজ্ঞার পাত্র ছিলাম। শুধু দু'মুঠো অন্ন ছাড়াও যে একটা অনাথ অভাগা, ওদের কাছে একটু স্নেহ, একটুখানি করুণা পাওয়ার জন্য কাঙাল, সে কথাটা ওরা যেন বুঝেও বুঝতো না। জানো হৈমন্তী মানুষ যে কত কঠিন, কত মমতাহীন হতে পারে তা বুঝেছি আমার আশ্রয়দাতাদের দেখে—একটা সর্বহারা ছেলেকে যারা সামান্য করুণা দানে চূড়ান্ত কৃপণতা করেছে। বলতে বলতে সৌমেনের গভীর চোখ দু'টো বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে। ব্যথা-বেদনায় গলাটা ধরে এসেছে।

হৈমন্তী ওর হাতখানাকে নিজের হাতের টেনে নেয়। সৌমেন আবার বর্তমানে ফিরে আ লজ্জা পায় সে। আরও লজ্জা পায়, যে এই সে একজনের বিরুদ্ধে তার পরোক্ষে নিন্দায় ছিল। আমার অভ্যাস নয় কারো নিন্দে ব আর তা ছাড়া—অকৃতজ্ঞও আমি নই—কিন্তু য নিজের জীবনের এই অপচয়ের কথা ভাবি, ত আমি ভুলে যাই হৈমন্তী—

হৈমন্তী সৌমেনের হাতখানাকে গভীর চাপ দিয়ে কণ্ঠে স্নেহ ঢেলে বলে, এখনও কাউকে পাও নি?

সৌমেনের মুখে পরিতৃপ্তির দীপ্তি ছড়িয়ে প পরিপূর্ণদৃষ্টিতে সে তাকায় হৈমন্তীর চোখের দি কিছুক্ষণের জন্য ওরা চলে যায় প্রেমের মন্দা বেয়ে স্থান ও কালের অতীতে।

ইতিমধ্যে কখন যে ভাটার শেষে জো জল কল্ কল্ রবে আসতে সুরু করেছে, কেউই তা লক্ষ্য করে নি। দৃষ্টি পড়ার সঙ্গেই হৈমন্তী চঞ্চল হয়ে উঠল। ইস্, বড্ড হয়ে গেছে। ওঠ এবার এবং অনিচ্ছুক সৌমে টেনে তুলে পথের দিকে অগ্রসর হল।

জোয়ারের জলে নৌকোটা আরও উপরে এসেছে—হৈমন্তীর নজরে পড়ল। যেতে যেতে হেসে সে বললে, আচ্ছা খানিক্ আগে তুমি যে বলা নৌকোটা ঐ মাঝির নিজের—কিন্তু এ তো হতে পারে—আর হতে পারেই বা কেন—ে ভাগ সময়ে তো তাই-ই হয়—যে মাঝিরা নৌ মালিকের মাইনেকরা চাকর মাত্র।

কথাটা যে মোহাৎ অবিশ্বাস্য তা নয়, তবুও এই অবসরে, হৈমন্তীর কাছ থেকে এমন রূঢ় শোনার প্রত্যাশা করে নি সৌমেন। একবার হল নিরুত্তর থাকে। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বি সে প্রতিবাদ করে বসল, যদিও সে নিশ্চিত যে, এ প্রতিবাদকে প্রমাণ করার মত সঠিক তার জানা নেই। না না এ নৌকো ওর নিজে না হয়েই পারে না। দেখছ না, সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও ওর চোখে-মুখে এতটুকু কষ্ট ছিহ্ন নেই! সৌমেন জোর দিয়ে এ কথাগু বলে নিজের মনেও যে অনিশ্চয়তার স্রোত বই তাকে বদ্ধ করে দিল। তবুও অল্পক্ষণ পূর্বের সন্ধ্যাটা যেন সৌমেনের দৃষ্টিতে ম্লান হয়ে ত আর সৌমেনের দৃষ্টির অন্তরালে হৈমন্তীর রঞ্জিত একটা বাঁকা হাসি খেলে যায়। এই অসতর্ক জেনে নিয়েছে হৈমন্তী—কত অসহায় এই সৌ সাধারণ নিঃস্ব মানুষের মতই অসহায়।

তবুও এই দুর্বল, অসহায়, নিঃস্ব সৌ সঙ্গেই ফাল্গুনের এক রাত্রে বিয়েটা ঘটে। জগতে অনেক অসম্ভব ঘটনা যেমন করে মাঝে ঘটে—ঠিক তেমনি করেই।

ইতিমধ্যে সৌমেন ইউনিভার্সিটীর পরিক্রমা করে, অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে একটা

এবং হৈমন্তীও যথাক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে
টীতে নাম লেখাবে কি না চিন্তা করছে।
ম লেখাবার পূর্বেই ঘটনাটা ঘটে গেল,
পিতা রায়বাহাদুর অবিনাশ রায়ের একান্ত
সত্ত্বেও। কিন্তু কন্যা যখন একান্তই
ক স্বামী বলে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর,
নিজের সম্মান ও আভিজাত্যের খাতিরেও
পযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ফলে বিয়েতে
তাবিহীন আড়ম্বরই লক্ষ্য করা গেল
রায়বাহাদুরের কন্যার উপযুক্ত দান-সজ্জা
ল, কিন্তু যার নিয়ে যাওয়ার কথা সে বেঁকে
সৌমেন শ্বশুরকে বললে, এগুলোর
ন কি?
য়বাহাদুরের একবার ইচ্ছা হল বলেন, তুমি
প্রয়োজন কতদূর বোঝ? কিন্তু সে ইচ্ছা
করলেন, পাছে মেয়ের মনে আঘাত লাগে—
নিত বোধ করে। সুতরাং স্বরটাকে একটু
ম করেই বললেন, কিন্তু মণিমার অভ্যস্ত
যে এসব জিনিসের খুবই প্রয়োজন। কি
, তাই না?
হমন্তীও পিতাকে সায় দিল।
সৌমেন ভয়ানক বিব্রত বোধ করলে। বললে,
ঠিক সে জন্যে আমি কথাটা বলি নি। আমি
ং যে ফ্ল্যাটে থাকি, সেটা হৈমন্তীও দেখেছে—
টা এত স্বল্প-পরিসর যে এত জিনিসপত্র সেখানে
আমার সন্দেহ হয়, সেখানে আমাদেরই স্থান
ল হবে না। কণ্ঠে যতটা সম্ভব বিনয়
কথাটা বলেছিল সৌমেন।
কিন্তু রায়বাহাদুরের চোখের দৃষ্টিটা, সে কথা
ক্ষণিকের জন্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল—কিন্তু
ক্ষণিকের জন্যই। সৌমেন বা হৈমন্তীর তা
চর হল না।
য়বাহাদুর হেসে বললেন, বেশ তো একটা বড়
াও, তা হলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে।
কিন্তু তারই বা প্রয়োজন কি, তোমরা তো
সঙ্গেই থাকলে পার। এতবড় বাড়িতে
তোমাদের স্থানের অভাব হবে না। এমন
সামান্য জিনিসপত্রগুলো থাকলেও। কথাটা
করে বেশ জোরের সঙ্গেই হেসে উঠলেন
াদুর।
সৌমেনের মনে হল, সে যেন বিচারকের মুখ
তাঁর চূড়ান্ত রায়টি শুনে নিয়েছে। এর উপর
কোন ওজর-আপত্তি চলবে না। দুরূহ সমস্যাটার
সহজ সমাধানে হৈমন্তীও স্বস্তির নিশ্বাস
। বাবা তাকে একটা মহা দুর্ভাবনা থেকে
দিয়েছেন। বিয়ের পরে যে এত জটিলতা
ত পারে, সে কথাটা সে ভেবে দেখে নি।
তিতে অনার্স-পড়া মেয়ের কাছে অবশ্য এতটা
াশা করা যায় না। না, হৈমন্তী সে বিষয়ে
ন ছিল। জীবনের কোন একটা দৃশ্যে এক
আর একে এক হলেও পরবর্তী সব দৃশ্যগুলোতেই যে দুই আর দুই-এ চার হয়, হৈমন্তীর এ জ্ঞানের অভাব ঘটে নি। বাপকে বাদ দিয়ে সংসার পাতার চিন্তা সে কখনও করে নি।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে সৌমেনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ সেই ভাল—কি বল? সব গণ্ডগোল মিটে গেল!

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এ সব কথা বলা হল, সে কিন্তু নিরুৎসাহকণ্ঠেই উত্তর দিল, তা হয় না হৈমন্তী। বরঞ্চ এ জিনিসগুলো আপাতত এখানেই থাক কিছুদিনের জন্যে। সুবিধামত নিয়ে যাওয়া যাবে এবং এ প্রসঙ্গটা যাতে আর অগ্রসর না হতে পারে—সেই সম্ভাবনাটার উপর ছেদ টেনে বললে, শ্বশুরকে এবার আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিন।

রায়বাহাদুর একবার ক্রুর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

সেদিন অবশ্য সেখানেই শেষ হয় নি।

এত কথার পরেও সৌমেন হৈমন্তীকে নিয়ে ওর চক্রবেড়ের দু-কামরা ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিল সেইদিনই।

তারপর সৌমেন অনেক চেষ্টা করেছিল ওদের জীবনে আবার পুরানো সুরটাকে নূতন করে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু অনুরাগের সেই কাব্যমধুর জীবনে কোথায় যে ছন্দপতন ঘটে গেল, তা সে কিছুতেই খুঁজে পেলে না। আর হৈমন্তীর

Art Leather goods & Murshidabad Silk

—A Pride of West Bengal!

—A favourite match for modern fancy!!

—an up-to-date Foshion!!!

? ? ?

GRAMIN: West Bengal Khadi & V. I. Board.

(Goalpark, Durgapur, Kharagpur)

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্স

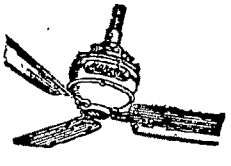

মার্কনী ফ্যান

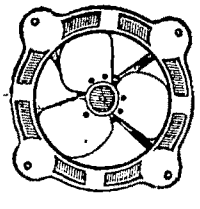

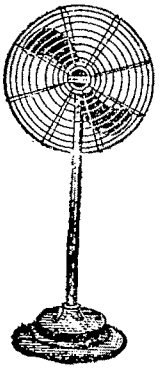

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

মনে হয়েছে ওদের ভালবাসার যন্ত্রটাই বোধ হয় কোথায় বিকল হয়ে গেছে—সেটাকে সারিয়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস পেরেও ত্রুটিটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

দু'টো মাস একটা অভিমানের ঘোরে কাটিয়ে দিলে সৌমেন। মাঝে-মধ্যে হৈমন্তীর খবরাখবর নিয়েছে টেলিফোনের সাহায্যে। তার কাছে যেতে যে ইচ্ছে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু যেতে গিয়েও পা বাড়াতে পারে নি। মনটা ওদের সকলের 'পরেই বিরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে হার তাকে মানতেই হল। এরকম নিঃসঙ্গ জীবন আর কতদিন সয়। তাই মাসদুয়েক পরে আজ হঠাৎ সৌমেন এসে হাজির হল রায়বাহাদুরের আফিস ঘরে এবং এসেই কোনরকম ভণিতা না করেই সে বললে, ওকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

'ওকে' মানে যে হৈমন্তীকে, সে কথাটা রায়বাহাদুর বেশ বুঝেছিলেন, কিন্তু তবুও প্রশ্ন করলেন, কাকে হৈমন্তীকে?

আজ্ঞে হাঁ।

তা বেশ তো, তোমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে, এতে আর আমার বলার কি থাকতে পারে—তবে—ডাক্তার বলছিলেন যে ওর শরীর এখনও খুব দুর্বল এবং এখনও ওর বেশ কিছুদিন বিশ্রাম দর

সে ক্ষেত্রে—কথাটা শেষ করলেন না র
সৌমেনের উপরেই সে ভার দিয়ে কাজে
রত হলেন।

সৌমেন ভ্রূকুঞ্চিত করে অল্পকাল দাঁড়িয়ে
প্রত্যাশা করলো, হয় তো রায়বাহাদুর তাঁর
অভিমত জানাবেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে
সাড়াশব্দ না পেয়ে মনে বিরক্ত হয়েই
খোঁজে গেল।

হৈমন্তী তখন চায়ের টেবিলে নীরেন
সঙ্গে গল্প করছে। নীরেন চৌধুরীকে এই
দেখলে সৌমেন। হৈমন্তী পরিচয় করিয়ে
বাবার অন্তরঙ্গবন্ধুর ছেলে। চার-পাঁচ বছর
ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। হালে
কোলকাতায় সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের এব
চাকরী নিয়ে।

আর সৌমেনকে দেখিয়ে বললে, হয় তো
না দিলেও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ নীরেনদা
ইনি আমার স্বামী।

হৈমন্তী আরও বললে সৌমেনকে, নী
ভ্যাগ্যিস আসে মাঝে মাঝে তাই সময়টা
যায় কোনরকমে। তুমি তো টেলিফোনেই
সারছ আজকাল।

খোঁচাটার জবাব দিতে পারত সৌমেন
করলেই—কিন্তু ইচ্ছে করল না। কি হবে।
মনের যে ক্ষতটা সময়ের প্রলেপে আর
বন্ধুর সাহচর্যে পূরণ হয়ে এসেছে, তাকে
ব্যথা দিয়ে লাভ কি? থাক নিরুত্তর থাকাই
একটা ম্লান হাসি দিয়ে হৈমন্তীর দেওয়া
আঘাতটাকে সহ্য করে নিলে সৌমেন এব
হয়েই, হয় তো বা ভদ্রতাবোধের প্রয়োজনে,
নীরেন চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে বি
ঘরে ফিরে এল। সৌমেন যা বলতে এসেছি
বলা হ'ল না। হৈমন্তীও তো ঘরে
যাওয়ার কথা একবারের জন্যও উত্থাপন
পারতো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সৌমেন ভাবছিল
কথা। সে যেন ক্রমে ক্রমে আবার দূ
যাচ্ছে।

নিজের চুলের মধ্যে অস্থিরভাবে আঙুল
করতে করতে এর প্রতিকারের উপায় চিন্তা ক
আর কোনকিছু স্থির করতে না পেরে
উপরেই নিজে আক্রোশে ফেটে পড়ছিল।

সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল সৌমেন। উঠে
বিছানায়। পেয়েছে। সে পেয়ে গেছে—সুনি
সমাধান।—একটা বাড়ি। হ্যাঁ একটা সুন্দর
বাড়ি। চারধার উন্মুক্ত, অবারিত আলো-বা
মাসকয়েক আগে সৌমেনের স্মরণ হয়, ওরা
কল্পনায় এঁকেছিল এমনই একটা নিখুঁত
ছবি, অদূর ভবিষ্যতে যেখানে ওরা নীড়
করবে। কল্পনাটা অবশ্য সৌমেনেরই। হৈ

৫১ পীঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানের
অবিস্মরণীয় কাহিনীর অনন্য-সাধারণ চলচ্চিত্রায়ণ!

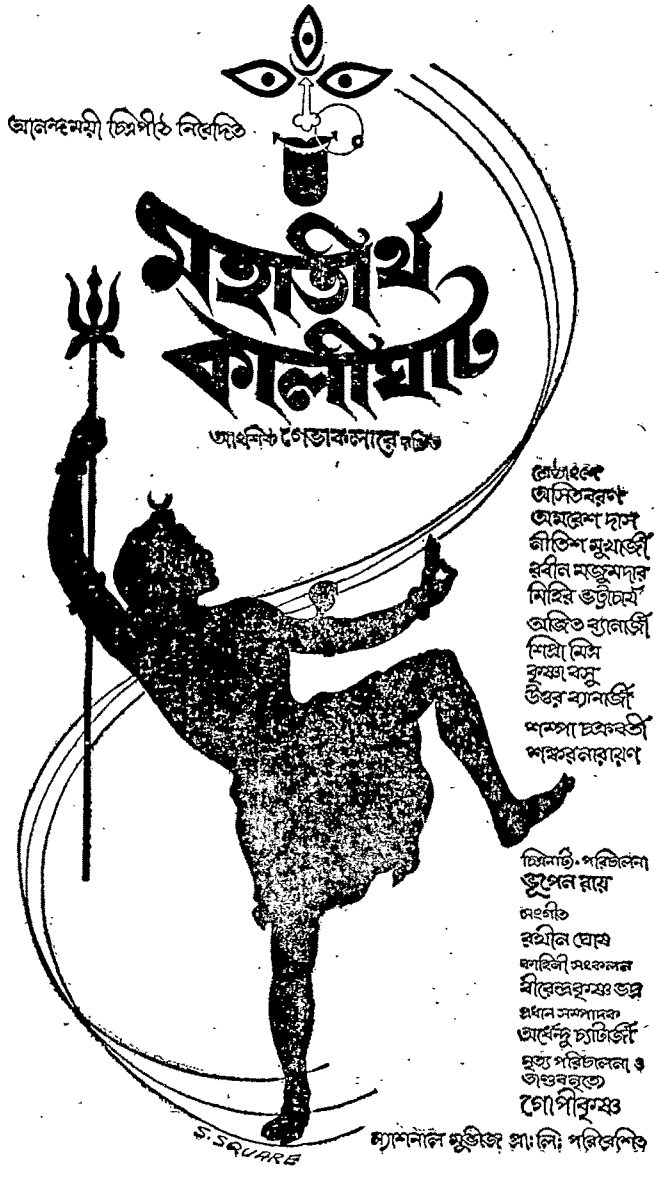

—সংগীতে—
॥ ধনঞ্জয় ॥
॥ মানবেন্দ্র ॥
॥ দ্বিজেন ॥
॥ পান্নালাল ॥
॥ বিনয় অধিকারী ॥
॥ নীলিমা ব্যানার্জী ॥
॥ শুক্লা ঘোষ ॥
॥ মাধুরী চ্যাটার্জী ॥
॥ সুমিত্রা ঘোষ ॥
॥ রবীন মজুমদার ॥

শহর ও শহরতলীর জনপ্রিয় চিত্রগৃহে—

মহাপূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

অপরূপ
ডিজাইন
চমৎকার
কারিগরী

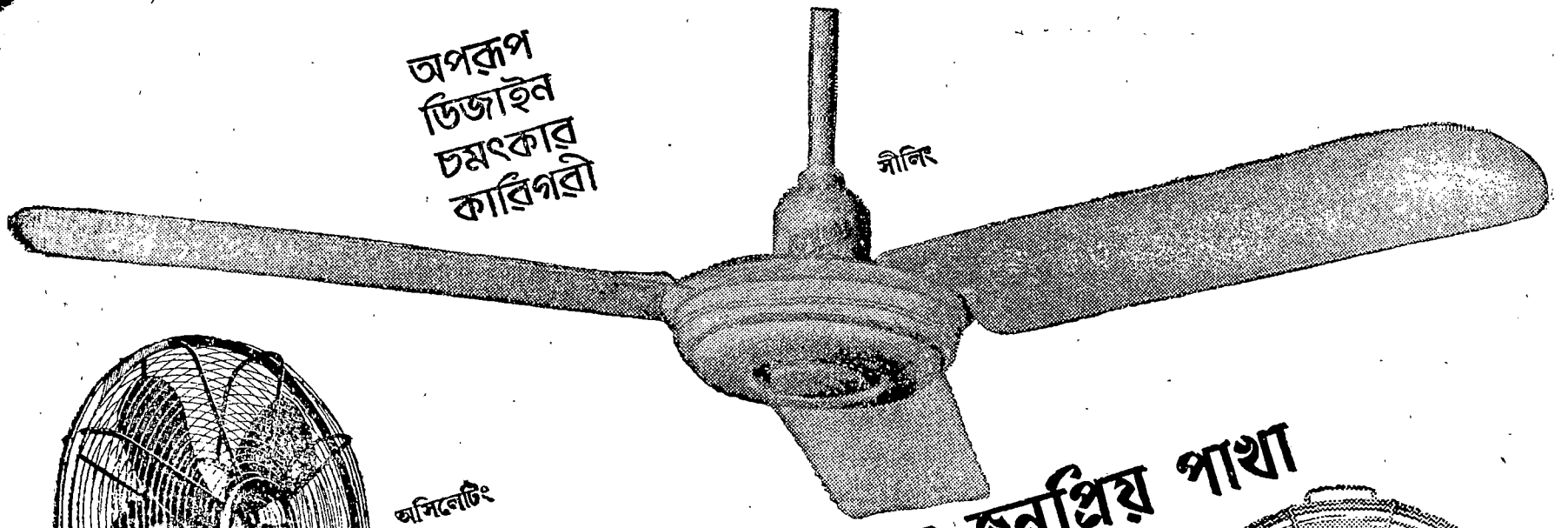

সীলিং

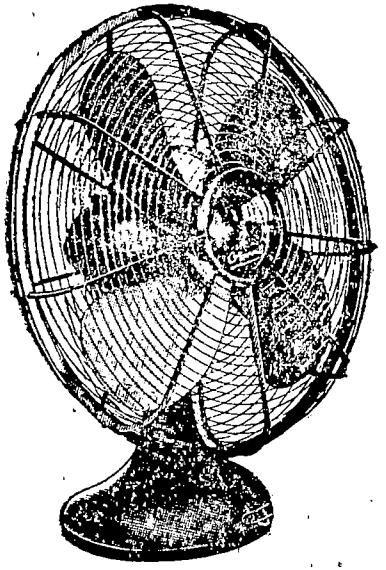

অসিলেটিং

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা

নিখুঁত সৌন্দর্য্য, নির্ঝঞ্ঝাট কার্য্যক্ষমতা,
ব্যবহারে অর্থ-সাশ্রয়ী—এসব ছাড়াও
অনেক কিছু গুণ থাকার ফলে
ওরিয়েন্ট পাখা ভারতে আজ সবচেয়ে
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

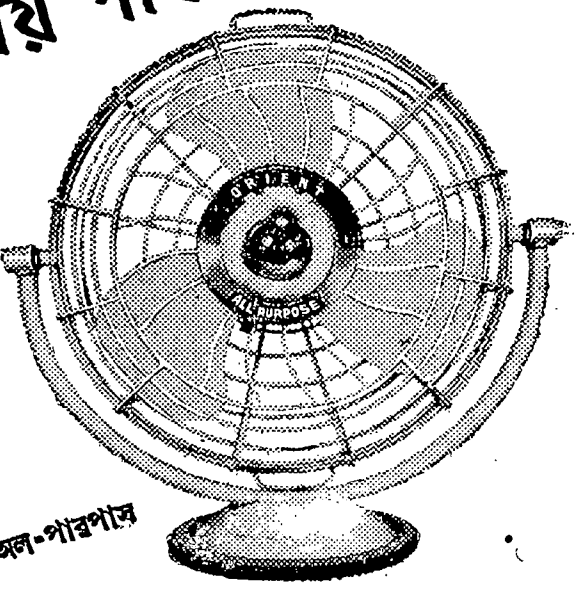

অল-পারপাস

ওরিয়েন্ট
পাখা

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, কলিকাতা-১১

ডিষ্ট্রিবিউটার্স ঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃ হিন্দুস্থান ডিলার্স লিঃ, ৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১, ফোন ঃ ৩৪-৫৩৯৩ এবং ৩৪-৫৩৯৪। **উড়িষ্যার জন্য শাখা ঃ** পেন্সান লেন, বক্সী বাজার, কটক—১। **বিহার ঃ** ধনধনিয়া ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ, ফ্রেজার রোড, পাটনা, ফোন ঃ ২২১৬৯

তাতে সায় ছিল। হয় তো প্রত্যেক নারীর বুকের অন্তরালে এই একই বাসনা বাসা বেঁধে থাকে।

সৌমেনের স্থির বিশ্বাস জন্মালো—নিজের গৃহেই হৈমন্তী খুঁজে পাবে তার জীবনের সার্থকতা। আর হয় তো এই পরিবেশের অভাবেই ও এতদিন তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।

সৌমেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে এবং সেই নির্জন ঘুমন্ত রাতের অন্ধকারে কল্পনার অশ্বকে বল্গাহীন অবস্থায় দ্রুত হতে দ্রুততর বেগে ছুটিয়ে দিলে।

সৌমেন স্থির করলে, কিছুদিন আরও সে আনবে না হৈমন্তীকে তার চক্রবেড়িয়ার ফ্ল্যাটে। নিজের সব খরচপত্র দেবে কমিয়ে আর আয়ের অঙ্কটাকে দেখে বাড়িয়ে এবং তাই করার জন্য টিউশনির সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িয়ে দেবে। বাড়ি করার জন্য একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু এ সুসংবাদটা তাকে জানিয়ে আসা প্রয়োজন, যার জন্য সে এ কাজে ব্রতী হয়েছে।

কিন্তু একা পেলে না হৈমন্তীকে। নীরেন চৌধুরী আর রায়বাহাদুরও ছিলেন সেখানে। কথায় কথায় বাড়ি তৈরির ইচ্ছেটা প্রকাশ করলে সৌমেন।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম বাড়ি করবে?

সৌমেন বেশ বুঝলো সে জিজ্ঞাসায় আছে উপহাসের আভাস। তবুও বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল—আমার সামর্থ্যের কথা তো আপনার অজানা নেই। সুতরাং তার বাইরে যাব কি করে বলুন?

তা হলে বরঞ্চ ঐ টাকা দিয়ে একটা ব্যবসা গড়ে তোল। প্রয়োজন হলে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারব। নিজের করে বাড়ি ভাড়া বাঁচিয়ে তোমার যেটুকু আ তার চেয়ে ঢের বেশি আয় হবে তোমার ঐ থেকে। কি বল মা?

অর্থনীতির ছাত্রী হৈমন্তীর আপেক্ষিক ক্ষতি হিসাবের তত্ত্ব বুঝতে এতটুকু কষ্ট হো মাথা নেড়ে সে পিতাকে সমর্থন জানালে।

নীরেন চৌধুরীও নিরপেক্ষ থাকল না। বললে, যদিও এ সব পারিবারিক আলো আমার কথা বলা উচিত নয়, তবুও আমি না পারছি নে যে, আজকালকার দিনে যখন টাকাতেই একটা ভাল থাকার জায়গা পাওয়া তখন নিজস্ব একটা বাড়ি করার মধ্যে সেন্টি ভ্যালু ছাড়া যে আর কিছুই নেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

একটু থেমে কথাটাকে শেষ করেছিল সে হাসতে, যদিও নিষেধ করা আমার সাজে না, চাকরী না করলে, ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে ঐ আমার প্রফেসান।

বছরখানেক কেটে গেছে। হৈমন্তী তার বাপের বাড়িতেই রয়েছে। এই এক মধ্যে সৌমেন বোধ করি দিন-পনেরোর বেশি দেখা করতে যায় নি। কি করে যাবে পেয়েছে কই? নিশ্বাস বন্ধ করে তাকে হয়েছে অর্থের সন্ধানে। আর এখন ছুটে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা জমির সন্ধানে।

হৈমন্তীর শরীর আগের থেকে অনেক উঠেছে, কিন্তু মনে জানি কোথায় ভাঙন মাঝে মাঝেই একটা উদাস নিস্পৃহতা তাকে ঘিরে ধরে। এতবড় বাড়িতে, সময়ে সময়ে বড় একা মনে হতে থাকে, আর রাজ্যের চি মাথার মধ্যে ভিড় করে।

সেদিনও একা বসেছিল হৈমন্তী। রা কিছুক্ষণ পূর্বে ডাক্তারের চেম্বারে গেছেন। যাবৎ তাঁর শরীরটাও সুস্থ নেই। কে আজকাল কথায় কথায় রেগে যান। চাকর-ব তে কথাই নেই, এমন কি এক-আধ সম ক্রোধের জের হৈমন্তীর উপরও এসে পড়ে। লোকজন নিয়ে হৈ-চৈ করতে ভালবাসতেন; তাও এড়িয়ে চলেন। এমন কি নীরেনকে দু-একটা মামুলি কথাবার্তা বলে সরে পড়েন। ডাক্তার বলেন প্রেসার বেড়েছে—চেঞ্জে ঘুরে উনি মানতে চান না। তাই জোর করে বি

A "BULLS EYE"
CANNOT BE GUARANTEED
EVERYTIME -

BUT WITH OUR ORGANISATION AND OUR WIDE RANGE OF STOCKS — WE COULD POSSIBLY HELP YOU IN YOUR PROBLEM OF "STEEL" ! WHY NOT WRITE ?

TATA SCOB DEALERS
(CONTROLLED STOCK)
CALCUTTA LIMITED
20 STRAND ROAD, CALCUTTA-1
TEL : 22-1101 (9 LINES)

না হয়েছে। ওকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর
বসে হৈমন্তী কি যেন ভাবছিল। জুতোর
ত হয়ে তাকালো। না, যাকে প্রত্যাশা
ল নয়। সৌমেন এসেছে।
কদিন পরে ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে
হৈমন্তী। বড় বিশীর্ণ আর ম্লান দেখাচ্ছিল
। তাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন যেন
মতা অনুভব করল হৈমন্তী। তার নিকটে
সে অনেকদিন পরে, তার একখানা হাত
হাতের মধ্যে তুলে নিল। একটু হাসল
আর সে হাসিটা হৈমন্তীর বড় ভাল
বিয়ের আগের সেই পূর্বরাগের দিনগুলোর
লগে গেল যেন তার মনে। ওকে নিয়ে
াল নিজের ঘরে—বিছানার 'পর নিজের
মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কেন আস না
?
কদিন পরে হৈমন্তীর এমন সুমধুর ব্যবহারে
অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার প্রশ্ন শুনে
শ বলে আর ক'টা মাস অপেক্ষা কর; সব
একেবারে অবাক করে দেব তোমাকে।
ল না সে কথা, পাছে সে আঘাত পায়।
ম্লান হাসলো।
ন্তী আবার বলল, বল না গো!
কদিন পরে এত করুণার স্পর্শ পেয়ে, তার
ী সজল হয়ে উঠল। উত্তর দিতে গলাটা
এল। বলল—তোমারই জন্যে মণি।
ন্তী ভাবল, যে বিসদৃশ ব্যবহার সে করেছে
সঙ্গে এতকাল ধরে, ও বোধ হয় তারই
রছে। ও যে কত অসহায় কত অভিমানী
হৈমন্তী ছাড়া আর কে জানে?
লজ্জায় আর বড় ব্যথায় সে মুখটা লুকালো
কোলে। আর কোথা থেকে রাজ্যের বাষ্প
র চোখ-মুখ আর সৌমেনের কোলটাকে
ল। সৌমেন বিস্মিত হল। ঠিক এমন
স্বীবনে ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। স্নেহভরে
পিঠে-মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে
ণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কেন কাঁদছ বল তো?
? ওঠ—সস্নাটি চোখ মোছ। তারপর
ওর মুখখানাকে তুলে ধরে ওর চোখের
মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করেছে—কি
কেন কাঁদছিলে বল তো মণি?
ন্তী ওর মাথাটা পুনরায় সৌমেনের কোলের
ব বললে, আমার আর ভাল লাগে না।
তুমি কোথাও নিয়ে চল।
ক্ষণে যেন ওর কান্নার অর্থ খুঁজে পেয়েছে
ওকে ছেড়ে আর থাকতে পারছে না
অথচ চক্রবেড়ের ঐ পুরানো ফ্ল্যাট-বাড়িটাতেও
যেতে ইচ্ছে করছে না তার, তাই আর
অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে এই

হৈমন্তীর মাথায় হাতখানাকে রেখে সে ভাবছিল, আর মনে মনে হাসছিল। বছরখানেক পূর্বেও যদি হৈমন্তী একটিবারের জন্যও তাকে এই অনুরোধ করত, সে হয় তো আনন্দের আতিশয্যে দিশাহারা হয়ে, ঋণ করেও পত্নীর এই বাসনাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস পেত। কিন্তু আজ? আজ আর তা সম্ভব নয়। যে অর্থ সে এত শ্রমে, এত কষ্টে আহরণ করেছে এবং যে অর্থের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত ব্যয় করতে সে সহস্রবার চিন্তা করে, তাকে নিছক একজনের একটা আব্দার পূরণ করার জন্য, অযথা নষ্ট করতে সে নারাজ।

কোনদিনই হিসেব করে, ভেবেচিন্তে সে কোন কাজই করে নি; টাকা-পয়সার ব্যাপারে তো নয়ই। অথচ আশ্চর্য অদৃষ্টের পরিহাস, সেই টাকা-পয়সা বাঁচাবার জন্যই আজ ওর যত চিন্তা! ও মনে মনে হেসে ফেললে। ওরা দু'জনেই বদলে গেছে। একজন সাময়িক একটুখানি সুখের জন্যে বেহিসেবি হয়ে যেতে চাইছে, আর একজন সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ নির্মাণে বদ্ধপরিকর; স্থায়ী সুখ যেখানে নিশ্চিত—তাই হিসাবের ব্যাপারে এত সংরক্ষণশীল হয়ে থাকতে চাইছে। না নিজেকে কোনমতেই আলগা দিলে চলবে না।

সৌমেন সস্নেহে হৈমন্তীর মুখখানাকে তুলে ধরে বললে, সেই জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্যেই তো এতদিন ধরে চেষ্টা করছি রাণী। আর ছ'টা মাস মাত্র—তারপরেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করব সেই অন্য কোথাও—যেখান থেকে ফিরে আসার জন্যে মন আর তোমার চঞ্চল হয়ে উঠবে না।

হৈমন্তী ওর মুখের দিকে আশ্চর্য-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। কি বলছে লোকটা?

সৌমেন ত্রস্তে জামার পকেট থেকে রঙবেরঙের হিজিবিজি লাইনটানা একখানা পাতলা কাগজ বার করল—এই দেখ।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে হৈমন্তী উঠে বসে। তারপর নিস্পৃহকণ্ঠেই প্রশ্ন করে, কি ওটা?

সেই কাগজখানার উপর একাগ্রদৃষ্টি রেখেই সৌমেন জবাব দেয়, যে জমিটা তোমার জন্যে কিনেছি—তারই নক্সা। ওর কথাই তো তোমাকে বলছিলাম, মাস ছয়েকের মধ্যেই ওখানে একটা বাড়ি গড়ে উঠবে, আর সেখানেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি প্রতিষ্ঠা করব। হৈমন্তীকে কাছে টেনে নিতে চাইল সৌমেন কিন্তু হৈমন্তী সুকৌশলে সে আকর্ষণ এড়িয়ে গেল! উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যেও না কিন্তু তোমার জন্যে চায়ের কথা বলতে যাচ্ছি।

যায়ও নি সৌমেন। চা খেয়েই সেদিন উঠেছিল, মনের প্রান্তে উপচে-পড়া খুশির রেশ নিয়ে। অনেক—অনেকদিন পরে হৈমন্তীকে আজ সে তার প্রার্থিত রূপে পেয়েছে। হয় তো সত্যি পেয়েছিল, চিড় খাওয়া মনটাকে গোটা করার প্রত্যাশা নিয়েই নিজেকে

তুলে ধরেছিল হৈমন্তী—সৌমেনের কাছে। কিন্তু সৌমেন বোধ করি তা লক্ষ্যও করল না এবং আরও লক্ষ্য করল না যে, সে যখন রায়বাহাদুরের গেট দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, নীরেন চৌধুরীর নূতন সিডানটা ঐ একই গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর ফ্ল্যাটে ফিরে দেখল ওর জন্য একখানা পোস্টকার্ড মেঝেতে পড়ে অপেক্ষা করছে। পত্রখানা উঠিয়ে পত্রলেখকের নাম দেখেই ওর চোখ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রায়বাহাদুর লিখেছেন পত্রখানা। তিনি চেঞ্জে যাচ্ছেন গিরিডিতে, হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। তা তিনি যে জন্যেই যান, আর যেখানেই যান, তাতে সৌমেনের কি এল-গেল। চিঠিখানাকে অবজ্ঞাভরেই সে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল শেষ লাইনটার প্রতি। 'হৈমন্তী এখানেই রইল—মাঝে-মধ্যে দেখাশুনা কোরো।'

সৌমেনের দৃষ্টিটা আবার সহজ হয়ে এল—মনটা খুশিতে ভরে উঠল। হৈমন্তী তার পীড়িত বাপের সঙ্গেও যায় নি—যায় নি নিশ্চয় তারই জন্যে। সে কবে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে তারই প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।—সৌমেন তখুনি মনে মনে সঙ্কল্প করে ফেললে যে, আর তাকে নিরর্থক কষ্ট দিয়ে বাপের বাড়িতে একা ফেলে রাখা চলবে না। জমিটার উপর ভিত্তিস্থাপনের দিনই ওকে নিয়ে আসবে, আর যে ক'টা মাস বাড়িটা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে সে ক'টা মাস না হয় একটু কষ্ট করেই চক্রবেড়ের এই ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িটাতেই সে থাকবে।

মঙ্গলবার দিন বিকেল নাগাদ প্ল্যানটা মিউনিসিপ্যাল অফিস থেকে পাওয়ার পরই সৌমেনের মনটা আশ্চর্যরকম হাল্কা হয়ে উঠল। কত বাধা-বিপত্তি; কত দুঃসহ ব্যথা-বেদনার শেষে আজ তার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। একটা অভূতপূর্ব আনন্দের বন্যা তার সারা দেহ-মনের উপর দিয়ে প্লাবিত হতে থাকল।

শীতের সন্ধ্যা, তাড়াতাড়ি নেমেছে। সৌমেন ব্যস্ত হয়েই রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল, বেশি রাত হওয়ার আগেই হৈমন্তীকে নিয়ে ফিরে যাবে সে। খুশির যে রেশটা এতক্ষণ পর্যন্ত অনুরণিত হচ্ছিল, হৈমন্তীকে দেখতে না পেয়ে সেটা অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে নীরেন চৌধুরীর সঙ্গে বাজারে গেছে কিছু কেনা-কাটার জন্যে। খানিকক্ষণ নীরবে তার প্রতীক্ষায় বসে রইল। কিন্তু একা একা বসে থাকতে ভাল লাগল না। মনটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। আজ কতকাল পরে সে তার হৈমন্তীকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে নিয়ে যেতে এসেছে, আর এই চরম মুহূর্তেই সে অনুপস্থিত। মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। চাকরকে বলল, আমি কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসছি, দিদিমণিকে বোলো।

উপরে গিয়ে এবারেও হৈমন্তীকে দেখতে পেল না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণি আসেন নি?

আজ্ঞে এসেছিলেন, কিন্তু আবার চলে গেলেন!

চলে গেলেন! কোথায় চলে গেলেন? বসে নি আমি এসেছিলাম?—একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসে সৌমেন রূঢ়কণ্ঠে।

ভৃত্য জবাব দিল, আজ্ঞে বলার আর সময় পেলাম কোথায়। ওঁরা এসেই—গোছগাছ করেই যে স্টেশনে চলে গেলেন।

একটা বিস্ময়ে; একটা সন্দেহাতীত সন্দেহে ক্ষণিকের জন্য তার সারা দেহ মন যেন অবশ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের একটা বিশ্রী নীরবতা সারা ঘরখানাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। সৌমেনই এই স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ও সহকারে জিজ্ঞাসা করল, কারা গেছে তার মন নিঃসংশয়ে জেনে নিয়েছে যে ক, কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষের অকারণেও ধারণা হয়—বোধ হয় সেইজন্যেই এ জিজ্ঞাসা।

বিনীত ভৃত্য, হয় তো সহানুভূতির দেয়, আজ্ঞে দিদিমণি আর ইঞ্জিনীয়ার সা

এবং এই চলে যাওয়ার ইতিহাসে একটা কার্য-কারণের সম্বন্ধ আরোপ ক ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বোম্বাই-এ বদলি হয়ে তাই।

কিন্তু এটাও যে সম্পূর্ণ উত্তর হল বুঝতে পেরে, জামাইবাবুকে খুশি করা সে তার বাকি বক্তব্যটুকু শেষ করে—শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না। যাওয়ার পর থেকেই খুব কান্নাকাটি তাই হয় তো—(একটু থেমে; একটু চি ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ওঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে

একথা শোনার পর, সৌমেনের হয়েছিল, তার পায়ের তলা থেকে যাচ্ছে? হৃৎস্পন্দন কি বন্ধ হয়ে যা হয়েছিল?—চোখ দু'টো কি ঝাপ্‌সা হয়ে কি জানি—কি তার হয়েছিল, সৌমে কিছু মনে নেই—কারণ মনে থাকার ম তার অবশিষ্ট ছিল না তখন।

ব্যথিত ভৃত্য শুধু শুনল, বিমূঢ় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে তাকে নিজের কাজে নির্দেশ দিচ্ছেন।

সম্মুখে খাটের উপর কাগজের ে অবস্থায় বাড়ির নানা ভঙ্গীর নক্সা কাগজখানা পড়ে আছে। বোধ হয় ও সৌমেনের মনে হতে লাগল, ওরা ে হেসেছে। কোলকাতার উপকণ্ঠে স জমির উপর—পুতুলের খেলাঘরের মত বাড়ি দিয়ে—সে হৈমন্তীকে ভোলাতে চে দেখেছে আর হো-হো করে হেসেছে।

সৌমেনও সেই কল্পিত হাসির স্বর মিলিয়ে হাসতে গেল, কিন্তু হা পরিবর্তে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে খ ঝরে পড়ল। সম্মুখের ঐ কাগজটা দেখেছে নীল, কিন্তু জানে না তো রঙ নীল নয়; বুকের জমাট বাঁধা রঙ-করা গাঢ় লাল ওটা। বুঝতে হৈমন্তী—বুঝতে পারে নি ঘন নীল আর তফাৎ। বোকা মেয়ে! হো হো করে সৌমেন। আর কাগজখানা নিয়ে টুকরে ছিঁড়ে শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন আঁধার-নয় ছড়িয়ে দিল।

রাখালদাস মল্লিক এণ্ড কোং
প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী
রেজিষ্টার্ড টাটা-ইস্কো ও হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স
ডি/১৪, জগন্নাথ ঘাট, কলিকাতা—৭
(অফিস) ৩৩-১৬৮৫ ফোন: ৬৭-২২২৫ (রেসিডেন্স)

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৫৮৯

With best compliments of

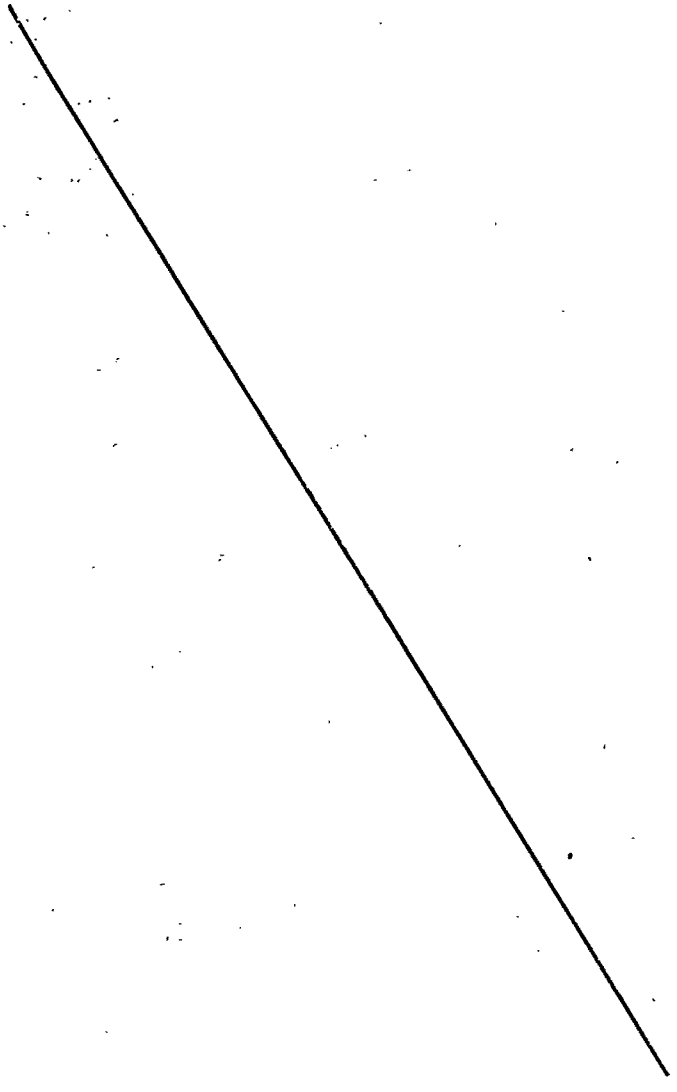

S. P. Trading Co.

35, Netaji Subhas Road, Calcutta-1

Phones : 22-8761
22-3882

Stockist :

BOILER TUBES.
HYDRAULIC TUBES
STEAM PIPES.

যত্নের চিরুণী
মানেই কিরণ

যত্নের চিরুণী 'কিরণ' এর জুড়ি নেই।
বাজারের সেরা চিরুণী দক্ষ কারিগরের হাতে
মেশিনে কাটা প্রতিটি দাঁত নিখুঁত
ও মসৃণ। চুলের গোড়ার ময়লা টেনে
আনে। আঁচড়ে আরাম পাওয়া যায়।
রকমারি রঙ ও ডিজাইন আর এমন
টেকসই যে স্বচ্ছন্দে অনেকদিন চলে।

কিরণ
এর চিরুণী ও
প্রসাধন সামগ্রী
আপনাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলবে।

কিরণ প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হইল
৺মহাপূজায় বসুমতীর উপচার
বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথী
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের
সর্ব্বজনসমাদৃত

মহাভারত

৪র্থ খণ্ড—মূল্য মাত্র ছয় টাকা
(শল্য—সৌপ্তিক—স্ত্রী ও শান্তি পর্ব্ব)
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

জটিল ব্যাধি ও প্রতিকার

হতাশ রোগী সুযোগ লউন

বিবাহিত, অবিবাহিত, তরুণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন রোগী, যাঁহারা নানা প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত, তাঁরা সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হউন। উহা ছাড়া স্মৃতিশক্তিহীনতা সকল প্রকার মূত্র-রোগ, শক্তিহীনতা, অম্লশূল, অজীর্ণ, অক্ষুধা, অনিদ্রা, যাবতীয় পুরাতন আমাশয়, পেটের রোগ, রক্তদোষ, সর্বাঙ্গ বেদনা, হার্ণিয়া, কোষবৃদ্ধি, ফাইলেরিয়া, একশিরা ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গাদি সম্পূর্ণ বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয়। সাক্ষাতে অথবা রোগ বিবরণ লিখিয়া ব্যবস্থা লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, ১৫, শিবতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। ফোন: ৬৭—২৭৫৫।

সবিনয় নি

● শারদীয়া দৈনিক
ও সম্পাদনা করিয়াছেন
রবিবাসরীয় সাময়িকী
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।

● এই বিশেষ সংখ্য
আন্তরিক সাহায্য ও সহযে
তন্মধ্যে লেখক, লেখিকা, শি
ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে
জানাইতেছি।

● উল্লেখ থাকে যে,
রচনাই স্বেচ্ছায় কোথাও
মুদ্রণ-পারিপাট্য ও রচনা
নুযায়ী সংখ্যাটি অলঙ্কৃত ক

● সম্পাদনা কার্যে ও
প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়াছেন
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিকুমার চট্টো

● সংখ্যাটি অলঙ্কৃত করিয়াছে
রেবতীভূষণ ঘোষ, পুলক বিশ্বা
গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী,
হীরেন সেন, সমীরকুমার ঘো
ঘোষ, শম্ভু রায়, মদন সরকার,
ঘোষ, শ্রীকান্ত রায়, সমীরকু
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু মু
রঞ্জন দাস, বিরাজ সেনগুপ্ত,
রায়চৌধুরী, নৃপেন পাল, যতীনাথ

বিবেকানন্দ মুখে
(সম্পাদক
দৈনিক ব

আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্যে
আমাদের আন্তরিক শারদীয়-শু

এ্যাসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ান এণ্টারপ্র
প্রাইভেট লিঃ

২০৬, আচার্য্য জগদীশ বোস রোড, কলিকাতা-

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীসুকুমার গুহমজুমদা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড * ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী